শঙ্করাচার্যের

বিবেকচূড়ামণি

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

'শঙ্করাচার্য ছিলেন লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে, ষোল বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি তাঁর সমস্ত গ্রন্থের রচনা শেষ করেছিলেন। এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের রচনা, এই বালক নিজেও—আধুনিক সভ্য জগতের চোখে পরম বিস্ময়। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে তার প্রাচীন পবিত্র ভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ভাবলে অবাক হতে হয়—কী কঠিন এবং কত বিরাট কাজ তাঁর সামনে ছিল।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

আচার্য শঙ্করের আনুমানিক আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষ ভাগে (তাঁর আবির্ভাবকাল নিয়ে মতভেদ আছে)। মাত্র বত্রিশ বছরের জীবনকালে তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজকে যা দিয়ে গেছেন, তার যথার্থ মূল্যায়ন আর একজন শঙ্করই কেবল করতে পারে। বিরুদ্ধ ধর্ম ও নাস্তিক মতবাদের মুখে সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করেছেন। তিনি বেদান্তের অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। সমগ্র ভারতবর্ষ পদব্রজে ভ্রমণ করে তিনি বেদান্তধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি মঠের প্রতিষ্ঠা এবং দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রবর্তনা করে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম তথা সন্ন্যাসী-সমাজকে তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শক্তিশালী করেছেন। এ তাঁর অপূর্ব সাংগঠনিক শক্তির পরিচায়ক এবং তাঁর এই কীর্তি দিগ্বিজয়ী সেনাপতির রাষ্ট্র-প্রতিরক্ষা নীতির সঙ্গেই তুলনীয়। অদ্বৈতানুভূতিকেই ধর্মজগতের শেষ সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করলেও, সেখানে উপস্থিত হতে গেলে যে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতের সোপানশ্রেণীকেও ব্যবহার করতে হয়, তা শঙ্কর বুঝতেন বলেই মনে হয়। কারণ জ্ঞানকেই যিনি পরম লক্ষ্য বলে প্রচার করেছেন, তিনি কিন্তু জগতে অবস্থান করেছেন একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মবীর রূপে। বহু লুপ্ত তীর্থ তিনি উদ্ধার করেছেন এবং শাস্ত্রসম্মত পূজাপদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। যেমন তিনি রচনা করেছেন বৈরাগ্য-উদ্দীপক 'কৌপীনপঞ্চকম্', 'নির্বাণষট্‌কম্'-এর মতো স্তোত্রসমূহ, তেমনি রচনা করেছেন অপূর্ব ভক্তিরসস্নিগ্ধ 'ভবানী-অষ্টকম্', 'অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্'। শঙ্করের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি: ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও প্রধান উপনিষদ্‌সমূহের (অর্থাৎ প্রস্থানত্রয়ের) ভাষ্য রচনা। এ ছাড়াও অদ্বৈতবেদান্তকে সর্ব-সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি রচনা করেছেন বহু প্রকরণ-গ্রন্থ। সেগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল 'বিবেকচূড়ামণি'।
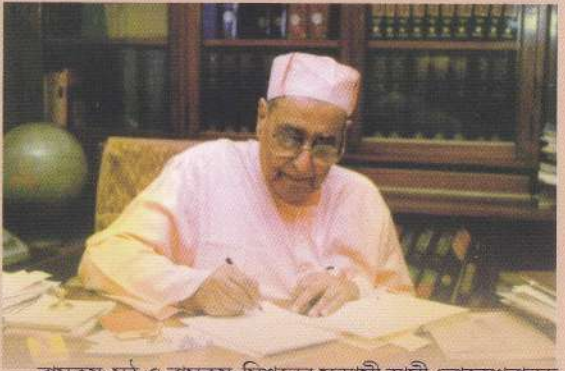
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের (১৯১১-৯৮) নাম এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। তাঁর সন্ন্যাসজীবনের সূচনা দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক হিসেবে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ক্রমশ এটিকে ভারতের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'নরেন্দ্রপুর' -এ রূপায়িত করেন—'নরেন্দ্রপুর'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ তিনিই (১৯৫৬-৭৪)। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-সংগঠন, বস্তি-উন্নয়ন এবং যুবশক্তি-বিকাশের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আবার একই সঙ্গে তিনি ছিলেন বহু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থের সম্পাদক ও রচয়িতা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ (স.), তব কথামৃতম্, শতরূপে সারদা (স.), অনন্যপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, উপনিষদ্, Practical Spirituality, Religion and Culture, Ramakrishna Paramahamsa, Letters for Spiritual Seekers, Upanishads (9 Vols.), ইত্যাদি। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইংরেজি ও বাংলায় অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এবং ভারতীয় দর্শন ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ দেশে ও বিদেশে বহুবার আমন্ত্রিত হয়েছেন। বহির্ভারতে যেসব দেশে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন তার মধ্যে আছে : রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড, কানাডা, জাপান, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, বালগেরিয়া, লিথুয়ানিয়া, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যাণ্ড। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, সরবন, হ্যামবোল্ড ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি যখন ভ্যাটিকানে যান, পোপের পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। জীবনের শেষ ২৫ বছর (১৯৭৪-৯৮) তিনি ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্কৃতি-কেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর অধ্যক্ষ। তাঁর আমলেই এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচিতি দেশ-বিদেশের পণ্ডিত মহলে ছড়িয়ে পড়ে।

'বিবেকচূড়ামণি' বিচারের বই। 'বিবেক' কথাটার অর্থ বিচার। সংসারে ভালো আছে, মন্দ আছে, সত্য আছে, মিথ্যা আছে। তাই মানুষকে বিচার করে চলতে হয়। তাকে সতর্ক করে দেয় এই বিচার। যে যত বিচারশীল, মানুষ হিসেবে সে তত উন্নত। কিন্তু আসল বিচার নিত্য-অনিত্যের বিচার। নিত্য-অনিত্যের বিচারের নামই বিবেক। সেই বিবেক বা বিচারের চূড়া, তারও ওপরের মণি—এই রকম বিচারের বই এই 'বিবেকচূড়ামণি'।

বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব এই বইয়ের বিষয়। বেদান্তে কি আছে? ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মই নিত্য সত্য। ব্রহ্ম শাশ্বত, সনাতন, অপরিবর্তনীয়। জগতের আর সব কিছু অনিত্য, পরিবর্তনশীল, এই আছে এই নেই। শাস্ত্র বলছেন : আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য জীবন্মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ জীবদ্দশাতেই মুক্ত হয়ে যাওয়া। কিন্তু আমি কি বদ্ধ ছিলাম কোন দিন? আমি তো ব্রহ্মস্বরূপ, আমি তো মুক্তই আছি চিরকাল। বন্ধন কোন দিনই ছিল না, নেইও। শুধু আমি সেটা জানি না। এই অজ্ঞানটা দূর করার জন্যই বিচারের প্রয়োজন। আমার বন্ধনের বোধ উপাধির জন্য। নিজের স্বরূপের সঙ্গে নানা পরিচয়ের লেজুড় জুড়েছি, তাই নিজেকে বদ্ধ মনে করছি। আমি কখনও জন্মাইনি, কখনও মরবও না। কেউ যে আমায় মুক্ত করে দেবে তা নয়, আমি মুক্তই আছি। এই জ্ঞানটা হওয়ার জন্য যে বিচারের প্রয়োজন, 'বিবেকচূড়ামণি' সেই বিচারের বই।

বেদান্তের পরম উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধি মানুষকে কিভাবে বদলে দেয়—'বিবেকচূড়ামণি'তে সেই কথা আছে। গুরু-শিষ্যের সংলাপের মাধ্যমে এতে আত্মতত্ত্ব বলা হয়েছে। সেসব এমন কথা যে, শুনলে শিহরণ জাগে। মুমুক্ষুর মুক্তির ইচ্ছা আরও বেড়ে ওঠে আর সাধারণ মানুষও মুমুক্ষু হয়ে যায়। 'বিবেকচূড়ামণি' বিচারের বই—কিন্তু সে বিচার নীরস বিচার নয়। আত্মানন্দের অনুভূতি অপরূপ কাব্যসুষমায় এই বইয়ের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

রামকৃষ্ণ মিশন
ইনস্টিটিউট
অব কালচার

Order for books may be placed at
Website : www.sriramakrishna.org
Email : rmic@vsnl.com

₹ 290

ISBN 81-901781-1-3
9788190178112
www.sriramakrishna.org

শঙ্করাচার্যের

বিবেকচূড়ামণি

শঙ্করাচার্যের

বিবেকচূড়ামণি

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোলপার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০২৯

প্রকাশক
স্বামী সুপর্ণানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোলপার্ক, কলকাতা ৭০০ ০২৯

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০০৩
দ্বিতীয় প্রকাশ : শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য আবির্ভাব তিথি
ষষ্ঠ মুদ্রণ : মে ২০১৮

ISBN : 978-81-87332-66-4

মূল্য : দুশো নব্বই টাকা

মুদ্রক
ট্রায়ো প্রসেস
কলকাতা ৭০০ ০১৪

প্রকাশকের নিবেদন

পূজ্যপাদ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গোলপার্ক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর 'বিবেকানন্দ হল'-এ শঙ্করাচার্যের 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'বিবেকচূড়ামণি'কে বেদান্তগ্রন্থ বলা হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের সরল বেদান্ত-ব্যাখ্যা শ্রোতাদের আপ্লুত করে। যাঁরা মহারাজজীর ক্লাসে নিয়মিত আসতেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই 'বিবেকচূড়ামণি'র অনবদ্য ব্যাখ্যা শুনে সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানান। পরবর্তী কালে পূজ্যপাদ মহারাজের আদেশে অধুনা প্রয়াতা অধ্যাপিকা শ্রীমতী দীপ্তি পাল মহাশয়া ক্যাসেট থেকে বক্তৃতাগুলির অনুলিপি করে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর মহারাজজীর দেহান্তের প্রায় পাঁচ বছর পরে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে 'প্রণতি পাবলিশিং হাউস'-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভাগবত চক্রবর্তী মহাশয় 'শঙ্করাচার্যের বিবেকচূড়ামণি' অভিধায় গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অগণিত ভক্তমণ্ডলী সেটিকে সাদরে গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে বইটি প্রকাশের ছ-বছরেরও অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানে শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী এই বইটির গ্রন্থস্বত্ব রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-কে প্রদান করেছেন। গ্রন্থটির স্বত্ব-প্রদানের জন্য আমরা প্রথম প্রকাশক শ্রীযুক্ত ভাগবত চক্রবর্তীর কাছে কৃতজ্ঞ।

নিবেদন

'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার'-এর প্রয়াত অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ সেখানকার 'বিবেকানন্দ হল'-এ 'বিবেকচূড়ামণি'র ক্লাস নিতে শুরু করেন ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে এবং শেষ করেন ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তাঁর সরল বেদান্ত ব্যাখ্যা লোককে মুগ্ধ করে এবং অনেকেই তাঁকে বলেন, পুস্তকাকারে ক্লাসগুলি প্রকাশ করতে। পূজনীয় মহারাজের ক্লাসগুলি ক্যাসেটে ধরা ছিল। সকলের অনুরোধেই সম্ভবতঃ ১৯৯৮ সালের মে মাসের মাঝামাঝি মহারাজ আমাকে বলেন, ক্যাসেট থেকে বক্তৃতার অনুলিপি করে পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ শুরু করতে এবং এই কাজে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের স্বামী বলভদ্রানন্দ মহারাজের সাহায্য নিতে।

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ মহারাজের শরীর চলে যায়। ঐ সময়ের মধ্যে ২০০-র মতো শ্লোকের অনুলিখন করা হয়েছিল। মহারাজকে আমি সেই ব্যাখ্যাগুলি পড়ে শোনাই। মহারাজ বলেন, 'এটা খু-উ-ব ভালো বই হচ্ছে। তাড়াতাড়ি শেষ কর।' দুর্ভাগ্য, মহারাজের শরীর থাকাকালীন এই বই শেষ করতে পারা যায়নি।

মহারাজের শরীর যাবার পর সাময়িকভাবে উৎসাহ হারিয়ে ফেললেও কিছুদিন পরে আবার আমি এই কাজে লাগি এবং সমস্ত পাণ্ডুলিপি কম্পিউটারে টাইপ করিয়ে স্বামী বলভদ্রানন্দজীকে দিই। এর পরে দিনের পর দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে বলভদ্রানন্দজী এবং আমি একসঙ্গে বসে বইটির কাজ করেছি। বলভদ্রানন্দজী ছুটির দিন ছাড়া সাধারণতঃ সময় করতে পারতেন না বলে, বইটি শেষ করতে একটু বেশী সময় লেগে যায়। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বইটি প্রকাশ করা গেল না। কারণ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত 'বিবেকচূড়ামণি'র দুটি বই (ইংরেজি ও বাংলায়) ইতিমধ্যেই আছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাংলায় 'বিবেকচূড়ামণি'র এরকম বিস্তৃত ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এই প্রথম।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য 'বিবেকচূড়ামণি'তে অদ্বৈত-বেদান্তের সারতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন এক আশ্চর্য রসসমৃদ্ধ ভাষায়—তা একাধারে গভীর ও সাহিত্যগুণসম্পন্ন। মহারাজের ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য তাঁর আশ্চর্য সরল ভঙ্গিমা। স্বামী বিবেকানন্দ

চেয়েছিলেন বেদান্তের তত্ত্বকে সকলের কাছে এমনভাবে উপস্থিত করতে যাতে 'একটা শিশুও তা বুঝতে পারে'। লোকেশ্বরানন্দজীর বেদান্ত ব্যাখ্যা পড়লে মনে হয় তিনি সব সময় একথা স্মরণে রেখেছেন। তাঁর ইংরেজি উপনিষদের বঙ্গানুবাদের পাণ্ডুলিপি যখন প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ আমার ইচ্ছে, গৃহবধূরা রান্না করতে করতেও যেন উপনিষদ্ পড়তে ও বুঝতে পারে।

এই কথা মনে রেখে এই গ্রন্থে শ্লোকের ব্যাখ্যাগুলি মহারাজের বক্তৃতার ভাষাতেই রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তিগুলি কখনও কখনও বাদ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা মহারাজের এই ক্লাসগুলি করেছেন, তাদের মনে মহারাজের নিজস্ব শব্দচয়ন ও বাচন-ভঙ্গিমার স্মৃতি জেগে উঠতে পারে ব্যাখ্যাগুলি পড়ার সময়। অনেক ক্লাসে মহারাজ শ্লোকের ব্যাখ্যার বাইরেও 'বিবেকচূড়ামণি' সম্বন্ধে সাধারণভাবে বেশ কিছু কথা বলেছেন। 'ভূমিকা' হিসেবে যে-প্রবন্ধটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি মহারাজের ঐসব কথারই সঙ্কলন।

স্বামীজী (এবং সারদানন্দজীও) বলেছেন ঃ বেদান্তে শুধু অদ্বৈততত্ত্বের কথা নেই, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈততত্ত্বও আছে। লোকেশ্বরানন্দজীও তাই বেদান্ত-ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভক্তির প্রসঙ্গও এনেছেন। ব্রহ্মনিষ্ঠার পাশাপাশি ঈশ্বর-অনুরাগ, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-এর পাশাপাশি নাম-জপ-প্রার্থনার কথাও বলেছেন। তাতে বইটি সর্বসাধারণের কাছে আরও বোধগম্য হবে বলেই মনে হয়।

পূজ্যপাদ লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের একটি অন্তিম ইচ্ছা এই গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে পূর্ণ হল—এটি ভেবে আমরা তৃপ্তিবোধ করছি।

ডঃ দীপ্তি পাল
১ আগস্ট ২০০৩ ভূতপূর্ব প্রফেসর
সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
কলকাতা

ভূমিকা

'বিবেকচূড়ামণি' বিচারের বই। 'বিবেক' কথাটার অর্থ হচ্ছে বিচার করা। বিশেষভাবে বিচার করা। সংসারে ভালো আছে মন্দ আছে, সত্য আছে মিথ্যা আছে, সবরকম মিশিয়ে আছে। সংসারটা এইরকম গোলমেলে। কিন্তু মানুষকে বিচার করে চলতে হয়। তাকে সতর্ক করে দেয় এই বিচার। সমস্ত 'বিবেকচূড়ামণি' বইটিই এই বিচার। বিচার স্থূলভাবে করতে পারা যায়, ভাসা-ভাসা; কিন্তু একেবারে খুব তলিয়ে দেখা, খুঁটিনাটি সবকিছু বুঝে নেওয়া, সেই হচ্ছে সত্যিকারের সূক্ষ্ম বিচার। সেই বিচারের চূড়া, তারও ওপরের মণি, এইরকম বিচারের বই এই 'বিবেকচূড়ামণি'।

'বিবেকচূড়ামণি'কে বেদান্তগ্রন্থ বলা হয়। বেদান্তে কি আছে ? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম নিত্যসত্য। অন্য বস্তু জগতে যা-কিছু আছে সব পরিবর্তনশীল, এই আছে, এই নেই। কিন্তু ব্রহ্ম শাশ্বত, সনাতন, অপরিবর্তনীয়। শাস্ত্র আমাদের নিত্যানিত্যের বিচার করতে বলছেন। আমরা সেই বিচার করতে পারি না, তাই শাস্ত্র আমাদের সহায়ক। শাস্ত্র বলে দিচ্ছেন কিভাবে বিচার করতে হবে। বলছেন, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন্মুক্ত হওয়া। কিন্তু আমি তো মুক্তই আছি, বন্ধন তো কখনও ছিল না, নেইও। শুধু অজ্ঞানটা চলে গেলেই আমার স্বরূপ, যেটা নিত্যমুক্ত, সেটা জানতে পারব। আমার এই যে বন্ধন, সেটা উপাধির জন্যে। নিজের স্বরূপের সঙ্গে নানা পরিচয়ের লেজুড় জুড়েছি, তাই নিজেকে বদ্ধ মনে করছি। 'বিবেকচূড়ামণি'তে বলা হচ্ছে, তুমি যদি জীবন্মুক্ত হয়ে যেতে পার, মানে জীবদ্দশাতেই যদি মুক্ত হয়ে যেতে পার তাহলে তোমার জীবনে আর কোনও দুঃখ থাকবে না। তুমি সব সময় পরমানন্দে অবস্থান করবে। অভিনয়ে যেমন দেখা যায়, যে ভালো অভিনেতা সে এক-এক সময় এক-এক ভূমিকায় অভিনয় করে। গরীবের ছেলে, হয়তো রাজার ছেলে সেজেছে। আবার সে হয়তো চাকরের অভিনয় করছে। কিন্তু সে যেরকম মানুষ সেইরকমই আছে। শুধু যে ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে যে পোশাক দরকার সে সেইসব পরছে। কিন্তু এইরকম একটা সাজ তো তার কিছুক্ষণের জন্যে, অনিত্য। তেমনি এ সংসারে আমাদের কত ভালোবাসার লোক, আবার কত লোক আমাদের বিরাগভাজন, তাদের কেন্দ্র করে যত সুখ-দুঃখ সব অনিত্য। রাজার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে রাজার পোশাক পরেছিলাম, অভিনয় শেষ হয়ে গেলে আবার আমার ছেঁড়া কাপড় পরে বাড়ি চলে যাব। শাস্ত্র বলছেন, আমি কখনও জন্মাইনি, আমি মরবও না। স্বরূপত আমি মুক্ত। কেউ যে আমায় মুক্ত

করে দেবে তা নয়, আমি মুক্তই আছি। বলছেন, 'জীবন্নেব সদা মুক্তঃ', জীবিত অবস্থাতেই আমি সদা মুক্ত। 'কৃতার্থঃ', যা আমার করার, যা কিছু পাওয়ার, সব করা হয়ে গেছে, পাওয়া হয়ে গেছে। 'ব্রহ্মবিত্তমঃ', আমি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্। আমি যে ব্রহ্ম, এ আমি জেনে গেছি। 'উপাধি নাশাৎ', উপাধি নাশের ফলে। উপাধি কি ? 'আমি ধনী, আমি নির্ধন, এসব উপাধি। এগুলো চলে গেছে। ঠাকুরের কথায়, ল্যাজ খসে গেছে। তখন কি হয়েছে ? 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম-অপি-এতি নির্দ্বয়ম্'; আমিই যে অদ্বয় ব্রহ্ম, এই জ্ঞানটা হয়ে গেছে। এই জ্ঞানটা হবার জন্যে যে বিচারের প্রয়োজন 'বিবেকচূড়ামণি' সেই বিচারের বই।

এই বইতে শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করছে, গুরু তার উত্তর দিচ্ছেন। যেমন গুরু তেমনি শিষ্য। গুরু নিষ্পাপ, শাস্ত্রজ্ঞ; কামনা বলে তাঁর কিছু নেই। তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্, সর্বদা ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন, শান্ত। তিনি তেজস্বী, কিন্তু তাঁর তেজে কোনও জ্বালা নেই। তিনি 'নিরিন্ধন ইবানলঃ', অগ্নিসম তাঁর তেজ। কিন্তু সে আগুনে ইন্ধন নেই তো, তাই ধোঁয়া নেই শুধু দীপ্তি আছে। তিনি অহেতুক দয়াসিন্ধু, শরণাগতের আশ্রয়। তিনি 'শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবৎ-লোকহিতং চরন্তঃ'; বসন্ত ঋতু যেমন বিনা কারণে সকলকে আনন্দিত করে, এই মহাপুরুষ তেমনি নিজের অবস্থিতির দ্বারাই লোকের কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছেন। আর শিষ্য ? সে মুমুক্ষু, বৈরাগ্যবান। পরম শ্রদ্ধায় গুরুর কাছে প্রণত হয়ে, তাঁর সেবা করে, তাঁকে প্রসন্ন করে সে প্রশ্ন করছে। আর গুরু সানন্দে উত্তর দিচ্ছেন। এ বই-এ শিষ্য তিনবার প্রশ্ন করেছে। আর গুরু তার উত্তর দিয়েছেন। সেই উত্তরের মধ্যে দিয়ে গুরু বেদান্তের সারসত্য ঢেলে দিয়েছেন। শিষ্য প্রথমেই জানতে চেয়েছে, বন্ধন কি ? এ কোথা থেকে, কি করে এলো ? এর প্রতিষ্ঠা কোথায় ? মোক্ষই বা কি ? এই অনাত্মা কি ? পরমাত্মা কি ? আত্মা ও অনাত্মার বিচার কিভাবে করে ? গুরু এইসব প্রশ্নের আদ্যোপান্ত আলোচনা করে উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন, জীবের সংসারবন্ধন অবিদ্যা বা অজ্ঞানের জন্যে। এই অবিদ্যা অনাদি। অবিদ্যার নাশ হলে জীবের সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি। 'অনাত্মা' কি বলেছেন, আত্মার কথা বলেছেন। জীবের তিন অবস্থা জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কথা বলেছেন, পঞ্চকোশের কথা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। এগুলো যে উপাধি, আরোপিত বস্তু, তা-ও পরিষ্কার করে বলেছেন।

শিষ্যের মনে কিন্তু খটকা লেগেছে। সে বলছে, অজ্ঞান চলে গেলে তবে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব। কিন্তু আপনিই তো বললেন, অবিদ্যা বা অজ্ঞান অনাদি। একটা অনাদিবস্তুর নাশ হওয়া কি করে সম্ভব ? গুরু বলছেন, আমি তো বলেছি অজ্ঞান মানে জ্ঞানের অভাব, সেটা অনাদি। এটাকে প্রাগভাব বলে। কোনও বস্তুর উৎপত্তির আগে সেই বস্তুর অভাবকে প্রাক্-অভাব বা প্রাগভাব বলে। প্রাগভাব অনাদি কিন্তু বিনাশশীল। বস্তুর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাগভাবের নাশ হয়। তাহলে

বুঝেছ তো ? অবিদ্যা বা অজ্ঞান জ্ঞানের প্রাগভাব, এ অনাদি কিন্তু সান্ত। যে মুহূর্তে জ্ঞান হবে সেই মুহূর্তে জ্ঞানের অভাব, অজ্ঞানটা চলে যাবে। তাই জ্ঞান হলেই তোমার মুক্তি হবে।

তারপর তিনি বলেছেন, কিভাবে বিচার করে বুঝতে হবে অনাত্মা বা অনিত্য বস্তুর বা পঞ্চকোশের আসলে কোনও সত্তা নেই। শিষ্যের আবার সংশয় উপস্থিত হয়েছে। সে বলছে, আপনি তো বিচার করে সবকিছু মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলেন। আমি তো এখন আমার নিজের মধ্যে বা এই জগতের মধ্যে সবকিছুর অভাব ছাড়া আর কিছুই দেখছি না। সত্যিই কি নিজের স্বরূপ বলে জানবার মতো কোনও সত্যবস্তু আছে ? নাকি সব শূন্য ? গুরু খুশি হয়ে বলছেন, ঠিক বলেছ। কিন্তু একটু ভেবে দেখো, এই যে সবকিছু নেই বলে জানছ, আবার আছে বলে জেনেছিলে, এই দুটো জানারই বোধস্বরূপ একজন তো আছেন। তাঁকেই জানতে হবে, তিনিই 'আত্মা'। তারপর গুরু এই আত্মাকে জানার উপায় নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিয়ে বলে গেছেন, আর শিষ্য চুপ করে শুনেছে। শিষ্য কথা বলেছে একেবারে জ্ঞানলাভের পর। তার কি অনুভূতি হচ্ছে তাই গুরুকে শোনাচ্ছে। এতো সুন্দর বর্ণনা যে বারবার পড়তে ইচ্ছে করে। তারপর শিষ্য গুরুকে বারবার প্রণাম করে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। শিষ্যের এই কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাব ও ভাষা এমন যে আমাদের হিন্দুদের মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক যে কি স্নেহ ও শ্রদ্ধার ওপর স্থাপিত সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। গুরু তখন শিষ্যের সাফল্যে খুশি হয়ে আরও কিছু কথা বললেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্, জীবন্মুক্ত পুরুষের একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকলেন। সে ছবি আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে মনে করিয়ে দেয়।

বেদান্তের উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধি মানুষকে কিভাবে বদলে দেয় 'বিবেকচূড়ামণি' আমাদের সেই কথা বলেছে। এই বই শেষ হবার মুখে বলা হয়েছে, 'ইতি আচার্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেনাত্মলক্ষণম্'। এই যে গুরু-শিষ্যের সংলাপ, আলাপ-আলোচনা, এর থেকে আমরা আত্মলক্ষণ পেয়েছি। এসব এমন কথা যে শুনলে শিহরণ জাগে। যে মুমুক্ষু, তার এসব কথা শুনলে আনন্দ, পড়লে আনন্দ, বুঝলে আনন্দ। এ বই পড়লে আমাদের মনেও আনন্দের সঞ্চার হয়। এমন সব কথা যা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। বারবার করে পড়তে ইচ্ছে করে, আলোচনা করতে ইচ্ছে করে। 'বিবেকচূড়ামণি' বিচারের বই। কিন্তু আত্মানন্দের অনুভূতি এর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

সাংকেতিক শব্দ-নির্দেশিকা

অবি	:	অমৃতবিন্দূপনিষৎ
ঈ	:	ঈশোপনিষৎ
ঋ	:	ঋগ্বেদ
ক	:	কঠোপনিষৎ
কে	:	কেনোপনিষৎ
কৈ	:	কৈবল্যোপনিষৎ
গী	:	শ্রীমদ্ভগবদগীতা
ছা	:	ছান্দোগ্যোপনিষৎ
তৈ	:	তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
বৃ	:	বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
মু	:	মুণ্ডকোপনিষৎ
শ্বে	:	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

শঙ্করাচার্য

বিবেকচূড়ামণিঃ

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং তমগোচরম্।
গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্‌গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥ ১

অন্বয় : সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং (সকল বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়) অগোচরং (বাক্যমনাতীত) পরমানন্দং (পরমানন্দস্বরূপ) সৎগুরুং (সদ্‌গুরু) তং (সেই) গোবিন্দং (পরমাত্মার কাছে) অহং (আমি) প্রণতঃ অস্মি (প্রণত হচ্ছি)।

অথবা

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং (সকল বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়) অগোচরং (বাক্যমনাতীত) পরমানন্দং (পরমানন্দরূপ-পরমাত্মাস্বরূপ) সদ্‌গুরুং তং গোবিন্দং (গোবিন্দ নাম যাঁর সেই আমার সদ্‌গুরুর কাছে) অহং প্রণতঃ অস্মি (আমি প্রণত হচ্ছি)।

সরলার্থ : সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে যাঁর কথা বলা হয়েছে, যিনি বাক্যমনাতীত পরমানন্দস্বরূপ সদ্‌গুরু, সেই পরমাত্মাকে আমি প্রণাম করি।

অথবা

সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে যাঁর কথা বলা হয়েছে, যিনি বাক্যমনাতীত, পরমানন্দরূপ-পরমাত্মাস্বরূপ, গোবিন্দনামধারী আমার সেই সদ্‌গুরুকে আমি প্রণাম করি।

ব্যাখ্যা : গ্রন্থ আরম্ভের পূর্বে আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রণাম জানাচ্ছেন। 'পরমানন্দং সৎগুরুং তং গোবিন্দং অহং প্রণতঃ অস্মি'। এই কথার দুরকম অর্থ করা যায়। 'গোবিন্দ' বলতে তো পরমাত্মাকেই বোঝান হয়। 'গো' শব্দের অর্থ বাণী বা বেদান্তবাক্য। বেদান্তবাক্যের দ্বারা যাঁর ধারণা হয়, যাঁকে বোঝা যায়, তাঁকেই গোবিন্দ বলা হয়। বলছেন, পরমানন্দরূপ আমার পরমাত্মা তিনিই তো আমার সৎগুরু, তিনি আমার হৃদয়-কন্দরে বসে আছেন। একাগ্র হয়ে যা জানতে চাই তিনিই তা প্রকাশ করছেন আমার অন্তরে। তাঁকে প্রণাম করি। আবার, আমার সৎগুরু যিনি শ্রীগোবিন্দপাদ তাঁকে তো পরমাত্মার সঙ্গে অভেদ দেখি, তাঁকে প্রণাম করি। এই যে সূক্ষ্মতম বিচারের কথা বলতে যাচ্ছি এতে তিনি আমার সহায় হোন, আমাকে আশীর্বাদ করুন। শঙ্করাচার্য গ্রন্থ

আরম্ভের পূর্বে ঈশ্বর ও শ্রীগুরুদেবের বন্দনা একসঙ্গে করলেন। বলছেন, 'সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত গোচরং তম্-অগোচরং', সমস্ত বেদান্তের সিদ্ধান্ত যাঁকে ধরে আছে, যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সেই বাক্যমনাতীত 'পরমানন্দং সৎগুরুং গোবিন্দং অহং প্রণতঃ অস্মি' সেই পরমানন্দরূপ সৎগুরু যিনি আমার পরমাত্মা তাঁকে প্রণাম করি।

জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা
তস্মাদ্‌বৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্।
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
মুক্তির্নো শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে।। ২

অন্বয় : জন্তূনাং (জীবগণের) নরজন্ম (মনুষ্যজন্ম) দুর্লভম্ (দুর্লভ) অতঃ (এর থেকে) পুংস্ত্বং (পুরুষদেহ লাভ) [দুর্লভ] ততঃ (তার থেকে) বিপ্রতা (ব্রাহ্মণশরীর লাভ) [দুর্লভ]। তস্মাৎ (ব্রাহ্মণশরীর হলেও) বৈদিকধর্মমার্গপরতা (বেদবিহিত ধর্মমার্গে নিষ্ঠা) [দুর্লভ]। অস্মাৎ (এর থেকেও) বিদ্বত্ত্বং (শাস্ত্রের তাৎপর্যজ্ঞান) পরম্ (শ্রেষ্ঠ)। আত্মানাত্ম বিবেচনং (আত্মা ও অনাত্মবিষয়ে বিচার) স্বনুভবঃ (সম্যক্ অনুভব) ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতিঃ (আত্মাই ব্রহ্ম এই বোধে একান্ত স্থিতি) [এর ফলস্বরূপ] মুক্তিঃ (মুক্তি) শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ (শতকোটি জন্মের সুকৃত কর্মের জন্যে) পুণ্যৈঃ বিনা (পুণ্যফল ব্যতীত) নো লভ্যতে (লাভ করা যায় না)।

সরলার্থ : জীবগণের মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, এর থেকেও দুর্লভ পুরুষদেহ প্রাপ্তি আবার তার থেকেও দুর্লভ ব্রাহ্মণশরীর লাভ। ব্রাহ্মণশরীর লাভ হলেও চাই বেদবিহিত ধর্মমার্গে নিষ্ঠা। আবার এর থেকেও শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি শাস্ত্রের তাৎপর্যজ্ঞান। আত্মা ও অনাত্ম বিষয়ের বিচার, এসবের সম্যক্ অনুভব, ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম অবস্থায় স্থিতি ও এর ফলস্বরূপ মুক্তি—শতকোটি জন্মের সুকৃতি ও পুণ্যফল ব্যতীত লাভ করা যায় না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভম্'; যার জন্ম হয় সে জন্তু বা জীব। আবার জীবজগতে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। কারণ মানুষের বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধি ভালোমন্দের বিচার করতে পারে, মন্দটাকে বর্জন করে যা ভালো, শ্রেয়স্কর তাই গ্রহণ করতে পারে। অন্য যেসব জীবজন্তু আছে তাদের যে বুদ্ধি নেই তা নয় কিন্তু তাদের বুদ্ধির তেমন কোনও প্রয়োগ নেই। সেটাকে বুদ্ধি না বলে instinct বা একটা সহজ প্রবৃত্তি বলাই ঠিক। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির সৃজনী প্রতিভা আছে। এই যে বিজ্ঞানের এত উন্নতি, সাহিত্য চিত্রকলা সঙ্গীত, সবকিছুর এত উৎকর্ষ, এ তো মানুষের বুদ্ধিরই কাজ। মানুষের কৌতূহল অদম্য, সবকিছু জানার আগ্রহ তাকে সবসময় সম্মুখে ঠেলছে, একটা অতৃপ্তি তাকে থামতে দিচ্ছে না। বলছেন, 'নরজন্ম দুর্লভম্'। দুর্লভ কেন বলছেন ? এই জন্ম কি আমি লাভ করেছি নিজেরই চেষ্টায় ? হ্যাঁ তাই। আমরা হিন্দুরা

কর্মবাদে বিশ্বাস করি। আমার এই জন্ম আমার জন্মজন্মান্তরের কর্মের ফলে হয়েছে। হিন্দু বলছে, মানুষ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরছে। একটা জন্মের কর্ম তার পরবর্তী জন্মে প্রতিফলিত হচ্ছে। সৎকর্মের ভাগ যদি বেশী থাকে তাহলে অনুকূল পরিবেশে জন্ম হয়, স্বচ্ছন্দ জীবন হয়। সৎ-অসৎ দুরকম কর্মের মিশ্রণে মানুষ-জন্ম হয়। যদি একটা জন্মে প্রায় সব কর্মই হীনকর্ম হয় তাহলে পরের জন্মে সেই মানুষ ইতরযোনি প্রাপ্ত হয়। ইতর প্রাণীর জীবন শেষ হলে আবার সে মানুষ হয়ে জন্মায়। আর যদি তার মানুষ-জীবনে সে বেদবিহিত যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, অনেক পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহলে দেহ গেলে তার স্বর্গলাভ হয়। সে সেখানে দেবতা হয়ে পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করে। সেই ভোগ শেষ হলে আবার মানুষ-জন্ম লাভ করে। দেবতা বা পশুর জীবনে নতুন কর্মের কোন স্থান থাকে না। যেসব কর্মের ফলে দেবজীবন বা পশুজীবন হয়েছে, তা শেষ হয়ে গেলে আবার মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়। মানুষ-জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে আমার নতুন কর্ম করার স্বাধীনতা থাকে। আমি হয়তো মন্দ কর্ম করে কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু আমিই আবার বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে শুভকর্ম করে আমার ভবিষ্যৎটাকে সুন্দর করে ফেলতে পারি। এই কারণেই মনুষ্য-জন্মকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। স্বাধীনভাবে কর্ম করতে পারি বলে মনুষ্য-জন্মকে বলে কর্মভূমি। আর সেটা করা যায় না বলে, শুধু পুরোনো কর্মের ফল ভোগ করতে হয় বলে, পশুজন্ম আর দেবজন্মকে বলে ভোগভূমি। তাই আমি যদি মোক্ষ-অভিলাষী হই, তাহলে আমাকে মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে। মানুষ হয়ে জন্মে নতুন কর্মের দ্বারা পুরোনো কর্মের বন্ধন কেটে জন্ম-মৃত্যুর চক্রের বাইরে যেতে হবে। তাই বলছেন 'নরজন্ম দুর্লভম্'। আবার বলছেন 'অতঃ পুংস্ত্বং', এর থেকেও দুর্লভ পুরুষদেহ লাভ। আগেকার দিনে শাস্ত্রচর্চার অধিকার প্রধানতঃ পুরুষদেরই থাকত, তাই একথা বলছেন। তাছাড়া মোক্ষের সাধন তো নির্জনে করতে হয়, পুরুষদেহ হলে তাতেও সুবিধে হয়। 'ততঃ বিপ্রতা'—তার থেকেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ আরও দুর্লভ ভাগ্য। বর্ণাশ্রমের রীতি অনুযায়ী যিনি ব্রাহ্মণ তিনি বেদ অধ্যয়নে রত থাকবেন। এখানে সেইরকম ব্রাহ্মণের কথা বলছেন। যিনি বেদান্তচর্চায় নিবিষ্ট হয়েছেন তাঁর পক্ষে মোক্ষের পথ তো সুগম হবেই। তারপর বলছেন 'তস্মাদ্‌বৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বম্-অস্মাৎ পরম্'। পুরুষ-দেহ, ব্রাহ্মণত্ব এসব হলেও সব হলো না। মুক্তির জন্যে চাই 'বৈদিকধর্মমার্গপরতা'। তার মানে কি ? বেদে অনেক যাগযজ্ঞের কথা বলা আছে সেগুলোর অনুষ্ঠান করতে হবে। কিন্তু আমি তো মোক্ষ লাভ করতে চাই। তাই যেসব বৈদিক আচরণ আমায় মোক্ষের পথে এগিয়ে দেবে সেগুলোই আমি করব, সেগুলোই আমার পক্ষে ধর্মাচরণ। যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি বিহিত কর্ম নিশ্চয় আমি করব কিন্তু নিষ্কাম ভাবে। ব্রহ্মসূত্রে আছে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্যে একটা প্রস্তুতি লাগে। আমি যদি ব্রহ্মকে জানতে পারি তাহলেই আমার মুক্তি, কিন্তু সেই ব্রহ্মকে জানার ইচ্ছে জাগারও একটা

প্রস্তুতি আছে। কি সেই প্রস্তুতি ? ইহ-অমুত্র-ফলভোগ-বিরাগঃ, আর ষট্সম্পত্তি লাভ। 'ইহ-অমুত্র-ফলভোগ- বিরাগঃ', 'ইহ' মানে এখানকার অর্থাৎ এই জগতের, আর 'অমুত্র' হচ্ছে অন্য জগতের, এই দুই জগতেই আমার কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই। আমি নিষ্কাম, আমার জাগতিক কিছু চাইবার নেই, পাবারও নেই। আর ষট্সম্পত্তি হচ্ছে মনের ছটি সম্পদ—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। 'শম' হচ্ছে অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মনের দমন, 'দম' হচ্ছে বহিরিন্দ্রিয়ের দমন, 'উপরতি' হচ্ছে সমস্ত বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়া। 'তিতিক্ষা' হচ্ছে শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ সবকিছুতে নির্বিকার থেকে সহ্য করার ক্ষমতা। 'শ্রদ্ধা'—গুরুবাক্যে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস, সংশয়ের একান্ত অভাব, ভক্তিপূর্ণ নির্ভরতা। 'সমাধান'—গভীর একাগ্রতা, আত্মস্থ হয়ে যাওয়া। এগুলোকে ষট্সম্পত্তি বলা হয় কারণ এগুলোই মানুষের সত্যিকারের ঐশ্বর্য, ধনদৌলত তো চিরকাল থাকবে না। 'বিদ্বত্ত্বম্-অস্মাৎ পরম্', এসবের থেকে যা পরম লাভ, শ্রেষ্ঠ লাভ তা হলো শাস্ত্রের তাৎপর্য বোঝা, শাস্ত্রবাক্যের মর্মগ্রহণ করতে পারা। তারপর আসছে 'আত্মানাত্মবিবেচনম্', আত্মা ও অনাত্মার বিচার করে অনাত্মবস্তুকে বর্জন। নেতি নেতি করে যা অনাত্মবিষয়, অনিত্য, মিথ্যা সেসব বাদ দিতে দিতে আত্মায় এসে থেমে যাওয়া। 'সু-অনুভবঃ' সবকিছুর সম্যক্ অনুভব। যা অবস্তু সেসব বর্জন করে আত্মাই যে আমার স্বরূপ, একমাত্র নিত্যবস্তু এই জ্ঞানের সম্যক্ উপলব্ধি। 'ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতিঃ-মুক্তিঃ নো শতজন্মকোটি সুকৃতৈঃ পুণ্যৈঃ-বিনা লভ্যতে'। 'ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতিঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতায় স্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্মই হয়ে যাওয়া। আর তার মানেই হলো ভববন্ধন থেকে মুক্তি, জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে নিষ্কৃতি। বলছেন, শতকোটি জন্মের সুকৃতি ও পুণ্যফল ব্যতীত এই অত্যন্ত দুর্লভবস্তু লাভ হয় না।

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥ ৩

অন্বয় : মনুষ্যত্বং (মানুষ-জন্ম) মুমুক্ষুত্বং (ভববন্ধন থেকে মুক্তির আগ্রহ) মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সঙ্গ) এতৎ ত্রয়ম্ এব (এই তিনটিই) দুর্লভম্ (দুর্লভ) দেবানুগ্রহহেতুকম্ (ঈশ্বরের অনুগ্রহে পাওয়া যায়)।

সরলার্থ : মানুষ-জন্ম লাভ, সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির ইচ্ছা ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সঙ্গ, এই তিনটি এ জগতে দুর্লভ। ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ হলে তবে এগুলি পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'দুর্লভম্ ত্রয়ম্-এব-এতদ্-দেবানুগ্রহহেতুকম্'; এই তিনটিই ঈশ্বরের অনুগ্রহ হলেই শুধু পাওয়া যায়। কোন তিনটি ? 'মনুষত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ-সংশ্রয়'। 'মনুষ্যত্বং', মানুষ হওয়া; শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মানুষ হচ্ছে মান-হুঁশ, নিজের মান

সম্বন্ধে যার হুঁশ আছে, চৈতন্য আছে। আমি মানুষ, আমার কী মহান পরিচয়, আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, আমি চৈতন্যস্বরূপ, এ যদি আমি জানতে পারি তবেই তো আমার মনুষ্যত্ব, তা না হলে আমার একটা মানুষের শরীর ধারণই সার, মনুষ্যত্ব লাভ আমার হলো না। 'মুমুক্ষুত্বং', সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির ইচ্ছা। দুর্লভ মানবজন্ম পেয়ে যদি বিষয়সুখের আশায় ছুটে বেড়াই, সংসারবন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে না চাই, তাহলে তো জন্মটাই বৃথা হলো। কিন্তু যদি ভাগ্যগুণে 'মহাপুরুষসংশ্রয়' অর্থাৎ সাধুসঙ্গের সুযোগ হয় তাহলে মন আস্তে আস্তে ঈশ্বরের দিকে ঝুঁকে পড়ে, বিষয় আর তেমন করে মনকে টানতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ, সৎগুরুর আশ্রয় লাভ হলে ঈশ্বরে অনুরাগ বাড়তে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ে বিরাগ আসে। তখন আর মুক্তি পাবার দেরি থাকে না। তাই বলছেন, 'মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ' এই তিনটি একসঙ্গে পাওয়ার মহাভাগ্য ভগবৎকৃপা ছাড়া হয় না।

লব্ধ্বা কথঞ্চিন্নরজন্ম দুর্লভং
তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতিপারদর্শনম্।
যস্ত্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ
স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্গ্রহাৎ ॥ ৪

অন্বয় : কথঞ্চিৎ (কোনও প্রকারে) দুর্লভং নরজন্ম (দুর্লভ নরজন্ম) তত্র অপি (সেই নরদেহে) পুংস্ত্বং (পুরুষশরীর) শ্রুতিপারদর্শনম্ (বেদান্তবিচারে কুশলতা) লব্ধ্বা (লাভ করে) যঃ তু মূঢ়ধীঃ (যে মূঢ় বুদ্ধির মানুষ) আত্মমুক্তৌ ন যতেত (নিজের মুক্তির জন্যে যত্ন করে না) সঃ আত্মহা (সেই আত্মঘাতী পুরুষ) হি (নিশ্চয়) অসদ্গ্রহাৎ (মিথ্যাবস্তু গ্রহণের ফলে) স্বং (নিজেকে) বিনিহন্তি (বিনাশ করে)।

সরলার্থ : কোনও রকমে দুর্লভ নরজন্ম আর সেই জন্মে পুরুষশরীর ও বেদান্তবিচারে পারদর্শিতা লাভ করেও যে মূঢ়বুদ্ধির মানুষ নিজের মুক্তির জন্যে যত্ন করে না, সেই আত্মঘাতী পুরুষ অসৎ-বস্তু গ্রহণের ফলে নিজেকেই বিনষ্ট করে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, ভাগ্যক্রমে নরজন্ম, পুরুষশরীর আবার বেদান্তবিচারে পারদর্শিতা লাভ করেও যে নিজের মুক্তির জন্যে যত্ন করে না সে তো নির্বোধ, আত্মঘাতীর সমান। সে মিথ্যাবস্তুতে আসক্ত হয়ে নিজেকেই নষ্ট করে। 'লব্ধ্বা কথঞ্চিৎ-নরজন্ম দুর্লভং তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতি পারদর্শনম্', কোনও রকমে দুর্লভ নরজন্ম তাতে আবার পুরুষ-শরীর আর বেদান্তবিচারে পারদর্শিতা লাভ করে 'যঃ তু-আত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ', যে নিজের মুক্তির জন্যে যত্ন করছে না সে তো স্থূলবুদ্ধি। বেদান্তবিচারে খুব ওস্তাদ অথচ মুক্তির চেষ্টা নেই মুক্তির ইচ্ছেই নেই—তার মানে বেদান্তবিচার করলেও বেদান্তের

কথা তার অন্তরকে স্পর্শ করেনি। শাস্ত্রবিচার করছে দাপটের সঙ্গে অথচ শাস্ত্রের মর্মগ্রহণ হয়নি—সে তো নির্বোধ। 'সঃ আত্মহা হি স্বং বিনিহন্তি-অসদ্ গ্রহাৎ'; সে আত্মঘাতীর সমান, সৎ-বস্তু ফেলে অসৎ অবস্তু গ্রহণ করে সে নিজেকেই বিনষ্ট করছে। ঈশোপনিষদে আছে যারা আত্মার সন্ধান করে না সেই 'আত্মহনো জনাঃ' (ঈ, ৩) শরীর গেলে অন্ধকারাচ্ছন্ন তমসাবৃত লোকে যায়। এখানেও সেই কথাই বলছেন।

ইতঃ কো ন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি।
দুর্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্ ॥ ৫

অন্বয় : যঃ (যে ব্যক্তি) দুর্লভং মানুষং দেহং (দুর্লভ মানুষদেহ) তত্র অপি (তাতে আবার) পৌরুষং (পুরুষশরীর) প্রাপ্য তু (পেয়েও) স্বার্থে প্রমাদ্যতি (স্বার্থ বুঝতে ভুল করে বসে) ইতঃ নু (এর থেকে আর বেশী) কঃ মূঢ়াত্মা অস্তি (কে নির্বোধ ব্যক্তি আছে) ?

সরলার্থ : দুর্লভ মানুষদেহ, তার ওপর আবার পুরুষশরীর পেয়েও যে নিজের স্বার্থ বুঝতে ভুল করে বসে তার থেকে বেশী নির্বোধ আর কে আছে ?

ব্যাখ্যা : বলছেন, মানুষ হয়ে জন্মেছ, পুরুষশরীর পেয়েছ, কিন্তু বিষয়ের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছ, নিজের ভালো বোঝ না—এ অতি নির্বোধের মত কাজ করছ। 'ইতঃ কঃ নু-অস্তি মূঢ়াত্মা যঃ তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি'—এর থেকে বেশী আর কে নির্বোধ আছে যে নিজের স্বার্থ বুঝতে ভুল করে? 'দুর্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্'—দুর্লভ মানবজন্ম তাতে আবার পুরুষদেহ পেয়েও নিজের স্বার্থ বুঝতে ভুল করে, এর থেকে মূঢ়বুদ্ধি আর কি হতে পারে ? বাস্তবিক আমরা সবাই তো নির্বোধের মত আচরণ করছি। মানুষ হয়ে জন্মেছি, কোথায় আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করব, না বিষয়ের পেছনে ছুটছি। সংসারসুখ তো ক্ষণিক, আজ যদি সুখের মুখ দেখি তো কাল দুঃখ এসে আমায় পেয়ে বসবে। এই সুখ-দুঃখের দোলায় দুলে আমার কোন্ স্বার্থ সিদ্ধি হবে ? কিছুই হবে না, শুধু সংসারের আবর্তে পড়ে নাকানি-চোবানি খাব। তাই বলছেন, যে ব্রহ্মানন্দের সন্ধান না করে সংসারসুখের খোঁজ করছে সে নিজের স্বার্থ বুঝতে ভুল করছে, সে নির্বোধ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পেলে বিষয়ানন্দ আলুনি লাগে। এখানেও তাই বলছেন, তাঁকে না খুঁজে বিষয় চাইছ ? তুমি বুঝতে পারছ না, কী হারাচ্ছ। নিজের স্বার্থ বুঝতে ভুল করছ।

বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্
কুর্বন্তু কর্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তি-
র্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি॥ ৬

অন্বয় : [অনেকেই] শাস্ত্রাণি বদন্তু (শাস্ত্রের কথা বলতে পারে, বাদানুবাদ করতে পারে) দেবান্ যজন্তু (দেবতাদের তুষ্ট করার জন্যে যজ্ঞ করতে পারে) কর্মাণি কুর্বন্তু (শাস্ত্র-বিহিত কর্ম করতে পারে) দেবতাঃ ভজন্তু (বহু দেব-দেবীর উপাসনা করতে পারে) অপি আত্মৈক্যবোধেন বিনা (কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার একত্ববোধ বিনা) ব্রহ্মশতান্তরে অপি (একশত ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের মধ্যেও) মুক্তিঃ ন সিধ্যতি (মুক্তি লাভ হবে না)।

সরলার্থ : অনেকেই শাস্ত্রপাঠ করে শাস্ত্রালোচনা করতে পারে, দেবতাদের কৃপা লাভের জন্যে যজ্ঞ করতে পারে, শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করতে পারে, বহু দেব-দেবীর ভজনা করতে পারে কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা ছাড়া শত ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের মধ্যেও মুক্তি লাভ হবে না।

ব্যাখ্যা : ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হলে মুক্তি হয় না, এইটা বলতে চাইছেন। বলছেন, 'বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্ কুর্বন্তু কর্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ'। এমন অনেকেই আছেন যাঁরা শাস্ত্রপাঠ করেন ও শাস্ত্রবাক্য নিয়ে আলোচনা করেন, এতে বুদ্ধির চর্চা হয় ঠিকই কিন্তু শাস্ত্রের মর্মগ্রহণ না হলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে এগোনো যায় না। 'যজন্তু দেবান্', দেবানুগ্রহের জন্যে যজ্ঞ করেন অনেকেই কিন্তু এতে সেইসব যজ্ঞের নির্দিষ্ট ফল লাভ হতে পারে তার বেশী কিছু হবে না। 'কুর্বন্তু কর্মাণি', বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান অনেকেই করেন, সকাম ভাবে করলে এর দ্বারা জাগতিক উন্নতি ও পুণ্যলাভ হয়, নিষ্কাম ভাবে করতে পারলে এতে চিত্তশুদ্ধি হতে পারে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় এটা নয়। 'ভজন্তু দেবতাঃ', বহু দেবদেবীর ভজনা করলে ভক্তিভাব হয়তো জাগবে। কিন্তু জ্ঞান না হলে মুক্তি হবে না। জ্ঞান মানে নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানা। 'আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তিঃ ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরে-অপি'। ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতার বোধ না হলে শত ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের মধ্যেও মুক্তি হয় না। আমিই ব্রহ্ম, যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি আমারও আত্মা—এই উপলব্ধি না হলে, অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান না হলে সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি হয় না।

অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি কর্মণো মুক্তেরহেতুত্বং স্ফুটং যতঃ ॥ ৭

অন্বয় : বিত্তেন (বিত্তের দ্বারা) অমৃতত্বস্য আশা (অমৃতত্বের আশা) ন অস্তি (নেই) ইতি-এব হি (এই রকমই) শ্রুতিঃ ব্রবীতি (শ্রুতি বলেন) যতঃ (যার থেকে) কর্মণঃ মুক্তেঃ-অহেতুত্বং (কর্মের মুক্তির ব্যাপারে অহেতুকত্ব) স্ফুটম্ (স্পষ্ট হয়েছে)।

সরলার্থ : বিত্ত লাভের দ্বারা মুক্তির আশা নেই, শ্রুতি এই কথা বলেছেন। এই কথা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে শ্রুতি কর্মকে মুক্তির কারণ হতে পারে বলে মনে করেন না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অমৃতত্বস্য ন -আশা-অস্তি বিত্তেন-ইতি-এব হি শ্রুতিঃ ব্রবীতি';

'বিত্ত' অর্থাৎ ধন-সম্পদের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নেই, শ্রুতি এই কথা বলেন। এখানে বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা বলছেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন বলে মনস্থ করে যাজ্ঞবল্ক্য যখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইলেন তখন মৈত্রেয়ী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এই ধনপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি আমার হয় তাহলে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব ? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'অমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেন ইতি'(বৃ, ২।৪।২৩), বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের কোনও আশা নেই। অমৃতত্ব লাভ করা মানে অমর হয়ে যাওয়া নয়। মৃত্যুর সঠিক অর্থটা বোঝা। আমার যে মৃত্যু হয় সেটা দেহের মৃত্যু কিন্তু আমি তো দেহ নই তাই আমার মৃত্যু নেই। আমি যে অজর অমর আত্মা এই সত্যটা উপলব্ধি করাই অমৃতত্ব লাভ করা আর তার মানেই মুক্তি। এই দেহটাকে যতক্ষণ 'আমি' ভাবছি ততক্ষণ দেহসংক্রান্ত সবকিছুকে 'আমি আমার' করে সংসারে জড়িয়ে পড়ছি। কিন্তু যখন আমি নিজের স্বরূপকে জানছি, যখন আমার আত্মজ্ঞান হচ্ছে তখন আর বন্ধন নেই, তখন আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। তাই বলছেন, শ্রুতিতে যে বলা হয়েছে বিত্তের দ্বারা অমৃতত্ব লাভের কোন আশা নেই, তাইতেই বোঝা যাচ্ছে যে শ্রুতি কর্মকে মুক্তির কারণ মনে করেন না। 'কর্মণঃ মুক্তেঃ-অহেতুত্বম্ স্ফুটং যতঃ'—কর্মের মুক্তির ব্যাপারে কোন হেতুকত্ব নেই এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 'যতঃ', যার থেকে। কিসের থেকে ? শ্রুতির এই বাক্য 'অমৃতত্বস্য ন-আশা-অস্তি বিত্তেন' থেকে। এটা বলছেন কারণ ধনসম্পদ লাভ করতে গেলে অনেক কর্মের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কর্মের দ্বারা যদি মুক্তি হতো তাহলে ধনলাভ করলেও মুক্তি আসতে পারত। কিন্তু শ্রুতি স্পষ্টই বলছেন, তা হবার নয়।

অতো বিমুক্ত্যৈ প্রযতেত বিদ্বান্
সংন্যস্তবাহ্যার্থসুখস্পৃহঃ সন্।
সন্তং মহান্তং সমুপেত্য দেশিকং
তেনোপদিষ্টার্থসমাহিতাত্মা।। ৮

অন্বয় : অতঃ (এই জন্যে) বিদ্বান্ (বুদ্ধিমান পুরুষ) সংন্যস্তবাহ্যার্থসুখস্পৃহঃ সন্ (বাহ্যবিষয়ে সুখভোগের স্পৃহা ত্যাগ করে) সন্তং মহান্তং দেশিকং (সদ্গুণসম্পন্ন, উদারচরিত দেশমান্য আত্মজ্ঞ সদ্গুরুকে) সমুপেত্য (প্রাপ্ত হয়ে) তেন-উপদিষ্টার্থ-সমাহিতাত্মা (তাঁর দ্বারা উপদিষ্ট বিষয়ে মনকে সমাহিত করে) বিমুক্ত্যৈ (মুক্তিলাভের জন্যে) প্রযতেত (প্রযত্ন করবেন)।

সরলার্থ : এই জন্যে যিনি বুদ্ধিমান তিনি বাহ্যবিষয়ের থেকে সুখভোগের স্পৃহা সম্পূর্ণ-ভাবে ত্যাগ করবেন আর সদ্গুণসম্পন্ন উদারচরিত দেশমান্য আত্মজ্ঞ পুরুষকে সদ্গুরুরূপে লাভ করে মুক্তির জন্যে প্রযত্ন করবেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অতঃ বিমুক্ত্যৈ প্রযতেত বিদ্বান্'। 'অতঃ'—এই কারণে। কি কারণে ? মুক্তিলাভই যে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি সেই কারণে। বলছেন, যে বুদ্ধিমান সে মুক্তির জন্যে খুব যত্ন করবে। 'প্রযতেত' অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যত্ন করবে। সেই যত্ন করতে গেলে কি করতে হবে ? 'সংন্যস্তবাহ্যার্থ সুখস্পৃহঃ সন্', বাহ্যবিষয়ের থেকে যেসব সুখ পাওয়া যায় সে-সবের স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে, 'সন্তং মহান্তং সমুপেত্য দেশিকং' সদ্গুণসম্পন্ন উদারচরিত মহাত্মা, যিনি দেশমান্য তাঁকে 'সমুপেত্য' অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়ে, তাঁকে গুরুরূপে বরণ করে, 'তেন-উপদিষ্টার্থ সমাহিতাত্মা', তাঁর দ্বারা উপদিষ্ট সমস্ত বিষয়ে মনকে সমাহিত করে রাখবে। এইভাবে যদি চলতে পার তাহলে তুমি মুক্তি লাভ করবে।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং মগ্নং সংসারবারিধৌ।
যোগারূঢ়ত্বমাসাদ্য সম্যগ্দর্শননিষ্ঠয়া।। ৯

অন্বয় : সম্যগ্দর্শননিষ্ঠয়া (শুদ্ধদৃষ্টি ও নিষ্ঠা সহকারে) যোগারূঢ়ত্বম্ (যোগারূঢ় অবস্থা) আসাদ্য (লাভ করে) সংসারবারিধৌ মগ্নম্ (সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত) আত্মানম্ (আত্মাকে) আত্মনা (নিজের শুদ্ধ আত্মার সহায়ে) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করতে হবে)।

সরলার্থ : শুদ্ধদর্শন ও নিষ্ঠা সহকারে যোগারূঢ় অবস্থা লাভ করে সংসারসাগরে নিমজ্জিত আত্মাকে নিজের শুদ্ধ আত্মার সাহায্যে উদ্ধার করতে হবে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'উদ্ধরেদ্-আত্মনা-আত্মানং মগ্নং সংসার বারিধৌ'। আমি যখন নিজের স্বরূপকে ভুলে গিয়ে সংসারসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে তলিয়ে যেতে থাকি তখন আমাকে উদ্ধার করতে পারে আমারই শুদ্ধসত্তা, বা শুদ্ধ আত্মা। গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন, 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানম্-অবসাদয়েৎ। আত্মৈব হি-আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ' (গী, ৬।৫)। এখানে আত্মা বলতে মনকে বোঝাচ্ছেন। শুদ্ধ বিচারশীল মনই সংসারসাগরে নিমজ্জিত মনকে বা জীবাত্মাকে উদ্ধার করে। একে অবসন্ন হতে দিতে নেই। আত্মাই আত্মার বন্ধু আবার আত্মাই আত্মার শত্রু। কারণ আমরা মনেই বদ্ধ মনেই মুক্ত। যখন নিজেকে মুক্ত মনে করছি তখন বন্ধুর কাজ করছি আবার যখন বদ্ধ মনে করছি তখন আমিই আমার শত্রু। এখানেও সেই কথাই বলছেন। কিন্তু এই যে আমি সংসারসাগরে তলিয়ে যাচ্ছি এটা থামাব কি করে ? নিজেকে টেনে তুলব কি করে ? বলছেন, 'যোগারূঢ়ত্বম্-আসাদ্য সম্যগ্-দর্শননিষ্ঠয়া'—যোগারূঢ় অবস্থা আয়ত্ত করে আর মনকে শুদ্ধ করে। শুদ্ধমন আত্মদর্শনের নিষ্ঠা এনে দেয়। 'যোগারূঢ়ঃ' অবস্থাটা কিরকম ? গীতায় ভগবান বলছেন, 'যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্যতে, সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে' (গী, ৬।৪)। যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়

থেকে মন্ সরে আসে, কোনও কিছুর জন্যে কোনও সঙ্কল্প থাকে না, সব ত্যাগ হয়ে যায়, কর্মে সম্পূর্ণ অনাসক্তি আসে তখনকার এই যে অবস্থা তাকে যোগারূঢ় অবস্থা বলা হয়। বলছেন, 'যোগারূঢ়ত্বম্-আসাদ্য সম্যগ্-দর্শন নিষ্ঠয়া'। 'সম্যগ্-দর্শন' মানে শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধির সাহায্যে দর্শন, সেই দর্শন আত্মদর্শন। বলছেন, যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে যে শুদ্ধমন আত্মদর্শনে নিবিষ্ট হয়ে আছে সেই মনের দ্বারাই সংসার-বারিধিতে ডুবে যাওয়া মনকে উদ্ধার করতে হবে।

সংন্যস্য সর্বকর্মাণি ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
যত্যতাং পণ্ডিতৈর্ধীরৈরাত্মাভ্যাস উপস্থিতৈঃ॥ ১০

অন্বয় : আত্মাভ্যাসে উপস্থিতৈঃ (স্বরূপচিন্তার অভ্যাসে স্থিতি লাভের দ্বারা) ধীরৈঃ পণ্ডিতৈঃ (স্থিরবুদ্ধি শাস্ত্রের মর্মগ্রাহী পণ্ডিতগণ) সর্বকর্মাণি সংন্যস্য (সমস্ত সকাম কর্ম ত্যাগ করে) ভববন্ধবিমুক্তয়ে (সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি লাভের জন্যে) যত্যতাম্ (যত্ন করবেন)।

সরলার্থ : 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই আত্মচিন্তার অভ্যাসে স্থিত থেকে স্থিরবুদ্ধি, শাস্ত্রের মর্মগ্রাহী পণ্ডিতগণ সমস্ত সকাম কর্মের অনুষ্ঠান বর্জন করে সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির জন্যে যত্নপরায়ণ হবেন।

ব্যাখ্যা : মোক্ষলাভের যে সাধনা সেটা কিভাবে করতে হবে সেই কথাই সংক্ষেপে বলছেন। 'সংন্যস্য সর্বকর্মাণি ভববন্ধবিমুক্তয়ে'—এই সংসারবন্ধন, জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খাওয়া থেকে মুক্তির জন্যে সমস্ত সকাম কর্ম ত্যাগ করতে হবে। করে কি করতে হবে ? 'যত্যতাং পণ্ডিতৈঃ-ধীরৈঃ-আত্মাভ্যাসে উপস্থিতৈঃ'; 'যত্যতাং', যত্ন করতে হবে। কারা যত্ন করবেন ? কিভাবে যত্ন করবেন ? 'ধীরৈঃ-পণ্ডিতৈঃ-আত্মাভ্যাসে উপস্থিতৈঃ'; যাঁরা স্থিরবুদ্ধি, শাস্ত্রবাক্যের মর্মগ্রহণে সমর্থ পণ্ডিত তাঁরা চিন্তা করবেন যে, সৎ-চিৎ-আনন্দ আমার স্বরূপ, সৎস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ আনন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম আমি তাই। এই চিন্তার অভ্যাস করতে করতে তাতেই স্থিতি লাভ করবেন। আমরা বলি 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিঃ ভবতি তাদৃশী'। যার যেমন ভাবনা তার তেমন সিদ্ধি। 'আমিই ব্রহ্ম' এই চিন্তার অভ্যাস করতে করতে এই বিশ্বাস আমার মনে দানা বাঁধতে থাকবে আর তখনই আমার বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যাবে, শাস্ত্রবাক্যের মর্মগ্রহণে আমি সমর্থ হব। সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করতে নিষেধ করছেন কেন ? কারণ কোনও কামনা চরিতার্থ করার জন্যে যে কর্ম তা আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করে। যা চাই তা পাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও যদি না পাই তো আমার হতাশা আসে, মনের প্রসন্নতা নষ্ট হয়ে যায়, ভাবতে থাকি আর কিভাবে এগোলে যা চাই তা পেতে পারতাম। আবার, যদি

কর্মে সফলতা আসে, যা চাই তা পেয়ে যাই তাহলেও বিক্ষেপ—আরও বড় কিছু পাবার বাসনা আমাকে নতুন কর্মের দিকে ঠেলে। মনের এই অবস্থা আত্মচিন্তার পরিপন্থী, এইসব ভাব সংসারবন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। তাই বলছেন, সকাম কর্ম ত্যাগ করে আত্মচিন্তার অভ্যাস করতে যাতে সেই চিন্তাই আমার স্বভাব হয়ে যায়।

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্মকোটিভিঃ॥ ১১

অন্বয় : কর্ম (নিষ্কাম কর্ম) চিত্তস্য শুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির জন্যে) তু (কিন্তু) বস্তু-উপলব্ধয়ে ন (বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধির জন্যে নয়) বস্তুসিদ্ধিঃ (ব্রহ্মজ্ঞানে সিদ্ধি) বিচারেণ (বিচারের দ্বারা হয়) কর্মকোটিভিঃ কিঞ্চিৎ ন (কোটি কর্মের দ্বারা কিঞ্চিৎ মাত্রও হয় না)।

সরলার্থ : নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় কিন্তু ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান বিচারের দ্বারা হয়। কোটি কর্মের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ মাত্রও হয় না।

ব্যাখ্যা : আগে সকাম কর্মের নিষেধ করে দিয়েছেন, এখন বলছেন নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হতে পারে কিন্তু ব্রহ্মবস্তু লাভ কখনও হবে না। বলছেন, 'চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম ন তু বস্তু-উপলব্ধয়ে'। চিত্তের শুদ্ধির জন্যে কর্ম, বস্তু উপলব্ধির জন্যে নয়। বস্তু মানে ব্রহ্ম, বা সহজ কথায়, ঈশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। সেই বস্তুলাভ নিষ্কাম কর্মের দ্বারাও হয় না। তবে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কিন্তু কর্ম কি করে নিষ্কাম ভাবে করা যায় ? আমরা কাজ করি সেই কাজের থেকে কিছু পাবার আশা করে কিন্তু নিষ্কাম কর্মে কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই। তাই বলছেন ঈশ্বর-উদ্দেশ্যে কর্ম কর, কর্মের ফলাফল ঈশ্বরকে সমর্পণ কর তাহলেই সেটা নিষ্কাম কর্ম হবে, সেই কর্ম আর তোমার বন্ধনের কারণ হবে না, তোমার চিত্তশুদ্ধির উপায় হবে। যখন আমরা বাসনাতাড়িত হয়ে কর্ম করি তখন আমরা কর্মের 'হেতু' হয়ে যাই। 'আমি কর্তা', 'আমি করছি' এই ভাবই বন্ধন আনে কিন্তু তাঁর কাজ তিনি করাচ্ছেন বলে যখন কাজ করি তখন সেই কর্মে আর বন্ধন থাকে না। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নেই তো, তাই এ কর্ম চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। এই হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। বলছেন, 'বস্তুসিদ্ধিঃ-বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্মকোটিভিঃ'—বস্তুলাভ হয় বিচারের দ্বারা, কোটি কর্মেও কিছুমাত্র হয় না। সেই পরম বস্তু আমার পরমাত্মা তিনি তো আমার মধ্যেই আছেন, শুধু চিত্তের মলিনতার জন্যে, 'আমি আমার' ভাবের জন্যে তিনি ঢাকা পড়ে আছেন, তাই নিজেকে জানতে পারছি না, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। একবার যদি চিত্তের মলিনতা কেটে যায় তাহলে একটু বিচার করলেই, গুরুর মুখে বেদান্তের মহাবাক্য দু-একবার শুনলেই

তিনি স্বমহিমায় প্রকাশ হবেন। তাই নিষ্কাম কর্মেও আত্মজ্ঞান হয় না ঠিকই কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়। তখন বিচার করলেই তাঁকে জানতে পারা যায়। চিত্তশুদ্ধি না হলে শত বিচারেও তাঁকে ধারণা করা যায় না।

সম্যগ্ বিচারতঃ সিদ্ধা রজ্জুতত্ত্বাবধারণা।
ভ্রান্তোদিতমহাসর্পভয়দুঃখবিনাশিনী॥ ১২

অন্বয় : ভ্রান্তোদিতমহাসর্পভয়দুঃখবিনাশিনী (ভ্রান্ত পুরুষের অজ্ঞানজনিত রজ্জুতে মহাসর্পের জ্ঞান থেকে যেসব ভয়, হৃদ্‌কম্প ইত্যাদি দুঃখের উদয় হয় সেসবের নাশকারিণী) রজ্জুতত্ত্ব-অবধারণা (রজ্জুর যথার্থ ধারণা) সম্যগ্-বিচারতঃ (যথাযথ বিচারের দ্বারা) সিদ্ধা (সিদ্ধ হয়)।

সরলার্থ : অজ্ঞানের জন্যে ভ্রান্তিবশত রজ্জুতে মহাসর্পের মিথ্যাজ্ঞান থেকে ভয়, হৃদ্‌কম্প ইত্যাদি যেসব দুঃখের উদ্ভব হয় সেসবের নাশ হয় রজ্জুকে রজ্জু বলে জানলে। ঠিক ঠিক বিচারের দ্বারা জ্ঞানের উন্মেষ হলে সর্পের মিথ্যাজ্ঞানটা চলে গিয়ে রজ্জুর পরিচয়টাই সত্য হয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'সম্যগ্ বিচারতঃ সিদ্ধা রজ্জুতত্ত্ব-অবধারণা'। অর্থাৎ ঠিক ঠিক বিচার করতে পারলে রজ্জুতত্ত্বের সত্য ধারণা প্রতিভাত হয়। রজ্জুতত্ত্বটা কি ? অন্ধকার পথে যাচ্ছি, একটা দড়ি পড়েছিল, সেটাকে ভেবেছি একটা ভয়ানক সাপ। ভয়ে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হলো, কোনও রকমে আলো আনিয়ে দেখি, আরে এটা তো একটা দড়ি। মায়া আমাদের এইরকমই ভুল করায়। দড়িটাকে সাপ বলে দেখাচ্ছে। দড়িকে আবরণ করে তার ওপর সর্পজ্ঞানটা আরোপ করছে। তারপর ভয়, হৃদ্‌কম্প, চিৎকার। আলো এলে, জ্ঞান হলে তখন দড়িকে দড়ি বলে চিনতে পারি। এই হচ্ছে রজ্জুতত্ত্ব। বেদান্তের এ একটা খুব প্রচলিত উদাহরণ। আলো আসাটাই 'সম্যগ্‌বিচার', এই বিচারের দ্বারা রজ্জুতত্ত্বের সার্থক ধারণা হয়। দড়িটা যেমন অধিষ্ঠান আর সাপের জ্ঞানটা তার ওপর অধ্যাস তেমনি এ জগৎ ব্রহ্মের ওপর অধ্যস্ত হয়ে আছে, ব্রহ্মই অধিষ্ঠান। এ জগৎ মিথ্যা কিন্তু মায়ার জন্যে একে সত্য বলে মনে করছি। অনবরত শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিচারের দ্বারা যখন জ্ঞানের উন্মেষ হবে তখন বুঝতে পারব, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। রজ্জুতত্ত্বের ধারণা তখন সিদ্ধ হবে। বলছেন, এই ধারণা 'ভ্রান্তোদিতমহাসর্পভয়দুঃখনাশিনী'। ভ্রান্তিবশত মনে যে মহাসর্পের ভয় হয়েছিল আর তার জন্যে যে চিত্তবিক্ষেপ, হৃদ্‌কম্প ইত্যাদি দুঃখজনক অবস্থায় পড়তে হয়েছিল সেইসবের নিবৃত্তি হয়ে যায় দড়িটাকে দড়ি বলে জানলে। এ জগৎ যাঁর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যিনি আশ্রয়, অধিষ্ঠান, তাঁকে জানতে পারলে সংসারের সব দুঃখের নিবৃত্তি হয়ে যাবে। শুদ্ধবুদ্ধির সাহায্যে সূক্ষ্মবিচারই তাঁকে জানার উপায়।

অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ।
ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা॥ ১৩

অন্বয় : বিচারেণ (বিচারের দ্বারা) হিতোক্তিতঃ (হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুর উক্তি থেকে) অর্থস্য (সত্যবস্তুর) নিশ্চয়ঃ (স্বরূপজ্ঞান) দৃষ্টঃ (অনুভূত হয়) স্নানেন ন দানেন ন প্রাণায়ামশতেন বা ন (স্নানের দ্বারা হয় না দানের দ্বারা হয় না বা শত প্রাণায়ামের দ্বারাও হয় না)।

সরলার্থ : বিচারের দ্বারা আর সত্যদর্শী গুরুর কল্যাণকর উক্তি থেকে সত্যবস্তুর স্বরূপজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। স্নানের দ্বারা হয় না, দানের দ্বারা হয় না বা শত প্রাণায়ামের দ্বারাও হয় না।

ব্যাখ্যা : বিবেকচূড়ামণি বিচারের শাস্ত্র, তাই এখানে সবসময় বিচারের ওপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে। বাস্তবিক বিচার ছাড়া আমাদের কোন ধারণাই পরিষ্কার হয় না। তাই বলছেন 'অর্থস্য নিশ্চয়ঃ দৃষ্টঃ বিচারেণ হিতোক্তিতঃ'। এখানে 'অর্থ' বলতে বোঝাচ্ছেন সৎ-বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম। 'অর্থস্য নিশ্চয়ঃ দৃষ্টঃ', বস্তুর স্বরূপের দর্শন বা উপলব্ধি হয় 'বিচারেণ হিতোক্তিতঃ', বিচারের দ্বারা আর যিনি স্বয়ং বস্তুজ্ঞান লাভ করেছেন সেই শুভানুধ্যায়ী সৎগুরুর উক্তি থেকে। একমাত্র সৎ-বস্তু ব্রহ্ম যে কিরকম সে তো বুঝিয়ে বলা যায় না, তাই যিনি তাঁকে জেনেছেন তাঁর কথা থেকে একটা ধারণা করার চেষ্টা করি আমরা। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁর কথার এত শক্তি হয় যে দু-একটা কথায় একজন মানুষকে তিনি পালটে দিতে পারেন। আর বিচার চাই। গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য, সব বিচার করে গ্রহণ করতে হবে। শাস্ত্র বলছে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। চিরকালীন সত্য একমাত্র ব্রহ্ম—অতীতে সত্য, বর্তমানে সত্য, ভবিষ্যতেও সত্য। বাকি সব মিথ্যা, বিচার করে সেগুলিকে বর্জন করতে হবে। এই ভাবে 'নেতি নেতি' করে বিচার করে এগোতে পারলে ব্রহ্মজ্ঞান নিশ্চয় করতলগত হবে। বলছেন 'ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা'; স্নান, দান বা শত প্রাণায়ামের দ্বারাও ব্রহ্মজ্ঞান হবে না। স্নানের দ্বারা দেহ শুদ্ধি হয়, দান করলে পুণ্য হয়, আর প্রাণায়ামের দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সমতা আসে, একাগ্রতার সুবিধা হয়—কিন্তু তাতে ব্রহ্মজ্ঞান হবে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে সদ্‌গুরুর উপদেশ শুনতে হবে, শুদ্ধ মনে বিচার করতে হবে।

অধিকারিণমাশাস্তে ফলসিদ্ধির্বিশেষতঃ।
উপায়া দেশকালাদ্যাঃ সন্ত্যস্মিন্ সহকারিণঃ॥ ১৪

অন্বয় : [বিচারস্য] ফলসিদ্ধিঃ ([বিচারের] ফলস্বরূপ সিদ্ধান্ত) বিশেষতঃ (বিশেষভাবে) অধিকারিণম্ (অধিকারীর ওপর) আশাস্তে (নির্ভর করে) দেশকালাদ্যাঃ (উপযুক্ত

দেশ-কাল ইত্যাদি) উপায়াঃ (সব উপায়) অস্মিন্ (এতে [ফলসিদ্ধি বিষয়ে]) সহকারিণঃ (সহায়ক) সন্তি (হয়)।

সরলার্থ : বিচারের ফলস্বরূপ যে সিদ্ধান্ত তার অভ্রান্ততা বিশেষভাবে অধিকারীর ওপর নির্ভরশীল। দেশ-কাল ইত্যাদি সব উপায় এই সঠিক সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

ব্যাখ্যা : আমার বিচারের ফল তো আমার যুক্তির স্বচ্ছতার ওপর নির্ভর করে তাই বলছেন বিচারের ফলসিদ্ধি অধিকারী নিরপেক্ষ নয়। বলছেন, 'অধিকারিণম্-আশাস্তে ফলসিদ্ধিঃ-বিশেষতঃ', অধিকারীর ওপর বিচারের ফলসিদ্ধি বিশেষভাবে নির্ভর করে। অধিকারী মানে ব্রহ্মবিচারে যার অধিকার আছে। এই বিচারে সবার সমান অধিকার হয় না। যার যেরকম প্রস্তুতি তার সেইরকম অধিকার। প্রস্তুতিটা কি ? যে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করছি তাকে শুদ্ধ করা। শুদ্ধবুদ্ধি মানে যে বুদ্ধি নিরপেক্ষ, অহঙ্কারের লেশমাত্রও যে বুদ্ধিতে নেই। শ্রুতি বলেছেন, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন (মু, ৩।২।৪), দুর্বল শরীর-মন নিয়ে তাঁকে লাভ করা যায় না, মেধা বা বহু শাস্ত্র পাঠের দ্বারাও নয়। তিনি মন-বুদ্ধির অগোচর কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি শুদ্ধমন শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। তাই বলছেন, 'নেতি নেতি' বিচার করে অনিত্যবস্তু বর্জন করতে করতে একমাত্র নিত্যবস্তু ব্রহ্মস্বরূপ তোমার যে আত্মা, সেখানে এসে তুমি থেমে যাবে। এর জন্যে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ হতে হবে, তোমাকে এই বিচারের অধিকারী হতে হবে, তা না হলে তোমার বিচারের ফলসিদ্ধি হবে না, অর্থাৎ তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না। তারপর বলছেন 'উপায়াঃ দেশ-কালাদ্যাঃ অস্মিন্ সহকারিণঃ সন্তি'। এর জন্যে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করতে হবে, যেমন নির্জন স্থানে বাস, ব্রাহ্মমুহূর্তে ধ্যান, গুরুর সাহায্য ইত্যাদি। এগুলো যথার্থ জ্ঞান লাভের সহায়ক হয়।

অতো বিচারঃ কর্তব্যো জিজ্ঞাসোরাত্মবস্তুনঃ।
সমাসাদ্য দয়াসিন্ধুং গুরুং ব্রহ্মবিদুত্তমম্॥ ১৫

অন্বয় : অতঃ (অতএব) ব্রহ্মবিদুত্তমং দয়াসিন্ধুং গুরুং (শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ দয়ার সাগর গুরুকে) সমাসাদ্য (সুখে প্রাপ্ত হয়ে) জিজ্ঞাসোঃ (জিজ্ঞাসুর) আত্মবস্তুনঃ (আত্মবস্তুর) বিচারঃ (বিচার) কর্তব্যঃ (করা উচিত)।

সরলার্থ : অতএব জিজ্ঞাসুর পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ দয়ার সাগর গুরু লাভ করে আত্মবস্তুর বিচার করাই কর্তব্য।

ব্যাখ্যা : বলছেন, একজন ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একজন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের কৃপা লাভ। তাঁকে পরম শ্রদ্ধায় গুরুরূপে বরণ করতে হবে, তারপর তাঁর সাহায্যে আত্মবিচারে ব্যাপৃত হতে হবে, এটাই কর্তব্য। আগে যেসব কথা বলেছেন তারই জের টেনে বলছেন 'অতঃ' অর্থাৎ অতএব। 'বিচারঃ কর্তব্যঃ জিজ্ঞাসোঃ আত্মবস্তুনঃ'—যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তার কর্তব্য আত্মবস্তুর বিচার। কিন্তু এই বিচার করতে গেলে একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে গুরুরূপে পেতে হয়। যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে গেছেন, তাই সেই মহাপুরুষের আশ্রয়ে, তাঁর সান্নিধ্যে, তাঁর মুখের কথায় এই বিচার ফলবতী হয়। সেইজন্যে বলছেন, 'সমাসাদ্য দয়াসিন্ধুং গুরুং ব্রহ্মবিদুত্তমম্'; 'সমাসাদ্য', সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হয়ে অর্থাৎ পরম শ্রদ্ধায় একান্ত শরণাগতির সঙ্গে গুরুকে গ্রহণ করতে হবে। আর ব্রহ্মবিদ্ গুরু কিরকম ? তিনি দয়াসিন্ধু। শিষ্যের ভবযন্ত্রণার কষ্ট তিনি বোঝেন, তাই পরম করুণায়, অখণ্ড ধৈর্যে বারবার করে শাস্ত্রের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে শিষ্যকে আত্মজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর করে দেন।

মেধাবী পুরুষো বিদ্বানূহাপোহ বিচক্ষণঃ।
অধিকার্যাত্মবিদ্যায়ামুক্তলক্ষণলক্ষিতঃ॥১৬

অন্বয় : মেধাবী (মেধাবী) বিদ্বান্ (বিদ্বান) ঊহ-অপোহ বিচক্ষণঃ (শ্রুতিসম্মত তর্কবিচারে পারদর্শী) উক্তলক্ষণলক্ষিত (এইসব লক্ষণযুক্ত) পুরুষঃ (ব্যক্তি) আত্মবিদ্যায়াম্ (আত্মজ্ঞানে) অধিকারী (অধিকারী)।

সরলার্থ : মেধাবী, বিদ্বান ও শ্রুতি-সম্মত তর্কবিচারে পারদর্শী, এইসব লক্ষণযুক্ত পুরুষ আত্মবিদ্যা লাভের অধিকারী।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'মেধাবী পুরুষঃ বিদ্বান্-ঊহ-অপোহ বিচক্ষণঃ'—মেধাযুক্ত পুরুষ, যে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেছে আর তার মর্মার্থ গ্রহণে সমর্থ, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি 'ঊহ-অপোহ বিচক্ষণঃ'; 'ঊহ' মানে শ্রুতিসম্মত যুক্তি গ্রহণ করে তর্ক আর 'অপোহ' মানে বেদবিরুদ্ধ যুক্তির খণ্ডন করে তর্ক। 'ঊহ-অপোহ বিচক্ষণঃ' মানে এমন ব্যক্তি যে বেদসম্মত যুক্তি অবলম্বন করে বেদের বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডন করায় নিপুণ। বলছেন, 'অধিকারী-আত্মবিদ্যায়াম্-উক্ত লক্ষণ-লক্ষিতম্'। এই যেসব লক্ষণের কথা বলা হলো সেইসব লক্ষণ যার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, সেই ব্যক্তিই আত্মবিদ্যা লাভের অধিকারী পুরুষ। বেদান্ত বলেন, এই আত্মাকে মেধা বা বহু শাস্ত্রপাঠের দ্বারা পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে বলছেন, যে-মেধাবী পুরুষ শাস্ত্র নিয়ে তর্কবিচারে নিপুণ সেই আত্মবিদ্যা লাভের অধিকারী। তার মানে শঙ্করাচার্য কি বেদান্তবিরোধী কথা বলছেন ? তা নয়। তিনি আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারীর লক্ষণ কি হবে তাই বলছেন, অন্য কিছু বলেননি। জ্ঞান তো আমার অন্তরে আছেই তার প্রকাশের জন্যে মনের সব আবর্জনা পরিষ্কার

করতে হবে। সেই আবর্জনা পরিষ্কারের জন্যে মেধা, শাস্ত্রবিদ্যা এসব কাজে লাগে। ঠিক ঠিক জিজ্ঞাসা নিয়ে শাস্ত্রবিচার করলে মনের কালিমা কেটে যায়।

বিবেকিনো বিরক্তস্য শমাদিগুণশালিনঃ।
মুমুক্ষোরেব হি ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতা মতা॥ ১৭

অন্বয় : বিবেকিনঃ (বিবেকীর) বিরক্তস্য (বৈরাগ্যবানের) শমাদিগুণশালিনঃ (শমাদিগুণ যুক্তের) মুমুক্ষোঃ এব (মুমুক্ষু ব্যক্তিরই) হি (অবশ্যই) ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যোগ্যতা (ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যোগ্যতা [আছে]) মতা (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের এই অভিমত)।

সরলার্থ : ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের মতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যোগ্যতা তাঁদেরই আছে যাঁরা নিত্য-অনিত্যবস্তু-বিচারশীল, বৈরাগ্যবান, শমাদিগুণসম্পন্ন, মুক্তিকামী সাধক।

ব্যাখ্যা : ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় কার যোগ্যতা আছে, সেটা যাঁরা ব্রহ্মকে জেনেছেন তাঁরাই বলতে পারেন। সেইসব ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরা মনে করেন 'বিবেকিনঃ বিরক্তস্য শমাদিগুণশালিনঃ মুমুক্ষোঃ-এব হি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-যোগ্যতা'। বলছেন, 'বিবেকী' হতে হবে। বিবেকী অর্থাৎ বিচারশীল, নিত্য-অনিত্যবস্তু বিচারে সমর্থ। বিচারের দ্বারা যে নেতি নেতি করে অনিত্য বস্তু বর্জন করতে পারে ও একমাত্র নিত্যবস্তু সেই আত্মার কাছে পৌঁছতে পারে, সে আত্মাকে জানতে পারে। 'বিরক্তস্য', বিষয়ে যার বিরাগ। বিষয়ে বিরাগ ছাড়া এ সাধনায় এগোনো যায় না। এই বিচিত্র জগৎ, এখানে কত রকমের ভোগের আয়োজন, সেইসবের দিকে মন যদি আকৃষ্ট হয় তাহলে সে তো এটা চাই, সেটা চাই করে ভোগের বস্তুর পেছনেই ছুটে বেড়াবে, আত্মচিন্তা কি করে করবে ? তাই বৈরাগ্য চাই। 'শমাদিগুণশালিনঃ'; শম দম ইত্যাদি গুণ যার আছে তারই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার। 'শম' হচ্ছে অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন, 'দম' হলো বহিরিন্দ্রিয়ের দমন। 'শমাদি' অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সব ইন্দ্রিয়ের দমন। ইন্দ্রিয়গুলি সব আমার বশে থাকবে আর আমি মুক্তি চাই, আমি মুমুক্ষু—এই অবস্থা যার হয়েছে সেই ব্রহ্মকে জানার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যাঁরা তাঁদের এই মত।

সাধনান্যত্র চত্বারি কথিতানি মনীষিভিঃ।
যেষু সৎস্বেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিধ্যতি॥ ১৮

অন্বয় : অত্র (এখানে অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়) চত্বারি সাধনানি (চারটি সাধন) মনীষিভিঃ কথিতানি (মহাপুরুষগণের দ্বারা কথিত হয়েছে) যেষু সৎসু এব (যেগুলি থাকলে তবে) সৎ-নিষ্ঠা (সৎস্বরূপ আত্মবস্তুতে নিষ্ঠা) [সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়)]। যৎ-অভাবে (যেসবের অভাবে) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না)।

সরলার্থ : ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিষয়ে চারটি সাধনের কথা মহাপুরুষরা বলেছেন, যেগুলি থাকলে তবে সৎস্বরূপ আত্মবস্তুতে নিষ্ঠা হয়, না থাকলে হয় না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, ব্রহ্মকে যাঁরা জেনেছেন সেইসব মনীষীরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্যে চারটি সাধনার কথা বলেছেন। বলছেন, 'যেষু সৎসু-এব সৎ-নিষ্ঠা', যেগুলি থাকলে তবে 'সৎ-নিষ্ঠা' হয়। 'সৎ' মানে যিনি অস্তিত্বস্বরূপ। সৎ-নিষ্ঠা—যাঁর অস্তিত্বে এ জীব জগতের সবকিছুর অস্তিত্ব সেই আত্মবস্তুতে নিষ্ঠা। যা কিছু দেখছি তার মধ্যে সেই পরমসত্তার সন্ধান করছি, এই হচ্ছে 'সৎ-নিষ্ঠা'। বলছেন, এই চারটি সাধনা না থাকলে 'সৎ-নিষ্ঠা' হয় না। পরের শ্লোকে আরও বিশদভাবে বলছেন, এই চারটি কোন্ কোন্ সাধনা।

আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্রফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্॥
শমাদিষট্কসম্পত্তির্মুমুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্॥ ১৯

অন্বয় : আদৌ (প্রথমে) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (নিত্য-অনিত্যবস্তু বিবেক) পরিগণ্যতে (ধরা হয়) তদ্-অন্তরম্ (তারপর) ইহ-অমুত্র-ফলভোগ-বিরাগঃ (এজগতে বা অন্য জগতে সৎ-কর্মের ফলভোগে বিরাগ) শমাদিষট্কসম্পত্তিঃ (শমাদি-ষট্ সম্পত্তি) মুমুক্ষুত্বম্ (মুমুক্ষুত্ব) ইতি স্ফুটম্ (অসংশয়ে গ্রহণীয়)।

সরলার্থ : আগে যে চারটি সাধনার কথা বলেছেন তার প্রথমটি হচ্ছে নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক। তারপর, পর পর আসছে, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমাদিষট্সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। এইগুলি নিঃসংশয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়।

পরের শ্লোকগুলিতে এই সাধনাগুলোর কথা আলাদা আলাদা করে বলেছেন।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবংরূপো বিনিশ্চয়ঃ।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ॥ ২০

অন্বয় : ব্রহ্ম সত্যং (ব্রহ্ম সত্য) জগৎ-মিথ্যা (জগৎ মিথ্যা) ইতি-এবংরূপঃ (এই ভাবেরই) বিনিশ্চয়ঃ (স্থির ধারণা) সঃ-অয়ং (সেই এই) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ (নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বলে কথিত হয়)।

সরলার্থ : 'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা' এই ধারণায় দৃঢ় প্রত্যয় হওয়াকেই নিত্য-অনিত্য-বস্তু-বিবেক বলে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই ধারণা যে বিচারের দ্বারা মনের মধ্যে

একেবারে গেঁথে যায় তাকেই নিত্য-অনিত্য বস্তু বিচার বলা হয়। শাস্ত্র বলছেন 'জগৎ মিথ্যা', কিন্তু জগৎ-কে মিথ্যা কেন বলছেন ? পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, বিচিত্র স্বভাবের বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, এই নিয়ে যে বৈচিত্র্যময় জগৎ, একে মিথ্যা কি করে বলি ? আসলে, মিথ্যা মানে অনিত্য, পরিবর্তনশীল। আজ আছে, কাল নেই। জগৎ চলছে আর তার সঙ্গে চলছে ঘটনার প্রবাহ। কত সব অসম্ভব ঘটনা ঘটে। অতি দরিদ্র যে সে হয় তো লটারি জিতে বড়লোক হয়ে গেল আবার বিরাট ধনী একজন, হয় তো ভাগ্য বিপর্যয়ে ধনসম্পদ সব হারিয়ে বসল। কারোর হয় তো স্ত্রী-পুত্র নিয়ে খুব একটা সুখের সংসার হঠাৎ স্ত্রীবিয়োগ হলো বা ছেলের মৃত্যু হলো, সমস্ত সুখ কোথায় হারিয়ে গেলো। সংসারে কত ভোগের সামগ্রী, সবকিছুই মনকে আকর্ষণ করে, কিন্তু এসবের থেকে যে সুখ আসে, আনন্দ আসে সেগুলো তো ক্ষণিক, আজ যা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়েছি কাল হয় তো তা হারিয়ে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে বসে থাকব। তাই শাস্ত্র বলছেন বিচার করে দেখো, এই জাগতিক সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান সব ক্ষণিক, অনিত্য, মিথ্যে। এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে নিজেকে কেন কষ্ট দিচ্ছ ? ব্যবহারিক অর্থে এ জগৎ মিথ্যা নয় ঠিক, কিন্তু পারমার্থিক অর্থে এ মিথ্যা। একমাত্র নিত্য সত্য হচ্ছেন ব্রহ্ম—তিনি তোমার আত্মা, পরমাত্মা। তাঁকে জান। নিত্য-অনিত্যের বিচার করে অনিত্যকে মিথ্যা বলে বর্জন কর। যা নিত্য, যা চিরকালীন শাশ্বত সনাতন তাকে ধরে থাক, আনন্দ লাভ কর। তাই বলছেন, 'ব্রহ্ম সত্যং জগৎ-মিথ্যা-ইতি-এবং বিনিশ্চয়ঃ', ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এইটা নিশ্চিতভাবে জেনে নেওয়াটাই 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃত', নিত্য-অনিত্য বস্তুবিবেক বলে কথিত হয়।

তদ্‌বৈরাগ্যং জিহাসা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ।
দেহাদিব্রহ্মপর্যন্তে হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি।। ২১

অন্বয় : দেহ-আদি-ব্রহ্ম-পর্যন্ত (নিজের দেহ থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মা পর্যন্ত) হি অনিত্যে ভোগবস্তুনি (সমস্ত অনিত্য ভোগ্যবস্তুতে) দর্শনশ্রবণাদিভিঃ (দোষদর্শন ও দোষের কথা শ্রবণের দ্বারা উদ্ভূত) যা (যে) জিহাসা (ত্যাগের ইচ্ছা) তৎ (তা-ই) বৈরাগ্যং (বৈরাগ্য)।

সরলার্থ : নিজের দেহ থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মার দেহ-পর্যন্ত সমস্ত অনিত্য ভোগের সামগ্রীর দোষ-দর্শন ও সেসবের দোষের কথা শোনার ফলে ভোগ্যবস্তুতে যে অনীহা জাগে ও সে সমস্ত ত্যাগ করার ইচ্ছা জন্মায় তাকেই বৈরাগ্য বলা হয়।

ব্যাখ্যা : 'ইহ-অমুত্র-ফলভোগবিরাগ' কাকে বলে সেইটাই বলছেন। 'দেহাদিব্রহ্ম পর্যন্ত হি-অনিত্যে ভোগবস্তুনি'; নিজের দেহ ও দেহের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ভোগের

বস্তু থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মার শরীর পর্যন্ত 'অনিত্যে ভোগবস্তুনি', অনিত্য ভোগ্যবস্তুতে 'যা জিহাসা তৎ বৈরাগ্যং', যে ত্যাগের ইচ্ছা তাই বৈরাগ্য। এই ত্যাগের ইচ্ছা কি করে জন্মায় ? বলছেন, 'দর্শনশ্রবণাদিভিঃ'; এসবের দোষদর্শনের দ্বারা, এইসব বস্তুর ভোগের পরিণাম যে ভালো হয় না সেইসব কথা শ্রবণের দ্বারা। এ জগতে যা কিছু আমরা ভোগ করি সব এই দেহ দিয়েই তো করি। এই দেহকে বলা হয় ভোগায়তন। দেহ অনিত্য, আবার যা কিছু ভোগের সামগ্রী সেগুলোও অনিত্য। ধন-সম্পদ, সম্মান-প্রতিষ্ঠা, আত্মীয়-পরিজন নিয়ে আজ হয় তো পরম সুখে দিন যাপন করছি কিন্তু এ সবকিছুই হয়তো দুদিন বাদে থাকবে না। হঠাৎ হয়তো ভাগ্যবিপর্যয় হয়ে গেল। কিংবা এ-সব যদি থাকেও, আমি যে একদিন থাকব না এতো ধ্রুব সত্য। তাই বলছেন যারা বুদ্ধিমান তারা এসবের প্রতি আকৃষ্ট হবে না। 'দেহাদিব্রহ্ম পর্যন্ত'; আমার দেহ নিয়ে যেমন ইহলোকে চিরসুখ লাভ করার কোনও আশা নেই তেমনি আমি যদি ব্রহ্মা হতাম তাহলেও একই অবস্থা হতো। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল যদিও ইহজগতের মানুষের থেকে অনেক বেশী কিন্তু তারও শেষ আছে। ব্রহ্মলোকে যদি আমার গতি হয় তাহলে সেখানেও আমার সুখভোগের একদিন শেষ হবে। কাজেই এ জগতে বা অন্য কোনও জগতেই স্থায়ী সুখের আশা করে লাভ নেই। চিরস্থায়ী সুখ একমাত্র নিত্যবস্তু সেই ব্রহ্মকে লাভ করতে পারলেই। শাস্ত্রমুখে গুরুমুখে এইসব কথা শুনছি আবার নিজের চোখে এই অনিত্য সংসারের নানা ঘটনা পরপর ঘটে যেতে দেখছি। এইসব দেখেশুনে ভোগের স্পৃহা চলে গিয়ে বিষয় ত্যাগের যে প্রবৃত্তি জাগে তাকেই বৈরাগ্য বলে। এ জগতে বা অন্য কোনও জগতে ভোগের কোন বাসনা না থাকাকেই 'ইহ-অমুত্র-ফলভোগ-বিরাগ' বলে।

বিরজ্য বিষয়ব্রাতাদ্ দোষদৃষ্ট্যা মুহুর্মুহুঃ।
স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে।। ২২

অন্বয় : মুহুর্মুহুঃ (ক্ষণে ক্ষণে) দোষদৃষ্ট্যা (দোষদর্শনের দ্বারা) বিষয়ব্রাতাদ্ (বিষয়-সমূহ থেকে) বিরজ্য (বিরাগের উদ্রেক হওয়ায়) মনসঃ (মনের) স্বলক্ষ্যে (নিজ লক্ষ্যস্থল ব্রহ্মে) নিয়তাবস্থা (নিশ্চল স্থিতির অবস্থা) শমঃ উচ্যতে (শম বলে কথিত হয়)।

সরলার্থ : প্রতি মুহূর্তে বিষয়সমূহে দোষ দেখতে পাওয়ার ফলে বিষয়ে যে বৈরাগ্য আসে তা থেকে মনের নিজ লক্ষ্যস্থল ব্রহ্মে নিশ্চল স্থিতি লাভ হয়, একে শম বলা হয়।

ব্যাখ্যা : আগে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার জন্যে অবশ্যকর্তব্য চারটি সাধনের কথা বলেছেন, তার মধ্যে একটিকে বলেছেন 'শমাদিষট্‌সম্পত্তি'। সেই ছটি সম্পদের কথা এক এক

করে এখন বলবেন। এখানে বলছেন 'শমঃ' বলতে কি বোঝায়। 'শমঃ' হচ্ছে অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মনের দমন। মনকে কি করে বশে আনা যায় ? সঙ্কল্প-বিকল্পে দোলায়মান, অত্যন্ত চঞ্চল, এই মনকে বশে আনা অতি কঠিন কাজ। অর্জুন তাই ভগবানকে বলছেন, আমার মনে হয় মনকে বশ করা 'বায়োরিব সুদুষ্করম্' (গী, ৬।৩৪)—বাতাসকে আয়ত্তে আনার মতোই কঠিন। ভগবান উত্তরে বলছেন, তুমি ঠিকই বলেছ, এই চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা খুব কঠিন। তাহলেও 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে' (গী,৬।৩৫)। অভ্যাস আর বৈরাগ্য এই দুই-এর দ্বারা একে বশে আনা যায়। এখানেও একই কথা বলছেন। 'বিরজ্য বিষয়ব্রাতাদ্ দোষদৃষ্ট্যা মুহুর্মুহুঃ'; সমস্ত ভোগ্যবিষয়ের দোষ মুহূর্তে মুহূর্তে চোখে পড়ছে আর তার ফলে বিষয়ে বৈরাগ্যের উদ্রেক হয়ে মন অন্তর্মুখী হয়ে যাচ্ছে। বাইরের বস্তুতে আর তো আকর্ষণ নেই, তাই মন আর সেসবের পেছনে ছুটছে না। বিষয়ের দোষ যখন দেখতে পাচ্ছি, এসবে যখন বিরাগ এসেছে তখন ঈশ্বরে অনুরাগও হয়েছে। আত্মচিন্তাতেই আনন্দ পাচ্ছি তাই অনবরত সেই চিন্তাই করছি। এইভাবে এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে ঈশ্বরচিন্তা না করে থাকতে পারা যায় না। মন তখন সবকিছুর থেকে গুটিয়ে এসে নিজের একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্মে স্থির নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। মনের এই অবস্থাকে শম বলা হয়।

বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে।
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্তিতঃ॥
বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতিরুত্তমা॥ ২৩

অন্বয় : উভয়েষাম্-ইন্দ্রিয়াণাং (উভয় প্রকারের ইন্দ্রিয়সমূহের) বিষয়েভ্যঃ (সমস্ত বিষয় থেকে) পরাবর্ত্য (বিমুখ করে) স্ব-স্ব-গোলকে (নিজের নিজের স্থানে) স্থাপনং (বসিয়ে রাখা) সঃ দমঃ পরিকীর্তিতঃ (সেটাই দম বলে কথিত হয়) বৃত্তেঃ (চিত্তবৃত্তির) বাহ্য-অনালম্বনং (বাহ্য বিষয় অবলম্বন না করা) এষা উত্তমা-উপরতিঃ (এটাই শ্রেষ্ঠ উপরতি)।

সরলার্থ : উভয় প্রকারের ইন্দ্রিয়গুলিকে (অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে) সমস্ত বিষয় থেকে বিমুখ করে তাদের নিজের নিজের জায়গায় নিশ্চল ভাবে ধরে রাখাকেই দম বলে। চিত্তবৃত্তিকে বাহ্যবিষয় অবলম্বন না করতে দেওয়াই শ্রেষ্ঠ উপরতি।

ব্যাখ্যা : 'শমাদিষট্‌ক সম্পত্তি'র মধ্যে শম কাকে বলা হয় সেটা আগের শ্লোকে বুঝিয়েছেন। বাকি আছে, দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধান। এখানে দম ও উপরতির কথা বলছেন। দম কাকে বলে ? না বহিরিন্দ্রিয়ের দমন। সেটা কিভাবে হয় ? 'বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে উভয়েষাম্-ইন্দ্রিয়াণাং'; বিষয়ের থেকে বিমুখ করে

এনে দুই রকমের ইন্দ্রিয়গুলিকেই নিজের নিজের জায়গায় স্থাপন, সেটাই 'দমঃ পরিকীর্তিতঃ', দম বলে কথিত হয়। 'উভয়েষাম্-ইন্দ্রিয়াণাম্' মানে উভয় প্রকারের ইন্দ্রিয়গুলির; পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্-পাণি-পাদ-উপস্থ-পায়ু ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক্। এদের স্ব-স্ব স্থানে স্থাপন করাকেই দম বলা হয়। এই স্ব-স্ব-স্থানে ধরে রাখার মানেটা কি ? মানে হচ্ছে তাদের লাগাম পরিয়ে বিপথে না যেতে দেওয়া। কঠোপনিষদে এই ইন্দ্রিয়গুলিকে একটা রথের ঘোড়াদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আর মনকে বলা হয়েছে 'প্রগ্রহ' অর্থাৎ লাগাম। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতঃ বহির্মুখী। বিষয়ভোগের জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। কিন্তু মন তাদের চালায়। মনে যখন ভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়, তখন সে এই ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে তার কামনা চরিতার্থ করে। বলছেন, এরকম হলে হবে না। মনকে বিষয়ভোগের থেকে বিমুখ কর, তাহলেই বাসনা-তাড়িত হয়ে ইন্দ্রিয়গুলো আর বাইরের দিকে ছুটবে না। বিচারের সাহায্যে অনিত্য বিষয়-কামনা থেকে মনকে সরিয়ে নাও। নিত্যসুখের উৎস তোমার যে আত্মা তাঁর মধ্যে মনকে ডুবিয়ে দাও। তাহলে দেখবে তোমার ইন্দ্রিয়গুলো আর ভোগের আশায় উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক করছে না। ইন্দ্রিয়গুলোকে এইভাবে বশ করাকেই দম বলে। আসলে শম ও দম একে অন্যের পরিপূরক, এ দুটো সাধনাই একসঙ্গে চলে। তারপর উপরতির কথা বলছেন। 'বাহ্য-অনালম্বনং বৃত্তেঃ-এষা-উপরতিঃ-উত্তমা'। 'বৃত্তিঃ' কাকে বলে ? নানা বিষয়ের সঙ্গে সংযোগের ফলে মনে যেসব প্রতিক্রিয়া হয় এবং তার থেকে মনের মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ প্রবণতার সৃষ্টি হয়, সেইগুলোকে বৃত্তি বলে। বলছেন 'বাহ্য-অনালম্বনং বৃত্তেঃ', বৃত্তির বাহ্য বিষয়ে অবলম্বন শূন্যতা, বাহ্য বিষয় থেকে চিত্তকে নিবৃত্তি। 'এষা-উপরতিঃ-উত্তমা', এটাই শ্রেষ্ঠ উপরতি। বেঁচে থাকতে গেলে বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে যোগাযোগ তো হবেই, কিন্তু চিত্তবৃত্তি যেন বাইরের বিষয়ের আকার না নেয়। চিত্তবৃত্তি বাইরের জগতের বিষয়কে অনুসরণ করবে না। সেটাই উপরতি। শম-দমের অভ্যাস করতে করতে উপরতি আয়ত্তে আসে।

সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্বকম্।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥ ২৪

অন্বয় : সর্বদুঃখানাম্ (সকল প্রকার দুঃখের) চিন্তা-বিলাপ-রহিতং (চিন্তা ও বিলাপশূন্য ভাবে) অপ্রতীকারপূর্বকম্ (বিনা প্রতিকারে) সহনং (সহ্য করে যাওয়া) সা (সেটাই) তিতিক্ষা নিগদ্যতে (তিতিক্ষা বলে কথিত হয়)।

সরলার্থ : কোন রকম চিন্তাভাবনা বা বিলাপ না করে সব রকমের দুঃখকেই গ্রহণ করে নেওয়া এবং বিনা প্রতিকারে তাদের সহ্য করে যাওয়াকে বলে তিতিক্ষা।

ব্যাখ্যা : মানুষের কত রকমের দুঃখ আছে। আমরা কথায় বলি, এ সংসারে ত্রিতাপে দগ্ধ হচ্ছি। ত্রিতাপ হচ্ছে তিন রকমের দুঃখ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক আর আধিভৌতিক। শারীরিক ও মানসিক কষ্টকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলা হয়। রোগযন্ত্রণা, দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে পড়ার কষ্ট, আবার হঠাৎ হয় তো কোনও দুর্ঘটনায় হাত-পা ভাঙলো, এইসব আধ্যাত্মিক কষ্টের মধ্যে পড়ে। তারপর মানসিক কষ্ট আছে। প্রিয়জনের বিয়োগব্যথার কষ্ট, যাকে ভালোবাসি তার কাছ থেকে হয় তো দুর্ব্যবহার পেলাম—তার কষ্ট, আবার যাকে বন্ধু বলে জানি হঠাৎ টের পেলাম সে আমার বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত করছে, খুব দুঃখ হলো। এইরকম সংসারে কত রকমের যে মনোকষ্ট আছে তা বলে শেষ করা যায় না। এসব আধ্যাত্মিক কষ্ট। আবার শীত, গ্রীষ্ম, প্রখর রৌদ্রের তাপ, মুষলধারে বৃষ্টি, ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এসবের থেকে যে কষ্ট সেগুলো আধিদৈবিক দুঃখ। মানুষের আরও দুঃখ আছে। মশা-মাছির উপদ্রব, পোকামাকড়ের উপদ্রব এইরকম কোনও প্রাণীর থেকে যে কষ্ট ভোগ তাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলা হয়। এই তিন রকমের দুঃখ সহ্য করতে হবে 'অপ্রতীকারপূর্বকম্'—কোন রকম প্রতিকার না করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে 'চিন্তাবিলাপরহিতম্'—কোন রকম দুশ্চিন্তা ও আক্ষেপ না করে। তাকেই বলে তিতিক্ষা। সাধনায় অগ্রসর হবার জন্যে তিতিক্ষা একটা প্রয়োজনীয় গুণ। এ সংসারে এইরকম হাজার রকমের কষ্ট মানুষকে পীড়িত করছে, এসব নিঃশব্দে সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে তবে মনের একটা শান্ত অবস্থা আসে, মন সহজে একাগ্র হয়। তাই তিতিক্ষা মনের একটা সম্পদ।

শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্।
সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তূপলভ্যতে॥ ২৫

অন্বয় : শাস্ত্রস্য (শাস্ত্রের) গুরুবাক্যস্য (গুরুবাক্যের) সত্যবুদ্ধি-অবধারণম্ (সত্যজ্ঞান দৃঢ়ভাবে গ্রহণ) যয়া (যার দ্বারা) বস্তু-উপলভ্যতে (আত্মবস্তুর উপলব্ধি হয়) সদ্ভিঃ সা শ্রদ্ধা কথিতা (সজ্জন ব্যক্তিদের দ্বারা তা শ্রদ্ধা বলে কথিত)।

সরলার্থ : শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ও অন্তরে সেই বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করাকে জ্ঞানীরা শ্রদ্ধা বলেন। এই শ্রদ্ধার সাহায্যে আত্মবস্তু লাভ হয়।

ব্যাখ্যা : শ্রদ্ধা কাকে বলে ? শাস্ত্রবাক্যে, গুরুবাক্যে স্থির বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলা যেতে পারে। কিন্তু এতে যেন সবটা বলা হলো না। একটা গভীর আস্তিক্যবুদ্ধি শ্রদ্ধা কথাটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একমাত্র 'সত্য' তিনি আছেন, এই বোধ আমার বুদ্ধিকে তাঁর ধারণা করার জন্যে সব সময় ঠেলছে। শাস্ত্র পড়ছি, গুরুবাক্য শুনছি, আর সমস্ত

বুদ্ধিকে একাগ্র করে তাঁদের বলা কথার মর্মগ্রহণের চেষ্টা করছি। তাঁরা যা বলছেন সব ঠিক বলছেন, এই বিশ্বাস মনে জ্বলজ্বল করছে। বলছেন, 'শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্য-বুদ্ধি-অবধারণম্'—শাস্ত্রবাক্যের, গুরু যা বলছেন সেইসব কথার সত্যতা বুদ্ধি দিয়ে একান্ত বিশ্বাসে ধারণা করা, 'সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভিঃ', সেইটাই সজ্জন ব্যক্তিদের দ্বারা শ্রদ্ধা বলে কথিত হয়। এখানে সজ্জন ব্যক্তি বলতে যাঁরা জ্ঞান লাভ করেছেন। আরও কি বলছেন ? 'যয়া বস্তু-উপলভ্যতে', যার দ্বারা 'বস্তু' অর্থাৎ আত্মবস্তু লাভ হয়। বাস্তবিক শ্রদ্ধা ছাড়া আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কারণ অবাঙ্মনসোগোচর তিনি কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। বুদ্ধির মধ্যে অহংতার লেশমাত্র থাকলে তাঁকে ধরা যাবে না। শ্রদ্ধা আমাদের অহঙ্কার নাশ করে, বুদ্ধিকে শুদ্ধ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, 'তৎ-ত্বম্-অসি শ্বেতকেতো' বলার আগে গুরু তাঁকে বলছেন 'শ্রদ্ধৎস্ব সৌম্য' (ছা, ৬।১২।২)।

সর্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি সর্বথা।
তৎ সমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য লালনম্॥ ২৬

অন্বয় : সর্বদা (সব সময়) শুদ্ধে ব্রহ্মণি (শুদ্ধ ব্রহ্মে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) সর্বথা (সর্বপ্রকারে) স্থাপনং (স্থাপন) তৎ সমাধানম্-ইতি-উক্তম্ (তা সমাধান বলে কথিত হয়) তু (কিন্তু) চিত্তস্য লালনং ন (বেদান্ততত্ত্ব আলোচনা করে চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদন করা নয়)।

সরলার্থ : সব সময়, সবরকম ভাবে বুদ্ধিকে শুদ্ধব্রহ্মে লগ্ন করে রাখাকে সমাধান বলে। কিন্তু বেদান্ততত্ত্ব আলোচনা করে চিত্তের যে প্রসন্নতা হয়, তা সমাধান নয়।

ব্যাখ্যা : বুদ্ধি যখন শুদ্ধব্রহ্মে সব সময় সর্বতোভাবে যুক্ত হয়ে থাকে তখন সেই অবস্থাকে সমাধান বলে। এর আগে আমরা শম ও দমের কথা বলেছি। 'দম' হচ্ছে ইন্দ্রিয়কে সংযত করা, 'শম' হচ্ছে মনকে সংযত করা। সংযত করা মানে বহির্বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে আত্মবিষয়ে নিয়োগ করা। আর 'সমাধান' হচ্ছে বুদ্ধির সংযম। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধি মনকে চালায়। মনের লক্ষণ সঙ্কল্প-বিকল্প। 'করব কি করব না, যাব কি যাব না'—এই যে দোলায়মান অবস্থা, এটা মনের বৈশিষ্ট্য। মনকে সিদ্ধান্ত দেয় বুদ্ধি—বলে, 'এটা কর বা এটা কোরো না।' তাই বুদ্ধির প্রবল শক্তি। এমন যে বুদ্ধি, তাকে ব্রহ্মে যুক্ত করে রাখতে হবে। বলছেন : 'সর্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি সর্বথা তৎ সমাধানম্-ইতি-উক্তম্'; শুধু 'সর্বদা' বলছেন না, বলছেন 'সর্বথা', মানে সর্বপ্রকারে। বুদ্ধি আর কোনও দিকে যাচ্ছেই না, এক শুদ্ধব্রহ্মে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। এই হচ্ছে সমাধান। তারপর বলছেন : 'ন তু চিত্তস্য লালনম্'—ভুল করো না যেন; শাস্ত্রবিচার করে, সেই পরমতত্ত্বের আলোচনা করে মনের মধ্যে যে সাময়িক তৃপ্তি হয় তা কিন্তু সমাধান নয়। সমাধান তার থেকে অনেক গভীর জিনিস।

অহংকারাদিদেহান্তান্ বন্ধানজ্ঞানকল্পিতান্।
স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ষুতা॥ ২৭

অন্বয় : অহংকার-আদি-দেহ-অন্তান্ (অহংকার থেকে স্থূল দেহ পর্যন্ত) বন্ধান্ (বন্ধন-সমূহ) অজ্ঞান-কল্পিতান্ (অজ্ঞান কল্পিত) স্ব-স্বরূপ-অববোধেন (নিজের স্বরূপ-জ্ঞানের সহায়ে) [সেইসব বন্ধন থেকে] মোক্তুম্-ইচ্ছা (মুক্ত হবার ইচ্ছা) মুমুক্ষুতা (মুমুক্ষুতা)।

সরলার্থ : অহঙ্কার থেকে আরম্ভ করে স্থূল দেহ পর্যন্ত যেসব বন্ধন সেগুলো অজ্ঞান কল্পিত। নিজের স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা সেইসব বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছাই মুমুক্ষুতা।

ব্যাখ্যা : বলছেন, অহঙ্কার থেকে আরম্ভ করে স্থূল দেহ পর্যন্ত যে সমস্ত বন্ধন আছে, সেগুলি সবই অজ্ঞান কল্পিত, অর্থাৎ অজ্ঞান বা অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন। 'অহঙ্কার' মানে 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা', এই ভাব। এটাই তো আমাদের বন্ধনের মূল কারণ। তারপর আছে বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দেহ। এ সবগুলিই আমাদের সংসারবন্ধনে জড়ায়। আমরা তো দেহটাকেই আমি মনে করি, তাই দেহের তাগিদে আমাদের অনেক কামনা-বাসনা, অনেক কাজ। মনের কোন্ বাসনাটা কিভাবে পূরণ করতে হবে মন ঠিক করতে পারছে না, বুদ্ধি বলে দিচ্ছে কি করতে হবে, আর দেহ আর প্রাণ একসঙ্গে হয়ে সেইসব কাজ করছে। আবার মনের থেকে নতুন করে তাগিদ আসছে, এটা পাইনি এখনও, এটার ব্যবস্থা কর। এইভাবে চলছে। কে যেন নাকে দড়ি দিয়ে আমাদের ঘোরাচ্ছে। এই হলো সংসারবন্ধন ! এর থেকে মুক্তির উপায় কি ? উপায় হল নিজেকে জানা। অহঙ্কার থেকে শুরু করে স্থূল দেহ পর্যন্ত কোন কিছুই আমার আসল পরিচয় নয়। আমার আসল পরিচয় হলো—আমি সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ, আমি নিত্য সত্য, নিত্য জ্ঞান, নিত্য-আনন্দ। আমার সত্তায় সবকিছু সত্তাবান। আমি সর্বভূতে বিরাজ করছি। এই জ্ঞান হলে সংসারবন্ধন কেটে যায়। তবে তার জন্যে মুমুক্ষুতা চাই। বলছেন, 'স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুম্-ইচ্ছা মুমুক্ষুতা'। নিজের স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা বন্ধন-মুক্ত হবার ইচ্ছাই মুমুক্ষুতা।

মন্দমধ্যমরূপাপি বৈরাগ্যেণ শমাদিনা।
প্রসাদেন গুরোঃ সেয়ং প্রবৃদ্ধা সূয়তে ফলম্॥ ২৮

অন্বয় : সা ইয়ং (সেই এইটি) [মুমুক্ষুতা] মন্দমধ্যমরূপা অপি (অল্প বা মধ্যম পরিমাণের হলেও) বৈরাগ্যেণ শমাদিনা (বৈরাগ্য ও শমদম ইত্যাদির সহায়তায়) গুরোঃ প্রসাদেন (গুরুর কৃপায়) প্রবৃদ্ধা (প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) [হয়ে] ফলং সূয়তে (মোক্ষফল উৎপন্ন করে)।

সরলার্থ : সেই মুমুক্ষুতা অল্প বা মধ্যম পরিমাণের হলেও বৈরাগ্য ও শমদম ইত্যাদির দ্বারা এবং গুরুকৃপায় প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মোক্ষফল সৃজন করে।

ব্যাখ্যা : মুমুক্ষুতা তিন রকমের—'মন্দ', 'মধ্যম' এবং 'প্রবৃদ্ধ'—অল্প, মাঝারি আর তীব্র। এখানে বলছেন, এই মুক্তির ইচ্ছা যদি 'মন্দমধ্যমরূপা-অপি' সামান্য বা মাঝামাঝি রকমেরও হয় তাহলেও 'বৈরাগ্যেণ শমাদিনা' বৈরাগ্যের সাহায্যে ও শমদম ইত্যাদির সহায়তায় আর 'প্রসাদেন গুরোঃ' গুরুর কৃপার দ্বারা 'প্রবৃদ্ধা সূয়তে ফলম্', প্রকৃষ্ট-রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মোক্ষফল প্রদান করে। অল্প অল্প মুক্তির ইচ্ছা নিয়ে হয়তো সাধনা শুরু হয়েছিল কিন্তু গুরুর উপদেশ আর নিয়মিত শমদম ইত্যাদি অভ্যাসের ফলে বৈরাগ্য বাড়তে থাকে। তখন বিষয় বিস্বাদ হয়ে যায়। তখন মনে হয় এই অনিত্য সংসারের ক্ষণিক সুখ-দুঃখের টানাপোড়েন শেষ হোক। তখন স্বরূপজ্ঞান লাভ করে সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। এই ইচ্ছা একবার যদি তীব্র হয়ে ওঠে তখন আর মোক্ষলাভের অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভের দেরি থাকে না।

বৈরাগ্যং চ মুমুক্ষুত্বং তীব্রং যস্য তু বিদ্যতে।
তস্মিন্নেবার্থবন্তঃ স্যুঃ ফলবন্তঃ শমাদয়ঃ॥ ২৯

অন্বয় : তু (কিন্তু) যস্য (যার) বৈরাগ্যং (বৈরাগ্য) চ (আর) মুমুক্ষুত্বং (মুমুক্ষুতা) তীব্রং (পূর্ণমাত্রায়) বিদ্যতে (বিদ্যমান থাকে) তস্মিন্-এব (তার পক্ষেই) শমাদয়ঃ (শমদমাদি) অর্থবন্তঃ (সার্থক) ফলবন্তঃ (মোক্ষসাধনা ফলবতী) স্যুঃ (হয়)।

সরলার্থ : কিন্তু যার বৈরাগ্য ও মুমুক্ষা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে তার পক্ষেই শমাদির সাধনা সার্থক হয়, মোক্ষের সাধনা ফলবতী হয়।

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বলেছেন, অল্প বা মধ্যম আকারের মুমুক্ষুতা নিয়ে শুরু করলেও বৈরাগ্য, শমাদির সাধন ও গুরুকৃপায় সেই মুমুক্ষার বৃদ্ধি হয়ে মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। এখানে বলছেন : সাধনচতুষ্টয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুতা। 'বৈরাগ্যং চ মুমুক্ষুত্বং তীব্রং যস্য তু বিদ্যতে', যার বৈরাগ্য ও মুমুক্ষা তীব্র হয়েই আছে 'তস্মিন্-এব-অর্থবন্তঃ স্যুঃ ফলবন্তঃ শমাদয়ঃ' তার পক্ষেই শমাদির সাধন সার্থক ও ফলবতী হয় অর্থাৎ তার অচিরে মোক্ষলাভ হয়। যখন আমার মুমুক্ষুতা অল্প বা মধ্যম তখন শমাদির সাধন ও বৈরাগ্য তাকে বাড়াতে থাকে। শমাদির অভ্যাস বৈরাগ্যকেও বাড়ায়। এমনি করে বৈরাগ্য ও মুমুক্ষা যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন সাধক সর্বদা আত্মস্বরূপ শুদ্ধব্রহ্মে যুক্ত হয়ে থাকতে চায়। তারপর একদিন সে স্ব-স্বরূপকে উপলব্ধি করে এবং ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। শম-দম ইত্যাদি সাধনার একমাত্র লক্ষ্য ঐ মোক্ষ লাভ।

এতয়োর্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভানমাত্রতা॥ ৩০

অন্বয় : যত্র (যেখানে) এতয়োঃ (এই দুটি) বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ (বৈরাগ্য ও মুমুক্ষার) মন্দতা (শিথিলতা) তত্র (সেখানে) মরৌ (মরুভূমিতে) সলিলবৎ (জল দেখার মতো) শমাদেঃ (শমাদি সাধনের) ভানমাত্রতা (অভিনয়মাত্রের মতো [সাধন হয়])।

সরলার্থ : যেখানে বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুতা এই দুটির শিথিলতা থাকে সেখানে মরুভূমিতে জল দেখার মতো শমাদির সাধন যেন সাধনার একটা অভিনয়ের মতো হয়।

ব্যাখ্যা : মোক্ষ-লাভের সাধনায় বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটিই যদি অল্প হয় তাহলে শমাদির সাধন একটা ভানের মতো হয়। কারণ বিষয়ে আকর্ষণ যদি ঠিকমত না কাটে তাহলে শম-দম ইত্যাদি সব বৃথা হয়। এসব সাধনা সার্থক হওয়ার জন্যে বিষয়ের প্রতি একটা স্বাভাবিক অনীহার প্রয়োজন আছে। কেবল তখনই মনের বাইরের দিকে ছোটার প্রবণতা কমে আসে। বলছেন, 'এতয়োঃ-মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ', যাঁর বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুতা দুটোই খুব কম তাঁর সাধনজীবনটা কেমন ? মরীচিকার জলের মতো মিথ্যা, ভানমাত্র। বলছেন : 'মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদেঃ-ভান-মাত্রতা', মরীচিকায় যেমন মরুভূমিতে জল দেখি, যেটা একটা জলের প্রতিবিম্বমাত্র, প্রকৃত জল নয়, তেমনি শম-দম ইত্যাদি সাধনাও এইসব লোকের জীবনে ভান মাত্র হয়ে যায়, এর থেকে তাঁদের কোনও বৈরাগ্যের বৃদ্ধি হয় না বা মুক্তিলাভের ইচ্ছা জাগে না। এঁরা হয়তো কোন জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে শুনে বা তাঁদের দেখে বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছেন যে বৈরাগ্য না হলে জীবনে শান্তি আসবে না, কিন্তু ওইটুকুই, এসব বোঝাবুঝি কাজে রূপান্তরিত হয় না।

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।
স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ ॥৩১

অন্বয় : মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং (মোক্ষের সাধনসমূহের মধ্যে) ভক্তিঃ এব (ভক্তিই) গরীয়সী (শ্রেষ্ঠ)। স্ব-স্বরূপ-অনুসন্ধানং (নিজের স্বরূপ অনুসন্ধান) ভক্তিঃ ইতি-অভিধীয়তে (ভক্তি বলে কথিত হয়) অপরে (অন্য কেউ) স্ব-আত্ম-তত্ত্ব-অনুসন্ধানং (নিজের পরমাত্মার তত্ত্ববিচারকে) ভক্তিঃ ইতি জগুঃ (ভক্তি বলে থাকে)।

সরলার্থ : মোক্ষের সাধনসমূহের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। নিজের স্বরূপের সন্ধানকেই ভক্তি বলে অভিহিত করা হয়। আবার অন্য অনেকে আত্মার ও পরমাত্মার তত্ত্ব-বিচারকেই ভক্তি বলে থাকেন।

ব্যাখ্যা : শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী তাই এখানে ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অদ্বৈতভাবের পরিপোষক। অবিদ্যার জন্যে যেসব অনাত্মবস্তুকে সত্যি বলে মনে করি, বিচার করে সেগুলো অনিত্য বলে বুঝে একমাত্র আত্মাই নিত্য বস্তু আর সেই আত্মাই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম—এই ধারণা মনের মধ্যে গেঁথে নেওয়ার নামই অদ্বৈতবাদীদের মতে ভক্তি। যাঁরা দ্বৈতবাদী, তাঁদের মতে ভক্তির সংজ্ঞা একটু অন্যরকম। নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে 'সা তু অস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা'; ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমের নামই ভক্তি। এই 'পরমপ্রেমরূপা' কথাটার মধ্যে একটা নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদনের ভাব আছে। আমার সমস্ত ভালোবাসা শুধু ঈশ্বরেই সমর্পণ করছি, আর কাউকে নয়—এরই নাম ভক্তি। ভক্তিশাস্ত্রের আর একজন দিক্‌পাল শাণ্ডিল্য বলেছেন, 'সা পরানুরক্তিঃ-ঈশ্বরে'; ঈশ্বরে পরম অনুরাগ হচ্ছে ভক্তি। আর এখানে বলছেন, 'স্ব-স্বরূপ-অনুসন্ধানং ভক্তি-ইতি-অভিধীয়তে'; নিজের স্বরূপের অনুসন্ধানকেই ভক্তি বলা হয়। নিজের স্বরূপের অনুসন্ধান আমরা কি করে করি ? বৈরাগ্য আর বিচারের দ্বারা যা অনিত্য, মিথ্যা সেগুলোকে বর্জন করে অন্তরের অন্তস্তলে সেই সৎস্বরূপ, চৈতন্য-স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ আমার পরমাত্মাকে খুঁজে পেতে চাই। এই খোঁজার মধ্যে ঐকান্তিক অনুরাগ আর নিষ্ঠাই আমাকে তাঁর কাছে এগিয়ে নিয়ে যায়। আবার বলছেন, অনেকে বলেন ভক্তি হচ্ছে 'স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং'। আমার আত্মাই সেই 'তৎ'। তিনি কি তা বলে বোঝাতে পারি না বলে 'তৎ' বলি। সেই তিনিই যে আমার আত্মা এই জ্ঞান লাভ করার প্রয়াসই হল 'স্ব-আত্মতত্ত্ব-অনুসন্ধানং' আর একেই কেউ কেউ বলেন 'ভক্তি'। দুটি সংজ্ঞার মধ্যে ভাবগত ভাবে কোনও পার্থক্য নেই। বলছেন যে, যে হৃদয়বৃত্তি আমাদের স্বরূপ অনুসন্ধানের সহায়ক, যার সাহায্যে আমাদের আত্মজ্ঞান লাভ হয় তাকেই ভক্তি বলে। বলছেন, 'মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী'—মোক্ষলাভের সমস্ত উপায়ের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। কেন শ্রেষ্ঠ ? কারণ ভক্তির সাহায্যে স্বরূপজ্ঞান হয়।

উক্তসাধনসম্পন্নস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুরাত্মনঃ।
উপসীদেদ্ গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাদ্ বন্ধবিমোচনম্॥ ৩২

অন্বয় : উক্তসাধনসম্পন্নঃ (পূর্বোক্ত সাধনসম্পন্ন) আত্মনঃ (আত্মার) তত্ত্বজিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্ব জানতে ইচ্ছুক) প্রাজ্ঞং (জ্ঞানী) গুরুম্-উপসীদেদ্ (গুরুর নিকটে উপস্থিত হবেন) যস্মাৎ (যাঁর থেকে) বন্ধবিমোচনম্ (সংসারবন্ধনের মোচন হয়)।

সরলার্থ : আগে যেসব সাধনের কথা বলা হয়েছে সেইসব সাধনসম্পন্ন, আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি পরমজ্ঞানী গুরুর কাছে যাবেন, কারণ গুরুর সাহায্যেই এই সংসারবন্ধন মোচনের উপায় হয়।

ব্যাখ্যা : নিজের স্বরূপকে জানার জন্যে সাধকের ব্রহ্মবিদ্ গুরু লাভ করা একান্ত

প্রয়োজন। ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানেন এই সাধনার পথে কি কি বিঘ্ন আসতে পারে আর কিভাবে সেসব পার হয়ে যেতে হয়। শুধু তাই নয়, সাধনার পথে যেসব অবস্থা ও উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেগুলো তিনিই ঠিক ঠিক যাচাই করতে পারেন। তাই বলছেন, আত্মজিজ্ঞাসু যেসব সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে, তাদেরও প্রকৃত একজন ব্রহ্মজ্ঞ গুরু লাভের বিশেষ প্রয়োজন। গুরুর সহায়তায়, গুরুর কৃপায় সাধনার অগ্রগতি হয়, আত্মসাক্ষাৎকার করে সাধক সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ।
অহেতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাম্॥ ৩৩

অন্বয় : শ্রোত্রিয়ঃ (বেদজ্ঞ) অবৃজিনঃ (নিষ্পাপ) অকামহতঃ (কামনাশূন্য) ব্রহ্মবিত্তমঃ (শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্) ব্রহ্মণি-উপরতঃ (বাহ্যবিষয়ের থেকে সরে এসে ব্রহ্মে রত) শান্তঃ (শান্ত) নিরিন্ধনঃ অনলঃ ইব (ইন্ধনহীন জ্বলন্ত কাঠের নির্ধূম আগুনের মতো) অহেতুক-দয়াসিন্ধুঃ (প্রতিদানের অপেক্ষা ছাড়াই অপার দয়ার সাগর) আনমতাং সতাং (প্রণত সজ্জন ব্যক্তিদের) বন্ধুঃ (বন্ধু)।

সরলার্থ : যিনি বেদজ্ঞ, নিষ্পাপ, নিষ্কাম ও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্, যাঁর মন বাহ্যবিষয় থেকে সরে এসে ব্রহ্মে স্থিত হয়ে আছে, যিনি ইন্ধনশূন্য জ্বলন্ত কাঠের আগুনের মতো শান্ত ও তেজস্বী, যিনি অহেতুক দয়াসিন্ধু তিনি প্রণত সজ্জন ব্যক্তিদের কল্যাণকারী বন্ধু।

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বলেছেন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে গেলে সদ্গুরুর প্রয়োজন। এখন বলছেন গুরু কিরকম হবেন। 'শ্রোত্রিয়ঃ অবৃজিনঃ অকামহতঃ যঃ ব্রহ্মবিত্তমঃ'; যিনি বেদজ্ঞ নিষ্পাপ নিষ্কাম আর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্, তিনিই গুরু হতে পারেন। 'শ্রোত্রিয়ঃ' অর্থাৎ বেদজ্ঞ তিনি, তাই তাঁর সাহায্যে শাস্ত্রের মর্মার্থ ধরতে পারি। 'অবৃজিনঃ'—পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি নিষ্কাম ও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্। নির্মলচরিত্র তিনি। কোন বাসনা নেই তাঁর। আমাকে যে তিনি ধর্মদান করছেন, তার বিনিময়ে জাগতিক কোন কিছু তিনি চান না। তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ তাই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা তাঁর উপদেশে সুগম হয়। 'ব্রহ্মণি-উপরতঃ শান্তঃ নিরিন্ধনঃ ইবানলঃ'; তাঁর মন বাহ্যবিষয় থেকে প্রত্যাহৃত, তিনি সর্বদা ব্রহ্মে স্থিত। তিনি শান্ত আবার তেজস্বী। কিরকম ? 'নিরিন্ধনঃ ইবানলঃ', যেন ইন্ধনহীন আগুন। একটা কাঠ জ্বলছে, কোনও ইন্ধন দিয়ে সেই আগুনকে বাড়ানো হচ্ছে না । তাই সেই আগুনের শিখা স্থির, তার কোন বাড়া-কমা নেই। কিন্তু আগুনের তেজ অনুভব করা যাচ্ছে। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুও তেমনি—শান্ত কিন্তু

তেজস্বী। তাঁর শক্তি অসীম। তিনি ব্রহ্মই হয়ে গেছেন তাই তাঁর সঙ্গ লাভ করলেই বাহ্যবিষয় কিছুটা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। আর তিনি দয়ার সাগর—'অহেতুক কৃপাসিন্ধু'। তাঁর কৃপা সদা উৎসারিত, কোন কারণ দেখে তিনি কৃপা করেন না। 'বন্ধুঃ-আনমতাং সতাং'—যেসব সজ্জন ব্যক্তি তাঁর শরণাগত, তাদের তিনি বন্ধু।

তমারাধ্য গুরুং ভক্ত্যা প্রহ্ব-প্রশ্রয়-সেবনৈঃ।
প্রসন্নম্ তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেৎ জ্ঞাতব্যমাত্মনঃ॥ ৩৪

অন্বয় : তম্ (সেই) গুরুং (গুরুকে) ভক্ত্যা (ভক্তি সহকারে) প্রহ্ব-প্রশ্রয়-সেবনৈঃ (প্রণাম, নম্রতা ও সেবার দ্বারা) আরাধ্য (পূজা করে) প্রসন্নং তম্ (প্রসন্ন তাঁকে) অনুপ্রাপ্য (নিকটে পেয়ে) আত্মনঃ (নিজের) জ্ঞাতব্যং (জ্ঞাতব্য) পৃচ্ছেৎ (জিজ্ঞেস করবে)।

সরলার্থ : সেই গুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বিনম্র সেবায় আরাধনা করে প্রসন্ন করবে, তারপর তাঁকে নিজের যা জানার আছে তা জিজ্ঞেস করবে।

ব্যাখ্যা : গুরু কিরকম হবেন সেটা আগের শ্লোকে বলেছেন। এখন বলছেন শিষ্য কিভাবে গুরুর কাছে যাবেন ও তাঁকে প্রশ্ন করবেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে গুরুর কাছে 'সমিৎপাণি' হয়ে যেতে হয়। 'সমিধ্' মানে যজ্ঞের কাঠ। যজ্ঞের কাঠ হাতে নিয়ে (পাণি = হাত) শিষ্যকে গুরুর কাছে যেতে হয়। এটা একটা প্রতীক। শিষ্য যে গুরুর কাছে বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করছে, তার প্রতীক। শ্রদ্ধা, ভক্তি আর সেবা দিয়ে গুরুকে তুষ্ট করে, প্রশ্ন করে করে যা জ্ঞাতব্য তা জেনে নিতে হয়। গীতাতেও ভগবান বলেছেন, 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' (গী, ৪।৩৪), গুরুকে ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে, সেবা করে, বারবার প্রশ্ন করে তাঁর কাছ থেকে সেই পরমতত্ত্ব জেনে নাও। এখানে বলছেন, 'তম্-আরাধ্য গুরুং ভক্ত্যা প্রহ্ব-প্রশ্রয়-সেবনৈঃ', সেই গুরুকে ভক্তিপূর্ণ প্রণামের দ্বারা ও বিনীত সেবার দ্বারা আরাধনা করে 'প্রসন্নং তম্-অনুপ্রাপ্য পৃচ্ছং জ্ঞাতব্যম্-আত্মনঃ', তিনি প্রসন্ন হয়েছেন দেখে, তাঁকে কাছে পেয়ে নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞেস করবে। গুরুর সেবা করলে বিশেষ ফল লাভ হয়, মন শুদ্ধ হয়। আর পরম শ্রদ্ধায় তাঁকে পরমাত্মার সঙ্গে অভেদ জেনে বারবার প্রশ্ন করে আত্মতত্ত্ব জেনে নিতে হয়। আমরা হিন্দুরা বলি, 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ'। গুরুর প্রতি যার যেমন শ্রদ্ধা ধর্মজগতে তার তেমন লাভ।

স্বামিন্ নমস্তে নতলোকবন্ধো
কারুণ্যসিন্ধো পতিতং ভবাব্ধৌ।
মামুদ্ধরাত্মীয়কটাক্ষদৃষ্ট্যা
ঋজ্বাঽতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা॥ ৩৫

অন্বয় : স্বামিন্ (প্রভো), নতলোকবন্ধো (প্রণতজনের বন্ধু) কারুণ্যসিন্ধো (করুণাসিন্ধু) তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার) ভবাব্ধৌ (সংসারসমুদ্রে) পতিতং মাং (পতিত আমাকে) ঋজ্বা (সরল) অতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা (অপার করুণার অমৃতবর্ষী) আত্মীয়কটাক্ষদৃষ্ট্যা (নিজের কৃপাদৃষ্টির দ্বারা) উদ্ধর (উদ্ধার কর)।

সরলার্থ : প্রণতজনের বন্ধু, দয়াসিন্ধু হে প্রভু, তোমার করুণামৃতবর্ষী সরল, স্নিগ্ধ কৃপাকটাক্ষদৃষ্টি দ্বারা সংসারসমুদ্রে পতিত আমাকে উদ্ধার কর।

ব্যাখ্যা : গুরুর স্তব করছেন শিষ্য। প্রার্থনা করছেন ভবসাগর থেকে উদ্ধার করার জন্যে। বলছেন, হে প্রভু তোমায় নমস্কার করি। তুমি দয়ার সাগর, অপার করুণা তোমার। যারা তোমার পায়ে মাথা নত করেছে তুমি তাদের পরম হিতৈষী বন্ধু। তুমি যদি একবার আমার দিকে কৃপাকটাক্ষে চাও তাহলে আমার অন্তরে অমৃতের ধারা বয়ে যাবে। সংসার-সাগরে পড়েছি আমি, ডুবে যাচ্ছি। আমি জানি, তুমি যদি একবার তোমার সহজ সরল করুণাঘন কৃপাকটাক্ষ আমার দিকে ফেরাও তাহলে সেই দৃষ্টির দ্বারাই আমি উদ্ধার হয়ে যাব। দয়া করে তোমার অপরূপ করুণায় স্নিগ্ধ সুধাবর্ষী দৃষ্টির দ্বারা আমাকে ভবযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার কর।

দুর্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং
দোধূয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ
শরণ্যমন্যদ্ যদহং ন জানে॥ ৩৬

অন্বয় : দুর্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং (দুর্নিবার সংসাররূপ দাবানলে তাপিত) দুরদৃষ্টবাতৈঃ (দুরদৃষ্টরূপ প্রবল বায়ুপ্রবাহের দ্বারা) দোধূয়মানং (বিকম্পিত) মৃত্যোঃ ভীতং (মৃত্যুর ভয়ে ভীত) প্রপন্নং (শরণাগতকে) পরিপাহি (সর্বতোভাবে রক্ষা কর) যৎ (যেহেতু) অন্যৎ (তোমা ছাড়া অন্য) শরণ্যম্ (শরণাগতের আশ্রয়) অহং ন জানে (আমি জানি না)।

সরলার্থ : সংসাররূপ দুর্নিবার দাবানলে তাপিত, দুরদৃষ্টরূপ প্রবল বায়ুর তাড়নায় বিকম্পিত ও মৃত্যুভয়ে ভীত শরণাগতকে সর্বতোভাবে রক্ষা কর। কারণ তুমি ছাড়া শরণাগতের আর কোনও আশ্রয় আমি জানি না।

ব্যাখ্যা : সংসারযন্ত্রণাকে দাবানলের দহনের সঙ্গে তুলনা করছেন। ঈশ্বরলাভের জন্যে মনে যে ব্যাকুলতা আসে, যেটা এলে তাঁকে পাওয়া যায়, শাস্ত্র সেই অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন, 'প্রদীপ্ত শিরঃ' বলে। মাথায় আগুন জ্বলছে; আর সহ্য করতে পারছি না, এ আগুন নেভানোর জন্যে যা করতে হয় সব করব। এইরকম ব্যাকুলতা এলে তবে

ঠিক ঠিক শরণাগতি আসে। এখানে শিষ্যের সেইরকম একটা অবস্থা হয়েছে বলে দেখাচ্ছেন। 'দুর্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং'—এই সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারণ করা দুঃসাধ্য কর্ম, আমি পারছি না, এ যেন দাবানল, এর দুঃসহ তাপে আমি ঝলসে যাচ্ছি। তার ওপর আবার দুরদৃষ্ট আছে, 'দোধূয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ', প্রবল ঝঞ্ঝা মানুষকে যেমন কাঁপিয়ে দেয় তেমনি দুরদৃষ্টের তাণ্ডবে আমার কম্পন হচ্ছে। আমি শরণাগত, 'প্রপন্নং পরিপাহি', শরণাগতকে রক্ষা কর। 'শরণ্যম্-অন্যদ্ যদ্-অহং ন জানে'—তুমি ছাড়া অন্য কারোকে আমি জানি না, যে শরণাগতের আশ্রয়। তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা কর।

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনা-
নহেতুনাঽন্যানপি তারয়ন্তঃ॥ ৩৭

অন্বয় : বসন্তবৎ (বসন্তকালের মতো) লোকহিতং চরন্তঃ (লোককল্যাণকর্মে রত) শান্তা (শান্ত) মহান্তঃ (মহাশয়) সন্তঃ (মহাত্মাসকল) নিবসন্তি (বাস করেন) স্বয়ং (নিজেরা) ভীমভবার্ণবং তীর্ণাঃ (ভয়ঙ্কর সংসারসমুদ্র পার হয়েছেন) অহেতুনা অপি (কোনও কারণ ছাড়াই) অন্যান্ জনান্ (অন্য লোকেদের) তারয়ন্ত (ভবসাগর পার করান)।

সরলার্থ : শান্ত মহৎ সাধুব্যক্তিরা বসন্ত ঋতুর মতো স্বভাবতঃ-ই লোককল্যাণে রত থেকে এ জগতে বাস করেন। তাঁরা স্বয়ং ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্র পার হয়েছেন আর অন্যদেরও পার করাচ্ছেন।

ব্যাখ্যা : এই জীবনেই যাঁদের মোক্ষলাভ হয়েছে, যাঁরা জীবন্মুক্ত, তাঁরা কিভাবে এ জগতে বাস করেন ? 'শান্তা মহান্তঃ নিবসন্তি সন্তঃ বসন্তবৎ-লোকহিতং চরন্তঃ'। শান্ত তাঁরা, অচঞ্চল, স্থির। 'মহান্তঃ', মহান ব্যক্তি, মহা সদাশয়। 'সন্তঃ' অর্থাৎ তাঁরা সাধু ব্যক্তি। সর্বদা বসন্ত ঋতুর মতো তাঁরা লোকহিতে রত। বসন্ত ঋতু সবার মনে আনন্দ দেয়। বসন্তকালে ফুলে ফলে, নতুন সবুজ পাতায় প্রকৃতি ঝলমল করতে থাকে আর এসবের জন্যে বসন্ত ঋতুকে কোনও অনুরোধ করতে হয় না। তেমনি যাঁরা জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁরা নিজের স্বভাবেই লোককল্যাণ করে যান। তাঁরা যদি চুপ করে বসে থাকেন তাতেই লোকের মঙ্গল হয়। শুধু তাঁদের অবস্থানটাই লোকের অশেষ কল্যাণ করে। 'তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনান্-অহেতুনা অন্যান্-অপি তারয়ন্তঃ'—তাঁরা স্বয়ং এই ভীষণ সংসারসমুদ্র পার হয়েছেন, এখন অহেতুক কৃপায়, 'অন্যান্ জনান্', অন্য সকলকেও 'তারয়ন্তঃ' পার করে দিচ্ছেন। সংসারবন্ধনে কাতর মানুষের প্রতি কৃপায় তাঁরা শরীরটা ধরে রাখেন, তাদের মুক্তির পথ দেখাবেন বলে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেচে কত লোকের কাছে যেতেন, শুধু তাদের কল্যাণ হবে বলে।

অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎ পর-
শ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাম্।
সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ককর্কশ-
প্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল ॥ ৩৮

অন্বয় : মহাত্মনাম্ (মহাত্মা ব্যক্তিদের) যৎ (যে) পরশ্রম-অপনোদ-প্রবণং (পরের দুঃখ নিবারণ প্রবণ) অয়ং স্বভাবঃ (এই স্বভাব) স্বতঃ এব (নিজের থেকেই আছে) [যেমন] এষঃ সুধাংশুঃ (এই চন্দ্র) স্বয়ং কিল (নিজেই) অর্ক-কর্কশ-প্রভাভিতপ্তাম্ (সূর্যের প্রখর কিরণে উত্তপ্ত) ক্ষিতিং (পৃথিবীকে) অবতি (রক্ষা করেন)।

সরলার্থ : মহাত্মাদের স্বভাবে পরদুঃখ নিরসনের যে প্রবণতা দেখা যায়, তা নিজের থেকেই হয়। যেমন প্রখর সূর্যকিরণে উত্তপ্ত পৃথিবীকে চন্দ্র তাঁর স্নিগ্ধ কিরণে আপনিই রক্ষা করেন।

ব্যাখ্যা : যাঁরা মহাত্মা ব্যক্তি তাঁদের পরের দুঃখমোচনের প্রবণতা স্বভাবসিদ্ধভাবেই থাকে। আপন-পর ভেদবুদ্ধিটাই তাঁদের মন থেকে সরে যায়, তাই পরের দুঃখে তাঁরা ব্যথা পান, তাদের দুঃখমোচনের চেষ্টা করেন। আসল কথা হৃদয়টা তাঁদের খুব বড় হয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ একবার গুরুভাই তুরীয়ানন্দ স্বামীকে বলেছিলেন, কতটা কি হয়েছে জানি না, তবে আমার হৃদয়টা খুব বড় হয়ে গেছে। ধর্মের জগতে যত অগ্রসর হওয়া যায় ততই সবাইকার জন্যে ভালোবাসা বিনা কারণে উৎসারিত হতে থাকে। 'অহং স্বভাবঃ স্বতঃ এব যৎ পরশ্রম-অপনোদ-প্রবণং মহাত্মনাম্'। বলছেন, পরের দুঃখ অপনোদন করার প্রবণতা মহাত্মাদের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত। আত্মপর ভেদ না করেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁরা সকলের দুঃখ দূর করার জন্যে চেষ্টা করেন। এটা তাঁদের স্বভাব। তারপর একটা সুন্দর উপমা দিচ্ছেন : 'সুধাংশুঃ এষ স্বয়ম্-অর্ক-কর্কশ-প্রভাভিতপ্তাম্-অবতি ক্ষিতিং কিল'; সূর্যের প্রখর কিরণে তপ্ত পৃথিবীকে স্নিগ্ধ শীতল কিরণে ভাসিয়ে দেন স্বয়ং চন্দ্র, তাকে শীতল করে রক্ষা করেন। মহাপুরুষ যাঁরা, এমনি করেই তাঁরা তাঁদের ভালোবাসা আর আশীর্বাদ দিয়ে সংসারের তাপে শুকিয়ে যাওয়া মানুষদের জীবনের পথে চলতে সাহায্য করেন। সর্বজীবে এই অপার ভালোবাসা তাঁদেরই হয় যাঁরা অনুভব করেন সেই এক আত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত। তিনি আমার মধ্যে আছেন আবার এক তিনিই সকলের মধ্যে আছেন। তাই অপরের দুঃখ আমারই দুঃখ।

ব্রহ্মানন্দরসানুভূতিকলিতৈঃ পূতৈঃ সুশীতৈর্যুতৈঃ
যুষ্মদ্বাক্‌কলসোজ্ঝিতৈঃ শ্রুতিসুখৈর্বাক্যামৃতৈঃ সেচয়।

সন্তপ্তং ভবতাপদাবদহনজ্বালাভিরেনং প্রভো
ধন্যাস্তে ভবদীক্ষণক্ষণগতেঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ ॥ ৩৯

অন্বয় : ভবতাপ-দাবদহন-জ্বালাভিঃ (সংসারতাপের দাবাগ্নি তুল্য জ্বালার দ্বারা) সন্তপ্তং (তাপিত) এনং (এই শরণাগতকে) ব্রহ্মানন্দরসানুভূতিকলিতৈঃ (ব্রহ্মানন্দ রসের অনুভূতি-প্লুত) পূতৈঃ (পবিত্র) সুশীতৈঃ-যুতৈঃ (স্নিগ্ধ শীতলতাযুক্ত) যুষ্মদ্-বাক্‌কলস-উজ্‌ঝিতৈঃ (আপনার বাক্যরূপ কলস নিঃসৃত) শ্রুতিসুখৈঃ (শ্রুতিসুখকর) বাক্যামৃতৈঃ (বাক্যামৃতের দ্বারা) সেচয় (সিঞ্চন করে দিন) প্রভো (হে প্রভু) ভবৎ-ঈক্ষণক্ষণগতেঃ (আপনার ক্ষণকালের নিমিত্ত দৃষ্টিপাতের) পাত্রীকৃতাঃ (পাত্র হয়েছে) স্বীকৃতাঃ ([আপনার কাছে] স্বীকৃত হয়েছে) তে ধন্যাঃ ([যারা] তারা ধন্য)।

সরলার্থ : সংসারের দাবাগ্নিতুল্য তাপের জ্বালায় সন্তপ্ত এই শরণাগতকে ব্রহ্মানন্দ-রসানুভূতিপ্লুতঃ পবিত্র স্নিগ্ধশীতল আপনার বাক্যরূপকলস নিঃসৃত শ্রুতি-মধুর কথামৃতের দ্বারা সিঞ্চন করে দিন। তারাই ধন্য, যারা ক্ষণকালের জন্যেও আপনার দৃষ্টিপাতের পাত্র হয়েছে ও আপনার কাছে স্বীকৃত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : শিষ্য গুরুকে বলছেন : সংসারের যন্ত্রণা আমার অসহ্য হয়েছে, আমি শরণাগত, আপনি দয়া করে আমাকে গ্রহণ করুন, আপনার উপদেশের অমৃতে আমার প্রাণ শীতল করুন। বলছেন, 'ব্রহ্মানন্দরসানুভূতি-কলিতৈঃ পূতৈঃ সুশীতৈঃ-যুতৈঃ যুষ্মদ্‌বাক্ কলস-উজ্‌ঝিতৈঃ'; ব্রহ্মানন্দরসের অনুভূতিপূর্ণ পবিত্র স্নিগ্ধ শীতলতাযুক্ত আপনার বাক্-কলস থেকে উৎসারিত 'শ্রুতি সুখৈঃ বাক্যামৃতৈঃ সেচয়', শ্রুতি-সুখকর অমৃতময় বাণীর দ্বারা সিঞ্চিত করে আমায় শীতল করুন। কারণ 'সন্তপ্তং ভবতাপদাবদহন জ্বালাভিঃ-এনং'—আমি সংসারতাপের দাবদহনের জ্বালায় সন্তপ্ত। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁর ইচ্ছে হলে সংসারযন্ত্রণা চলে যেতে পারে, কিন্তু শরণাগত হতে হয়। ভক্তি দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, সেবা দিয়ে তাঁকে তুষ্ট করতে হয়। তখন তিনি এমন সব অমৃতকথা বলতে থাকেন যা শুনলে সমস্ত প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তারপর শিষ্য বলছেন, 'প্রভো ধন্যাস্তে ভবদ্-ঈক্ষণক্ষণগতেঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ'—প্রভু, তারাই ধন্য যারা ক্ষণকালের জন্যেও আপনার দৃষ্টিপাতের পাত্র হতে পেরেছে আর আপনার কাছে স্বীকৃত হয়েছে। এইসব ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের দৃষ্টি একবার পড়লে মনে হয় দেহ মন সব শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেলো। যাঁরা ঈশ্বরকল্প পুরুষ তাঁদের দৃষ্টি অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করে, মনকে নির্মল করে, একটা পরম প্রাপ্তির অনুভূতি আনে। সেই কথাই এখানে বলছেন। আরও বলছেন যে, যাদের দায় আপনি স্বীকার করেছেন প্রভু তাদের মতো ভাগ্যবান আর কে আছে ? তারা ধন্য। অর্থাৎ বলতে চাইছেন, আমার দায়ও আপনি স্বীকার করে নিন, আমাকেও ধন্য করুন।

কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং
কা বা গতির্মে কতমোঽস্ত্যুপায়ঃ।
জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াঽব মাং প্রভো
সংসারদুঃখক্ষতিমাতনুষ্ব ॥ ৪০

অন্বয় : এতং (এই) ভবসিন্ধুম্ (সংসারসমুদ্র) কথং (কি করে) তরেয়ম্ (পার হব) কা বা (কি বা) মে গতিঃ (আমার গতি) কতমঃ উপায়ঃ অস্তি (কি উপায় আছে) কিঞ্চিৎ ন জানে (কিছুই জানি না) প্রভো (হে প্রভু) কৃপয়া মাং অব (কৃপা করে আমাকে রক্ষা কর) সংসারদুঃখক্ষতিম্-আতনুষ্ব (সংসারদুঃখের নাশ প্রসারিত কর)।

সরলার্থ : এই সংসারসমুদ্র কি করে পার হব ? কি বা আমার গতি ? কি উপায় আছে ? কিছুই জানি না। হে প্রভু, কৃপা করে আমাকে রক্ষা কর। সংসারদুঃখের হানি আরও বিস্তৃত কর।

ব্যাখ্যা : যখন বৈরাগ্য আসে, তখন মনে হয় সংসার অসহ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : সংসারকে পাতকুয়া দেখে, আত্মীয়-স্বজনকে মনে হয় কালসাপ। শিষ্যের মনের অবস্থাটা সেইরকম। বলছেন, কি করে এই সংসারসমুদ্র পার হব ? আমার কি গতি হবে ? 'কতমঃ উপায়ঃ অস্তি' ? 'কিঞ্চিৎ ন জানে'। এই সংসার থেকে নিষ্কৃতির কি উপায় আছে ? কিছুই জানি না। প্রভু, আমার আর কোনও উপায় নেই, তুমি আমাকে রক্ষা কর। 'সংসার দুঃখক্ষতিম্-আতনুষ্ব'; 'আতনুষ্ব' মানে বিস্তার কর; এখানে বলতে চাইছেন, এই সংসার-দুঃখ নিবারণের যেসব উপায় আছে সেগুলো আরও বিস্তারিতভাবে আমাকে বল যাতে আমি তাড়াতাড়ি এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাই। বৈরাগ্য তীব্র না হলে স্বরূপজ্ঞানের যোগ্যতাই হয় না। তাই পরপর কয়েকটি শ্লোকে দেখাচ্ছেন শিষ্যের মনে সংসারের প্রতি বিরাগ কত তীব্র হয়েছে। এইরকম অবস্থা হলে তবে গুরুর উপদেশ ফলপ্রসূ হয়, অজ্ঞান কেটে যায়। আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

তথা বদন্তং শরণাগতং স্বং
সংসারদাবানলতাপতপ্তং।
নিরীক্ষ্য কারুণ্যরসার্দ্রদৃষ্ট্যা
দদ্যাদভীতিং সহসা মহাত্মা ॥ ৪১

অন্বয় : তথা বদন্তং (এইরকম বলছেন যিনি তাঁকে) স্বং শরণাগতং (নিজের শরণাগত) সংসার-দাবানল-তাপতপ্তং (সংসারদাবানলের তাপে তাপিত যিনি তাঁকে) কারুণ্য-রসার্দ্রদৃষ্ট্যা (করুণায় আর্দ্র দৃষ্টির দ্বারা) নিরীক্ষ্য (নিরীক্ষণ করে) মহাত্মা (মহাত্মা [গুরু]) সহসা (তৎক্ষণাৎ) অভীতিং (অভয়) দদ্যাৎ (প্রদান করে থাকেন)।

সরলার্থ : এইভাবে বলছেন যিনি, তাঁকে সংসার-দাবানলের উত্তাপে তপ্ত ও তাঁরই শরণাগত বুঝে সেই মহাত্মা গুরু তাঁকে করুণার্দ্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন এবং তৎক্ষণাৎ অভয় দিয়ে থাকেন।

ব্যাখ্যা : এত সব কথা শুনে সেই মহাত্মা গুরু বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক এই ব্যক্তিটি যথার্থ তাঁর শরণাগত আর সংসারের আগুনে সে সত্যিই দগ্ধ। গুরু শিষ্যকে গ্রহণ করার আগে বুঝে নেন তাঁর উপদেশ গ্রহণের মতো মানসিক প্রস্তুতি তার আছে কিনা। সাধনায় সাফল্যের জন্যে আর একটা জিনিসেরও অত্যন্ত প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে গুরুর কাছে বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ, গুরুর শরণাগত হওয়া। তাই বলছেন, 'তথা বদন্তং শরণাগতং স্বং সংসারদাবানলতাপতপ্তং নিরীক্ষ্য কারুণ্যরসার্দ্রদৃষ্ট্যা'; সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে শিষ্য যেসব কথা বলেছে তা শুনে ও তাকে শরণাগত দেখে সেই মহাত্মার মনে করুণার উদ্রেক হয়। তিনি তখন করুণাসিক্ত দৃষ্টিতে তাকে অভয় দেন অর্থাৎ শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন।

বিদ্বান্ স তস্মা উপসত্তিমীয়ুষে
মুমুক্ষবে সাধু যথোক্তকারিণে।
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়
তত্ত্বোপদেশং কৃপয়ৈব কুর্যাৎ ॥ ৪২

অন্বয় : সঃ বিদ্বান্ (সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ) সাধু (সম্যক্ রূপে) যথোক্তকারিণে (উপদেশ পালনে তৎপর) প্রশান্তচিত্তায় (প্রশান্ত চিত্ত) শমান্বিতায় (শমযুক্ত) উপসত্তিম্-ঈয়ুষে (অনন্যভাবে শরণাগত) মুমুক্ষবে (মুক্তিকামী) তস্মৈ (তাকে) কৃপয়া (কৃপা করে) তত্ত্বোপদেশ কুর্যাৎ (তত্ত্বোপদেশ দেবেন)।

সরলার্থ : সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তখন গুরুবাক্য পালনে তৎপর, প্রশান্তচিত্ত, শমযুক্ত, যথাবিহিত শিষ্যভাবে শরণাগত, মুক্তিকামী তাকে কৃপাপরবশ হয়ে সযত্নে তত্ত্বোপদেশ দেবেন।

ব্যাখ্যা : উপযুক্ত শিষ্য পেলে গুরুরও আনন্দ হয়। তিনি তো এসব গুহ্যকথা বলতেই চান কিন্তু উপযুক্ত আধার না পেলে বলতে পারেন না, তাই যোগ্য আধার দেখলে সযত্নে পরম কৃপায় তত্ত্বোপদেশ করেন। বলছেন, 'বিদ্বান্ সঃ উপসত্তিমীয়ুষে', সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু 'মুমুক্ষবে যথোক্তকারিণে প্রশান্তচিত্তায় শমন্বিতায়' যথাবিহিতভাবে শিষ্যত্ব লাভের আশায় যে এসেছে সেই মুমুক্ষু শিষ্যকে 'তত্ত্বোপদেশং কৃপয়া-এব কুর্যাৎ', কৃপাপরবশ হয়ে তত্ত্বোপদেশ করবেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হতে হলে চারটি সাধনের প্রয়োজন, একথা আগে বলেছেন। এখানে শিষ্যের মুমুক্ষুতার কথা বলছেন

আর সে শমাদি ষট্‌সম্পদ যুক্ত এটা বলছেন, বাকি থাকছে নিত্যানিত্যের বিচার আর বৈরাগ্য। কিন্তু বলছেন যে, এই শিষ্য প্রশান্তচিত্ত। তার মানেই বিষয়ে বিরাগ তার হয়েছে আর নিত্যানিত্যের বিচার করে একমাত্র নিত্যবস্তু ব্রহ্মকে জানাও তার লক্ষ্য বলে স্থির হয়ে গেছে। কারণ, আমাদের মন কখন শান্ত হয় ? যখন আর এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি থাকে না। অনিত্য বস্তুতে মন পড়ে থাকলে মনে প্রশান্তি আসে না। কারণ যা পেয়ে খুশি হয়েছি তা তো এই মুহূর্তেই হারাতে পারি। আবার বৈরাগ্য না হলে অনিত্যবস্তুর বর্জনও হয় না। কাজেই তত্ত্বজ্ঞান ধারণা করার মতো উপযুক্ত আধার নিয়েই শিষ্য এসেছেন গুরুর কাছে। ব্রহ্মবিদ্ গুরুও তাই পরম কৃপায় সযত্নে তাকে তত্ত্বোপদেশ করবেন। ঠিক এই ভাবের কথা মুণ্ডক উপনিষদেও আছেঃ 'তস্মৈ সঃ বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেন-অক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্ম বিদ্যাম্ (মু, ১।২।১৩) —যথাবিহিত নিয়ম পালন করে যে শিষ্যত্ব লাভের জন্যে এসেছে, সেই প্রশান্তচিত্ত সংযত শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু যে-বিদ্যার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্ব যথাযথ ভাবে বলবেন।

মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥ ৪৩

অন্বয় : বিদ্বন্ (হে বিদ্বান্) মা ভৈষ্ট (ভয় পেও না) তব অপায়ঃ নাস্তি (তোমার [মোক্ষলাভের] অন্তরায় নেই) সংসারসিন্ধোঃ (সংসার সমুদ্র) তরণে (উত্তীর্ণ হওয়ার) উপায়ঃ অস্তি (উপায় আছে) যেন এব যতয়ঃ (যার দ্বারা যতিগণ) অস্য পারং যাতাঃ (এর পারে গিয়েছেন) তং মার্গং এব তব (সেই পথই তোমার) নির্দিশামি (আমি নির্দেশ দেব)।

সরলার্থ : বিদ্বান তুমি, ভয় পেও না। তোমার মোক্ষলাভের পথে অন্তরায় নেই। সংসার- সাগর পার হওয়ার উপায় আছে। যতিগণ সেই উপায় অবলম্বন করে এর পারে গেছেন। তোমারও সেই পথ। আমি তোমাকে সেই পথের নির্দেশ দেব।

ব্যাখ্যা : শিষ্যের আকুতি দেখে গুরু খুশি হয়েছেন। তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বিদ্বান বলে সম্বোধন করছেন। বলছেন ঃ 'তব নাস্তি-অপায়ঃ', তোমার মুক্তি লাভে কোনও অন্তরায় নেই। এই সংসারসমুদ্র পার হওয়ার উপায় আছে। 'যতয়ঃ', যোগী পুরুষরা এর পারে গেছেন। তাঁরা সাধনার দ্বারা এই উত্তাল সংসারসমুদ্রের পারে চলে গেছেন। তাঁরা যেসব উপায় অবলম্বন করে এই দুরূহ কাজ করেছেন তোমাকেও তাই

করতে হবে। আমি বুঝতে পারছি তুমি তা পারবে। তাঁরা যে-পথে চলেছেন 'তং মার্গং এব তব', তোমারও সেই পথ। আমি তোমায় 'নির্দিশামি', নির্দেশ দেব, সেই পথ দেখিয়ে দেব। ভয় নেই, তুমি সফল হবে।

অস্ত্যুপায়ো মহান্ কশ্চিৎ সংসারভয়নাশনঃ।
তেন তীর্ত্বা ভবাম্ভোধিং পরমানন্দমাপ্স্যসি॥ ৪৪

অন্বয় : সংসারভয়নাশনঃ (সংসারভয়-নাশক) কশ্চিৎ মহান্ উপায়ঃ অস্তি (কোনও এক মহৎ উপায় আছে) তেন (সেই উপায়ের দ্বারা) ভবাম্ভোধিং (সংসারসমুদ্রকে) তীর্ত্বা (অতিক্রম করে) পরমানন্দম্ আপ্স্যসি (পরমানন্দ লাভ করবে)।

সরলার্থ : ভবভীতি-নাশক কোনও এক মহৎ উপায় আছে যার দ্বারা তুমি সংসার-সমুদ্রকে অতিক্রম করে পরমানন্দ লাভ করবে।

ব্যাখ্যা : আগে শিষ্যকে অভয় দিয়েছেন, এখন আরও জোর দিয়ে গুরু বলছেন, তোমার ভবভয় দূর করার খুব ভালো উপায় আছে, তোমাকে আমি তা বলব। 'অস্তি-উপায়ঃ মহান্ কশ্চিৎ সংসার ভয়নাশনঃ'; কোনও এক মহৎ উপায় আছে যা সংসার-ভীতি নাশ করে। সেই উপায়ে তুমি ভবার্ণব পার হয়ে যাবে আর পরমানন্দ লাভ করবে। ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করবেন তো, তাই শিষ্যকে উৎসাহ দেবার জন্যে সাধনার ফলের কথাটা আগে বলে দিচ্ছেন। উপায়টাকে মহান কেন বলছেন ? কারণ এই উপায় ব্যর্থ হবার নয়। যখন বৈরাগ্য তীব্র হয়, সংসার বিস্বাদ লাগে, আত্মজ্ঞান হওয়ার তখন আর দেরি থাকে না। শিষ্যের বৈরাগ্য জেগেছে, গুরু বুঝেছেন যে জমি প্রস্তুত, তিনি বীজ ফেললেই কাজ হবে। তাই বলছেন, এমন একটা উপায় তোমায় বলে দেব যে তুমি তার সাহায্যে 'তীর্ত্বা ভবাম্ভোধিং পরমানন্দম্-আপ্স্যসি', এই ভবসমুদ্র পার হয়ে পরমানন্দ লাভ করবে। সৎ-চিৎ-আনন্দ আমার স্বরূপ, পরমানন্দের উৎস তো আমার ভেতরেই আছে, শুধু মায়ার আবরণে ঢাকা পড়ে আছে। সেই আবরণটা সরাতে হবে। গুরু বলে দেবেন সেই আনন্দের উৎসমুখের ঢাকাটা কি করে তুলে ফেলতে হবে। আর তখন যে পরমানন্দ আমার স্বরূপ তার মধ্যে আমি ডুবে যাব।

বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্।
তেনাত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশো ভবত্যনু॥ ৪৫

অন্বয় : বেদান্তার্থ-বিচারেণ (উপনিষদ্ ইত্যাদির বাক্যসমূহের মর্মার্থ বিচারের দ্বারা) উত্তমং জ্ঞানং (শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান) জায়তে (উদ্ভূত হয়) অনু (এর পরই) তেন (এই জ্ঞানের দ্বারা) আত্যন্তিক-সংসার-দুঃখনাশঃ (সংসারদুঃখের সমূলে বিনাশ) ভবতি (হয়)।

সরলার্থ : বেদান্তবাক্যের বিচারের দ্বারা যখন সেইসব কথার মর্মার্থ স্পষ্ট হয় তখন তার থেকে আত্মজ্ঞান জন্মায়। যে জ্ঞান হলে সংসারদুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয় অর্থাৎ দুঃখের লেশমাত্রও আর থাকে না।

ব্যাখ্যা : আত্মতত্ত্বের উপদেশ করবেন তাই বেদান্তশাস্ত্রের বিচারের কথা বলে শুরু করছেন। বেদের সার হচ্ছে বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্‌গুলি। হিন্দুধর্মের যে দার্শনিক তত্ত্ব তা এই উপনিষদ্‌গুলির মধ্যেই আছে। ব্রহ্মবিদ্যার আকরগ্রন্থ বলে যদি কিছু থাকে তাহলে তা এই উপনিষদ্। তাই বলছেন 'বেদান্তবিচারেণ জায়তে জ্ঞানম্-উত্তমম্'; উত্তম জ্ঞান, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান—তা পরিস্ফুট হয় বেদান্তবিচারের দ্বারা। বিচার করে বেদান্তবাক্যের মর্মার্থ গ্রহণ করতে হয়, তারপর সেইসব কথার ধ্যান করতে হয়। তখন ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বোধে প্রতিষ্ঠা হয়। তখন সুখদুঃখ সব সমান। মায়া আর কিছু করতে পারে না। তাই বলছেন জ্ঞান হলে 'আত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশঃ ভবতি-অনু'; সংসারই মিথ্যা হয়ে গেছে তার আবার দুঃখ কি থাকবে ? তাই বলছেন, সংসারদুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয় আত্মজ্ঞান হলে।

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগান্ মুমুক্ষো-
র্মুক্তের্হেতূন্ বক্তি সাক্ষাচ্ছ্রুতের্গীঃ।
যো বা এতেষ্বেব তিষ্ঠত্যমুষ্য
মোক্ষোঽবিদ্যা কল্পিত দেহবন্ধাৎ॥ ৪৬

অন্বয় : শ্রুতেঃ (শ্রুতির) গীঃ (বাক্য) মুমুক্ষোঃ (মুমুক্ষুর) শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান-যোগান্ (শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান, এই ত্রিবিধ যোগ) মুক্তেঃ (মুক্তির) সাক্ষাৎ হেতূন্ (প্রত্যক্ষ কারণ) বক্তি (বলেন) যঃ (যিনি) বৈ (শুধু) এতেষু-এব (এইসকল সাধনেই) তিষ্ঠতি (নিযুক্ত থাকেন) অমুষ্য (সেই ব্যক্তির) অবিদ্যাকল্পিতদেহবন্ধাৎ (অবিদ্যাকল্পিত দেহবন্ধন থেকে) মোক্ষঃ (মোক্ষঃ [হয়])।

সরলার্থ : শ্রুতিবাক্য বলেন, যিনি মুমুক্ষু তাঁর শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান এই তিনটে যোগই মুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ। যে শুধু এই তিনটি সাধন নিয়েই থাকে তার অবিদ্যাকল্পিত দেহবন্ধন থেকে মুক্তি হয়।

ব্যাখ্যা : মোক্ষলাভের সাধনার কথা বলছেন। বলছেন, শ্রুতির কথা অনুযায়ী শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান এই ত্রিবিধ সাধনাই মুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ হয়। শ্রদ্ধা হচ্ছে আস্তিক্য বুদ্ধি, শাস্ত্রবাক্যে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস, তাঁদের কথায় একান্ত নির্ভরতা। আর ভক্তি হচ্ছে আত্মানুসন্ধানে নিষ্ঠা, ভালোবাসা, আসক্তি। আর ধ্যান হচ্ছে মনটাকে তৈলধারার মতো নিরবচ্ছিন্নভাবে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত রাখা। বলছেন, 'শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান-যোগান্

মুমুক্ষোঃ মুক্তেঃ হেতূন্ বক্তি সাক্ষাৎ-শ্রুতেঃ-গীঃ'; শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান, এই তিনটি যোগ মুমুক্ষুর মুক্তির কারণ, সাক্ষাৎ শ্রুতিবাক্য এই কথা বলছেন। ভববন্ধন থেকে মুক্তি মানে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি। জন্মাচ্ছি, মরছি, আবার জন্মাচ্ছি আবার মরছি এই যে আবর্তন চলছে এটা থামবে কি করে ? থামবে যখন আমি জানতে পারব এই দেহটা আমি নই; জন্মহীন মৃত্যুহীন অজর অমর আমার যে আত্মা, তিনিই আমি। দেহটাকে 'আমি' ভাবছি বলে দেহের সুখ-দুঃখের জন্যে কত কাজ করছি আর সেই সব কর্মের ফল ভোগ করছি। দেহসংক্রান্ত যা কিছু সব 'আমার' ভাবছি। এই 'আমি আমার' করে করে ভোগের বাসনা, ভোগের পরিধি বাড়িয়েই চলেছি। দেহ মানে শুধু এই স্থূল দেহ নয়। দেহ-মন-বুদ্ধি-চিত্ত অহঙ্কার নিয়ে আমার যে ব্যক্তিসত্তার কল্পনা করেছি তারই পুজো করে চলেছি। কিন্তু এগুলো তো সব অনিত্য, থাকবে না। আজ যা পেয়ে খুশি হয়েছি কাল তাই হারিয়ে দুঃখে ভেঙে পড়ছি, এই তো চলছে। শাস্ত্র বলছেন, গুরু বলছেন, এসব অনিত্য, এদের পেছনে ছুটলে তোমার মুক্তি নেই। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত তোমার যে স্বরূপ তাঁকে জান। দেহের সুখ-দুঃখে কাতর হয়ে সংসারে জড়িয়ে পড়ে ভাবছ এ বন্ধন আমার কি করে ঘুচবে ? কিন্তু তোমার তো বন্ধন নেই, এ বন্ধন মায়ার দ্বারা কল্পিত, তুমি সব সময় মুক্ত । শাস্ত্রের এই কথায় শ্রদ্ধা করে একান্ত নিষ্ঠায় আত্মানুসন্ধান করতে হয়। আমার স্বরূপটা কি ? শাস্ত্র যা বলছেন তার সঙ্গে মেলে কি ? এই চিন্তা, এই বিচার বারবার করে যেতে হয়। যখন সমাধি হয় তখন ঠিক ঠিক অনুভব হয় সৎ-চিৎ-আনন্দ আমার স্বরূপ। তখন আর দেহবন্ধন থাকে না, তখন মায়া নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। তাই বলছেন, 'যঃ বৈ এতেষু-এব তিষ্ঠতি-অমুষ্য মোক্ষঃ-অবিদ্যা কল্পিত দেহবন্ধাৎ'; যে শুধু এইগুলিতেই স্থিত অর্থাৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান এই তিনটি যোগে যুক্ত হয়ে আছে তার 'মোক্ষঃ অবিদ্যা কল্পিত দেহবন্ধাৎ', অবিদ্যার কল্পনা যে দেহবন্ধন তার থেকে মুক্তি হয়ে যায়।

অজ্ঞানযোগাৎ পরমাত্মনস্তব
হ্যনাত্মবন্ধস্তত এব সংসৃতিঃ।
তয়োর্বিবেকোদিতবোধবহ্নি-
রজ্ঞানকার্যং প্রদহেৎ সমূলম্॥ ৪৭

অন্বয় : পরমাত্মনঃ হি (বস্তুতঃ পরমাত্মাই) তব (তোমার) অজ্ঞানযোগাৎ (অজ্ঞানযুক্ত হওয়াতে) অনাত্মবন্ধঃ (জড় দেহাদিরূপ অনাত্মবস্তুতে বন্ধন) ততঃ এব (তার থেকেই) সংসৃতিঃ (জন্ম-মরণের সংসার) তয়োঃ (আত্মা ও অনাত্মার) বিবেকোদিত-বোধবহ্নিঃ (বিচার থেকে উদ্ভূত স্বরূপবোধ-রূপ অগ্নি) অজ্ঞানকার্যং (অজ্ঞানের ফল অহঙ্কারাদি) সমূলং (সমূলে) প্রদহেৎ (দগ্ধ করবে)।

সরলার্থ : অজ্ঞানযুক্ত হওয়ার ফলেই তোমার এই দেহাদিরূপ অনাত্মবস্তুতে বন্ধন, বস্তুতঃ তুমি পরমাত্মাই। সেই অনাত্মবস্তুতে সম্বন্ধ স্থাপনের থেকেই এই জন্ম-মরণের সংসার। আত্মা ও অনাত্মা এই দুই-এর বিচার থেকে উদ্ভূত স্বরূপজ্ঞানের বহ্নি অজ্ঞানের কাজ অহঙ্কারাদি সমূলে দগ্ধ করবে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, পরমাত্মাই তোমার স্বরূপ। তুমি অজ্ঞানের মধ্যে পড়ে আছ বলে দেহ ইত্যাদি সব অনাত্মবস্তুতে আমি বুদ্ধি করেছ আর জন্ম-মৃত্যুর সংসারবন্ধনে জড়িয়ে পড়েছ। 'অজ্ঞানযোগাৎ পরমাত্মনঃ-তব হি-অনাত্মবন্ধঃ-ততঃ এব সংসৃতিঃ'; অজ্ঞানযুক্ত হয়েছ বলেই স্বরূপতঃ পরমাত্মা তোমার অনাত্মবস্তুতে বন্ধন, তার থেকেই এই জন্মমৃত্যুর সংসারে যাওয়া-আসা। 'অনাত্মবন্ধনঃ' অর্থাৎ যা আত্মা নয়, জড় পদার্থ, এরকম বস্তুতে বন্ধন। দেহ-মন-বুদ্ধিতে আমি বদ্ধ হয়ে আছি, মানে এগুলিতে 'আমি বুদ্ধি' করছি। এগুলিকে আমার বলে ভাবছি, আর এসবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে মনে করছি আমার বন্ধন দশা হয়েছে। এই দেহাত্মবুদ্ধিই সংসারবন্ধনের কারণ। সংসার মানে যা সরে সরে যাচ্ছে। এ সংসারে সবই অনিত্য, 'আমার' বলে যা ধরতে যাই তাই দেখি কোথায় যেন সরে যায়। তবু আমরা এই দেহের সুখের জন্যে কত আয়োজন করি। আমি কর্তা, সবই তো আমি করছি , যেখানে চোখ দেবো না সেখানেই গণ্ডগোল—এই ভেবে নিজের আমিত্বের পুষ্টিসাধন করছি। এই যে আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ভাব, এটাই অজ্ঞান, এর থেকেই যত বাসনার সৃষ্টি আর সেইসব বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে বারবার ঘুরে ঘুরে আসা। কিন্তু সৎ-চিৎ-আনন্দ আমার স্বরূপ। আমার দেহ ইত্যাদি নিয়ে যে ব্যক্তিসত্তা সেটাকে 'আমি' মনে করছি অবিদ্যার জন্যে, অজ্ঞানের জন্যে, ভুল করে এরকম ভাবছি। এই ভুল আমার ভাঙবে কি করে ? অজ্ঞান যাবে কি করে ? বলছেন, 'তয়োঃ বিবেক-উদিত-বোধবহ্নিঃ অজ্ঞান-কার্যং প্রদহেৎ সমূলম্'। 'তয়োঃ' মানে দু-এর অর্থাৎ আত্মা আর অনাত্মার এই দুই-এর ঠিক ঠিক বিচার থেকে নিজের স্বরূপের বোধ হয়। সেই স্বরূপজ্ঞানরূপ বহ্নি অজ্ঞানের থেকে উৎপন্ন অহঙ্কার ইত্যাদিকে নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেলবে। বলছেন 'প্রদহেৎ সমূলং' মূল পর্যন্ত পুড়িয়ে দেবে। জ্ঞান হলেই তো অজ্ঞান চলে যায়। অজ্ঞানই যদি চলে গেল তো 'অজ্ঞানকার্যং' মানে অজ্ঞানের ফলে যেসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো আর কি করে থাকবে ? সেগুলোর মূল পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

শিষ্য উবাচ

কৃপয়া শ্রূয়তাং স্বামিন্ প্রশ্নোঽয়ং ক্রিয়তে ময়া।
যদুত্তরমহং শ্রুত্বা কৃতার্থঃ স্যাং ভবন্মুখাৎ॥ ৪৮

অন্বয় : শিষ্যঃ উবাচ (শিষ্য বললেন) স্বামিন্ (প্রভু) ময়া (আমার দ্বারা) অয়ং (এই) প্রশ্নঃ (প্রশ্ন) ক্রিয়তে (করা হচ্ছে) কৃপয়া (কৃপা করে) শ্রূয়তাম্ (শুনুন) ভবৎ-মুখাৎ (আপনার মুখ থেকে) যৎ-উত্তরং (যার উত্তর) শ্রুত্বা (শুনে) [অহং (আমি)] কৃতার্থঃ স্যাম্ (কৃতার্থ হব)।

সরলার্থ : শিষ্য বললেন, প্রভু আমি এই প্রশ্ন করছি। কৃপা করে শুনুন। আপনার মুখ থেকে এর উত্তর পেলে আমি কৃতার্থ হব।

ব্যাখ্যা : এবার শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করছেন। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে গুরুকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে বলছেন, আমার মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, প্রভু, সেটা আপনাকে বলছি। আপনি কৃপা করে একটু শুনুন। আপনার মুখ থেকে এর উত্তর পেলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাব।

কো নাম বন্ধঃ কথমেষ আগতঃ
কথং প্রতিষ্ঠাঽস্য কথং বিমোক্ষঃ।
কোঽসাবনাত্মা পরমঃ ক আত্মা
তয়োর্বিবেকঃ কথমেতদুচ্যতাম্॥ ৪৯

অন্বয় : বন্ধঃ নাম (বন্ধন) কঃ (কী) এষঃ (এ) কথম্ (কি করে) আগতঃ (এলো) অস্য (এর) কথম্ (কি রকম) প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) কথম্ (কি করে) বিমোক্ষঃ (মুক্তি হয়) অসৌ (এই) অনাত্মা (অনাত্মা) কঃ (কি) কঃ পরমঃ আত্মা (পরমাত্মাই বা কি) তয়ো (এই দুই-এর [আত্মা ও অনাত্মার]) বিবেকঃ (বিচার) কথম্ (কি ভাবে ঠিকমত হয়) এতৎ-উচ্যতাম্ (এটা বলুন)।

সরলার্থ : বন্ধন কি ? এ এলো কি করে ? এর কি রকম স্থিতি ? কি করলে মুক্তি হয় ? এই অনাত্মা কি ? পরমাত্মাই বা কি ? এই দুই-এর অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার ঠিক ঠিক বিচার কি ভাবে হয় ? দয়া করে এগুলি বলুন।

ব্যাখ্যা : শিষ্য যে প্রশ্নগুলো করেছেন সেগুলো আমাদের সকলের প্রশ্ন এবং চিরকালের প্রশ্ন। বলছেন, 'কঃ নাম বন্ধঃ ? কথম্ এষঃ আগতঃ ?' বন্ধন কাকে বলে ? কি করেই বা এটা এলো ? সত্যিই তো, বন্ধন, সংসারবন্ধন, এসব আমরা বলি কিন্তু ঠিক কেন যে বন্ধন, কোন্ অবস্থাটা বদ্ধ অবস্থা সেটা কি আমরা বুঝে বলি ? বলি না। আর এই বন্ধন কি করে এলো ? শ্রুতি বলেছেন, মুক্ত আমরা হয়েই আছি, আমাদের স্বভাবেই আমরা মুক্ত। তাহলে বন্ধন কি করে এলো ? তারপর বন্ধন যদি এসেই থাকে তো তার স্থায়িত্ব কিরকম ? মোক্ষের কথা শোনা যায় কিন্তু মুক্তি কি করে হয় ? 'তয়োঃ বিবেকঃ কথম্' ?

অর্থাৎ আত্মা-অনাত্মার বিচার কি ভাবে ঠিক ঠিক হয় ? দয়া করে এগুলি বলুন।

শ্রীগুরুরুবাচ

ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি পাবিতং তে কুলং ত্বয়া।
যদবিদ্যাবন্ধমুক্ত্যা ব্রহ্মীভবিতুমিচ্ছসি॥ ৫০

অন্বয় : শ্রীগুরুঃ উবাচ (শ্রীগুরু বললেন) ধন্যঃ অসি (ধন্য হও) কৃতকৃত্যঃ অসি (কৃতকৃত্য হও) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) তে (তোমার) কুলং (কুল) পাবিতং (পবিত্র হয়েছে) যৎ (কারণ) অবিদ্যাবন্ধমুক্ত্যা (অবিদ্যাবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে) ব্রহ্মীভবিতুম্ (ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির জন্যে) ইচ্ছসি (ইচ্ছা করছ)।

সরলার্থ : শ্রীগুরু বললেন, তুমি ধন্য, তুমি কৃতকৃত্য, তোমার দ্বারা তোমার কুল পবিত্র হয়েছে। কারণ তুমি অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভাব পেতে চেয়েছ।

ব্যাখ্যা : শিষ্যের প্রশ্ন শুনে গুরু খুশি হয়েছেন। বলছেন, তুমি ধন্য, কৃতকৃত্য। তোমাকে দিয়ে তোমার কুল পবিত্র হয়েছে। কারণ তুমি ব্রহ্মভাব পেতে চেয়েছ। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যে ঐকান্তিক ব্যাকুলতা খুব কম মানুষেরই হয়। শিষ্যের মধ্যে সেই ব্যাকুলতা গুরু দেখতে পেয়েছেন। আর তার প্রশ্নগুলো শুনে গুরু বুঝেছেন যে এর বুদ্ধি ভাসা ভাসা নয়, গভীরে প্রবেশ করতে চায় এ। যা জানার তা সম্পূর্ণভাবে জানতে পারলে তবে এর তৃপ্তি। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে যে শুদ্ধবুদ্ধি প্রয়োজন, সেই বুদ্ধির এগুলোই লক্ষণ। তাই আদর করে গুরু বলছেন, তোমার মধ্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জেগেছে, তুমি ধন্য, তোমার কুল পবিত্র।

ঋণমোচনকর্তারঃ পিতুঃ সুতাদয়ঃ।
বন্ধোমোচনকর্তা তু স্বস্মাদন্যো ন কশ্চন॥ ৫১

অন্বয় : পিতুঃ (পিতার) ঋণমোচনকর্তারঃ (ঋণপরিশোধের কর্তা রূপে) সুতাদয়ঃ (পুত্রাদি) সন্তি (থাকেন) তু (কিন্তু) বন্ধমোচনকর্তা (অবিদ্যাজনিত বন্ধন মোচনের কর্তা) স্বস্মাৎ অন্যঃ (নিজের থেকে অন্য) কঃ-চন ন (কেউ নেই)।

সরলার্থ : পিতাকে ঋণমুক্ত করার জন্য পুত্রেরা থাকে, কিন্তু নিজেকে অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে নিজে ছাড়া আর কেউ পারে না।

ব্যাখ্যা : শিষ্যের প্রথম প্রশ্ন ছিল, বন্ধন কি ? এ কোথা থেকে কি করে এলো ? তার পরের প্রশ্ন ছিল, মুক্তি কি করে হয় ? গুরু এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরই এখন

দিচ্ছেন। কারণ বন্ধন যে কি সেটা বন্ধন মোচনের উপায়ের কথা জানলেই বোঝা যায়। আর বন্ধন কি করে এলো, কোথা থেকে এলো, এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর হয় না। অবিদ্যা বা মায়ার জন্যেই আমাদের বন্ধন। কিন্তু মায়া যে কি করে এলো এ কেউ বলতে পারে না। স্বামীজী তাঁর 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতায় একথা সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। এখানে বলছেন, 'ঋণমোচনকর্তারঃ পিতুঃ সুত-আদয়ঃ'; পিতার ঋণ ছেলেরা মোচন করতে পারে, কিন্তু 'বন্ধোমোচনকর্তা তু স্বস্মাদ্-অন্যঃ ন কশ্চন'; কিন্তু অবিদ্যাজনিত যে সংসারবন্ধন সেটা নিজে ছাড়া অন্য কেউ কখনও ছিন্ন করতে পারে না। নিজের স্বরূপজ্ঞান যখন হয় তখনই অবিদ্যার নাশ হয়, সংসারবন্ধনও চলে যায়। কিন্তু আত্মজ্ঞান তো অপরোক্ষ অনুভূতির জিনিস। এ কি করে অপরকে দিয়ে হবে ? শাস্ত্র পড়ে, গুরুর কাছে গিয়ে আমি বড়জোর বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি যে এ সংসার অনিত্য, একে আঁকড়ে ধরতে নেই, সৎ-চিৎ-আনন্দই আমার স্বরূপ, ইত্যাদি। কিন্তু এই অনুভব তো আমাকেই অর্জন করতে হবে, অন্য কেউ করিয়ে দিতে পারবে না। তাই বলছেন, মোক্ষ লাভ করতে হলে তোমাকেই সাধনা করতে হবে, তোমার হয়ে আর কেউ এ করে দিতে পারবে না।

মস্তকন্যস্তভারাদের্দুঃখমন্যৈর্নিবার্যতে।
ক্ষুধাদিকৃতদুঃখংতু বিনা স্বেন ন কেনচিৎ॥ ৫২

অন্বয় : মস্তকন্যস্ত-ভারাদেঃ (মস্তকে স্থাপিত ভার ইত্যাদির) দুঃখম্ (কষ্ট) অন্যৈঃ (অপরের দ্বারা) নিবার্যতে (নিবারণ করা যেতে পারে) তু (কিন্তু) ক্ষুধাদিকৃত-দুঃখম্ (ক্ষুদ্-পিপাসা ইত্যাদির কারণে যে দুঃখ) স্বেন বিনা কেনচিৎ (নিজে ছাড়া আর কারোর দ্বারা) ন নিবার্যতে (নিবারিত হয় না)।

সরলার্থ : মাথার ওপরে চাপানো ভার বহন করার কষ্ট অপরের দ্বারা নিবারণ করা যায় কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদির যে কষ্ট তা নিজে ছাড়া আর কেউ নিবারণ করতে পারে না।

ব্যাখ্যা : একই কথা একটা সুন্দর উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন। বলছেন, মাথায় যদি একটা মস্ত বোঝা চাপানো হয় তাহলে সে কষ্টের লাঘব অন্য কেউ করে দিতে পারে, মাথা থেকে বোঝাটা নাবিয়ে নিয়ে বা কিছুটা হালকা করে দিয়ে। কিন্তু যখন খিদে-তেষ্টায় কষ্ট পাই তখন তো সেই কষ্ট নিবারণ করার জন্যে আমাকেই খেতে হবে, আমাকেই জলপান করতে হবে। তেমনি আমি সেই পরমাত্মা, জ্যোতিস্বরূপ তিনি আমার হৃদয় উজ্জ্বল করে বিরাজ করছেন, আবার সকলের মধ্যেও তেমনিভাবেই আছেন—এই সত্যটা আমাকেই উপলব্ধি করতে হবে। এ না হলে আমার আত্মজ্ঞান লাভ হবে না, বন্ধন কাটবে না। বলছেন, 'মস্তকন্যস্তভারাদের্দুঃখম্-অন্যৈঃ-নিবার্যতে', মাথার ওপর

যে ভার চাপানো হয়েছে সে দুঃখের নিবারণ অন্য আর একজন করতে পারে কিন্তু 'ক্ষুধাদিকৃতদুঃখঃ বিনা স্বেন ন কেনচিৎ', ক্ষুধাতৃষ্ণার যে কষ্ট তার নিবারণ নিজের দ্বারা ছাড়া অন্য কারও দ্বারা হবার নয়। তেমনি আত্মজ্ঞান নিজেকেই লাভ করতে হবে।

পথ্যমৌষধসেবা চ ক্রিয়তে যেন রোগিণা।
আরোগ্যসিদ্ধির্দৃষ্টাস্য নান্যানুষ্ঠিত কর্মণা॥ ৫৩

অন্বয় : যেন রোগিণা (যে রোগীর দ্বারা) ঔষধসেবা চ পথ্যং ক্রিয়তে (ঔষধ সেবন ও পথ্য গৃহীত হয়) অস্য (তার) আরোগ্যসিদ্ধিঃ দৃষ্টা (আরোগ্য সিদ্ধ হতে দেখা যায়) অন্য-অনুষ্ঠিত কর্মণা ন (অন্যের দ্বারা এইসব কর্মের অনুষ্ঠান হয় না)।

সরলার্থ : যে রোগী ঔষধসেবন ও পথ্যগ্রহণ কর্মগুলি করে তার আরোগ্য লাভ হতে দেখা যায়। অন্য কোনও একজন এই কাজগুলো করলে রোগীর আরোগ্য লাভ হয় না।

ব্যাখ্যা : আর একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন যে আত্মজ্ঞান নিজেকেই লাভ করতে হয়। অন্য কেউ সেটা করে দিতে পারে না। বলছেন, 'পথ্যম্-ঔষধ-সেবা চ ক্রিয়তে যেন রোগিণা আরোগ্য সিদ্ধিঃ দৃষ্টা-অস্য'; যে রোগী ঔষধ সেবন ও পথ্য গ্রহণ করে তারই আরোগ্য লাভ হতে দেখা যায়। 'ন অন্য-অনুষ্ঠিত কর্মণা'; এই কাজগুলি অন্য কেউ করলে তা হয় না। তার হয়ে অন্য কেউ ওষুধ খেলে ও পথ্য করলে তার রোগ সারে না। যার অসুখ করেছে তাকেই ওষুধ খেতে হবে, পথ্যগ্রহণ করতে হবে। তেমনি জ্ঞান হলেই অজ্ঞান চলে যাবে। কিন্তু অন্য আর একজনের জ্ঞান হলে আমার অজ্ঞান যাবে না। আমারই জ্ঞান হতে হবে। ভবব্যাধিতে আমিই ভুগছি। স্বরূপ জ্ঞান না হলে আমার রোগমুক্তি হবে না। আর আমাকেই তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। অন্য কারও স্বরূপজ্ঞান হলে আমার অজ্ঞান কাটবে না। যেমন অন্য একজন ওষুধ খেলে আমার রোগ সারে না।

বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা
স্বেনৈব বেদ্যং ন তু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব
জ্ঞাতব্যমন্যৈরবগম্যতে কিম্॥ ৫৪

অন্বয় : বস্তুস্বরূপং (আত্মবস্তুর স্বরূপ) স্ফুটবোধচক্ষুষা (উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে) স্বেন এব (নিজের দ্বারাই) বেদ্যম্ (জ্ঞাতব্য) পণ্ডিতেন তু ন (পণ্ডিতের দ্বারা কিন্তু নয়) চন্দ্রস্বরূপং (চন্দ্রের স্বরূপ) নিজ চক্ষুষা এব (নিজের চক্ষুর দ্বারাই) জ্ঞাতব্যম্ (জানতে হবে) অন্যৈঃ (অপরের দ্বারা) কিম্ (কী) অবগম্যতে (জানা যাবে) ?

সরলার্থ : আত্মার স্বরূপ উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা অর্থাৎ সংশয়হীন শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা নিজেকেই জানতে হবে। কোনও পণ্ডিত জানলে কিন্তু হবে না। চন্দ্রের স্বরূপ নিজের চোখেই দেখতে হয়, জানতে হয়, অন্য কারোর চোখ দিয়ে দেখলে কি আর জানা যাবে ?

ব্যাখ্যা : বলছেন, চন্দ্রের সৌন্দর্য নিজের চোখে দেখেই অনুভব করতে হয়। অপরে কি দেখল তা জেনে সেই সৌন্দর্য বোঝা যায় না। তেমনি আত্মস্বরূপের জ্ঞান আমার নিজেরই হতে হবে, কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির আত্মজ্ঞান হলে তার থেকে আমার তো আর মুক্তি হবে না। 'বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধ চক্ষুষা স্বেন-এব বেদ্যং'। বস্তুর স্বরূপ মানে কি ? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। আত্মাই বস্তু আর সব অবস্তু। বস্তুস্বরূপ মানে আত্মস্বরূপ। আমার স্বরূপকে নিজের চেষ্টার দ্বারাই জানতে হবে। কি করে জানা যাবে ? না, 'স্ফুটবোধচক্ষুষা'। 'বোধচক্ষু' মানে জ্ঞানচক্ষু। 'স্ফুটবোধচক্ষুষা', যে জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে সেই উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দর্শন করলে নিজের স্বরূপ-দর্শন হবে, আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হবে। 'ন তু পণ্ডিতেন', কিন্তু পণ্ডিতের দ্বারা নয়। কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির আত্মদর্শন হতে পারে কিন্তু তাতে আমার কিছু লাভ নেই, আমার তাতে আত্মজ্ঞান বা মুক্তি হবে না। 'চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব জ্ঞাতব্যম্-অন্যৈঃ অবগম্যতে কিম্' ? চন্দ্রের যে অপার সৌন্দর্য সে তো নিজের চোখে দেখেই অনুভব করতে হবে, অন্যে দেখে কি অনুভব করল তাতে আমার কি ? একটা কথাই বারবার বলছেন মনে গেঁথে দেবার জন্যে। তা হলো : তোমার মুক্তির উপায় তোমার নিজের হাতে। তার জন্যে তোমাকেই সাধন করতে হবে। অন্য কেউ তোমায় মুক্তি পাইয়ে দিতে পারে না।

অবিদ্যাকামকর্মাদিপাশবন্ধং বিমোচিতুম্।
কঃ শক্নুয়াদ্বিনাত্মানং কল্পকোটিশতৈরপি॥ ৫৫

অন্বয় : আত্মানং বিনা (নিজে ছাড়া) কল্পকোটিশতৈঃ অপি (শতকোটি কল্পেও) অবিদ্যা-কাম-কর্মাদি-পাশবন্ধং (অবিদ্যাজনিত কামকর্মাদি-রূপ রজ্জুর বন্ধন থেকে) বিমোচিতুং (বিমুক্ত করতে) কঃ শক্নুয়াৎ (কে সমর্থ হয়) ?

সরলার্থ : নিজে ছাড়া অবিদ্যাজনিত কামকর্মাদিরূপ পাশবন্ধন মোচন করতে শতকোটি কল্পেও কে সমর্থ হয় ?

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অবিদ্যাকামকর্মাদি পাশবন্ধং বিমোচিতুম কঃ শক্নুয়াৎ বিনা আত্মানং'? 'অবিদ্যা-কাম-কর্মাদি-পাশবন্ধং', অবিদ্যা, অজ্ঞান, এর জন্যেই আমার স্বরূপ আমার কাছে ঢাকা পড়ে আছে। এই অবিদ্যা থেকেই কামনা-বাসনার সৃষ্টি আর সেইসব বাসনা পূরণের জন্যে আমার যত কর্ম। আনন্দের খনি আছে অন্তরে,

তার সন্ধান না করে ছোট ছোট ক্ষণিক সুখের আশায় অবিরাম কাজ করে চলেছি। ভালো কাজও করছি আবার হয়তো মন্দ কাজও করছি আর সেইসব কর্মের ফল ভোগ করছি। কিছু কিছু কর্মের ফল এ জন্মেই ভোগ করছি আবার কিছু তোলা থাকছে পরের পরের জন্মে ভোগের জন্যে। এই দেহে হয়তো আমার সব বাসনা চরিতার্থ হলো না, তখন সেইসব অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করার জন্যে আবার শরীর গ্রহণ করছি, জন্মাচ্ছি আবার মরে যাচ্ছি আবার জন্মাচ্ছি। কে যেন পাশবদ্ধ করে জন্মমৃত্যুর এই চক্রে আমাদের ঘুরিয়ে মারছে। 'পাশ' মানে ফাঁস। বলছেন, এই 'পাশবন্ধং বিমোচিতুম কঃ শক্নুয়াৎ বিনা আত্মানং'? নিজে ছাড়া এই পাশবন্ধনের মোচন আর কে করতে পারে ? আর কেউ পারবে না। শতকোটিকল্প ধরে চেষ্টা করলেও পারবে না। কল্প হচ্ছে ব্রহ্মার এক দিন। একটা সৃষ্টির আরম্ভ থেকে প্রলয় পর্যন্ত সময়। এই রকম শত কল্পেও তোমার বন্ধন কেউ ঘোচাতে পারবে না, যদি না তুমি নিজে চেষ্টা কর। তুমি নিজে চেষ্টা করলেই শুধু তোমার অবিদ্যা চলে যেতে পারে। অবিদ্যা চলে গেলে তোমার বন্ধন খসে পড়বে, তুমি আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করবে।

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্মণা নো ন বিদ্যয়া।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধেন মোক্ষঃ সিধ্যতি নান্যথা॥ ৫৬

অন্বয় : যোগেন ন (অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা নয়) সাংখ্যেন ন (সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ববিচারের দ্বারাও নয়) কর্মণা নো (শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারাও নয়) বিদ্যয়া ন (শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারাও নয়) ব্রহ্ম-আত্মা-একত্ব-বোধেন (ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বোধের দ্বারাই) মোক্ষঃ সিধ্যতি (মোক্ষ সিদ্ধ হয়) ন অন্যথা (অন্য কোনও উপায়ে হয় না)।

সরলার্থ : অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্যের তত্ত্ববিচার, অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম, শাস্ত্র অধ্যয়ন, এসবের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বের বোধেই মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব হয়, অন্য কোনও উপায়ে হয় না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্মণা নো ন বিদ্যয়া'; যোগাভ্যাস, সাংখ্যের তত্ত্ববিচার, বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান বা শাস্ত্রবিদ্যা, এসবের থেকে মোক্ষলাভ হয় না। যোগ বলতে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলছেন। এই আটটি অঙ্গ হচ্ছে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। 'যম' হচ্ছে সংযম। এর মধ্যে পড়ে অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, অনপহরণ, ব্রহ্মচর্য ও অপ্রতিগ্রহ। 'নিয়ম' বলতে বোঝায় বাইরের ও ভেতরের শুচিতা, বহির্শুদ্ধি ও অন্তর্শুদ্ধি। অন্তর্শুদ্ধি বলতে বোঝায় সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরে শরণাগতি। তারপর আসন ও প্রাণায়াম। প্রাণায়াম মানে প্রাণের নিয়ন্ত্রণ। তারপর 'প্রত্যাহার', ইন্দ্রিয়গুলোকে বাইরের থেকে ফিরিয়ে অন্তর্মুখী করা।

'ধারণা' হচ্ছে মনকে কোনও বিশেষ লক্ষ্যে স্থির করা। তারপর ধ্যান ও সমাধি। এই হল অষ্টাঙ্গিক যোগ-সাধনা। আর সাংখ্যের মত কি ? সাংখ্য মতে জড় প্রকৃতি ও শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ এই দু-এর তত্ত্ব বিচারের দ্বারা দুঃখময় সংসার থেকে মুক্তি হয়। আর 'কর্ম' বলতে যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি বৈদিক কর্মের কথা বলছেন। শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ কর্মের বিশেষ বিশেষ ফলের কথা বলা আছে, সেগুলোর অনুষ্ঠান করলে সেই সব ফল লাভ হয়। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের মতে এইসব যোগ, সাংখ্য, বৈদিক কর্ম বা শাস্ত্রবিদ্যা—এদের কোনটাই মুক্তি দিতে পারে না। 'ব্রহ্ম-আত্মা-একত্ব-বোধেন মোক্ষঃ সিধ্যতি নান্যথা'; ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বোধের দ্বারাই মুক্তি সিদ্ধ হয়, অন্য কোনও উপায়ে হয় না। আমার আত্মা আর ব্রহ্ম এক, এই উপলব্ধি হলে তবে সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি হয় তাছাড়া হয় না। আমার বন্ধনের কারণ তো এই দেহকেন্দ্রিক আমিত্ব বুদ্ধি। সেটা তখনই বিনষ্ট হয় যখন আমি অনুভব করতে থাকি যে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই আমি। তখনই আমার মুক্তি হয়।

বীণায়া রূপসৌন্দর্যং তন্ত্রীবাদনসৌষ্ঠবম্।
প্রজারঞ্জনমাত্রং তন্ন সাম্রাজ্যায় কল্পতে॥ ৫৭

অন্বয় : বীণায়াঃ (বীণার) রূপসৌন্দর্যং (রূপের সৌন্দর্য) তন্ত্রীবাদন-সৌষ্ঠবং (তারগুলোকে বাজানোর কুশলতা) প্রজারঞ্জনমাত্রম্ (সংগীত অনুরাগীদের মনোরঞ্জন করতে পারে) তৎ সাম্রাজ্যায় (সেটা সাম্রাজ্যলাভের জন্যে) ন কল্পতে (কল্পনাতেও যথেষ্ট নয়)।

সরলার্থ : বীণার অপরূপ সৌন্দর্য ও তারগুলোকে সুরে বাজানোর কুশলতা সঙ্গীত অনুরাগী শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে পারে কিন্তু এসবের দ্বারা সাম্রাজ্য লাভের কল্পনাও করা যায় না।

ব্যাখ্যা : বলা হয়, 'রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ'। অর্থাৎ তিনিই রাজা যিনি প্রজারঞ্জন করেন। তার মানে কিন্তু এই নয় যে অনেক মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারলেই রাজা হওয়া যায়। রাজা হতে গেলে সাম্রাজ্য লাভ করতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলছেন : সুদৃশ্য একটি বীণা নিয়ে কুশল শিল্পী তার তন্ত্রীগুলোতে অপূর্ব সুরের ঝঙ্কার তুলে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে পারেন কিন্তু এই 'তন্ত্রীবাদনসৌষ্ঠবং' তাঁকে রাজপদের অধিকারী করে না। সেইরকমই আত্মজ্ঞান লাভ করতে না পারলে মোক্ষ লাভও হয় না। শাস্ত্রচর্চা, যোগসাধনা, বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান বা উপাসনার দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে না। এগুলোর দ্বারা মনকে নানা রঙে রাঙাতে পারা যায় কিন্তু 'আমিই ব্রহ্ম', এই অপরোক্ষ অনুভূতি ছাড়া মুক্তি সাম্রাজ্যের অধিকার জন্মায় না।

বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্‌বদ্‌ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে।। ৫৮

অন্বয় : বৈখরী বাক্ (ভাষায় অভিজ্ঞতা) শব্দঝরী (শব্দপ্রয়োগের কুশলতা) শাস্ত্রব্যাখ্যান-কৌশলম্ (শাস্ত্রব্যাখ্যায় চাতুর্য), তৎ-বৎ (আর এই প্রকার) বৈদুষ্য (পাণ্ডিত্য) বিদুষাং (লৌকিক বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণের) ভুক্তয়ে (ভোগের উপকরণ লাভের জন্যে) তু (কিন্তু) মুক্তয়ে ন (মুক্তির জন্যে নয়)।

সরলার্থ : ভাষার অভিজ্ঞতা, শব্দচয়নের দক্ষতা, মনোজ্ঞ করে শাস্ত্রব্যাখ্যার ক্ষমতা এবং কাব্য-অলঙ্কার ইত্যাদিতে পাণ্ডিত্য বিদ্বান ব্যক্তিদের ভোগের জন্যেই কাজে লাগে, মুক্তিলাভের জন্যে এগুলো কোনো কাজে আসে না।

ব্যাখ্যা : অনেক পণ্ডিত খুব ভালো ভালো শব্দ ব্যবহার করে কথার জাল বিস্তার করে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, খুব পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁদের এ শাস্ত্রজ্ঞান 'ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে', ভোগের জন্যে, মুক্তি লাভের জন্যে নয়। বলছেন, 'বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যান কৌশলম্'; 'বাগ্‌বৈখরী'—বাক্যের চার রকমের বিভাগ করা হয়। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। পরা বাক্ অতি সূক্ষ্ম, মূলাধার চক্রের বায়ু থেকে এর উৎপত্তি, এ শোনা যায় না। পশ্যন্তী বাক্ নাভিচক্রের বায়ু থেকে আসে, এই শব্দ শুধু যোগীরা শুনতে পান। মধ্যমা বাক্ হৃৎচক্রের বায়ু থেকে ওঠে, অতি সূক্ষ্ম শব্দ। এও সকলে শুনতে পায় না। আর বৈখরী কি ? যেসব কথা মানুষ জোরে জোরে বলে, তৎপরতার সঙ্গে উচ্চারণ করে আর সকলের শ্রুতিগোচর হয়। গলার স্বর উঠিয়ে-নাবিয়ে কথার জাল বিস্তার করে অনেক বক্তা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এ হল বৈখরী। 'শব্দঝরী' অর্থাৎ খুব ধ্বনিমাধুর্য আছে এই ভাবে শব্দ চয়ন করা। 'শাস্ত্রব্যাখ্যান কৌশলম্'—শাস্ত্র ব্যাখ্যায় কৌশল দেখাচ্ছেন, খুব পাণ্ডিত্য সহকারে শাস্ত্রব্যাখ্যা করছেন। 'তৎ বৎ বৈদুষ্যং বিদুষাং ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে', এইরকম পাণ্ডিত্য যে সব বিদ্বান ব্যক্তিদের, তাদের বিদ্যা 'ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে', নিজের ভোগের জন্যে, মুক্তির জন্যে নয়। 'ভুক্তয়ে' বলতে বোঝাচ্ছেন যে তার শাস্ত্রব্যাখ্যার চমৎকারিত্ব দেখে সবাই হয়তো খুব বাহবা দেবে আর সে সেটা উপভোগ করবে। আবার অনেকে হয়তো নানা জায়গায় শাস্ত্রব্যাখ্যা করার জন্যে তাকে ডেকে নিয়ে যাবে এবং তাকে অর্থও দেবে। এইসব ভোগগুলো তার হবে ঠিকই, কিন্তু মুক্তি হবে না।

অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তুনিষ্ফলা।
বিজ্ঞাতেঽপি পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা।। ৫৯

অন্বয় : পরে তত্ত্বে অবিজ্ঞাতে (পর-তত্ত্ব অবিজ্ঞাত থাকলে) তু (নিশ্চয়) শাস্ত্রাধীতিঃ

(শাস্ত্র অধ্যয়ন) নিষ্ফলা (বিফল হয়) পরে তত্ত্বে বিজ্ঞাতে-অপি (পরতত্ত্বের জ্ঞান হলেও) শাস্ত্রাধীতিঃ-তু নিষ্ফলা (শাস্ত্র অধ্যয়ন নিষ্প্রয়োজনই হয়ে যায়)।

সরলার্থ : পরতত্ত্ব অবিজ্ঞাত থাকলে শাস্ত্রপাঠ নিষ্ফল হয়। আবার পরতত্ত্বের জ্ঞান হলে শাস্ত্রপাঠের আর প্রয়োজন থাকে না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিঃ-তু নিষ্ফলা'; 'পরে তত্ত্বে', পরম তত্ত্ব, শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। 'তত্ত্ব' কাকে বলি ? যিনি বাক্যমনাতীত, যাঁকে বোঝাতে পারি না বলে 'তৎ' বলি, তাঁর জ্ঞান। শাস্ত্র পড়ে তাঁর সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। আমরা বুঝি যে তাঁকে জানাই জীবনের উদ্দেশ্য। পরব্রহ্মকে নিজের স্বরূপ বলে উপলব্ধি করাই জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উপলব্ধিটা শাস্ত্র করিয়ে দিতে পারে না, সেটা আমাকেই সাধনা করে করতে হবে। তাই বলছেন, পরতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা যদি ঐ বুদ্ধির স্তরেই থেমে থাকে তবে তোমার শাস্ত্রপাঠ নিষ্ফল। 'পর তত্ত্ব' জানার জন্যেই তো শাস্ত্র পড়ি, সেই 'তত্ত্ব' যদি অবিজ্ঞাতই থেকে যায় তাহলে 'শাস্ত্রাধীতিঃ-তু নিষ্ফলা', শাস্ত্রপাঠ নিষ্ফল। আর যখন আমার অপরোক্ষ অনুভূতি হয়, যখন সেই 'পরম তত্ত্ব' অনুভব করে ফেলেছি তখনও শাস্ত্রপাঠ নিষ্ফল। কারণ তখন আর আমার শাস্ত্র পড়ে তাঁকে জানার কোনও দরকার নেই। তখন আমি নিজের অনুভূতি থেকেই বুঝতে পারি 'বেদাহং এতৎ পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসো পরস্তাৎ', আমি সেই সূর্যের মতো জ্যোতিষ্মান মহান্ পুরুষকে জেনেছি, সমস্ত অন্ধকারের পারে তিনি আছেন। তখন শাস্ত্রপাঠ নিষ্প্রয়োজন হয়ে গেছে।

শব্‌দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।
অতঃ প্রযত্নাজ্জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাৎ তত্ত্বমাত্মনঃ।। ৬০

অন্বয় : শব্‌দজালং (শাস্ত্র বহু আর সেগুলিতে শব্দের বিন্যাস শব্দজালের তুল্য) মহা-অরণ্যম্ (যেন একটা মহা অরণ্য) চিত্তভ্রমণ-কারণম্ (পথ হারিয়ে চিত্তের এলোমেলো ঘোরার কারণ) অতঃ (অতএব) তত্ত্বজ্ঞাৎ (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে) প্রযত্নাৎ (পরম যত্নে) আত্মনঃ তত্ত্বং (আত্মার তত্ত্ব) জ্ঞাতব্যং (জানা কর্তব্য)।

সরলার্থ : বহু শাস্ত্রে অনেক শব্দের প্রয়োগ যেন শব্দজালের সৃষ্টি করে। এ একটা মহা অরণ্যের মতো, এর মধ্যে প্রবেশ করলে চিত্তে বিভ্রান্তি আসে আর বিপথে চলে যাবার কারণ ঘটে। সেইজন্যে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে পরম যত্নে আত্মস্বরূপের তত্ত্ব জানা কর্তব্য।

ব্যাখ্যা : আমাদের শাস্ত্রই বলে দিচ্ছে বেশি শাস্ত্র পড়ার বিপদের কথা। বলছেন, 'শব্‌দজালং মহা-অরণ্যম্ চিত্তভ্রমণকারণম্'। অনেক শাস্ত্র আর সেইসব শাস্ত্রের বাক্যবিস্তার যেন শব্দের জাল। একই শব্দের একাধিক অর্থ হয়। সেইসব অর্থ নির্ণয়

করতে বসলে শব্দের জালেই আটকে পড়তে হয়। বলছেন, এই শব্দজাল হলো 'মহারণ্যম্', একটা যেন গহন অরণ্য, এর মধ্যে প্রবেশ করলে মন-বুদ্ধি সব পথ না পেয়ে ঘুরতে থাকে। শাস্ত্রের কচকচি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। লক্ষ্যটা হারিয়ে যায়। 'চিত্তভ্রমণ কারণম্', দুর্ভেদ্য জঙ্গলে যেমন পথ না জানলে ইতস্তত বিচরণ করতে হয়, বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না, তেমনি বহু শাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকলে শব্দজালের মধ্যেই আটকে থাকতে হয়। মন-বুদ্ধি সেই শব্দার্থ বুঝতেই ব্যস্ত থাকে, মর্মার্থর দিকে যায় না, আত্মতত্ত্ব বিচারের দিকে যায় না। অতএব 'প্রযত্নাৎ-জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাৎ তত্ত্বম্-আত্মনঃ', খুব যত্নে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যে চেষ্টা করতে হবে। আত্মার স্বরূপকে জানতে হবে। কার কাছ থেকে ? 'তত্ত্বজ্ঞাৎ'—যিনি নিজে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাভের পথ জেনে নিতে হবে।

অজ্ঞানসর্পদষ্টস্য ব্রহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা।
কিমু বেদৈশ্চ শাস্ত্রৈশ্চ কিমু মন্ত্রৈঃ কিমৌষধৈঃ॥ ৬১

অন্বয় : অজ্ঞানসর্পদষ্টস্য (অজ্ঞানরূপ সর্পের দংশনে যে দষ্ট) ব্রহ্মজ্ঞান-ঔষধং বিনা (ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ঔষধ ব্যতীত) বেদৈঃ শাস্ত্রৈঃ চ (বেদের দ্বারা বা শাস্ত্রের দ্বারা) কিমু (কি ফল হয়) চ মন্ত্রৈঃ ঔষধৈঃ কিম্ (মন্ত্র বা ঔষধেই বা কি হয়) ?

সরলার্থ : অজ্ঞানরূপ সর্পদংশনে যে দষ্ট হয়েছে তার ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া আর কি ওষুধ থাকতে পারে ? বেদ বা শাস্ত্রে কি ফল হতে পারে ? মন্ত্র বা ওষুধেই বা কি হয় ?

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অজ্ঞানসর্পদষ্টস্য ব্রহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা কিমু বেদৈঃ-চ শাস্ত্রৈঃ-চ কিমু' ? অজ্ঞান-সর্প যেখানে দংশন করেছে, ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া আর কোন্ ওষুধে কাজ হবে ? জ্ঞান হলে তবে তো অজ্ঞান যাবে। যদি বেদ-পাঠ করি বা শাস্ত্রবিচার করি তাহলে কি আমার জ্ঞান হবে ? না, তা হবে না। মন্ত্র উচ্চারণেও অজ্ঞানের বিষ যাবার নয়। এই অজ্ঞান কবে এলো, কেন এলো, কোথা থেকে এলো, এ কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এটা বলা যায় যে এ অজ্ঞানের অন্ত আছে। জ্ঞান হলেই অজ্ঞানের অন্ত হবে। জ্ঞান মানে ব্রহ্মজ্ঞান। বেদপাঠ, শাস্ত্রপাঠ বা মন্ত্র উচ্চারণ আমার চিত্তশুদ্ধির জন্যে কাজে লাগতে পারে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান না হলে অজ্ঞান যায় না। তাই বলছেন 'মন্ত্রৈঃ কিম্ ঔষধৈঃ', মন্ত্র বা ওষুধেই বা কি হবে ? বেদপাঠ, শাস্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ এসব কিন্তু বর্জন করার কথা কেউ বলছে না। এগুলোর প্রয়োজন আছে মনের মালিন্য দূর করার জন্যে। কিন্তু এগুলি সরাসরি অজ্ঞান দূর করতে পারে না। অজ্ঞানের একমাত্র ওষুধ ব্রহ্মজ্ঞান।

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ।
বিনাঽপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে॥ ৬২

অন্বয় : পানং বিনা (পান বিনা) ঔষধশব্দতঃ (ঔষধ শব্দ উচ্চারণের দ্বারা) ব্যাধিঃ (রোগ) ন গচ্ছতি (যায় না) অপরোক্ষানুভবং বিনা (অপরোক্ষ অনুভব ছাড়া) ব্রহ্ম শব্দৈঃ (ব্রহ্ম শব্দের উচ্চারণের দ্বারা) ন মুচ্যতে ([জীব] মুক্ত হয় না)।

সরলার্থ : ওষুধ না খেয়ে শুধু ওষুধ কথাটা উচ্চারণ করলে কোনও রোগ সারে না। তেমনি অপরোক্ষ অনুভূতি যদি না হয় তাহলে শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম করলে মুক্তি হয় না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিঃ-ঔষধ-শব্দতঃ'; আমার অসুখ করেছে। কিন্তু আমি ওষুধ খাচ্ছি না শুধু 'ওষুধ, ওষুধ' বলছি, তাতে কি আমার অসুখ সারবে ? তেমনি 'বিনা-অপরোক্ষ-অনুভবং ব্রহ্মশব্দৈঃ ন মুচ্যতে'; অপরোক্ষ অনুভব না হলে শুধু ব্রহ্ম শব্দ উচ্চারণের দ্বারা কেউ মুক্ত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান অনুভবলব্ধ জ্ঞান, পরের মুখে শুনে বা অনবরত ব্রহ্ম ব্রহ্ম জপ করলে এ জ্ঞান হয় না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়ং আত্মা ব্রহ্ম' এইসব মহাবাক্য বারবার উচ্চারণ করা ভালো, কিন্তু যতক্ষণ না এইসব মহাবাক্যের মর্মার্থ আমি 'করামলকবৎ' উপলব্ধি করছি, ততক্ষণ আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি। হাতের মুঠোয় আমলকী ধরা আছে, এখন সারা পৃথিবী যদি বলে আমার হাতে আমলকী নেই, তাহলেও কিছু যায় আসে না। কারণ আমি তো জানি আমলকী আমার হাতে আছে। এইরকম 'অপরোক্ষ-অনুভব' চাই, তাহলেই ব্রহ্মকে জেনে আমি ব্রহ্মই হয়ে যাব। আর তাহলেই মুক্তি।

অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়মজ্ঞাত্বা তত্ত্বমাত্মনঃ।
ব্রহ্মশব্দৈঃ কুতো মুক্তিরুক্তিমাত্রফলৈর্নৃণাম্॥৬৩

অন্বয় : দৃশ্যবিলয়ম্ অকৃত্বা (দৃশ্যের বিলয় না করে) আত্মনঃ তত্ত্বং অজ্ঞাত্বা (আত্মার স্বরূপতত্ত্ব না জেনে) ব্রহ্ম শব্দৈঃ উক্তিমাত্রফলৈঃ (ব্রহ্মশব্দ উচ্চারণমাত্রের ফলের দ্বারা) নৃণাম্ (মানুষের) কুতঃ মুক্তিঃ (মুক্তি কোথা থেকে হবে) ?

সরলার্থ : দৃশ্য পদার্থ অনিত্য ও মিথ্যা এ না জেনে, আত্মার স্বরূপ অনুভব না করে, শুধু মুখে ব্রহ্ম শব্দ উচ্চারণ করলে মানুষের মুক্তি কি করে হবে ?

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়ম্', দৃশ্যের বিলয় না করে। যা দেখছি তাই 'দৃশ্য'। কি দেখছি ? জগৎ দেখছি, জগতের সব বিষয় দেখছি। কিন্তু এ সবই অনিত্য, পরিবর্তনশীল, মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা, এই বোধ যদি আমার না হয়, জগৎ যদি আমাকে অনবরত আকর্ষণ করে তাহলে ব্রহ্মই যে একমাত্র নিত্যবস্তু এ আমি জানব কি করে ? জানতে পারব না। 'অজ্ঞাত্বা তত্ত্বম্-আত্মনঃ', আত্মতত্ত্ব না জেনে। আত্মতত্ত্বটা কি ? না আমিই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি। সর্বব্যাপী, ব্রহ্মই যে আমার আত্মা, এ যদি আমি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে না জানি তাহলে শুধু ব্রহ্ম শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে

থাকলেই মুক্তি হবেনা। 'ব্রহ্মশব্দৈঃ কুতো মুক্তিঃ উক্তিমাত্রফলৈঃ-নৃণাম্'? শুধু ব্রহ্ম শব্দ উচ্চারণের ফলে মানুষের মুক্তি কি করে হবে ? তা হবে না।

অকৃত্বা শত্রুসংহারমগত্বাঽখিলভূশ্রিয়ম্।
রাজাহমিতি শব্দান্নো রাজা ভবিতুমর্হতি॥ ৬৪

অন্বয় : শত্রুসংহারম্ অকৃত্বা (শত্রুসংহার না করে) অখিলভূশ্রিয়ম্ (বিশ্বজগতের ভূমিলক্ষ্মীকে) অগত্বা (লাভ না করে) অহং রাজা (আমি রাজা) ইতি শব্দাৎ (এই শব্দের হেতু) রাজা ভবিতুম্ (রাজা হবার) নো অর্হতি (যোগ্যতা আসে না)।

সরলার্থ : শত্রু সংহার না করে, বিশ্বজগতের ভূমিলক্ষ্মী লাভ না করে, শুধু 'আমি রাজা' এই কথা বলে রাজা হবার যোগ্যতা হয় না।

ব্যাখ্যা : ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হলে মুক্তি হয় না এই কথাটাই অন্য একটা উপমা দিয়ে বলছেন। বলছেন, রাজা হতে গেলে অখিল ভূখণ্ডের অধিপতি হতে হয়, শত্রু সংহার করতে হয়, রাজশ্রী লাভ করতে হয়। সেসব কিছু নেই অথচ মুখে বলছে 'আমি রাজা', এই শব্দ কি তাকে রাজা হবার যোগ্যতা দেয়? তা কখনও দেয় না। তেমনি আমি যদি সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাই তাহলে প্রথমেই শত্রু-সংহার করতে হবে। এখানে শত্রু হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো। ইন্দ্রিয় জয় করে তারপর ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সম্পদ আমায় লাভ করতে হবে। কিন্তু এসব না করে যদি শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম উচ্চারণ করি তাহলে আমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে না, মুক্তিও হবে না। তাই বলছেন, শত্রু জয় না করে, বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিপতি না হয়ে যেমন 'রাজা-অহম্-ইতি শব্দাদ্-নো রাজা ভবিতুম্ অর্হতি'—'আমি রাজা' এই কথা বারবার বললে রাজা হবার যোগ্যতা আসে না—তেমনি বিনা অনুভবে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বললে ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার একত্ববোধ হয় না।

আপ্তোক্তিং খননং তথোপরি শিলাদ্যুৎকর্ষণং স্বীকৃতিং
নিক্ষেপঃ সমপেক্ষতে ন হি বহিঃ শব্দৈস্তু নির্গচ্ছতি।
তদ্বদ্ব্রহ্মবিদোপদেশমননধ্যানাদিভির্লভ্যতে
মায়াকার্যতিরোহিতং স্বমমলতত্ত্বং ন দুর্যুক্তিভিঃ॥ ৬৫

অন্বয় : নিক্ষেপঃ (ভূগর্ভস্থ সম্পদ) আপ্তোক্তিং (জ্ঞানীব্যক্তির উপদেশ) খনন (ভূমি খনন) তথা (আর) উপরি-শিলাদি-উৎকর্ষণং সমপেক্ষতে (ওপরের পাথর ইত্যাদি সরানোর অপেক্ষায় থাকে) স্বীকৃতিং (সম্পদ প্রাপ্তির স্বীকৃতি) তু (কিন্তু) শব্দৈঃ (শব্দের দ্বারা) ন নির্গচ্ছতি (বাইরে আসে না) তৎবৎ (সেইরকম) মায়াকার্যং তিরোহিতং (মায়ার কাজ বন্ধ হয়ে গেলে) অমলং স্বম্-তত্ত্বং (নির্মল আত্মতত্ত্ব) ব্রহ্মবিদা

(ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা) উপদেশ-মনন-ধ্যানাদিভিঃ (উপদেশ ও সেই উপদেশের মনন ও ধ্যান ইত্যাদির থেকে) লভ্যতে (লাভ করা যায়) দুর্যুক্তিভিঃ ন (কুতর্কের দ্বারা নয়)।

সরলার্থ : ভূগর্ভস্থ সম্পদ প্রাপ্তি জ্ঞানীব্যক্তির উপদেশ, ভূমিখনন, সেই সম্পদের উপরিস্থিত পাথর ইত্যাদির অপসারণ এবং তারপরে স্বয়ং সেই সম্পদের অধিকার গ্রহণ—এই সবের অপেক্ষা করে। কিন্তু 'সম্পদ তুমি বাইরে এসো' এইরকম শব্দের দ্বারা সম্পদ বাইরে আসে না। তেমনি মায়া-মুক্ত নির্মল আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ ও সেইসব উপদেশের মনন ও ধ্যানাদির থেকে লাভ করা যায়। কুতর্কের দ্বারা নয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, মাটির নীচের ধনসম্পদ পেতে গেলে যাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁদের উপদেশ নিয়ে মাটি খুঁড়তে হয়, পাথর সরাতে হয়, তারপরে সেই সম্পদকে নিজে গ্রহণ করতে হয়—তবে সম্পদ লাভ হয়। কিন্তু এসব না করে আমি যদি বলতে থাকি 'সম্পদ তুমি বেরিয়ে এসো' তাহলে কি সম্পদ বাইরে আসবে ? আসবে না। 'আপ্তোক্তিং খননং তথা-উপরিশিলা-আদি-উৎকর্ষণং স্বীকৃতিং নিক্ষেপঃ সমপেক্ষতে'। 'নিক্ষেপঃ' মানে এখানে মাটির নীচে রাখা ধনসম্পত্তি। মাটির নীচের সম্পত্তি লাভ অনেক কিছুর অপেক্ষা করে। 'সমপেক্ষতে' অর্থাৎ অপেক্ষা করে আছে, নির্ভর করে আছে। কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করছে ? 'আপ্তোক্তিং', অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা, যিনি জানেন তাঁর কথা বা নির্দেশ; 'খননং', মাটি খোঁড়া; 'তথা-উপরিশিলাদি-উৎকর্ষণং', তার ওপরের অর্থাৎ সেই সম্পদের ওপরের পাথর ইত্যাদি সরানো। আর সব শেষে 'স্বীকৃতি'। সম্পদটা উন্মুক্ত হয়ে গেলে সেটার অধিকার নিজেকে নিতে হয়। তখন বলা যাবে যে, হ্যাঁ, আমি এই সম্পদ লাভ করেছি। 'ন হি বহিঃ শব্দৈঃ তু নির্গচ্ছতি', কিন্তু শুধু শব্দের দ্বারা সম্পদ নিশ্চয় বাইরে বেরিয়ে আসে না। 'সম্পদ, তুমি এস'—এই রকম বললেই সম্পত্তি মাটির নীচ থেকে আমার হাতে চলে আসবে না। 'তৎ বৎ', সেইরকম, 'মায়াকার্যতিরোহিতং' মায়ার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, এইরকম একটা অবস্থায়, 'ব্রহ্মবিদা-উপদেশ-মনন-ধ্যানাদিভিঃ', ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে সেই উপদেশের মনন ও ধ্যানাদির দ্বারা, 'অমলং স্বম্ তত্ত্বং লভ্যতে'—নির্মল আত্ম-তত্ত্ব লাভ করা যায়। ব্রহ্মবিদ্ গুরুর উপদেশ শুধু পেলে হয় না, মনের মধ্যে তাঁর উপদেশগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়, বুদ্ধি দিয়ে ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হয়, তারপর সেইসব কথার ধ্যান করতে হয়। শ্রুতি বলেছেন, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন, এই তিনটির কথা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে অমৃতত্ব লাভের উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি' (বৃ, ২।৪।৫); দেখতে হবে, শুনতে হবে, মনন করতে হবে, ধ্যান করতে হবে, তবে আত্মাকে জানতে পারবে। কিন্তু

'দ্রষ্টব্যঃ' কিরকম ? তাঁকে দেখব কি করে ? এ দেখা চোখের দেখা নয়, জ্ঞানচক্ষু যখন উন্মীলিত হয় তখন যে গভীর অনুভূতি সেটাই আত্মদর্শন। এই সব উপায়গুলোকেই বলছেন, 'মনন-ধ্যানাদি'। কিন্তু এসব সার্থক হবে কখন ? যখন 'মায়াকার্যতিরোহিতং', মায়া আর ভুল দেখাতে পারছে না। বৈরাগ্য ও আত্মনিষ্ঠা ঐকান্তিক হলে মায়ার কাজ থেমে যায়। তখন 'লভ্যতে স্বম্-অমলতত্ত্বং মায়াকার্যতিরোহিতং'। তখন সেই নির্মল শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব লাভ হয়। আসলে জ্ঞান তো আমার ভেতরেই আছে। মায়ার জন্যে, অবিদ্যার জন্যে সেটা জানতে পারছি না। এইসব সাধনার দ্বারা মায়া তিরোহিত হয়ে গেলেই আত্মজ্ঞান স্বমহিমায় প্রকাশিত হয়।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ভববন্ধ বিমুক্তয়ে।
স্বৈরেব যত্নঃ কর্তব্যো রোগাদাবিব পণ্ডিতৈঃ ॥ ৬৬

অন্বয় : তস্মাৎ (সেইজন্যে) সর্বপ্রযত্নেন (সবরকমভাবে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে) ভববন্ধবিমুক্তয়ে (সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে) পণ্ডিতৈঃ স্বৈঃ-এব (বিচার-শীল ব্যক্তিদের নিজেদের দ্বারাই) যত্নঃ কর্তব্যঃ (সব উপায় অবলম্বন করে চেষ্টা করা কর্তব্য) রোগাদৌ-ইব (রোগ হলে যেমন আরোগ্যের জন্যে নিজেকেই ওষুধ খেতে হয়)।

সরলার্থ : রোগ হলে নিজেকেই ওষুধ খেতে হয়। তেমনি বুদ্ধিমান বিচারশীল ব্যক্তিদেরও ভববন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যে সব রকম উপায় অবলম্বন করে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নিজেদেরই চেষ্টা করতে হবে।

ব্যাখ্যা : আগে একবার বলেছেন যে অসুখ করলে সুস্থ হবার জন্যে নিজেকেই ওষুধ খেতে হয়, অন্য কেউ ওষুধ খেলে রোগীর রোগ সারে না। এখনও সেটাই বলছেন : এই সংসারবন্ধন থেকে যদি মুক্ত হতে চাও তো খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তোমাকে নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাই করেন। 'তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ভববন্ধ বিমুক্তয়ে স্বৈঃ-এব যত্নঃ কর্তব্যঃ রোগাদৌ-ইব পণ্ডিতৈঃ'। 'তস্মাৎ', সেইজন্যে, 'সর্ব প্রযত্নেন' সবরকমভাবে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। সবরকমভাবে মানে এ পর্যন্ত মুক্তির উপায় হিসেবে যা কিছু বলেছেন সব করতে হবে আর খুব যত্নের সঙ্গে করতে হবে। আর বলছেন, বুদ্ধিমান যারা তারা জানে যে নিজের বন্ধনমুক্তির জন্যে নিজেকেই চেষ্টা করতে হয়, 'স্বৈঃ-এব পণ্ডিতৈঃ যত্নঃ কর্তব্যঃ'। কারণ 'রোগাদৌ-ইব', রোগ হলে যেমন ওষুধ-পথ্য রোগীর নিজেকেই খেতে হয়, এ-ও তেমনি। ভবব্যাধির জন্যে যন্ত্রণা আমার, সেই যন্ত্রণা নিরসনের জন্যে যা করণীয় তা অন্য কেউ করলে আমার যন্ত্রণার উপশম হবে কি ? যা কিছু করার তা নিজেকেই করতে হবে।

যস্ত্বয়াদ্য কৃতঃ প্রশ্নো বরীয়াঞ্ছাস্ত্রবিন্মতঃ।
সূত্রপ্রায়ো নিগূঢ়ার্থো জ্ঞাতব্যশ্চ মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৬৭

অন্বয় : অদ্য (আজ) যঃ প্রশ্নঃ (যে প্রশ্ন) ত্বয়া কৃতঃ (তোমার দ্বারা করা হলো) [তা] বরীয়ান্ (খুব উচ্চস্তরের) শাস্ত্রবিৎ-মতঃ (শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের মনোমত) সূত্রপ্রায়ঃ (প্রায় সূত্রের মতো স্বল্প কথায় অর্থপূর্ণ) নিগূঢ়ার্থ (গভীর ভাবব্যঞ্জক) মুমুক্ষুভিঃ জ্ঞাতব্যঃ (মুমুক্ষু ব্যক্তিদের পক্ষে জ্ঞাতব্য)।

সরলার্থ : আজ যে প্রশ্ন তুমি করেছ তা খুব বড় প্রশ্ন, শাস্ত্রবিদ্‌দের মনোমত, প্রায় সূত্রের মতো। স্বল্প কথা কিন্তু অর্থপূর্ণ ও গভীর ভাবব্যঞ্জক; মুমুক্ষু ব্যক্তিদের জানার যোগ্য।

ব্যাখ্যা : শিষ্যের প্রশ্ন শুনে গুরু খুব খুশি হয়েছেন। এতক্ষণ মোটামুটি সেইসব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন। এখন আরও বিশদ করে বলবেন, কিন্তু তার আগে শিষ্যের প্রশংসা করছেন। বলছেন, আজ যে প্রশ্ন করেছ সেটা একটা বড় প্রশ্ন, শাস্ত্রবিদ্ যাঁরা তাঁদের মতে এইরকম প্রশ্ন হওয়া উচিত। তোমার প্রশ্ন প্রায় সূত্রের মতো, সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ, ভাবের দিক থেকে গভীর। সমস্ত মুমুক্ষু ব্যক্তির এই প্রশ্নের উত্তর জানা উচিত। ভালো শিষ্য পেলে গুরুর খুব আনন্দ হয়। কঠোপনিষদে নচিকেতাকে যম বলছেন, 'ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা' (ক. ১।২।৯), তোমার মতো প্রশ্নকারী আরও হোক। এখানেও গুরুর কথায় সেই ভাবটাই প্রকাশ পাচ্ছে।

শৃণুষ্বাবহিতো বিদ্বন্ যন্ময়া সমুদীর্যতে।
তদেতচ্ছ্রবণাৎ সদ্যো ভববন্ধাদ্‌বিমোক্ষ্যসে ॥ ৬৮

অন্বয় : বিদ্বন্ (হে বিদ্বান্) ময়া যৎ সমুদীর্যতে (আমার দ্বারা যা কথিত হচ্ছে) তৎ (তা) অবহিতঃ শৃণুষ্ব (অবধান করে শোন) এতৎ-শ্রবণাৎ (এই শ্রবণ থেকে) সদ্যঃ (অচিরে) ভববন্ধাৎ (সংসারবন্ধন থেকে) বিমোক্ষ্যসে (মুক্ত হবে)।

সরলার্থ : বিদ্বান, আমি যা বলছি তা মনঃসংযোগ করে শোন। এ শুনলে তুমি অচিরে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

ব্যাখ্যা : গুরু বুঝেছেন তাঁর এই শিষ্যের মন তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত। জমি প্রস্তুত, বীজ ছড়ালেই ফল পাওয়া যাবে। তাই তিনি শিষ্যকে বলছেন, 'শৃণুষ্ব-অবহিতঃ বিদ্বন্ যৎ-ময়া সমুদীর্যতে', যা বলছি তা খুব মন দিয়ে শোন, আমার কথাগুলো ধারণা করার চেষ্টা কর। 'তৎ-এতৎ-শ্রবণাৎ সদ্যো ভববন্ধাদ্-বিমোক্ষ্যসে'। শুনলেই তুমি ভববন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। শিষ্যের পূর্ণ বৈরাগ্য, মুক্তির ইচ্ছা তীব্র, মনও শুদ্ধ—তাই গুরুর মুখে আত্মতত্ত্ব শুনলেই তার আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে, সংসারবন্ধন চলে যাবে।

মোক্ষস্য হেতুঃ প্রথমো নিগদ্যতে
বৈরাগ্যমত্যন্তমনিত্যবস্তুষু।
ততঃ শমশ্চাপি দমস্তিতিক্ষা
ন্যাসঃ প্রশক্তাখিলকর্মণাং ভৃশম্।। ৬৯

অন্বয় : অনিত্যবস্তুষু (অনিত্য বস্তসমূহে) অত্যন্তং বৈরাগ্যম্ (তীব্র বৈরাগ্য) মোক্ষস্য (মুক্তি লাভের) প্রথমঃ হেতুঃ নিগদ্যতে (প্রথম কারণ বলে উক্ত হয়) ততঃ (তার পর) শমঃ চ অপি দমঃ তিতিক্ষা (শম, দম আর তিতিক্ষা) প্রশক্তাখিলকর্মণাং (শ্রুতি-বিহিত করণীয় কর্মসমূহের) ভৃশম্ (অত্যন্ত) ন্যাসঃ (ত্যাগ) [এগুলি মুক্তির উপায়]।

সরলার্থ : সমস্ত অনিত্য বস্তুতে তীব্র বৈরাগ্য মুক্তিলাভের প্রথম কারণ বলে কথিত। তারপর শম-দম-তিতিক্ষা ও শ্রুতিবিহিত সমস্ত করণীয় কর্মের সর্বতোভাবে ত্যাগ।

ব্যাখ্যা : শিষ্যের আচরণে ও প্রশ্নে প্রসন্ন হয়ে গুরু এখন আত্মজ্ঞান্ লাভের উপায় বলছেন। 'মোক্ষস্য হেতুঃ প্রথমঃ নিগদ্যতে বৈরাগ্যম্-অত্যন্তম্-অনিত্য-বস্তুষু'। বলা হয় যে, অনিত্য বস্তুতে অত্যন্ত বৈরাগ্য মুক্তির প্রথম বা আদি কারণ। যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সেসবই অনিত্য বস্তু, এগুলিতে আকর্ষণের জন্যেই আমাদের সংসারবন্ধন। এইসব বিষয়ে তীব্র বিতৃষ্ণা এলেই মুক্তির ইচ্ছে হয়। তাই অনিত্য বস্তুতে অত্যন্ত বৈরাগ্যকেই ভববন্ধন মুক্তির আদি কারণ বলা হয়। 'ততঃ শমশ্চাপি দমস্তিতিক্ষা ন্যাসঃ প্রশক্ত-অখিলকর্মণাং ভৃশম্'। তারপর শম-দম-তিতিক্ষা ও শাস্ত্রবিহিত করণীয় কর্মগুলির 'ভৃশম ন্যাসঃ', নিঃশেষে ত্যাগ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রস্তুতির জন্যে যে সংযমগুলির প্রয়োজন সেইগুলির কথা বলছেন। 'শমঃ' হচ্ছে অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন; 'দমঃ' হচ্ছে বহিরিন্দ্রিয় সংযম; আর 'তিতিক্ষা' হচ্ছে দেহের ও মনের সব রকমের কষ্ট বিনা প্রতিকারের চেষ্টায় সহ্য করা। তারপর বলছেন, 'ন্যাসঃ প্রশক্ত-অখিল কর্মণাং ভৃশম্'; সব কর্ম নিঃশেষে ত্যাগ করতে হবে। কর্ম বলতে এখানে সকাম কর্মের কথা বলছেন। শাস্ত্র-বিহিত যে-সব কর্ম বা যাগযজ্ঞ সকামভাবে নির্দিষ্ট ফল লাভের জন্যেই করা হয়, সেগুলি বর্জন করতে বলছেন। কারণ, এগুলি বন্ধন শিথিল না করে আরও দৃঢ় করে।

ততঃ শ্রুতিস্তন্মননং স্বতত্ত্বধ্যানং
চিরং নিত্যনিরন্তরং মুনেঃ।
ততোঽবিকল্পং পরমেত্য বিদ্বানিহৈব
নির্বাণসুখং সমৃচ্ছতি।। ৭০

অন্বয় : ততঃ (তার পর) শ্রুতিঃ (আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বেদান্তের মহাবাক্য শ্রবণ) তৎ-মননং (তার মনন) চিরং (সুদীর্ঘকাল) নিত্যনিরন্তরং (সর্বক্ষণ অবিরাম) স্বতত্ত্বধ্যানং (আত্মতত্ত্ব ধ্যান, নিদিধ্যাসন) মুনেঃ (মননশীল, বিচারশীল সাধকের [করণীয়]) ততঃ (তার পর) অবিকল্পং পরম্ (বিকল্পহীন পরব্রহ্ম) এত্য (লাভ করে) ইহ-এব (এই জীবনেই) বিদ্বান্ (বিদ্বান) নির্বাণসুখং (নির্বাণসুখ) সমৃচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)।

সরলার্থ : প্রথমে গুরুর কাছে আত্মার স্বরূপের কথা ও বেদান্তের মহাবাক্য শ্রবণ করতে হয়। তারপর সেইসব বাক্যের মনন করতে হয় এবং সুদীর্ঘকাল বিরামহীনভাবে আত্মস্বরূপের ধ্যান করতে হয়। মননশীল সাধকের এগুলিই করণীয়। এরপর সেই বিদ্বান সাধক বিকল্পহীন পরব্রহ্মকে লাভ করে এই জীবনেই নির্বাণসুখ লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : আগে বলেছেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যোগ্যতা অর্জন করতে গেলে চারটি সাধনের প্রয়োজন। এখন বলছেন সেই সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন ব্যক্তির কি করা কর্তব্য। যিনি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তিনি 'মুনি' অর্থাৎ মননশীল, বিচারশীল। তিনি আগে গুরুর মুখ থেকে আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনবেন, বেদান্তের মহাবাক্যগুলি শুনবেন, তারপর সেই কথাগুলি নিয়ে মনন করবেন। মনের মধ্যে সেইসব কথা নিয়ে আলোড়ন করবেন, তলিয়ে দেখবেন সেসব কথার অর্থ কি : গুরু যা বলেছেন তা অন্তত বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করতে হবে। তারপর সেগুলি ধ্যান করতে হবে। তাই বলছেন, 'শ্রুতিঃ-তৎ-মননং স্বতত্ত্বধ্যানং'। এই আত্মতত্ত্বের ধ্যান কিরকম হবে ? 'চিরং নিত্যনিরন্তরং'; কোনও অন্তর বা ফাঁক থাকবে না, যেন চিরকাল এই আত্মতত্ত্বের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে আছি। এরকম যদি হয় তাহলে 'অবিকল্পং পরম্-এতৎ বিদ্বান্-ইহ-এব নির্বাণসুখং সমৃচ্ছতি'— সেই বিদ্বান তখন অবিকল্প পরব্রহ্মকে লাভ করে নির্বাণ-সুখ প্রাপ্ত হবে, নির্বিকল্প সমাধি লাভ করবে। অবিকল্প পরব্রহ্মকে লাভ করা মানেই নির্বিকল্প সমাধি লাভ করা। তার মানে তার মন-বুদ্ধি-অহংকার সব চলে গেছে, 'আমি' আর নেই, ব্রহ্ম আর আত্মা এক হয়ে গেছে, বিকল্প আর নেই। এইটাই নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা।

যদ্‌বোদ্ধব্যং তবেদানীমাত্মানাত্মবিবেচনম্।
তদুচ্যতে ময়া সম্যক্ শ্রুত্বাত্মন্যবধারয়।। ৭১

অন্বয় : যৎ (যে) আত্মানাত্মবিবেচনম্ (আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য বিচার) তব (তোমার) বোদ্ধব্যং (বোঝা প্রয়োজন) ইদানীং তৎ (এখন তা) ময়া (আমার দ্বারা) উচ্যতে (কথিত হচ্ছে) সম্যক্ শ্রুত্বা (ভালো করে শুনে) আত্মনি অবধারয় (মনের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ে ধরে রাখ)।

সরলার্থ : আত্মা ও অনাত্মার যে পার্থক্য বিচার করে তোমার বোঝা দরকার, এখন তা তোমাকে বলছি। খুব ভালো করে শুনে নাও ও মনের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ে ধরে রাখ।

ব্যাখ্যা : গুরু বলছেন শিষ্যকে, আত্মা আর অনাত্মার ভেতর তফাতটা কি সেটা তোমার বোঝা দরকার। আমি সেটা বলছি, তুমি ভালো করে শুনে নাও, মনের মধ্যে যেন একদম গেঁথে যায়। যা অনাত্ম বস্তু তাতে আত্মভাব আরোপ করে আমরা এ সংসারে কষ্ট পাই। আমাদের সংসারদুঃখের মূল এইটাই, বন্ধনের কারণও এটাই। অনাত্মবস্তু বলতে কি বোঝায় এটা না জানলে বন্ধন কেন হয়, বন্ধন যেতে চায় না কেন, কি তার আশ্রয় এসব বোঝা যায় না। আর বন্ধন কি জিনিস সেটা না বুঝলে বন্ধন-নিবৃত্তি কি করে হয়, মুক্তি কি তা বোঝা যায় না। তাই গুরু বলছেন, আত্মা আর অনাত্মার পার্থক্য কোথায় সেটা তোমায় বুঝিয়ে বলছি, মন দিয়ে শোন। এই পার্থক্যজ্ঞানটা মনের মধ্যে নিশ্চয় করে ধরে রাখ।

মজ্জাস্থিমেদ পলরক্তচর্ম-
ত্বগাহ্বয়ৈর্ধাতুভিরেভিরন্বিতম্।
পাদোরুবক্ষোভুজপৃষ্ঠমস্তকৈ-
রঙ্গৈরুপাঙ্গৈরুপযুক্তমেতৎ॥ ৭২

অন্বয় : মজ্জা-অস্থি-মেদঃ-পল-রক্ত-চর্ম-ত্বক্-আহ্বয়ৈঃ (মজ্জা-অস্থি-মেদ-মাংস-রক্ত-চর্ম-ত্বক্ নামের) এভিঃ ধাতুভিঃ (এই ধাতুগুলির দ্বারা) অন্বিতং (যুক্ত) পাদ-ঊরু-বক্ষঃ-ভুজ-পৃষ্ঠ-মস্তকৈঃ-অঙ্গৈঃ-উপাঙ্গৈঃ (পা-উরু-বুক-হাত-পিঠ-মাথা [এই সকল] অঙ্গ ও উপাঙ্গের দ্বারা) এতৎ উপযুক্তম্ (এইটে [দেহটা] ঠিকভাবে যুক্ত)।

সরলার্থ : মজ্জা-অস্থি-মেদ-মাংস-রক্ত-চর্ম-ত্বক্ নামের এই ধাতুগুলির দ্বারা সংযুক্ত ও পা, উরু, বুক, হাত, পিঠ ও মাথা এই সমস্ত অঙ্গ ও উপাঙ্গ নিয়ে তৈরী এই শরীর।

ব্যাখ্যা : এই শরীরটা কি ? হাত পা মাথা ইত্যাদি কতগুলো টুকরোকে জুড়ে একটা কিছু হয়ে এ উপস্থিত হয়েছে। এ অনাত্ম বস্তু। এটা কিছু ভালোবাসার মতো বস্তু নয়, কয়েকটি জড়পদার্থকে নিয়ে এর সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের তো দেহের প্রতি ভয়ানক আকর্ষণ, সেই আকর্ষণের ভিতটাকে নাড়া দেবার জন্যে এভাবে বলছেন। এই দেহটা যে মনোযোগ দেবার মতো একটা জিনিসই নয়, সেটাই বলতে চাইছেন।

অহং মমেতি প্রথিতং শরীরং মোহাস্পদং স্থূলমিতীর্যতে বুধৈঃ।
নভো নভস্বদ্দহনাম্বুভূময়ঃ সূক্ষ্মাণিভূতানি ভবন্তি তানি॥ ৭৩

অন্বয় : অহং মম-ইতি ('আমি আমার' এই ভাবে) প্রথিতং (প্রসিদ্ধ) মোহাস্পদং (মোহের আশ্রয়) স্থূলং শরীরং (স্থূলশরীর) ইতি বুধৈঃ ঈর্যতে (এইরকমই পণ্ডিতরা বলে থাকেন) নভঃ-নভস্বৎ-দহন-অম্বু-ভূময়ঃ (আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল ও পৃথিবী) তানি সূক্ষ্মাণি-ভূতানি (এইসকল সূক্ষ্মভূত [নিয়ে এই শরীর])।

সরলার্থ : 'আমি আমার' এই মোহের আশ্রয়স্থল বলে প্রসিদ্ধ এই দেহকে পণ্ডিতরা স্থূলশরীর বলে থাকেন। এই স্থূলশরীরে আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল ও মৃত্তিকা এই পাঁচটি সূক্ষ্মভূত আছে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অহং মমেতি প্রথিতং শরীরং মোহ-আস্পদং স্থূলম্-ইতি-ঈর্যতে বুধৈঃ'। 'আমি' ও 'আমার' এই মোহের আশ্রয়স্থল বলে প্রসিদ্ধ আমাদের যে দেহ, এটাকেই পণ্ডিতেরা স্থূলশরীর বলে থাকেন। এই দেহটাকে 'আমি' ভাবি আর দেহ সংক্রান্ত যা-কিছু সেসবকে 'আমার' বলে মনে করি। যেমন, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ধনী, আমি বুদ্ধিমান বা আমি গরীব; আবার বলছি, আমার দেহ, আমার হাত-পা, আমার সংসার, আমার আত্মীয়পরিজন। এসবই এই স্থূলদেহকে কেন্দ্র করে বলছি ও ভাবছি। এই যে নিজের ব্যক্তিসত্তাটাকে 'আমি' ভাবা, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় এটা 'কাঁচা আমি'। আমার প্রকৃত স্বরূপ এটা নয়। আমার প্রকৃত স্বরূপ হলো, আমি আত্মা। কিন্তু দেহকে আশ্রয় করে আমার মধ্যে মোহ উৎপন্ন হচ্ছে, আমি ভুল বুঝছি, দেহকে 'আমি' ভাবছি। এই 'আমি আমার' ভাবটাই আমার সংসারবন্ধনের কারণ। এটাকে ছাড়তে হবে। তার জন্যে এই দেহটা যে আমি নই সেটা বুঝতে হবে। গুরু তাই শিষ্যকে বলছেন, এই দেহটা কি ? আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল ও মাটি এই পঞ্চভূত সূক্ষ্ম অবস্থায় এতে আছে। এটা একটা জড়বস্তু। এটা তোমার স্বরূপ হবে কি করে ?

পরস্পরাংশৈর্মিলিতানি ভূত্বা
স্থূলানি চ স্থূলশরীরহেতবঃ।
মাত্রাস্তদীয়া বিষয়া ভবন্তি
শব্দাদয়ঃ পঞ্চ সুখায় ভোক্তুঃ॥ ৭৪

অন্বয় : পরস্পরাংশৈঃ (পরস্পরের অংশের সঙ্গে) মিলিতানি ভূত্বা (মিলিত হয়ে) স্থূলানি (স্থূল) চ (এবং) স্থূল-শরীর-হেতবঃ (স্থূলশরীর গঠনের হেতু হয়) তদীয়াঃ মাত্রাঃ (তাদের অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের গুণসমূহ) ভোক্তুঃ সুখায় (ভোক্তা জীবের সুখের জন্যে) শব্দাদয়ঃ পঞ্চ (শব্দ ইত্যাদি পাঁচটি অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) বিষয়াঃ ভবন্তি ([পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য] বিষয় হয়)।

সরলার্থ : এই সূক্ষ্মভূতগুলি পরস্পরের অংশের সঙ্গে মিলে স্থূলভূতে পরিণত হয় ও স্থূলশরীর নির্মাণের হেতু হয়। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের গুণগুলি ভোক্তা জীবের সুখের জন্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপ বিষয় হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা : আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়—সবই জড় পদার্থ, পঞ্চভূতের সৃষ্টি। এগুলো অনিত্য, পরিবর্তনশীল, আজ আছে কাল নেই। কাজেই এসবের পেছনে

ছোটা নিরর্থক। বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্যে এই শ্লোকে বলছেন : কিভাবে সূক্ষ্ম ভূতগুলি থেকে স্থূল পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয় আর তা থেকে আমাদের শরীর ইত্যাদি তৈরী হয়। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকা—এই পাঁচটি সূক্ষ্মভূত। এদের তন্মাত্রও বলা হয়। তন্মাত্র বললে তখন এদের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই নামে বলতে হবে। প্রতিটি সূক্ষ্মভূতের একটা গুণ আছে, সেই গুণের দিক থেকে বললে সূক্ষ্মভূতগুলিকে 'তন্মাত্র' বলা হয়। যেমন আকাশের গুণ 'শব্দ', সেইজন্য সূক্ষ্মভূত 'আকাশ'কে শব্দ-তন্মাত্র-ও বলা হয়। তেমনি বায়ুর গুণ স্পর্শ, তাই বায়ু হলো স্পর্শ-তন্মাত্র। অগ্নি হলো রূপ-তন্মাত্র, জল রস-তন্মাত্র আর মৃত্তিকা বা পৃথিবী হলো গন্ধ-তন্মাত্র। এই সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলে-মিশে স্থূলভূত বা মহাভূতগুলি সৃষ্টি করে। যে-পদ্ধতিতে সেটা হয়, শাস্ত্রে তাকে 'পঞ্চীকরণ' বলে। কোনও সূক্ষ্মভূতের অর্ধেকের সঙ্গে অন্য চারটি সূক্ষ্মভূতের এক অষ্টমাংশ করে মিলে যে-সূক্ষ্মভূতের অর্ধেক নেওয়া হয়েছে, সেই নামের স্থূলভূত তৈরী হয়। যেমন, স্থূলভূত পৃথিবী বা মৃত্তিকা = ১/২ গন্ধ-তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম পৃথিবী + ১/৮ সূক্ষ্ম আকাশ + ১/৮ সূক্ষ্ম বায়ু + ১/৮ সূক্ষ্ম অগ্নি + ১/৮ সূক্ষ্ম জল। সূক্ষ্মভূতকে মহাভূতও বলে। এমনি করে 'পঞ্চীকরণ'-এর মাধ্যমে যে পাঁচটি স্থূলভূত উৎপন্ন হয়, সেগুলিই আমাদের শরীর আর এই জগৎ তৈরী করে। তাই এখানে বলছেন : 'মাত্রাঃ-তদীয়াঃ বিষয়াঃ ভবন্তি শব্দাদয়ঃ পঞ্চ সুখায় ভোক্তুঃ'—ভোক্তা জীবের সুখের জন্যে এই শব্দাদি পাঁচটি তন্মাত্র ভোগের উপকরণ অর্থাৎ বিষয় হয়ে যায়। আমাদের যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে—চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক—এগুলোর সাহায্যে আমরা সেই বিষয়গুলি ভোগ করি। আমাদের ভোগের ব্যবস্থা করার জন্যেই পঞ্চ তন্মাত্র—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ—বিষয়ে পরিণত হয়ে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। এসব বলার একটাই উদ্দেশ্য : ভোগ্য-বিষয়ের স্বরূপটা তুমি বুঝে নাও। সেটা বুঝে নিলে বিষয়-আসক্তি কমে আসে।

য এষু মূঢ়া বিষয়েষু বদ্ধা
রাগোরুপাশেন সুদুর্দমেন।
আয়ান্তি নির্যান্ত্যধ উধর্বমুচ্চৈঃ
স্বকর্মদূতেন জবেন নীতাঃ ॥ ৭৫

অন্বয় : যে মূঢ়াঃ (যে মূঢ় ব্যক্তিগণ) সুদুর্দমেন (দুর্ভেদ্য) রাগ-উরু-পাশেন (বিষয়াসক্তি রূপ বিস্তীর্ণ বন্ধনরজ্জুদ্বারা) এষু বিষয়েষু (এই সকল ভোগ্য বিষয়ে) বদ্ধাঃ (আবদ্ধ থাকে) [তারা] স্বকর্মদূতেন (স্বকর্মরূপ দূতের দ্বারা) জবেন নীতা (সবলে চালিত হয়ে) অধঃ (নীচে, নীচজন্মে) উচ্চৈঃ ঊধর্বম্ (উধের্ব, স্বর্গলোক পর্যন্ত) আয়ান্তি নির্যান্তি চ (আসে ও যায়)।

সরলার্থ : যেসব মূঢ় ব্যক্তি অত্যন্ত আসক্তির বশে বিষয়ভোগে আবদ্ধ থাকে তারা নিজের নিজের কর্মফলের দ্বারা সবলে চালিত হয়ে কখনও বা পশু, তির্যক ইত্যাদি নিম্নযোনিতে জন্ম নেয় আবার কখনও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়ে সুখভোগ করে। এই ভাবে তারা আসে আর যায়, জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে যাওয়া-আসা করে।

ব্যাখ্যা : বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তির ফলে মানুষ ভোগে আত্মবিস্মৃত হয়ে যায়। তার আর মুক্তির ইচ্ছা জাগে না। কর্মস্রোতে সে ভেসে চলে—তার মধ্যে ভালো কর্মও থাকে মন্দ কর্মও থাকে। মন্দ কর্মের জন্যে তার অধোগতি হয় আর ভালো কাজের জন্যে ঊধর্ব-গতি হয়। বলছেন, 'আয়ান্তি নির্যান্তি-অধঃ ঊধর্বম্-উচ্চৈঃ স্বকর্মদূতেন জবেন নীতাঃ'; নিজের কর্মরূপ দূতের দ্বারা সবলে চালিত হয়ে তারা আসছে আর যাচ্ছে, মন্দ কর্মের জন্যে নীচে নামছে আবার ভালো কর্মের জন্যে ওপরে উঠছে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রমতে মানবজন্মই একমাত্র জন্ম যেখানে কর্মের দ্বারা মানুষ অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে, ইচ্ছে হলে মুক্তিলাভও করতে পারে। কিন্তু একটা জন্মে খুব নিকৃষ্ট কাজ করলে মৃত্যুর পর তার পশু বা তির্যক যোনিতে জন্ম হয়। সেই জন্মের দুঃখভোগ শেষ হলে আবার সে মানুষ হয়ে জন্মায়। যখন সৎকর্মের পাল্লা খুব ভারি হয় তখন স্বর্গলাভ পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু সৎকর্মের ফল অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করে তাকে আবার মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে। আর, তার ভালো-মন্দ কর্মের ভাগ যদি প্রায় সমান সমান হয় তাহলে মানুষ জন্মই হয়, কিন্তু কর্ম ও বাসনা অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে, বিভিন্ন পরিবেশে। সেই জন্মের শেষে মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু—এইভাবেই চলে। তাই বলছেন, 'আয়ান্তি নির্যান্তি অধঃ ঊধর্বং উচ্চৈঃ'। এই যাওয়া-আসার দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি হবে যদি নিজের স্বরূপ কি জানতে পারি। বিষয় থেকে মন না উঠলে স্বরূপজ্ঞান হয় না।

শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ
পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গা
নরঃ পঞ্চভিরঞ্চিতঃ কিম্ ॥ ৭৬

অন্বয় : কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গাঃ (কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন ও ভৃঙ্গ) পঞ্চ ([এই] পাঁচ প্রাণী) শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিঃ এব (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুণের দ্বারাই) স্বগুণেন বদ্ধাঃ (নিজ নিজ এক বিশেষ গুণের দ্বারা বদ্ধ হয়ে) পঞ্চত্বম্ আপুঃ (মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থাকে) নরঃ (মানুষ) পঞ্চভিঃ অঞ্চিতঃ (এই পাঁচ গুণের দ্বারা নিযুক্ত থেকে) কিম্ (কি [আর করবে]) ?

সরলার্থ : কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, মীন ও ভৃঙ্গ এই পঞ্চপ্রাণীর প্রত্যেকেই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণের মধ্যে নিজের নিজের প্রিয় কোন বিশেষ গুণের

দ্বারা বদ্ধ হয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। মানুষ এই পাঁচ গুণের দ্বারাই বশীভূত, কাজেই সে আর কি করবে ?

ব্যাখ্যা : মানুষ তার ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ করতে না পেরে তাদেরই বশীভূত হয়ে আছে আর তাদের তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে চলেছে। তার যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক্, তারা চার পাশের বিষয় থেকে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচটি জিনিস উপভোগের জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে আছে। কাজেই মানুষের দুঃখ ও বন্ধন দশা তো হবেই। উদাহরণ দিয়ে বলছেন, 'কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গা পঞ্চত্বম্-আপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ'; এই পাঁচটি প্রাণীই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচটি গুণের মধ্যে নিজের নিজের স্বভাব অনুযায়ী কোনও একটি বিশেষ গুণের দ্বারা বদ্ধ হয়ে মৃত্যু মুখে পড়ে। কুরঙ্গ মানে হরিণ, ব্যাধের বাঁশী শুনে সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারায়। মাতঙ্গ অর্থাৎ হাতি, তাকে ধরার জন্যে যে খেদা প্রস্তুত করা হয় তার মধ্যে এসে সে ঢোকে হস্তিনীর স্পর্শসুখ লাভের আশায়। কাঠ দিয়ে মজবুত করে ঘেরা জায়গাকে খেদা বলে। খেদায় ঢোকার একটিই রাস্তা থাকে। শিক্ষিত হস্তিনীকে খেদার কাছে ছেড়ে রাখা হয়। বন্যহস্তী খেদার কাছে এলে সেই হস্তিনী তার শুঁড়ে শুঁড় জড়িয়ে তাকে স্পর্শসুখ দেয় ও আস্তে আস্তে তাকে খেদার মধ্যে নিয়ে আসে। সেই হস্তী স্পর্শসুখের লোভে খেদায় ঢুকে বদ্ধ হয়। পতঙ্গ আগুনের রূপে মুগ্ধ হয়ে আগুনে পড়ে প্রাণ হারায়। মীন মানে মাছ। বড়শিতে গাঁথা খাবারের রস আস্বাদনের লোভে গলায় বড়শি বিঁধে মাছ প্রাণ দেয়। ভৃঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, পদ্মের মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পদ্মের ওপরেই বসে থাকে, ছেড়ে যেতে পারে না। শেষকালে সন্ধ্যে হলে পদ্মের পাপড়িগুলি মুদ্রিত হয়ে যায় আর সে সেই পদ্মের মধ্যে আটকে থেকে প্রাণ হারায়। বলছেন, শুধু একটি ইন্দ্রিয়সুখের লিপ্সা যদি প্রাণীদের এই অবস্থা করে তাহলে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের ভোগের তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে যে মানুষ উদ্গ্রীব হয়ে আছে তার দশা কি হবে ?

দোষেণ তীব্রো বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি।
বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষাপ্যয়ম্॥ ৭৭

অন্বয় : বিষয়ঃ (বিষয়) দোষেণ (দোষের দিক থেকে) কৃষ্ণসর্পবিষাৎ-অপি (কৃষ্ণসর্পের বিষের থেকেও) তীব্রঃ (তীব্র) বিষং (বিষ) ভোক্তারং (ভক্ষককে) নিহন্তি (নিহত করে) অয়ং (এই [বিষয়]) চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা) দ্রষ্টারম্ অপি (দর্শন-করীকেও [নিহত করে])।

সরলার্থ : বিষয় কৃষ্ণসর্পের বিষের থেকেও তীব্র ও ক্ষতিকারক। বিষ যে খায় তারই মৃত্যু হয় কিন্তু এই বিষয় চোখ দিয়ে দেখলেও প্রাণসংশয় হয়।

ব্যাখ্যা : কৃষ্ণসর্পের বিষ অত্যন্ত মারাত্মক। এই সাপ কামড়ালে মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু 'দোষেণ তীব্রঃ বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্প-বিষাৎ-অপি'; বিষয়ের যেসব দোষ সেগুলি কৃষ্ণসর্পের বিষের থেকেও বেশী যন্ত্রণাদায়ক। রূপ-রস ইত্যাদি আমরা উপভোগ করি বিষয়ের মধ্যে দিয়ে। এই ভোগ আমাদের মনে নানা রকমের 'দোষের' সৃষ্টি করে। যেমন, কোনও একটা জিনিসের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি, সেটা পাচ্ছি না বলে ক্রোধ, বিরক্তি। আবার অন্য কেউ সেটা ভোগ করছে, আমি পারছি না, তার জন্যে আমার ঈর্ষা, দ্বেষ। এইসব মনোভাব মনটাকে ছোট করে দেয়, সংসারের পাঁকে আরও বেশী তলিয়ে যেতে হয়। এইসবগুলোকে বিষয়ের দোষ বলছেন। বলছেন, এগুলো কৃষ্ণসর্পের বিষের থেকেও বেশী ক্ষতিকারক। কারণ 'বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষা-অপি-অয়ম্'; বিষ যে খায় বিষ তাকেই নিহত করে, কিন্তু এই বিষয়, চোখ দিয়ে যে দেখে তাকেও নষ্ট করে। যদিও বলছেন 'দ্রষ্টারম্ চক্ষুষা অপি' কিন্তু অর্থ হচ্ছে, যে কোনও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হলেই মানুষ বিনষ্টির পথে চলতে থাকে। বলছেন, সাপের বিষ খেলে মানুষ মরে কিন্তু বিষয়ের যে বিষ তা দেখলে মৃত্যু হয়, আঘ্রাণ করলে মৃত্যু হয়, শুনলে মৃত্যু হয়, স্পর্শ করলেও মৃত্যু হয়। যে কোন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে বিষয়াসক্তি ঢুকে মানুষের সর্বনাশ করে দিতে পারে। এত করে বলছেন, শিষ্যের মনে বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা পাকা করে দেবার জন্যে।

বিষয়াশামহাপাশাদ্ যো বিমুক্তঃ সুদুস্ত্যজাৎ।
স এব কল্পতে মুক্ত্যৈ নান্যঃ ষট্শাস্ত্রবেদ্যপি॥ ৭৮

অন্বয় : সুদুস্ত্যজাৎ (যা ত্যাগ করা অতি কঠিন) [সেই] বিষয়-আশা-মহাপাশাদ্ (বিষয় আশারূপ দারুণ বন্ধন থেকে) যঃ বিমুক্তঃ (যিনি মুক্ত) সঃ এব (তিনিই) মুক্ত্যৈ কল্পতে (মোক্ষফল লাভ করতে পারেন) অন্যঃ (অন্য [বিষয়ে বদ্ধ]) ষট্শাস্ত্র-বেদী অপি ন (ষট্শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হলেও [পারেন] না)।

সরলার্থ : বিষয়ভোগের আশারূপ দারুণ বন্ধন ত্যাগ করা দুঃসাধ্য। যিনি এই বন্ধন থেকে মুক্ত তিনিই মোক্ষলাভের যোগ্য হয়েছেন। অন্য যাঁর বিষয়বন্ধন ত্যাগ হয়নি তিনি ষট্শাস্ত্রবিদ্ হলেও মোক্ষলাভের অধিকারী হন না।

ব্যাখ্যা : আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো স্বভাবতই বহির্মুখী। তারা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ, এইসব উপভোগ করার জন্যে লোলুপ হয়ে রয়েছে। মানুষকে তারা ভোগের সামগ্রীর পেছনে ছোটাচ্ছে। সেগুলো পাওয়ার চেষ্টাতেই মানুষের সব শক্তি ক্ষয় হয়ে যায় আর সংসার তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলে। বলছেন, 'বিষয়-আশামহাপাশাদ্ সুদুস্ত্যজাৎ যঃ বিমুক্ত ঃ' বিষয়-আশার এই ভয়ানক বন্ধন, যা ত্যাগ

করা দুঃসাধ্য, এর থেকে যে মুক্ত হয়েছে 'সঃ এব কল্পতে মুক্ত্যৈ', সেই মুক্তির অভিলাষ করতে পারে, সেই মুক্তি লাভের অধিকারী। অপূর্ণ বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে আমরা ফিরে ফিরে এই পৃথিবীতে আসি। বাসনার নিবৃত্তি হয়েছে যার, মোক্ষলাভের কল্পনা তাকেই সাজে। আর যার এই বিষয়ের পাশ ছিন্ন হয়নি সে যদি 'ষট্শাস্ত্রবেদী'ও হয় তাহলেও সে মুক্তি লাভের অধিকারী হতে পারবে না। ষট্শাস্ত্র হচ্ছে ষড়্দর্শন— ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা। বলতে চাইছেন : বাসনার জালে যদি জড়িয়ে থাক তাহলে যত শাস্ত্রই পড় মোক্ষলাভের আশা নেই।

আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্
ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুমুদ্যতান্।
আশাগ্রহো মজ্জয়তেঽন্তরালে
নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্য বেগাৎ॥ ৭৯

অন্বয় : ভবাব্ধিপারং (সংসারসমুদ্রের পারে) প্রতিযাতুম্ (যেতে) উদ্যতান্ (উদ্যত) আপাতবৈরাগ্যবতঃ (ওপর ওপর বৈরাগ্যবান) মুমুক্ষূন্ (মুমুক্ষুদের) আশাগ্রহঃ (ভোগের আশারূপ কুমীর) কণ্ঠে নিগৃহ্য (গলা ধরে) বেগাৎ বিনিবর্ত্য (দারুণ বেগে সাধনার পথ থেকে ফিরিয়ে) অন্তরালে (মধ্যপথে) মজ্জয়তে (ডুবিয়ে দেয়)।

সরলার্থ : আপাতবৈরাগ্যবান যেসব মুমুক্ষুরা সংসারসমুদ্র পার হতে চান তাঁদের ভোগের আশারূপ কুমীর গলা ধরে দারুণ বেগে সাধনার পথ থেকে ফিরিয়ে মাঝপথে ডুবিয়ে দেয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, বৈরাগ্য যদি পাকা না হয় তাহলে মুক্তির ইচ্ছে জাগলেও মুক্তির সাধনা সফল হয় না। ভোগের আশা-আকাঙ্ক্ষা সাধনার মাঝপথেই সাধককে টেনে নাবিয়ে সংসারের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। বলছেন, এই ভোগের আকাঙ্ক্ষা যেন কুমীরের মতো। কুমীর যেমন মানুষকে একবার ধরলে তাকে টেনে জলের তলায় নিয়ে যায় এও তেমনি। ভোগের বাসনা একবার ঘাড়ে চাপলে মানুষকে তা সংসার-সাগরে ডুবিয়ে মারে। 'আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্ ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুম্-উদ্যতান্'; 'আপাতবৈরাগ্যবতঃ', যার বৈরাগ্য ভাসা ভাসা। হঠাৎ কোন দুঃখ বা আঘাত পেয়ে হয়তো বৈরাগ্য এসেছে, কিন্তু সেই বৈরাগ্যে দৃঢ়তা নেই। এরকম যারা, তাদের মুক্তির ইচ্ছেটাও তীব্র হয় না। তাই সংসারসমুদ্রের পারে যাবার জন্যে তারা যে সাধনা করে তাতেও নিষ্ঠার অভাব থাকে। তাদের অবস্থাটা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, 'আশাগ্রহঃ মজ্জয়তে-অন্তরালে নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্য বেগাৎ'; বিষয় গ্রহণের বাসনা, ভোগের

আশা, তাদের কুমীরের মতো গলা কামড়ে ধরে তীব্র গতিতে সাধনার পথ থেকে টেনে নামিয়ে আনে এবং আবার সংসারের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। আসলে বৈরাগ্য যদি পাকা না হয় তাহলে সাধকের যে-কোন সময় পতনের ভয় থাকে।

বিষয়াখ্যো গ্রহো যেন সুবিরক্ত্যসিনা হতঃ।
স গচ্ছতি ভবাম্ভোধেঃ পারং প্রত্যূহবর্জিতঃ॥ ৮০

অন্বয় : যেন (যাঁর দ্বারা) বিষয়াখ্যঃ গ্রহঃ (বিষয় নামের কুমীর) সুবিরক্তি-অসিনা (দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ তরোয়ালের দ্বারা) হতঃ (নিহত হয়) সঃ (তিনি) প্রতি-উহ-বর্জিতঃ (প্রতিবন্ধক শূন্য হয়ে) ভব-অম্ভোধেঃ (সংসারসমুদ্রের) পারং গচ্ছতি (পারে চলে যান)।

সরলার্থ : বিষয় নামের কুমীরকে যিনি তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসির দ্বারা নিহত করেন তিনি বিনা বাধায় সংসারসমুদ্রের পারে চলে যান।

ব্যাখ্যা : বলছেন 'বিষয়াখ্যো গ্রহঃ যেন সুবিরক্তি-অসিনা হতঃ'; যে তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসির দ্বারা বিষয় নামের কুমীরটাকে মেরে ফেলেছে, তার কি হবে ? তার আর এই জন্ম-মৃত্যুর সংসারে আসা-যাওয়া থাকবে না। কারণ বিষয়বাসনাই তো আমাদের সংসারবন্ধন, এই বাসনাতাড়িত হয়েই আমরা সংসারের সুখদুঃখের আঘাতে একবার উচ্ছ্বসিত হচ্ছি আবার একবার ম্রিয়মান হয়ে পড়ছি, একজনকে ভালোবাসছি আবার আর একজনের প্রতি বিদ্বেষ অনুভব করছি। এই সব সংঘাতে মনে শান্তি নেই, প্রসন্নতা নেই। তাই বলছেন, এইসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগের সামগ্রী কুমীরের মতো আমাদের সংসারসাগরে ডুবিয়ে মারছে। তীব্র বৈরাগ্যের খড়গ দিয়ে এই বিষয়-কুমীরকে কেটে ফেলতে হবে। কারণ বাসনার একটুও যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সেই বাসনা পূরণের জন্যে এ জন্ম শেষ হলেও আবার জন্ম নিতে হবে—জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘোরা থামবে না। কিন্তু যার বৈরাগ্য দৃঢ়, বিষয় তাকে আর ভোলাতে পারে না, তার আর সংসারসমুদ্রের পারে যাবার কোনও বাধা নেই। কারণ বৈরাগ্যের খড়গ দিয়ে ইন্দ্রিয়সুখের আশ্রয়স্থল ঐ বিষয় নামের কুমীরটাকে সে হত্যা করেছে। সংসারসমুদ্রে আর কুমীরের ভয় নেই, এই সমুদ্র পার হবার আর কোনও প্রতিবন্ধক নেই। 'সঃ গচ্ছতি ভবাম্ভোধেঃ পারং প্রত্যূহবর্জিতঃ', সে তখন নির্বিঘ্নে সংসারসমুদ্রের পারে চলে যায়।

বিষমবিষয়মার্গৈর্গচ্ছতোঽনচ্ছবুদ্ধেঃ
প্রতিপদমভিযাতো মৃত্যুরপ্যেষ বিদ্ধি।
হিতসুজনগুরূক্ত্যা গচ্ছতঃ স্বস্য যুক্ত্যা
প্রভবতি ফলসিদ্ধিঃ সত্যমিত্যেব বিদ্ধি॥ ৮১

অন্বয় : বিষম-বিষয়মার্গৈঃ (দুঃসহ রূপরসাদি বিষয়ের পথে) গচ্ছতঃ (গমনকারী)

অনচ্ছবুদ্ধেঃ (অশুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষের) এষঃ মৃত্যুঃ অপি (এই মৃত্যুও) প্রতিপদম্ (প্রতি পদে) অভিযাতঃ (সঙ্গে গমনশীল) [এটা] বিদ্ধি (জেনো) হিত-সুজন-গুরু-উক্ত্যা (হিতাকাঙ্ক্ষী সজ্জন গুরুর উক্তির সহায়তায়) স্বস্য যুক্ত্যা (নিজের যুক্তিবিচারের সাহায্যে) গচ্ছতঃ (চলছে যে তার) ফলসিদ্ধিঃ (সাফল্যলাভ) প্রভবতি (প্রকৃষ্টরূপে হয়) ইতি সত্যং বিদ্ধি (এই সত্যকে জেনো)।

সরলার্থ : রূপ-রস ইত্যাদি সমাকীর্ণ বিষম বিষয়ের পথে যে অস্বচ্ছবুদ্ধির পুরুষ চলেছে তার সঙ্গে প্রতি পদে মৃত্যুও চলেছে এটা জেনো। আর এই সত্যটাও জেনো যে হিতাকাঙ্ক্ষী-সজ্জন-গুরুর বাক্যের সহায়তায় আর নিজের যুক্তিবিচারের সাহায্যে পথ চললে সাফল্যলাভ ত্বরান্বিত হয়।

ব্যাখ্যা : শিষ্যের যাতে বৈরাগ্য তীব্র হয় তাই গুরু এইসব কথা বলছেন। বলছেন, 'বিষম-বিষয়মার্গৈঃ-গচ্ছতঃ-অনচ্ছবুদ্ধেঃ প্রতিপদম্-অভিযাতঃ মৃত্যুঃ-অপি এষঃ বিদ্ধি'; রূপ-রস ইত্যাদি ভোগ্যবস্তুতে পরিকীর্ণ, ভয়ানক বিষয়-পথে অশুদ্ধবুদ্ধির পুরুষের চলাফেরা। এটা জেনো যে, প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুও চলেছে তার সঙ্গে। বলছেন 'অনচ্ছবুদ্ধেঃ', যার বুদ্ধি শুদ্ধ হয়নি। বুদ্ধি শুদ্ধ হয়নি মানে—ঠিক ঠিক বিচারবুদ্ধি জাগেনি, কোন্‌টা নিত্য বস্তু কোন্‌টা অনিত্য বস্তু তার পার্থক্য জ্ঞান তার নেই। এইরকম 'অনচ্ছবুদ্ধি'র মানুষ বিষয়ের 'বিষম' পথেই চলে এবং ভোগে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। ভুলে যায় যে এসব অনিত্য, দুদিনের জিনিস, থাকবে না। শিষ্যকে বলছেন, তুমি জেনে রাখো, মৃত্যুও পদে পদে তার সঙ্গে চলেছে। যে কোনও মুহূর্তে সে এই পুরুষকে গ্রাস করতে পারে। সেইজন্যে বলছেন, 'হিত-সুজন-গুরু-উক্ত্যা গচ্ছতঃ স্বস্য যুক্ত্যাঃ প্রভবতি ফলসিদ্ধিঃ সত্যম্-ইতি-এব বিদ্ধি'। এই সত্যটা জেনে রাখো যে, হিতাকাঙ্ক্ষী সজ্জন গুরুর বাক্য অনুযায়ী আর নিজের যুক্তিবিচারের সাহায্যে পথ চললে সাফল্যলাভ ত্বরান্বিত হবে।

মোক্ষস্য কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি
ত্যজাতিদূরাৎ বিষয়ান্ বিষং যথা।
পীযূষবৎ তোষদয়াক্ষমার্জব-
প্রশান্তিদান্তীর্ভজ নিত্যমাদরাৎ॥ ৮২

অন্বয় : যদি বৈ (যদি) তব (তোমার) মোক্ষস্য (মুক্তির) কাঙ্ক্ষা (কামনা) অস্তি (থাকে) [তাহলে] বিষয়ান্ ত্যজ-অতিদূরাৎ (সমস্ত বিষয়কে অনেক দূর থেকে ত্যাগ কর) বিষং যথা (যেমন বিষ [ত্যাগ করা হয়]) আদরাৎ (আদর করে) তোষ-দয়া-ক্ষমা-আর্জব-প্রশান্তি-দান্তীঃ (সন্তোষ-দয়া-ক্ষমা-সরলতা-শম ও দম) পীযূষবৎ (অমৃতজ্ঞানে) নিত্যং ভজ (সর্বদা অনুশীলন কর)।

সরলার্থ : তোমার যদি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বিষের মতো অনেক দূর থেকে ত্যাগ কর। আর সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, শম ও দম, এইসব গুণগুলি আদর করে অমৃতজ্ঞানে মনের মধ্যে নিত্য অনুশীলন কর।

ব্যাখ্যা : গুরু শিষ্যকে বলছেন, তোমার যদি মুক্তির ইচ্ছা হয়ে থাকে, যদি আত্মজ্ঞান লাভ করতে চাও তাহলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে বিষের মতো অনেক দূর থেকেই ত্যাগ করতে হবে। বলছেন, 'ত্যজ-অতি-দূরাৎ বিষয়ান্ বিষং যথা'। 'বিষয়' মানেই যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেইসব। 'ত্যজ-অতি-দূরাৎ' মানে বিচার করে ত্যাগ করতে বলছেন। বিষয়ের যন্ত্রণা ভোগ করে তারপর ত্যাগ করার চেয়ে বিচার করে বিষয়কে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখাই সবচেয়ে ভালো। বিষ যেমন প্রাণহানিকর বলে দূর থেকেই ত্যাগ করা ভালো, বিষয়ও তেমনি। সংসারে নিমজ্জিত করে আত্মবিস্মৃতির কারণ ঘটায় বলে বিষয় দূর থেকে ত্যাগ করাই ভালো। তারপর বলছেন, তোমায় বিষ ত্যাগ করে অমৃত গ্রহণ করতে হবে। সেই অমৃত কি ? 'পীযূষবৎ তোষ-দয়া-ক্ষমা-আর্জব-প্রশান্তি-দান্তীঃ-ভজ নিত্যম্-আদরাৎ'। সন্তোষ-দয়া-ক্ষমা-সরলতা-শম-দম, এইসব গুণগুলি অমৃততুল্য, আদর করে নিত্য এদের ভজনা কর। অর্থাৎ সর্বদা অভ্যাস করে, চিন্তা করে, বিচার করে এইসব গুণগুলিকে তোমার স্বভাব করে তোল। তাহলে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যাবে, তুমি আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হবে।

অনুক্ষণং যৎ পরিহৃত্য কৃত্যম-
নাদ্যবিদ্যাকৃতবন্ধমোক্ষণম্।
দেহঃ পরার্থোঽয়মমুষ্য পোষণে
যঃ সজ্জতে স স্বমনেন হন্তি॥ ৮৩

অন্বয় : অনাদি-অবিদ্যাকৃত-বন্ধ-মোক্ষণম্ (অনাদি অবিদ্যা থেকে আসা বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া) অনুক্ষণং (প্রতি মুহূর্তে) যৎ কৃত্যম্ (যে সাধনাভ্যাস করা কর্তব্য) [তা] পরিহৃত্য (ত্যাগ করে) অয়ং (এই) পরার্থঃ দেহঃ (পরের ভোগ্য দেহ) অমুষ্য (এটার) পোষণে (পালনে) যঃ (যে) সজ্জতে (আসক্ত হয়) সঃ (সে) অনেন (এই কাজের দ্বারা) স্বম্ হন্তি (নিজেকে হত্যা করে)।

সরলার্থ: অনাদি-অবিদ্যার সৃষ্টি যে বন্ধন তার থেকে মুক্তির চেষ্টা সর্বক্ষণ করা কর্তব্য। তা না করে এই পরভোগ্য দেহ, এটার পরিপালনে যে আসক্ত হয় সে এই দেহের সেবার দ্বারা নিজেকেই হত্যা করে।

ব্যাখ্যা : বলছেন : দেহের প্রতি আসক্তি মানুষের পরমার্থ লাভের অন্তরায়। সেই আসক্তি ত্যাগ করে অবিদ্যা-জনিত বন্ধন দূর করাই মানুষের একমাত্র কৃত্য হওয়া উচিত। 'অনুক্ষণং যৎ পরিহৃত্য কৃত্যম্-অনাদি-অবিদ্যাকৃত-বন্ধ-মোক্ষণম্'; অবিদ্যা বা অজ্ঞান বা মায়াকে অনাদি বলা হয়, কারণ এ যে কোথা থেকে এসেছে, কবে এসেছে, কেন এসেছে কেউ জানে না। কিন্তু এটা যে আছে সেটা একটা বাস্তব সত্য। আর এই অবিদ্যার জন্যেই আমাদের সংসারবন্ধন। আমি তো আসলে সব সময় মুক্ত। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আমার স্বরূপ, আমার আবার বন্ধন কি ? কিন্তু এই অবিদ্যা আমার কাছ থেকে আমার স্বরূপকে আড়াল করে রেখেছে, তাই নিজেকে বদ্ধ ভাবছি আর কষ্ট পাচ্ছি। অবিদ্যা কিন্তু অনাদি হলেও সান্ত, এর অন্ত আছে। আমার আত্মার ওপর থেকে এই অবিদ্যার আবরণটা সরিয়ে দিতে পারলেই সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ আমার আত্মা স্বমহিমায় ফুটে উঠবেন আর তখনই আমার বন্ধন খসে পড়বে। মোক্ষলাভের জন্যে করণীয় এটাই, অবিদ্যার আবরণটা সরিয়ে দেওয়া। কাজটা কিন্তু সহজ নয়। এর জন্যে বিচার করে গুরুর উপদেশ মতো অনুক্ষণ আত্মচিন্তায় নিবিষ্ট থাকতে হয়। তাই বলছেন, 'অনুক্ষণং যৎ পরিহৃত্য কৃত্যম্-অনাদি-অবিদ্যাকৃত বন্ধ-মোক্ষণম্', অনাদি অবিদ্যাকৃত বন্ধন মুক্তির জন্যে যা করণীয় তা অনুক্ষণ না করে, সেসব পরিত্যাগ করে—'দেহঃ পরার্থঃ-অয়ম্-অমুষ্য পোষণে যঃ সজ্জতে সঃ স্বম্-অনেন হন্তি', এই পরভোগ্য দেহ, এটার লালন-পালনে যে আসক্ত হয়ে আছে সে এইসব করে নিজেকেই নষ্ট করছে, যেন আত্মহত্যা করছে। দেহটাকে 'পরার্থঃ' বলছেন, কারণ আমরা মরে গেলে এই দেহ যদি পড়ে থাকে তো সেটা শেয়াল কুকুর বা শকুনে খায়। দেহের প্রতি তো আমাদের অত্যন্ত আসক্তি, তাই সেটা নষ্ট করার জন্যে এরকম করে বলছেন। আর নিজের স্বরূপের অনুসন্ধান না করে দেহ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকাকে আত্মহননের সমান বলছেন। কারণ, সত্যিই তো তাই, আমি প্রকৃতই যা তা আমি জানছি না, আর একটা অনিত্য, মিথ্যা বস্তুকে আমি মনে করে, সেটার যত্ন করে, আমার স্বরূপকে আরও বেশি আবৃত করছি। একে আত্মহনন ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ?

শরীরপোষণার্থী সন্ য আত্মানং দিদৃক্ষতি।
গ্রাহং দারুধিয়া ধৃত্বা নদীং তর্তুং স গচ্ছতি॥ ৮৪

অন্বয় : যঃ (যে) শরীরপোষণার্থী সন্ (শরীরপোষণে ব্যাপৃত থেকে) আত্মানং দিদৃক্ষতি (আত্মস্বরূপ দর্শন করতে চায়) সঃ (সে) গ্রাহং (কুমীরকে) দারুধিয়া (কাঠ মনে করে) ধৃত্বা (ধরে) নদীং তর্তুং (নদী পার হতে) গচ্ছতি (যায়)।

সরলার্থ : শরীরের পালন ও যত্ন করায় ব্যাপৃত থেকে যে স্বস্বরূপের দর্শন অভিলাষী হয় সে কাঠ মনে করে কুমীরকে ধরে নদী পার হতে যায়।

ব্যাখ্যা : আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আত্মজ্ঞানের কোনও কথাই ওঠে না। দেহকে 'আমি' মনে করি আর দেহকেন্দ্রিক যা কিছু আছে সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকি বলেই আমাদের সংসারবন্ধন। তাই বলছেন, শরীরকে ভালোবেসে তার সেবা-যত্ন করে তাকে যদি সবসময় ভালো রাখার কাজে ব্যস্ত থাকি আর মনে মনে ভাবি আমি আত্মজ্ঞান লাভ করব, তাহলে সেটা কুমীরকে কাঠ ভেবে ধরে নদী পার হবার চেষ্টার মতো হবে। 'শরীরপোষণার্থী সন্ যঃ আত্মানং দিদৃক্ষতি'; শরীরপোষণ করতে চায় যে সে যদি 'আত্মানং দিদৃক্ষতি', আত্মদর্শন করতে চায়, তাহলে সেটা 'গ্রাহং দারুধিয়া ধৃত্বা নদীং তর্তুং স গচ্ছতি', সে কাঠ মনে করে কুমীরকে ধরে নদী পার হতে যাচ্ছে, বলতে হবে। কুমীরের পিঠে চড়ে কেউ যদি নদী পার হতে চায় তো কুমীর তাকে গলা কামড়ে নদীর নীচে নিয়ে যায় আর মেরে ফেলে। তেমনি দেহের আসক্তি মানুষকে সংসারের অতলে টেনে নিয়ে গিয়ে তার আত্মসাক্ষাৎকারের বাসনা সেখানেই বিনষ্ট করে দেয়।

মোহ এব মহামৃত্যুর্মুমুক্ষোর্বপুরাদিষু।
মোহো বিনির্জিতো যেন স মুক্তিপদমর্হতি॥ ৮৫

অন্বয় : মুমুক্ষোঃ (মুমুক্ষুর) বপুরাদিষু (দেহাদিতে) মোহঃ এব (মোহই) মহামৃত্যুঃ (মহামৃত্যু স্বরূপ) যেন (যাঁর দ্বারা) মোহঃ (মোহ) বিনির্জিতঃ (জয় করা হয়েছে) সঃ (তিনি) মুক্তিপদম্ (মুক্তিপদ) অর্হতি (লাভের যোগ্য হন)।

সরলার্থ : যিনি মুমুক্ষু তাঁর পক্ষে দেহাদিতে মোহই মহামৃত্যুস্বরূপ। যিনি মোহ জয় করেছেন তিনিই মুক্তিপদ লাভের যোগ্য অধিকারী।

ব্যাখ্যা : দেহাদিতে আসক্তিই মুক্তি লাভের প্রতিবন্ধক, সেই কথাই আবার বলছেন। এই দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এইসবে 'আমি আমার' করাই আমাদের অবিদ্যা। এটা না গেলে স্বরূপজ্ঞান হয় না। স্বরূপজ্ঞান না হলে মুক্তিও হয় না। বলছেন, 'মোহ এব মহামৃত্যুঃ-মুমুক্ষোঃ-বপুঃ-আদিষু'; দেহাদিতে মোহই মুমুক্ষুর পক্ষে মহামৃত্যুস্বরূপ। বলছেন, 'বপুরাদি'। আদি শব্দটা ব্যবহার করছেন দেহসংক্রান্ত সবকিছুকে বোঝাবার জন্যে। যে মুমুক্ষু সেও যদি দেহাদির মোহে পড়ে তাহলে তার মুক্তির ইচ্ছেটাই ক্রমশ চলে যাবে। কাজেই তার পক্ষে এই মোহকে মৃত্যুর সমান বলা যেতে পারে কিন্তু যে এই মোহ জয় করেছে, মুক্তিপদের অধিকার তারই। 'মোহঃ বিনির্জিতঃ যেন সঃ মুক্তিঃ-অর্হতি'; দেহাদিতে যার মোহ চলে গেছে, আত্মজ্ঞান তার করতলগত। মুক্তিপদের অধিকার তারই।

মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদারসুতাদিষু।
যং জিত্বা মুনয়ো যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৮৬

অন্বয় : দেহ-দার-সুতাদিষু (দেহ ও স্ত্রীপুত্রাদিতে) মহামৃত্যুং মোহং (মহামৃত্যুর সমান মোহকে) জহি (নাশ কর) যং জিত্বা (যাকে জয় করে) মুনয়ঃ (মুনিগণ) বিষ্ণোঃ তৎ পরমং পদং (বিষ্ণুর সেই পরম পদ) যান্তি (আশ্রয় করেছেন)।

সরলার্থ : দেহ ও স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি মহামৃত্যুর সমান মোহকে নাশ কর, যাকে জয় করে মুনিরা বিষ্ণুর সেই পরম পদে গতি লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহ-দার-সুতাদিষু'। তোমার দেহ, তোমার স্ত্রী-পুত্র ও আরও যারা সব আকর্ষণের বস্তু আছে তাদের প্রতি মোহ ত্যাগ কর। কারণ এই মোহ মহামৃত্যুর মতো, তোমার বিনাশের কারণ হবে। মোহ কাকে বলে ? কোনও কিছুর প্রতি যে অত্যন্ত আকর্ষণ মানুষকে বুদ্ধিভ্রংশ করে তাকেই মোহ বলে। আমরা তো সংসারে অনবরত দেখছি যে বেশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিন্তু বিপথগামী পুত্রকে শাসন করতে পারছে না অত্যন্ত স্নেহের জন্যে। সংসারে স্ত্রী হয়তো অশান্তির সৃষ্টি করছে, পাঁচজনের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করে কিন্তু স্বামীর তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। এই মোহ ধনসম্পদ, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা, এইসবের ওপরও দেখতে পাওয়া যায়। টাকাপয়সা বাড়াবার জন্যে লোকে নীতি-দুর্নীতির ধার ধারছে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্যে মানুষ কত অকাজ-কুকাজ করে। মোহ মানুষকে এমনি করে বিপথে নিয়ে যায়, মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। তাই একে মহামৃত্যুর সমান বলছেন। বলছেন, এই মোহের বিনাশ কর। বিষয়ের আকর্ষণে যে বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সে আবার সজাগ হবে, বিবেকবুদ্ধি জাগবে আর তখন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ কমতে থাকবে, বৈরাগ্য আসবে। বলছেন, এই মোহকে জয় করে 'মুনয়ঃ যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' মুনিরা সেই বিষ্ণুর পরম পদে গতি লাভ করেন। বিষ্ণুর পরম পদ মানে সংসারের পারে সেই পরম আনন্দরূপ অধিষ্ঠান। মানুষের একমাত্র গন্তব্যস্থল।

ত্বঙ্‌-মাংস-রুধির-স্নায়ু-মেদোমজ্জাস্থিসংকুলম্।
পূর্ণং মূত্রপুরীষাভ্যাং স্থূলং নিন্দ্যমিদং বপুঃ ॥ ৮৭

অন্বয় : ত্বক্‌-মাংস-রুধির-স্নায়ু-মেদঃ-মজ্জা-অস্থিসংকুলম্ (ত্বক্‌-মাংস-রক্ত-স্নায়ু-মেদ-মজ্জা-অস্থি সমন্বিত) মূত্র পুরীষাভ্যাং (মূত্র ও মলে পূর্ণ) ইদং স্থূলং বপুঃ (এই স্থূল দেহ) নিন্দ্যঃ (নিন্দনীয়)।

সরলার্থ : ত্বক-মাংস-রুধির-স্নায়ু-মেদ-মজ্জা ও অস্থি সমন্বিত আর মূত্র ও মলে পূর্ণ এই স্থূল দেহ একটা নিন্দার বস্তু।

ব্যাখ্যা : শরীরের ওপর তো আমাদের অত্যন্ত আকর্ষণ, আমরা দেহসর্বস্ব। কিন্তু দেহের

প্রতি মমতা না কমলে বৈরাগ্য আসে না। তাই শিষ্যের বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্যে এইরকম করে বলছেন। রক্ত মাংস হাড় এইসব দিয়ে তৈরী একটা জিনিস এই শরীর, তার ওপর আবার মল-মূত্রে পূর্ণ। এ একটা নোংরা জিনিস, নিন্দের জিনিস। এ থেকে মন তুলে নাও।

পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ পূর্বকর্মণা।
সমুৎপন্নমিদং স্থূলং ভোগায়তনমাত্মনঃ।
অবস্থা জাগরস্তস্য স্থূলার্থানুভবো যতঃ ॥ ৮৮

অন্বয় : পঞ্চীকৃতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ (পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতগুলির থেকে) পূর্বকর্মণা (জীবের পূর্বকর্মের সংযোগে) আত্মনঃ (আত্মার) ভোগ-আয়তনম্ (ভোগের আয়তন) ইদং স্থূলং (এই স্থূল দেহ) সমুৎপন্নম্ (উৎপন্ন হয়েছে) তস্য জাগরঃ অবস্থা (তার জাগ্রত অবস্থা) যতঃ (যেহেতু) স্থূলার্থ-অনুভবঃ (স্থূল পদার্থের অনুভব সমন্বিত)।

সরলার্থ : পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতগুলির থেকে ও জীবের পূর্বকর্মের সহযোগে তার ভোগের উপযোগী আশ্রয় এই স্থূল দেহ উৎপন্ন হয়েছে। কারণ তার জাগ্রত অবস্থা স্থূল পদার্থের অনুভব নির্ভর।

ব্যাখ্যা : বলছেন 'পঞ্চীকৃতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ'; পঞ্চীকরণের কথা আগেও আমরা আলোচনা করেছি (৭৪ নং শ্লোকে)। আকাশ-বায়ু-অগ্নি-জল-মৃত্তিকা এই পাঁচটি সূক্ষ্মভূত। এই সূক্ষ্মভূতগুলো পঞ্চীকৃত হয়ে স্থূলভূত বা মহাভূতগুলি তৈরী হয়। সূক্ষ্মভূতের কোনও একটির অর্ধাংশের সঙ্গে অন্য চারটির এক অষ্টমাংশ করে মিশে স্থূলভূতগুলির সৃষ্টি হয়। যে সূক্ষ্মভূতের অর্ধাংশ নিয়ে মহাভূতটি তৈরী হয়েছে সেই সূক্ষ্মভূতের নাম অনুযায়ী মহাভূতটির নাম হয়। বলছেন, এই পাঁচটি স্থূলভূত থেকে আর 'পূর্বকর্মণা', পূর্ব পূর্ব জন্মের সঞ্চিত কর্মের দ্বারা এই স্থূলদেহ তৈরী হয়েছে। হিন্দুমত হচ্ছে ভালো কর্মের ফলে পরের জন্ম ভালো অবস্থার মধ্যে হয় আবার মন্দ কর্মের ভাগ বেশি হলে মন্দ অবস্থায় জন্মাতে হয়, এমন কি ইতরযোনিতে জন্ম হওয়াও সম্ভব। আমাদের কর্মের সঙ্গে সব সময় বাসনা জড়িয়ে থাকে। যেসব বাসনা একটা জন্মে পূর্ণ হয়নি সেইগুলি পূর্ণ করার জন্যে আমাদের আবার জন্ম হয়। আর সেই সব অতৃপ্ত কামনা পূরণের উপযোগী দেহ নিয়ে জন্ম হয়। বলছেন এই স্থূলদেহটা 'ভোগায়তনম্‌-আত্মনঃ'; আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির তৃপ্তিসাধনের জন্যে এই দেহ তৈরী হয়েছে, একে তাই ভোগায়তন বলা হয়। বিষয় ভোগ করতে গেলে একটা দেহের দরকার হয়। বলছেন, 'অবস্থা জাগরঃ তস্য স্থূলার্থ-অনুভবঃ যতঃ'। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের তো এই স্থূল জগতের সঙ্গে সংযোগ হয়, স্থূল পদার্থ নিয়ে আমাদের ব্যবহার

করতে হয়। হাত দিয়ে ধরতে হয়, পা দিয়ে চলতে হয়, মুখ দিয়ে খেতে হয়, ইত্যাদি। এসবগুলো জাগ্রত অবস্থায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। আর এগুলির জন্যেই আমাদের এই শরীরের দরকার হয়।

বাহ্যেন্দ্রিয়ৈঃ স্থূলপদার্থসেবাং
স্রক্-চন্দন-স্ত্র্যাদি-বিচিত্ররূপাম্।
করোতি জীবঃ স্বয়মেতদাত্মনা
তস্মাৎ প্রশস্তির্বপুষোঽস্য জাগরে।। ৮৯

অন্বয় : জীবঃ (জীব) বাহ্যেন্দ্রিয়ৈঃ (বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা) স্রক্-চন্দন-স্ত্রী-আদি-বিচিত্ররূপাম্ (মালা, চন্দন, স্ত্রী ইত্যাদি বিচিত্ররূপ) স্থূলপদার্থ সেবাং (স্থূল পদার্থ-সমূহের উপভোগ) এতদাত্মনা স্বয়ং (এই দেহে আত্মবোধ সহ নিজে) করোতি (করে) তস্মাৎ (সেই জন্যে) অস্য বপুষঃ (এই শরীরের) জাগরে (জাগ্রত-অবস্থায়) প্রসস্তিঃ (প্রাধান্য)।

সরলার্থ : জীব বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে মালা চন্দন স্ত্রী ইত্যাদি বিচিত্র রূপের পদার্থের উপভোগ নিজে করে, দেহে আত্মবোধ সহকারে। সেইজন্যে জাগ্রত অবস্থায় এই শরীরের প্রাধান্য।

ব্যাখ্যা : এই জগতে বিচিত্র সব ভোগের আয়োজন রয়েছে আর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এমন বহির্মুখী হয়ে তৈরী হয়েছে যে, এরাও ভোগ্যবস্তু গ্রহণে খুব তৎপর। দেহ ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে বাইরের জগতের ভোগ্যবস্তুগুলি গ্রহণ করে আর দেহে আত্মবুদ্ধি থাকার জন্যে সেই ভোগের অনুভূতি হয় আমার নিজের—দেহের নয়। আসলে আমি কর্তাও নই, ভোক্তাও নই। কিন্তু দেহকেই 'আমি' ভাবি বলে নিজেকে কর্তা বা ভোক্তা বলে মনে হয়। বলছেন, 'বাহ্যেন্দ্রিয়ৈঃ স্থূলপদার্থ সেবাং স্রক্-চন্দন-স্ত্রী-আদি বিচিত্ররূপাম্ করোতি জীবঃ স্বয়মেতদাত্মনা'; এই বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা জীব স্থূল পদার্থের সেবা করে, মালা চন্দন স্ত্রী ইত্যাদি বিচিত্র সব বস্তু গ্রহণ করে। দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে বলে সে নিজেই এগুলি উপভোগ করে। আসলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাইরের ভোগ্য-বিষয়ের সংযোগে দেহের মধ্যে ভালো-মন্দের অনুভূতি হচ্ছে। কিন্তু জীব নিজেকে দেহের সঙ্গে একাত্ম করে বসে আছে। সে যে দেহের থেকে আলাদা সেটা ভুলে গেছে। তাই যা আসলে দেহের ভোগ, তাকে নিজের ভোগ বলে মনে করছে। 'তস্মাৎ প্রসস্তি বপুষঃ-অস্য জাগরে'। এই দেহাত্মবুদ্ধির জন্যেই জাগ্রত অবস্থায় জীবের কাছে দেহের এত প্রাধান্য। জগৎটাকে সত্য ভাবছি, তাই যে দেহের সাহায্যে এই জগৎকে জানছি সেইটাকেই 'আমি' মনে করছি। কিন্তু এইসব জাগতিক সুখ-দুঃখের অনুভব যার হচ্ছে সে যে দেহ থেকে স্বতন্ত্র এইটা বুঝতে পারছি না।

সর্বোঽপি বাহ্যসংসারঃ পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ।
বিদ্ধি দেহমিদং স্থূলং গৃহবদগৃহমেধিনঃ।। ৯০

অন্বয় : পুরুষস্য (জীবের) সর্বঃ অপি (সর্ব প্রকারেরই) বাহ্য সংসারঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপ সংসার) যদ্-আশ্রয়ঃ (যা আশ্রয় করে থাকে) [তা] গৃহমেধিনঃ (গৃহস্থের) গৃহবৎ (গৃহের মতো) ইদং স্থূলং দেহং (এই স্থূল দেহকে) বিদ্ধি (জেনো)।

সরলার্থ : পুরুষের সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্যবিষয়ে সংসারের আশ্রয়স্থল এই স্থূল দেহকে গৃহস্থের গৃহের মতো জেনো।

ব্যাখ্যা : আবার সেই একই কথা বলছেন যে দেহ আর আত্মা আলাদা। গৃহস্থ যেমন গৃহের মধ্যে থেকে গৃহের সমস্ত সুখ ভোগ করে, তেমনি জীবাত্মা দেহের মধ্যে থেকে দেহ-সংক্রান্ত সমস্ত ভোগ সুখ উপলব্ধি করে। কিন্তু আসলে আত্মা দেহ থেকে আলাদা, ঠিক যেমন গৃহস্থ গৃহ থেকে আলাদা। দেহকে 'আমি' বলে মনে করার জন্যেই আত্মা যেন বাইরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সমস্ত কিছু ভোগ করছে বলে মনে হয়। আসলে আত্মা কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়। বলছেন : 'বিদ্ধি দেহম্-ইদম্ স্থূলং গৃহবৎ-গৃহমেধিনঃ'; এই দেহকে গৃহস্থের গৃহের মতো বলে জানবে। গৃহস্থ আর গৃহ তো এক নয়, তেমনি আত্মা আর দেহ আলাদা, এইটে সব সময় মনে রাখতে হবে।

স্থূলস্য সম্ভবজরামরণানি ধর্মাঃ
স্থৌল্যাদয়ো বহুবিধাঃ শিশুতাদ্যবস্থাঃ।
বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা বহুধাঽময়াঃ স্যুঃ
পূজাবমানবহুমানমুখা বিশেষাঃ।। ৯১

অন্বয় : সম্ভব-জরা-মরণানি (জন্ম জরা ও মৃত্যু) ধর্মাঃ (এই সব ধর্ম) বহুবিধঃ (বহু রকমের) স্থৌল্য-আদয়ঃ (স্থূলতা কৃশতা ইত্যাদি) শিশুতা-আদি-অবস্থাঃ (শৈশব যৌবন প্রভৃতি অবস্থা) বর্ণাশ্রমাদি-নিয়মাঃ (ব্রাহ্মণ ইত্যাদি চারটি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্যাদি চারটি আশ্রমের নিয়মসমূহ) বহুধা-আময়াঃ (নানা রোগব্যাধি) পূজা-অবমান-বহুমান-মুখাঃ (পূজা-অপমান-বহু সম্মান ইত্যাদি) বিশেষাঃ (বিশেষ বিশেষ অবস্থাভেদ) স্থূলস্য (স্থূল দেহেরই) স্যুঃ (হয়ে থাকে)।

সরলার্থ : জন্ম-জরা-মৃত্যু, স্থূলতা-কৃশতা, শৈশব যৌবন প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা, চার বর্ণ ও চার আশ্রমের পালনীয় সব নিয়ম, নানা রোগ ব্যাধি, পূজা, অপমান বা বহু সম্মান ইত্যাদি স্থূল দেহকে আশ্রয় করেই থাকে।

ব্যাখ্যা : স্থূল দেহের ধর্ম কি ? জন্ম জরা ও মৃত্যু এগুলো স্থূল দেহের ধর্ম। যাস্ক ঋষি

বলেছেন, দেহের ষড়্‌বিকার আছে। 'জায়তে অস্তি বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি'।—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ। এগুলো কিন্তু দেহেরই হয়, আত্মার কোনও বিকার হয় না। আমরা দেহে আমিত্বের অভিমান করেছি বলে মনে করি আমার ক্ষয় হচ্ছে, এবার মৃত্যু আসবে। কিন্তু আত্মার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। আবার আমাদের শরীর নানা রকমের হয়। মোটা, রোগা, ফর্সা, কালো, লম্বা, বেঁটে—কত রকম। দেহ তো সব সময় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। শৈশব থেকে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য, এ সবই দেহের ব্যাপার। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দেহের বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন হয়। তারপর বর্ণাশ্রম আছে। চারটি বর্ণ হচ্ছে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র। আর চারটি আশ্রম ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই বর্ণাশ্রমের বাহ্যিক কতকগুলো নিয়ম আছে, সেগুলো মেনে চলতে হয়। যেমন ব্রাহ্মণের শিখা-উপবীত ধারণ করার নিয়ম, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রধারণের নিয়ম ইত্যাদি। এসব নিয়মগুলো দেহকে অবলম্বন করেই। তারপর অসুখ-বিসুখ আছে, পূজা-অপমান-সম্মান ইত্যাদি আছে। কিন্তু এ সবই দেহকেই ঘিরে, এগুলি আত্মার কিছু নয়। দেহে আত্ম-অভিমানের জন্যেই মানুষ দেহের সুখদুঃখকে নিজের মনে করে।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শ্রবণং ত্বগক্ষি-
ঘ্রাণং চ জিহ্বা বিষয়াববোধনাৎ।
বাক্‌পাণিপাদা গুদমপ্যুপস্থঃ
কর্মেন্দ্রিয়াণি প্রবণেন কর্মসু॥ ৯২

অন্বয় : বিষয়-অববোধনাৎ (বিষয়ের জ্ঞান জন্মানোর জন্যে) শ্রবণং ত্বক্-অক্ষি-ঘ্রাণং জিহ্বা চ (কর্ণ ত্বক্ চক্ষু নাসিকা ও জিহ্বা) বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়) [বলে কথিত হয়] বাক্-পাণি পাদাঃ গুদম্-অপি-উপস্থঃ (মুখ হাত পা মলদ্বার ও লিঙ্গ) কর্মসু প্রবণেন (কর্মপ্রবণতার কারণে) কর্ম-ইন্দ্রিয়াণি (কর্মেন্দ্রিয়) [বলে কথিত হয়]।

সরলার্থ : বিষয়ের জ্ঞান জন্মায় বলে কর্ণ ত্বক চক্ষু নাসিকা ও জিহ্বাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। আর কর্মপ্রবণতার জন্যে মুখ হাত পা মলদ্বার ও লিঙ্গকে কর্মেন্দ্রিয় বলা হয়।

ব্যাখ্যা : চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাসিকা ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষের বিষয়ের জ্ঞান হয়, তাই এদের জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। বিষয়ের জ্ঞান হলে সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমাদের কিছু করণীয় থাকে। সেই কাজগুলো করার জন্যে আমাদের পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আছে—বাক্-পাণি-পাদ-উপস্থ-পায়ু। কর্মপ্রবণতার জন্যে এগুলিকে কর্মেন্দ্রিয় বলা হয়।

নিগদ্যতেঽন্তঃকরণং মনোধী-
রহংকৃতিশ্চিত্তমিতি স্ববৃত্তিভিঃ।
মনস্তু সংকল্পবিকল্পনাদিভি-
বুদ্ধিঃ পদার্থাধ্যবসায়ধর্মতঃ। ৯৩
অত্রাভিমানাদহমিত্যহংকৃতিঃ
স্বার্থানুসন্ধানগুণেন চিত্তম্॥ ৯৪

অন্বয় : অন্তঃকরণম্ (অন্তঃকরণ) স্ববৃত্তিভিঃ (নিজের বৃত্তির বিভিন্নতার কারণে) মনঃ-ধীঃ-অহংকৃতিঃ-চিত্তম্ (মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত) ইতি (এই চারটি নামে) নিগদ্যতে (আখ্যাত হয়) সংকল্প-বিকল্পনাদিভিঃ তু মনঃ (সংকল্প ও বিকল্প এই বৃত্তির দ্বারা মন) পদার্থ-অধ্যবসায়ধর্মতঃ বুদ্ধিঃ (পদার্থের নিয়ত বিশ্লেষণের দ্বারা 'এটা এই' বলে স্থির করার বৃত্তি হচ্ছে বুদ্ধি) অত্র (এই দেহাদিতে) অহম্ (আমি) ইতি অভিমানাৎ (এই অভিমানের হেতু) অহংকৃতিঃ (অহংকার) স্বার্থ-অনুসন্ধানগুণেন (নিজের সুখসাধনের চিন্তারূপ গুণের দ্বারা) চিত্তম্ (চিত্ত) [অভিহিত]।

সরলার্থ : অন্তঃকরণ বিভিন্ন রকমের বৃত্তি অনুযায়ী মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চারটি নামে অভিহিত হয়। সঙ্কল্প-বিকল্প দ্বারা চিহ্নিত বৃত্তি মন। অধ্যবসায়পূর্বক পদার্থের বিশ্লেষণের দ্বারা পদার্থের নিশ্চিত জ্ঞান উৎপন্ন করার বৃত্তি হচ্ছে বুদ্ধি। এই দেহে অভিমানবশতঃ 'এই দেহই আমি' এই বোধ যে বৃত্তি থেকে উৎপন্ন হয় তাকে বলে অহঙ্কার। নিজের স্বার্থ ঠিক করতে গিয়ে যেসব গুণের দ্বারা অন্তঃকরণে নানা ভাবের উন্মেষ হয় তাকে চিত্ত বলে।

ব্যাখ্যা : এখন সূক্ষ্ম দেহের আলোচনা করছেন আর সেই প্রসঙ্গে অন্তঃকরণের চারটি ভাগের কথা বলছেন। সেই ভাগগুলি হলো মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। অন্তঃকরণের বিভিন্ন বৃত্তি অনুযায়ী এই চারটি নাম হয়েছে। সঙ্কল্প-বিকল্পে দোলায়মান বৃত্তির নাম মন। 'এটা করব ? না, ওইটা করি। না, না সেটাও বোধ হয় ভুল হবে'—এমনি করে মন সব সময় একটা দোলায়মান অবস্থায় থাকে। কিন্তু বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। সে সিদ্ধান্ত করতে পারে। যে-কোনও বিষয়ের বিচার ও বিশ্লেষণ করে বুদ্ধি ঠিক করতে পারে কোন্‌টা নেওয়া চলে আর কোন্‌টা বর্জন করতে হয়। অন্তঃকরণের এই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি বলা হয়। তারপর 'অহংকৃতিঃ' বা অহংকার। মানুষ দেহাদিতে আমিত্বের অভিমান করে। দেহটাকেই 'আমি' মনে করে আর দেহ-সংক্রান্ত যা কিছু তা 'আমার' মনে করে। দেহের সুখ-দুঃখ নিজের সুখ-দুঃখ বলে মনে করে। দেহকেন্দ্রিক এই যে আমিত্ব বোধ এটাই অহংকার। আর চিত্ত কি ? মানুষের অনুরাগ বিরাগ দ্বেষ ক্রোধ ইত্যাদি অনুভব হয় চিত্তে। আবার এইসব অনুভূতির স্মৃতি চিত্ত নিজের মধ্যে ধরে

রাখে। এই চিত্তকে বলা হয় 'স্মরণাত্মক' (বেদান্তসার, ৫৩, সুবোধিনী টীকা')। এখানে বলছেন : 'স্বার্থ-অনুসন্ধান গুণেন চিত্তম্'। জীবাত্মা সবসময় নিজের আনন্দ অনুসন্ধান করে। অনুকূল বস্তু পেলে তার আনন্দ হয় সুখ হয়, প্রতিকূল বস্তু পেলে দুঃখ হয় ক্রোধ-দ্বেষ ইত্যাদি হয়। অন্তঃকরণের যে বৃত্তির জন্যে এই অনুভূতিগুলি হয় তা-ই চিত্ত।

প্রাণাপানব্যানোদানসমানা ভবত্যসৌ প্রাণঃ।
স্বয়মেব বৃত্তিভেদাদ্ বিকৃতিভেদাৎ সুবর্ণসলিলাদিবৎ॥ ৯৫

অন্বয় : অসৌ প্রাণঃ (এই প্রাণ) সুবর্ণসলিলাদিবৎ (সুবর্ণ, সলিল ইত্যাদির মতো) বৃত্তিভেদাৎ (বৃত্তিভেদহেতু) বিকৃতিভেদাৎ (বিকৃতির বিভিন্নতার হেতু) স্বয়ম্ এব (নিজেই) প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমানাঃ (প্রাণ অপান ব্যান উদান ও সমান) ভবতি (হয়)।

সরলার্থ : এই প্রাণ সুবর্ণ ও সলিলের মতো বৃত্তি ও বিকারের বিভিন্নতা অনুযায়ী নিজেই প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমান এই পঞ্চবায়ুতে পরিণত হয়।

ব্যাখ্যা : এক প্রাণই আমাদের দেহের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান ও সমান এই পঞ্চবায়ুতে পরিণত হয়। বলছেন, 'প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমানাঃ ভবতি-অসৌ প্রাণঃ স্বয়ম্-এব বৃত্তিভেদাদ্ বিকৃতিভেদাৎ সুবর্ণসলিল-বৎ'; 'সুবর্ণসলিলবৎ', সোনা বা জলের মতো যেমন প্রয়োজন হয় সেইমত আকার নেয়। সোনার কত রকমের গয়না হয়। আবার একই জলের ফেনা তরঙ্গ বুদ্বুদ ইত্যাদি হয়। 'বৃত্তিভেদাৎ' মানে যখন যে কাজে নিযুক্ত হচ্ছে সেই অনুযায়ী। আর 'বিকৃতিভেদাৎ' মানে বিভিন্ন রকমের বিকার অর্থাৎ পরিবর্তন থেকে। দেহের মধ্যে এই পঞ্চবায়ুর ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। প্রাণবায়ুর স্থান হৃদয়ে, এর কাজ হচ্ছে মুখ ও নাক দিয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। অপান বায়ুর স্থান মলনালীতে, এই বায়ু নিম্নগামী। 'সমান' বায়ুর স্থান নাভিতে, এর কাজ খাবার হজম করানো। উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠদেশে, এই বায়ু ঊর্ধ্বগামী। আর ব্যানের স্থান সর্বদেহে, এ রক্ত-চলাচল অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু একই প্রাণ।

বাগাদি পঞ্চ শ্রবণাদি পঞ্চ
প্রাণাদি পঞ্চাভ্রমুখানি পঞ্চ।
বুদ্ধ্যাদ্যবিদ্যাপি চ কামকর্মণী
পুর্যষ্টকং সূক্ষ্মশরীরমাহুঃ॥ ৯৬

অন্বয় : বাক্-আদি পঞ্চ (বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) শ্রবণাদি পঞ্চ (শ্রবণ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) প্রাণাদি পঞ্চ (প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু) অভ্রমুখানি পঞ্চ (আকাশ ইত্যাদি পঞ্চ মহাভূত) বুদ্ধি-আদি-অবিদ্যা-অপি (বুদ্ধি ইত্যাদি অন্তঃকরণের চারটি রূপ, এবং অবিদ্যা) চ কামকর্মণী (এবং কাম ও কর্ম) পুরী অষ্টকং ([এই] আটটি পুরী) [জীবরূপী রাজার বাসস্থান]) সূক্ষ্মশরীরম্ (সূক্ষ্মশরীর) আহুঃ (বলা হয়ে থাকে)।

সরলার্থ : (১) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, (২) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, (৩) পঞ্চ প্রাণ, (৪) পঞ্চ মহাভূত, (৫) অন্তঃকরণের বুদ্ধি ইত্যাদি চারটি ভাগ, (৬) অবিদ্যা, (৭) কাম ও (৮) কর্ম—এই আটটি পুরীকে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন : আমাদের যে সূক্ষ্মশরীর সেটা যেন 'পুরী-অষ্টকং', আটটি পুরীযুক্ত একটা বিরাট প্রাসাদ। জীব রাজার মতো সেই প্রাসাদে বাস করে। এই আটটি পুরী কি কি ? পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—বাক্-পাণি-পাদ-উপস্থ-পায়ু; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্; পঞ্চ প্রাণ—প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমান; চারভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণ—মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার; পঞ্চ সূক্ষ্মভূত; আর অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম। খুব সুন্দর একটা উপমা! বিরাট একটা প্রাসাদ তার আটটা পুরী অর্থাৎ আটটা ঘর। জীব যেন এক একটা প্রয়োজনে এক একটা ঘরে কিছুক্ষণ থাকছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে তার বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ হচ্ছে, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার, এদের আশ্রয়ে কামনার সৃষ্টি হচ্ছে, অবিদ্যা সেই কামনাকে চরিতার্থ করার জন্যে নানা ভাবে জীবকে উদ্বুদ্ধ করছে, সে তখন কর্মেন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে সেইসব কামনা পূর্ণ করছে, কর্ম করছে। কিন্তু 'আমি' এ সবের থেকে আলাদা। 'আমি' এই আটপুরী-যুক্ত প্রাসাদের মালিক। আমি ইচ্ছে করলে এই প্রাসাদের যে-কোন ঘরে থাকতে পারি। আবার এই প্রাসাদ থেকে বাইরেও চলে আসতে পারি।

ইদং শরীরং শৃণু সূক্ষ্মসংজ্ঞিতং
লিঙ্গং ত্বপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্।
সবাসনং কর্মফলানুভাবকম্
স্বাজ্ঞানতোঽনাদিরুপাধিরাত্মনঃ॥ ৯৭

অন্বয় : [হে শিষ্য] শৃণু (শোন) ইদং সূক্ষ্ম-সংজ্ঞিতং শরীরং (এই সূক্ষ্ম বলে বর্ণিত শরীর) লিঙ্গং তু (লিঙ্গশরীর বলেও কথিত হয়) [এই শরীর] অপঞ্চীকৃত-ভূত সম্ভবম্ (অপঞ্চীকৃত ভূতগুলির থেকে উৎপন্ন) সবাসনং (বাসনা যুক্ত) কর্মফল-অনুভাবকম্ (কর্মফলের অনুভাবক) স্ব-অজ্ঞানতঃ (স্বীয় স্বরূপজ্ঞানের অভাববশত) আত্মনঃ (আত্মার) অনাদিঃ-উপাধিঃ (অনাদি উপাধি)।

সরলার্থ : শোন, এই সূক্ষ্মশরীরকে লিঙ্গশরীরও বলা হয়। এ অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের

সমবায়ে গঠিত, বাসনাযুক্ত, কর্মফলের অনুভাবক আর জীবের স্বরূপজ্ঞানের অভাব-বশত এ আত্মার অনাদি উপাধি।

ব্যাখ্যা : শিষ্যকে বলছেন, শোন, যাকে সূক্ষ্মশরীর বলে বর্ণনা করা হলো তাকে লিঙ্গশরীরও বলা হয়। অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত এই শরীরের উপাদান। এর বাসনা আছে, কর্মফলের অনুভব আছে। অজ্ঞানের জন্যে নিজের স্বরূপকে যতদিন জানতে পারছে না ততদিন এ অনাদি উপাধি রূপে আত্মাকে আবরণ করে থাকে। বলছেন, 'ইদং শরীরং শৃণু সূক্ষ্মসংজ্ঞিতং লিঙ্গং তু-অপঞ্চীকৃতভূত-সম্ভবম্'; এই সূক্ষ্মশরীর বলে যার বর্ণনা করা হচ্ছে তাকে লিঙ্গশরীরও বলা হয়। লিঙ্গ কথাটা 'লিগি' ধাতু থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে স্মরণ করানো। সূক্ষ্মশরীরকে লিঙ্গশরীরও বলা হয় কারণ সব কর্ম সূক্ষ্মভাবে এই শরীরে মিশে থাকে। স্মৃতি ও বাসনাও এই শরীরে থাকে। এই শরীর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে যা কিছু করা হচ্ছে তার পেছনে একজন কারয়িতা আছেন। এই শরীর 'অপঞ্চীকৃত ভূত-সম্ভবম্'। সূক্ষ্ম পঞ্চভূত পঞ্চীকরণের মধ্যে দিয়ে, একটি অন্য চারটির সঙ্গে মিশে, এক একটি স্থূল ভূতের রূপ নেয়। এই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরের উপাদান যদিও পঞ্চভূত কিন্তু এদের কোনও মিশ্রণ হয়নি। এরা 'অপঞ্চীকৃত' অর্থাৎ আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও মৃত্তিকা, প্রত্যেকে একরকমই আছে, এরা ভেঙে যায়নি বা একটির বড় অংশের সঙ্গে অন্য চারটি মিশে যায়নি। 'সবাসনং কর্মফল-অনুভাবকম্'; এর বাসনা আছে। পূর্ব পূর্ব জন্মের অতৃপ্ত সব বাসনা এ বহন করছে। আর ভালোমন্দ কর্মের যে সুখদুঃখরূপ ফল সেসবের অনুভবও এর আছে। আমাদের যখন মৃত্যু হয় তখন আমাদের স্থূলশরীরটা ফেলে রেখে এই লিঙ্গদেহ বেরিয়ে আসে। সে সঙ্গে করে নিয়ে আসে কৃতকর্মের বোঝা আর অতৃপ্ত সমস্ত বাসনা। এই বাসনা আর সঞ্চিত কর্মের ফল তাকে আবার একটা স্থূলদেহ অবলম্বন করে জন্মাতে বাধ্য করে। 'স্ব-অজ্ঞানতঃ-অনাদিঃ-উপাধিঃ-আত্মনঃ'। নিজেকে চিনি না, এটাই হচ্ছে অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের জন্যে এই লিঙ্গশরীর আত্মার অনাদি উপাধি হয়ে রয়েছে। আত্মার ওপর একে আরোপ করেছি, তাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে 'আমি' বলে চিনছি না, ওই লিঙ্গশরীরটাকেই 'আমি' ভাবছি। আমার অজ্ঞান, অবিদ্যা আমাকে দিয়ে এই ভুলটা করাচ্ছে। কিন্তু একে অনাদি উপাধি বলছেন কেন ? কারণ যতদিন অজ্ঞান আছে ততদিন এই লিঙ্গশরীরও আত্মার ওপর উপাধিরূপে আছে। অজ্ঞান অনাদি, তাই একে আত্মার অনাদি উপাধি বলছেন। স্থূল দেহ পালটাচ্ছে কিন্তু জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই সূক্ষ্মশরীর ভিন্ন ভিন্ন স্থূল দেহ অবলম্বন করে আসছে আর যাচ্ছে। এই ভাবেই চলে, যতদিন না স্বরূপজ্ঞান হয়ে জীবের উপাধির নাশ হয়।

স্বপ্নো ভবত্যস্য বিভক্ত্যবস্থা
স্বমাত্রশেষেণ বিভাতি যত্র।
স্বপ্নে তু বুদ্ধিঃ স্বয়মেব জাগ্রৎ-
কালীননানাবিধবাসনাদিভিঃ ॥ ৯৮
কর্ত্রাদি ভাবং প্রতিপদ্য রাজতে
যত্র স্বয়ং ভাতি হ্যয়ং পরাত্মা।
ধীমাত্রকোপাধিরশেষসাক্ষী
ন লিপ্যতে তৎকৃতকর্মলেশৈঃ ॥
যস্মাদসঙ্গস্তত এব কর্মভি-
র্ন লিপ্যতে কিঞ্চিদুপাধিনা কৃতৈঃ ॥ ৯৯

অন্বয়: অস্য (এই সূক্ষ্মশরীর অভিমানী জীবের) বিভক্তি-অবস্থা (জাগ্রত অবস্থা থেকে ভিন্ন) স্বপ্নঃ ভবতি (স্বপ্নাবস্থা হয়) যত্র (যেখানে) স্বমাত্রশেষেণ (নিজের রূপ শেষ পর্যন্ত) বিভাতি (দীপ্তিমান থাকে) স্বপ্নে তু বুদ্ধি স্বয়ম্-এব (স্বপ্নে বুদ্ধি নিজেই) জাগ্রৎ-কালীন-নানাবিধ-বাসনাদিভিঃ (জাগ্রৎকালীন নানা বাসনার সহায়ে) কর্তৃ-আদি-ভাবং (কর্তৃত্ব ইত্যাদি ভাব) প্রতিপদ্য (প্রাপ্ত হয়ে) রাজতে (বিরাজ করে) যত্র (যেখানে) অয়ম্ পরাত্মা (এই পরমাত্মা) স্বয়ম্ হি ভাতি (নিজেই প্রকাশিত হয়) অশেষসাক্ষী ([স্বপ্নের সকল বস্তুর] চিরকালীন দ্রষ্টা) ধী-মাত্রক-উপাধিঃ (কেবলমাত্র বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত) তৎকৃতকর্মলেশৈঃ (বুদ্ধির দ্বারা কল্পিত কর্মের লেশ মাত্রের দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) যস্মাৎ (যেহেতু) [আত্মা] অসঙ্গঃ (সঙ্গরহিত, নির্লিপ্ত) ততঃ এব (সেই কারণে) উপাধিনা কৃতৈঃ (বুদ্ধিরূপ উপাধিদ্বারা কৃত) কর্মভিঃ (কর্মগুলির দ্বারা) কিঞ্চিৎ ন লিপ্যতে (একটুও লিপ্ত হয় না)।

সরলার্থ : সূক্ষ্মদেহাভিমানী জীবের স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থার থেকে ভিন্ন অবস্থা। স্বপ্নে জীব নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। স্বপ্নে বুদ্ধি নিজেই জাগ্রৎকালীন নানাবিধ বাসনার সাহায্যে কর্তৃত্ব ইত্যাদি ভাব অবলম্বন করে বিরাজ করে। স্বপ্নে সূক্ষ্মশরীরের সাক্ষী পরমাত্মা কেবল বুদ্ধিমাত্র উপাধিযুক্ত হয়ে থাকেন কিন্তু বুদ্ধি-কল্পিত কর্মে লিপ্ত হন না। কারণ আত্মা অসঙ্গ তাই বুদ্ধিকৃত কর্মের দ্বারা একটুও লিপ্ত হন না।

ব্যাখ্যা : স্বপ্নে যে সূক্ষ্মশরীরের বিশেষ প্রকাশ সেইটে এখানে বলছেন। স্বপ্নে মানুষ নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। কোনও বাইরের জিনিসের সাহায্য সে নেয় না। বলছেন, 'স্বপ্নে তু বুদ্ধিঃ স্বয়মেব জাগ্রৎকালীননানাবিধবাসনাদিভিঃ কর্ত্রাদি-ভাবং প্রতিপদ্য রাজতে'; স্বপ্নে বুদ্ধি জাগ্রত অবস্থার নানা বাসনার সাহায্যে কর্তৃত্বাদি ভাব নিয়ে বিরাজ করে। এখানে বুদ্ধি বলতে অন্তঃকরণ বোঝাচ্ছেন। স্বপ্নে আমরা কত কি করি। আমি

তো বিছানায় পড়ে আছি, ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করছে না, অথচ স্বপ্নে একটা জগৎ তৈরী হচ্ছে। কত কি করতে চাই যা বাস্তবে ঘটে ওঠে না, কিন্তু স্বপ্নে সেগুলো করে ফেলি। এসব হয় কি করে ? অন্তঃকরণ তো একটা জড়বস্তু, সে এইভাবে নিজেকে কি করে প্রকাশ করে ? বলছেন, 'যত্র স্বয়ং ভাতি হি-অয়ং পরাত্মা'; 'যত্র' মানে যেখানে অর্থাৎ স্বপ্নে স্বয়ং পরমাত্মাই সবকিছু ভাস্বর করে তুলছেন, স্বপ্নের জগৎ-কে চালাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর ওপর 'ধীমাত্রক-উপাধি', শুধু অন্তঃকরণই উপাধিরূপে আছে আর তিনি 'অশেষ সাক্ষী', চিরকালের সাক্ষীস্বরূপ হয়ে আছেন। 'ন লিপ্যতে তৎকৃতকর্মলেশৈঃ'; কর্তৃত্ব ভাব নিয়ে অন্তঃকরণের যেসব কাজকর্ম সেগুলোর দ্বারা তিনি লিপ্ত হন না, যদিও তিনি আছেন বলেই সেগুলি চলছে। তিনি দ্রষ্টা, সাক্ষী। কারণ 'অসঙ্গঃ-তত এব কর্মভিঃ-ন লিপ্যতে কিঞ্চিৎ-উপাধিনা কৃতৈঃ'। তিনি 'অসঙ্গঃ', কিছুতেই জড়িয়ে থাকেন না, নির্লিপ্ত। তাই অন্তঃকরণরূপ যে উপাধির আড়ালে তিনি আছেন, সেই উপাধি-কৃত কোনও কিছুতেই তিনি লিপ্ত হন না। আবার স্বপ্নের রাজ্যে আধিপত্য করছে যে অন্তঃকরণ সে তো জড়। তাহলে আমরা যে স্বপ্নে মানুষজনকে চেতনরূপে দেখি, সেটা হয় কি করে ? হয়, কারণ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার চৈতন্যের আভায় তারা চৈতন্যময়রূপে প্রকাশিত হয়। আমাদের জাগ্রত অবস্থাতেও যা কিছু কাজকর্ম-ভোগসুখ-দুঃখবেদনা তিনি আছেন বলেই সম্ভব হয়, কিন্তু তিনি কোনও কিছুতে লিপ্ত হন না। তখন তাঁর ওপর দেহ-ইন্দ্রিয়াদি-অন্তঃকরণ উপাধি রূপে চাপানো থাকে। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় এই স্থূল দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলো সব ঘুমে অচেতন, সেখানে শুধু অন্তঃকরণ রাজত্ব করছে। সে-ই আত্মার একমাত্র উপাধি, তখনও সব কল্পিত কাজকর্ম সুখ-দুঃখ-ভয়-ভ্রান্তি চলছে শুধু সেই সাক্ষীস্বরূপ নির্লিপ্ত আত্মা আছেন বলে। জাগ্রত অবস্থায় বাইরের জগৎকে স্থূলভাবে অনুভব করি তাই বাস্তব বলে মনে হয়। কিন্তু স্বপ্নের রাজ্যে যা কিছু দেখি বা করি সেগুলো স্থূল জগতের প্রতিচ্ছায়ারূপে অন্তঃকরণে প্রতিভাত হয়।

সর্বব্যাপৃতিকরণং লিঙ্গমিদং স্যাচ্চিদাত্মনঃ পুংসঃ।
বাস্যাদিকমিব তক্ষ্ণস্তেনৈবাত্মা ভবত্যসঙ্গোঽয়ম্।। ১০০

অন্বয় : তক্ষ্ণঃ (ছুতোর মিস্ত্রীর) বাস্য-আদিকম্-ইব (বাসুলি প্রভৃতি যন্ত্রের মতো) চিদাত্মনঃ পুংসঃ (চৈতন্যস্বরূপ আত্মা পুরুষের) সর্বব্যাপৃতি-করণম্ (সকল ব্যাপারের কাজকর্ম) ইদং লিঙ্গং স্যাৎ (এই লিঙ্গশরীর নির্ভর হয়) তেন-এব (এই কারণে) অয়ম্-আত্মা (এই আত্মা) অসঙ্গঃ ভবতি (অসঙ্গ হন)।

সরলার্থ : ছুতোর মিস্ত্রির সব কাজকর্ম যেমন বাসুলি প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে চলে তেমনি চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সব ব্যাপারই লিঙ্গশরীরের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ছুতোর মিস্ত্রি

যেমন নিজের যন্ত্রপাতির থেকে আলাদা, সেইরকম এই আত্মাও লিঙ্গশরীরের থেকে পৃথক ও অসঙ্গ হয়ে থাকেন।

ব্যাখ্যা : দেহাদি উপাধির আবরণের মধ্যে আমাদের চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আছেন। তিনি আছেন বলেই আমাদের বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ, কাজ-কর্ম, চিন্তা-ভাবনা সব চলছে। এগুলো কি করে হচ্ছে ? বলছেন, 'সর্বব্যাপৃতি-করণং লিঙ্গম্-ইদম্ স্যাৎ-চিদাত্মনঃ পুংসঃ'; চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের বা আত্মার সর্বব্যাপারের কাজকর্ম চলে ওই লিঙ্গশরীর আছে বলে। আমরা দেখি পুরুষই কাজ করছে, ভোগ করছে, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। আত্মা তো নির্লিপ্ত, সাক্ষীস্বরূপ, তিনি কি কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন? না। আত্মা বা পুরুষের উপস্থিতিতে সব হচ্ছে, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। 'বাস্যাদিকম্-ইব তক্ষ্ণঃ-তেন-এব-আত্মা ভবতি-অসঙ্গঃ-অয়ম্'। ছুতোর মিস্ত্রির যেমন যন্ত্রপাতি, তেমনিই আত্মার এই লিঙ্গশরীর। ছুতোর মিস্ত্রিকে কাঠের কাজের জন্যে অনেক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয় কিন্তু সে নিজে তো ওইসব যন্ত্রপাতির থেকে আলাদাই থাকে। সেই রকমই যদিও এই লিঙ্গশরীরের সাহায্যেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হচ্ছে, কিন্তু তিনি নিজে এ সবের থেকে আলাদা হয়ে থাকেন, কিছুতেই লিপ্ত হন না।

অন্ধত্বমন্দত্বপটুত্বধর্মাঃ
সৌগুণ্যবৈগুণ্যবশাদ্ধি চক্ষুষঃ।
বাধির্যমূকত্বমুখাস্তথৈব
শ্রোত্রাদিধর্মা ন তু বেত্তুরাত্মনঃ।। ১০১

অন্বয় : হি চক্ষুষঃ (চক্ষুরই) সৌগুণ্য-বৈগুণ্য-বশাৎ (নির্দোষ বা দোষযুক্ত হওয়ার বশে) অন্ধত্ব-মন্দত্ব-পটুত্ব-ধর্মাঃ (অন্ধত্ব, অল্পদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্নতারূপ অবস্থা হয়) তথা-এব (সেই রকমই) বাধির্য-মূকত্ব-মুখাঃ (বধিরতা, মূকতা প্রভৃতি) শ্রোত্রাদিধর্মাঃ (কর্ণ ইত্যাদির ধর্ম) তু বেত্তুঃ-আত্মনঃ ন (কিন্তু বেত্তা আত্মার নয়)।

সরলার্থ : চোখের দোষ থাকলে অথবা না থাকলে সেই কারণে মানুষের মধ্যে অন্ধত্ব, অল্পদৃষ্টি বা তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখা যায়। সেইরকম কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের দোষে বধিরতা, মূকত্ব ইত্যাদি হয়। কিন্তু যে আত্মা এইসব দোষ বা গুণের জ্ঞাতা তাঁর মধ্যে এই দোষ-গুণগুলি আসে না।

ব্যাখ্যা : চোখের দোষ-গুণের উপর নির্ভর করে মানুষের অন্ধত্ব, দৃষ্টির অল্পতা বা তীক্ষ্ণতা দেখা যায়। কিন্তু এগুলো চোখেরই ব্যাপার, আত্মার নয়। সেইরকমই বধিরতা বা মূকত্ব ইত্যাদি। যেসব ইন্দ্রিয়গুলি অবলম্বন করে শরীরের ক্রিয়া, সেগুলোর দোষ-

গুণ শরীরের ব্যাপার, আত্মার কিছু নয়। আত্মা ঐ দোষ-গুণগুলির জ্ঞাতা, কিন্তু ঐ দোষ-গুণ তাঁকে স্পর্শ করে না।

উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসবিজৃম্ভণক্ষুৎ-
প্রস্যন্দনাদ্যুৎক্রমণাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রাণাদিকর্মাণি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ
প্রাণস্য ধর্মাবশনাপিপাসে।। ১০২

অন্বয় : উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাস-বিজৃম্ভণ-ক্ষুৎ-প্রস্যন্দনাদি-উৎক্রমণাদিকাঃ (শ্বাসত্যাগ, শ্বাসগ্রহণ, হাইতোলা, হাঁচি, কফাদির নিঃসরণ, দেহত্যাগ ইত্যাদি) ক্রিয়াঃ (কর্ম) প্রাণাদি-কর্মাণি (প্রাণ ইত্যাদি পঞ্চবায়ুর কাজ) তজ্জ্ঞাঃ (প্রাণাদির তত্ত্ব যাঁরা জানেন তাঁরা) বদন্তি (বলেন) অশনা-পিপাসে (ক্ষুধা ও পিপাসা) প্রাণস্য ধর্মৌ (প্রাণের দুই ধর্ম)।

সরলার্থ : শ্বাসত্যাগ, শ্বাসগ্রহণ, হাইতোলা, হাঁচি, শরীরের পরিত্যাজ্য বস্তুর নির্গমন, দেহত্যাগ ইত্যাদি প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর কাজ। যাঁরা প্রাণের তত্ত্ব জানেন তাঁরা এইরকমই বলে থাকেন। ক্ষুৎ-পিপাসা প্রাণের আর দুটি ধর্ম।

ব্যাখ্যা : পঞ্চপ্রাণের কি কি কাজ সেটা বলছেন। পঞ্চপ্রাণ হল প্রাণ-অপান-উদান-ব্যান-সমান। আমাদের শরীরে সর্বত্র যাতে বায়ু-চলাচল অব্যাহত থাকে তার জন্যে এই পঞ্চপ্রাণের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ভূমিকা আছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, হাইতোলা, হাঁচি ইত্যাদি আমাদের শরীরে বায়ু-চলাচলের তারতম্য অনুযায়ী ঘটে। আর প্রাণ উৎক্রান্ত হলে যে শরীর যায় এটাও সকলের জানা। ক্ষুধা ও তৃষ্ণাও, যার প্রাণ আছে তারই থাকে। বলছেন, প্রাণের তত্ত্ব যাঁরা জানেন তাঁরা বলেন যে, এ সবই হচ্ছে প্রাণের ক্রিয়া।

অন্তঃকরণমেতেষু চক্ষুরাদিষু বর্ষ্মণি।
অহমিত্যভিমানেন তিষ্ঠত্যাভাসতেজসা।। ১০৩

অন্বয় : এতেষু চক্ষুঃ-আদিষু (এইসব চক্ষু ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলিতে) বর্ষ্মণি (শরীরে) অহম্-ইতি-অভিমানেন (আমি কর্তা ও ভোক্তা এই ভাবের আমিত্ববৃত্তির সংযোগে) অন্তঃকরণ (অন্তঃকরণ) আভাস-তেজসা (চিদাভাসের তেজের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে) তিষ্ঠতি (থাকে)।

সরলার্থ : অন্তঃকরণ আত্মার তেজে উদ্ভাসিত হয়ে, চক্ষু ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহে এবং দেহে 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা' এইরূপ আমিত্ববৃত্তি অবলম্বন করে বিদ্যমান থাকে।

ব্যাখ্যা : এখানে অন্তঃকরণের পরিচয় দিচ্ছেন। আগেই বলেছেন বিভিন্ন রকমের ব্যবহারের ভিত্তিতে অন্তঃকরণের চারটি ভাগ। মন-বুদ্ধি-চিত্ত ও অহঙ্কার। মন হচ্ছে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা, চিত্ত হচ্ছে ভাবাবেগের ধারক ও বাহক আর অহঙ্কার হচ্ছে 'আমি আমার' বোধ। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ হলে আমরা যেভাবে ব্যবহার করি সেটা আমাদের অন্তঃকরণ ঠিক করে দেয়। এই যোগাযোগটা হয় আমাদের চোখ, কান ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে আর উপযোগী ব্যবহারটা হয় বাক্, পাণি, পাদ ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয়গুলোর সহায়তায়। এই ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে মন-বুদ্ধি-চিত্ত তো কাজ করছেই, সঙ্গে সঙ্গে 'আমার' এইরকম অনুভব হয়েছে বলে 'আমি' এইভাবে ব্যবহার করছি, আমিত্বের এই অভিমানও সব সময় থাকছে। তাই বলছেন, অন্তঃকরণ দেহে ও ইন্দ্রিয়গুলিতে আমিত্বের অভিমান নিয়ে 'তিষ্ঠতি-আভাস-তেজসা', চিদাভাসের তেজের দ্বারা ভাস্বর হয়ে থাকে। আত্মা ছাড়া সবই জড়। অন্তঃকরণও জড় পদার্থ। কিন্তু এর পিছনে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আছেন। আত্মাকে আবৃত করে একটা উপাধিরূপে এই অন্তঃকরণ আছে। তাই আত্মার চৈতন্যের প্রভায় অন্তঃকরণের সব কাজকর্ম চৈতন্যময় বলে দেখায়।

অহংকারঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্তা ভোক্তাভিমান্যয়ম্।
সত্ত্বাদিগুণযোগেন চাবস্থাত্রয়মশ্নুতে।। ১০৪

অন্বয় : সঃ অহঙ্কারঃ (সেই অহঙ্কার) কর্তা-ভোক্তা-অভিমানী (ভালো-মন্দ কাজের কর্তা, সুখ-দুঃখের ভোক্তা এই বোধে অভিমানী) বিজ্ঞেয়ঃ (এটা জানতে হবে) অয়ং চ (এটাই) সত্ত্বাদিগুণযোগেন (সত্ত্বাদি তিন গুণের সংযোগে) অবস্থাত্রয়ম্ (জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ : সেই অহঙ্কারকে ভালো-মন্দ কাজের 'আমি কর্তা' ও সুখদুঃখের 'আমি ভোক্তা' এই ভাবের অভিমানী বলে জানবে। এই অহঙ্কারই সত্ত্বাদি তিন গুণের সংযোগে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা : আমাদের অহঙ্কার কোন্‌টা ? 'আমি' বুদ্ধি; 'আমি কর্তা' 'আমি ভোক্তা'— এই ভাব। আমরা দেহে 'আমি'বুদ্ধি করি। তাই চোখ কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে জগতের সঙ্গে যে সংযোগ, সেগুলোর অনুভব 'আমার' হচ্ছে বলে মনে করি। কর্মেন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে যা কিছু করি মনে করি 'আমি' করছি। এমনি করে আমাদের অহঙ্কার দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে একাকার হয়ে থাকে। এই অহংকার বা 'আমি' বুদ্ধির উপর চিদাত্মার ছায়া পড়ে। তাই এই 'আমি'বুদ্ধি যা-কিছুতেই আরোপিত হয়, তাই চেতন বলে মনে হয়। এই কারণেই শরীর-মন-বুদ্ধি জড় হলেও চেতন বলে মনে

হয়। বলছেন, 'অহঙ্কারঃ সঃ বিজ্ঞেয়ঃ কর্তা ভোক্তাভিমানী'। এটা জানতে হবে যে সেই অহঙ্কার হচ্ছে 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা' এই অভিমানযুক্ত। আর এ 'সত্ত্বাদিগুণযোগেন চ-অবস্থা ত্রয়ম্-অশ্নুতে'; এই অহঙ্কারই প্রকৃতির তিনটি গুণ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনটি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই তিনটি অবস্থা হচ্ছে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। আমাদের এই তিনটি অবস্থায় এক একটি গুণের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। জাগ্রত অবস্থায় রজঃ গুণের প্রাধান্য। স্বপ্ন অবস্থায় সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য আর তমঃ গুণের প্রাধান্য সুষুপ্তি অবস্থায়।

বিষয়াণামানুকূল্যে সুখী দুঃখী বিপর্যয়ে।
সুখং দুঃখং চ তদ্ধর্মঃ সদানন্দস্য নাত্মনঃ॥ ১০৫

অন্বয় : [সেই অহঙ্কার] বিষয়াণাম্-আনুকূল্যে (বিষয়সমূহের অনুকূলতায়) সুখী (সুখী) বিপর্যয়ে (প্রতিকূলতায়) দুঃখী (দুঃখী) সুখং দুঃখং চ (সুখ ও দুঃখ) তৎ-ধর্মঃ (তার [সেই অহঙ্কারের] ধর্ম) সদানন্দস্য আত্মনঃ ন (সদানন্দরূপ আত্মার নয়)।

সরলার্থ : বিষয়সমূহ অনুকূল হলে সেসবের থেকে সুখ আসে তখন অহঙ্কার সুখী হয়। আর বিষয় প্রতিকূল হলে যে দুঃখ আসে তাতে অহঙ্কার দুঃখী হয়। এই সুখ-দুঃখ অহঙ্কারের ধর্ম, সদানন্দরূপ আত্মার নয়।

ব্যাখ্যা : অহঙ্কার বা 'আমি' বুদ্ধির জন্যে কর্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়র মাধ্যমে বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগ হয়। এই বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে যোগ যদি আমাদের মনোমত অবস্থার সৃষ্টি করে তাহলে আমরা সুখ অনুভব করি আর এর বিপরীত অবস্থা হলে আমাদের দুঃখের অনুভব হয়। কিন্তু এই সুখ-দুঃখ অহঙ্কারেরই, আত্মার নয়। দেহের থেকে আত্মা আলাদা। তার কোনও সুখ-দুঃখ নেই। তাই দেহকেন্দ্রিক যা কিছু, সুখ-দুঃখ-প্রেম-প্রীতি-ক্রোধ-বিদ্বেষ, কিছুই আত্মাকে স্পর্শ করে না। এসব দেহের ব্যাপার, অন্তঃকরণের ব্যাপার, অহঙ্কারের ধর্ম। আত্মা নির্লিপ্ত, এসবের থেকে আলাদা।

আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃপ্রিয়ঃ।
স্বত এব হি সর্বেষামাত্মা প্রিয়তমো যতঃ।
তত আত্মা সদানন্দো নাস্য দুঃখং কদাচন॥ ১০৬

অন্বয় : প্রেয়ান্ বিষয়ঃ (প্রীতিকর বিষয়) আত্মার্থত্বেন হি (আত্মার প্রয়োজনেই) প্রিয়ঃ (প্রিয়) স্বতঃ (নিজের গুণে) ন (নয়) যতঃ (যেহেতু) আত্মা স্বতঃ এব হি (আত্মা নিজের স্বভাবেই) সর্বেষাং প্রিয়তমঃ (সকলের প্রিয়তম) ততঃ (সেইজন্য) আত্মা সদানন্দঃ (আত্মা নিত্য-আনন্দস্বরূপ) অস্য (এর) কদাচন (কখন) দুঃখং ন (দুঃখ হয় না)।

সরলার্থ : প্রীতিকর বিষয় আত্মার মধ্যে দিয়ে অনুভূত হয় বলেই প্রিয় হয়, বিষয়ের নিজের গুণে হয় না। যেহেতু আত্মা নিজের স্বভাবেই সকলের কাছে প্রিয়তম সেইজন্যে আত্মা নিত্যানন্দস্বরূপ, এর কখনও কোনও দুঃখ নেই।

ব্যাখ্যা : কত বিষয় থেকে আমরা আনন্দ পাই, সে আনন্দ কি বিষয়ের গুণে পাই ? তা নয়। আমার মধ্যে যে আনন্দস্বরূপ আত্মা আছেন তাঁর আনন্দস্পর্শেই বিষয় প্রীতিকর ও প্রিয় হয়। 'আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ঃ ন স্বতঃ প্রিয়ঃ'; প্রীতিকর বিষয়গুলি আনন্দরূপ আত্মার মধ্যে দিয়ে অনুভবে আসে বলেই প্রিয় হয়, বিষয়ের নিজের গুণে নয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলছেন, 'ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি' (বৃ, ২।৪।৫)। আত্মার প্রীতিসাধনের জন্যে সর্ববস্তু প্রিয় হয়, বস্তুর গুণে নয়। আমাদের সকলের অভিজ্ঞতাও তাই। যা কিছু আত্মার তৃপ্তিসাধন করে সেইসবই আমাদের প্রিয়বস্তু হয়। এরকম কেন হয় ? কারণ, 'স্বতঃ এব হি সর্বেষাম্-আত্মা প্রিয়তমঃ'। নিজের স্বভাবেই আত্মা সকলের প্রিয়তম। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই আছে, 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা' (বৃ, ১।৪।৮)—এই আত্মা পুত্রের থেকে প্রিয়, বিত্তের থেকে প্রিয়, অন্য সবকিছুর থেকে প্রিয়, কারণ এই আত্মা সমস্ত কিছুর থেকে অন্তরতর। আমার অন্তরতম এই আত্মা সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। যিনি আমার সত্তা, আমার জ্ঞান, আমার আনন্দ তিনি তো আমার প্রিয়তম হবেনই, কারণ তিনি ছাড়া 'আমি' তো নেই। যা আমাদের প্রিয় তা-ই আনন্দের উদ্রেক করে। তাই বলছেন, 'ততঃ আত্মা সদানন্দঃ ন অস্য দুঃখং কদাচন'—তাই জন্যে আত্মা নিত্যানন্দস্বরূপ, এঁর কখনও দুঃখ হয় না। তার মানে কি আমাদের দুঃখের অনুভূতির পেছনে আত্মা নেই ? তা নয়। সব অনুভূতির পিছনেই তিনি আছেন দ্রষ্টা রূপে। কিন্তু আত্মার স্বরূপ হচ্ছে আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। তাই বলছেন আত্মাকে দুঃখ কখনও স্পর্শ করতে পারে না।

যৎ সুষুপ্তৌ নির্বিষয় আত্মানন্দোঽনুভূয়তে।
শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চ জাগ্রতি॥ ১০৭

অন্বয় : যৎ (যে কারণে [আত্মা সদানন্দ বলে]) সুষুপ্তৌ (গাঢ় নিদ্রায়) নির্বিষয়ঃ (বিষয়শূন্য) আত্মানন্দঃ (আত্মানন্দ) অনুভূয়তে (অনুভূত হয়) [আত্মার আনন্দ-স্বরূপত্বের প্রমাণরূপে] শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষম্-ঐতিহ্যম্-অনুমানম্ (শ্রুতি প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য অনুমান এই চার প্রমাণ) চ জাগ্রতি (জাগ্রত হয়ে আছে)।

সরলার্থ : আত্মা সদানন্দ বলে মানুষ গভীর নিদ্রায় বিষয়শূন্য আত্মানন্দ অনুভব করে।

আত্মা যে আনন্দস্বরূপ সেবিষয়ে চার প্রমাণ শ্রুতি প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য ও অনুমান সদা জাগরূক।

ব্যাখ্যা : বলছেন, আত্মা যে সদানন্দ সেটা বোঝা যায় আমাদের সুষুপ্তির সময়ের সুখের অনুভব থেকে। গভীর ঘুম, স্বপ্ন নেই, ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করছে না, মনও ঘুমিয়ে পড়েছে, তারপর জেগে উঠে ভাবছি, আঃ, কি আরাম হয়েছে, এত ভালো ঘুমিয়েছি, শরীর-মন সব যেন জুড়িয়ে গেছে। এই অনুভব হয় কেন ? কারণ সুষুপ্তির সময় আমরা আত্মায় অবস্থান করি, তবে অজ্ঞান থাকে বলে সেটা জানতে পারি না। তাই বলছেন, 'সুষুপ্তৌ নির্বিষয় আত্মানন্দ অনুভূয়তে'; সুষুপ্তিতে বিষয়হীন আত্মানন্দের অনুভব হয়। তারপর বলছেন, আত্মা যে আনন্দস্বরূপ তার চার রকমের প্রমাণ আছে। 'শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষম্-ঐতিহ্যম্-অনুমানম্ চ জাগ্রতি'; শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান, এই চার প্রমাণ জাগরূক হয়ে আছে। শ্রুতি কি বলছেন ? শ্রুতিতে বারবার করে বলছেন, আত্মা বা ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। 'আনন্দো ব্রহ্মেতি' (তৈ, ৩।৬), আনন্দই ব্রহ্ম। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (বৃ, ২।৫।১৯), এই আত্মা ব্রহ্ম। অস্য এষঃ পরমঃ আনন্দঃ (বৃ, ৪।৩।৩২); এই ব্রহ্ম জীবের পরম আনন্দের অবস্থা। আর সুষুপ্তির সময় যে আনন্দ হয়, তা আত্মার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইন্দ্রিয় ও মন সুষুপ্তিতে কাজ করে না। কাজেই বাইরের বিষয়ের সঙ্গে আমার তখন সংযোগ থাকে না। আবার বাইরের জগতের স্মৃতিও তখন কাজ করে না, কারণ মন-বুদ্ধি সব তখন নিষ্ক্রিয়। তাহলে কিসের জন্য সুষুপ্তির সময় এত পরিতৃপ্তি হয় ? আনন্দস্বরূপ আত্মার সান্নিধ্যের জন্যে। এই অভিজ্ঞতাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এছাড়া, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা, যাঁদের অপরোক্ষ অনুভূতি হয়েছে, তাঁরা চিরকাল বলে এসেছেন যে, আত্মা আনন্দস্বরূপ। তাঁদের নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা এরকম বলেছেন। তাঁদের কথা আত্মার সদানন্দ স্বরূপের ঐতিহ্য প্রমাণ। আর আমরা এ-ও দেখি যে, আত্মা আমাদের সবচেয়ে প্রিয়, নিজের থেকে বেশী প্রিয় আমাদের আর কিছুই নেই। যা আনন্দ দেয়, তা-ই আমাদের প্রিয় বলে মনে হয়। এ থেকে অনুমান হয়, আত্মা আমাদের এত প্রিয় আনন্দস্বরূপ বলেই।

অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিরনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া যয়া জগৎ সর্বমিদং প্রসূয়তে।। ১০৮

অন্বয় : ত্রিগুণাত্মিকা (ত্রিগুণাত্মিকা) অব্যক্তনাম্নী (অব্যক্তনামের) পরমেশশক্তিঃ (ব্রহ্মের শক্তি) অনাদি-অবিদ্যা (অনাদি অবিদ্যা) পরা (কারণস্বরূপা) মায়া এব (মায়া-ই) [এটা] সুধিয়া (বিজ্ঞব্যক্তিদের দ্বারা) কার্য-অনুমেয়া (কার্যের থেকে অনুমান করা হয়) যয়া (যে মায়ার দ্বারা) ইদং সর্বং জগৎ (এই সমস্ত জগৎ) প্রসূয়তে (প্রসূত হয়)।

সরলার্থ : মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মের শক্তি। মায়াকে অব্যক্তও বলা হয়। এই মায়া অনাদি, ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণ সমন্বিতা, কারণস্বরূপা। বিজ্ঞ ব্যক্তি মায়ার জগৎসৃষ্টির কাজ থেকে এর অস্তিত্ব অনুমান করেন।

ব্যাখ্যা : এখানে মায়ার কথা বলছেন। বলছেন, 'অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিঃ-অনাদি-অবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা মায়া এব'; মায়া পরমেশ্বরের শক্তি, 'অব্যক্ত' এর নাম। মায়া অনাদি, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণ সমন্বিতা এবং কারণস্বরূপা। 'যয়া জগৎ সর্বম্-ইদং প্রসূয়তে'—এই মায়ার দ্বারা সমস্ত জগৎ প্রসূত হয়েছে। 'সুধিয়া কার্যানুমেয়া এব'—বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা মায়ার কাজ দেখে এর অস্তিত্ব বুঝে থাকেন। কোন্ কাজ থেকে মায়ার অস্তিত্ব অনুমান করা হয় ? বিশ্বসৃষ্টির কাজ। বেদান্ত মতে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম তাঁর অনির্বচনীয় মায়াশক্তির সাহায্যে এই সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেছেন। অবশ্য সৃষ্টি মানে আমরা বুঝি যা অব্যক্ত ছিল তা ব্যক্ত হলো। সৃষ্টির পূর্ব অবস্থায় প্রকৃতির তিন গুণ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ সাম্যাবস্থায় থাকে। এই সাম্যের মধ্যে বিক্ষেপ উপস্থিত হলে সৃষ্টিকার্য শুরু হয়ে যায়। তিনটি গুণ তখন ভাগ হয়ে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে মিশে যা অব্যক্ত ছিল তাকে ব্যক্ত করতে থাকে। তাই মায়াকে বলছেন 'অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিঃ'। এই মায়া কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি নয়। সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী শুদ্ধচৈতন্য পুরুষের থেকে জড় প্রকৃতি আলাদা। বেদান্ত মতে মায়া ব্রহ্মের শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ সমন্বিতা বলে মায়াকে বলা হয় ত্রিগুণাত্মিকা। মায়া কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়, মায়াকে কোনও সংজ্ঞা দিয়ে নির্দেশ করা যায় না। যে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই জগতের প্রকাশ হয় সেইসব পরিবর্তন আর পরিণামের কারণস্বরূপা এই মায়া। মায়াকে 'অনাদি অবিদ্যা' বলা হয়। অবিদ্যা, কারণ মায়ার প্রভাবে মানুষ নিজের ব্রহ্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়। আমার আত্মাই স্বরূপত ব্রহ্ম, এটা ভুলে গিয়ে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বাঁধা পড়ে। সত্যকে আবৃত করে এই ভুল দেখানো অবিদ্যা বা মায়ার কাজ। এই অবিদ্যা কবে এসেছে, কেন এসেছে, তা কেউ জানে না। তাই মায়া অনাদি-অবিদ্যারূপিণী। মায়া যে আসলে কি তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। মায়াকে তাই অনির্বচনীয় বলা হয়। 'সুধিয়া কার্যানুমেয়া'—বিজ্ঞ লোকেরা মায়ার কার্য এই জগৎ দেখে তার অস্তিত্ব অনুমান করেন।

সন্ নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো
ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো
মহাদ্ভুতাঽনির্বচনীয়রূপা ।। ১০৯

অন্বয় : [সেই মায়া] সৎ ন (সৎ নয়) অসৎ অপি না (অসৎও নয়) উভয়াত্মিকা অপি নো (সৎ ও অসতের মিশ্রণ নয়) ভিন্না অপি (আত্মা থেকে ভিন্ন) [ন (নয়)] অভিন্না অপি (আত্মার সঙ্গে অভিন্ন) [ন (নয়)] অপি উভয়াত্মিকা নো (আত্মা থেকে ভিন্ন ও অভিন্ন এই উভয়রূপা নয়) স-অঙ্গা অপি (অঙ্গযুক্ত) [ন (নয়)] অনঙ্গা (অঙ্গরহিত) [ন (নয়)] হি-উভয়াত্মিকা নো (অঙ্গযুক্ত আবার অঙ্গবিহীন একইসঙ্গে তাও নয়) মহা-অদ্ভুতা (অতি আশ্চর্যরূপা) অনির্বচনীয়রূপা (বাক্যের দ্বারা অবর্ণনীয়া)।

সরলার্থ : মায়া যে আছে তাও নয় আবার নেই এরকমও নয়। আছেও আবার নেইও—এ দুই-এর মিশ্রণও নয়। মায়া পরমাত্মা থেকে ভিন্নও নয় অভিন্নও নয়, আবার ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়রূপাও নয়। মায়া অঙ্গযুক্ত বা অঙ্গবিহীন নয় অথবা অঙ্গ আছে আবার নেই, এই দুয়ের একত্র অবস্থাও নয়। মায়া অতি অদ্ভুতরূপা ও বাক্যের দ্বারা অবর্ণনীয়া।

ব্যাখ্যা : মায়া যে কি সেটা বলতে চাইছেন। কিন্তু বলা যায় না, তাই বিরোধী ভাবের উত্থাপন করে বলছেন, মায়া এটাও নয়, ওটাও নয়। বলছেন, 'সৎ-ন-অপি-অসৎ-ন-অপি-উভয়াত্মিকা নো'; সৎ-ও নয়, অসৎ-ও নয়, সৎ-অসৎ দুটোই একসঙ্গে আছে যে তাও নয়। 'সৎ' হচ্ছে সৎ-চিৎ-আনন্দের যে 'সৎ' সেই 'সৎ'। অর্থাৎ যে সত্য চিরকাল আছে। আর 'অসৎ' হচ্ছে যা 'সৎ' নয় অর্থাৎ মিথ্যা। মায়াকে 'সৎ' বলা যায় না কারণ ব্রহ্মজ্ঞান হলে মায়া আর থাকে না। আবার মায়াকে 'অসৎ' বা মিথ্যাও বলা যায় না কারণ মায়ার কার্য দেখা যায়। জগৎটাই মায়ার সৃষ্টি, মায়া বিশ্বসৃষ্টির কারণস্বরূপা। আবার সৎ-অসৎ এই দুই এর সংমিশ্রণও মায়া নয়। কারণ দুটো বিপরীত-ধর্মী বস্তুর একই সঙ্গে একবস্তুতে অবস্থান সম্ভব নয়। তারপর বলছেন, 'ভিন্ন-অপি-অভিন্ন-অপি-উভয়াত্মিকা নো'; মায়া ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বা অভিন্ন বা ভিন্ন-অভিন্ন উভয়াত্মিকা নয়। মায়া ব্রহ্ম থেকে আলাদা হতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নেই। আবার মায়া ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নও হতে পারে না কারণ ব্রহ্ম নির্বিকার আর এই মায়া বিকারশীল; বিকারধর্মী সৃষ্টি মায়ার-ই কাজ। 'স-অঙ্গা-অপি-অনঙ্গা হি-উভয়াত্মিকা নো'; মায়া অঙ্গযুক্ত বা অঙ্গবিহীন নয় বা এ দুই-এর একত্র অবস্থাও নয়। মায়া যদি 'স-অঙ্গা' হতো তাহলে তাকে দেখা যেত কাজেই তা সে নয়। আবার এর অঙ্গ নেই তা-ই বা বলি কি করে ? কারণ মায়া বহু আকার-বিশিষ্ট এই স্থূল জগতের কারণস্বরূপ। আবার যদি বলি মায়ার অঙ্গ থাকা বা না থাকাটা এক হয়ে গিয়ে মায়া উভয়াত্মিকা হয়ে আছে সেটাও ভুল বলা হবে। কারণ, আগের মতো একই যুক্তি দিয়ে বলা যায় যে, দুটো পরস্পর-বিরোধী জিনিস কখনো একসঙ্গে থাকতে পারে না। তাই বলছেন, মায়া 'মহাদ্ভুতা অনির্বচনীয়রূপা'—ভারি অদ্ভুত, আশ্চর্য জিনিস এই মায়া। এ যে কি তা কথায় বলা যায় না।

শুদ্ধাদ্বয়ব্রহ্মবিবোধনাশ্যা
সর্পভ্রমো রজ্জুবিবেকতো যথা।
রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রসিদ্ধা
গুণাস্তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্যৈঃ ॥ ১১০

অন্বয় : [এই মায়া] শুদ্ধ-অদ্বয়-ব্রহ্মবিবোধ-নাশ্যা (শুদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞানের দ্বারা নাশ পায়) যথা (যেমন) রজ্জুবিবেকতঃ সর্পভ্রমঃ (দড়িটাকে দড়ি বলে জানার ফলে সাপ বলে ভুল করাটা চলে যায়) স্বকার্যৈঃ (নিজ নিজ কাজের দ্বারা পরিচিত) রজঃ-তমঃ-সত্ত্বম্ ইতি প্রসিদ্ধাঃ (রজঃ তমঃ ও সত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ) তদীয়াঃ (সেই মায়ার) গুণাঃ (গুণসমূহ)।

সরলার্থ : চিত্তবিভ্রমের জন্যে দড়িকে সাপ বলে ভুল হয়। কিন্তু দড়িকে দড়ি বলে জানলে সাপের ভয় চলে যায়। সেই রকমই মায়া যে শুদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্মকে আশ্রয় করে আছে সেই ব্রহ্মকে জানলেই মায়া আর থাকে না। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, মায়ার এই তিন গুণ সুখ দুঃখ ও মোহের সৃষ্টি করে বলে প্রসিদ্ধ।

ব্যাখ্যা : মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় কি করে ? মায়া ব্রহ্মের শক্তি, তিনিই মায়ার আশ্রয়। সেই ব্রহ্মকে জানলেই মায়া চলে যায়, রজ্জুকে জানলে যেমন সর্পভ্রম চলে যায়। বলছেন : 'সর্পভ্রমঃ রজ্জু-বিবেকতঃ যথা'। অন্ধকার পথে যাচ্ছি, একটা দড়ি পড়ে আছে, ভেবেছি সাপ। ভয়ে অস্থির হয়ে কোনও রকমে আলো আনিয়েছি। আলোয় দেখছি, এটা তো সাপ নয়, একটা দড়ি। এই হচ্ছে 'রজ্জু- বিবেকতঃ'। আলো এলো মানে জ্ঞান হলো আর তখনই দড়িটাকে দড়ি বলে চিনতে পারলাম। সাপ তো কোনও কালেই ছিল না, দড়ির ওপর সাপের কল্পনাটা আরোপ করেছিলাম। আলো আসতে অন্ধকার চলে গেলো, তখন দড়িটাকে দড়ি বলে দেখতে পেলাম। তেমনি অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে আমরা জগতের আশ্রয় সেই ব্রহ্মকে না দেখে জগৎ-কে দেখি। কিন্তু জ্ঞান হলে আর জগৎ দেখি না, তার অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম তাঁকেই দেখি। মায়া তখন আর ভুল দেখাতে পারে না, তার প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। তারপর বলছেন, 'রজস্তমঃ সত্ত্বমিতি প্রসিদ্ধাঃ গুণাঃ-তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্যৈঃ'। রজঃ তমঃ সত্ত্ব মায়ার এই গুণগুলি নিজের নিজের কাজের দ্বারা প্রসিদ্ধ। এই তিনটি গুণ অবলম্বন করেই মায়া কাজ করে। সত্ত্বগুণ সুখের সৃষ্টি করে, রজোগুণ দুঃখ আনে আর তমোগুণ মোহ উৎপাদন করে। এসবের মধ্যে পড়ে মানুষ উত্তরোত্তর সংসারে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে সুখ দুঃখ মোহ কিছুই থাকে না, তখন মায়া ও তার গুণগুলো সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।

রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং
দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ ॥ ১১১

অন্বয় :রজসঃ (রজোগুণ থেকে) ক্রিয়াত্মিকা (ক্রিয়াশীল) বিক্ষেপ শক্তিঃ (বিক্ষেপ-শক্তি) [আসে] যতঃ (যার থেকে) পুরাণী (চিরকালের) প্রবৃত্তিঃ (বিষয় প্রবৃত্তি) প্রসৃতা (প্রসার লাভ করেছে) রাগ-আদয়ঃ (বিষয়াসক্তি ইত্যাদি) দুঃখাদয়ঃ (দুঃখ সুখ প্রভৃতি) যে (যে সমস্ত) মনসঃ (মনের) বিকারাঃ (বিকারসমূহ) [সেই সমস্ত] নিত্যম্ (চিরকাল) অস্যাঃ (এর থেকে) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়)।

সরলার্থ : ক্রিয়াত্মিকা বিক্ষেপশক্তি রজোগুণ থেকে উদ্ভূত। এই বিক্ষেপশক্তি থেকেই অনাদি কাল ধরে বিষয়প্রবৃত্তি প্রসার লাভ করছে। বিষয়াসক্তি, সুখদুঃখ ইত্যাদি মনের সমস্ত বিকার চিরকাল ধরে এই বিক্ষেপশক্তি থেকে নির্গত হচ্ছে।

ব্যাখ্যা : রজোগুণের প্রভাব মানুষের ওপর কিভাবে পড়ে, সেই কথা বলছেন। বলছেন, 'বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা'; রজোগুণ থেকে ক্রিয়াত্মিকা বিক্ষেপশক্তির উদ্ভব হয়। এই বিক্ষেপশক্তি মানুষকে স্থির হয়ে থাকতে দেয় না, সব সময় তাকে কিছু একটা করার জন্যে অস্থির করে। কারণ এই বিক্ষেপশক্তি থেকেই 'প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী'; বিষয়ের যে প্রবৃত্তি তা অনাদিকাল ধরে প্রসারিত হয়েছে। 'রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ'; বিষয়াসক্তি, দুঃখ-সুখ ইত্যাদি মনের বিকার—এসব চিরকাল এই বিক্ষেপশক্তি থেকেই আসে। গীতায় ভগবান বলছেন, 'রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্', রজোগুণ 'রাগাত্মকম্' অর্থাৎ কামনা-বাসনা ও আসক্তি এর থেকে উদ্ভূত হয়। যা আমার আছে সেগুলো অত্যন্ত আসক্তিতে আঁকড়ে ধরে থাকি আর যা নেই সেগুলো পাবার জন্যে ছটফট করি। বাসনা পূরণের জন্যে সম্ভব-অসম্ভব সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এই যে একটা অবস্থা—বাসনার তাগিদে অত্যন্ত কর্মপ্রবণতা আর সব 'আমি করছি' এইরকম একটা তীব্র অভিমান— রজোগুণের ধর্ম। এইরকম ভাব হলে মনের মধ্যে সুখ দুঃখ ক্রোধ গর্ববোধ এই সব বিকার আসবেই। রজোগুণের যে শক্তিতে মানুষ এইরকম অবস্থার মধ্যে পড়ে তাকেই বলছেন,' ক্রিয়াত্মিকা বিক্ষেপশক্তিঃ'। এই বিক্ষেপশক্তি মানুষকে অশান্ত করে তোলে, আর সে অনেক সময়েই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যা করার নয় তাই করে বসে।

কামঃ ক্রোধো লোভদম্ভাদ্যসূয়া-
ঽহঙ্কারের্ষ্যামৎসরাদ্যাস্তু ঘোরাঃ।
ধর্মা এতে রাজসাঃ পুংপ্রবৃত্তি-
র্যস্মাদেষা তদ্রজো বন্ধহেতুঃ ॥ ১১২

অন্বয় : কামঃ-ক্রোধঃ-লোভদম্ভাদি-অসূয়া-অহঙ্কার-ঈর্ষ্যা-মৎসরাদ্যাঃ-তু (কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভাদি, অসূয়া, অহঙ্কার, ঈর্ষা, মাৎসর্য ইত্যাদি) ঘোরাঃ (ভয়ানক দুঃখদায়ক ও জীবের সংসার-বন্ধনের কারণ) ধর্মাঃ (বৃত্তিসমূহ) রাজসাঃ (রজোগুণের) যস্মাৎ (যার থেকে) এষা (এই [কাম-ক্রোধাদি]) পুংপ্রবৃত্তিঃ (পুরুষের প্রবৃত্তিগুলো [আসে]) তৎ (সেই জন্যে [প্রবৃত্তিগুলোর নিমিত্ত বলে]) রজঃ (রজোগুণ) বন্ধহেতুঃ (বন্ধনের কারণ)।

সরলার্থ : কাম ক্রোধ লোভ দম্ভাদি অসূয়া অহঙ্কার ঈর্ষা মাৎসর্য ইত্যাদি ভয়ানক দুঃখদায়ক বৃত্তিগুলি রজোগুণের থেকে আসে। পুরুষের এই কামক্রোধাদি প্রবৃত্তিগুলির নিমিত্ত হয় বলে রজোগুণ বন্ধনের কারণ।

ব্যাখ্যা : রজোগুণের প্রভাবে মানুষের মনে কাম ক্রোধ লোভ দম্ভাদি অসূয়া অহঙ্কার ঈর্ষা মাৎসর্য ইত্যাদি ভয়ানক বৃত্তিগুলি আসে। এই বৃত্তিগুলিকে 'ঘোরাঃ' বলছেন, কারণ সত্যিই এগুলো ভয়ঙ্কর। প্রথম 'কাম' অর্থাৎ কামনা। এই কামনার জন্যে আমাদের মনে শান্তি নেই। সারাক্ষণ মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তি, এটা চাই সেটা চাই। সেইসব কামনা চরিতার্থ করার জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয় আর মন ক্রমাগত বলে, আরও চাই, আরও চাই। তারপর ক্রোধ। যার ওপর রেগে গেছি তাকে হয়তো এমনি সব কটু কথা বলছি যা আমার মুখ দিয়ে কোনও দিন বেরোতে পারে বলে জানতাম না। ক্রোধে আমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি। তারপর আছে লোভ, দম্ভ, অসূয়া, অহঙ্কার, ঈর্ষা, মাৎসর্য ইত্যাদি। লোভ যে মানুষকে কত নীচে নাবাতে পারে তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত সবাই আমরা দেখতে পাই। 'দম্ভ' আমাদের নিজেদের ক্ষমতার ধারণা করতে দেয় না, সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিরাট করে তোলে কিন্তু কাজের বেলায় দেখতে পাওয়া যায় সেসব ভুল; এতে লোকের বিরক্তি উৎপাদন করা হয়, সকলের অপ্রিয় হতে হয় তাই নিজেরও কষ্ট হয়। 'অসূয়া' মানে পরের ভালো দেখতে না পারা, কারও কোনও গুণ থাকলে তার মধ্যে দোষ খুঁজে বার করা। 'অহঙ্কার'; সব 'আমি' করছি, এই বোধ। 'ঈর্ষা', অন্যের কোনও গুণ দেখলে বা সে কোনও ভাবে আমার থেকে বেশী কিছু পেয়েছে বুঝলে মনে একটা যন্ত্রণাবোধ করা ও তাকে ছোট করার চেষ্টা। 'মাৎসর্য', পরশ্রীকাতরতা, কারোর ভালো দেখলে মনে কষ্ট হওয়া, পরের উন্নতি হলে দুঃখিত হওয়া। অসূয়া, ঈর্ষা, মাৎসর্য মোটামুটি একই অর্থ। এইসব বৃত্তিগুলো মানুষের মনের সমস্ত প্রসন্নতা নষ্ট করে দেয়। তাকে সংসারের বন্ধনে ক্রমশ বেশী করে জড়িয়ে ফেলে। রজোগুণের থেকে এইসব বৃত্তিগুলোর উদ্ভব হয় বলে রজোগুণকে জীবের বন্ধনের অন্যতম কারণ বলা হয়।

এষাঽবৃতির্নাম তমোগুণস্য
শক্তির্যয়া বস্ত্ববভাসতেঽন্যথা।
সৈষা নিদানং পুরুষস্য সংসৃতে-
র্বিক্ষেপশক্তেঃ প্রবণস্য হেতুঃ॥ ১১৩

অন্বয় : যয়া (যার দ্বারা) বস্তু অন্যথা অবভাসতে (বস্তু যেমনটি নয় তেমন ভাবে প্রকাশ পায়) এষা (তা) তমোগুণস্য (তমোগুণের) আবৃতিঃ নাম শক্তিঃ (আবৃতি নামের শক্তি) সা এষা (সেই এই [আবরণ-শক্তি]) পুরুষস্য সংসৃর্তেঃ নিদানং (পুরুষের সংসার যাতায়াতের নিদান) বিক্ষেপশক্তেঃ (বিক্ষেপশক্তির) প্রবণস্য হেতুঃ (কর্মপ্রবণতার হেতু)।

সরলার্থ : তমোগুণের আবৃতি নামের শক্তি বা আবরণ-শক্তির দ্বারা বস্তু (অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) যেমন নয় সেইরকম ভাবে প্রকাশিত হয়। এই শক্তি পুরুষের সংসার যাতায়াতের নিদান ও রজোগুণ থেকে উদ্ভূত বিক্ষেপশক্তির ক্রিয়াপ্রবণতার হেতু।

ব্যাখ্যা : আগে বিক্ষেপশক্তির কথা বলেছেন, এখন আবরণ-শক্তির কথা বলছেন। অবিদ্যা বা মায়ার দুটো শক্তি, আবরণী ও বিক্ষেপী। আবরণী শক্তি আমাদের কাছ থেকে সত্যকে আবরণ করে রাখে। বলছেন, 'এষা-আবৃতিঃ নাম তমোগুণস্য শক্তিঃ যয়া বস্তু-অবভাসতে-অন্যথা'; এই আবৃতি নামে তমোগুণের শক্তি যার দ্বারা যে বস্তু যা নয় তাকে সেই ভাবে প্রকাশ করা হয়। 'সা এষা নিদানং পুরুষস্য সংসৃতেঃ', এই সেই শক্তি যা পুরুষের সংসার যাতায়াতের নিদানস্বরূপ আর 'বিক্ষেপশক্তেঃ প্রবণস্য হেতুঃ', রজোগুণ থেকে উদ্ভূত বিক্ষেপশক্তির কর্মপ্রবণতার হেতু। মায়ার এই আবরণী ও বিক্ষেপী শক্তিকে বোঝানোর জন্যে বেদান্তের একটা খুব প্রচলিত দৃষ্টান্ত 'রজ্জুসর্প'। অন্ধকার পথে যাচ্ছি, রাস্তায় একটা দড়ি পড়েছিল, দেখে ভেবেছি সাপ। ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি, চিৎকার চেঁচামেচি করে আলো আনিয়ে দেখছি, না এটা সাপ নয়, দড়ি। অজ্ঞানের অন্ধকার বা তমঃ দড়ির প্রকৃত সত্তাটা আবরণ করেছিল, দড়িটাকে সাপ বলে দেখিয়েছিল। তখন ভয় হলো, চিত্তবিক্ষেপ হলো, চিৎকার চেঁচামেচি করে আলো আনাতে হলো। এই যে ভয় হওয়া অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপ হওয়া সেটা রজোগুণের কাজ আর চেঁচামেচি করে আলো আনানো সেটাও রজোগুণেরই কর্মপ্রবণতার লক্ষণ। মায়া তার তমোগুণ ও রজোগুণের সাহায্যে এমনি করে আমাদের ভোলায়। যতক্ষণ না আলো আসছে বা জ্ঞান হচ্ছে ততক্ষণ সাপের ভয়ে অস্থির হয়ে কি যে করব ঠিক করতে পারছি না। সংসারেও আমরা এমনি ভাবেই ভুল করি। যা অনিত্য বস্তু, মনে করি তা-ই আমার কাম্য আর সেইসবের পেছনে ছুটি। কত বাসনা অপূর্ণ থেকে গেলো আর আমি মরে গেলাম। তখন আবার জন্মাতে হয়, অতৃপ্ত বাসনা পূরণের জন্যে, কৃতকর্মের ফল ভোগ করার জন্যে। এই ভাবে সংসারে যাতায়াত চলতে থাকে যতদিন না জ্ঞান হচ্ছে।

প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোঽপি চতুরোঽপ্যত্যন্তসূক্ষ্মাত্মদৃগ্
ব্যালীঢ়স্তমসা ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতোঽপি স্ফুটম্।
ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্ গুণান্
হন্তাসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তির্মহত্যাবৃতিঃ॥ ১১৪

অন্বয় : প্রজ্ঞাবান্-অপি (প্রজ্ঞাসম্পন্ন পুরুষও) পণ্ডিতঃ-অপি (শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও) চতুরঃ-অপি (ব্যবহারিকভাবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বিচারে পটু ব্যক্তিও) অত্যন্ত সূক্ষ্মাত্মদৃক্ (শ্রুতি-উক্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন যিনি তিনিও) ব্যালীঢ়ঃ-তমসা (তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হয়ে) বহুধা সংবোধিতঃ-অপি (বহুভাবে বোধ উৎপাদনের জন্যে উপদিষ্ট হলেও) স্ফুটং ন বেত্তি (নিঃসংশয়ে [আত্মতত্ত্ব] জানতে পারেন না) ভ্রান্ত্যা (ভ্রান্তির কারণে) আরোপিতম্ এব (আরোপিত অনিত্য দেহ-গৃহ ইত্যাদি পদার্থ) সাধু কলয়তি (সত্য ও সুখপ্রদ বলে মনে করেন) তদ্ গুণান্ (সেইসব গুণ) আলম্বতে (অবলম্বন করে থাকেন) হন্ত (হায়) দুরন্ততমসঃ (দুরন্ত তমোগুণের) আবৃতিঃ-শক্তিঃ (আবরণ-শক্তি) মহতী প্রবলা (বড়ই প্রবল)।

সরলার্থ : প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি, পণ্ডিত ব্যক্তি, ব্যবহারিক বিষয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি বা শাস্ত্র নির্দেশিত সূক্ষ্ম-তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি, এঁরা কেউই—বোধ উৎপাদনের জন্যে বহুভাবে উপদিষ্ট হলেও—তমোগুণের প্রভাবে আত্মতত্ত্ব নিঃসংশয়ে জানতে পারেন না। ভ্রান্তির জন্যে দেহ ইত্যাদি আরোপিত বস্তুকে ও দেহকেন্দ্রিক সব অনিত্যবস্তুকে সত্য ও সুখপ্রদ মনে করে সেইসব বস্তুর ভালোমন্দ অবলম্বন করেই থাকেন। হায় ! দুরন্ত তমোগুণের আবরণী শক্তি অতি প্রবল।

ব্যাখ্যা : তমোগুণের প্রভাবে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি সব আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সে অনিত্য, মিথ্যাবস্তু নিয়েই থাকে। যা একমাত্র সত্য সেই পরমাত্মার খোঁজ আর করে না। এমন কি পরমাত্মার তত্ত্ব তার কাছে বহুভাবে বলা হলেও সে ধারণা করতে পারে না, তার সংশয় থেকেই যায়। বলছেন, 'প্রজ্ঞাবান্-অপি পণ্ডিতঃ-অপি চতুরঃ-অপি-অত্যন্ত সূক্ষ্মাত্মদৃগ্ ব্যালীঢ়ঃ-তমসা ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতঃ-অপি স্ফুটম্'; 'প্রজ্ঞাবান্', প্রজ্ঞাবান্ তাকেই বলা হয় যার জ্ঞান সর্ব অবস্থায়, সর্বকালে স্থির থাকে। 'পণ্ডিতঃ', শাস্ত্র অধ্যয়ন থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় 'পণ্ডা', এই 'পণ্ডা' যার আছে সে পণ্ডিত। 'চতুরঃ', তর্কবিচারে নিজের বক্তব্যের সমর্থন ও বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন যে

খুব পটুত্বের সঙ্গে করতে পারে সে চতুর। আবার ব্যবহারিকভাবে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ও স্বার্থরক্ষায় পটু যে তাকেও চতুর বলা হয়। 'অত্যন্ত সূক্ষ্মাত্মদৃগ্', শাস্ত্রে আত্মার সম্বন্ধে যে সব তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে সেইসব অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব যে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে বুঝতে পেরেছে তাকেই 'সূক্ষ্মাত্মদৃক্' বলছেন। বলছেন, এই প্রজ্ঞাবান্, পণ্ডিত, চতুর, সূক্ষ্মাত্মদৃক্, এরা সকলেই 'ব্যালীঢ়ঃ-তমসা'—তমোগুণের দ্বারা অভিভূত হয়ে আত্মতত্ত্ব ঠিকমত ধারণা করতে পারছে না। 'ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতঃ-অপি স্ফুটম্'; জ্ঞান উৎপাদনের জন্যে এই আত্মতত্ত্ব তাদের কাছে বহুভাবে ব্যাখ্যা করে বললেও তাদের বোধ হয় না, সংশয় যায় না। কারণ 'ভ্রান্ত্যা-আরোপিতম্-এব সাধু কলয়তি-আলম্বতে তৎগুণান্'। ভ্রান্তির জন্যে সে দেহাদি ও দেহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সব অনিত্য বস্তুকে, আরোপিত বস্তুকে সত্য বলে মনে করে আর সেই সব নিয়ে বেশ ভালোই আছি বলে ভাবে। মায়া এমনি করেই আমাদের ভোলায়। কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা গুলিয়ে যায়। যা আপাতসুখকর তাকেই আঁকড়ে ধরি। শাস্ত্র বলছেন, এসব মিথ্যা। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও জানছি, এ জীবন নশ্বর। যাঁরা বিজ্ঞ, বিদ্বান তাঁদের কাছ থেকে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেছি, কত শাস্ত্র বিচার করেছি, শাস্ত্রে যে একমাত্র নিত্যবস্তু আত্মার কথা, ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে সেসব বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছি, কিন্তু সব বৃথা। মায়া আমাকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে, আমার বুদ্ধিকে আবৃত করে রেখেছে। তাই অনিত্যকে অনিত্য বলে মেনে নিতে পারছি না। মিথ্যে জেনেও একেই চাইছি, অনিত্য জেনেও বিষয়ের পিছনে ছুটছি। তমোগুণের প্রভাবে অভিভূত হয়ে সংসারের সুখ-দুঃখে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। মানুষের এই তো অবস্থা ! তাই বলছেন, 'হন্ত-অসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তির্মহতী-আবৃতিঃ', হায় ! এই দুরন্ত তমোগুণের আবৃতি-শক্তি বড়ই প্রবল।

অভাবনা বা বিপরীতভাবনাঽ-
সংভাবনা বিপ্রতিপত্তিরস্যাঃ।
সংসর্গযুক্তং ন বিমুঞ্চতি ধ্রুবং
বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়ত্যজস্রম্॥ ১১৫

অন্বয় : অস্যাঃ (এর [এই আবরণ-শক্তির]) সংসর্গ যুক্তং (সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিকে) অভাবনা (বিচারের অভাব) ন বিমুঞ্চতি (ত্যাগ করে না) বিপরীত-ভাবনা বা (অথবা উলটো চিন্তা) অসং ভাবনা (অসংলগ্ন চিন্তা যা ধারণা জন্মানোর পরিপন্থী) বিপ্রতিপত্তিঃ (প্রত্যয়হীন ভাবনা) ন বিমুঞ্চন্তি (ত্যাগ করে না) বিক্ষেপশক্তিঃ (বিক্ষেপশক্তি) ধ্রুবম্ (সত্যই) [তাকে] অজস্রম্ ক্ষপয়তি (অজস্র ভাবে বিভ্রান্ত করে)।

সরলার্থ : এই আবরণ-শক্তির সংস্পর্শে থাকা পুরুষকে বিচারের অভাব, বিপরীত চিন্তা, কোনও ধারণা জন্মানোর পরিপন্থী অসংলগ্ন চিন্তা, বিপ্রতিপত্তি-বা প্রত্যয়হীন

ভাবনাচিন্তা কখনও ত্যাগ করে না। বিক্ষেপশক্তি সত্যিই এই পুরুষকে অজস্র ভাবে বিভ্রান্ত করে।

ব্যাখ্যা : তমোগুণের আবরণী-শক্তির প্রভাবের মধ্যে যে পুরুষ আছে মায়ার বিক্ষেপশক্তিও তাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। 'অভাবনা বা বিপরীত ভাবনা-অসংভাবনা বিপ্রতিপত্তিঃ অস্যাঃ সংসর্গযুক্তং ন বিমুঞ্চতি'; বিচারহীন ভাবনা, বিপরীত ভাবনা, অসংলগ্ন চিন্তা, প্রত্যয়হীন ভাসা ভাসা চিন্তা, তাকে (অর্থাৎ আবরণ-শক্তির সংসর্গযুক্ত ব্যক্তিকে) কখনও ত্যাগ করে না। এখানে 'অস্যাঃ' বলতে বোঝাচ্ছেন আবরণ-শক্তির। তমোগুণের প্রভাবে বুদ্ধির বিশ্লেষণ ক্ষমতা ঢাকা পড়ে যায়। তাই তমোগুণে বশীভূত পুরুষ সর্বদা বিচারহীন হয়ে অবস্থান করে। যদিও বা কখনও সে বিচার করে তো বিপরীত ভাবনার বশীভূত হয়—অর্থাৎ দেহ প্রভৃতি অনিত্য বস্তুকে আত্মা বলে ভাবতে থাকে। সৎসঙ্গের ফলে যদি বা কখনও তার আত্মতত্ত্ব বিচারের সম্ভাবনা ঘটে তো তা 'অসংভাবনা' অর্থাৎ অসংলগ্ন চিন্তার দরুন অসম্ভাবনা-বোধের দ্বারা অভিভূত থাকে। অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারলেও আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে তার সংশয় ও অবিশ্বাস থেকেই যায়। গুরুর উপদেশ ও বেদান্তবাক্য শ্রবণের ফলে যদি-বা তার শাস্ত্রসম্মত জ্ঞান হয় তাহলেও তার বিপ্রতিপত্তি থেকে যায়। 'বিপ্রতিপত্তিঃ' অর্থাৎ বুদ্ধির সিদ্ধান্ত করার অক্ষমতা। তার চিন্তার মধ্যে কোনও প্রত্যয় থাকে না, দৃঢ়তা থাকে না, ফলে তার আত্মস্বরূপের অনুভব হয় না। তমোগুণের আবরণী-শক্তি মানুষের মন-বুদ্ধিকে অজ্ঞানের আবরণে ঢেকে ফেলে তার এইরকম একটা অবস্থা করে। সে নিজেকে আর ঠিকমতো চালাতেই পারে না, খালি ভুল করতে থাকে। তখন নানা রকমের বিপরীত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে তাকে একেবারে বিপর্যস্ত করে ফেলে। বলছেন, 'ধ্রুবং বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়তি-অজস্রম্'; মায়ার আবরণী-শক্তির প্রভাব যার ওপর পড়েছে তাকে বিক্ষেপশক্তিও সত্যিই অশেষ ভাবে বিভ্রান্ত করে।

অজ্ঞানমালস্য-জড়ত্ব-নিদ্রা-
প্রমাদমূঢ়ত্বমুখাস্তমোগুণাঃ।
এতৈঃ প্রযুক্তো ন হি বেত্তি কিঞ্চিন্-
নিদ্রালুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি॥ ১১৬

অন্বয় : অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান) আলস্য-জড়ত্ব-নিদ্রা-প্রমাদ-মূঢ়ত্বমুখাঃ (আলস্য, জড়ত্ব, নিদ্রা, প্রমাদ, মূঢ়ত্ব ইত্যাদি) তমোগুণাঃ (তমোগুণের বৃত্তি) এতৈঃ (এগুলোর দ্বারা) প্রযুক্তঃ (সংসৃষ্ট) [পুরুষ] কিঞ্চিৎ হি (কিছুই) ন বেত্তি (বোঝে না) নিদ্রালুবৎ (ঘুমে ঢুলে পড়া মানুষের মতো) স্তম্ভবৎ এব (থামের মতো জড়বৎ) তিষ্ঠতি (অবস্থান করে)।

সরলার্থ : অজ্ঞান-আলস্য-জড়ত্ব-নিদ্রা-প্রমাদ-নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি তমোগুণের বৃত্তি। এগুলোর দ্বারা সংসৃষ্ট পুরুষ কিছুই বোঝে না। ঘুমে ঢুলে পরা মানুষের মতো বা একটা জড় থামের মতো অবস্থান করে।

ব্যাখ্যা : এখানে তমোগুণের প্রভাবে মানুষের স্বভাবে কি কি ভাবের প্রকাশ হয় সেইটা বলছেন। 'অজ্ঞানম্-আলস্য-জড়ত্ব-নিদ্রা-প্রমাদ-মূঢ়ত্বমুখাঃ তমোগুণাঃ'। এইগুলি সব তমোগুণের লক্ষণ। প্রথম হচ্ছে 'অজ্ঞানম্'। তমোগুণের লক্ষণের মধ্যে অজ্ঞানটাই প্রধান। তমোগুণ তো মায়ার আবরণী-শক্তির অন্যতম কারণ তাই এর কাজ আমাদের জ্ঞানকে আবৃত করা। অন্য সব লক্ষণগুলো মূলতঃ এই অজ্ঞান থেকেই আসছে। 'আলস্য', কিছু করতে ইচ্ছে হয় না, চুপ করে পড়ে থাকতেই ভালো লাগে। মনে কোনও জিজ্ঞাসা নেই, নিজের অবস্থার উন্নতি করার কোনও স্পৃহাও নেই। 'জড়ত্ব', আলস্য খুব বেড়ে গেলে আমরা জড়ের মতোই হয়ে যাই, নড়াচড়া করতেও যেন আর ভালো লাগে না। 'নিদ্রা', যার মধ্যে তমোগুণের খুব বৃদ্ধি হয় সে যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়ে। 'প্রমাদ', যা করণীয় তা ঠিকভাবে না করা, অনবধানতা। মন নেই তাই কাজে ভুল হয়ে যাচ্ছে। 'মূঢ়ত্ব', বুদ্ধি-হীনতা; আলস্য জড়ত্ব ইত্যাদির ফলে বুদ্ধিও আর ঠিকমতো কাজ করছে না। বলছেন 'এতৈঃ প্রযুক্তঃ ন হি বেত্তি কিঞ্চিৎ-নিদ্রালুবৎ স্তম্ভবৎ-এব তিষ্ঠতি'; এইসব গুণগুলি যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সে কিছুই বোঝে না, জানে না। ঘুমে ঢুলে পড়া মানুষের মতো কিংবা একটা জড় স্তম্ভের মতো সে থাকে। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তার কোন সচেতনতা নেই, আবার জগতের অতীত যে সত্য—ব্রহ্ম বা আত্মা—সে সম্বন্ধেও তার কোন ধারণা বা আগ্রহ নেই। আর সব থেকে দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, যে তমোয় ডুবে আছে তার মধ্যে এই অবস্থা থেকে ওঠার কোনও চেষ্টাই জাগে না।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি
তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্
প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ম্॥ ১১৭

অন্বয় : সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) বিশুদ্ধং জলবৎ (বিশুদ্ধ জলের মতো [স্বচ্ছ]) তথা-অপি (তাহলেও) তাভ্যাং (সেই দুটির সঙ্গে [রজঃ ও তমোগুণের সঙ্গে]) মিলিত্বা (মিলিত হয়ে) সরণায় (জন্মমৃত্যুর নিমিত্ত হতে) কল্পতে (সমর্থ হয়) যত্র (যেখানে [সত্ত্বগুণে]) আত্মবিম্বঃ (শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ আত্মা) প্রতিবিম্বিতঃ সন্ (প্রতিফলিত হয়ে) অর্কঃ ইব (সূর্যের মতো) অখিলং জড়ং (সমগ্র জড় পদার্থ) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে)।

সরলার্থ : সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ জলের মতো স্বচ্ছ। কিন্তু এ রজঃ ও তমোগুণের সঙ্গে

মিলিত হয়ে জীবের সংসার যাতায়াতের নিমিত্ত হয়। এই সত্ত্বগুণে শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মা প্রতিফলিত হয়ে সূর্যের মতো সমগ্র জড় জগৎ-কে প্রকাশ করেন।

ব্যাখ্যা : এবার সত্ত্বগুণের কথা বলছেন। সত্ত্বগুণ আমাদের সুখ উৎপাদন করে, জ্ঞান উৎপাদন করে। তবুও এও আমাদের সংসার-বন্ধনের কারণ। স্বামীজী যেমন বলছেন, সোনার শেকলও শেকল, তাও মানুষকে বেঁধে রাখতে পারে। সত্ত্বগুণ যেন সোনার শেকল। বলছেন, 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে'; এখানে 'তাভ্যাং' বলতে বোঝাচ্ছেন রজঃ ও তমোগুণের সঙ্গে। সত্ত্বগুণ যদিও বিশুদ্ধ জলের মতো তবুও এ রজঃ ও তমোগুণের সঙ্গে মিলে 'সরণায় কল্পতে'। 'সরণায়' মানে সংসারের জন্যে। 'সরণায় কল্পতে', অর্থাৎ সংসারের চলতে থাকার কারণ সৃষ্টি করে, জন্মমৃত্যুর প্রবাহ যাতে চলতে থাকে তাই করে। কিন্তু আগেই বলেছেন সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ জলের মতো, অর্থাৎ স্বচ্ছ, তাই এখানে 'আত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্ প্রকাশয়তি-অর্ক ইব-অখিলং জড়ম্'; চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এখানে প্রতিবিম্বিত হয়ে সমস্ত জড়পদার্থকে প্রকাশ করেন, সূর্য যেমন সমগ্র জড়জগৎ-কে প্রকাশ করে। সত্ত্বগুণ প্রকাশধর্মী। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি সৎগুণের প্রকাশ হয় সত্ত্বগুণের সাহায্যে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের সাহায্যে মায়া কাজ করে। ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সৃষ্টির কারণস্বরূপ। রজঃ ও তমোগুণ জীবের সংসারবন্ধনের কারণ। আর সত্ত্বগুণ এই জীব জগৎ-কে প্রকাশ করে সবকিছু আমাদের জ্ঞানের সীমানার মধ্যে এনে দেয়। আয়নায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয় বলে তাতে আমরা কত জিনিসের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। তেমনি আমাদের বুদ্ধিতে যে সত্ত্বগুণ আছে সে বিশুদ্ধ জলের মতো স্বচ্ছ, তাই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এতে প্রতিফলিত হন আর সেই জ্ঞানস্বরূপ চিদাত্মার জ্ঞানের প্রভাবেই এই জড়জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের হয়। সত্ত্বগুণের মধ্যে দিয়েই আত্মার প্রকাশ হয় বলে এ না থাকলে রজঃ ও তমঃ গুণের কাজও চলত না। সত্ত্বগুণের সাহায্যেই আমরা আমাদের স্বরূপ যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মা তাঁর কাছাকাছি যেতে পারি। এ না থাকলে আমাদের জ্ঞান লাভ হত না, মুক্তি হত না। কিন্তু সত্ত্বগুণও বন্ধন, তাই মুক্তির জন্যে গুণাতীত অবস্থা লাভ করতে হয়, তিনটি গুণেরই পারে যেতে হয়। ভগবান তাই গীতায় অর্জুনকে বলেছেন, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন (গী, ২।৪৫)।

মিশ্রস্য সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্মা-
স্ত্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ
দৈবী চ সম্পত্তিরসন্নিবৃত্তিঃ॥ ১১৮

অন্বয় : অমানিতা-আদ্যাঃ (অমানিত্ব ইত্যাদি) নিয়মাঃ (নিয়মসমূহ) যম-আদ্যাঃ (যম

ইত্যাদি) শ্রদ্ধা চ ভক্তিঃ চ মুমুক্ষুতা চ (এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি ও মুমুক্ষুতা) চ দৈবী সম্পত্তিঃ (এবং দৈবী সম্পত্তি) অসৎ-নিবৃত্তিঃ (অসৎ-আচরণ ত্যাগ) ধর্মাঃ তু (এই সব ধর্ম) মিশ্রস্য সত্ত্বস্য (মিশ্র সত্ত্বগুণের) ভবন্তি (হয়)।

সরলার্থ : অমানিত্ব ইত্যাদি গুণ, নিয়মসমূহ, যম ইত্যাদি গুণ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুমুক্ষুতা প্রভৃতি দৈবী সম্পদ, অসদাচরণ ত্যাগ প্রভৃতি গুণ মিশ্র সত্ত্বগুণের ধর্ম।

ব্যাখ্যা : এখানে মিশ্র সত্ত্বগুণের লক্ষণের কথা বলছেন। মিশ্র কেন বলছেন ? কারণ সাধারণত এই তিনটি গুণের কোনটিই অন্য দুটি গুণের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় ছাড়া থাকতে পারে না। রজঃ ও তমঃ গুণকে অবদমিত করে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়। সেইরকম তমঃ ও সত্ত্বগুণকে ছাপিয়ে রজোগুণ প্রবল হয়। তেমনি রজঃ ও সত্ত্বগুণকে নীচে ফেলে তমোগুণ প্রধান হয়ে ওঠে। যার মধ্যে যে গুণ প্রবল হয় সেই গুণের লক্ষণগুলি তার মধ্যে প্রকাশ পায়। এখানে সত্ত্বগুণ যার মধ্যে প্রবল তার মধ্যে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় সেইটা বলছেন। 'অমানিতা-আদ্যাঃ', অমানিত্ব-আদি। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব ইত্যাদি কুড়িটা গুণকে ভগবান গীতায় জ্ঞানের সাধন বলে বর্ণনা করেছেন (গী, ১৩।৮-১২)। এখানে 'আদি' শব্দে সেইসব গুণগুলির কথাই বলেছেন। 'নিয়মাঃ', নিয়মগুলি হচ্ছে শৌচ সন্তোষ স্বাধ্যায় তপঃ ও ঈশ্বরপ্রণিধান। শৌচ হচ্ছে দেহে মনে শুদ্ধ থাকা; সন্তোষ— সর্ব-অবস্থায় সন্তুষ্টির বোধ; স্বাধ্যায়—শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রগুলির মনে মনে উচ্চারণ ও সেইগুলির চিন্তা; তপঃ—দেহ-মনের ক্লান্তি ও সুখদুঃখ অগ্রাহ্য করে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকা; ঈশ্বরপ্রণিধান—ঈশ্বরে শরণাগতি। 'যমাদ্যাঃ', 'যম' মানে সংযম, দেহ ও মনের সংযম। এই সংযমগুলি হচ্ছে অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। অহিংসা—দেহে মনে কোনও কিছুতে হিংসা না থাকা; সত্য—কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠা; অস্তেয়—পরের দ্রব্য অপহরণ না করা; ব্রহ্মচর্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়সংযম; অপরিগ্রহ—কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ না করা। যম ও নিয়মের কথা মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগদর্শনে বলেছেন—যে পতঞ্জলিকে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মবিজ্ঞানের মহা বৈজ্ঞানিক বলতেন। তারপর বলছেন 'শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ দৈবী চ সম্পত্তিঃ অসৎ-নিবৃত্তিঃ'; শ্রদ্ধা হচ্ছে গভীর আস্তিক্য বুদ্ধি। শাস্ত্রে বিশ্বাস, গুরুবাক্যে বিশ্বাস, ভগবৎ বিশ্বাস আর এ সবকিছুর প্রতি গভীর সম্ভ্রমের ভাব। ভক্তি বলতে অদ্বৈতবাদীরা বোঝেন নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান। আর মুমুক্ষুতা হচ্ছে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা। 'দৈবী চ সম্পত্তি' অর্থাৎ অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি ইত্যাদি যে ছাবিবশটি সৎগুণকে ভগবান গীতায় দৈবী সম্পত্তি (গী, ১৬।১-৩) বলেছেন। তারপর বলছেন, 'অসৎ-নিবৃত্তিঃ' অর্থাৎ যা কিছু 'অসৎ', অনিত্য, মিথ্যা সেসবের থেকে নিবৃত্তি, আচরণে ও চিন্তায়। সত্ত্বগুণের প্রভাবে মনে এইসব বৃত্তিগুলি

যখন আসে তখন আর আত্মজ্ঞান লাভের বেশি দেরি থাকে না। তবু সত্ত্বগুণও বন্ধন, কারণ এই সৎগুণগুলি মনে একটা সুখের অনুভূতির সৃষ্টি করে, একটা তৃপ্তির ভাব এনে দেয়। সেটাও বন্ধন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকম্-অনাময়ম্ সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ' (গী, ১৪।৬)। এই যে সুখের আসক্তিতে বন্ধন, জ্ঞানের আসক্তিতে বন্ধন, এ মিশ্র সত্ত্বগুণের প্রভাব। ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার আগে পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোনও গুণই শুদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারে না। যার মধ্যে সত্ত্বগুণ, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়েছে তাকেই আমরা সাত্ত্বিক বলি। এই 'জ্ঞানসঙ্গেন' ও 'সুখসঙ্গেন' বন্ধন তারই হয়। তাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণকেই অতিক্রম করে যেতে হবে।

বিশুদ্ধসত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ
স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তি প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা
যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি॥ ১১৯

অন্বয় : বিশুদ্ধসত্ত্বস্য (বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের) গুণাঃ (গুণসমূহ) প্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) স্ব-আত্মা-অনুভূতিঃ (নিজের আত্মার অনুভূতি) পরমা প্রশান্তিঃ (নিরতিশয় শান্তি) তৃপ্তিঃ (পরিতুষ্টি) প্রহর্ষঃ (স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ) পরমাত্মনিষ্ঠা (পরমাত্মার চিন্তায় অত্যন্ত একাগ্রতা) যয়া (যার দ্বারা) সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি (সর্বদা আনন্দরস প্রাপ্তির অনুভব হয়)।

সরলার্থ : চিত্তের প্রসন্নতা, স্বস্বরূপের অনুভূতি, নিরতিশয় প্রশান্তি, তৃপ্তি, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ, পরমাত্মনিষ্ঠা, যার দ্বারা সর্বদা আনন্দরস প্রাপ্তির অনুভব হয়, এইগুলি সব বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের লক্ষণ।

ব্যাখ্যা : এখানে শুদ্ধসত্ত্বের গুণগুলির কথা বলছেন। এই গুণগুলি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মধ্যেই দেখা যায়। ব্রহ্মজ্ঞান হলে মানুষের এমন অবস্থা হয় যে শুদ্ধসত্ত্বগুণ আশ্রয় করেই সে এ-জগতে থাকে। শুদ্ধসত্ত্বের গুণ হচ্ছে 'প্রসাদঃ স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ তৃপ্তি প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা'; 'প্রসাদ' মানে চিত্তের প্রসন্নতা। এটা কখন আসে ? মন যখন নির্মল হয়ে যায়। 'আমি আমার' বোধ চলে গেছে, সর্বভূতে সমদৃষ্টি। চিত্ত তখন প্রসন্নতায় ভরে যায়। 'স্বাত্মানুভূতিঃ', সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ আমার যে আত্মা তাঁকে অনুভব করছি, আনন্দস্বরূপ হয়ে বসে আছি, তাই 'পরমা প্রশান্তিঃ'। আত্মতৃপ্ত হয়ে আছি। 'প্রহর্ষঃ', স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ভরপুর হয়ে আছি, পরমাত্মার চিন্তায় ডুবে আছি, জগৎ ভুলে গেছি। এমনি করে যে পরমাত্মার চিন্তায় একনিষ্ঠ হয়ে যেতে পারে সে তখন 'সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি', সর্বদা আনন্দরস লাভ করে, সেই অনুভূতিতেই

ডুবে থাকে। এই অবস্থা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির অবস্থা, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অবস্থা।

অব্যক্তমেতৎ ত্রিগুণৈর্নিরুক্তং
তৎ কারণং নাম শরীরমাত্মনঃ।
সুষুপ্তিরেতস্য বিভক্ত্যবস্থা
প্রলীনসর্বেন্দ্রিয়বুদ্ধিবৃত্তিঃ॥ ১২০

অন্বয় : ত্রিগুণৈঃ (সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা) নিরুক্তং (বর্ণনা করা হয়েছে) এতৎ অব্যক্তম্ (এই অব্যক্তকে) তৎ (তা) আত্মনঃ (আত্মার) কারণং নাম শরীরম্ (কারণ নামের শরীর) এতস্য (এর [কারণশরীরাভিমানী আত্মার]) প্রলীন-সর্বেন্দ্রিয়বুদ্ধিবৃত্তিঃ (সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বৃত্তিসমূহ লীন হয়ে যাওয়া) বিভক্তি-অবস্থা (জাগ্রৎ ও স্বপ্ন থেকে বিভক্ত অবস্থা) সুষুপ্তিঃ (সুষুপ্তি)।

সরলার্থ : সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সমন্বয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে অব্যক্তকে তা আত্মার কারণ নামের শরীর। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন থেকে আলাদা যে সুষুপ্তি, যেখানে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বৃত্তি প্রলীন হয়ে যায়, তা এই কারণশরীরের একটি বিশেষ অবস্থা।

ব্যাখ্যা : আত্মার তিনটি শরীর আছে। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ। এখানে কারণশরীরের কথা বলছেন। একে কারণশরীর বলা হয় তার কারণ হচ্ছে এ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তির কারণ। যা শীর্ণ হয় তাকে শরীর বলা হয়। কারণশরীর একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা শীর্ণ হয়ে নাশ পায়। বলছেন, 'অব্যক্তম্-এতৎ ত্রিগুণৈঃ নিরুক্তং তৎ কারণং নাম শরীরম্-আত্মনঃ'; তিনটি গুণের সহযোগে এই যে অব্যক্তকে বর্ণনা করা হয়েছে তা আত্মার কারণ নামের শরীর।'অব্যক্তম্'—যা এখনও ব্যক্ত হয়নি অর্থাৎ মায়া। ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা অবিদ্যা আত্মাকে আবরণ করে আছে, আমাদের স্বরূপজ্ঞানের প্রতিবন্ধক রূপে আছে। এই অব্যক্তই আমাদের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর রূপে প্রকাশ হচ্ছে। জগৎ-সৃষ্টির কারণ যেমন ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, তেমনি এই কারণশরীর আমাদের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর সৃষ্টির কারণ। ব্রহ্মজ্ঞান হলে তবে এই অজ্ঞানরূপ কারণশরীরের নাশ হয়। 'সুষুপ্তিঃ-এতস্য বিভক্তিঃ-অবস্থা প্রলীন,সর্ব-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি-বৃত্তিঃ'; সুষুপ্তি হলো এই কারণশরীরাভিমানী আত্মার জাগ্রৎ ও স্বপ্ন থেকে বিভক্ত হয়ে যাওয়া একটা অবস্থা, যেখানে সব ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-বৃত্তি প্রলীন হয়ে যায়। আমরা যখন জেগে থাকি তখন সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণের প্রভাবে ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করে। বাইরের জগতের সঙ্গে নানা ভাবে আদান-প্রদান চলে। তারপর যখন ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখি, তখন সব ইন্দ্রিয়গুলোও ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু অন্তঃকরণ তখন মন-বুদ্ধি-চিত্ত আর অহঙ্কার দিয়ে

একটা বিচিত্র স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করে। সেই জগতে আমরা একটা ছায়ার মতো সত্তা নিয়ে কত কি করে বেড়াই। তারপর গভীর ঘুমের মধ্যে যখন চলে যাই, যাকে সুষুপ্তি বলে, তখন অন্তঃকরণ নেই, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার কিছুই নেই, তাই স্বপ্নজগৎও নেই। তখন আমার আত্মস্বরূপের একেবারে কাছে পৌঁছে গেছি—শুধু ঐ অজ্ঞানরূপ কারণশরীরের আবরণটুকু রয়ে গেছে। তাই আত্মস্বরূপের বোধ আমার হচ্ছে না। সুষুপ্তিকে কারণশরীরের একটা বিশেষ অবস্থা বলছেন। সুষুপ্তি আর সমাধি কি এক ? না। সমাধিতে আমাদের আত্মানুভূতির বোধ থাকে, অজ্ঞান বিনষ্ট হয়ে যায় বলে তখন আনন্দস্বরূপ আত্মার আনন্দে সদানন্দরূপে অবস্থান। কিন্তু সুষুপ্তিতে অজ্ঞান থেকে যায়।

সর্বপ্রকারপ্রমিতিপ্রশান্তি-
র্বীজাত্মনাবস্থিতিরেব বুদ্ধেঃ।
সুষুপ্তিরেতস্য কিল প্রতীতিঃ
কিংচিন্ন বেদ্মীতি জগৎপ্রসিদ্ধেঃ॥ ১২১

অন্বয় : সর্বপ্রকারপ্রমিতি-প্রশান্তি (সকল প্রকার বিষয়জ্ঞানজনিত চাঞ্চল্যের প্রশান্তি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) বীজাত্মনা এব অবস্থিতিঃ (বীজাকারে আত্মায় অর্থাৎ অবিদ্যারূপ কারণশরীরে অবস্থান) সুষুপ্তিঃ ([এই হচ্ছে] সুষুপ্তি) কিংচিৎ (কিছুই) ন বেদ্মি (জানি না) ইতি (এই জ্ঞান) জগৎপ্রসিদ্ধেঃ (জগৎ প্রসিদ্ধ হওয়ায় [সকল মানুষের অনুভব বলে]) এতস্য (এই অবিদ্যার) প্রতীতিঃ (প্রতীতি) কিল (সম্ভব হয়)।

সরলার্থ : সকল প্রকার বিষয়জ্ঞানজনিত বিক্ষেপের প্রশান্তি ও বুদ্ধির নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবিদ্যারূপ কারণশরীরে অবস্থিতি—এই হল সুষুপ্তি। 'আমি কিছুই জানি না'—সকল মানুষের সুষুপ্তিকালীন এই যে বোধ এটাই কারণশরীরের অস্তিত্বের প্রমাণ।

ব্যাখ্যা : সুষুপ্তির বর্ণনা করছেন। আর বলছেন, এই সুষুপ্তির জন্যেই কারণশরীরের অস্তিত্ব বোঝা যায়। বলছেন, 'সর্বপ্রকারপ্রমিতি-প্রশান্তিঃ বুদ্ধেঃ বীজাত্মনা-এব অবস্থিতিঃ সুষুপ্তিঃ'; 'প্রমিতি' মানে হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান। বলছেন 'সর্বপ্রকার-প্রমিতিপ্রশান্তি'—সমস্ত রকমের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রশান্তি। ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে বিষয়ের যে জ্ঞান হয় তার থেকে মনে নানা বৃত্তির সৃষ্টি হয়, সেগুলো চিত্তের তরঙ্গ; সে সব শান্ত হয়ে গেছে। কারণ ইন্দ্রিয়গুলো ঘুমে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, বাইরের জগতের কোন জ্ঞান তখন আর হচ্ছে না, তাই প্রমিতি-প্রশান্তি। বুদ্ধিরও কাজ থেমে গেছে। 'বুদ্ধেঃ বীজাত্মনা-এব অবস্থিতি'—বুদ্ধি বীজাকারে অর্থাৎ সংস্কাররূপে অজ্ঞানের মধ্যে অবস্থান করছে। এই যে অবস্থা, এই হচ্ছে সুষুপ্তি।

গাঢ় ঘুমের মধ্যে আমরা তো বাস্তবিকই অজ্ঞানের মতো পড়ে থাকি, কিছুই টের পাই না। কিন্তু আমাদের সংস্কারগুলো থাকে। তাই জেগে উঠলেই আবার যে-কে-সেই হয়ে যাই। তাই বলছেন, সুষুপ্তিতে বুদ্ধি বীজাকারে অবস্থান করে, আর এই সুষুপ্তি অবস্থা থেকেই কারণশরীরের অস্তিত্ব বোঝা যায়। 'এতস্য কিল প্রতীতিঃ কিংচিৎ-ন বেদ্মি-ইতি জগৎপ্রসিদ্ধেঃ'; 'এতস্য' মানে এর, অর্থাৎ কারণশরীরের। বলছেন, এই কারণশরীরের প্রতীতি হয় সুষুপ্তি অবস্থা থেকে। মানুষ যখন অঘোরে ঘুমোয় তখন সকলেরই 'কিংচিৎ-ন বেদ্মি', আমি কিছুই জানি না, এই অজ্ঞানের বোধ থাকে। গভীর ঘুম থেকে উঠে মানুষ সেইজন্য বলে : 'এত ঘুমিয়েছি, কিছুই বুঝতে পারিনি।' এ সবারই অভিজ্ঞতা, তাই বলছেন, 'জগৎ প্রসিদ্ধ'। কাজেই এই সুষুপ্তি অবস্থা কারণশরীরের অস্তিত্বের একটা প্রমাণ। সুষুপ্তিতে আমার স্থূল দেহ নিষ্ক্রিয়, সূক্ষ্ম দেহ নিষ্ক্রিয়, আত্মার একেবারে কাছে এসে গেছি। শুধু অজ্ঞানের একটা সূক্ষ্ম আবরণ রয়েছে, আত্মার আনন্দ তার মধ্যে দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাই সুষুপ্তিতে অপরিসীম তৃপ্তি। কিন্তু অজ্ঞানরূপ কারণশরীর আত্মাকে আবৃত করে থাকে বলে আমরা জানতে পারি না কি আনন্দের মধ্যে ছিলাম। শুধু একটা পরিতৃপ্তি নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠি। তাই সুষুপ্তিকে কারণশরীরের অস্তিত্বের প্রমাণ বলে মনে করা হয়।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদয়ঃ
সর্বে বিকারা বিষয়াঃ সুখাদয়ঃ।
ব্যোমাদিভূতান্যখিলং চ বিশ্ব-
মব্যক্তপর্যন্তমিদং হ্যনাত্মা॥ ১২২

অন্বয় : দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনঃ-অহম্-আদয়ঃ (দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহম্ ইত্যাদি) সর্বে বিকারাঃ (সমস্ত রকমের বিকারশীল বস্তু) বিষয়াঃ (শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় সকল) সুখাদয়ঃ (সুখ-দুঃখাদি) ব্যোমাদি ভূতানি (ব্যোম ইত্যাদি পঞ্চ মহাভূত) অখিলং বিশ্বম্ চ (এবং সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড) অব্যক্ত পর্যন্তম্ (অব্যক্ত পর্যন্ত) ইদং হি (এই সবকিছুই) অনাত্মা (আত্মা নয়)।

সরলার্থ : দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহঙ্কার ইত্যাদি সমস্ত বিকারশীল বস্তু, শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ, সুখদুঃখাদি মনের বিকার, আকাশাদি পঞ্চমহাভূত এবং অব্যক্ত পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,—এসবই অনাত্মা।

ব্যাখ্যা : শিষ্য যেসব প্রশ্ন করেছিলেন তার মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল 'কঃ অসৌ অনাত্মা', এই অনাত্মা কি বস্তু (৪৯ নং শ্লোক) ? এখন সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। বলছেন, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহঙ্কার ইত্যাদি সব বিকারশীল বস্তুই অনিত্য, অতএব অনাত্মা। আবার শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ, সুখদুঃখাদি মনের বিকার, পঞ্চমহাভূত এবং অব্যক্ত পর্যন্ত অনুভূত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই অনাত্মা, কারণ তারা অনিত্য ও পরিবর্তনশীল। অব্যক্ত হচ্ছে মায়া। মায়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি বীজ। মায়াও অনিত্য। কারণ, জ্ঞান হলে মায়া থাকে না। একমাত্র নিত্যবস্তু হচ্ছেন আত্মা, আর যা কিছু সব অনিত্য, সবই অনাত্মা। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে 'নেতি, নেতি' করে ধরে ধরে অনিত্য বস্তু বর্জন করতে হয়। সেই বিচারের ধারাটা ধরিয়ে দেবার জন্যে নাম করে করে সব অনাত্ম বস্তুর কথা বলছেন।

মায়া মায়াকার্যং সর্বং মহদাদিদেহপর্যন্তম্।
অসদিদমনাত্মতত্ত্বং বিদ্ধি ত্বং মরুমরীচিকাকল্পম্॥ ১২৩

অন্বয় : মায়া (মায়া) মহৎ-আদি দেহ পর্যন্তং (মহৎ-তত্ত্ব থেকে দেহ পর্যন্ত) মায়াকার্যং (মায়ার সৃষ্টি) সর্বং (সব কিছু) অসৎ (অনিত্য, মিথ্যা) ইদং (এই) অনাত্মতত্ত্বং (আত্মা থেকে ভিন্ন বস্তুর তত্ত্ব) ত্বং (তুমি) মরুমরীচিকাকল্পং (মরুভূমিতে মরীচিকার তুল্য) বিদ্ধি ([বলে] জেনো)।

সরলার্থ : মায়া এবং মহৎ-তত্ত্ব থেকে দেহ পর্যন্ত মায়ার সকল কার্যই অনিত্য ও মিথ্যা। এই অনাত্মবস্তুর তত্ত্ব তুমি মরুভূমিতে মরীচিকার তুল্য বলে জানবে।

ব্যাখ্যা : এখানে 'মায়াকার্যং' বা মায়ার কাজ বলতে বিশ্বসৃষ্টির কাজ বোঝাচ্ছেন। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম তাঁর অনির্বচনীয় মায়াশক্তি অবলম্বন করে সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেছেন। বলছেন, 'একং সৎ-অগ্রে-আসীৎ' (ছা, ৬।২।১), সেই এক সত্তামাত্র ছিলেন, 'তদ্-ঐক্ষত,' তিনি দেখলেন, বা সঙ্কল্প করলেন, অমনি সৃষ্টিকার্য শুরু হয়ে গেল। ব্রহ্মের দৃষ্টিপাত বা সঙ্কল্প মাত্র সৃষ্টি হয়ে গেলো। কিন্তু নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, তাঁর সঙ্কল্পই বা কি করে হয় আর দেখাই বা কি করে হয় ? এটা তিনি করলেন তাঁর মায়াশক্তির সাহায্যে। 'মহৎ' থেকে শুরু করে দেহাদি পর্যন্ত সব সৃষ্টি হয়ে গেলো। 'মহৎ' থেকে অহঙ্কার এল। তারপর সূক্ষ্ম মহাভূতগুলির উৎপত্তি হলো। তারা পঞ্চীকরণের মধ্যে দিয়ে স্থূল পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি করল। তারপর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত হলো। বলছেন, 'মায়া মায়াকার্যং সর্বং মহদাদি দেহ পর্যন্তম্ অসৎ-ইদম্-অনাত্ম তত্ত্বং'; মায়া ও মায়ার কাজ দুই-ই অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। 'মহৎ' থেকে স্থূল দেহের প্রকাশ পর্যন্ত সবকিছুই মায়ার কার্য। তাই এ-সবই অসৎ, অনিত্য, মিথ্যা। এগুলো সব অনাত্মবস্তু, 'বিদ্ধি ত্বম্ মরুমরীচিকাকল্পম্'; তুমি এগুলোকে মরুভূমির মরীচিকার মতো বলে জেনো। মরুভূমিতে মরীচিকায় আমরা যে জলাশয় দেখি সেটা ভুল দেখি। মনে হচ্ছে জলাশয়, কিন্তু আসলে তা নয়। তপ্ত বালুর উপর সূর্যের আলো পড়ে

ঐরকম দেখাচ্ছে। জগৎকেও সেইভাবে জানতে হবে। সত্য বলে মনে হলেও এ সত্য নয়। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। কেন সত্য ? কারণ, নিত্য—চিরকালীন সত্য, ত্রিকাল অবাহিত সত্য। এই অর্থেই জগৎ মিথ্যা, কারণ জগৎ নিত্য নয়। কিন্তু জগৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া তো সহজ নয়। আমার খিদে-তেষ্টা আছে, রোগযন্ত্রণা আছে—এসব আমার নিজের অনুভব, একে মিথ্যে বলি কি করে ? হ্যাঁ, ব্যবহারিকভাবে জগৎ মিথ্যা নয়। যতদিন না জানছি ব্রহ্মই অধিষ্ঠান, তিনি আছেন বলেই জগৎ আছে, ততদিন জগৎ মিথ্যে মনে হয় না। মরুভূমিতে বালি তেতে গিয়ে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম প্রতিসরণ ঘটে আর তার ফলে মরীচিকা দেখি। কিন্তু যতক্ষণ না আমরা মরীচিকার রহস্যটা জানি, ততক্ষণ মরীচিকার জলকে সত্য বলেই মনে হয়। এ জগৎ-ও তেমনি। ব্রহ্মকে সত্য হিসেবে যতক্ষণ না জানি, যতক্ষণ না জানি ব্রহ্মই এ-জগতের অধিষ্ঠান, ততক্ষণ জগৎকে মিথ্যা বলে ঠিক ঠিক মনে হয় না। কিন্তু জগতের মিথ্যাত্ব-বোধ বুদ্ধিতে না এলে সাধক আত্মজ্ঞানের দিকে এগোতে পারে না। তাই বলছেন, 'অসৎ-ইদম্ অনাত্মতত্ত্বং বিদ্ধি ত্বম্ মরুমরীচিকাকল্পম্'। মরুভূমির মরীচিকা সত্য মনে হলেও যেমন মিথ্যাই, তেমনি এ জগৎ যতই সত্যি মনে হোক না কেন—এ আসলে মিথ্যা। এটা সব সময় মনে রেখো।

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
যদ্‌বিজ্ঞায় নরো বন্ধান্মুক্তঃ কৈবল্যমশ্নুতে।। ১২৪

অন্বয় : অথ (অনন্তর) তে (তোমাকে) পরমাত্মনঃ স্বরূপং (পরমাত্মার স্বরূপ) সংপ্রবক্ষ্যামি (বিশেষভাবে বলব) নরঃ (মানুষ) যৎ বিজ্ঞায় (যা জেনে) বন্ধাৎ-মুক্তঃ (বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে) কৈবল্যম্ অশ্নুতে (কৈবল্য লাভ করে)।

সরলার্থ : এবার তোমাকে পরমাত্মার স্বরূপের কথা বিশেষভাবে বলব। যাঁকে জানলে মানুষ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কৈবল্য লাভ করে।

ব্যাখ্যা : শিষ্য অনাত্মা কি জানতে চেয়েছিলেন আর জিজ্ঞেস করেছিলেন 'পরমঃ কঃ আত্মা ?' অনাত্ম-বিষয় বলা হয়ে গেছে, এবার তাই বলছেন, তোমাকে পরমাত্মার স্বরূপের কথা বলব। তাঁকে জানলে সংসারবন্ধন চলে যাবে, কৈবল্য লাভ করবে। পরমাত্মার কথা শুনে অনুধাবন করতে হলে একটা প্রস্তুতি লাগে, এই জ্ঞান লাভ করার অধিকারী হতে হয়। এখন শিষ্যকে যোগ্য অধিকারী বলে বুঝেছেন, তাই পরমাত্মার স্বরূপের কথা বলতে যাচ্ছেন।

অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং নিত্যমহংপ্রত্যয়লম্বনঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ ।। ১২৫

অন্বয় : পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ (পঞ্চকোশ থেকে আলাদা) অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার সাক্ষী হয়ে) নিত্যং (সর্বদা) অহংপ্রত্যয়লম্বনঃ (অহং-প্রত্যয়ের আশ্রয়) কশ্চিৎ (কেউ একজন) স্বয়ম্ অস্তি (নিজে আছেন)।

সরলার্থ : পঞ্চকোশ থেকে আলাদা, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ এবং জীবের 'আমি আমি' বোধের নিত্য অধিষ্ঠানরূপে কেউ একজন স্বয়ংই রয়েছেন।

ব্যাখ্যা : 'অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং নিত্যম্-অহং-প্রত্যয়লম্বনঃ'; এমন একজন কেউ নিজে নিজেই আছেন যিনি সর্বদা 'অহম্' জ্ঞানের অধিষ্ঠান-স্বরূপ। তিনি 'অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ পঞ্চকোশ বিলক্ষণঃ'—পঞ্চকোশ থেকে আলাদা, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ হয়ে তিনি আছেন। 'নিজে নিজেই আছেন' মানে তিনি অন্য কারও উপর নির্ভর করেন না। অনপেক্ষ তিনি, তাঁর অস্তিত্ব অন্য কোন কিছুর ওপর নির্ভর করে নেই। 'জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি' এই তিন অবস্থার সাক্ষিরূপে আত্মা আছেন। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের জগতের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া চলতে থাকে তিনি আছেন বলে, স্বপ্নে আমরা মনোজগতে ঘুরে বেড়াতে পারি তিনি আছেন বলেই, আর সুষুপ্তিতে দেহ-মন-বুদ্ধি যখন লয় হয়ে যায় তখনও সেই আত্মা জেগে থাকেন দ্রষ্টারূপে সাক্ষিরূপে। তিনি 'পঞ্চকোশ বিলক্ষণঃ'। আমাদের আত্মার ওপর পাঁচটি কোশ আছে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ। অন্নময় কোশ আমাদের স্থূল শরীর, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশ আমাদের সূক্ষ্ম শরীর। আর আনন্দময় কোশ হচ্ছে আমাদের কারণশরীর। এই কোশগুলি আত্মার ওপর এক একটি আস্তরণ। আত্মা কিন্তু এদের থেকে আলাদা।

যো বিজানাতি সকলং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
বুদ্ধিতদ্‌বৃত্তিসদ্‌ভাবমভাবমহমিত্যয়ম্। ১২৬

অন্বয় : যঃ (যিনি) জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কালে) সকলং বুদ্ধি-তদ্-বৃত্তি-সদ্‌ভাবম্-অভাবম্ (সমস্ত বুদ্ধির ও তার বৃত্তির থাকা বা না থাকা) অহং ইতি (আমি জানছি বলে) বিজানাতি (জানেন) [সঃ (সেই)] অয়ম্ (এই আত্মা)।

সরলার্থ : যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় বুদ্ধির ক্রিয়া, তার বৃত্তি ও অভাব, 'আমি এসব জানছি' বলে জানেন তিনিই এই আত্মা।

ব্যাখ্যা : বলছেন, যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় সবকিছু জানছেন, যিনি 'বুদ্ধি-তদ্‌বৃত্তি'—বুদ্ধি ও তার বৃত্তি, 'সদ্‌ভাবম্-অভাবম্'—তার থাকা বা না থাকা, এই সমস্তকে—অহম্-ইতি বিজানাতি—'আমিই জানছি' বলে জানেন, তিনিই হচ্ছেন 'অয়ম্'—এই আত্মা। আমাদের জাগ্রত অবস্থায় মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় সবাই কাজ করে।

তখন বিষয় সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় সেটা বুদ্ধি কাজ করছে বলেই হয়। যখন স্বপ্ন দেখি তখন মনোজগতে থাকি। ইন্দ্রিয়গুলো সেখানে নেই। স্বপ্নের জগৎ চলে অন্তঃকরণের মাধ্যমে, সেখানে বুদ্ধির বৃত্তিগুলো আছে কিন্তু তার কোনও বাস্তব ক্রিয়া নেই। আবার সুষুপ্তির সময় মন বুদ্ধি কিছুই থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় আমার যে অভিজ্ঞতাগুলি হচ্ছে, আমি জানছি যে আমার সেই অভিজ্ঞতাগুলি হচ্ছে; স্বপ্ন অবস্থায় যা দেখছি, আমি জানি যে আমিই দেখছি। আর সুষুপ্তিতে আমার কোন জ্ঞানই থাকে না। কিন্তু কোন যে জ্ঞান থাকে না সেটা কিন্তু আমিই জানি। তাই ঘুম থেকে উঠে বলি, কি ভীষণ ঘুমিয়েছি, কিছুই টের পাই নি। তাই বলছেন : এই যে 'আমি জানছি' বোধ, এই বোধ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই থাকে। সেই বোধস্বরূপ যিনি, যিনি তিন অবস্থার বিজ্ঞাতারূপে সব সময় আছেন, তিনিই এই আত্মা।

যঃ পশ্যতি স্বয়ং সর্বং যন্ন পশ্যতি কশ্চন।
যশ্চেতয়তি বুদ্ধ্যাদি ন তদ্ যং চেতয়ত্যয়ম্॥ ১২৭

অন্বয় : যঃ (যিনি) স্বয়ং (নিজে) সর্বং (সব কিছু) পশ্যতি (দেখেন) কঃ-চন (কেউই) যং (যাঁকে) ন পশ্যতি (দেখে না) যঃ (যিনি) বুদ্ধি-আদি (বুদ্ধি ইত্যাদি) চেতয়তি (চৈতন্যময় করেন) যম্ (যাঁকে) তৎ (বুদ্ধি প্রভৃতি) ন চেতয়তি (প্রকাশ করে না) অয়ম্ (এই সেই আত্মা)।

সরলার্থ : যিনি নিজে সবকিছু দেখেন কিন্তু যাঁকে কেউ দেখতে পায় না, যিনি বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে চৈতন্যময় করেন কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, তিনিই আত্মা।

ব্যাখ্যা : তিনি আছেন বলেই এই জগৎ চলছে। তিনি সবকিছু দেখছেন বলেই আমাদের জগতের জ্ঞান হচ্ছে। কারণ মন-প্রাণ-বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলি, যেগুলোর সাহায্যে এই জগৎকে আমরা জানি, সেগুলো তাঁর চৈতন্যেই চৈতন্যময়, তাঁর শক্তিতেই জগৎ-কে প্রকাশ করছে। তিনি কিন্তু লুকিয়ে আছেন, তাঁকে কেউ দেখতে পায় না, জানতে পারে না। বলছেন, 'যঃ পশ্যতি স্বয়ং সর্বং যং-ন পশ্যতি কশ্চন', যিনি স্বয়ং সবকিছু দেখছেন কিন্তু যাঁকে কেউই দেখছে না, 'যঃ-চেতয়তি বুদ্ধি-আদি ন তদ্ যং চেতয়তি-অয়ম্', যিনি বুদ্ধি ইত্যাদিকে চেতন করছেন, কিন্তু সেই বুদ্ধি যে চৈতন্যস্বরূপকে প্রকাশ করতে পারছে না—তিনিই এই আত্মা। তিনি তো স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁকে আবার কে প্রকাশ করবে ? বুদ্ধি যা কিছু প্রকাশ করছে সে তো তাঁর চৈতন্যের প্রভাবেই করতে পারছে, সে তাঁকে কি করে প্রকাশ করবে ? তাঁর চৈতন্যেই সবকিছু চৈতন্যময়, 'তস্য ভাসা সর্বমিদম্ বিভাতি' (মু, ২।২।১০)। তিনিই সবকিছু প্রকাশ করছেন তাঁকে কেউ প্রকাশ

করতে পারে না। কেনোপনিষদে আছে 'যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি' (কে, ১/৭), যাঁকে চোখ দিয়ে কেউ দেখতে পায় না কিন্তু যাঁর দ্বারা চোখে দৃষ্টিশক্তি আসে বলেই লোকে দেখে, তাঁকে জান, তিনিই ব্রহ্ম। এখানেও সেই কথাই বলছেন।

যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তং যন্ন ব্যাপ্নোতি কিংচন।
আভারূপমিদং সর্বং যং ভান্তমনুভাত্যয়ম্॥ ১২৮

অন্বয় : ইদং বিশ্বং (এই বিশ্ব) যেন ব্যাপ্তং (যাঁর দ্বারা পরিব্যাপ্ত) যং (যাঁকে) কিঞ্চন (কোন কিছুই) ন ব্যাপ্নোতি (ব্যাপ্ত করে না) ইদং সর্বং আভারূপম্ (যাঁর ছায়ারূপ এই সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ) যং ভান্তং (যিনি স্বপ্রকাশ বলে [এই বিশ্ব]) অনুভাতি (প্রকাশ পায়) অয়ম্ (তিনিই এই আত্মা)।

সরলার্থ : যাঁর দ্বারা সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে অথচ যাঁকে কোন কিছুই ব্যাপ্ত করতে পারে না, এই বিশ্ব যাঁর ছায়ারূপ, যিনি প্রকাশমান বলে এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, তিনিই এই আত্মা।

ব্যাখ্যা : আত্মা যে সর্বব্যাপী সেই কথা বলছেন। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' (ঈ, ১), তিনি এই জগৎসংসারের সবকিছু আচ্ছাদন করে আছেন। সবকিছুর ভেতরেও আছেন বাইরেও আছেন। তিনি 'ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত', সর্বভূতে আছেন। বলছেন, 'যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তং যৎ-ন ব্যাপ্নোতি কিঞ্চন', যাঁর দ্বারা এই বিশ্বজগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে কিন্তু যাঁকে কেউ ব্যাপ্ত করতে পারে না। এমন কিছুই নেই যার মধ্যে বা বাইরে তিনি নেই। কাজেই তাঁর দ্বারা সবকিছু ব্যাপ্ত হয়ে তো থাকবেই। আর যিনি সর্বব্যাপী তাঁকে আবার কি দিয়ে ব্যাপ্ত করা যাবে ? তাই তাঁকে কোনও কিছু দিয়েই ব্যাপ্ত করা যায় না। 'আভারূপম্-ইদম্ সর্বং যং ভান্তম্-অনুভাতি-অয়ম্'; 'আভারূপম্' অর্থাৎ জ্যোতিস্বরূপ তিনি। সেই জ্যোতির প্রভায় এই সমগ্র জগৎ আভাময়। কিন্তু তাঁকে প্রকাশ করার জন্যে আর কাউকে দরকার নেই, স্বয়ংপ্রকাশ তিনি। সেই স্বয়ংপ্রকাশকে আশ্রয় করে জগতের সবকিছু প্রকাশিত। তিনিই সেই আত্মা। কঠোপনিষদে বলছেন, 'তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্' (ক, ২/২/১৫)। তাঁর প্রভায় সবকিছু প্রভাময় হয়ে প্রকাশ পায়। সূর্যের আলোয় যেমন জগতের সবকিছু প্রকাশিত হয়। তিনিই সেই আত্মা।

যস্য সন্নিধিমাত্রেণ দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্তন্তে প্রেরিতা ইব॥ ১২৯

অন্বয় : যস্য (যাঁর) সন্নিধিমাত্রেণ (সামীপ্যের দ্বারা) দেহ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-ধিয়ঃ (দেহ,

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি) স্বকীয়েষু বিষয়েষু (স্ব স্ব-বিষয়ে) প্রেরিতাঃ ইব (প্রেরিতের মতো) বর্তন্তে (নিযুক্ত থাকে) [তিনিই আত্মা]।

সরলার্থ : যাঁর সন্নিধানবশত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি নিজের নিজের বিষয়ে যেন প্রেরিত হয়ে নিযুক্ত থাকে, তিনিই আত্মা।

ব্যাখ্যা : এই দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি, এরা জড়, এদের স্বকীয় কোনও সত্তা নেই। তা সত্ত্বেও এরা কাজ করে যায়। যাঁর সান্নিধ্যের জন্যে, যেন আদেশপ্রাপ্ত ভৃত্যের মতো এরা নিজের নিজের কাজ করে যায়, তিনিই আত্মা। 'যস্য সন্নিধিমাত্রেণ দেহ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-ধিয়ঃ বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্তন্তে প্রেরিতাঃ ইব'; এখানে দেহ বলতে হাত-পা-বাক্য ইত্যাদি সব কর্মেন্দ্রিয়গুলোকে বোঝাচ্ছেন আর ইন্দ্রিয় বলতে চোখ-কান ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোকে বোঝাচ্ছেন। 'মনঃ' কথাটা ব্যাপক অর্থে বলছেন, অন্তঃকরণ বলে বুঝতে হবে, তার মধ্যে বুদ্ধিও আছে। আর 'ধিয়ঃ' বলতে এখানে বোঝাচ্ছে অহংকারকে। বলছেন 'যস্য সন্নিধি-মাত্রেণ'। যাঁর শুধু সান্নিধ্যের জন্যেই এই দেহ-ইন্দ্রিয় ইত্যাদি 'বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্তন্তে প্রেরিতাঃ ইব'—দেহ-মন-বুদ্ধি-অহংকার এমন ভাবে নিজের নিজের কাজে লেগে যাচ্ছে যে মনে হবে কেউ যেন তাদের ঐ ঐ কাজের জন্যে পাঠিয়েছে। ভাবটা হচ্ছে আত্মা যেন প্রভুর মতো বসে আছেন আর দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি যেন অনুগত ভৃত্যের মতো তাঁর কাছাকাছি আছে এবং তাঁর উপস্থিতিটাই তাদের নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত করছে। ইন্দ্রিয়গুলোকে মন চালায় আর মন কাজ করে আত্মার শক্তিতে। তাই বলছেন, যাঁর 'সন্নিধিমাত্রেণ' এরা সব ভৃত্যের মতো 'প্রেরিতাঃ ইব' কাজ করছে তিনিই সেই চৈতন্যময় আত্মা। তিনি আছেন বলেই এই জগৎ চলছে।

অহংকারাদিদেহান্তা বিষয়াশ্চ সুখাদয়ঃ।
বেদ্যন্তে ঘটবদ্ যেন নিত্যবোধস্বরূপিণা॥ ১৩০

অন্বয় : অহংকারাদি-দেহান্তাঃ (অহংকার থেকে স্থূল দেহ পর্যন্ত) বিষয়াঃ চ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ) সুখাদয়ঃ (সুখ-দুঃখ ইত্যাদি) নিত্যবোধস্বরূপিণা যেন (নিত্য বোধস্বরূপ যাঁর দ্বারা) ঘটবদ্ বেদ্যন্তে (ঘটের মতো বিজ্ঞাত হয়) [তিনিই আত্মা]।

সরলার্থ : নিত্যবোধস্বরূপ যাঁর দ্বারা অহংকার থেকে স্থূল দেহ পর্যন্ত সবকিছু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ঘটের মতো প্রতীয়মান হয় তিনিই আত্মা।

ব্যাখ্যা : বলছেন, একটা ঘটের মধ্যে যেমন আকাশ থাকে তেমনি আমাদের আকাশবৎ সর্বব্যাপী আত্মাও যেন অহঙ্কার প্রভৃতি দিয়ে তৈরী একটা ঘটের মধ্যে রয়েছেন। এখানে

'আকাশ' মানে 'space'। ঘট ও ঘটাকাশের অর্থাৎ ঘট-পরিচ্ছিন্ন আকাশের উপমা বেদান্তের একটা অত্যন্ত প্রচলিত উপমা। ঘটের সঙ্গে আকাশের যে সম্পর্ক, দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে আত্মার সেই সম্পর্ক। 'অহঙ্কারাদি-দেহান্তাঃ বিষয়শ্চ সুখাদয়ঃ', অহঙ্কার, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দেহ, রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ প্রভৃতি বিষয় আর সুখ-দুঃখাদির অনুভব, এই সব উপাদান দিয়ে তৈরী একটা ঘটের মধ্যে আত্মা রয়েছেন। যে আকাশ ঘটের মধ্যে থাকে সে যেমন ঘটের সঙ্গে লিপ্ত হয় না তেমনি আমাদের আত্মাও ওই অহঙ্কারাদি বিষয় এবং সুখ-দুঃখাদির থেকে আলাদা। বলছেন, 'বেদ্যন্তে ঘটবদ্ যেন নিত্যবোধস্বরূপিণা' এগুলোকে ঘটবৎ বলে জানছেন তিনি। কে জানছেন ? যিনি নিত্য বোধস্বরূপ। তিনিই আমাদের আত্মা। ঘটের মধ্যে যে আকাশ আছে, মনে হয় সে যেন মহাকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘটের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু আকাশ কখনো ঘটে আবদ্ধ হয় না বা ঘটের সঙ্গে লিপ্ত হয় না। ঘটটা ভেঙে দিলেই সব একাকার। তেমনি আমার নিত্যবোধস্বরূপ আত্মা এই অহঙ্কার, বিষয় ও সুখ-দুঃখ প্রভৃতির দ্বারা যেন আবদ্ধ হয়ে গেছেন। কিন্তু আসলে এগুলিকে তিনি ঐ ঘটের মতো জানেন—বেদ্যন্তে ঘটবৎ; তিনি এসবের সঙ্গে কোনও ভাবেই লিপ্ত নন।

এষোঽন্তরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো
নিরন্তরাখণ্ডসুখানুভূতিঃ।
সদৈকরূপঃ প্রতিবোধমাত্রো
যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি॥ ১৩১

অন্বয় : এষঃ অন্তরাত্মা (এই অন্তরাত্মা) পুরুষঃ পুরাণঃ (সনাতন পুরুষ) নিরন্তর-অখণ্ড-সুখানুভূতিঃ (নিত্য-অখণ্ড সুখানুভব স্বরূপ) সদা একরূপঃ (সর্বদা একরূপ) প্রতিবোধমাত্রঃ (প্রতি বিষয়ের বোধস্বরূপ) বাক্-অসবঃ (বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও প্রাণ) যেন ইষিতাঃ (যাঁর ইচ্ছার দ্বারা) চরন্তি (নিজের নিজের পরিধির মধ্যে বিচরণ করে)।

সরলার্থ : এই অন্তরাত্মা সনাতন পুরুষ, নিত্য অখণ্ড সুখানুভব স্বরূপ, সর্বদা একরূপ, সর্ব বিষয়ের বোধস্বরূপ—যাঁর ইচ্ছায় বাক্ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় ও প্রাণ নিজের নিজের কর্মে ব্যাপৃত থাকে।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকেও আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করছেন এবং কয়েকটি প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্য অনুসরণ করে সেটা বলছেন। বলছেন, 'এষঃ অন্তরাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ', আত্মাকে 'অন্তরাত্মা' বলছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে : 'অন্তরতরং যদয়মাত্মা'—এই আত্মা অন্তরের সবচেয়ে গভীরে রয়েছেন। তারই অনুসরণে এখানে বলছেন : 'এষঃ অন্তরাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ'। 'পুরাণঃ', মানে 'পুরাপি নবঃ', অর্থাৎ পুরাতন কিন্তু

চিরনতুন, সনাতন। 'পুরুষঃ', যিনি দেহে বাস করছেন, 'পুরি শেতে', তিনি পুরুষ। এই অন্তরাত্মা সনাতন পুরুষ, আমার দেহরূপ পুরে শয়ন করে আছেন বা বাস করছেন। 'নিরন্তর-অখণ্ড সুখানুভূতিঃ', তিনি নিরবচ্ছিন্ন, অখণ্ড, পূর্ণ সুখানুভব স্বরূপ; 'সদা-একরূপঃ', সর্বদা একরূপ তিনি। তাঁর কোন বিকার পরিবর্তন বা ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই। তাই তিনি সর্বদা 'একরূপঃ'। 'প্রতিবোধমাত্রঃ' অর্থাৎ বুদ্ধির সমস্ত ক্রিয়ায় বোধ রূপে তিনি আছেন। কেনোপনিষদে আছে 'প্রতিবোধবিদিতম্ মতম্' (কে, ২/৪) অর্থাৎ প্রতি বোধে এই আত্মার বোধ। আমি দেখছি, শুনছি বা কিছু করছি, সবকিছুর মধ্যে যে আমি এইসব করছি বলে একটা বোধ, সেই বোধস্বরূপই এই আত্মা। 'যেন-ইষিতা বাক্-অসবঃ চরন্তি'; যাঁর ইচ্ছার দ্বারা বাক্-ইত্যাদি ইন্দ্রিয় ও প্রাণ তাদের কাজ করে যায়। কেনোপনিষদ্ বলছেন, 'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক-উ দেবো যুনক্তি' (কে, ১/১)। কার ইচ্ছায় মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রেরিতের মতো যায় ? কার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে প্রধান প্রাণ স্বকার্যে যায় ? কার ইচ্ছায় লোকে কথা বলে ? কোন্ জ্যোতিষ্মানই বা চোখ ও কানকে নিজের নিজের কাজে নিয়োগ করেন ? এই 'কেনেষিতং' প্রশ্নের উত্তরই এই শ্লোকে দিয়েছেন। বলছেন : আত্মা আছেন বলেই তাঁর প্রভাবে ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ সব ভৃত্যের মতো নিজের নিজের কাজ করে চলে।

অত্রৈব সত্ত্বাত্মনি ধীগুহায়া-
মব্যাকৃতাকাশ উশৎপ্রকাশঃ।
আকাশ উচ্চৈঃরবিবৎ প্রকাশতে
স্বতেজসা বিশ্বমিদং প্রকাশয়ন্॥ ১৩২

অন্বয় : অত্র-এব (এই দেহে) সত্ত্ব-আত্মনি (সত্ত্বগুণপ্রধান অন্তঃকরণে) ধী-গুহায়াম্ (বুদ্ধিরূপ গুহায়) অব্যাকৃত-আকাশে (অপ্রকাশিত আকাশে অর্থাৎ কারণশরীরে) উশৎ-প্রকাশঃ (কমনীয় তেজোযুক্ত) আকাশঃ (আত্মা) স্বতেজসা (নিজের তেজের দ্বারা) ইদং বিশ্বং (এই বিশ্বকে) প্রকাশয়ন্ (প্রকাশ করে) উচ্চৈঃ (উচ্চে অবস্থিত) রবিবৎ প্রকাশতে (সূর্যের মতো দীপ্যমান হয়ে থাকেন)।

সরলার্থ : সমগ্র জগৎকে আলোকিত করেও দীপ্যমান সূর্য যেমন জগতের ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন, তেমনি কমনীয় তেজোযুক্ত আত্মা নিজের তেজে এই বিশ্বজগৎকে প্রকাশ করেও এই দেহে, সত্ত্বগুণ প্রধান অন্তঃকরণে, বুদ্ধিরূপ গুহায় এবং কারণশরীরে নির্লিপ্তভাবে বিরাজ করেন।

ব্যাখ্যা : এখানে ইঙ্গিতে বলছেন পরমাত্মার অন্বেষণ কোথায় করতে হবে। 'অত্র-এব,

সত্ত্ব-আত্মনি ধীগুহায়াম্-অব্যাকৃত-আকাশ'। 'অত্র-এব'—এখানেই, মানে এই দেহেই। 'সত্ত্ব-আত্মনি'—সত্ত্বগুণ প্রধান অন্তঃকরণে। পঞ্চভূতের সত্ত্ব অংশ থেকে অন্তঃকরণ তৈরী হয়েছে, তাই সত্ত্বগুণ প্রধান। সত্ত্বগুণ প্রধান অন্তঃকরণেও আত্মা আছেন। 'ধীগুহায়াম্', শুদ্ধ বুদ্ধির গুহায় আত্মা রয়েছেন। আর 'অব্যাকৃত-আকাশে', অব্যক্ত আকাশ অর্থাৎ কারণশরীরের ভেতরে আত্মা আছেন। কিরকম তিনি ? 'উশৎপ্রকাশঃ আকাশঃ'; সর্ব প্রকাশক উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ তেজস্বরূপ। তিনি 'স্বতেজসা বিশ্বমিদং প্রকাশয়ন্'—নিজের তেজের দ্বারা এই বিশ্বকে প্রকাশ করে, 'উচ্চৈঃ রবিবৎ প্রকাশতে', ঊর্ধ্বে অবস্থান করছে যে তেজোদীপ্ত সূর্য সেইরকম দ্রষ্টারূপে বিরাজ করছেন। স্থূল দেহ, অন্তঃকরণ ও অব্যক্ত আকাশ এই তিনের মধ্যে থেকেও তিনি এগুলি থেকে আলাদা হয়ে আছেন। তিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটি শরীর থেকেই আলাদা। তাঁকে জানতে হলে এই তিনটি শরীরেই অভিমান বর্জন করতে হবে। আত্মাকে 'আকাশঃ' বলছেন। বেদান্তে ব্রহ্মকে অনেক সময়ই আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কারণ আকাশ সর্বব্যাপী, নিরাকার আর ব্রহ্ম বা আত্মাও তাই। যদিও ব্রহ্ম অতুলনীয়, তাঁর সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না। তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করছেন কিন্তু তিনি এ-সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সূর্যের আলোয় যেমন সবকিছুর প্রকাশ হয় অথচ সূর্য কিছুর সঙ্গেই লিপ্ত নন তিনিও তেমনি দ্রষ্টা, সাক্ষী।

জ্ঞাতা মনোঽহংকৃতিবিক্রিয়াণাং
দেহেন্দ্রিয়প্রাণকৃতক্রিয়াণাম্।
অয়োঽগ্নিবৎ তাননুবর্তমানো
ন চেষ্টতে নো বিকরোতি কিংচন॥ ১৩৩

অন্বয় : [আত্মা] মনঃ-অহংকৃতি-বিক্রিয়াণাং (মন ও অহংকারের সব বিকারের) দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-কৃত-ক্রিয়াণাম্ (দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের করা সমস্ত কাজের) জ্ঞাতা (জ্ঞাতা) অয়ঃ-অগ্নিবৎ (জ্বলন্ত লোহায় আগুনের মতো) তান্ (সেইসবকে অর্থাৎ মন-অহংকার দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকে) অনুবর্তমানঃ (অনুবর্তন করার) কিংচন ন চেষ্টতে (কোনও চেষ্টা করেন না) নো বিকরোতি (বিকারী হন না)।

সরলার্থ : আত্মা মন ও অহঙ্কারের সমস্ত বিকারের আর দেহ-ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমস্ত কাজের জ্ঞাতা। কিন্তু জ্বলন্ত লোহার তালের পক্ষে নানা আকৃতি গ্রহণ করা সম্ভব হলেও সেই লোহার তালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আগুন কখনও সেইসব আকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না। তেমনি মন, অহঙ্কার, দেহ, ইন্দ্রিয়াদিকে অনুবর্তন করার কোনও চেষ্টাই আত্মার নেই। তিনি কখনও বিকারপ্রাপ্ত হন না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'জ্ঞাতা মনঃ-অহংকৃতি-বিক্রিয়াণাং', মনের মধ্যে নানা বাসনা-কামনা, সংকল্প-বিকল্প হচ্ছে—এগুলো মনের বিকার। আর 'আমি' বুদ্ধি নিয়ে যা কিছু করি বা ভাবি, তা হল অহঙ্কারের বিকার। আত্মা মন ও অহঙ্কারের সমস্ত বিকারের জ্ঞাতা। দেহ, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রাণ, এদের সাহায্যেই আমাদের সব কাজ চলে। আত্মা সেইসব ক্রিয়ারও জ্ঞাতা। তিনি নিজে কিন্তু অবিকারী, নিষ্ক্রিয়। 'অয়ঃ-অগ্নিবৎ তান্-অনুবর্তমানঃ ন চেষ্টতে ন বিকরোতি কিংচন'; একটা জ্বলন্ত লোহার তাল আগুনের উত্তাপে নরম হয়ে যায় আর তখন সেটা নানা আকার নিতে পারে। সেই বিভিন্ন আকারের জ্বলন্ত লোহার তালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে আগুন, মনে হতে পারে যে সেও ঐ পরিবর্তিত আকার পেয়েছে। কিন্তু তা তো নয়, আগুন যেমন আগুন ছিল তেমনিই থাকে। সেইরকম আত্মা মন-অহঙ্কার-দেহ-প্রাণ ইত্যাদির সব বিকার ও কর্মের জ্ঞাতারূপেই আছেন। এদের কোনও গুণ বা বিকারই আত্মাকে স্পর্শ করে না। এইসব গুণ অবলম্বন করার কোনও চেষ্টাই তাঁর মধ্যে নেই। তিনি কখনও বিকারপ্রাপ্ত হন না। তিনি অবিকারী, নিষ্ক্রিয়—সবকিছুর জ্ঞাতারূপে আমাদের হৃদয়কন্দরে অবস্থান করছেন।

ন জায়তে নো ম্রিয়তে ন বর্ধতে
ন ক্ষীয়তে নো বিকরোতি নিত্যঃ।
বিলীয়মানেঽপি বপুষ্যমুষ্মিন্
ন লীয়তে কুম্ভ ইবাম্বরঃ স্বয়ম্।। ১৩৪

অন্বয় : নিত্যঃ (চিরবর্তমান) [আত্মা] ন জায়তে (জন্মান না) ন ম্রিয়তে (মরেন না) ন বর্ধতে (বৃদ্ধি পান না) ন ক্ষীয়তে (ক্ষয়প্রাপ্ত হন না) নো বিকরোতি (বিকারপ্রাপ্ত হন না) অমুষ্মিন্ বপুষি (এই দেহ) বিলীয়মানে-অপি (নাশ পেলেও) স্বয়ং ন লীয়তে (আত্মা স্বয়ং নাশপ্রাপ্ত হন না) কুম্ভ ইব-অম্বরঃ (ঘটস্থ আকাশের মতো)।

সরলার্থ : চিরবর্তমান আত্মা জন্মান না, মরেন না, বৃদ্ধি পান না, ক্ষয় পান না, বিকার-প্রাপ্তও হন না। ঘটমধ্যস্থিত আকাশ যেমন ঘট ভেঙে গেলে নাশ পায় না তেমনি এই দেহ বিনষ্ট হলে আত্মা স্বয়ং বিনষ্ট হন না।

ব্যাখ্যা : যা অনিত্য জড় বস্তু সেসবের ষড়্‌বিকার আছে, আমাদের দেহেরও আছে, কিন্তু আত্মার নেই, কারণ তিনিই একমাত্র নিত্যবস্তু। ষড়্‌বিকার হচ্ছে : জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণামতে, ক্ষীয়তে, বিনশ্যতি—জন্মাচ্ছে, থাকছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিণাম হচ্ছে, ক্ষয় পাচ্ছে আর শেষে বিনষ্ট হচ্ছে। আত্মার এই ষড়্‌বিকার হয় না। তাই বলছেন, 'ন জায়তে নো ম্রিয়তে ন বর্ধতে ন ক্ষীয়তে নো বিকরোতি নিত্যঃ'—

আত্মা নিত্যবস্তু তাই সে জন্মায় না, মরে না, বৃদ্ধি পায় না, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, বিকারপ্রাপ্তও হয় না। 'বিলীয়মানে-অপি বপুষি-অমুষ্মিন্ ন লীয়তে কুম্ভ ইব-অম্বরঃ স্বয়ম্', দেহ বিনষ্ট হলেও এই আত্মার বিনাশ হয় না যেমন ঘট বিনষ্ট হলে ঘটের মধ্যেকার আকাশের বিনাশ হয় না। এইরকম কথা শ্রুতিও বলছেন, গীতাতেও আছে। কঠোপনিষদে আছে, 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' (ক, ১/২/১৮); ব্রহ্ম জন্মান না, মরেন না। এই আত্মা অন্য কোনও কারণ থেকে উদ্ভূত হন নি, তাঁর থেকেও কিছু উৎপন্ন হয়নি। আত্মা জন্মহীন নিত্য শাশ্বত ও সনাতন। শরীর হত হলে ইনি হত হন না। এই আত্মাকেই জানতে হবে।

প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ
সদসদিদমশেষং ভাসয়ন্ নির্বিশেষঃ।
বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদিষ্ববস্থা-
স্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ।। ১৩৫

অন্বয় : প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ (প্রকৃতি অর্থাৎ অব্যাকৃত ও পঞ্চ মহাভূতাদির কারণ এবং বিকৃতি অর্থাৎ দেহ থেকে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত কার্য—এদের থেকে ভিন্ন) শুদ্ধবোধস্বভাবঃ (শুদ্ধবোধস্বরূপ) নির্বিশেষঃ (যাঁকে বিশেষিত করা যায় না) পরমাত্মা (পরমাত্মা) ইদম্ (এই) অশেষং (অনন্ত) সৎ-অসৎ (কার্য ও কারণসমূহ, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ) ভাসয়ন্ (প্রকাশ করে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ (সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপে থেকে) জাগ্রৎ-আদিষু-অবস্থাসু (জাগ্রৎ ইত্যাদি অবস্থায়) অহম্-অহম্-ইতি (আমি আমি ভাব নিয়ে) বিলসতি (যেন লীলা করছেন)।

সরলার্থ : কার্য-কারণ থেকে ভিন্ন, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ নির্বিশেষ পরমাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ নিখিল জগৎকে প্রকাশ করে বুদ্ধির সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপে জাগ্রদাদি তিন অবস্থায় 'আমি, আমি' এই বোধ নিয়ে যেন লীলা করছেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, এই আত্মা 'প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ'; 'প্রকৃতি' হল অব্যক্ত, অব্যাকৃত, পঞ্চ মহাভূতের কারণ; 'বিকৃতি' হল দেহ থেকে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যা কিছু স্থূল পদার্থ, জীবজগৎ, গ্রহ, নক্ষত্র, স্থাবর জঙ্গম সবকিছু। আত্মা প্রকৃতি ও তার বিকৃতি থেকে ভিন্ন। 'শুদ্ধবোধস্বভাবঃ'—তিনি শুদ্ধবোধস্বরূপ, এই তাঁর স্বভাব। শুদ্ধ মানে কি ? কোনও মলিনতা নেই; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে লিপ্ততাই তো মলিনতা আনে, তিনি কিন্তু নির্লিপ্ত—দ্রষ্টারূপে সাক্ষিরূপে বোধমাত্র হয়ে আছেন। তাই তিনি 'শুদ্ধবোধস্বভাবঃ'। 'সদ্-অসদ্-ইদম্-অশেষং ভাসয়ন্ নির্বিশেষঃ'; এখানে 'সদ্-

অসৎ' মানে কার্য আর কারণ। 'সৎ' মানে যা আছে বলে দেখা যাচ্ছে, 'অসৎ' মানে যা দেখতে পাচ্ছি না। যেমন বীজ আর গাছ। গাছটাকে দেখতে পাচ্ছি তাই 'সৎ' আর বীজটাকে দেখতে পাচ্ছি না তাই 'অসৎ'। কার্য আর কারণ। কার্যটা দেখতে পাচ্ছি, কারণটা দেখতে পাচ্ছি না। 'সৎ-অসৎ-ইদম্-অশেষং ভাসয়ন্ নির্বিশেষঃ'; নির্বিশেষ তিনি, কোন বিশেষণ দিয়ে তাঁকে বিশেষিত করা যায় না। তিনি সমস্ত কার্য-কারণ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ অশেষভাবে প্রকাশ করে 'বিলসতি'—লীলা করছেন। কে লীলা করছেন ? 'পরমাত্মা'। কিভাবে লীলা করছেন ? 'জাগ্রদাদিষু অবস্থাসু-অহম্-অহম্-ইতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ'; বুদ্ধির সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপে জাগ্রদাদি তিন অবস্থায় 'আমি, আমি' এই বোধ অবলম্বন করে তিনি লীলা করছেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই আমার যা কিছু বোধ হচ্ছে, তার সাক্ষিরূপে তিনি আছেন। আর একটা 'আমি, আমি' বোধ নিয়ে যেন খেলার ছলে আমাদের মধ্যে ধারণার সৃষ্টি করছেন : আমি জেগে আছি, আমি স্বপ্ন দেখছি, আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছি। এই 'আমি, আমি' ভাবের বোধস্বরূপ যিনি তিনিই আত্মা। তাঁকেই জানতে হবে।

নিয়মিতমনসামুং ত্বং স্বমাত্মানমাত্ম-
ন্যয়মহমিতি সাক্ষাদ্ বিদ্ধি বুদ্ধিপ্রসাদাৎ।
জনিমরণতরংগাপারসংসারসিন্ধুং
প্রতর ভব কৃতার্থো ব্রহ্মরূপেণ সংস্থঃ॥ ১৩৬

অন্বয় : ত্বম্ (তুমি) অমুং (পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত) স্বম্ আত্মানং (স্বীয় আত্মস্বরূপকে) নিয়মিতমনসা (নিয়মবদ্ধ ও সংযত মনের দ্বারা) বুদ্ধিপ্রসাদাৎ (বুদ্ধির নির্মলতার ফলে) আত্মনি (নিজের আমি বুদ্ধিতে) 'অয়ম্ অহম্'-ইতি ('এই শুদ্ধ আত্মাই আমি'—এইভাবে) সাক্ষাৎ বিদ্ধি (প্রত্যক্ষরূপে অনুভব কর) জনি-মরণ-তরংগ-অপার-সংসারসিন্ধুং (জন্মমৃত্যুর তরঙ্গ-সঙ্কুল অপার ভবসাগর) প্রতর (পার হও) ব্রহ্মরূপেণ সংস্থঃ (ব্রহ্মরূপে স্থিত হও) কৃতার্থঃ ভব (কৃতার্থ হও)।

সরলার্থ : তুমি সংযত মন ও শুদ্ধ-বুদ্ধির সহায়ে, আগে আত্মার যে-সব লক্ষণ বলা হলো, সেইসব লক্ষণযুক্ত তাঁকে নিজের আত্মস্বরূপ বলে উপলব্ধি কর। 'এই শুদ্ধ আত্মাই আমি'—এইভাবে তাঁকে নিজের 'আমি বুদ্ধি'তে প্রত্যক্ষরূপে অনুভব কর। আর এর ফলস্বরূপ জন্মমৃত্যুর তরঙ্গসঙ্কুল অপার সংসারসমুদ্র পার হও। ব্রহ্মে স্থিতি লাভ কর, কৃতার্থ হও।

ব্যাখ্যা : ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যে কিভাবে এগোতে হবে সেটাই শিষ্যকে বলছেন। বলছেন, আত্মার কথা এত তো শুনলে, এখন তুমি তাঁকে নিজের স্বরূপ বলে জেনে

সংযত মনে, 'অয়ম্ অহম্'—এই আত্মাই আমি, এইটা অনুভব কর। শুদ্ধবুদ্ধির সাহায্যে এই বোধ হয়। তোমার বুদ্ধিকে শুদ্ধ করে তার সাহায্য নাও, তাহলে নিশ্চয় হবে। বলছেন, 'নিয়মিতমনসা-অমুং ত্বং স্বম্-আত্মানম্-আত্মনি-অয়ম্-অহম্-ইতি সাক্ষাদ্ বিদ্ধি বুদ্ধিপ্রসাদাৎ'; 'নিয়মিত মনসা', সংযত মনের দ্বারা; 'অমুং' মানে সেই তাঁকে; যে পরমাত্মার কথা আগের শ্লোকগুলিতে এতভাবে বলা হলো তাঁকে। 'স্বম্-আত্মানং', নিজের আত্মাকে। 'আত্মনি-অয়ম্-অহম্-ইতি সাক্ষাদ্ বিদ্ধি'। 'আত্মনি' মানে এখন যাকে তুমি 'আমি' বলে ভাবছ সেই আত্মায়। 'অয়ম্ অহম্' ইতি সাক্ষাৎ বিদ্ধি' অর্থাৎ 'আমিই এই আত্মা' এইটার প্রত্যক্ষ অনুভব কর। সেই অনুভব কি করে হবে ? 'বুদ্ধিপ্রসাদাৎ'—শুদ্ধবুদ্ধি থেকে। অর্থাৎ বুদ্ধি শুদ্ধ হলে এই জ্ঞান সেই বুদ্ধির ধারণায় আসবে, আর তখনই তোমার প্রত্যক্ষ হবে আমিই সেই পরমাত্মা। ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতিকে অপরোক্ষ অনুভূতি বলা হয়। হস্তামলকবৎ, হাতে যদি আমলকী ধরা থাকে তাহলে তো আমার বুঝতে কোনও ভুল হয় না যে আমার হাতে আমলকী আছে, এ সেইরকম প্রত্যক্ষ জ্ঞান। বলছেন, এই জ্ঞান লাভ কর এবং 'জনিমরণতরংগ-অপার-সংসারসিন্ধুং প্রতর ব্রহ্মরূপে সংস্থঃ কৃতার্থঃ ভব'—জন্মমৃত্যুর তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অপার সংসারসাগর পার হয়ে যাও। ব্রহ্মরূপে স্থিতি লাভ কর। কৃতার্থ হও। তোমাকে আর জন্মমৃত্যুর তরঙ্গে ওঠানামা করতে হবে না। তুমি ব্রহ্ম হয়ে অবস্থান করবে। কৃতকৃতার্থ হয়ে যাবে।

অত্রানাত্মন্যহমিতি মতির্বন্ধ এষোঽস্য পুংসঃ
প্রাপ্তোঽজ্ঞানাজ্জননমরণক্লেশসংপাতহেতুঃ।
যেনৈবায়ং বপুরিদমসৎ সত্যমিত্যাত্মবুদ্ধ্যা
পুষ্যত্যুক্ষত্যবতি বিষয়ৈস্তন্তুভিঃ কোশকৃদ্বৎ॥ ১৩৭

অন্বয় : অত্র অনাত্মনি (এই অনাত্মবস্তুতে অর্থাৎ দেহাদিতে) অহম্ ইতি মতিঃ (আমি-জ্ঞান) বন্ধঃ (বন্ধন) অজ্ঞানাৎ প্রাপ্তঃ (অজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত) এষঃ (এই বন্ধন) অস্য পুংসঃ (এই পুরুষের) জনন-মরণ-ক্লেশ-সংপাতহেতুঃ (জন্মমরণরূপ ক্লেশপ্রাপ্তির কারণ) যেন-এব (যে অজ্ঞানের দ্বারা) অয়ম্ (এই পুরুষ) ইদম্-অসৎ বপুঃ (এই অনিত্য দেহ) সত্যম্ ইতি আত্মবুদ্ধ্যা (সত্য মনে করে এতে 'আমি বুদ্ধি' করে) বিষয়ৈঃ (ভোগ্য বিষয়সমূহের দ্বারা) পুষ্যতি (পোষণ করে) উক্ষতি (স্নানাদি করায়) অবতি (পালন করে) তন্তুভিঃ কোশকৃৎবৎ (সুতো দিয়ে কোশকার কীট বা গুটিপোকা যেমন গুটি বানায়)।

সরলার্থ : এই অনাত্মা দেহাদিতে 'আমি'-জ্ঞানই বন্ধন। অজ্ঞান থেকে জাত এই বন্ধন পুরুষের জন্মমরণরূপ ক্লেশপ্রাপ্তির কারণ। অজ্ঞানের জন্যেই পুরুষ এই অনিত্য দেহকে সত্য মনে করে আর 'এই দেহ আমি'—এই বোধ থেকে একে বিবিধ ভোগ্যবস্তু

দ্বারা পোষণ, মার্জন ও পালন করে—গুটিপোকা যেমন সুতো দিয়ে গুটি তৈরী করে তাতে বদ্ধ হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা : শিষ্য প্রশ্ন করেছিলেন, 'কো নাম বন্ধঃ কথমেষ আগতঃ' (৪৯নং শ্লোক) ? এখানে সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। বলছেন, 'অত্র-অনাত্মনি-অহম্-ইতি মতিঃ বন্ধঃ', এই অনাত্মায় অর্থাৎ দেহাদিতে 'আমি' জ্ঞান করাই বন্ধন। 'এষঃ-অস্য পুংসঃ প্রাপ্তঃ-অজ্ঞানাৎ-জননমরণক্লেশসংপাতহেতুঃ'। 'এষঃ' মানে এই বন্ধন। 'অজ্ঞানাৎ প্রাপ্তঃ'—অজ্ঞান থেকে পাওয়া। 'পুংসঃ জননমরণক্লেশসংপাতহেতুঃ'—পুরুষের জন্মমরণের দুঃখপ্রাপ্তির হেতু। এই দেহটাতে 'আমি বুদ্ধি' করে দেহসংক্রান্ত সবকিছু নিয়ে মেতে গেছি। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্যে কি না করছি ! যা চাই, পেলে খুব আনন্দ, আবার না পেলেই দুঃখ। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এরা সব আমার, এদের সুখদুঃখের দায়িত্ব আমার, আমি ছাড়া এদের দেখবার কেউ নেই। এই 'আমি-আমার' করে সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। এমনি করে চলতে চলতে একদিন মরে গেলাম। কিন্তু মরতে তো চাইনি; কত বাসনা সব অপূর্ণ রয়ে গেছে, এখনও ভোগ হয়নি, আর দেহটা চলে গেলো ? কাজেই আর একটা দেহ আশ্রয় করে আবার আসতে হয়, অতৃপ্ত বাসনার আর কর্মফলের ভোগের জন্যে। জন্মমৃত্যুর এই চক্র চলছেই। কেন এরকম হয় ? অজ্ঞানের জন্যে, মায়ার জন্যে। মায়া আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। আমার স্বরূপকে আমার কাছ থেকে ঢেকে রেখেছে। তাই এই মিথ্যা দেহটাতে 'আমি বুদ্ধি' করে জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরছি। অশেষ যন্ত্রণা পাচ্ছি। কিন্তু তবু এই দেহকেই সত্য মনে করে একেই 'আমি' বলে ভাবছি। এই ভাবনা থেকেই মানুষ সব সময় দেহের যত্ন করে। তাকে 'পুষ্যতি-উক্ষতি-অবতি বিষয়ৈঃ তন্তুভিঃ কোশকৃৎ-বৎ'; তাকে আদরযত্ন করে রাখে, স্নানটান করিয়ে পরিচ্ছন্ন করে, খাইয়ে-দাইয়ে পালন করে, যতকিছু ভোগ্যবস্তু আছে সেসব দিয়ে তাকে সযত্নে ধরে রাখে। বলছেন, এ যেন গুটিপোকার নিজের লালা দিয়ে তৈরী সুতোর মতো—যা দিয়ে সে গুটি তৈরী করে তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকে। আমরাও নিজের বাসনার সুতো দিয়ে সংসারের গুটি তৈরী করে তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছি। তার মানে অবশ্য এই নয় যে দেহটাকে অবহেলা করতে হবে। দেহের যত্ন তো করতেই হবে, কারণ এই দেহ দিয়েই ভগবান লাভ করতে হবে। কিন্তু দেহসর্বস্ব হয়ে থাকলে চলবে না। একে জীবনধারণের একটা উপায় বলে নিতে হবে, আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক হিসেবে দেহকে ব্যবহার করতে হবে। দেহই আমার সবকিছু এই ভেবে দেহকে পুজো করলে চলবে না।

অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ প্রভবতি বিমূঢ়স্য তমসা
বিবেকাভাবাদ্ বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা।

ততোঽনর্থব্রাতো নিপততি সমাদাতুরধিক-
স্ততো যোঽসদ্গ্রাহঃ স হি ভবতি বন্ধঃ শৃণু সখে॥ ১৩৮

অন্বয় : তমসা (তমোগুণের দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা) বিমূঢ়স্য (অভিভূত ব্যক্তির) অতস্মিন্ (যা যা নয় তাতে) তৎ-বুদ্ধি (সেই বস্তুর জ্ঞান) প্রভবতি (জন্মায়) বিবেক-অভাবাৎ বৈ (বিবেকের অভাবের থেকেই) ভুজগে (সর্পে) রজ্জুধিষণা স্ফুরতি (রজ্জুর ধারণা হয়) ততঃ (তার পর) সমাদাতুঃ (সাপকে রজ্জু বলে ধরে নিয়েছে যে তার) অধিকঃ (অনেক) অনর্থ ব্রাতঃ (বিপদরাশি) নিপততি (এসে পড়ে) ততঃ (অতএব) সখে (সখে) শৃণু (শোন), যঃ (যা) অসদ্ গ্রাহঃ (মিথ্যাবস্তুর গ্রহণ) সঃ হি (তা-ই) বন্ধঃ ভবতি (বন্ধন হয়ে যায়)।

সরলার্থ : অজ্ঞানের অন্ধকারে যে আছে সে, যেটা যা নয় সেটাকে তাই বলে ভুল করে। বিবেকের অভাব হলেই সাপকে দড়ি বলে ভুল হতে পারে। এইরকম ভুল যার হয়েছে, (অর্থাৎ যে সাপকে দড়ি মনে করছে) তার অনেক বিপদ এসে উপস্থিত হয়। শোন সখা, মিথ্যাবস্তুর গ্রহণই বন্ধন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, যা 'অসৎ', অনিত্য, মিথ্যা, সেইসবগুলো আঁকড়ে ধরে থাকার জন্যেই বন্ধন হয়। 'অতস্মিন্-তদ্-বুদ্ধি'—যেটা যা নয়, তাকে তা-ই বলে ভুল করা। এই ভ্রান্তিপ্রসূত জ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান কার হয় ? 'প্রভবতি বিমূঢ়স্য তমসা'—তমোগুণের প্রভাবে অর্থাৎ অজ্ঞানের প্রভাবে যারা বিমূঢ় হয়ে আছে তাদেরই এই ভুল জ্ঞান হয়। 'অসৎ'কে 'সৎ' বলে মনে হয়। অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলে বোধ হয়। মায়ার জন্যে এসব হয়। আমাদের ভুল দেখানোটাই মায়ার কাজ। সে আমাদের কাছে সত্যকে আবরণ করে রাখে আর অসত্যকে সত্য বলে দেখায়। এখানে একটা খুব ভালো উপমা দিচ্ছেন : 'বিবেক-অভাবাৎ বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা'—বিচারবুদ্ধির অভাব হলেই ভুল করে একটা সাপে দড়ির ধারণা হতে পারে। 'ততঃ-অনর্থ ব্রাতঃ নিপততি সমাদাতুঃ-অধিকঃ', তখন যদি দড়ি ভেবে কেউ সেটাকে তুলে নেয়, তাহলে মহা অনর্থ হবে। সাপ তো আর তাকে ছেড়ে দেবে না ছোবল দিয়ে শেষ করেই দেবে। 'ততঃ যঃ অসদ্ গ্রাহঃ সঃ হি ভবতি বন্ধঃ শৃণু সখে'—অতএব, শোন বন্ধু, অসৎ-বস্তু গ্রহণ করলেই তা বন্ধন হয়ে যায়। শিষ্যের সঙ্গে সমপর্যায়ে নেমে এসে আলোচনা করছেন, তাই তাকে 'সখে' বা বন্ধু বলে সম্বোধন করছেন।

অখণ্ডনিত্যাদ্বয়বোধশক্ত্যা
স্ফুরন্তমাত্মানমনন্ত বৈভবম্।
সমাবৃণোত্যাবৃতিশক্তিরেষা
তমোময়ী রাহুরিবার্কবিম্বম্॥ ১৩৯

অন্বয় : এষা তমোময়ী আবৃতিশক্তিঃ (এই তমোগুণপ্রধানা আবরণীশক্তি) অখণ্ড-নিত্য-অদ্বয়-বোধশক্ত্যা (অখণ্ড, নিত্য ও অদ্বয় জ্ঞানশক্তির দ্বারা) স্ফুরন্তম্ (প্রকাশমান) অনন্ত বৈভবম্-আত্মানম্ (অনন্ত ঐশ্বর্যস্বরূপ আত্মাকে) অর্ক বিম্বম্ (সূর্যমণ্ডলকে) রাহুঃ-ইব (রাহু যেমন আবৃত করে সেইরকম) সম্-আবৃণোতি (সম্যক্ রূপে আবৃত করে)।

সরলার্থ : এই তমোময়ী আবরণী শক্তি অখণ্ড নিত্য ও অদ্বয় বোধশক্তির দ্বারা প্রকাশমান অনন্ত ঐশ্বর্যস্বরূপ আত্মাকে, রাহু যেমন সূর্যমণ্ডলকে আবৃত করে, তেমনি সম্যক্ ভাবে আবরণ করে রাখে।

ব্যাখ্যা : বন্ধন যে কি সেটা বলেছেন। এখন বলছেন এই বন্ধন কি করে হলো। শিষ্য জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কথমেষ আগতঃ'—সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। বলছেন, আত্মা সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। 'অখণ্ড-নিত্য-অদ্বয়-বোধশক্ত্যা স্ফুরন্তম্', অখণ্ড নিত্য ও অদ্বয় চিৎ-শক্তি বা বোধশক্তি দ্বারা তিনি প্রকাশিত। 'স্ফুরন্তম্', উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। আর তিনি 'অনন্ত বৈভবম্'; সেই উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত আত্মা, তিনি অনন্ত ঐশ্বর্যস্বরূপ। তিনি সৎ-স্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। তিনি অখণ্ড, তাঁর মধ্যে কোনও বিভাগ নেই, খণ্ড নেই, তিনি নিত্য, অদ্বয়, তাঁর কোনও দ্বিতীয় নেই। সবকিছুর সত্তাস্বরূপ তিনি, সমস্ত বৈভবের সত্তা, তাই তিনি 'অনন্ত বৈভবম্'। এই আমাদের স্বরূপ। সেই স্বরূপকে জানছি না অবিদ্যার জন্যে, মায়ার জন্যে। বলছেন, 'সমাবৃণোতি আবৃতিশক্তিঃ এষা তমোময়ী রাহুঃ-ইব-অর্ক বিম্বম্'; এই তমোময়ী আবৃতিশক্তি তাঁকে সম্পূর্ণভাবে আবরণ করেছে, রাহু যেমন সূর্যমণ্ডলকে ঢেকে ফেলে। মায়ার দুটো শক্তি, আবরণী-শক্তি আর বিক্ষেপীশক্তি। আবরণীশক্তি তমোগুণ প্রধান তাই বলছেন 'তমোময়ী আবৃতিশক্তিঃ'। আমাদের স্বরূপ হচ্ছে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ঐ আত্মা। স্বরূপত আমি তো মুক্তই, আমার বন্ধন আসছে কি করে ? বন্ধন আসছে, কারণ মায়া তার আবরণী-শক্তির দ্বারা আমার স্বরূপকে আবৃত করে রেখেছে, নিজের পরিচয় আমায় জানতে দিচ্ছে না। দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি ইত্যাদির যে আবরণ আত্মার ওপর আরোপিত হয়ে আছে সেগুলোকেই 'আমি' বলে দেখাচ্ছে। যখন পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয়, তখন যেমন চাঁদের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে যায়, মনে হয় সূর্য নেই, তেমনি মায়া আবরণ করেছে বলে আমার স্বরূপ যে আত্মা তাঁর জ্ঞান আমার হচ্ছে না। এই আমাদের বন্ধনের কারণ। ভুবনমোহিনী মায়াই আমাদের বন্ধনের মূলে।

তিরোভূতে স্বাত্মন্যমলতরতেজোবতি পুমা-
ননাত্মানং মোহাদহমিতি শরীরং কলয়তি।
ততঃ কামক্রোধপ্রভৃতিভিরমুং বন্ধনগুণৈঃ
পরং বিক্ষেপাখ্যা রজস উরুশক্তির্ব্যথয়তি॥ ১৪০

অন্বয় : অমলতর-তেজোবতি স্বাত্মনি তিরোভূতে (অতিনির্মল তেজোময় স্বীয় আত্মা তিরোভূত হলে) পুমান্ (পুরুষ) মোহাৎ (মোহের থেকে) অনাত্মানং শরীরং (অনাত্মা শরীরকে) অহম্-ইতি (এ-ই আমি) কলয়তি (মনে করে) ততঃ (তার ফলে) রজসঃ (রজোগুণের) বিক্ষেপাখ্যা উরুশক্তিঃ (বিক্ষেপ নাম্নী বলবতী শক্তি) অমুং (ওই পুরুষকে) কাম-ক্রোধ-প্রভৃতিভিঃ বন্ধনগুণৈঃ (কাম ক্রোধ প্রভৃতি বন্ধন রজ্জুগুলির দ্বারা বেঁধে) পরং ব্যথয়তি (অত্যন্ত ব্যথা দেয়)।

সরলার্থ : অতিনির্মল তেজোময় আত্মস্বরূপ যখন অজ্ঞানের আবরণে তিরোভূত বলে মনে হয়, তখন পুরুষ মোহবশত অনাত্মা দেহকে 'আমি' বলে মনে করে। তার ফলে রজোগুণের বিক্ষেপনাম্নী বলবতী শক্তি ওই পুরুষকে কাম ক্রোধ প্রভৃতি বন্ধনরজ্জুগুলির দ্বারা বন্ধন করে অত্যন্ত দুঃখ দেয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, অজ্ঞানের আবরণে পরম শুদ্ধ তেজস্বরূপ আত্মা যখন ঢাকা পড়ে যান, মানুষ তখন তার বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে এবং যা সে প্রত্যক্ষ করতে পারছে সেই দেহকেই 'আমি' মনে করে দেহের সুখের চিন্তাতেই দিন কাটায়। 'তিরোভূতে স্বাত্মনি-অমলতরতেজোবতি পুমান্-অনাত্মানং মোহাৎ-অহম্-ইতি শরীরং কলয়তি'; অজ্ঞানের আবরণে শুদ্ধ তেজোময় আত্মা ঢাকা পড়ে গেছেন, পুরুষ তখন মোহের বশে এই অনাত্মা দেহকেই 'আমি' বলে মনে করছে। যা অনাত্মা অর্থাৎ অনিত্য, পরিবর্তনশীল তাকে 'আমি' মনে করে জীবন কাটাতে থাকলে কি হয় ? 'ততঃ কামক্রোধপ্রভৃতিভিঃ অমুং বন্ধনগুণৈঃ পরং বিক্ষেপাখ্যা রজস উরুশক্তিঃ ব্যথয়তি'; দেহে 'আমি' জ্ঞান করার ফলে রজোগুণের বিক্ষেপ নামের বলবতী শক্তি সেই পুরুষকে কাম ক্রোধ প্রভৃতি বন্ধনরজ্জুগুলো দিয়ে বেঁধে ফেলে অশেষ যন্ত্রণা দেয়। বাসনার তাগিদে কর্মে উদ্দীপনা আসছে; যত কাজ করছি ততই 'আমি এইসব করছি' ভাবছি আর 'আমি আমার' ভাব বাড়ছে, তার সঙ্গে রজোগুণের প্রাধান্যও বাড়ছে। অস্থির চঞ্চল হয়ে আছি, মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। যা করতে চাই তাতে যদি কেউ বাধা দেয় অমনি ক্রোধ এসে পড়ছে। বলছেন, কাম ক্রোধ লোভ মোহ এইসব বন্ধনের দড়ি। বিক্ষেপশক্তি যেন এই দড়িগুলো দিয়ে সেই পুরুষকে শক্ত করে বেঁধে অপরিসীম কষ্ট দিচ্ছে। আমাদের বন্ধন হচ্ছে অজ্ঞানের জন্য। আর এই অজ্ঞান এসেছে মায়ার আবরণীশক্তি থেকে। তার থেকে আবার বিক্ষেপশক্তির কাজ আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের বন্ধন আরও দৃঢ় হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের সংসারবন্ধনের মূল হলো মায়া।

মহামোহ-গ্রাহগ্রসন-গলিতাত্মাবগমনো
ধিয়ো নানাবস্থাং স্বয়মভিনয়ংস্তদ্গুণতয়া।

অপারে সংসারে বিষয়বিষপুরে জলনিধৌ
নিমজ্জ্যোন্মজ্জ্যায়ং ভ্রমতি কুমতিঃ কুৎসিতগতিঃ।। ১৪১

অন্বয় : অয়ং কুৎসিতগতিঃ কুমতিঃ (এই কদর্যগতি ও মন্দ বিষয়ে মতিসম্পন্ন পুরুষের) মহামোহ-গ্রাহ-গ্রসন-গলিত-আত্ম-অবগমনঃ (মূল অজ্ঞান থেকে আসা মহামোহরূপ কুমীরের গ্রাসে পড়ে আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা নষ্ট হয়ে গেছে বলে) ধিয়ঃ (বুদ্ধির) নানা-অবস্থাঃ (জাগ্রদাদি বিভিন্ন অবস্থাকে) তদ্গুণতয়া (কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধির গুণগুলি নিজের মনে করে) স্বয়ম্-অভিনয়ন্ (নিজে সেসবের অভিনয় করতে করতে) বিষয়বিষপুরে (বিষয়বিষে পূর্ণ) অপারে সংসারে জলনিধৌ (অপার সংসারসমুদ্রে) নিমজ্জ্য-উন্মজ্জ্য (ডুবে ও ভেসে) ভ্রমতি (ভ্রমণ করে)।

সরলার্থ : মূল অজ্ঞান থেকে আসা মহামোহরূপ কুমীরের গ্রাসে পড়ে এই কদর্যগতি মন্দমতি পুরুষের আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই সে বুদ্ধির জাগ্রতাদি অবস্থা ও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি গুণগুলো নিজের মনে করে নিজেই সেইসবের অভিনয় করতে থাকে এবং বিষয়বিষে পূর্ণ অপার সংসারসাগরে কখনো ডোবে কখনো বা ভাসে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, অজ্ঞানের যে দুটো শক্তি আবরণী ও বিক্ষেপী তাদের প্রভাবে মহামোহের সৃষ্টি হয়। 'মোহ' মানে কোনও একটা জিনিস ভালো লাগলে তার প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ ও লোভ, সেটা পাবার তীব্র ইচ্ছেয় বিচারবুদ্ধির লোপ পেয়ে যাওয়া। বলছেন, 'মহামোহ-গ্রাহগ্রসন-গলিত-আত্ম-অবগমনঃ'; 'আত্ম-অবগমনঃ'— আত্মায় গমন, আত্মার সঙ্গে একীভূত হওয়ার চেষ্টা। মহামোহরূপ কুমীরের গ্রাসে পড়ে আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছে বা চেষ্টা 'গলিত' হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। তখন কি হচ্ছে ? 'ধিয়ঃ নানা-অবস্থাঃ স্বয়ম্-অভিনয়ন্-তদ্গুণতয়া'—বুদ্ধির তিনটি অবস্থা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এবং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি গুণগুলো নিজের মনে করে সেই পুরুষ সেগুলোর অভিনয় করতে থাকে। তার ফলে কি হয় ? 'অপারে সংসারে বিষয়বিষপূরে জলনিধৌ নিমজ্জ্য-উন্মজ্জ্য-অয়ং ভ্রমতি কুমতিঃ কুৎসিতগতিঃ'; বিষয়-বিষে পূর্ণ অপার সংসারজলধিতে এই মন্দমতি, কদর্যগতি পুরুষ ডুবে-ভেসে ভ্রমণ করে। হাবু-ডুবু খায়। বলছেন, 'অভিনয়ন্'; অভিনয় বলছেন, কারণ আমি তো স্বরূপত বুদ্ধির থেকে আলাদা। দেহ-মন-বুদ্ধি এসবে 'আমি-জ্ঞান' করেছি বলে বুদ্ধির বৃত্তিগুলোকে আমার বৃত্তি বলে মনে করছি আর সেইমত কাজ করছি। একজন অভিনেতা যখন নানা ভূমিকায় অভিনয় করে তখন সে সেই-সেই ভূমিকার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। আমাদের দেহবুদ্ধি নিয়ে সংসারে চলাটা সেইরকম। বলছেন, 'অপারে সংসারে বিষয়বিষপূরে জলনিধৌ';

এই বিষয়বিষ-পূর্ণ অপার সংসার হাজার হাজার জন্মমৃত্যুর সমষ্টি নিয়ে যেন এক বিশাল জলধি। এর মধ্যে অজ্ঞান-মানুষ ডুবছে আর ভাসছে। ডুবছে মানে মন্দ কর্মের জন্যে তার মন্দ অবস্থায় জন্ম হচ্ছে বা নিম্ন জন্ম হচ্ছে আর ভাসছে মানে সৎকর্মের জন্যে তার ভালো জন্ম হচ্ছে। মোহগ্রস্ত মানুষ এইভাবে জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর আর শেষ হচ্ছে না।

ভানুপ্রভাসংজনিতাভ্রপঙ্‌ক্তি-
র্ভানুং তিরোধায় বিজৃম্ভতে যথা।
আত্মোদিতাহংকৃতিরাত্মতত্ত্বং
তথা তিরোধায় বিজৃম্ভতে স্বয়ম্।। ১৪২

অন্বয় : ভানুপ্রভাসংজনিত-অভ্রপঙ্‌ক্তিঃ (সূর্যের প্রভায় উদ্ভাসিত মেঘের সারি) ভানুং তিরোধায় (সূর্যকে আড়াল করে) যথা বিজৃম্ভতে (যেমন প্রকাশিত হয়) তথা (সেইরকম) আত্ম-উদিত-অহংকৃতিঃ (আত্মা থেকে উত্থিত অহংকার) আত্ম-তত্ত্বং তিরোধায় (আত্মতত্ত্বকে আড়ালে রেখে) স্বয়ং বিজৃম্ভতে (নিজেই প্রকাশ পায়)।

সরলার্থ : সূর্যের প্রভায় উদ্ভাসিত মেঘের সারি যেমন সূর্যকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলে নিজেরাই আকাশ জুড়ে থাকে তেমনি আত্মা থেকে উৎপন্ন অহঙ্কার আত্মতত্ত্বকে আবৃত করে নিজেই প্রকাশ পায়।

ব্যাখ্যা : আমাদের অহংকার বা অহংবুদ্ধি, শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে 'কাঁচা আমি' বলেছেন, সেইটাই আমাদের 'পাকা আমি' অর্থাৎ যে আমি সকলের আমি সেই পরমাত্মাকে আবৃত করে রেখেছে। তাই তাঁকে জানতে পারছি না। কি করে আবৃত করে রাখছে ? এই 'আমি আমার' বোধের দ্বারা আমাদের মন-বুদ্ধি সব মলিনতায় পূর্ণ করেছে তাই সেখানে পরমাত্মার প্রকাশ হতে পারছে না। তিনি যদিও বাক্যমনাতীত কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, তিনি শুদ্ধ মনের, শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। আমার বুদ্ধি শুদ্ধ হলে পরমাত্মা সেখানে জ্বলজ্বল করে প্রকাশ হবেন। 'ভানুপ্রভাসংজনিত-অভ্রপঙ্‌ক্তিঃ ভানুং তিরোধায় বিজৃম্ভতে যথা', সূর্যের প্রভায় মেঘের যে সারি উদ্ভাসিত হয়েছে তারা যেমন সূর্যকেই ঢেকে ফেলেছে, তেমনি 'আত্ম-উদিত-অহংকৃতিঃ আত্মতত্ত্বং তথা তিরোধায় বিজৃম্ভতে স্বয়ম্', আত্মার থেকে যে অহঙ্কারের উদয় হয়েছে সে সেই আত্মাকে আবৃত করে নিজেকেই প্রকাশ করছে। আমার ব্যক্তিসত্তাকে 'আমি' করে এই যে অহংবুদ্ধি নিয়ে আছি সে তো আত্মাকেই আশ্রয় করে আছে, কিন্তু আত্মতত্ত্বকে সে আবৃত করে ফেলেছে। 'আত্মতত্ত্ব' অর্থাৎ তিনিই যে আমার আত্মা, সকলের আত্মা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর সত্তাস্বরূপ, এই জ্ঞান। এই জ্ঞান আমার হতে পারছে না, কারণ আমার মন-বুদ্ধি

সমস্ত ব্যাপ্ত করে 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা' এই বোধ আধিপত্য করছে। আকাশে যখন মেঘ করে থাকে তখন সূর্যকে দেখতে পাই না, শুধু কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে এটাই দেখি। কিন্তু সূর্য না থাকলে ওই মেঘগুলোকেই তো দেখতে পাওয়া যেত না, সূর্য না থাকলে পৃথিবীর কোন কিছুই দেখা যেত না। তেমনি আমরা এই ছোট আমিটাকেই সব মনে করে তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ আত্মা নিত্য আছেন বলেই এই অহংকার আমার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এটাই নিশ্চিতভাবে জানতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ 'অহংকার' কথাটাকে ভেঙে বলতেন : এ 'অহং' কার ? তাঁরই।

কবলিত দিননাথে দুর্দিনে সান্দ্রমেঘৈ-
র্ব্যথয়তি হিমঝঞ্ঝাবায়ুরুগ্রো যথৈতান্।
অবিরত-তমসাত্মন্যাবৃতে মূঢ়বুদ্ধিং
ক্ষপয়তি বহুদুঃখৈস্তীব্রবিক্ষেপশক্তিঃ ॥ ১৪৩

অন্বয় : যথা (যেমন) দুর্দিনে (মেঘাচ্ছন্ন দিনে) সান্দ্র-মেঘৈঃ (গাঢ় মেঘের দ্বারা) কবলিত-দিননাথে (সূর্য আচ্ছাদিত হলে) উগ্র হিমঝঞ্ঝাবায়ুঃ (প্রবল ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া) এতান্ (এই মেঘগুলোকে) ব্যথয়তি (পীড়া দেয়, ইতস্ততঃ তাড়িত করে) [সেইরকম] অবিরত-তমসা (ছেদহীন অজ্ঞান-অন্ধকারের দ্বারা) আত্মনি-আবৃতে (আত্মা আবৃত হলে) তীব্র-বিক্ষেপশক্তিঃ (তীব্র বিক্ষেপশক্তি) মূঢ়বুদ্ধিং (স্থূলবুদ্ধি পুরুষকে) বহুদুঃখৈঃ (বহু দুঃখের দ্বারা) ক্ষপয়তি (পীড়িত করে)।

সরলার্থ : মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্য মেঘে আচ্ছন্ন হলে বরফের মতো ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ায় মেঘগুলো যেমন ইতস্তত ছুটে বেড়ায় তেমনি নিশ্ছিদ্র অজ্ঞানের অন্ধকারে আত্মা আবৃত হলে তীব্র বিক্ষেপশক্তি আত্মার বিষয়ে অজ্ঞ মূঢ় পুরুষকে অশেষ দুঃখ দেয়।

ব্যাখ্যা : তমোগুণের প্রভাবে আত্মা যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে সম্পূর্ণভাবে আবৃত হয়ে থাকেন তখন রজোগুণ তার বিক্ষেপীশক্তি দিয়ে অজ্ঞ মানুষকে খুবই কষ্ট দেয়। বলছেন, 'কবলিতদিননাথে দুর্দিনে সান্দ্রমেঘৈঃ-ব্যথয়তি হিমঝঞ্ঝাবায়ুঃ-উগ্রঃ যথা-এতান্', মেঘলা দিনে সূর্য যখন মেঘে ঢাকা পড়ে থাকে তখন হিমশীতল প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া যেমন 'এতান্' অর্থাৎ ওই মেঘেদের এদিক-ওদিক ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনি 'অবিরততমসা-আত্মনি-আবৃতে', নিশ্ছিদ্র তমোগুণের অজ্ঞান-অন্ধকারে আত্মা আবৃত হলে, 'মূঢ়বুদ্ধিং ক্ষপয়তি'—সেই মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিকে, আত্মা-সম্বন্ধে অজ্ঞ মূঢ় পুরুষকে কে যেন পীড়া দিতে থাকে। কে পীড়া দেয় ? 'বহুদুঃখৈঃ তীব্রবিক্ষেপশক্তিঃ'—মায়ার তীব্র বিক্ষেপশক্তি সেই মূঢ় ব্যক্তিকে একের পর এক বহু দুঃখ দিয়ে পীড়িত করে। বিষয়ে যে-মানুষ আকণ্ঠ ডুবে আছে, আত্মা আছেন কি নেই এই নিয়ে যার

মাথাব্যথাই নেই, রজোগুণের বিক্ষেপশক্তি তাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। তার মনে অজস্র বাসনার সৃষ্টি করে সেই বাসনা পূরণের তাগিদে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তার বিক্ষিপ্ত মন আর নিজের বশে থাকে না। স্বামীজী অবশ্য রজোগুণের প্রয়োজনের কথা বলেছেন দেশের জন্যে। ঘোর তমোয় দেশ ছেয়ে আছে, তাই প্রথমে তিনি রজোগুণ চেয়েছেন সর্বসাধারণের জন্যে, কর্মপ্রবণতা চেয়েছেন। কারণ, তমোগুণের চেয়ে রজোগুণ ভাল। কিন্তু চরমলক্ষ্যের দিক থেকে দেখলে, আত্মজ্ঞান লাভের কথা ভাবলে তমঃ, রজঃ—দুইই বন্ধন। এমনকি, সত্ত্বগুণও।

এতাভ্যামেব শক্তিভ্যাং বন্ধঃ পুংসঃ সমাগতঃ
যাভ্যাং বিমোহিতো দেহং মত্বাত্মানং ভ্রমত্যয়ম্ ॥ ১৪৪

অন্বয় : এতাভ্যাম্ (এই দুটি) শক্তিভ্যাম্ এব (শক্তির দ্বারাই) পুংসঃ (পুরুষের) বন্ধঃ সমাগতঃ (বন্ধন এসেছে) যাভ্যাং (যে দুই শক্তির দ্বারা) বিমোহিতঃ (মোহিত হয়ে) অয়ং (এই পুরুষ) দেহং (দেহকে) আত্মানং মত্বা (আত্মা মনে করে) ভ্রমতি (সংসারে ভ্রমণ করে)।

সরলার্থ : আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুটি শক্তি পুরুষের সংসারবন্ধনের কারণ। এই দুই শক্তির প্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে মানুষ শরীরকে আত্মা বলে মনে করছে আর এই জন্ম-মৃত্যুর সংসারে ভ্রমণ করছে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, আবরণী আর বিক্ষেপী মায়ার এই দুই শক্তি মানুষের সংসারবন্ধনের কারণ। সে এদের প্রভাবে পড়ে মোহগ্রস্ত হয়ে শরীরকেই আত্মা বলে মনে করে। শরীর অনিত্য, নশ্বর, একটা জড়বস্তু। এর ষড়্‌বিকার আছে। একদিন এটা নষ্ট হয়ে যায়। তারপর অপূর্ণ বাসনার ভোগের জন্যে আর যেসব কর্মের ফল ভোগ করা হয়নি, সেই সব কর্মের জন্যে আবার একটা শরীর নিতে হয়, আবার জন্মাতে হয়। আত্মার জন্ম নেই মৃত্যু নেই, কিন্তু দেহের জন্মমৃত্যু আছে। তাই দেহাত্মবুদ্ধি আছে যার সে জন্মমৃত্যুর এই সংসারে বারবার আসবে আর যাবে।

বীজং সংসৃতিভূমিজস্য তু তমো দেহাত্মধীরঙ্কুরো
রাগঃ পল্লবমম্বু কর্ম তু বপুঃ স্কন্ধোঽসবঃ শাখিকাঃ
অগ্রাণীন্দ্রিয়সংহতিশ্চ বিষয়াঃ পুষ্পাণি দুঃখং ফলং
নানাকর্মসমুদ্ভবং বহুবিধং ভোক্তাত্র জীবঃ খগঃ ॥ ১৪৫

অন্বয় : সংসৃতিভূমিজস্য (সংসারবৃক্ষের) বীজং তু তমঃ (বীজ তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞানই) দেহাত্মধীঃ (দেহে আত্মবুদ্ধি) অঙ্কুরঃ (অঙ্কুর) রাগঃ (অনুরাগ) পল্লবম্ (পল্লব) কর্ম

অম্বু (কর্ম জল) বপুঃ স্কন্ধঃ (শরীর গুঁড়ি) অসবঃ শাখিকাঃ (প্রাণ শাখা) ইন্দ্রিয় সংহতি (ইন্দ্রিয়গুলি) অগ্রাণি (এসবের অগ্রভাগ) বিষয়াঃ (শব্দ-স্পর্শাদি সমস্ত বিষয়) পুষ্পাণি (ফুল) নানা কর্ম সমুদ্ভবং বহুবিধং দুঃখং (নানা কর্ম থেকে উদ্ভূত বহুবিধ দুঃখ) ফলম্ (ফল) অত্র (এখানে, এই সংসারবৃক্ষে) ভোক্তা জীবঃ (কর্মফল ভোগকারী জীব) খগঃ (পক্ষী)।

সরলার্থ : এই সংসারবৃক্ষের বীজ অজ্ঞান। দেহে আত্মবুদ্ধি এর অঙ্কুর। বিষয়ে অনুরাগ পল্লবরাজি, সব রকমের কর্ম হচ্ছে জল, শরীর হচ্ছে গাছের গুঁড়ি, প্রাণ শাখাপ্রশাখা, ইন্দ্রিয়গুলো ওই শাখাপ্রশাখার অগ্রভাগ আর সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হচ্ছে এর পুষ্পসম্ভার। আর এই গাছের ফল হচ্ছে নানা কর্ম থেকে উদ্ভূত দুঃখের রাশি। এই সংসারবৃক্ষে পাখীর মতো বাস করছে কর্মফল ভোগকারী জীব।

ব্যাখ্যা : সংসারকে একটা বিরাট মহীরুহের সঙ্গে তুলনা করছেন। বলছেন, 'বীজং সংসৃতি ভূমিজস্য তু তমঃ'; 'ভূমিজ' মানে গাছ। 'তমঃ' অর্থাৎ অজ্ঞানই হচ্ছে সংসারবৃক্ষের বীজ। কারণ অজ্ঞান না থাকলে সংসারই থাকত না। 'দেহাত্মধীঃ অঙ্কুরঃ'; দেহাত্মবুদ্ধি এর অঙ্কুর। কারণ দেহে আত্মবুদ্ধি থেকেই সংসার নিজের রূপটা নিতে থাকে। 'রাগঃ পল্লবঃ'; বিষয়ে অনুরাগ ও নানা রকমের আসক্তি হলো এই বৃক্ষের পাতা। পাতার সাহায্যেই গাছ সূর্যের কিরণ থেকে প্রাণশক্তি সংগ্রহ করে। সংসারও যে চলছে, তা আসক্তি ও বিষয়ে অনুরাগের জন্যে। 'অম্বু কর্ম তু'; কর্মই জল। একটা গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে তাকে জল দিতে হয়। সংসারও চলছে এই সংসারবাসী জীবের সদসদ্ কর্মপ্রবাহে। ভালো কর্মের ফলস্বরূপ সে ভালো জন্ম পাচ্ছে আবার মন্দ কর্মের জন্যে মন্দ জন্ম পাচ্ছে। 'বপুঃ স্কন্ধঃ'; গাছের 'স্কন্ধঃ' বা গুঁড়ি না থাকলে গাছ দাঁড়াতে পারে না, তেমনি জীবের এই ভোগায়তন শরীর না থাকলে সংসার থাকে না। 'অসবঃ শাখিকাঃ'; 'অসবঃ' মানে প্রাণ। এই গাছের শাখাপ্রশাখা হচ্ছে এর প্রাণ। 'ইন্দ্রিয়সংহতিঃ চ অগ্রাণি'; ইন্দ্রিয়রা এইসব শাখাপ্রশাখার 'অগ্রাণি' অর্থাৎ অগ্রভাগ। শাখাপ্রশাখার ডগাগুলোর সাহায্যেই বাইরের জগতের সঙ্গে গাছের সংযোগ। 'বিষয়াঃ পুষ্পাণি'; বিষয়গুলি এই গাছের পুষ্প সম্ভার। ফুলের সমারোহ যেমন গাছকে সাজায় তেমনি রূপরসাদি বিষয়ের সংস্পর্শের জন্যে সংসারের আপাত মনোমুগ্ধকর চেহারা। 'নানা কর্ম সমুদ্ভবং বহুবিধং দুঃখং ফলম্'। আর এই সংসারবৃক্ষের ফল হলো সদসদ্ কর্ম থেকে উদ্ভূত বহুবিধ দুঃখ। সবই দুঃখজনক বলছেন কেন ? সংসারে কি সুখলাভ কখনই হয় না ? নিশ্চয় হয়। কিন্তু সব তো অনিত্য, তাই সে সুখ থাকে না , সুখ হারালেই আবার দুঃখ। আর দুঃখের রজনীই তো সবচেয়ে দীর্ঘ, তাই সংসারে দুঃখটাই প্রধান বলে মনে হয়। 'অত্র ভোক্তা জীবঃ খগঃ'—জীব হচ্ছে এই সংসারবৃক্ষের ফলভোগী পাখী, যে ওই গাছে বাস করে।

অজ্ঞানমূলোঽয়মনাত্মবন্ধো
নৈসর্গিকোঽনাদিরনন্ত ঈরিতঃ।
জন্মাপ্যয়ব্যাধিজরাদি দুঃখ-
প্রবাহপাতং জনয়ত্যমুষ্য॥ ১৪৬

অন্বয় : অয়ম্ অনাত্মবন্ধঃ (এই অনাত্ম বস্তুতে বন্ধন) অজ্ঞানমূলঃ (অজ্ঞান মূলক) নৈসর্গিকঃ (স্বাভাবিক) অনাদিঃ-অনন্তঃ (আদিহীন অন্তহীন) [বলে] ঈরিতঃ (কথিত হয়) অমুষ্য (এর, এই জীবের) জন্ম-অপ্যয়-ব্যাধি-জরাদি-দুঃখ-প্রবাহপাতং (জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি-জরা প্রভৃতি দুঃখপ্রবাহে পতন) জনয়তি (ঘটায়)।

সরলার্থ : অনাত্মবস্তু দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিই সংসারবন্ধনের কারণ। এর মূল অজ্ঞান। অজ্ঞানের কোনও কারণ নির্দেশ করা যায় না। এ আদি-অন্ত হীন, এই রকমই বলা হয়। জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি-জরা প্রভৃতি দুঃখের প্রবাহে জীবের যে পড়ে থাকা সেটা এই অজ্ঞানই করায়।

ব্যাখ্যা : অজ্ঞান সম্বন্ধে বলছেন, 'নৈসর্গিকঃ-অনাদিঃ-অনন্তঃ-ঈরিতঃ', বলা হয় এ একটা স্বাভাবিক জিনিস, আদি-অন্ত হীন। অজ্ঞান অনাদি—এটা ঠিকই, কারণ অজ্ঞান কোথা থেকে এসেছে, কবে এর শুরু, এ কেউ বলতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে অজ্ঞানের নাশ হয়, কাজেই এর অন্ত আছে। এখানে অনন্ত বলছেন, কারণ যার দেহে আত্মবুদ্ধি আছে তার পক্ষে এ অনন্ত। তারপর এই অজ্ঞান আরও কি করে ? 'জন্ম-অপ্যয়-ব্যাধি-জরাদি-দুঃখ-প্রবাহ-পাতং জনয়তি অমুষ্য'; জীব যে জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি-জরা ইত্যাদি দুঃখের প্রবাহের মধ্যে পড়ে থাকে, এটা ঘটায় অজ্ঞান। অজ্ঞানের প্রভাবে জড়বস্তু দেহতে 'আমি বুদ্ধি' করেছি, কাজেই দেহের যে ষড়্বিকার, জন্ম, মৃত্যু, জরা ইত্যাদি, তার দুঃখ আমাকে ভোগ করতে হবেই। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে দেহ-ইন্দ্রিয় ইত্যাদি যে আমার প্রকৃত সত্তা নয় এইটা বুঝতে হবে।

নাস্ত্রৈর্ন শস্ত্রৈরনিলেন বহ্নিনা
ছেত্তুং ন শক্যো ন চ কর্মকোটিভিঃ।
বিবেকবিজ্ঞানমহাসিনা বিনা
ধাতুঃ প্রসাদেন সিতেন মঞ্জুনা॥ ১৪৭

অন্বয় : [এই বন্ধন] অস্ত্রৈঃ শস্ত্রৈঃ অনিলেন বহ্নিনা (অস্ত্র-শস্ত্র-বায়ু-অগ্নি এসবের দ্বারা) ছেত্তুং ন শক্যঃ (ছেদন করা সম্ভব নয়) চ কর্মকোটিভিঃ ন (কোটি কোটি শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত কর্মের দ্বারাও নয়) ধাতুঃ প্রসাদেন (ধাতার অর্থাৎ জীবের নিয়ন্তার প্রসন্নতা ও আত্মাভিমুখিতারূপ) সিতেন মঞ্জুনা (তীক্ষ্ণ শোভন) বিবেক-বিজ্ঞান-মহা-

অসিনা বিনা (আত্মানাত্মবিচার থেকে উদ্ভূত ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদজ্ঞানরূপ খড়গ ব্যতীত) [এই বন্ধনের নাশ সম্ভব নয়।]

সরলার্থ : এই বন্ধন অস্ত্র-শস্ত্র-বায়ু-অগ্নি কিছুর দ্বারাই ছেদন করা সম্ভব নয়। শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত কোটি কোটি কর্মের দ্বারাও নয়। জীবের নিয়ন্তার প্রসন্নতা এবং তীক্ষ্ণ ও শোভন আত্মানাত্ম বিচার থেকে উদ্ভূত ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মবোধরূপ খড়গ বিনা এই বন্ধন ছিন্ন হয় না।

ব্যাখ্যা : এখানে শিষ্যের 'কথং বিমোক্ষঃ', এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। বলছেন, অস্ত্র-শস্ত্র, বায়ু বা অগ্নি দিয়ে এই বন্ধন ছিন্ন করা যায় না। শাস্ত্র ও স্মৃতি বিহিত কোটি কোটি কর্মের দ্বারাও নয়। আমরা তো স্বরূপত মুক্ত। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা আমাদের স্বরূপ। আমাদের আবার বন্ধন কি করে হলো ? অজ্ঞানের জন্যে এই বন্ধন। অজ্ঞান মানে জ্ঞানের অভাব, তাই জ্ঞান হলে তবেই এ যাবে, আর কিছু দিয়ে এই বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব নয়। আমি ভাবছি 'আমি বদ্ধ' তাই আমি বদ্ধ। এই ভাবনাটাকে তো আর অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে ছিন্ন করা সম্ভব নয় বা বায়ুর দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া অথবা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া ! তাই বলছেন, 'বিবেকবিজ্ঞান-মহা অসিনা বিনা ধাতুঃ প্রসাদেন সিতেন মঞ্জুনা'; তীক্ষ্ণ ও শোভন বিবেকবিজ্ঞানরূপ মহা খড়গ বিনা আর পরমেশ্বরের প্রসন্নতা ছাড়া এই অজ্ঞানজনিত বন্ধন ছিন্ন করা যায় না। 'বিবেকবিজ্ঞান' মানে কি ? 'বিবেকঃ' হচ্ছে বিচার, আত্মানাত্ম বস্তু বিচার। আর সেই বিচারের ফলস্বরূপ যে আত্মজ্ঞান লাভ, তা-ই হচ্ছে 'বিবেকবিজ্ঞান'। 'নেতি, নেতি' করে বিচার করতে হবে, 'এটা নয়, এটা নয়' করে সব অনাত্মবস্তু বর্জন করে একমাত্র নিত্যবস্তু আত্মাতে গিয়ে পৌঁছতে হবে। তখন অখণ্ডবোধস্বরূপ এই আত্মাই ব্রহ্ম এই জ্ঞান হবে। এই জ্ঞানকে তীক্ষ্ণ ও সুন্দর মহা-অসির সঙ্গে তুলনা করছেন। বলছেন, শুধু এই মহা খড়গ, এই আত্মজ্ঞানই অজ্ঞানকে বিনষ্ট করতে পারে। 'ন চ কর্মকোটিভিঃ'—কোটি কোটি কর্মের দ্বারাও এই অজ্ঞানকে বিনষ্ট করা যায় না।

শ্রুতিপ্রমাণৈকমতেঃ স্বধর্মনিষ্ঠা
তয়ৈবাত্মবিশুদ্ধিরস্য।
বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ পরমাত্মবেদনং
তেনৈব সংসারসমূলনাশঃ॥ ১৪৮

অন্বয় : শ্রুতিপ্রমাণ-একমতেঃ (বেদের প্রামাণ্যের সঙ্গে যে একমত তার) স্বধর্মনিষ্ঠা (স্বধর্মে নিষ্ঠা, নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানে নিষ্ঠা [হয়]) তয়া-এব (তার দ্বারাই) অস্য (এই পুরুষের) আত্মবিশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি [হয়]) বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ (যার বুদ্ধি শুদ্ধ তার)

পরমাত্মবেদনং (ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার একত্বের জ্ঞান [হয়]) তেন এব (এর দ্বারাই) সংসারসমূলনাশঃ (মূল অজ্ঞানের সঙ্গে সংসারের নিবৃত্তি [হয়])।

সরলার্থ : বেদের প্রামাণ্যের সঙ্গে একমত যার, যার স্বধর্মনিষ্ঠা আছে ও যে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করে, তার চিত্তশুদ্ধি হয়। বুদ্ধি শুদ্ধ হলে আত্মজ্ঞান হয়। আত্মজ্ঞান হলে মূল অজ্ঞানের সঙ্গে সংসার চিরতরে বিলীন হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বলা হয়েছে, কোটি কর্মেও অজ্ঞানজনিত বন্ধন ছেদ করা যাবে না। পাছে লোকে ভুল বোঝে যে, কর্ম বর্জন করতে হবে, তাই এই শ্লোকে স্বধর্মনিষ্ঠার কথা বলছেন। শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্যে যেসব কর্ম নির্দিষ্ট আছে তা-ই স্বধর্ম। সেইসব কর্তব্য কাজ নিষ্ঠা সহকারে করতে হবে—নিষ্কামভাবে। নিষ্কামকর্ম আত্মজ্ঞানের একটা উপায়। গীতাতে এই নিষ্কাম কর্মের জয়গান করা হয়েছে। এই শ্লোকে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি জিনিসের দরকার বলছেন। 'শ্রুতি-প্রমাণ-একমতেঃ স্বধর্মনিষ্ঠা'—শ্রুতির প্রামাণিকতায় ঐকমত্য বা বিশ্বাস আর স্বধর্মনিষ্ঠা অর্থাৎ নিষ্কামভাবে নিজের কর্তব্য করা। এই দুটি থাকলে কি হবে ? 'তয়া এব আত্মবিশুদ্ধিঃ'—এর দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হবে, মনের সব মলিনতা দূর হয়ে যাবে। আর 'বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ পরমাত্মবেদনং'—যাঁর বুদ্ধি এরকম শুদ্ধ হয়ে গেছে, তিনিই পরমাত্মাকে জানতে পারেন। ব্রহ্ম আর আত্মার একত্বজ্ঞান তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়। আর এই জ্ঞানের দ্বারা সংসার সমূলে বিনষ্ট হয়—'তেনৈব সংসার-সমূলনাশঃ'। সংসারের মূল তো অজ্ঞান। আর 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম—এই জ্ঞানই জ্ঞান। জ্ঞান হলেই অজ্ঞান চলে যাবে, আলো এলে যেমন অন্ধকার আপনিই চলে যায়। আর অজ্ঞান না থাকলে সংসারও নেই। তাই বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান হলে, 'তেন-এব সংসারসমূলনাশঃ'—সংসার সমূলে ধ্বংস হয়। জন্মমৃত্যুর চক্রে মানুষকে আর আসতে হয় না, মুক্তিলাভ হয়।

কোশৈরন্নময়াদ্যৈঃ পঞ্চভিরাত্মা ন সংবৃতো ভাতি।
নিজশক্তিসমুৎপন্নৈঃ শৈবালপটলৈরিবাম্বু বাপীস্থম্॥ ১৪৯

অন্বয় : নিজশক্তি-সমুৎপন্নৈঃ (নিজশক্তির দ্বারা উৎপন্ন) শৈবালপটলৈঃ (শৈবাল-সমূহের দ্বারা) বাপীস্থম্ (জলাশয়স্থিত) অম্বু ইব (জলের মতো) অন্নময়াদ্যৈঃ (অন্নময় প্রভৃতি) পঞ্চভিঃ কোশৈঃ (পাঁচটি কোশের দ্বারা) সংবৃতঃ (আবরিত) আত্মা ন ভাতি (আত্মা প্রকাশ পান না)।

সরলার্থ : পুষ্করিণীর জল থেকেই উৎপন্ন শেওলা ইত্যাদির দ্বারা আবৃত হয়ে সেই জল যেমন দেখতে পাওয়া যায় না তেমনি আত্মার অবিদ্যাশক্তি থেকে উৎপন্ন অন্নময়াদি পঞ্চকোশের দ্বারা আবৃত থাকার জন্যে আত্মার প্রকাশ হয় না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, দেহ-মন-বুদ্ধি, এসবের প্রকাশ আমরা বুঝতে পারি কিন্তু আত্মা তো তেমন করে প্রকাশ হন না; কেন হন না ? কারণ পর পর পাঁচটি কোশ আত্মাকে ঢেকে রেখেছে। কুঠুরির মধ্যে কুঠুরি, এইরকম পর পর পাঁচটি কোশ আছে, অন্নময়কোশ, প্রাণময়কোশ, মনোময়কোশ, বিজ্ঞানময়কোশ, আনন্দময়কোশ, তার মধ্যে আত্মা আছেন, তাই তাঁকে দেখতে পাই না। বলছেন, 'কোশৈঃ-অন্নময়াদ্যৈঃ পঞ্চভিঃ-আত্মা ন সংবৃতঃ ভাতি'; অন্নময় ইত্যাদি পাঁচটি কোশের দ্বারা আবৃত, তাই আত্মা প্রকাশ হচ্ছেন না। 'নিজশক্তিসমুৎপন্নৈঃ শৈবালপটলৈঃ-ইব-অম্বু বাপীস্থম্'; একটা জলাশয়ের জল যেমন একের পর এক শেওলার স্তর সৃষ্টি করে সেই শেওলায় ঢাকা পড়ে যায়, এও তেমনি। আত্মার ওপরের এই যে কোশগুলো, বলছেন, এগুলো 'নিজশক্তি সমুৎপন্নৈঃ', নিজের শক্তিতেই উৎপন্ন হয়েছে। কি সে শক্তি ? আত্মার অবিদ্যাশক্তি। অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে পড়ে এই সংসারে জন্মাচ্ছি, এই সংসারের হাসি-কান্নায় কিছুদিন ছোটাছুটি করছি তারপর কিছু অপূর্ণ বাসনা আর কর্ম নিয়ে মরে যাচ্ছি, আবার জন্মাচ্ছি। মায়া আমাদের এমনি করে ঘোরাচ্ছে। তাই বলছেন, 'নিজশক্তি-সমুৎপন্নৈঃ কোশৈঃ-অন্নময়াদ্যৈঃ পঞ্চভিঃ'; 'নিজের শক্তি' মানে আত্মার অনির্বচনীয় মায়াশক্তি। সেই মায়াশক্তির দ্বারা পাঁচটি কোশের সৃষ্টি হয়েছে। অন্নময়কোশ হচ্ছে অন্নের দ্বারা পুষ্ট স্থূলদেহ, প্রাণময়কোশ হচ্ছে পঞ্চপ্রাণ, মনোময়কোশ হচ্ছে মন, বিজ্ঞানময়কোশ হচ্ছে বুদ্ধি আর আনন্দময়কোশ হচ্ছে আত্মার সবথেকে কাছের কোশ, তাই আত্মার আনন্দের স্পর্শে সে আনন্দময়। এই পাঁচটি কোশ আত্মাকে আবরণ করে জীবের শরীর তৈরী করেছে। যতক্ষণ এই শরীরে আত্মবুদ্ধি করছি ততক্ষণ এরা আত্মার আবরণ। একবার যদি এদের ওপর থেকে 'আমি' বুদ্ধি তুলে নিতে পারি, এদের থেকে আমি আলাদা, আমি স্বয়ং আত্মা, এই বোধ যদি একবার হয় তাহলে আত্মার এই আবরণ সব খসে যাবে, তিনি স্বমহিমায় প্রকাশ হবেন। যেমন শেওলায় ঢাকা জলের উপর থেকে শেওলার আস্তরণগুলো সরিয়ে দিলেই দেখা যায় কাকচক্ষু জল টলটল করছে, এও ঠিক তেমনি।

তচ্ছৈবালাপনয়ে সম্যক্ সলিলং প্রতীয়তে শুদ্ধম্।
তৃষ্ণাসন্তাপহরং সদ্যঃ সৌখ্যপ্রদং পরং পুংসঃ॥ ১৫০

অন্বয় : তৎ-শৈবাল-অপনয়ে (সেই শেওলার অপসারণ হলে) তৃষ্ণাসন্তাপহরং (তৃষ্ণার কষ্ট দূরকারী) সদ্যঃ সৌখ্যপ্রদং (পানমাত্র তৃপ্তিদায়ক) সম্যক্ শুদ্ধম্ সলিলং (অত্যন্ত নির্মল জল) পুংসঃ পরং প্রতীয়তে (পুরুষের আনন্দবর্ধন করে দৃষ্টিগোচর হয়)।

সরলার্থ : সেই শেওলার অপসারণ হলে তৃষ্ণা-দুঃখ অপহারক পানমাত্র তৃপ্তিদায়ক শুদ্ধ নির্মল জল পুরুষের আনন্দ উদ্রেক করে দৃষ্টিগোচর হয়।

ব্যাখ্যা : জলাশয়ের জলের ওপর শেওলা পড়েছিল বলে জল দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। শেওলাটা সরিয়ে দিতেই পরিষ্কার শুদ্ধ জল টলটল করছে দেখতে পাচ্ছি। সেই জল পান করলে সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তি। তেমনি পঞ্চকোশের আবরণ যদি আত্মার ওপর থেকে দূর করা যায়, আনন্দস্বরূপ আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হবেন, সেই আনন্দরস পান করে আমাদের সব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হবে।

পঞ্চানামপি কোশানামপবাদে বিভাত্যয়ং শুদ্ধঃ।
নিত্যানন্দৈকরসঃ প্রত্যগ্রূপঃ পরঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ॥ ১৫১

অন্বয় : পঞ্চানাম্-অপি কোশানাম্ (পাঁচটি কোশেরই) অপবাদে (বিবেকবুদ্ধির দ্বারা এগুলি অনাত্মবস্তু বলে স্থির ধারণা করলে) শুদ্ধঃ নিত্যানন্দ একরসঃ (নির্মল সদানন্দরূপ একরসস্বরূপ) প্রত্যক্-রূপঃ (প্রত্যেকের সত্তাস্বরূপ) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) স্বয়ংজ্যোতিঃ (জ্যোতিস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ) অয়ং (এই আত্মা) বিভাতি (দীপ্যমান হন)।

সরলার্থ : যখন বিবেক-বিচারের দ্বারা পাঁচটি কোশের কোনটাই আত্মা নয় বলে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় তখন শুদ্ধ, সদানন্দরূপ, একরসস্বরূপ, প্রত্যেকের অন্তরে সাক্ষিরূপে বর্তমান, শ্রেষ্ঠ, স্বয়ংজ্যোতি আত্মা স্বমহিমায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ হন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'পঞ্চানাম্-অপি কোশানাম্-অপবাদে'। 'অপবাদে' অর্থাৎ আত্মার স্বভাবযুক্ত নয় এই বিচারের ফলে। পাঁচটি কোশের কোনটিই আত্মার স্বভাবযুক্ত নয়,' এই বিচারের ফলে এগুলি যে অনাত্মবস্তু সে-সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবে। এই প্রত্যয় জন্মালে 'বিভাতি-অয়ং শুদ্ধং নিত্যানন্দ-একরসঃ প্রত্যগ্রূপঃ পরঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ',— এই শুদ্ধ, নিত্যানন্দ, একরস আত্মা, যিনি প্রত্যেকের আত্মস্বরূপ, সর্বশ্রেষ্ঠ, স্বয়ংজ্যোতি, তিনি নিজের প্রভায় 'বিভাতি', দীপ্যমান হন। বলছেন, এই আত্মা 'নিত্যানন্দ একরসঃ'; তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ তাই তিনি নিত্যানন্দ। তিনি 'একরসঃ' মানে তিনি রসস্বরূপ; সেই নিবিড় রসে কোথাও একটু ফাঁক নেই। তিনি 'স্বয়ংজ্যোতিঃ', নিজের জ্যোতিতেই প্রকাশমান, তাঁকে প্রকাশ করার জন্যে বাইরের কোনও আলোর দরকার হয় না। তিনি নিজের তেজে স্বয়ং দীপ্যমান। পঞ্চকোশ তাঁর থেকে আলাদা। তরোয়ালের যেমন খাপ থাকে, এই পাঁচটি কোশ যেন একেকটা খাপ। একটা খাপের মধ্যে আরেকটা খাপ রয়েছে। সবচেয়ে ভেতরের খাপটি আনন্দময় কোশ—সেই খাপের মধ্যে আত্মা লুকিয়ে আছেন। এই খাপগুলি একটা একটা করে অনাত্মা বলে বর্জন করতে পারলে আত্মা নিজের তেজে জ্বলজ্বল করে প্রকাশ হন।

আত্মানাত্মবিবেকঃ কর্তব্যো বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা।
তেনৈবানন্দী ভবতি স্বং বিজ্ঞায় সচ্চিদানন্দম্॥ ১৫২

অন্বয় : বিদুষা (বিচারশীল ব্যক্তির দ্বারা) বন্ধমুক্তয়ে (বন্ধনমুক্তির জন্যে) আত্মা-অনাত্ম বিবেকঃ (আত্মা কি, অনাত্মা কি, এই বিচার) কর্তব্যঃ (করণীয়) তেন এব (তার দ্বারাই অর্থাৎ এই বিচারের দ্বারাই) স্বং (নিজেকে) সৎ-চিৎ-আনন্দম্ (সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম) বিজ্ঞায় (জেনে) [সেই বিচারশীল ব্যক্তি] আনন্দী ভবতি (আনন্দরূপ হয়ে যান)।

সরলার্থ : বিচারশীল ব্যক্তি বন্ধন থেকে মুক্তির জন্যে আত্মা কি, অনাত্মা কি, এই বিচার করবেন। এই বিচারের দ্বারাই তিনি নিজেকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলে জেনে আনন্দস্বরূপ হয়ে যান।

ব্যাখ্যা : বন্ধনমুক্তির একটাই উপায়। সেটা হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ। তার জন্যে কি করতে হবে ? 'আত্মানাত্মবিবেকঃ কর্তব্যো বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা'; বুদ্ধিমান, বিচারশীল ব্যক্তি 'আত্মা কি, অনাত্মা কি' এই বিচারের সাহায্যে বন্ধন মুক্তির জন্যে চেষ্টা করবেন। এটাই কর্তব্য। 'তেন-এব-আনন্দী ভবতি স্বং বিজ্ঞায় সচ্চিদানন্দম্'; এই বিচারের দ্বারাই নিজেকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলে জেনে তিনি আনন্দস্বরূপ হয়ে অবস্থান করেন। 'আত্মানাত্মবিবেকঃ' মানে কোন্‌টা 'অনাত্মা' অর্থাৎ 'অসৎ' আর কোন্‌টা সৎস্বরূপ আত্মা, এই বিচার। 'নেতি নেতি' বিচার করে তিনি সব অসৎ বস্তু বর্জন করেন এবং একমাত্র সৎ বস্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে অনুভব করে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে অবস্থান করতে থাকেন। এই বিদ্বান ব্যক্তি সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই হয়ে গেছেন, তাই বলছেন 'আনন্দী ভবতি'। তাঁর আর বন্ধন থাকে না। কারণ যতক্ষণ মানুষ নিজের স্বরূপকে ভুলে থাকে, ততক্ষণ তার অজ্ঞান থাকে, ততক্ষণই তার বন্ধন। এখন স্বরূপজ্ঞান হয়েছে তাই আর বন্ধন নেই।

মুঞ্জাদিষীকামিব দৃশ্যবর্গাৎ
প্রত্যঞ্চমাত্মানমসঙ্গমক্রিয়ম্।
বিবিচ্য তত্র প্রবিলাপ্য সর্বং
তদাত্মনা তিষ্ঠতি যঃ স মুক্তঃ॥ ১৫৩

অন্বয় : মুঞ্জাৎ (মুঞ্জাঘাস থেকে) ইষীকাম্-ইব (ওপরের আবরণগুলো ফেলে দিয়ে ভেতরের ডাঁটার মতো জিনিসটা যেমন বের করতে হয় তেমনি) দৃশ্যবর্গাৎ (সমস্ত দৃশ্যবস্তু থেকে) প্রত্যঞ্চম্-অসঙ্গম্-অক্রিয়ম্ আত্মানং (দ্রষ্টা, নির্লিপ্ত, অক্রিয় আত্মাকে) বিবিচ্য (বিচার করে আলাদা বলে জেনে) তত্র (সেই শুদ্ধ আত্মায়) সর্বং প্রবিলাপ্য (সবকিছু বিলীন করে দিয়ে) যঃ (যিনি) তদাত্মনা (সেই আত্মার সঙ্গে এক হয়ে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করেন) সঃ মুক্তঃ (তিনি মুক্তপুরুষ)।

সরলার্থ : মুঞ্জাতৃণের ভেতরের ডাঁটাটি বের করার জন্যে তার ওপরের আবরণগুলো যেভাবে ফেলে দিতে হয় সেইভাবে দৃশ্য অনাত্মবস্তুগুলোর থেকে বিচার করে দ্রষ্টা, নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় আত্মাকে আলাদা বলে জেনে, সেই শুদ্ধ আত্মায় সমস্ত অনাত্মবস্তু বিলীন করে দিয়ে আত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে যিনি অবস্থান করেন তিনিই মুক্তপুরুষ।

ব্যাখ্যা : 'নেতি নেতি' করে বিচার করে সব অনাত্মবস্তু বর্জন করে একমাত্র নিত্যবস্তু আত্মায় আশ্রয় নিতে হবে, এটা আগে বলেছেন। কিন্তু সেটা কিভাবে করা যাবে, সেইটা এখানে বলছেন। বলছেন ঃ মুঞ্জা ঘাস দেখেছ তো ? তার ভেতরে খুব সূক্ষ্ম একটা ডাঁটার মতো জিনিস থাকে, সেটাকে বের করতে গেলে তার বাইরের খোলসের মতো অংশগুলো খুব সাবধানে আলাদা করে ফেলে দিতে হয়। এই বিচারও সেইরকম। 'মুঞ্জাৎ-ইষীকাম্-ইব দৃশ্যবর্গাৎ প্রত্যঞ্চম্-আত্মানম্-অসঙ্গম্-অক্রিয়ম্ বিবিচ্য', মুঞ্জাঘাসের থেকে ডাঁটার মতো জিনিসটা বের করার মতো সমস্ত দৃশ্যবস্তু থেকে দ্রষ্টা, নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় আত্মাকে বিচার করে আলাদা বলে জেনে, 'তত্র প্রবিলাপ্য সর্বং তদাত্মনা তিষ্ঠতি যঃ সঃ মুক্তঃ', সেই আত্মায় সবকিছু বিলীন করে দিয়ে যিনি সেই আত্মার সঙ্গে এক হয়ে অবস্থান করেন তিনি মুক্তপুরুষ। এই শ্লোকের সঙ্গে কঠোপনিষদের একটি মন্ত্রের খুব সাদৃশ্য।—'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ-অন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ তং স্বাৎ-শরীরাৎ প্রবৃহেৎ-মুঞ্জাৎ-ইব-ইষীকাং ধৈর্যেণ' (ক, ২।৩।১৭); অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অন্তরাত্মারূপে সর্বদা সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। খুব ধৈর্যের সঙ্গে মুঞ্জাতৃণ থেকে ডাঁটা বের করার মতো তাঁকে নিজের শরীর থেকে আলাদা করবে। এখানে শরীর থেকে তাঁকে আলাদা করার কথা বলা হচ্ছে আর শঙ্করাচার্য বলছেন সমস্ত দৃশ্যবস্তু থেকে আলাদা করতে। প্রকারান্তরে একই কথা। আত্মাই একমাত্র 'দৃক্' বা দ্রষ্টা, বাকী সবই দৃশ্য। আমার শরীর, জীব-জগৎ সবকিছুই তার মধ্যে পড়ে। আর আমাদের তো দৃশ্যবস্তুর সঙ্গে সংযোগ এই শরীরের সাহায্যেই। তাঁকে যদি শরীর থেকে আলাদা করে দেখতে পারি তাহলে সমস্ত দৃশ্যবস্তুর থেকেও তিনি যে আলাদা সেটাও জানতে পারব। সমস্ত অনিত্যবস্তুর থেকে স্বতন্ত্র তিনিই একমাত্র নিত্যবস্তু, এই বোধ হলে অনিত্যবস্তুগুলো আপনিই তাঁর মধ্যে হারিয়ে যায়। তাই বলছেন, 'প্রবিলাপ্য সর্বং'—সবকিছু তাঁর মধ্যে বিলীন করে দিয়ে ব্রহ্ম হয়ে বসে থাক। যে এটা করতে পারে সেই মুক্ত।

দেহোঽয়মন্নভবনোঽন্নময়স্তু কোশ-
শ্চান্নেন জীবতি বিনশ্যতি তদ্বিহীনঃ।
ত্বক্‌চর্মমাংসরুধিরাস্থিপুরীষরাশি-
র্নায়ং স্বয়ং ভবিতুমর্হতি নিত্যশুদ্ধঃ॥ ১৫৪

অন্বয় : অন্নভবনঃ (অন্ন থেকে উৎপন্ন) অয়ং দেহঃ তু (এই দেহই) অন্নময়ঃ কোশঃ (অন্নময়কোশ) অন্নেন চ জীবতি (অন্নের দ্বারাই বেঁচে থাকে) তৎ-বিহীনঃ (তা ছাড়া অর্থাৎ অন্ন ছাড়া) বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয়) ত্বক্-চর্ম-মাংস-রুধির-অস্থি-পুরীষ-রাশিঃ (ত্বক্-চর্ম-মাংস-রুধির-অস্থি-বিষ্ঠার সমষ্টি) অয়ং (এই অন্নময়কোশ) নিত্যশুদ্ধঃ স্বয়ং (নিত্যশুদ্ধ আত্মা) ভবিতুম্ ন অর্হতি (হবার যোগ্য নয়)।

সরলার্থ : অন্ন থেকেই এই দেহের উৎপত্তি। [কারণ মাতাপিতার শরীর থেকেই এই শরীর উৎপন্ন হয়েছে, তাঁদের শরীর অন্নের দ্বারাই পুষ্টিলাভ করেছে।] এই শরীরই অন্নময়কোশ। এ অন্নের দ্বারাই বেঁচে থাকে, অন্ন না পেলে মরে যায়। ত্বক্-চর্ম-মাংস-রুধির-অস্থি-বিষ্ঠার সমষ্টি এই অন্নময়কোশ কখনই নিত্যশুদ্ধ আত্মা হতে পারে না।

ব্যাখ্যা : আগে বলেছেন, আত্মা ও অনাত্মার বিচার করে অনাত্মবস্তু বর্জন করতে হবে। আরও বলেছেন যে এই বিচার খুব সাবধানে করতে হয়। মুঞ্জাঘাসের মধ্যেকার সরু শীষ বা ডাঁটাটাকে যেমন খুব সাবধানে ধৈর্যের সঙ্গে ঘাসের মধ্যে থেকে আলাদা করে বের করে আনতে হয়, তেমনি সাবধানে বিচার করে আত্মাকে অনাত্মবস্তু থেকে পৃথক করে জানতে হয়। সেই বিচার এখন করছেন। যে পঞ্চকোশের কথা বলা হলো তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে অন্নময়কোশ। এটা প্রথম, কারণ কুঠুরির মধ্যে কুঠুরির মতো যে পাঁচটি কোশ আছে তার প্রথম কুঠুরিটি বা একদম বাইরেরটি অন্নময়কোশ অর্থাৎ এই স্থূলদেহ। একে অন্নময়কোশ বলা হচ্ছে, কারণ অন্নই এর উৎপত্তির কারণ। মা-বাবার অন্নপুষ্ট শরীর থেকে এই শরীর উৎপন্ন হয়েছে। অন্ন গ্রহণ করেই এ বেঁচে থাকে, অন্ন না পেলে মরে যায়। আমরা বুদ্ধিহীন বলে এই দেহটাকে 'আমি' ভাবি আর এর সুখদুঃখকে আমার মনে করে সংসারকে জড়িয়ে ধরি। কিন্তু এ দেহটা কি ? 'ত্বক্-চর্ম-মাংস-রুধির-অস্থি-পুরীষ রাশিঃ'; ত্বক্, মাংস পুরীষ ইত্যাদির রাশি এই দেহ, 'ন অয়ং স্বয়ং ভবিতুম্-অর্হতি নিত্যশুদ্ধঃ' এ নিত্যশুদ্ধ আত্মা হবার যোগ্য কি করে হবে ? এ নিত্যও নয় শুদ্ধও নয়। কাজেই অন্নময়কোশ আত্মা নয়।

পূর্বং জনেরধিমৃতেরপি নায়মস্তি
জাতক্ষণঃ ক্ষণগুণোঽনিয়তস্বভাবঃ।
নৈকো জড়শ্চ ঘটবৎপরিদৃশ্যমানঃ
স্বাত্মা কথং ভবতি ভাববিকারবেত্তা।। ১৫৫

অন্বয় : অয়ং (এই দেহ বা অন্নময়কোশ) জনেঃ পূর্বং (জন্মের পূর্বে) মৃতেঃ অধি অপি (এবং মৃত্যুর পরেও) ন অস্তি (বর্তমান থাকে না) জাতক্ষণঃ (ক্ষণিক অস্তিত্ব, জন্মমৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টুকুর জন্যে বর্তমান) ক্ষণগুণঃ (অল্পদিনের জন্যে রমণীয়) অনিয়ত-

স্বভাবঃ (প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল) ন একঃ (সর্বদা একরূপ নয়) চ জড়ঃ (এবং জড়) ঘটবৎ পরিদৃশ্যমানঃ (ঘটের মতো কিছুকালের জন্যে দৃশ্যমান, নামরূপাত্মক) [এই দেহ] ভাববিকারবেত্তা (দেহাদির পরিণামের দ্রষ্টা) স্ব-আত্মা (নিজের আত্মা) কথং ভবতি (কি করে হয়) ?

সরলার্থ : এই দেহ বা অন্নময়কোশ জন্মের পূর্বে ছিল না, মৃত্যুর পরেও থাকে না। জন্মমৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে এর অস্তিত্ব। অল্প কিছুদিনের জন্যে সুন্দর রমণীয় থাকে। এ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে, সর্বদা একরূপ নয় ও জড়বস্তু। ঘটের মতো কিছুকালের জন্যে নামরূপের সাহায্যে একে দেখতে পাওয়া যায়। এ দেহাদির পরিবর্তন ও পরিণামের দ্রষ্টা নিজের আত্মা কি করে হয় ?

ব্যাখ্যা : কি কি কারণে দেহ আত্মা নয় সেই কথা বলছেন। প্রথমে বলছেন, 'জাতক্ষণঃ' বলে এই দেহ আত্মা নয়। এই দেহ জন্মের আগে থাকে না মৃত্যুর পরেও থাকে না, শুধু জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টুকুর জন্যে এর অবস্থান। কালের পরিপ্রেক্ষিতে এ তো একটা ক্ষণিক অস্তিত্ব; তাই বলছেন এ 'জাতক্ষণঃ'। তারপর বলছেন, 'ক্ষণগুণঃ' বলে এই দেহ আত্মা নয়। ক্ষণকালের জন্যে দেহের মধ্যে নানা গুণের প্রকাশ হয়। যেমন, সৌন্দর্য, কর্মতৎপরতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি। কিন্তু দেহের সঙ্গে সঙ্গেই এই গুণগুলোর নাশ হয়। দেহ অনিত্য, এই গুণগুলোও অনিত্য। আবার আমাদের শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য এইসব অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আর প্রতি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেহের পরিবর্তন হয়। তাই বলছেন, এই দেহ 'অনিয়তস্বভাবঃ' অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। 'ন একঃ'—এ একরকম থাকে না, পালটে পালটে যায়। এ একটা জড়বস্তু, তাই এর ষড়্‌বিকার আছে। 'ঘটবৎ পরিদৃশ্যমানঃ' অর্থাৎ নামরূপাত্মক। একটা ঘটকে যেমন তার আকার দেখে আর 'এটা একটা ঘট' এই নাম দিয়ে জানি ও চিনি, এই দেহও তেমনি নামরূপাত্মক। আত্মাকে দেহের সব রকম বিকার ও পরিণামের বেত্তা বা দ্রষ্টা বলা হয়। দেহ নিজে তার নিজের পরিবর্তন ও পরিণামের দ্রষ্টা হতে পারে না। তাই বলছেন, 'স্ব-আত্মা কথং ভবতি ভাববিকারবেত্তা', এই দেহ কি করে ভাববিকারের বেত্তা আমার নিজের আত্মা হয় ? দেহ আত্মা হতে পারে না।

পাণিপাদাদিমান্ দেহো নাত্মা ব্যঙ্গেঽপি জীবনাৎ।
তত্তচ্ছক্তেরনাশাচ্চ ন নিয়ম্যো নিয়ামকঃ।। ১৫৬

অন্বয় : বি-অঙ্গে অপি (অঙ্গহীন হলেও) জীবনাৎ (জীবন থাকার থেকে [বোঝা যায়] পাণিপাদাদিমান্ দেহঃ (হস্তপদাদিযুক্ত দেহ) আত্মা ন (আত্মা নয়) [কোন কোন অঙ্গনাশ হলে] তৎ-তৎ-শক্তেঃ (সেই সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তির) অনাশাৎ (নাশ হয় না বলে)

[এই আত্মা] নিয়ম্যঃ ন (কোন নিয়মাধীন নন) [কিন্তু] নিয়ামকঃ (দেহাদির নিয়ন্তা)।

সরলার্থ : কোন অঙ্গবিশেষের নাশ হলেও মানুষ জীবিত থাকে বলে, আর অঙ্গনাশের সঙ্গে সেই অঙ্গের শক্তি নষ্ট হয় না বলে, হস্তপদাদি যুক্ত দেহ আত্মা হতে পারে না। আত্মা কোনও নিয়মাধীন নন, তিনি দেহাদির নিয়ামক।

ব্যাখ্যা : হাত-পা নিয়ে আমাদের দেহ কিন্তু সেইসব অঙ্গের কোনও একটা চলে গেলেও আমাদের জীবন ঠিকই থাকে। এ থেকেও বোঝা যায় যে দেহ আত্মা নয়। বলছেন, 'পাণিপাদাদিমান্ দেহঃ ন আত্মা বি-অঙ্গে-অপি জীবনাৎ'; হাত-পা যুক্ত দেহ আত্মা নয়, কারণ অঙ্গহীন হলেও জীবন থাকে আর যে-যে অঙ্গের নাশ হয়েছে, সেই-সেই অঙ্গের শক্তির নাশ হয় না বলে—'তৎ-তৎ-শক্তেঃ-অনাশাৎ।' পা কাটা গেলেও পায়ের যে চলার শক্তি তার নাশ হয় না, বা হাত কাটা গেলেও হাতের যেসব কাজ করার শক্তি থাকে তার নাশ হয় না। এটা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে যার পা নেই সে কৃত্রিম পা তৈরী করিয়ে সেই পা দিয়ে চলতে পারে, কৃত্রিম হাত দিয়ে কাজ করতে পারে। চলার বা হাত দিয়ে কাজ করার শক্তি যদি চলে যেত তাহলে মেকি হাত-পা দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব হতো না। এ থেকে বোঝা যায় যে এই হাত-পা যুক্ত দেহ আত্মা নয়, কারণ আত্মা 'ন নিয়ম্য নিয়ামকঃ'। আত্মা নিয়মাধীন নন, তিনি নিয়ামক। দেহাদি একটা নিয়মে চলে। তাদের কতকগুলো ধর্ম আছে, তারা সেই অনুযায়ী চলে। সেই নিয়মগুলোর, সেই ধর্মগুলোর নিয়ামক বা নিয়ন্তা আত্মা। আত্মা চালাচ্ছেন বলে দেহ চলছে, তাই দেহ কখনও আত্মা হতে পারে না।

দেহ-তদ্ধর্ম-তৎকর্ম-তদবস্থাদিসাক্ষিণঃ।
সত এব স্বতঃসিদ্ধং তদ্বৈলক্ষণ্যমাত্মনঃ॥ ১৫৭

অন্বয় : দেহ-তদ্ধর্ম-তৎকর্ম-তৎ-অবস্থাদি-সাক্ষিণঃ (দেহ এবং দেহের ধর্ম-কর্ম-অবস্থাদির সাক্ষী) সতঃ আত্মনঃ (সৎস্বরূপ আত্মার) তৎ-বৈলক্ষণ্যম্ (দেহের থেকে পার্থক্য) স্বতঃসিদ্ধম্ এব (নিজের থেকেই প্রমাণিত)।

সরলার্থ : দেহ এবং দেহের ধর্ম-কর্ম-অবস্থাদির সাক্ষী সৎস্বরূপ আত্মার দেহাদির থেকে পার্থক্য নিজের থেকেই প্রমাণিত।

ব্যাখ্যা: দেহ ও দেহ সংক্রান্ত যা কিছু, আত্মা সেসবের সাক্ষিস্বরূপ হয়ে আছেন। যে, যে-বস্তুর সাক্ষী, সে সেই-বস্তু হবে কি করে ? কাজেই আত্মা দেহের থেকে আলাদা। 'দেহ-তৎ-ধর্ম-তৎকর্ম-তৎ-অবস্থাদি সাক্ষিণঃ সতঃ আত্মনঃ এব'; দেহ ও তার ধর্ম-কর্ম-অবস্থা ইত্যাদির সাক্ষিস্বরূপ হয়ে আত্মা বিরাজ করছেন। সেই সৎস্বরূপ আত্মার

'তৎ-বৈলক্ষণ্যম্ স্বতঃসিদ্ধং', দেহের থেকে ভিন্নতা এমনই স্পষ্ট যে তা আর প্রমাণের দরকার করে না। দেহের ধর্ম হচ্ছে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি। দেহের কর্ম হচ্ছে, গমন, অবস্থান, শয়ন, ভোজন ইত্যাদি। দেহের অবস্থা বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি। চৈতন্য-স্বরূপ, বোধস্বরূপ, সৎস্বরূপ আত্মা দেহের এইসব ব্যাপারের সাক্ষিরূপে আছেন, কাজেই তিনি দেহের থেকে আলাদা। বলছেন, 'তৎ-বৈলক্ষণ্যম্ স্বতঃসিদ্ধং', আত্মা যে দেহ নয়, দেহের থেকে আলাদা, এটা স্বতঃপ্রমাণিত।

শল্যরাশির্মাংসলিপ্তো মলপূর্ণোঽতিকশ্মলঃ।
কথং ভবেদয়ং বেত্তা স্বয়মেতদ্বিলক্ষণঃ॥ ১৫৮

অন্বয় : শল্যরাশিঃ (অস্থির সমাবেশে গঠিত) মাংসলিপ্তঃ (মাংসের দ্বারা আবৃত) মলপূর্ণ (মলপূর্ণ) অতি কশ্মলঃ (অত্যন্ত মলিন, বিশ্রী ময়লাযুক্ত) অয়ম্ (এই দেহ) এতৎ বিলক্ষণঃ (এর থেকে পৃথক) স্বয়ং বেত্তা (কোনও প্রমাণের ওপর নির্ভরতা ছাড়া স্বভাবেই বেত্তা বা জ্ঞাতা আত্মা) কথং ভবেৎ (কি করে হতে পারে) ?

সরলার্থ : অস্থির দ্বারা গঠিত, মাংসলিপ্ত, মলপূর্ণ, বিশ্রী ময়লাযুক্ত এই দেহ । এ কি করে দেহ থেকে ভিন্ন স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ আত্মা হতে পারে ?

ব্যাখ্যা : এতক্ষণ আত্মার স্বভাব নির্দেশ করে বলছিলেন, আত্মার তো এইরকম স্বভাব এ কি করে দেহ হবে ? এখন বলছেন, দেহ তো এইরকম, এ কি করে আত্মা হবে ? বলছেন, এই শরীরটা হচ্ছে 'শল্যরাশিঃ-মাংসলিপ্তো মলপূর্ণঃ-অতি কশ্মলঃ'—হাড়ের রাশি, মাংস মাখানো, মলে ভর্তি, অতি নোংরা। 'কথং ভবেৎ-অয়ং বেত্তা স্বয়ম্-এতদ্ বিলক্ষণঃ'—এ কি করে সেই সবকিছুর জ্ঞাতা, স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ ও দেহের থেকে আলাদা আত্মা হবে ? তা হতে পারে না। আত্মা 'স্বয়ং বেত্তা', জ্ঞানস্বরূপ। সমস্ত জ্ঞানের আকর তিনি, জ্ঞানই তাঁর স্বভাব। তিনি যা জানছেন তা নিজেই জানছেন, এর জন্যে তাঁকে বাইরের কোনও প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয় না। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, আর এই দেহ একটা জড় পদার্থ, কাজেই দেহ আত্মা নয়। আমরা দেহের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলেছি, তাই আত্মাকে চিনতে পারি না। দেহাত্মবুদ্ধি যাতে শিথিল হয় তাই জন্যে এতো করে বলছেন।

ত্বঙ্ মাংসমেদোঽস্থিপুরীষরাশা-
বহংমতিং মূঢ়জনঃ করোতি।
বিলক্ষণং বেত্তি বিচারশীলো
নিজস্বরূপং পরমার্থভূতম্॥ ১৫৯

অন্বয় : মূঢ়জনঃ (অজ্ঞ ব্যক্তি) ত্বক্-মাংস-মেদঃ-অস্থি-পুরীষরাশৌ (ত্বক্-মাংস-মেদ-অস্থি-বিষ্ঠার দ্বারা পূর্ণ শরীরে) অহংমতিং (আমি জ্ঞান) করোতি (করে) বিচারশীলঃ (বিচারশীল ব্যক্তি) নিজস্বরূপং (নিজের স্বরূপকে) পরমার্থভূতং (পরমার্থস্বরূপ) বিলক্ষণং (অন্য সবকিছুর থেকে আলাদা) বেত্তি (জানেন)।

সরলার্থ : মোহগ্রস্ত অজ্ঞ ব্যক্তি ত্বক্-মাংস-চর্বি-অস্থি-বিষ্ঠায় পূর্ণ শরীরটাতে 'আমি জ্ঞান' করে। কিন্তু বিচারশীল ব্যক্তি নিজের স্বরূপকে অন্য সবকিছুর থেকে আলাদা পরমার্থরূপে জানেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, এইসব মেদ-মাংস-পুরীষ ভর্তি শরীরটাকে যে 'আমি' ভাবে সে অত্যন্ত বুদ্ধিহীন। যার বিচার করার মতো বুদ্ধি আছে সে জানে তার স্বরূপ এসবের থেকে আলাদা, তিনিই পরমার্থ, তাঁকে জানতে পারাই পরমজ্ঞান লাভ করা। 'ত্বক-মাংস-মেদঃ-অস্থি-পুরীষ-রাশৌ-অহং মতিং মূঢ়জনঃ করোতি'; ত্বক্ -মাংস-মেদ-অস্থি-পুরীষ-রাশিতে 'আমি বুদ্ধি' বুদ্ধিহীন ব্যক্তি করে। 'বিলক্ষণং বেত্তি বিচারশীলঃ নিজস্বরূপং পরমার্থ ভূতম্'; যে বিচারশীল সে জানে তার নিজের স্বরূপ এ সবের থেকে আলাদা। 'পরমার্থ ভূতম্' অর্থাৎ যা শ্রেষ্ঠ 'অর্থ' বা লাভের বিষয়, তা হলো এই নিজ স্বরূপের জ্ঞান। কাজেই এই স্থূল শরীরে 'আমি' বুদ্ধি ত্যাগ করে নিজের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করাই একমাত্র কর্তব্য।

দেহোঽহমিত্যেব জড়স্য বুদ্ধি-
র্দেহে চ জীবে চ বিদুষস্ত্বহংধীঃ।
বিবেকবিজ্ঞানবতো মহাত্মনো
ব্রহ্মাহমিত্যেব মতিঃ সদাত্মনি॥ ১৬০

অন্বয় : জড়স্য এব (জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরই) অহম্ দেহঃ (আমি দেহ) ইতি বুদ্ধিঃ (এইরকম বুদ্ধি হয়) তু বিদুষঃ (কিন্তু বিদ্বানের) দেহে জীবে চ (দেহে এবং জীবাত্মায়) অহংধীঃ (অহং বুদ্ধি হয়) বিবেকবিজ্ঞানবতঃ (বিচারের দ্বারা বিশেষরূপে জ্ঞানবান) মহাত্মনঃ (মহাত্মার) সদা (সর্বদা) আত্মনি (শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মায়) অহম্ ব্রহ্ম-এব (আমি ব্রহ্মই) ইতি মতিঃ (এই ধারণা হয়)।

সরলার্থ : জড়বুদ্ধি যার সে-ই দেহকে 'আমি' বলে মনে করে। যিনি বিদ্বান, শাস্ত্রপাঠ করে যিনি আত্মার কথা জেনেছেন, তিনি কখনও দেহকে 'আমি' মনে করেন আবার কখনও প্রাণ-মন-বুদ্ধি যুক্ত যে ব্যক্তিসত্তা তাকেই 'আমি' মনে করেন। আর যিনি আত্মা-অনাত্মার বিচার করে অনাত্মবস্তু বর্জন করে আত্মাই একমাত্র সত্যবস্তু এই

বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন, সেই মহাত্মার সর্বদা নিজের মধ্যে 'আমি ব্রহ্মই' এই ধারণা হয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, দেহই 'আমি' এই বুদ্ধি কার হয় ? যে জড়ের মতো তার। 'দেহঃ অহম্-ইতি এব জড়স্য বুদ্ধিঃ'। এইরকম লোক সংসারে দেখতে পাওয়া যায় যার অনুভূতিগুলো অত্যন্ত স্থূল। কোনও সূক্ষ্ম জিনিসের ধারণা সে করতে পারে না। দেহের সুখের বাইরে অন্য কিছু সে ভাবতে পারে না। এইরকম মানুষকেই জড়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। দেহটাকেই সে 'আমি' মনে করে। 'দেহে চ জীবে চ বিদুষঃ-তু-অহংধীঃ', কিন্তু যে বিদ্বান সে দেহে 'আমি' বুদ্ধি করে, আবার জীবরূপে তার যে ব্যক্তিসত্তা তাকেও 'আমি' ভাবে। এখানে বিদ্বান বলতে বোঝাচ্ছেন, যে শাস্ত্র পড়ে আত্মার কথা জেনেছে, কিন্তু আত্মজ্ঞান হয়নি। মন-বুদ্ধির সাহায্যে দেহের অতিরিক্ত একটা সত্তা আছে বলে হয়তো বুঝেছে, তাই সে মনে করে এই ব্যক্তিসত্তাটাই চৈতন্যময় আত্মা। আবার যখন হাত-পা এইসব ব্যবহার করে তখন দেহটাকেই বিশেষভাবে অনুভব করে বলে একেই 'আমি' বলে মনে করে। কিন্তু, 'বিবেক বিজ্ঞানবতঃ মহাত্মনঃ ব্রহ্ম-অহম্-ইতি-এব মতিঃ সদাত্মনি'। যিনি আত্মা ও অনাত্মার ঠিক ঠিক বিচার করে অনাত্মবস্তু বর্জন করে শুদ্ধ আত্মাকেই একমাত্র নিত্যবস্তু বলে জেনেছেন, তিনি 'আমি' বলতে অন্যরকম বোঝেন। তাঁর বোঝাটাই ঠিক বোঝা। তিনি নিজেকে 'ব্রহ্ম' বলে বোঝেন। বলছেন : সেই জ্ঞানী মহাত্মার সর্বদা নিজের মধ্যে 'আমি ব্রহ্ম' এই অনুভূতি হয়। এখানে বিচারের ওপর জোর দিচ্ছেন। বিচার করে অনাত্মবস্তু বর্জন করতে না পারলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : ব্রহ্ম বাক্যমনাতীত, কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। তাই বিচারের দ্বারা সমস্ত অনাত্মবস্তুকে যদি বর্জন করা যায়, তাহলেই শুদ্ধবুদ্ধিতে 'ব্রহ্ম-অহম্-ইতি-এব মতিঃ'—'আমিই ব্রহ্ম' এই ধারণা হওয়া সম্ভব।

অত্রাত্মবুদ্ধিং ত্যজ মূঢ়বুদ্ধে
ত্বঙ্-মাংস-মেদোঽস্থি-পুরীষরাশৌ।
সর্বাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে
কুরুষ্ব শান্তিং পরমাং ভজস্ব॥ ১৬১

অন্বয় : মূঢ়বুদ্ধে (ওরে নির্বোধ) অত্র ত্বক্-মাংস-মেদঃ-অস্থি-পুরীষরাশৌ (এই ত্বক্-মাংস-মেদ-অস্থি ও পুরীষের রাশিতে) আত্মবুদ্ধিং ত্যজ ('আমি' বুদ্ধি ত্যাগ কর) সর্বাত্মনি নির্বিকল্পে ব্রহ্মণি (সকলের আত্মস্বরূপ নির্বিকল্প ব্রহ্মে) [আত্মবুদ্ধি] কুরুষ্ব (কর) পরমাং শান্তিং ভজস্ব (পরম শান্তি অনুভব কর)।

সরলার্থ : ওরে নির্বোধ, এই ত্বক্-মাংস-মেদ-অস্থি ও পুরীষের রাশিতে 'আমি বুদ্ধি' ত্যাগ কর। সকলের আত্মা, নির্বিকল্প ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি কর, পরম শান্তি অনুভব কর।

ব্যাখ্যা : দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করার কথাই আবার বলছেন। যারা দেহটাকেই 'আমি' মনে করে সংসারের সুখদুঃখে নিমজ্জিত হয়ে আছে তাদের বলছেন ঃ ওরে নির্বোধ, এই ত্বক্-মাংস-মেদ-অস্থি-পুরীষ রাশিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর। 'সর্বাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে কুরুষ্ব'; সকলের আত্মা যিনি সেই নির্বিকল্প ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি কর ও 'শান্তিং পরমাং ভজস্ব', পরম শান্তি অনুভব কর। ব্রহ্মজ্ঞান হলে পরম শান্তি কেন হয় ? কারণ আমি আর দুই দেখছি না, সব এক। দুই দেখলেই চাঞ্চল্য, বিক্ষেপ। দুই নেই—আমার কিছু হারাবার নেই, পাবারও নেই। তাই নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো চিত্তের অবস্থা। সব তরঙ্গ থেমে গেছে, শান্ত অবস্থা। তাই বলছেন, 'শান্তিং পরমাং ভজস্ব'।

দেহেন্দ্রিয়াদাবসতি ভ্রমোদিতাং
বিদ্বানহংতাং ন জহাতি যাবৎ।
তাবন্ন তস্যাস্তি বিমুক্তিবার্তাহ-
প্যস্ত্বেষ বেদান্তনয়ান্তদর্শী॥ ১৬২

অন্বয় : বিদ্বান্ (বিদ্বান ব্যক্তি) অসতি দেহ-ইন্দ্রিয়াদৌ (মিথ্যা দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে) ভ্রমোদিতাং (ভ্রম থেকে উদিত) অহংতাং ('আমি' জ্ঞানকে) যাবৎ (যতক্ষণ) ন জহাতি (ত্যাগ না করছে) তাবৎ (ততক্ষণ) তস্য (তার) বিমুক্তিবার্তা ন (মুক্তির বার্তা আসে না) অপি (যদিও) এষঃ (এই ব্যক্তি) বেদান্ত-নয়ান্তদর্শী (বেদান্তে ও নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত) অস্তু (হয়)।

সরলার্থ : কোন বিদ্বান ব্যক্তি বেদান্তদর্শন ও নীতিশাস্ত্রে যত বড় পণ্ডিত হোক না কেন যতক্ষণ না অনিত্য দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে ভ্রান্তিজনিত 'আমি আমার'-বোধ ত্যাগ করছে ততক্ষণ তার কাছে মুক্তির বার্তা পৌঁছবে না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, বেদান্ত, নীতিশাস্ত্র এসব পড়ে বিদ্বান হতে পার কিন্তু যতক্ষণ তোমার দেহাত্মবুদ্ধি আছে ততক্ষণ মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কারণ এই যে সংসারবন্ধন এটা এসেছে দেহ ইত্যাদিতে 'আমি' বুদ্ধি করার জন্যে। দেহে 'আমি' বুদ্ধি আর দেহকেন্দ্রিক সবকিছুকে 'আমার' বলে মনে করা এই দুটোই দড়ির মতো আমায় সংসারচক্রে বেঁধে রেখেছে। আমি বেদান্ত ও নীতিশাস্ত্রের পণ্ডিত হতে পারি, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতাও হয়তো দিতে পারি, কিন্তু এই অনিত্য দেহে আত্মবুদ্ধি না গেলে সংসারবন্ধন যায় না। যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা তিনিই আমার স্বরূপ, এই অপরোক্ষ অনুভূতি ছাড়া মুক্তি হয় না।

ছায়াশরীরে প্রতিবিম্বগাত্রে
যৎ স্বপ্নদেহে হৃদি কল্পিতাঙ্গে।
যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচিজ্-
জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্তু॥ ১৬৩

অন্বয় : যথা (যেমন) ছায়াশরীরে (নিজের ছায়ায়) প্রতিবিম্বগাত্রে (জলে বা দর্পণে দেখা প্রতিবিম্বে) যৎ স্বপ্নদেহে (যেমন স্বপ্নে দেখা শরীরে) হৃদি কল্পিতাঙ্গে (হৃদয়ের মধ্যে কল্পিত শরীরে) যথা তব (যেমন তোমার) কাচিৎ (কোন রকমেরই) আত্মবুদ্ধিঃ ('আমি' জ্ঞান) ন অস্তি (থাকে না) জীবৎ-শরীরে চ (জীবিত শরীরেও) তথা এব (সেই রকমই) মা অস্তু (না থাকুক)।

সরলার্থ : নিজের ছায়ায়, জলে বা দর্পণে পড়া শরীরের প্রতিবিম্বে, স্বপ্নে দেখা শরীরে বা মনের কল্পিত দেহে যেমন তোমার কখনও 'আমি' জ্ঞান হয় না, তেমনি জীবিত শরীরকেও তোমার যেন কখনও 'আমি' বলে বোধ না হয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'ছায়া-শরীরে প্রতিবিম্বগাত্রে', নিজের ছায়ায়, জলে বা দর্পণে শরীরের যে প্রতিবিম্ব পড়েছে তাতে; 'স্বপ্নদেহে হৃদি কল্পিতাঙ্গে', স্বপ্নে দেখা শরীরে বা মনের কল্পনার শরীরে; 'যথা আত্মবুদ্ধিঃ-তব নাস্তি', যেমন তোমার আত্মবুদ্ধি থাকে না; 'কাচিৎ-জীবৎ-শরীরে চ তথা-এব মাস্তু', তেমনি জীবিত শরীরেও তোমার কোনও 'আমি' জ্ঞান না থাকুক। নিজের ছায়া, প্রতিবিম্ব বা স্বপ্নে যে শরীর দেখি সেগুলিকে আমরা কখনও নিজের সঙ্গে এক করে ফেলি না। কারণ এরা যে আমার জীবিত শরীরটার থেকে আলাদা সেটা আমরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝি, এর জন্যে কোন যুক্তিতর্কের আবশ্যক হয় না। বলছেন, তোমার এই জীবিত শরীরটা যে আত্মার থেকে আলাদা সেটাও এইভাবে স্বতঃসিদ্ধের মতো বোঝ। খুব সহজে এটা আমরা বুঝতে পারি না। তার কারণ, আত্মা আমার হৃদয়গুহায় লুকিয়ে আছেন, কিন্তু এই দেহটা তো একদম হাতের কাছের জিনিস—একে দেখতে পাচ্ছি এর গায়ে আঘাত লাগলে ব্যথা অনুভব করছি, তাই এর থেকে চট করে আমরা আলাদা হয়ে যেতে পারি না। তাই এত বিচারের দরকার হয়। বিচার করে বুঝতে হয় যে আত্মার স্বভাবের সঙ্গে দেহের স্বভাব একেবারে মেলে না। দেহ ও আত্মা, দুটো বিপরীতধর্মী বস্তু। আমি আমার স্বরূপ জানতে চাই, যা নিত্যবস্তু তাতেই আমি স্থিতি লাভ করব, এই অনিত্য দেহে 'আমি' বুদ্ধি বর্জন করব—এই দৃঢ় সঙ্কল্প করে চেষ্টা করলে তবে দেহে আমিত্ব বুদ্ধি যেতে পারে।

দেহাত্মধীরেব নৃণামসদ্ধিয়াং
জন্মাদিদুঃখপ্রভবস্য বীজম্।

যতস্ততস্ত্বং জহি তাং প্রযত্নাৎ
ত্যক্তে তু চিত্তে ন পুনর্ভবাশা॥ ১৬৪

অন্বয় : যতঃ (যেহেতু) দেহাত্মধীঃ এব (দেহে আত্মবুদ্ধিই) অসৎ-ধিয়াং নৃণাম্ (অশুদ্ধ বুদ্ধির সব মানুষের) জন্মাদি-দুঃখ-প্রভবস্য (জন্মমরণাদি দুঃখের উৎপত্তির) বীজম্ (কারণ) ততঃ (সেই কারণে) ত্বং (তুমি) তাং (দেহে আত্মবুদ্ধিকে) প্রযত্নাৎ (যত্নের সঙ্গে) জহি (ত্যাগ কর) তু (অবশ্যই) চিত্তে ত্যক্তে (চিত্তে উৎপন্ন দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ হলে) পুনঃ (পুনরায়) ভব-আশা ন (জন্মাদির সম্ভাবনা থাকে না)।

সরলার্থ : যেহেতু শরীরে 'আত্মবুদ্ধি'ই অশুদ্ধবুদ্ধি মানুষের জন্মমরণের কারণ সেহেতু তুমি এই দেহাত্মবুদ্ধি খুব যত্নের সঙ্গে ত্যাগ কর। মনের ভ্রান্তিবশতঃ উৎপন্ন এই দেহাত্মবুদ্ধির ত্যাগ হলে অবশ্যই আর জন্মমরণের সম্ভাবনা থাকে না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'দেহাত্মধীঃ-এব নৃণাম্-অসৎ-ধিয়াং জন্মাদিদুঃখ প্রভবস্য বীজম্'; 'অসৎ-ধিয়াং' মানে অসৎ-বস্তু দিয়ে আবৃত বুদ্ধি যাদের, অবিদ্যার প্রভাবযুক্ত বুদ্ধি যাদের; বলছেন, দেহাত্মবুদ্ধিই অশুদ্ধ বুদ্ধির মানুষের জন্মমরণাদি দুঃখের কারণ। 'যতঃ-ততঃ-ত্বং জহি তাং প্রযত্নাৎ', এই যখন কারণ তখন তুমি খুব যত্ন করে একে ত্যাগ কর। 'ত্যক্তে তু চিত্তে ন পুনঃ-ভব-আশা', মনে এর ত্যাগ হলে কখনই আর জন্মমৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না। 'ত্যক্তে তু চিত্তে', মনে ত্যাগ হলে; আমি মনে করছি এই দেহটাই 'আমি', তাই আমার দেহাত্মবুদ্ধি; এটা মনেরই সৃষ্টি, কাজেই মন থেকে এই ধারণাটা তাড়িয়ে দিতে হবে। খুব শক্ত। কারণ আমাদের সবকিছুই তো এই দেহকে ঘিরে। চলছি, ফিরছি, খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি সব এই দেহ দিয়েই করছি। তাই এটা একটা চাপানো জিনিস, এটা 'আমি' নই—এই ধারণাটা মনের মধ্যে গড়ে তোলা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু প্রতিনিয়ত যদি চিন্তা করতে পারি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পরমাত্মাই আমার স্বরূপ আর প্রতিটি কাজের মধ্যে যদি মনে রাখি, চৈতন্যস্বরূপ তিনি আছেন বলেই দেহ-মন-বুদ্ধি সব কাজ করে যাচ্ছে, তাহলে দেহের ওপর অত্যন্ত টানটা শিথিল হয়ে আসবে, ধীরে ধীরে দেহাত্মবুদ্ধি চলে যেতে থাকবে। এইটাই উপায়।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরঞ্চিতোঽয়ং
প্রাণো ভবেৎ প্রাণময়স্তু কোশঃ।
যেনাত্মবানন্নময়োঽনুপূর্ণঃ
প্রবর্ততেঽসৌ সকলক্রিয়াসু॥ ১৬৫

অন্বয় : পঞ্চভিঃ কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে) অঞ্চিতঃ (সংযুক্ত) অয়ং প্রাণঃ তু (এই প্রাণই) প্রাণময়ঃ কোশঃ ভবেৎ (প্রাণময়কোশ হয়েছে) যেন (যে প্রাণময়কোশের দ্বারা) অনুপূর্ণঃ (ভেতর থেকে পূর্ণ) আত্মবান্ (চেতনাযুক্ত) অসৌ অন্নময়ঃ (ওই অন্নময়কোশ) সকলক্রিয়াসু (সকল কর্মে) প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত হয়)।

সরলার্থ : পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত এই প্রাণই প্রাণময়কোশ হয়েছে। এই প্রাণময়কোশের দ্বারা ভেতর থেকে পূর্ণ ও চেতনাযুক্ত হয়েই ওই অন্নময়কোশ সব কাজে প্রবৃত্ত হয়।

ব্যাখ্যা : অন্নময়কোশের কথা বলা হয়ে গেছে, এবার প্রাণময়কোশের কথা বলছেন। 'কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিঃ-অঞ্চিতঃ-অয়ং প্রাণঃ ভবেৎ প্রাণময়ঃ তু কোশঃ'; পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা সঞ্চারিত এই প্রাণই প্রাণময়কোশ হয়েছে। প্রাণবায়ু আমাদের শরীরের সর্বত্র চলাচল করে বলে আমরা জীবিত আছি। কোনও একটা অঙ্গে যদি প্রাণ না পৌঁছয় তাহলে সেই অঙ্গ অকেজো হয়ে যায়। প্রাণকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার কাজ আমাদের পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের। এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় বললে বুঝতে হবে মস্তিষ্কের মধ্যেকার সেই সেই ক্রিয়া যেগুলো দিয়ে এই বাক্-পাণি-ইত্যাদি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় নিজের নিজের কাজে নিযুক্ত হয়। এইজন্যে বলছেন 'পঞ্চভিঃ-অঞ্চিতঃ-অয়ং প্রাণঃ ভবেৎ প্রাণময়কোশঃ'। 'যেন-আত্মবান্-অন্নময়ঃ-অনুপূর্ণঃ'; 'যেন' মানে যার দ্বারা অর্থাৎ এই প্রাণময়কোশের দ্বারা। 'অনুপূর্ণঃ' অর্থাৎ পশ্চাতের প্রাণময়কোশের দ্বারা পূর্ণ। 'আত্মবান্' অর্থাৎ চেতনাযুক্ত হয়ে আছে। পশ্চাতের প্রাণময়কোশের দ্বারা পূর্ণ ও চেতনাযুক্ত হয়ে অন্নময়কোশ সব কাজ করে—'প্রবর্ততে-অসৌ সকলক্রিয়াসু'। 'অসৌ' মানে ঐ অন্নময়কোশ অর্থাৎ দেহ। প্রাণময়কোশ আছে বলেই অন্নময়কোশ সব কাজ করে। প্রাণ যদি এই দেহকে চেতনের মতো করে না তুলত তাহলে এ ঘোরাফেরা করতে পারত না, জড়ের মতোই পড়ে থাকত। প্রাণ এই দেহ থেকে চলে গেলে আমরা মরে যাই। মৃতদেহ একটা জড়বস্তু। সেটা ফেলে রাখলে পচে যায়। তাই বলছেন, অন্নময়কোশের পরে যে প্রাণময়কোশ আছে সেইই এই অন্নময়কোশকে প্রাণে পূর্ণ করে 'আত্মবান্' করে সব কাজে প্রবৃত্ত করছে। প্রাণই যেন এই দেহের আত্মা।

নৈবাত্মাপি প্রাণময়ো বায়ুবিকারো
গন্তাগন্তা বায়ুবদন্তবহিরেষঃ।
যস্মাৎ কিঞ্চিৎ ক্বাপি ন বেত্তীষ্টমনিষ্টং
স্বং বান্যং বা কিঞ্চন নিত্যং পরতন্ত্রঃ॥ ১৬৬

অন্বয় : এষঃ প্রাণময়ঃ অপি (এই প্রাণময়কোশও) বায়ুবিকারঃ (অপঞ্চীকৃত বায়ুর বিকার) আত্মা ন এব (জীবাত্মা নয়) যস্মাৎ (যেহেতু) এষঃ বায়ুবৎ (এ বায়ুর মতো) অন্তঃ-বহিঃ (ভিতরে ও বাইরে) গন্তা-আগন্তা (যাতায়াতকারী) ক্ব-অপি (কখনও)

কিম্-চিৎ (কিছুমাত্র) ইষ্টম্-অনিষ্টম্ (ভালো মন্দ) স্বং বা (নিজেকে বা) কিম্-চন অন্যং বা (অন্য কিছুকে বা কাকেও) ন বেত্তি (জানে না) নিত্যং পরতন্ত্রঃ (সর্বদা পরাধীন [মনের অধীন])।

সরলার্থ : প্রাণময়কোশ অপঞ্চীকৃত বায়ুর বিকার বলে আত্মা নয়। আরও কারণ হচ্ছে, এ বায়ুর মতো ভিতরে ও বাইরে যাতায়াত করে, এ কখনও কিছুমাত্র ভালোমন্দ বুঝতে পারে না, নিজেকে বা অন্য কিছুকে জানতে পারে না, এবং এ পরাধীন। কাজেই এ আত্মা হতে পারে না।

ব্যাখ্যা : প্রাণময়কোশ কেন আত্মা নয় সেই কারণগুলো দিচ্ছেন। আত্মা তো অবিকারী, অক্রিয়। কিন্তু এই প্রাণময়কোশ অপঞ্চীকৃত বায়ুর বিকার। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে এ ভেতরে যায় আবার বাইরে আসে, কাজেই এ আত্মা হতে পারে না। বলছেন, 'ন এব-আত্মা-অপি প্রাণময়ঃ বায়ুবিকারঃ গন্তা-আগন্তা বায়ুবৎ-অন্তঃ বহিঃ-এষঃ'। তারপর আরও কারণ দিচ্ছেন, 'যস্মাৎ কিঞ্চিৎ ক্বাপি ন বেত্তি-ইষ্টম্-অনিষ্টম্'— যেহেতু কখনও কোনও কিছুর ভালোমন্দ বুঝতে পারে না, 'স্বং বা অন্যং বা কিঞ্চন'— নিজেকে বা অন্যকে বা অন্য কিছুকে জানে না এবং 'নিত্যং পরতন্ত্র'— সবসময় পরের অধীন, সেই হেতু এ আত্মা নয়। প্রাণ যন্ত্রচালিতের মতো কাজ করে, ইষ্ট-অনিষ্ট বোঝে না, আর প্রাণায়ামের দ্বারা একে বশে আনতে পারা যায়। কিন্তু আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, স্বাধীন, স্বতন্ত্র। অতএব প্রাণময়কোশ আত্মা হতে পারে না।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্যাৎ
কোশো মমাহমিতি বস্তুবিকল্পহেতুঃ।
সংজ্ঞাদিভেদকলনাকলিতো বলীয়াং-
স্তৎপূর্বকোশমভিপূর্য বিজৃম্ভতে যঃ ॥ ১৬৭

অন্বয় : জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি) চ মনঃ (এবং মন) মনোময়ঃ কোশঃ স্যাৎ (মনোময়কোশরূপে বিদ্যমান) মম-অহম্-ইতি ('আমার' ও 'আমি' এই ভাব) বস্তু-বিকল্পহেতুঃ (নানা বস্তুর বিভিন্ন রূপ ভাবনার হেতু) সংজ্ঞাদিভেদ-কলনাকলিতঃ (নাম, রূপ ও ক্রিয়াদির বিভিন্নতার ধারণাযুক্ত) বলীয়ান্ (বলবান) যঃ (যে) তৎ-পূর্বকোশম্ (তার আগের কোশকে) অভিপূর্য (পরিবৃত করে) বিজৃম্ভতে (প্রকাশ পায়)।

সরলার্থ : জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি ও মন একত্রে মনোময়কোশ রূপে বিদ্যমান। 'আমি-আমার' ধারণার দ্বারা বস্তুকে বিভিন্নরূপে গ্রহণের হেতু, নামরূপাত্মক ভেদের ধারণাযুক্ত, অত্যন্ত বলবান এই মনোময়কোশ তার আগের কোশ অর্থাৎ প্রাণময়কোশকে পরিব্যাপ্ত করে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : মনোময়কোশ আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি আর মনকে নিয়ে তৈরী হয়েছে। এ অত্যন্ত বলবান। 'আমি ও আমার' ভাব অবলম্বন করে এই মনোময়কোশই বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন ভাবে দেখার কারণ হয়। আর নামরূপাত্মক এই বৈচিত্রময় জগতের ধারণার স্থানও এই মনোময়কোশ। প্রাণময়কোশকে পরিবৃত ও পূর্ণ করে এ প্রকাশিত। 'জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্যাৎ কোশঃ'। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি ও মন একসঙ্গে মিলে মনোময়কোশ হয়েছে। 'মম-অহম্-ইতি বস্তুবিকল্পহেতুঃ'; 'আমার ও আমি', এই ভাব নিয়ে নানা বস্তুর বিকল্প ধারণার হেতু। 'সংজ্ঞাদিভেদ-কলনাকলিতঃ', নামরূপের ভেদজনিত যত বৈচিত্র, সেই বৈচিত্রের ধারণা-যুক্ত 'বলীয়ান্'—অত্যন্ত বলবান। 'তৎপূর্বকোশম্-অভিপূর্য বিজৃম্ভতে যঃ', তার আগের কোশকে অর্থাৎ প্রাণময়কোশকে পরিবৃত ও পূর্ণ করে প্রকাশিত হয়েছে যে—সে-ই এই মনোময়কোশ। আগের শ্লোকে বলেছেন, প্রাণময়কোশ 'পরতন্ত্রঃ' অর্থাৎ পরের অধীন। সে যে কার অধীন সেটা এখানে বলছেন। বলছেন, মনোময়কোশ প্রাণময়কোশকে 'অভিপূর্য বিজৃম্ভতে', পূর্ণ করে, পরিবৃত করে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রাণময়কোশকে পূর্ণ করা মানে প্রাণের সমস্ত ক্রিয়ার কারণরূপে বর্তমান থাকা। প্রাণের সমস্ত ক্রিয়া মনের সঙ্কল্প-বিকল্পের বা শুধু মনের ওপর নির্ভর করে, তাই প্রাণময়কোশ মনোময়কোশের অধীন। এর প্রমাণ হচ্ছে যোগীরা প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রাণকে সম্পূর্ণভাবে বশে আনতে পারেন। আর তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলছেন, 'তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ অন্যোঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ (তৈ, ২।৩)।' প্রাণময়ের থেকে আলাদা অথচ তার অভ্যন্তরে অতিরিক্ত রূপে মনোময় আত্মা আছে। সেই মনোময়ের দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ। বলছেন, জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি আর মন, এই নিয়ে মনোময়কোশ। আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্। এগুলো শরীরের অঙ্গ হয়ে আছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলির স্থান মস্তিষ্কে। ইন্দ্রিয়রা যেমন যেমন বার্তা পাঠায় সেই অনুযায়ী চোখ কান ইত্যাদি শরীরের যন্ত্রগুলো ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে আর দেখা শোনা ইত্যাদি কাজের শুরু হয়ে যায়। আমাদের বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ এই ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে। আর মন হচ্ছে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। তার একটা 'আমি-আমার' ভাব আছে। যা কিছু দেখছে, শুনছে, আস্বাদ করছে, আঘ্রাণ করছে বা স্পর্শ করছে, সেসব—আমার এইরকম অনুভব হচ্ছে, আমি এই সমস্ত দেখছি, শুনছি, ইত্যাদি—মনে করছে। কিন্তু এই মনে করার আবার কোনও স্থিরতা নেই। একবার ভাবছে এইরকমই তো দেখলাম, আরেক বার ভাবছে, ওটা অন্যরকম ছিল। এই সঙ্কল্প-বিকল্পের দোলায়মান অবস্থায় তার সব কাজ চলছে। নামরূপাত্মক এই যে বিচিত্র জগৎ তার সমস্ত বৈচিত্রের ধারণা এই মনই করছে। এ অত্যন্ত বলবান। কারণ এই মনের সহায়তায় আমরা আত্মাকে জানতে পারি। প্রাণময়কোশকে পূর্ণ করে ও পরিবৃত করে এই মনোময়কোশের প্রকাশ হয়।

পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরেব হোতৃভিঃ
প্রচীয়মানো বিষয়াজ্যধারয়া।
জাজ্বল্যমানো বহুবাসনেন্ধনৈ-
র্মনোময়াগ্নির্বহতি প্রপঞ্চম্।। ১৬৮

অন্বয় : পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিঃ এব হোতৃভিঃ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ পাঁচজন হোতার দ্বারা) বহু-বাসনা-ইন্ধনৈঃ (বহু বাসনার ইন্ধনের সাহায্যে) জাজ্বল্যমানঃ (প্রজ্বালিত) বিষয়-আজ্য-ধারয়া (বিষয়রূপ ঘৃতাহুতির দ্বারা) প্রচীয়মানঃ (পরিবর্ধিত) মনোময়াগ্নিঃ (মনোময়কোশ-রূপ অগ্নি) প্রপঞ্চম্ বহতি (বিশ্বজগৎকে বয়ে আনে)।

সরলার্থ : পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ পাঁচজন হোতার দ্বারা বহু বাসনার ইন্ধনে জ্বলে ওঠা মনোময়কোশ-রূপ অগ্নি বিষয়ের ঘৃতাহুতিতে পরিবর্ধিত হয়ে বিশ্বজগৎকে জীবের গোচরের মধ্যে বয়ে আনে।

ব্যাখ্যা : এখানে একটি রূপক ব্যবহার করে মনোময়কোশ কিভাবে কাজ করে সেটা বলছেন। 'পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিঃ-এব হোতৃভিঃ', পাঁচটি ইন্দ্রিয়রূপ পাঁচজন হোতার দ্বারা, 'জাজ্বল্যমানঃ বহুবাসনা-ইন্ধনৈঃ মনোময়-অগ্নিঃ-বহতি প্রপঞ্চম্', বহু বাসনার ইন্ধন দিয়ে জ্বালিয়ে তোলা মনোময় অগ্নি বিশ্বপ্রপঞ্চকে মানুষের গোচরে বহন করে আনছে। এই অগ্নি 'প্রচীয়মানঃ বিষয়-আজ্য ধারয়া'; এই অগ্নি পরিবর্ধিত হয়েছে বিষয়রূপ ঘৃতাহুতির ধারায়। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় মানে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যেই আমাদের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ যুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ হয়। আমাদের তো বাসনার শেষ নেই। সেই বাসনার ইন্ধনে মনোময় অগ্নি জ্বলে উঠেছে। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক্—ওই বাসনার ইন্ধনে বিষয়ের ঘৃতাহুতি দিচ্ছে আর মনের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে। বলছেন, 'প্রচীয়মানঃ বিষয়-আজ্য ধারয়া', মনের আগুন যে লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠছে তার কারণ বাসনার ইন্ধনে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ওই ইন্দ্রিয়গুলো বিষয়ের জোগান দিয়ে যাচ্ছে। আবার বলছেন, এই 'মনোময়ঃ-অগ্নিঃ-বহতি প্রপঞ্চম্', বিশ্বপ্রপঞ্চকে এই মনোময় অগ্নি বহন করে আনছে। কার কাছে বহন করে আনছে ? জীবাত্মার কাছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে মন কাজ করে বলেই আমার যে 'অহংবুদ্ধি' আছে সে জগৎকে চিনছি বলে মনে করে। মনোময়কোশ যেন যজ্ঞাগ্নি, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় বহু বাসনার ইন্ধনে এই আগুন জ্বালিয়েছে, আর বিষয়-ঘৃতের আহুতি দিয়ে সেই আগুনকে বাড়িয়ে তুলেছে। সেই আগুন 'আমি' বলে যে আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তার গোচরে আনছে, আর এই যজ্ঞের ফলস্বরূপ ঈপ্সিত বিষয় ভোগের সুখ তাকে দিচ্ছে। এই রূপকের আর একটা ব্যাখ্যা হতে পারে। বলা হয় যে, যজমান অর্থাৎ যিনি যজ্ঞের আয়োজন করেন ও ইন্ধনের সাহায্যে যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়ে

ঘৃতাহুতি দেন, তিনি সেই যজ্ঞের ফল পান। এই ফল 'অপূর্ব' নামের ফল যা সৃষ্টিপ্রবাহ অব্যাহত রাখে। বলা যেতে পারে যে, মনোময়কোশরূপ অগ্নিও—দেহান্তের সময় জীবের যা মনে হয় সেই অনুযায়ী তার আবার জন্ম হয় বলে—জন্মপ্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখছে।

ন হ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা
মনো হ্যবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ।
তস্মিন্ বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং
বিজৃম্ভিতেঽস্মিন্ সকলং বিজৃম্ভতে।। ১৬৯

অন্বয় : মনসঃ অতিরিক্তা (মনের থেকে আলাদা অন্য) অবিদ্যা ন হি অস্তি (অবিদ্যা কিছুই নেই) মনঃ হি ভববন্ধহেতুঃ (মনই সংসারবন্ধনের হেতু) অবিদ্যা (অবিদ্যা) তস্মিন্ বিনষ্টে (সেই মনের নাশ হলে) সকলং বিনষ্টং (সমস্ত সংসারবন্ধন বিনষ্ট হয়ে যায়) অস্মিন্ বিজৃম্ভিতে (এই মনের প্রকাশ হলে) সকলং বিজৃম্ভতে (সবকিছুর প্রকাশ হয়)।

সরলার্থ : মনের অতিরিক্ত অবিদ্যা নেই। মনই সংসারবন্ধনের হেতু অবিদ্যা। মনের নাশ হলে সমস্ত সংসারবন্ধন চলে যায়। আবার মনের প্রকাশের সঙ্গেই সমস্ত সংসার প্রকাশিত হয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, মনের অতিরিক্ত অবিদ্যা নেই। মনই যদি একমাত্র অবিদ্যা হবে তাহলে অবিদ্যারূপ আমাদের যে কারণশরীর, যেটা সুষুপ্তির সময় থাকে, সেটা কি ? সেটাই অবিদ্যা। কিন্তু বলতে চাইছেন, অবিদ্যার সবচেয়ে বেশী প্রকাশ মনে, কারণ আমরা মনেই বদ্ধ আবার মনেই মুক্ত। আমরা নিত্যমুক্ত আত্মা হয়েও নিজেকে বদ্ধ ভাবছি আর বন্ধনের কারণগুলো পরম যত্নে আরও জোরাল করে তুলছি। এসবই অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে হচ্ছে। এই অবিদ্যা কাজ করছে মনের মাধ্যমে। এই দেহটাকে 'আমি' মনে করছি আর এই একটা ভুল থেকে সংসার শুরু হয়ে যাচ্ছে। তাই বলছেন, 'ন হি অস্তি-অবিদ্যা মনসঃ-অতিরিক্তা।' আবার বলছেন, 'মনঃ হি অবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ'—যে অবিদ্যার কারণে সংসারবন্ধন, মনই সেই অবিদ্যা। আমাদের সংসারবন্ধন কেন হয় ? কারণ দেহকেন্দ্রিক সমস্ত অনিত্যবস্তু 'আমার' বলে আঁকড়ে ধরছি আর সেগুলো হারাবার ভয়ে দুশ্চিন্তা করছি। এসব 'আমার' জিনিস, এর রক্ষণাবেক্ষণ আমাকেই করতে হবে, এই 'আমিই কর্তা' ভাবের জন্যে মনের সব শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে সব সময় অশান্ত চঞ্চল হয়ে আছি। এসব অজ্ঞানের জন্যে হয় আর মনই সেই অজ্ঞানের আশ্রয়স্থল। তাই বলছেন, 'তস্মিন্ বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং', এই মনের নাশ হলে সব বন্ধনের নাশ হয়। মনের নাশ কি করে হয় ? মনের লক্ষণ

সঙ্কল্প-বিকল্প, সেটা দূর করলেই মনের নাশ হয়। আবার যদি মনের প্রকাশ হয় তাহলেই সংসার এসে গেলো। 'বিজৃম্ভিতে-অস্মিন্ সকলং বিজৃম্ভতে'; তার মানে কি মন একবার নষ্ট হয়ে গিয়ে আবার নিজের চেহারায় ফিরে আসে ? একেবারে নষ্ট হয়ে গেলে তা আর হয় না। কিন্তু এই যে সঙ্কল্প-বিকল্প-ত্যাগ সেটা সম্ভব হয় দেহে আত্মবুদ্ধি চলে গেলে। যদি সেই দেহাত্মবুদ্ধি পুরোপুরি না যায়, একটু-আধটু থেকে যায়, তাহলে সংসারের মধ্যে অনবরত থাকার দরুন সেই 'আমি' বুদ্ধি আবার আগের আকার নিয়ে ফেলতে পারে। তা যদি হয় তাহলে আবার সংসার শুরু হয়ে যায়, বন্ধনের দড়ি আবার বাঁধতে থাকে, মন আবার অবিদ্যার প্রভাবে পড়ে। জীব নিজেকে বদ্ধ বলে মনে করে।

স্বপ্নেঽর্থশূন্যে সৃজতি স্বশক্ত্যা
ভোক্ত্রাদি বিশ্বং মন এব সর্বম্।
তথৈব জাগ্রত্যপি নো বিশেষ-
স্তৎসর্বমেতন্মনসো বিজৃম্ভণম্ ॥ ১৭০

অন্বয় : মনঃ এব (মনই) অর্থশূন্যে স্বপ্নে (বিষয়শূন্য স্বপ্নে) স্বশক্ত্যা (নিজের শক্তির দ্বারা) সর্বং (সমস্ত) ভোক্তৃ-আদি বিশ্বম্ (ভোক্তা ও ভোগ্যরূপ বিশ্ব) সৃজতি (সৃষ্টি করে) তথা এব (সেই ভাবেই) জাগ্রতি অপি (জেগে থাকা অবস্থাতেও) নো বিশেষঃ (কোন তফাত নেই) তৎ (সেই জন্যে) এতৎ সর্বম্ (এইসব স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় দেখা বস্তু) মনসঃ বিজৃম্ভণম্ (মনেরই প্রকাশ)।

সরলার্থ : স্বপ্নের সময় বাইরের কোনও কিছু বর্তমান না থাকলেও মনই নিজের শক্তিতে ভোক্তা ও ভোগ্য বস্তুর সঙ্গে সমস্ত সংসারটাই সৃষ্টি করে। জাগ্রত অবস্থায় যে সংসার দেখি সেটাও মনেরই সৃষ্টি। এ দুটোর মধ্যে তফাত বিশেষ নেই। এইজন্যে এই দুই অবস্থায় দেখা জগৎ-ই মনের দ্বারা প্রকাশিত।

ব্যাখ্যা : বলছেন, আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, তখন একটা স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করি। সে জগৎ মনেরই সৃষ্টি। মনই কাল্পনিক ভোগ্যবস্তু আর তার কাল্পনিক ভোক্তা তৈরী করে নেয়। বাস্তবে আসলে কিছুই নেই। বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছি, কিন্তু দেখছি রসগোল্লা খাচ্ছি। ভোগ্যবিষয় রসগোল্লা যেমন কাল্পনিক, আমি যে রসগোল্লা খাচ্ছি, সেটাও কাল্পনিক। মনই তার নিজের শক্তিতে স্বপ্নজগতের ভোক্তা ও ভোগ্যবিষয়কে সৃষ্টি করে। তাদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব থাকে না। 'তথা-এব জাগ্রতি অপি নো বিশেষঃ'—জেগে থেকেও তা-ই হচ্ছে, আলাদা কিছু নয়। জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থায় ভোগ্যবিষয় আর ভোক্তার মধ্যে সম্পর্কটা একই রকম। কি করে তা হয় ? জাগ্রত অবস্থাতে তো স্থূল

বাইরের জগৎকে স্পষ্ট দেখছি, নিজেকেও পরিষ্কার দেখছি ও জানছি—তাহলে স্বপ্নের সঙ্গে সেটা এক হয় কি করে ? এক এই অর্থে যে, মনই 'আমি-আমার' বুদ্ধির সাহায্যে জগতের বিষয়কে 'আমার' ভোগ্য বিষয় বলে দেখাচ্ছে আর আমাকে সেগুলির 'ভোক্তা' মনে করাচ্ছে। আসলে বাইরের বিষয় যেমন জড়বস্তু, দেহ-মন-ইন্দ্রিয় যা দিয়ে ভোগ করছি আমি তা-ও জড়বস্তু। বাইরের বিষয়কে 'ভোগ্য' মনে করা এবং নিজেকে 'ভোক্তা' মনে করা এ-মনেরই কাজ। ভোগ্যবস্তুর 'ভোগ্য' হওয়ার গুণ যদি ভোগ্য বিষয়ের মধ্যেই থাকত, তাহলে একই বিষয় সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত হত। তা-তো হয় না। অনেক বিষয়ই আছে যা একজন খুব লোভনীয় মনে করে, আরেকজন ফিরেও চায় না। কাজেই, ভোক্তা ও ভোগ্যবিষয়-পরিপূর্ণ এই যে বাহ্য জগৎ, স্বপ্ন জগতের মতো এ-ও মনেরই সৃষ্টি।

সুষুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ সকলপ্রসিদ্ধেঃ।
অতো মনঃকল্পিত এব পুংসঃ
সংসার এতস্য ন বস্তুতোঽস্তি॥ ১৭১

অন্বয় : সুষুপ্তিকালে (সুষুপ্তির সময়ে) মনসি প্রলীনে (মন লীন হয়ে গেলে) কিম্-চিৎ-এব (কিছুই) ন অস্তি (থাকে না) সকলপ্রসিদ্ধেঃ ([এটা] সকলের অনুভবসিদ্ধ) অতঃ (এই কারণে) সংসারঃ (সংসার) এতস্য পুংসঃ (এই পুরুষের) মনঃকল্পিতঃ এব (মনের দ্বারাই কল্পিত) বস্তুতঃ ন অস্তি (বস্তুত নেই)।

সরলার্থ : সুষুপ্তির সময়ে মন লীন হয়ে গেলে কিছুই থাকে না এটা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ ঘটনা। কাজেই এই সংসার পুরুষের মনেরই কল্পনা, এ বস্তুত নেই।

ব্যাখ্যা : গাঢ় ঘুমে যখন অচৈতন্যের মতো পড়ে থাকি তখন মন কোথায় তলিয়ে যায়। তখন কিছুই টের পাওয়া যায় না। জেগে উঠে মনে হয়, উঃ এতো ঘুমিয়েছি, ছিলাম কি না ছিলাম কিছুই জানি না। বলছেন, 'সুষুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ সকলপ্রসিদ্ধেঃ'; সুষুপ্তির সময় মন যখন লীন হয়ে যায় তখন যে 'কিছুই নেই' এইরকম একটা অনুভূতি হয়, তা সকলেরই জানা আছে। যখন জেগে থাকি বা স্বপ্ন দেখি তখন মন কাজ করে, তাই জগৎ দেখি, সংসারের সুখ-দুঃখ ভালোমন্দ অনুভব করি, হাসি-কান্না-ভালোবাসা-বিদ্বেষ, কামনা-বাসনা ভরা এই সংসার নিয়ে থাকি। কিন্তু যখন অঘোরে ঘুমোই তখন আর মন কাজ করে না তাই তখন আমার কাছে কিছুই নেই। বলছেন, 'অতঃ মনঃ কল্পিত এব পুংসঃ সংসার এতস্য ন বস্তুতঃ-অস্তি', কাজেই এই সংসার পুরুষের মনের দ্বারা কল্পিত, বস্তুত এটা নেই। সুষুপ্তির সময় আমাদের মন

কারণশরীরে লীন হয়ে যায়। তখন মনের যে ধর্ম, সঙ্কল্প-বিকল্প, তা আর থাকে না; তাই ঘুমন্ত মানুষের জগৎপ্রপঞ্চের কোনও ধারণা থাকে না। এর থেকেই বুঝতে পারা যায় যে অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে মনই এই সংসার সৃষ্টি করে। এর কোন বাস্তব সত্তা নেই।

বায়ুনাঽনীয়তে মেঘঃ পুনস্তেনৈব নীয়তে।
মনসা কল্প্যতে বন্ধো মোক্ষস্তেনৈব কল্প্যতে।। ১৭২

অন্বয় : বায়ুনা (বায়ুর দ্বারা) মেঘঃ আনীয়তে (মেঘ আনীত হয়) পুনঃ (আবার) তেন এব (তার দ্বারাই) নীয়তে (অপসারিত হয়) বন্ধঃ (বন্ধন) মনসা (মনের দ্বারা) কল্প্যতে (কল্পনা করা হয়) তেন এব (তার দ্বারাই) মোক্ষঃ (মুক্তি) কল্প্যতে (কল্পিত হয়)।

সরলার্থ : যেমন বায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে মেঘ আসে আবার সেই বায়ুর দ্বারাই অপসারিত হয় তেমনি বন্ধন ও মুক্তি দুই-ই মনের কল্পনা।

ব্যাখ্যা : মানুষ মনেই বদ্ধ মনেই মুক্ত। আমি যদি মনে করি আমি বদ্ধ, তাহলেই আমি বদ্ধ আর যদি মনে করি আমি মুক্ত, তাহলেই আমি মুক্ত। বাতাস যেমন মেঘকে ভাসিয়ে নিয়ে আসে আবার সরিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি মনই বন্ধন হয়েছে বলে ভাবে আবার মনই মুক্তির কল্পনা করে। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা আমার স্বরূপ। আমি তো মুক্তই হয়ে আছি, আবার মুক্ত হব কি করে ? বন্ধনই বা এলো কোথা থেকে ? অজ্ঞানের জন্যে আমি ভাবছি আমি বদ্ধ, তাই আমি বদ্ধ। আমার মন থেকে অজ্ঞান চলে গেলেই আমি বুঝতে পারব যে আমি নিত্যমুক্ত।

দেহাদিসর্ববিষয়ে পরিকল্প্য রাগং
বধ্নাতি তেন পুরুষং পশুবদ্ গুণেন।
বৈরস্যমত্র বিষবৎ সুবিধায় পশ্চাদেনং
বিমোচয়তি তন্মন এব বন্ধাৎ।। ১৭৩

অন্বয় : তৎ মনঃ এব (সেই মনই) দেহাদি-সর্ববিষয়ে (দেহে, ইন্দ্রিয়ে এবং রূপরসাদিতে) রাগং (অনুরাগ) পরিকল্প্য (সৃষ্টি করে) তেন গুণেন (সেই অনুরাগের রজ্জু দিয়ে) পশুবৎ (পশুর মতো) পুরুষং (পুরুষকে) বধ্নাতি (বেঁধে রাখে) [আবার সেই মনই] পশ্চাৎ (অন্য সময়ে) অত্র (সকল বিষয়ে) বিষবৎ (বিষের মতো) বৈরস্যং (বিতৃষ্ণা) সু-বিধায় (সম্যক্ রূপে বিধান করে) এনং (এই জীবকে) বন্ধাৎ বিমোচয়তি (বন্ধন থেকে মুক্ত করে)।

সরলার্থ : মনই দেহে ইন্দ্রিয়ে ও রূপরসাদি বিষয়ে আসক্তির সৃষ্টি করে, পশুকে যেমন দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় সেইরকম আসক্তির দড়ি দিয়ে পুরুষকে সংসারে বেঁধে রাখে। এই মনই আবার অন্য সময় সমস্ত বিষয় বিষের মতো বিতৃষ্ণার যোগ্য বিধান করে জীবের বন্ধন মোচন করে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, এই মনই 'দেহাদি সর্ববিষয়ে পরিকল্প্য রাগং বধ্নাতি তেন পুরুষং পশুবদ্ গুণেন'। 'দেহাদি সর্ববিষয়ে'; দেহ, ইন্দ্রিয়, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ যুক্ত সমস্ত বিষয়ে। 'দেহাদি' বলতে দেহ ও দেহ সংক্রান্ত সবকিছু। ইন্দ্রিয়গুলো তো দেহেরই অঙ্গ আর এগুলো ছাড়া বিষয়ের ভোগ হবে না, তাই এগুলোও চাই। মন এই সবকিছুতে অত্যন্ত অনুরাগ বা আসক্তির সৃষ্টি করে পুরুষকে পশুর মতো সেই আসক্তির দড়ি দিয়ে বাঁধে। আমাদের বন্ধন তো সংসারে আসক্তির জন্যে। যদি অনাসক্ত হতে পারি, তাহলে সংসার যতই তার মায়ার জাল বিছোক, আমি নির্লিপ্ত দর্শকের মতো দেখব। কারণ আসক্তির দড়িটা তখন ছিঁড়ে গেছে, তা দিয়ে আমাকে তখন আর বাঁধা যাচ্ছে না। তারপর বলছেন, সেই মনই আবার কি করে ? 'বৈরস্যম্-অত্র বিষবৎ সু-বিধায়', এইসব দেহাদি ও বিষয় বিষের মতো, এই বিধান করে এসবে বিতৃষ্ণা আনে এবং 'পশ্চাৎ-এনং বিমোচয়তি তৎ-মনঃ এব বন্ধাৎ'—এই জীবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে। ভাগ্যবশে ভোগে যখন ক্লান্তি আসে আর মনে বিবেকবুদ্ধি জাগে, মন তখন এইসব অনিত্য বিষয়ভোগে আর সুখ পায় না। উপরন্তু এগুলো ক্লান্তিকর ও দুঃখজনক বলে বিষের মতো মনে করে। অর্থাৎ মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। কোনও জিনিসকে যদি আমি বিষের মতো জীবনহানির কারণ বলে মনে করি তাহলে সেটা নেবার জন্যে আমার কোনও প্রবৃত্তি হবে না, বরং বর্জন করতেই চাইব। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়। বিষয়ভোগের কুফল বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে বুঝলে তীব্র বৈরাগ্যে মন ভরে যায়। আর এই বৈরাগ্যযুক্ত মনই পুরুষকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে।

তস্মান্মনঃ কারণমস্য জন্তো-
র্বন্ধস্য মোক্ষস্য চ বা বিধানে।
বন্ধস্য হেতুর্মলিনং রজোগুণৈ-
র্মোক্ষস্য শুদ্ধং বিরজস্তমস্কম্।।১৭৪

অন্বয় : তস্মাৎ (সেইজন্যে) অস্য জন্তোঃ (এই জাতকের) বন্ধস্য মোক্ষস্য চ বা বিধানে (বন্ধন বা মুক্তির বিধান করতে) মনঃ কারণম্ (মনই কারণ) রজোগুণৈঃ মলিনং (রজোগুণের দ্বারা মলিন) [মনঃ] বন্ধস্য হেতুঃ (বন্ধনের কারণ) বিরজঃ-তমস্কম্ (রজঃ এবং তমোগুণ বর্জিত) শুদ্ধং (শুদ্ধ মন) মোক্ষস্য (মোক্ষের) [কারণ]।

সরলার্থ : এই কারণে মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির হেতুস্বরূপ। রজোগুণের দ্বারা

মলিন মন জীবের বন্ধনের কারণ। আর রজঃ-তমঃ-বিবর্জিত শুদ্ধ মন মুক্তির কারণ।

ব্যাখ্যা : বলছেন, মনই বন্ধনের সৃষ্টি করে আবার মনই মুক্তির ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই দুটো বিপরীতধর্মী কাজ মন কি করে করে ? সেইটাই এখানে বলছেন। 'বন্ধস্য হেতুঃ মলিনং রজোগুণৈঃ', মন বন্ধনের হেতু হয় রজোগুণের দ্বারা মলিন হয়ে গেলে। আগে বলেছেন, দেহাদি ও সমস্ত বিষয়ে আসক্তি সৃষ্টি করে মন সেই আসক্তির দড়ি দিয়ে মানুষকে বাঁধে। এই আসক্তি আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা 'আমি আমার' বোধ, এগুলো মনের মলিনতা। এগুলো আসে রজোগুণের প্রভাবে। আর এসবের ফলশ্রুতি হচ্ছে ক্রোধ, দম্ভ, লোভ, মোহ, বিদ্বেষ, অত্যন্ত কর্মপ্রবণতা ইত্যাদি। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আমরা যার সঙ্গে যে ব্যবহার করার নয় তাই করে বসি আর পরে এর জন্যে কষ্ট পাই। দম্ভ আমাদের সকলের কাছে অপ্রিয় করে তোলে আর নিজের সম্বন্ধে অমূলক উঁচু ধারণার জন্যে মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। লোভ, মোহ, বিদ্বেষ, এসব মানুষকে চঞ্চল করে ও যত রাজ্যের অকাজ-কুকাজে প্রবৃত্ত করায়। এ সবগুলোই সংসারবন্ধনের কারণ, মনের মলিনতা। তারপর বলছেন, মন যখন 'বিরজঃ-তমস্কম্', রজঃ ও তমোগুণ থেকে মুক্ত, তখন সে শুদ্ধ হয়ে গেছে। সেই মনই মোক্ষের কারণ। তমোগুণও মনের শুদ্ধতা নষ্ট করে। তার লক্ষণ কি ? তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে জড়তা, আলস্য, কর্মবিমুখতা, নিজের অবস্থার উন্নতির জন্যে চেষ্টার অভাব। তমোগুণের প্রভাবে সমস্ত কর্মতৎপরতা নষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধির প্রয়োগ হয় না বলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা চলে যায়, আলস্যের বশে মানুষ যেমন ছিল তেমনি অবস্থায় পড়ে থেকে জড়ের মতো দিন কাটায়। সংসারবন্ধন কাটাতে হলে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হয়, তার জন্যে মহা-উদ্যমের প্রয়োজন হয়—তমোগুণ তা আসতে দেয় না। তাই তমোগুণও প্রতিবন্ধক। রজঃ ও তমঃ যে মন থেকে চলে গেছে সেই শুদ্ধ মনই মানুষের মোক্ষ লাভের কারণ।

বিবেকবৈরাগ্যগুণাতিরেকা-
চ্ছুদ্ধত্বমাসাদ্য মনো বিমুক্ত্যৈ।
ভবত্যতো বুদ্ধিমতো মুমুক্ষো-
স্তাভ্যাং দৃঢ়াভ্যাং ভবিতব্যমগ্রে॥ ১৭৫

অন্বয় : বিবেক-বৈরাগ্য-গুণাতিরেকাৎ (বিবেকবৈরাগ্য-গুণের বৃদ্ধি থেকে) শুদ্ধত্বম্-আসাদ্য (শুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে) মনঃ (মন) বিমুক্ত্যৈ ভবতি (মুক্তির কারণ হয়) অতঃ (অতএব) বুদ্ধিমতঃ মুমুক্ষোঃ (বুদ্ধিমান মুমুক্ষুর) অগ্রে (প্রথমেই) দৃঢ়াভ্যাং তাভ্যাং (দৃঢ় বিবেকবৈরাগ্য-যুক্ত) ভবিতব্যম্ (হওয়া কর্তব্য)।

সরলার্থ : বিবেক ও বৈরাগ্যের বৃদ্ধি হলে মন শুদ্ধ হয়ে মানুষের মুক্তির কারণ হয়। অতএব প্রথমেই দৃঢ় বিবেক বৈরাগ্যবান হওয়ার জন্যে যত্ন করা বুদ্ধিমান মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্তব্য।

ব্যাখ্যা : মন শুদ্ধ হলে সে মোক্ষলাভের কারণ হয় এটা আগের শ্লোকে বলেছেন। এখন বলছেন মনকে কি করে শুদ্ধ করতে হবে। বলছেন, 'বিবেক-বৈরাগ্য-গুণাতিরেকাৎ-শুদ্ধত্বম্-আসাদ্য মনঃ বিমুক্ত্যৈ'। বিবেক ও বৈরাগ্য এই দুটি গুণ বৃদ্ধি পেলে মন শুদ্ধত্ব লাভ করে ও মুক্তির কারণ হয়। বিবেক মানে বিচার। নিত্যানিত্যের বিচার। বিচার করে যা অনিত্য বস্তু তাকে ত্যাগ করতে হবে। এখানেই বৈরাগ্য এসে গেল। এই যে সমস্ত রূপ-রসাদি বিষয়, বিচার করে তো জানতে পারছি এসব অনিত্য, থাকবে না, কিন্তু জানলেই কি এসবের ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারি ? তা পারি না। এগুলো যখন আর আমাকে আনন্দ দিতে পারে না তখনই এগুলোর ত্যাগ সম্ভব। বৈরাগ্য মনের সেই বৃত্তি যা বিষয়ের ভোগ থেকে আর আনন্দ পায় না। বারবার বিচার করতে করতে বৈরাগ্য আসে। বৈরাগ্য নেতিবাচক জিনিস নয়। বৈরাগ্য মানে বড় জিনিসের জন্য ছোট জিনিস ত্যাগ। আমরা সবাই বড় জিনিসের আশায় ছোট জিনিস ত্যাগ করি। ছোটবেলায় একটা কিছু মুখরোচক খাবার খেলে আনন্দ হয়। বড় হলে একটা ভালো বই পড়লে বা একটা ভালো গান শুনলে তার থেকে বেশী আনন্দ হয়। গান শোনার আশায় প্রয়োজন হলে আমরা খাওয়াটা ত্যাগ করতে পারি। এই ভাবেই আমাদের ত্যাগ হয়, বড় আনন্দের জন্যে ছোট আনন্দকে ত্যাগ করি। যদি ঈশ্বরচিন্তায় আনন্দ পেতে থাকি তাহলে আপনিই বিষয়ভোগের ইচ্ছে চলে যেতে থাকে। বিষয়ের সঙ্গে আমাদের লিপ্ত করে রাখে রজঃ ও তমোগুণ। তমোগুণ মায়ার আবরণীশক্তি, সে আমাদের বুদ্ধিকে আবরণ করে রাখে, বিবেকবুদ্ধি জাগতে পারে না তার প্রভাবে। আর রজোগুণ মায়ার বিক্ষেপীশক্তি, এ আমাদের স্থির হয়ে ভালোমন্দ তলিয়ে দেখতে দেয় না। তাই সত্ত্বগুণের সাহায্যে এদের দাবিয়ে রাখতে হয়। সত্ত্বগুণ প্রকাশধর্মী। বিদ্যা-চর্চা, সঙ্গীত-চর্চা, ছবি আঁকা, এইরকম সব কাজের মধ্যে দিয়ে মনের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলোর বৃদ্ধি হয় আর স্থূল প্রবৃত্তি সব চাপা পড়ে যায়, সেগুলোর ত্যাগ তখন সহজ হয়। কিন্তু এই সূক্ষ্ম বৃত্তিরও বন্ধন আছে, সেটাকেও শেষে ত্যাগ করতে হয়। উপায়, ঈশ্বর-অনুরাগ, ঈশ্বর চিন্তা। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে, দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। একবার বিবেকবৈরাগ্য যদি মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বসে যায় তাহলে মুক্তির আর দেরি থাকে না। তাই বলছেন, 'বুদ্ধিমতঃ-মুমুক্ষোঃ-তাভ্যাং দৃঢ়াভ্যাং ভবিতব্যম্-অগ্রে'। বুদ্ধিমান মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রথমেই দৃঢ়ভাবে বিবেক বৈরাগ্যবান হওয়া কর্তব্য।

মনো নাম মহাব্যাঘ্রো বিষয়ারণ্যভূমিষু।
চরত্যত্র ন গচ্ছন্তু সাধবো যে মুমুক্ষবঃ।। ১৭৬

অন্বয় : মনঃ নাম মহাব্যাঘ্রঃ (মন নামের মহাব্র্যাঘ্র) বিষয়-অরণ্যভূমিষু (বিষয়ের অরণ্য ভূমিতে) চরতি (বিচরণ করে) অত্র (এই বিষয়ের মধ্যে) মুমুক্ষবঃ (মুমুক্ষু) যে সাধবঃ (যেসব সাধু আছেন তাঁরা) ন গচ্ছন্তু (যেন না যান)।

সরলার্থ : মন নামের মহাব্যাঘ্র বিষয়ের অরণ্যভূমিতে বিচরণ করছে। মুক্তিকামী যেসব সাধু আছেন তাঁরা যেন ওই বিষয়ের মধ্যে না যান।

ব্যাখ্যা : মন শুদ্ধ হলে সে মুক্তির কারণ হয় ঠিকই, কিন্তু যখন সে বিষয়ে মেতে গিয়ে বিষয়ের মধ্যেই থাকে তখন তার ভয়ঙ্কর চেহারা। একটা ভোগ শেষ হলে আরেকটা ভোগ নিয়ে মেতে ওঠে। মনে হয় যেন বিষয়ের একটা ঘন জঙ্গল, আর মন তার মধ্যে বিরাট বাঘের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলছেন, মুক্তিকামী যেসব সাধু আছেন তাঁরা যেন ওখানে না যান। বিষয়ের জঙ্গলে তাঁরা যেন না ঢোকেন।

মনঃ প্রসূতে বিষয়ানশেষান্ স্থূলাত্মনা সূক্ষ্মতয়া চ ভোক্তুঃ।
শরীরবর্ণাশ্রমজাতিভেদান্ গুণক্রিয়াহেতুফলানি নিত্যম্।। ১৭৭

অন্বয় : স্থূল-আত্মনা (জাগ্রত অবস্থায় স্থূলরূপে) সূক্ষ্মতয়া (স্বপ্নে সূক্ষ্মরূপে) অশেষান্ বিষয়ান্ (অসংখ্য বিষয়) মনঃ প্রসূতে (মন সৃষ্টি করে) চ (এবং) ভোক্তুঃ (ভোক্তা জীবের) শরীর-বর্ণ-আশ্রম-জাতি-ভেদান্ (স্থূল শরীরের আশ্রয়ে চার বর্ণ, চার আশ্রম এবং বিভিন্ন জাতি) গুণ-ক্রিয়া-হেতু-ফলানি (গুণ, ক্রিয়া, হেতু ও সমস্ত ফল) নিত্যম্ (অনবরত) [সৃষ্টি করে]।

সরলার্থ : মনই জাগ্রত অবস্থায় স্থূল ও স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টি করে। আর অনবরত ভোক্তা জীবের শরীর-বর্ণ-আশ্রম-জাতি ইত্যাদি বিভিন্ন ভেদ এবং গুণ, ক্রিয়া, হেতু ও ফল সমূহ সৃষ্টি করে।

ব্যাখ্যা : মনের যে কত শক্তি তা-ই বলছেন। যখন জেগে থাকি তখন যত বিষয় নিয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো ব্যস্ত থাকে সেগুলো মনেরই সৃষ্টি। কারণ আমাদের মন যেমন দেখাচ্ছে আমরা তেমনি দেখছি। তাই বিভিন্ন মানুষের কাছে একই বিষয়ের বিভিন্ন আবেদন। আবার আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন ইন্দ্রিয়গুলো যদিও কাজ করে না কিন্তু সূক্ষ্ম অবস্থায় বিষয়গুলো মন আমাদের ঠিকই ভোগ করায়। আরও বলছেন 'শরীর-বর্ণ-আশ্রম-জাতি ভেদান্ গুণ-ক্রিয়া-হেতু-ফলানি নিত্যম্', এইগুলো সব মনই নিত্য সৃষ্টি করে চলে। শরীর ভেদ, বর্ণ ভেদ, আশ্রম ভেদ, জাতি ভেদ—এসব মনেরই

সৃষ্টি। শরীর ভেদ বলতে বোঝাচ্ছেন পশু শরীর, মানুষ শরীর, দেব শরীর। বর্ণের ভেদ হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। আশ্রমের ভেদ হলো ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থ-আশ্রম, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। আমরা যখন সুষুপ্তি অবস্থায় থাকি তখন এসব ভেদ কিছুই থাকে না, কারণ তখন মন থাকে না। কাজেই এই সব ভেদ নিশ্চয় মনের সৃষ্টি। তেমনি 'গুণ-ক্রিয়া-হেতু-ফলানি'। গুণ হচ্ছে, রূপ-রস-শব্দ ইত্যাদি যে সব গুণের জন্যে বিষয় এত প্রিয়। ক্রিয়া হচ্ছে বিষয় লাভের জন্যে কাজ। হেতু হচ্ছে বিষয় প্রাপ্তির নানা উপায়। ফল হচ্ছে কর্মের পরিণতিতে যা পাওয়া যায়। মন এইসব প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে যাচ্ছে। শুধু সৃষ্টি করেই সে থেমে থাকে না, এসব দিয়ে সে জীবের বন্ধনদশা ঘটায়।

অসঙ্গচিদ্রূপমমুং বিমোহ্য দেহেন্দ্রিয়প্রাণগুণৈর্নিবধ্য।
অহংমমেতি ভ্রময়ত্যজস্রং মনঃ স্বকৃত্যেষু ফলোপভুক্তিষু।। ১৭৮

অন্বয় : অসঙ্গ-চিৎ-রূপম্ (সঙ্গরহিত ও চৈতন্যস্বরূপ) অমুং (জীবাত্মাকে) বিমোহ্য (বিমোহিত করে) দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-গুণৈঃ (দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণরূপ রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করে) অহং মম-ইতি ('আমি-আমার' এই ভাবে) ফল উপভুক্তিষু (সুখ-দুঃখাদি ফলের উপভোগে) স্বকৃত্যেষু (নিজের যা করার আছে সেইভাবে) মনঃ (মন) অজস্রং (নিরন্তর) ভ্রময়তি (ভ্রমণ করায়)।

সরলার্থ : আত্মা অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু মন সেই আত্মাকে বিমোহিত করে দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণরূপ দড়ি দিয়ে বেঁধে 'আমি-আমার' এই ভাবের সাহায্যে সুখদুঃখ ইত্যাদি ফলের উপভোগ করায় এবং মনের কাম-সঙ্কল্পাদি কাজে সর্বদা লিপ্ত করে রাখে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, আমাদের জীবাত্মা তো অসঙ্গ ও চৈতন্যস্বরূপ কিন্তু মন তাকে বিমোহিত করে সংসারে লিপ্ত করেছে। তিনি নিজেকে ভুলে বদ্ধজীবের মতো আচরণ করছেন। বলছেন, 'অসঙ্গচিদ্রূপম্-অমুং বিমোহ্য দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ গুণৈঃ-নিবধ্য', মন অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ তাকে ('অমুম্' মানে তাকে) অর্থাৎ আত্মাকে বিমোহিত করে দেহ-ইন্দ্রিয় ও প্রাণ এই সব দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। 'অহং মম-ইতি ভ্রময়তি-অজস্রম্ মনঃ স্বকৃত্যেষু ফল-উপভুক্তিষু', 'আমি-আমার' এই একটা বোধ উৎপাদন করে মন এই আত্মাকে সংসারের সুখ-দুঃখের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে মন মোহে ফেলেছে, সে নিজের স্বরূপ ভুলে দেহ-ইন্দ্রিয় ও প্রাণেতেই 'আমি' বুদ্ধি করেছে আর দেহ-সংক্রান্ত সবকিছুকে 'আমার' বলে ভাবছে। এই জন্যে সে অসঙ্গ হয়েও সংসারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে আর সংসারের সুখ-দুঃখের ভোক্তারূপে, মনের যা কাজ সেই কামনা ও সঙ্কল্প ইত্যাদিকে 'আমার

বাসনা, আমার সঙ্কল্প' বলে মনে করছে। মন তাকে এই ভাবে সংসারে লিপ্ত করে একটা অবস্থা থেকে আর একটা অবস্থায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আত্মা নিজেকে বদ্ধজীব বলে ভাবছেন। যিনি জ্ঞানস্বরূপ তিনি নিজের স্বরূপ ভুলে এই দেহকে আমি ভাবতে আরম্ভ করেছেন। এই অজ্ঞান, অবিদ্যা এ যে মনকেই আশ্রয় করে থাকে তা কি করে বোঝা যায় ? বোঝা যায় কারণ আমাদের জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থায় যতক্ষণ মন কাজ করছে, ততক্ষণ এই দেহাত্মবোধ আমাদের মধ্যে থাকছে, অবিদ্যা কাজ করছে। কিন্তু সুষুপ্তির সময় মন যখন অবিদ্যারূপ কারণ-শরীরে মিলিয়ে গেছে তখন আর কে আমি, কীই বা আমার, এসব কোনও বোধ নেই। কাজেই মনই অবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সংসার-বন্ধন ঘটাচ্ছে, জীবাত্মাকে মোহগ্রস্ত করছে।

অধ্যাসদোষাৎ পুরুষস্য সংসৃতিরধ্যাসবন্ধস্ত্বমুনৈব কল্পিতঃ।
রজস্তমোদোষবতোঽবিবেকিনঃ জন্মাদিদুঃখস্য নিদানমেতৎ॥ ১৭৯

অন্বয় : পুরুষস্য (পুরুষের) অধ্যাসদোষাৎ (অধ্যাস-দোষ থেকেই) সংসৃতিঃ (জন্মমরণের সংসার) অধ্যাসবন্ধঃ-তু-অমুনা-এব (অধ্যাস রূপ বন্ধন অবশ্যই এই মনের দ্বারা) কল্পিতঃ (কল্পিত) রজঃ-তমঃ-দোষবতঃ (রজঃ ও তমোরূপ দোষযুক্ত) অবিবেকিনঃ (বিচারবিহীন পুরুষের) এতৎ (এই মন) জন্মাদি-দুঃখস্য (জন্ম-মরণাদিরূপ দুঃখের) নিদানম্ (কারণ)।

সরলার্থ : অধ্যাস-দোষ থেকেই পুরুষের জন্মমরণের সংসার। আর এই অধ্যাসরূপ বন্ধন মনের দ্বারাই কল্পিত। এই মনই রজঃ ও তমোগুণে বশীভূত বিচারবিহীন পুরুষের জন্মমরণাদিরূপ দুঃখের কারণ।

ব্যাখ্যা : বলছেন, অধ্যাস-দোষেই পুরুষের জন্মমরণের সংসার কিন্তু অধ্যাস ব্যাপারটা কি ? যা আরোপিত হয়েছে তাই অধ্যাস। অন্ধকারে ভালো দেখতে পাচ্ছি না, একটা দড়ি পড়ে আছে, দেখে ভাবছি সাপ। এই যে দড়িটাকে সাপ ভাবা, সাপের কল্পনাটা দড়ির ওপর চাপানো, এটা অধ্যাস। মিথ্যা সর্পজ্ঞানটা রজ্জুতে অধ্যস্ত হয়েছে, রজ্জু অধিষ্ঠান, মিথ্যা সর্পজ্ঞানটা অধ্যাস। অধ্যাস হচ্ছে যে যা নয় তাকে তাই ভাবা। বলছেন, 'অধ্যাসদোষাৎ পুরুষস্য সংসৃতিঃ'। এই অধ্যাস-দোষটা কি ? আমাদের চৈতন্যস্বরূপ আত্মা যিনি, তাঁর ওপরে দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ ইত্যাদি অধ্যাসরূপে চাপিয়েছি আর আত্মাকে 'আমি' না ভেবে সেই দেহ ইত্যাদিকেই 'আমি' মনে করছি। যিনি অধিষ্ঠান তাঁকে জানছি না, মিথ্যা অধ্যাসটাকেই সত্যি বলে মনে করছি। এইটাই অধ্যাস-দোষ। এই অধ্যাস অর্থাৎ দেহে 'আমি' বুদ্ধির জন্যেই আমি জন্মাচ্ছি, মরছি, আবার জন্মাচ্ছি। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, কিন্তু অনিত্য দেহের জন্মও আছে মৃত্যুও আছে। কাজেই

অধ্যাস-দোষেই সংসারের শুরু এবং সংসারবন্ধন। কিন্তু 'অধ্যাসবন্ধঃ তু-অমুনা এব কল্পিতঃ'। এই অধ্যাসের বন্ধন মনের দ্বারাই কল্পিত। কিন্তু মনের এ কল্পনা হয় কেন ? কি করে হয় ? রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে হয়। বলছেন, 'রজঃ-তমোদোষবতঃ-অবিবেকিনঃ জন্মাদিদুঃখস্য নিদানম্-এতৎ'; রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে পড়েছে যে বিচারশক্তিহীন পুরুষ, এই মনই তার জন্মমরণ ইত্যাদি দুঃখের কারণ। রজঃ ও তমোগুণের সাহায্যে মনকে দিয়ে এই ভুলটা করাচ্ছে মায়া। তমোগুণ মায়ার আবরণীশক্তি, সে সৎস্বরূপ আত্মাকে আবরণ করে দেহাদিকেই 'আমি' বলে দেখাচ্ছে আর রজোগুণ সেই 'আমি' কেন্দ্রিক সবকিছু নিয়ে অনবরত চিত্তবিক্ষেপের সৃষ্টি করছে। মন বিক্ষিপ্ত, বিচারবুদ্ধি গুলিয়ে গেছে। তাই এই অবস্থায় পড়ে মানুষ আর তার ভুলটা দেখতে পায় না। জন্মমরণের সংসারে বদ্ধ হয়ে দুঃখ পেতে থাকে। এ সবকিছুর কারণ কিন্তু ওই মন।

অতঃ প্রাহুর্মনোঽবিদ্যাং পণ্ডিতাস্তত্ত্বদর্শিনঃ
যেনৈব ভ্রাম্যতে বিশ্বং বায়ুনেবাভ্রমণ্ডলম্॥ ১৮০

অন্বয় : অতঃ (এই কারণে) তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী) পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) মনঃ (মনই) অবিদ্যাং (অবিদ্যা) প্রাহুঃ (বলে থাকেন) বায়ুনা (বায়ুর দ্বারা) অভ্রমণ্ডলম্ ইব (মেঘ মণ্ডলের মতো) যেন এব (যার দ্বারা) বিশ্বং (বিশ্ব) ভ্রাম্যতে (পরিচালিত হচ্ছে)।

সরলার্থ : এই কারণে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতরা মনই অবিদ্যা বলে থাকেন। বায়ুর দ্বারা আকাশের মেঘমণ্ডলী যেমন ইতস্তত পরিচালিত হয় তেমনি এই অবিদ্যার দ্বারা জগৎ পরিচালিত হয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, এত যে সব কথা বলা হলো মনকে নিয়ে, সেইসব কারণে, 'প্রাহুঃ-মনঃ-অবিদ্যাং পণ্ডিতাঃ-তত্ত্বদর্শিনঃ', তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতরা মনই অবিদ্যা বলে থাকেন। তত্ত্বদর্শী মানে যিনি তত্ত্ব জেনেছেন, অর্থাৎ যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে। আর পণ্ডিত হচ্ছে যিনি শাস্ত্রজ্ঞ। 'যেনৈব ভ্রাম্যতে বিশ্বং বায়ুনা-ইব-অভ্রমণ্ডলম্', যার দ্বারা এই বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে বায়ুর দ্বারা মেঘমণ্ডলীর মতো। বাতাস যেমন মেঘমণ্ডলীকে এধারে-ওধারে ছড়িয়ে দেয় তেমনি অবিদ্যা এই জগৎকে নানা বৈচিত্রের মধ্যে দিয়ে এধারে-ওধারে ছড়িয়ে দেয়। আমাদের অন্তর্জগৎকেও তাই করে। এমন চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয় যে তাকে গুটিয়ে আনা সুদুষ্কর বলে মনে হয়। অর্জুন তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, 'তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্' (গী, ৬।৩৪)।

তন্মনঃশোধনং কার্যং প্রযত্নেন মুমুক্ষুণা।
বিশুদ্ধে সতি চৈতস্মিন্ মুক্তিঃ করফলায়তে ॥১৮১

অন্বয় : মুমুক্ষুণা (মুক্তিকামীর দ্বারা) প্রযত্নেন (বিশেষ যত্নের সঙ্গে) তৎ-মনঃ-শোধনং (সেই মলিন মনের শোধন করা) কার্যম্ (কর্তব্য) চ এতস্মিন্ বিশুদ্ধে সতি (এই মন বিশুদ্ধ হলে) মুক্তিঃ (মুক্তি) করফলায়তে (করতলগত ফলের মতো আয়ত্তে আসে)।

সরলার্থ : যিনি মুক্তিকামী তাঁর পক্ষে সর্বাগ্রে মলিন মনের শোধনের জন্যে যত্ন করা কর্তব্য। মন বিশুদ্ধ হলে, অর্থাৎ মন থেকে রাগদ্বেষাদি দোষ চলে গেলে মুক্তি করতলগত ফলের মতো অতি সহজে আয়ত্তে আসে।

ব্যাখ্যা : যাঁরা মুক্তি কামনা করেন, তাঁদের আগে এই মলিন মনকে শোধন করতে হবে। মুক্তি মানে জন্মমৃত্যুর এই যে চক্র, এর থেকে মুক্তি। আমরা বারবার জন্মাচ্ছি আর মরছি, এই আসা-যাওয়া থেকে মুক্তি। হিন্দুধর্মে মুক্তির কথা বারে বারে বলা হচ্ছে। আমরা মুক্তি বলতে বুঝি অবিদ্যা থেকে মুক্তি, অজ্ঞান থেকে মুক্তি। অজ্ঞানের জন্যে বা অবিদ্যার জন্যে আমাদের এত সব বাসনা। সব সময় চাই আর চাই। যেটা পেলাম সেটাতে সন্তুষ্ট নই আরও চাই। এই বাসনাই মনের মলিনতা, কালিমা। কালিমার আচ্ছাদনে অবিদ্যা আমাদের ঢেকে রেখেছে। আমরা যা কিছু জপ-তপ করছি সব এই অবিদ্যা বা চিত্তের কালিমা দূর করার জন্যে, চিত্তশুদ্ধির জন্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, দীঘি আছে, টলটলে জল, কিন্তু শেওলা পড়ে আছে—শেওলাটা অবিদ্যা, এটা চলে গেলেই কাকচক্ষু জল। আমাদের ধর্ম, কর্ম, সাধনা সব এই অবিদ্যা দূর করার জন্যে। চিত্তশুদ্ধির জন্যে। কিন্তু সবাই তো মুক্তি চান না। অনেকে এই জন্মমৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকতেই ভালোবাসেন। এই জন্মে যা ভোগ করা হলো না আসছে জন্মে তা যেন পাই, এরকম কথাও অনেকে ভাবেন। এ মায়ার জন্যে হয়। এই মায়া আমাদের বেঁধে রেখেছে, আমরা স্বাধীন নই। কিন্তু যে বিচারশীল সে এই মায়ার বন্ধন কাটিয়ে মুক্তি পেতে চায়। সে তখন কি করবে ? না, 'তন্মনঃ শোধনং কার্যং প্রযত্নেন মুমুক্ষুণা'। 'প্রযত্নেন', যত্নের সঙ্গে চেষ্টা করবে 'তন্মনঃ শোধনং'। আমি মনুষ্যজন্ম পেয়েছি, এ তো ভাগ্য। 'মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষুত্বং, মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ'—এ ভাগ্যের কথা। মানুষ হয়ে জন্মেছি, তার সঙ্গে মুক্তির ইচ্ছা আর সৎগুরু-সংসর্গ যদি হয় তো সেটা মহাভাগ্য। আমি তো কীটপতঙ্গ হয়েও জন্মাতে পারতাম। আমরা বিশ্বাস করি কর্মফল অনুসারে আমরা ইতরপ্রাণী হয়েও জন্মাতে পারি, গাছ-পালা হয়েও জন্মাতে পারি। তাহলে কিন্তু হবে না। কিছু করতে পারা যাবে না। মানুষ হয়ে জন্মালে তবে ভালোমন্দ বিচার করতে পারব, কি করব আর করব না সেটা ঠিক করতে পারব। কীটপতঙ্গ তা পারে না। মানুষ শ্রেয় আর প্রেয়র মধ্যে শ্রেয়কে বেছে নিতে পারে। একটা জিনিস আপাতমধুর কিন্তু আমার পক্ষে কল্যাণকর নয়, সেটা হচ্ছে প্রেয়। সেটা আমি বর্জন করব। আর শ্রেয়, যেটা আপাতমধুর নয় কিন্তু আমার পক্ষে কল্যাণকর, সেটা আমি গ্রহণ করব। এই

বিচার মানুষই করতে পারে, ইতরপ্রাণী এসব পারে না। সেইজন্যে এই মনুষ্যত্ব চাই। বিচার করে আমি যেটা শ্রেয় সেটা জেনে নেবো। আমি শাস্ত্রবাক্য শুনব, গুরুবাক্য শুনব, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করব। এই সব করে আমার চিত্তশুদ্ধি ঘটবে। যদি, 'বিশুদ্ধে সতি চৈতস্মিন্'—চিত্ত যদি শুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? 'মুক্তিঃ করফলায়তে'—মুক্তি হাতের মুঠির মধ্যে এসে যাবে। জ্ঞান আমাদের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু চাপা রয়েছে। সেই জন্যে সত্যি যে মুমুক্ষু, সে কি করবে? সে চেষ্টা করবে 'প্রযত্নেন তন্মনঃ-শোধনং'। তার মানে মুক্তির জন্যে চিত্তশুদ্ধি সবার আগে করতে হবে। পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে চিত্তশুদ্ধি, এখানে বলছেন, 'মনঃশোধনং' অর্থাৎ মনের ওপর যে অবিদ্যার আবরণ আছে সেটা সবার আগে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। হিন্দুর কয়েকটা মূল ধারণা আছে। আমরা হিন্দুরা মনে করি এই মুক্তি বা জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। এ কেউ ঘটাতে পারে না, চিত্তশুদ্ধি হলে জ্ঞান বা মুক্তি আপনি হয়। জ্ঞান ভেতরে আছে, অথচ আমরা জানছি না কেন ? কারণ ঐ অবিদ্যা বা অজ্ঞান, যার জন্যে নিজেকে চিনি না, জানি না। এই অজ্ঞানই পাপ। পাপ বলে আর কিছু নেই। নিজেকে জানি না, তাই আমাদের এত বাসনা, এত বন্ধন, যার জন্যে আমরা দুঃখ পাই। জ্ঞান হলে দুঃখ চলে যাবে। জ্ঞান যেন খড়গ। মা কালীর হাতে আমরা যে খড়গ দেখি, তা হচ্ছে জ্ঞান-খড়গ। জ্ঞান-খড়গ দিয়ে মা সব বন্ধন কেটে দিচ্ছেন। বন্ধন মানে কর্মজনিত বন্ধন। ভালো কাজেও বন্ধন, মন্দ কাজেও বন্ধন। সেই জন্যে কাজ করতে হবে নিষ্কাম ভাবে, ঈশ্বরার্থে, লোককল্যাণের জন্যে, নিজের জন্যে নয়। স্বামীজী বলছেন, 'তুমি মায়ের জন্যে বলিপ্রদত্ত।' মা মানে জগজ্জননী; মা কালী মানে এই জগৎ। ব্রহ্ম—নির্গুণ, নিরাকার, কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম মানে এই জগৎ—কীট, পতঙ্গ, মানুষ, দেবতা, গাছপালা সব এই জগৎ। তাকে মা বলা হচ্ছে। এই মায়ের জন্যে অর্থাৎ 'বহুজনহিতায়' যদি কাজ করি তাহলে চিত্তশুদ্ধি হবে। চিত্তশুদ্ধি হলে অজ্ঞানের আবরণ দূর হবে, জ্ঞান হবে, মুক্তি হবে। তাই বলছেন ঃ চিত্তশুদ্ধি হলে 'মুক্তিঃ করফলায়তে'—মুক্তি করতলগত হয়। হস্তামলকবৎ। একটা আমলকী আমার হাতের ভেতর আছে, কেউ দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি। তাই সবাই 'নেই' বললেও আমি সেটা মানব না। এরকম নিশ্চিত প্রত্যয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

মোক্ষৈকসক্ত্যা বিষয়েষু রাগং নির্মূল্য সংন্যস্য চ সর্বকর্ম।
সচ্ছ্রদ্ধয়া যঃ শ্রবণাদিনিষ্ঠো রজঃস্বভাবং স ধুনোতি বুদ্ধেঃ ॥১৮২

অন্বয় : যঃ (যিনি) মোক্ষ-এক-সক্ত্যা (মোক্ষের প্রতি একান্তভাবে অনুরক্ত হয়ে) বিষয়েষু (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়ে) রাগং (আসক্তি) নির্মূল্য (মূল থেকে বিনষ্ট করে) চ (এবং) সর্বকর্ম (সকল সকাম কর্ম) সংন্যস্য (ত্যাগ করে) সৎ-শ্রদ্ধয়া (সৎ-

স্বরূপ ব্রহ্মে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে) শ্রবণাদি-নিষ্ঠঃ (শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনে নিষ্ঠাসম্পন্ন) [হন] সঃ (তিনি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) রজঃস্বভাবং (বহির্মুখী বৃত্তিকে) ধুনোতি (নাশ করে ফেলেন)।

সরলার্থ : যিনি মোক্ষের প্রতি একান্ত অনুরাগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয়ের আসক্তি নির্মূল করেছেন ও সর্বপ্রকারের সকাম কর্ম ত্যাগ করে সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মে শ্রদ্ধা স্থাপন করে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে নিষ্ঠাবান হয়েছেন, তিনি বুদ্ধির রজোগুণ-জনিত বহির্মুখী বৃত্তি নাশ করে ফেলেন।

ব্যাখ্যা : আমাদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ আছে। সত্ত্ব নিয়ে সমস্যা নেই। যদি সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হয় তাহলে ত্যাগ, বৈরাগ্য এ সমস্ত গুণ আসবে। তখন শ্রেয় যেটা সেটাই বেছে নিতে চেষ্টা করব। কিন্তু রজঃ যদি থাকে, তাহলে তা আমাদের বহির্মুখী করবে। সেটা থাকলে কি করব? সেই কথাই বলা হচ্ছে। বলছেন—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোল, ভালো দিয়ে মন্দটাকে দূর করো। অনেকে আছেন যাঁরা খারাপ কথা বলেন আবার দুঃখ করেন, কি করি মুখ দিয়ে কেন যে এত খারাপ কথা বেরোয়? এর উত্তর হচ্ছে খারাপ কথা মনে থাকলেই মুখ দিয়ে বেরোবে। আর যদি সব সময় ভালো চিন্তা হয় তাহলে মনেও খারাপ কথা আসবে না। মুখ দিয়েও বেরোবে না। রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে কোথায় কত ময়লা পড়ে আছে সে সব দেখার কি দরকার? ভালো জিনিসটা দেখার চেষ্টা করতে পারি। আমাদের সাধকরা কেমন বলছেন, ভগবান ! চোখ কিসের জন্যে? তোমার রূপ দেখব বলে। কান কিসের জন্যে? তোমার গুণগান শুনব বলে। জিহ্বা কিসের জন্যে? তোমার জয়গান করব বলে। হাত-পা কিসের জন্যে? তোমার সেবা করব বলে। ভালো দেখতে দেখতে ভালোর চিন্তা করতে করতে লোকে ভালো হয়ে যায়। আর মন্দ দেখে সেই চিন্তায় মন্দ হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, আমি যদি পেঁয়াজ খাই তো মুখে পেঁয়াজের গন্ধ হবে। এই যে রজোগুণের বহির্মুখী ভাব তাকে কি করে বশে আনব? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মোড় ফিরিয়ে দাও। তোমার বাইরের দিকে ঝোঁক আছে, সেটা অন্য দিকে ফেরাও। 'মৌক্ষৈকসক্ত্যাঃ', 'সক্তি' মানে আসক্তি। এই যে আমরা শুধু চাই আর চাই, এই হলো আসক্তি। কিন্তু যদি মোক্ষে আমার 'আসক্তি' হয়—একনিষ্ঠ হয়ে যদি মোক্ষ চাই, তাহলে আমার কি করা উচিত ? বলছেন, 'নির্মূল্য বিষয়েষু রাগং', বিষয়ের জন্যে যে অনুরাগ তাকে নির্মূল করব। আমরা দুঃখ পাই কেন ? বিষয় কামনার জন্যে। আমরা সব সময় চাইছি—আমরা ভিক্ষুক। এর শেষ নেই। আগুনে ঘি দিলে আগুন তো নিভে যায় না, আরও বেড়ে যায়। সেইরকম একটা বাসনা আবার আর একটা বাসনা আনে,এ বেড়েই যায়। বিচার করতে হবে। ওই শ্রেয় আর প্রেয়র বিচার—আমার পক্ষে কি কল্যাণকর সেটা

বিচার করে ঠিক করতে হবে। বলছেন, 'মৌক্ষৈকসক্ত্যা বিষয়েষু রাগং নির্মূল্য'—মোক্ষই আমার একমাত্র কাম্য, বিষয়ের প্রতি যে অত্যন্ত অনুরাগ সেটা নির্মূল করতে হবে, ওটা আমার কাম্য নয়। ঈশ্বর লাভ করব, জ্ঞান লাভ করব,আমি ভালো মানুষ হবো, এই আমার কাম্য। তার মানে এই নয় যে আমি ভালো খাব না পরব না— তা নয়, আমি সবই করব কিন্তু কোনও আসক্তি নেই। তারপর 'সংন্যস্য চ সর্বকর্ম', সব কাজে আমার সন্ন্যাস—সন্ন্যাস মানে সম্যক্ ন্যাস, সব ত্যাগ, সব কর্ম ত্যাগ। তার মানে কি আমি জড় হয়ে যাব? না, তা নয়, কর্মত্যাগ মানে সকাম কর্ম করব না। গীতায় এই নিয়ে কত আলোচনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কাজ করবে না ? কাজ না করে কি থাকতে পারা যায় ? কাজ করো, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করো, ফল তাঁকে দিয়ে দাও। নিষ্কাম কর্ম করো। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙো। হাতে তেল মেখে মানে সংসারকে অনিত্য বলে জেনে। এই হলো বৈরাগ্য। এ সংসার অনিত্য—কি রকম? যেন অভিনয় হচ্ছে—কতরকম ভূমিকা, কোনওটাই সত্যি নয়। এইটাই আমরা বুঝি না। টাকাপয়সা, মানসম্মান আজ আছে কাল হয় তো থাকবে না, রাখবার চেষ্টা করলেও না থাকতে পারে। তাই বলে কি এসব রাখব না ? তা নয়। সংসারে থাকলে অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সবকিছু ঈশ্বরকে নিবেদন করে দিতে হবে। এখানে সর্বকর্ম ত্যাগ করতে বলেছেন মানে সকাম কর্ম ত্যাগ করতে বলেছেন। ঈশ্বরার্থে কাজ মানেও নিষ্কাম কাজ, শঙ্করাচার্য বলেছেন। ত্যাগ মানে সকাম কর্ম ত্যাগ।

তারপর বলছেন, 'সৎ-শ্রদ্ধয়া'। সৎ মানে ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমাত্মা। তিনি আছেন, সব সময় আছেন—অস্ ধাতু থেকে সৎ—শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই যে সৎ তাঁর চিন্তা করতে হবে। 'শ্রবণাদি নিষ্ঠোঃ', নিষ্ঠার সঙ্গে বারবার করে শুনতে হবে। 'শ্রবণ-আদি', আদি মানে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। বারবার করে শুনছি— শুনতে ভালো লাগছে, মনন করছি, ধ্যান করছি, আরও শুনতে চাইছি। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এসব মহাবাক্য বারবার শুনতে হয়। নিষ্ঠার সঙ্গে শুনতে হয়, তারপর মনন ও নিদিধ্যাসন। বারবার শুনতে শুনতে মনে একটা দাগ পড়ে যায়। একটা পাখী শুনে শুনে সেই কথা আওড়ায়, মানুষ পারবে না? শোনার পর মনন, মানে মনের মধ্যে বারবার আলোড়ন করা আর নিদিধ্যাসন মানে ধ্যান করা। তখন 'রজঃস্বভাবং স ধুনোতি বুদ্ধেঃ'; রজঃস্বভাব তখন বুদ্ধি থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ধুয়ে যায় যেন। ধুতে গেলে ময়লা ছাড়ানোর জন্যে আনুষঙ্গিক একটা কিছু দিতে হয়—এখানে সেটা কি? মনটাকে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া—'মৌক্ষৈকসক্ত্যা'। মোক্ষের দিকে, ঈশ্বরের দিকে মনটাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই জগৎটাকে নিত্য মনে করি, তাই তার প্রতি আকর্ষণ, যদি জানি এটা অনিত্য তাহলে আর আকর্ষণ হবে না। তখন তাঁকে নিত্য বলে জেনে তাঁর প্রতি আকর্ষণ

হবে। অর্থাৎ মনটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া। এরকম যদি হয় তাহলে বুদ্ধি থেকে চিত্ত থেকে রজঃস্বভাব চলে যাবে। তাঁর ওপর, তাঁর কথায় যখন আকর্ষণ হয়েছে তখন রজঃস্বভাব আমার বুদ্ধি থেকে ধুয়ে-মুছে গেলো।

মনোময়ো নাপি ভবেৎ পরাত্মা হ্যাদ্যন্তবত্ত্বাৎ পরিণামিভাবাৎ।
দুঃখাত্মকত্বাদ্ বিষয়ত্বহেতোর্দ্রষ্টা হি দৃশ্যাত্মতয়া ন দৃষ্টঃ ॥ ১৮৩

অন্বয়: আদি-অন্তবৎ-ত্বাৎ (উৎপত্তি ও বিনাশশীল বলে) পরিণামিভাবাৎ (পরিণাম আছে বলে) দুঃখাত্মকত্বাৎ (দুঃখাত্মক বলে) বিষয়ত্বহেতোঃ (জ্ঞানের বিষয় বলে) মনোময়ঃ অপি (মনোময় কোশও) ন হি পরাত্মা ভবেৎ (কখনই পরমাত্মা হতে পারে না) দ্রষ্টা হি (দ্রষ্টা নিশ্চয়) দৃশ্যাত্মতয়া (দৃশ্যরূপে) ন দৃষ্টঃ (দৃষ্ট হন না)।

সরলার্থ: মনোময় কোশ কখনও পরমাত্মা হতে পারে না। কারণ এর উৎপত্তি আছে বিনাশ আছে, পরিণাম আছে, এ দুঃখময় ও জ্ঞানের বিষয়। যা জ্ঞানের বিষয় তা দৃশ্য বস্তু, আর যা দৃশ্য তা নিশ্চয় দ্রষ্টা হতে পারে না।

ব্যাখ্যা: এখানে মনোময় কোশের কথা বলছেন। আমরা অনেকে, খানিকটা পাশ্চাত্যের ভাবনা-চিন্তার প্রভাবেই হয়তো মনে করি, এই মনটাই আমাদের চালাচ্ছে—মনই আত্মা। তা কিন্তু নয়। এই দেহটা যেমন জড় মনটাও তেমনি জড়, তবে আরও সূক্ষ্ম; বুদ্ধিও জড় কিন্তু আরও সূক্ষ্ম। তাহলে মনের এতসব কাজ কি করে চলছে? বলছেন, জড় হলেও এই মনের পিছনে আত্মা রয়েছেন, সেই আত্মা মনের মধ্যে দিয়ে কাজ করছেন। যেন ঘরের মধ্যে একটা আলো জ্বলছে, সেই আলো জানলা দিয়ে বাইরে যাচ্ছে। এখানে বলছেন 'মনোময়ঃ ন অপি ভবেৎ পরাত্মা'—মনোময় কোশ কখনও আমাদের আত্মা হতে পারে না। কেন নয় ? সেটা পর পর বলছেন। 'হি আদ্যান্ত বত্ত্বাৎ', মনের আদি আছে অন্ত আছে। 'পরিণামিভাবাৎ', পরিণাম আছে, পরিবর্তন আছে। সুষুপ্তিতে মনটা থাকে না, মনের অন্ত বা লয় হয়। আবার জাগ্রত অবস্থায় মনটা দেখা দেয়। মন তাই 'আদি-অন্ত-বৎ'—আদি-অন্ত-যুক্ত। আবার মনের মধ্যে নানারকম পরিবর্তন দেখা যায়, মন একরকম থাকে না। দুঃখ, ভয়, সংশয়, নানারকম বাসনা—এসবের দোলায় মনটা সব সময় পালটে পালটে যাচ্ছে। কিন্তু আত্মা হচ্ছেন অবিকারী, নিত্য—তাঁর আদি বা অন্ত নেই। তাই মন আত্মা হতে পারে না। আবার 'দুঃখ-আত্মকত্বাৎ', দুঃখাত্মক বলেও মন আত্মা নয়। আত্মার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে 'আনন্দ-স্বভাব'—সৎ-চিৎ-আনন্দ—আত্মার স্বরূপ। কিন্তু মনের স্বভাব হচ্ছে দুঃখ, বাসনার জন্যে দুঃখ। তাই মনকে আত্মা বলা যাবে না। আর কি কারণ ? 'বিষয়ত্ব হেতোঃ'—জ্ঞানের বিষয় হয় বলে। মনের মধ্যে যে অনুভূতি হয়, সেগুলো আমরা জানতে

পারি, আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় সেগুলো। তাই মন আত্মা নয়। 'দ্রষ্টা হি দৃশ্যাত্মতয়া ন দৃষ্টঃ'—দ্রষ্টা কখনো দৃশ্য হতে পারে না। আত্মা দ্রষ্টা, তাঁকে কখনো দৃশ্য রূপে দেখা যায় না। মনকে জ্ঞানের বিষয় বলে জানি, তা-ই মন আত্মা নয়।

বুদ্ধির্বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সার্ধং সবৃত্তিঃ কর্তৃলক্ষণঃ।
বিজ্ঞানময়কোশঃ স্যাৎ পুংসঃ সংসারকারণম্॥ ১৮৪

অন্বয় : বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ৈঃ সার্ধং (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সহ) সবৃত্তিঃ (বৃত্তি যুক্ত) কর্তৃলক্ষণঃ ('আমি কর্তা' এই লক্ষণযুক্ত) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) বিজ্ঞানময়-কোশঃ স্যাৎ (বিজ্ঞানময়-কোশরূপে বিদ্যমান) [বিজ্ঞানময়কোশ] পুংসঃ সংসার-কারণম্ (পুরুষের জন্মমরণের সংসারের কারণ)।

সরলার্থ : বুদ্ধি পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় সহ বৃত্তি ও কর্তৃত্বের লক্ষণযুক্ত হয়ে বিজ্ঞানময়কোশ-রূপে বিদ্যমান। এই বিজ্ঞানময়কোশই পুরুষের সংসার-বন্ধনের কারণ।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'বুদ্ধিঃ-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ৈঃ সার্ধং সবৃত্তিঃ কর্তৃলক্ষণঃ বিজ্ঞানময়কোশঃ স্যাৎ'; 'সার্ধং' মানে একইসঙ্গে। 'বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ৈঃ' মানে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে। বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি একই সঙ্গে বৃত্তি ও কর্তৃত্ব লক্ষণযুক্ত হয়ে বিজ্ঞানময়কোশ হয়েছে। এই বিজ্ঞানময়কোশই 'পুংসঃ সংসারকারণম্', পুরুষের সংসারের হেতু। আগে বলেছেন, মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি একসঙ্গে মিলে মনোময়কোশ হয়েছে। তাহলে মনোময়কোশের সঙ্গে বৃত্তি ও কর্তৃত্ব লক্ষণ এই দুটো বাড়তি জিনিসের যোগ হয়ে বিজ্ঞানময়কোশ তৈরী হয়েছে। মন ও বুদ্ধি দুটোই অন্তঃকরণের দুরকমের ক্রিয়ার প্রকাশ। মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক, 'এটা করি, না ওটা করি' করছে। আর বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা, সে ভালো-মন্দ বিচার করে ঠিক করে ফেলছে, 'হ্যাঁ এটাই করব'। আমি যখন কোনও একটা কাজ করতে গিয়ে বিচার করে ঠিক করি, হ্যাঁ এটা এই ভাবেই করতে হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, তখন সেই বিশেষ ভাবটা বুদ্ধির একটা বৃত্তি হয়ে যায়। মনের সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা নেই বলে তার মধ্যে বিভিন্ন ভাবের যেসব বৃত্তির সৃষ্টি হয় সেগুলো স্থির থাকে না, একটা আর একটার সঙ্গে মিলে-মিশে যায়। সেইজন্যে একটা বিশেষ বৃত্তি অনুযায়ী মন চলতে পারে না, বুদ্ধি পারে। আর বলছেন, বিজ্ঞানময়কোশে বুদ্ধির সঙ্গে একটা কর্তৃত্বের লক্ষণ আছে। তার মানে 'আমি' করছি এই ভাবটা খুব স্পষ্ট হয়ে আছে। আমাদের যে মনোময়কোশ, তার মধ্যেও তো 'আমি-আমার' ভাব আছে, তাহলে এই ভাবটাই বিজ্ঞানময়কোশে আছে বলে বিশেষ করে উল্লেখ করা হচ্ছে কেন ? কারণ এই দুটো 'আমি' জ্ঞানের একটু তফাত আছে। বুদ্ধির মধ্যে যে 'আমি-জ্ঞান' সেটা আমার কর্মে প্রকাশ পায়, আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রকাশ হয়। আর মনের মধ্যে

যে 'আমি-আমার' ভাব সেটা একটা অনুভূতির মতো। বলছেন, এই বিজ্ঞানময়কোশই 'পুংসঃ সংসারকারণম্'। আসলে মন ও বুদ্ধি দুটোই সংসারবন্ধনের কারণ। মনের ভাবনাগুলোই বুদ্ধি যেন ঝেড়ে-বেছে কাজে লাগাবার মতো করে তোলে। মনের সঙ্গে বুদ্ধির যা তফাত মনোময় কোশের সঙ্গে বিজ্ঞানময়কোশের সেই তফাত।

অনুব্রজচ্চিৎপ্রতিবিম্বশক্তির্বিজ্ঞানসংজ্ঞঃ প্রকৃতের্বিকারঃ।
জ্ঞানক্রিয়াবানহমিত্যজস্রং দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বভিমন্যতে ভৃশম্॥ ১৮৫

অন্বয় : অনুব্রজৎ-চিৎপ্রতিবিম্ব শক্তিঃ (চিৎ শক্তির প্রতিবিম্ব যাকে অনুসরণ করে) প্রকৃতেঃ-বিকারঃ (প্রকৃতির বিকার) জ্ঞানক্রিয়াবান্ (জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন) বিজ্ঞান-সংজ্ঞঃ (বিজ্ঞান বলে কথিত) অজস্রং (সর্বদা) ভৃশম্ (সম্পূর্ণরূপে) দেহেন্দ্রিয়াদিষু (দেহে ও ইন্দ্রিয়াদিতে) 'অহম্' (আমিই এ সমস্ত) ইতি (এইরকম) অভিমন্যতে (অভিমান করে থাকে)।

সরলার্থ : চিৎশক্তির প্রতিবিম্ব নিয়ে বিদ্যমান, প্রকৃতির বিকার, জ্ঞান ও কর্ম শক্তি সম্পন্ন বিজ্ঞানময়কোশ সর্বদা, সম্পূর্ণরূপে দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ, 'আমি', এই অভিমান করে থাকে।

ব্যাখ্যা : বিজ্ঞানময়কোশ আত্মার খুব কাছাকাছি থাকে বলে আত্মার প্রতিবিম্ব তার ওপর পড়ে। তার জন্যে সে জড় হলেও তাকে চৈতন্যবান বলে মনে হয়। বলছেন, 'অনুব্রজৎ-চিৎপ্রতিবিম্বশক্তিঃ'; চিৎশক্তির প্রতিবিম্ব বিজ্ঞানময় কোশের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। বিজ্ঞান নাম-যুক্ত এই কোশ। 'বিজ্ঞানসংজ্ঞঃ প্রকৃতেঃ-বিকারঃ'—বিজ্ঞান নামের এই কোশ আসলে প্রকৃতির বিকার। 'জ্ঞানক্রিয়াবান্-অহম্-ইতি-অজস্রম্ দেহ-ইন্দ্রিয়াদিষু-অভিমন্যতে ভৃশম্', জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন, সবসময় সর্বতোভাবে দেহে ও ইন্দ্রিয়াদিতে 'আমিই এ সমস্ত' এই ভাবে অভিমান করে যে কোশ তাই বিজ্ঞানময়কোশ। বলছেন, এ 'প্রকৃতেঃ বিকারঃ', প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার বিকার। তার মানে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের সমন্বয়ে যে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলোই এই বিজ্ঞানময়কোশের উপাদান। অর্থাৎ এ জড়বস্তু। কিন্তু একে চৈতন্যময় বলে মনে হয় কারণ এর ওপর চিৎশক্তির প্রতিবিম্ব পড়েছে। আয়নায় সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়লে তার থেকেও জ্যোতির স্ফুরণ হয়, সেইরকম বুদ্ধির সব কাজেই চৈতন্যের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে এ জ্ঞান লাভ করতে পারে, কর্মেন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে কাজ করতে পারে। দেহে ও ইন্দ্রিয় ইত্যাদিতে এর সবসময় খুব দৃঢ় একটা 'আমি'-বুদ্ধি আছে। বলছেন 'দেহেন্দ্রিয়াদিষু-অভিমন্যতে ভৃশম্'; 'ভৃশম্' মানে খুব বেশী। 'দেহ-ইন্দ্রিয়-আদিষু' বলছেন। 'আদি' শব্দটা দিয়ে প্রাণ ও মনকেও

বোঝাচ্ছেন। বুদ্ধি—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন—এইসবের সাহায্যেই জ্ঞান অর্জন করে আর কাজ করে এবং তার সবসময় এই বস্তুগুলোতে খুব দৃঢ় আমিত্বের অভিমান থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানময়কোশ আসলে জড়। এ যে জ্ঞান লাভ করতে পারে তার কারণ হচ্ছে চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব এর সঙ্গে থাকে।

অনাদিকালোঽয়মহংস্বভাবো জীবঃ সমস্তব্যবহারবোঢ়া।
করোতি কর্মাণ্যপি পূর্ববাসনঃ পুণ্যান্যপুণ্যানি চ তৎফলানি॥ ১৮৬
ভুঙ্‌ক্তে বিচিত্রাস্বপি যোনিষু ব্রজন্নায়াতি নির্যাত্যধ ঊর্ধ্বমেষঃ।
অস্যৈব বিজ্ঞানময়স্য জাগ্রতস্বপ্নাদ্যবস্থাঃ সুখদুঃখভোগঃ॥ ১৮৭

অন্বয় : অয়ম্ (এই) অহং-স্বভাবঃ (আমি-জ্ঞান যার স্বভাব [সেই বিজ্ঞানময়কোশ] অনাদিকালঃ (অনাদি কাল) জীবঃ (জীব [বলে কথিত]) সমস্তব্যবহারবোঢ়া (লৌকিক ও বৈদিক সকল কর্মের নির্বাহকর্তা) পূর্ববাসনঃ (পূর্ব-পূর্ব বাসনা অনুযায়ী) পুণ্যানি-অপুণ্যানি কর্মাণি অপি (সব পুণ্য ও পাপ কর্ম) করোতি (করে) চ তৎফলানি ভুঙ্‌ক্তে (সেইসব কর্মের ফল ভোগ করে) এষঃ (এ) বিচিত্রাসু-অপি যোনিষু (বিভিন্ন বিচিত্র যোনিতে) ব্রজন্ (ভ্রমণ করে) ঊর্ধ্বম্ আয়াতি (ঊর্ধ্বদেশে যায়) অধঃ নির্যাতি (নিম্নদেশে পতিত হয়) অস্য বিজ্ঞানময়স্য এব (এই বিজ্ঞানময়কোশরূপী জীবেরই) জাগ্রত-স্বপ্নাদি-অবস্থাঃ (জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থা প্রাপ্তি) সুখদুঃখভোগঃ (সুখ-দুঃখের ভোগ হয়)।

সরলার্থ : অনাদিকাল থেকে এই 'অহং স্বভাব' বিশিষ্ট বিজ্ঞানময়কোশরূপ জীব সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক কর্মের নির্বাহক ও কর্তা। পূর্ব-পূর্ব বাসনা অনুযায়ী এ সৎ ও অসৎ কর্মের অনুষ্ঠান করে আর তার সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করে। এ বিচিত্র সব যোনিতে জন্মগ্রহণ করে কখনও ঊর্ধ্বগতি বা কখনও অধোগতি প্রাপ্ত হয়। জাগ্রত-স্বপ্নাদি অবস্থার অনুভব ও সুখদুঃখাদির ভোগ এই বিজ্ঞানময়কোশরূপী জীবেরই হয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অনাদিকালঃ-অয়ম্-অহংস্বভাবঃ জীবঃ'; 'অয়ম্' বলতে বিজ্ঞানময়কোশকে বোঝাচ্ছেন। এই বিজ্ঞানময়কোশরূপ জীব, এ অহংভাব যুক্ত আর অনাদিকাল ধরে এ আছে। কিন্তু আগে একে 'প্রকৃতেঃ বিকারঃ' বলেছেন, অর্থাৎ জড় বলেছেন। একটা জড় পদার্থ অনাদিকাল ধরে থাকে কি করে ? বলা হয় যে, মহাপ্রলয়ের সময় বিজ্ঞান বীজাকারে থাকে। বুদ্ধি পূর্ব-পূর্ব জন্মের সংস্কারগুলো তার কেন্দ্রে ধরে রাখে। এ যদি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যেত তাহলে এর আবার নতুন করে সৃষ্টি সম্ভব হতো না। তাই একে অনাদি বলা হচ্ছে। 'অহংস্বভাবঃ', এই জীব বা বুদ্ধি, এর ওপর চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পড়েছে, এ কিন্তু দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সেইগুলোকেই 'আমি' বলে ভাবছে। আর এই আমি জ্ঞান নিয়ে এ জাগতিক সব

কাজকর্ম করে যাচ্ছে। 'সমস্তব্যবহারবোঢ়া'; সবকিছু লৌকিক আর শ্রুতি বিহিত কর্ম এ 'আমি কর্তা' এই ভাব নিয়ে করে যাচ্ছে। 'করোতি কর্মাণি-অপি পূর্ববাসনঃ পুণ্যানি-অপুণ্যানি চ তৎ-ফলানি ভুঙক্তে'; সে পুণ্যকর্মও করছে পাপকর্মও করছে, আর সেসব কাজের ভালোমন্দ ফল ভোগ করছে। পুণ্যকর্ম হচ্ছে যা শ্রুতি বিহিত কর্ম। আর পাপ কাজ বা অপুণ্যকর্ম হচ্ছে সেইসব কাজ যা করতে শ্রুতি নিষেধ করেছেন। এইসব কর্মের ভালোমন্দ ফলভোগ হচ্ছে 'বিচিত্রাসু-অপি-যোনিষু ব্রজন্-আয়াতি নির্যাতি-অধঃ ঊর্ধ্বম্-এষঃ', বিজ্ঞানময়কোশরূপী এই জীব বিচিত্র সব যোনিতে ভ্রমণ করে কখনও নীচে পড়ে যায় আবার কখনও উঁচুতে ওঠে। তার মানে নানা জন্মের মধ্যে দিয়ে এ যায়। 'অস্য-এব বিজ্ঞানময়স্য জাগ্রত-স্বপ্ন-আদি-অবস্থাঃ সুখদুঃখভোগঃ', এরই, এই বিজ্ঞানময় জীবেরই জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থার অনুভব হয় আর সুখ-দুঃখের ভোগ হয়।

দেহাদিনিষ্ঠাশ্রমধর্মকর্মগুণাভিমানং সততং মমেতি।
বিজ্ঞানকোশোঽয়মতিপ্রকাশঃ প্রকৃষ্টসান্নিধ্যবশাৎ পরাত্মনঃ॥
অতো ভবত্যেষ উপাধিরস্য যদাত্মধীঃ সংসরতি ভ্রমেণ॥ ১৮৮

অন্বয় : পরাত্মনঃ (পরমাত্মার) প্রকৃষ্ট সান্নিধ্যবশাৎ (অত্যন্ত নিকট সান্নিধ্যের বশে) অতিপ্রকাশঃ (অতি প্রকাশধর্মী) অয়ং বিজ্ঞানকোশঃ (এই বিজ্ঞানকোশ) দেহাদিনিষ্ঠ-আশ্রম-ধর্ম-কর্ম-গুণাভিমানং (দেহাদিতে অত্যন্ত মনোযোগ ও আশ্রমবিহিত ধর্ম-কর্ম-গুণাদিতে অভিমান) মম ইতি ('আমারই সব', এই ভাবে আচরণ) সততং (সর্বদা) [করে] অতঃ (এইজন্যে) এষঃ (এই বিজ্ঞানময় কোশ) অস্য (এই শুদ্ধ আত্মার) উপাধিঃ ভবতি (উপাধি হয়ে থাকে) ভ্রমেণ (ভ্রান্তিবশত) যৎ-আত্মধীঃ (যাতে আমিত্ব বুদ্ধি আরোপিত) [সে] সংসরতি (সংসার করে)।

সরলার্থ : পরমাত্মার একান্ত নিকট সান্নিধ্যের জন্যে বিজ্ঞানময়কোশ অত্যন্ত প্রকাশধর্মী। দেহাদিকে আশ্রয় করে এ থাকে, আর আশ্রম বিহিত ধর্ম-কর্ম গুণাদিতে 'আমারই সব' এই অভিমান নিয়ে সর্বদা আচরণ করে। এইজন্যে বিজ্ঞানময়কোশ শুদ্ধ আত্মার একটা উপাধিরূপে থাকে ও ভ্রান্তিবশত একেই 'আমি' মনে করে আত্মা সংসার করে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর চক্রে যাতায়াত করে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, এই বিজ্ঞানময়কোশ পরমাত্মার অত্যন্ত নিকট সান্নিধ্যের জন্যে প্রকাশধর্মী হলেও এর দেহাদিতে খুব নিষ্ঠা। যে সমস্ত বস্তুর সঙ্গে এর সংযোগ সেগুলো সম্বন্ধে 'এসব আমার' এই ভাব নিয়ে এ থাকে আর সেই মতো আচরণ করে। 'দেহাদিনিষ্ঠ-আশ্রম-ধর্ম-কর্ম-গুণাভিমানং সততং মম-ইতি বিজ্ঞানকোশঃ-অয়ম্-অতিপ্রকাশঃ প্রকৃষ্ট সান্নিধ্যবশাৎ পরাত্মনঃ'। 'দেহাদিনিষ্ঠ', দেহাদিতে নিষ্ঠা আছে।

দেহের সঙ্গে 'আদি' শব্দটা যোগ করেছেন ইন্দ্রিয়দের ও প্রাণকেও বোঝাবার জন্যে। 'আশ্রম-ধর্ম-কর্ম-গুণ-অভিমানং'; আশ্রম মানে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার আশ্রম। আমাদের হিন্দুপ্রথা অনুযায়ী মানুষ যে-কোন একটা আশ্রম অবলম্বন করে জীবন কাটায়। প্রতি আশ্রমেরই নির্দিষ্ট ধর্ম, কর্ম আছে। 'গুণ' হচ্ছে মানুষের যেসব সৎ বা অসৎ গুণ থাকে। দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি সৎগুণ আর লোভ, হিংসা ইত্যাদি অসৎ গুণ। এই বিজ্ঞানকোশ পরমাত্মার অত্যন্ত নিকট সান্নিধ্যের জন্যে বিশেষভাবে প্রকাশধর্মী। এর দেহাদিতে খুব নিষ্ঠা। আর আশ্রম ধর্ম কর্ম ও তার যে সব গুণ আছে তাতে খুব অভিমান অর্থাৎ 'আমি' এইসব করছি, আমার এইসব গুণ আছে এইরকম সবসময় মনে করছে আর 'এ সবই আমার' এই ভাব নিয়ে আছে ও সেইমতো ব্যবহার করছে। 'অতঃ ভবতি-এষঃ উপাধিঃ-অস্য যৎ-আত্মধীঃ সংসরতি ভ্রমেণ'; কাজেই এই বিজ্ঞানময়কোশ শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মার একটা উপাধি। 'এষঃ' বলতে বিজ্ঞানময়কোশকে বোঝাচ্ছেন। আর 'অস্য' বলে শুদ্ধ আত্মাকে বোঝাচ্ছেন। বলছেন এই উপাধিতেই ভুল করে 'আমি বুদ্ধি' করে এই আত্মা সংসার করতে থাকে। বুদ্ধি আত্মার খুব কাছাকাছি আছে তাই আত্মার প্রতিবিম্ব তার ওপর পড়েছে। আত্মা যেমন স্বয়ংপ্রকাশ বুদ্ধিও তাঁর প্রতিবিম্ব হয়ে আছে বলে স্বয়ংপ্রকাশ। কিন্তু তার অজ্ঞানটা যায় নি। এই অজ্ঞান তাকে দিয়ে ভুল করাচ্ছে। সে দেহাদিতে 'আমি বুদ্ধি' করছে আর দেহ সংক্রান্ত যা কিছু আছে 'সব আমার' এই রকম একটা ভাব নিয়ে সংসার করছে। আত্মাকে আবরণ করে উপাধি হয়ে, একটা আরোপিত বস্তু হয়ে সে যে আছে এটা সে জানছে না। আত্মার প্রতিবিম্ব নিয়ে চৈতন্যময় হয়ে আছে কিন্তু সেই চৈতন্যস্বরূপ, অসঙ্গ, নির্লিপ্ত আত্মাকে সে জানতে পারছে না। তাই সংসারে লিপ্ত হয়ে জন্মমৃত্যুর চক্রে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে।

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি স্ফুরত্যয়ং জ্যোতিঃ।
কূটস্থঃ সন্নাত্মা কর্তা ভোক্তা ভবত্যুপাধিস্থঃ॥ ১৮৯

অন্বয় : যঃ অয়ং (এই যে) বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানময়, বুদ্ধির অনুসারী) প্রাণেষু (প্রাণের নিকটস্থ সকল কর্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ে) হৃদি স্ফুরতি ([এবং] হৃদয়ে স্ফুরিত হচ্ছে) অয়ং (এই) জ্যোতিঃ (চৈতন্যের দীপ্তি) আত্মা কূটস্থঃ সন্ (কেবল, স্থির, সবকিছুর থেকে আলাদা, আত্মা নির্বিকার হয়েও) উপাধিস্থঃ (উপাধি যুক্ত হয়ে) কর্তা ভোক্তা ভবতি (কর্তা, ভোক্তা রূপে থাকেন)।

সরলার্থ : এই যে বিজ্ঞানময়কোশ এ প্রাণের নিকটবর্তী সমস্ত কর্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ে এবং হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা কূটস্থ হয়েও উপাধি যুক্ত হয়েছেন বলে কর্তা, ভোক্তা রূপে থাকেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'যঃ-অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি স্ফুরতি-অয়ং জ্যোতিঃ'; এখানে 'প্রাণেষু' বলতে বোঝাচ্ছেন কর্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলিতে; সামীপ্যে সপ্তমী হয়েছে, প্রাণেষু মানে প্রাণের কাছাকাছি বস্তুগুলোতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিতে, কারণ প্রাণের নিকটবর্তী অন্নময়কোশে ইন্দ্রিয়গুলি আছে। বলছেন, এই যে বিজ্ঞানময় এ সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ে ও হৃদয়ে স্ফুরিত হয়েছে। 'অয়ং জ্যোতিঃ কূটস্থঃ সন্-আত্মা কর্তা ভোক্তা ভবতি-উপাধিস্থঃ'। 'কূটস্থঃ', পাহাড়ের চূড়োর যে শেষ অত্যন্ত অল্প পরিসর স্থান, তাকে কূট বলে। আত্মা কূটস্থ হয়ে আছেন মানে সব কিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওই একটুখানি জায়গায় স্থির হয়ে আছেন, নির্লিপ্ত, একা, কেবল। এই জ্যোতিস্বরূপ আত্মা কূটস্থ হয়েও উপাধিগ্রস্ত হয়েছেন বলে কর্তা ও ভোক্তা হয়ে প্রকাশ হচ্ছেন। বিজ্ঞানময়কোশ আত্মার প্রতিবিম্ব। কিন্তু অজ্ঞানের জন্যে, মায়ার প্রভাবে সে জ্ঞান ও কর্মের স্পৃহা নিজের ওপর আরোপ করেছে। আর 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা' এই ভাব নিয়ে সবকিছু জানছে ও সব কাজ করছে। আত্মা যিনি কূটস্থ, নির্লিপ্ত, যাঁর চৈতন্যের দীপ্তিতে বুদ্ধি চৈতন্যময় হয়ে প্রকাশিত, তিনি এইসব উপাধি-গ্রস্ত হয়ে 'আমি কাজ করছি', 'আমি ভোগ করছি', এই ভাব নিয়ে বিজ্ঞানময়কোশে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন।

স্বয়ং পরিচ্ছেদমুপেত্য বুদ্ধেস্তাদাত্ম্যদোষেণ পরং মৃষাত্মনঃ।
সর্বাত্মকঃ সন্নপি বীক্ষতে স্বয়ং স্বতঃ পৃথক্ত্বেন মৃদো ঘটানিব॥ ১৯০

অন্বয় : স্বয়ং সর্বাত্মকঃ সন্ অপি (নিজে সর্বাত্মক হয়েও) মৃষা-আত্মনঃ (মিথ্যা আত্মস্বরূপ) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) পরিচ্ছেদম্ উপেত্য (সসীমতা গ্রহণ করে) তাদাত্ম্যদোষেণ (তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার দোষের দ্বারা) পরং (পরে) স্বয়ং (নিজে) স্বতঃ (নিজের থেকে) পৃথক্ত্বেন বীক্ষতে (পৃথকত্বের সঙ্গে সবকিছু দেখতে থাকেন) মৃদঃ (মাটি থেকে) ঘটান্-ইব (ঘটেদের যেমন) [পৃথক করে দেখা হয়]।

সরলার্থ : আত্মা স্বয়ং সর্বাত্মক। কিন্তু মিথ্যা আত্মস্বরূপ বিজ্ঞানময়কোশের সসীমতা গ্রহণ করে, তার সঙ্গে একাত্মবোধ করার দোষে পরে স্বয়ং আত্মা নিজের থেকেই সবকিছু পৃথক পৃথক ভাবে দেখতে থাকেন। যেমন মাটির তৈরী ঘটকে মাটি বলে না দেখে ঘট বলে ভাবে সাধারণ মানুষ।

ব্যাখ্যা : সাধারণ মানুষ একটা ঘট দেখে তাকে শুধু ঘট বলেই দেখে, তার উপাদান যে মাটি আর সেটা যে ঘট, কলস, কুম্ভ ইত্যাদি সব কিছুরই উপাদান এটা দেখে না। ঠিক সেইরকমই আত্মা, যিনি সর্বাত্মক তিনি বিজ্ঞানময়কোশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেকে একটা গণ্ডীর মধ্যে ফেলে দেন আর সবকিছু আলাদা-আলাদা করে দেখতে থাকেন। 'স্বয়ং পরিচ্ছেদম্-উপেত্য বুদ্ধেঃ-তাদাত্ম্যদোষেণ পরং মৃষা-আত্মনঃ', আত্মা স্বয়ং

বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে একাত্মবোধ করার দোষে দুষ্ট হন এবং মিথ্যা-আত্মস্বরূপ হয়ে 'সর্বাত্মকঃ সন্-অপি বীক্ষতে স্বয়ং স্বতঃ পৃথক্ত্বেন মৃদঃ ঘটান্-ইব'; নিজেই 'সর্বাত্মকঃ' অর্থাৎ সর্ববস্তুতে বর্তমান থেকেও সবকিছু আলাদা-আলাদা ভাবে দেখতে থাকেন; ঘটগুলোর উপাদান যে মাটি, সেটা না দেখে আলাদা ভাবে প্রত্যেকটিকে ঘট বলেই দেখতে থাকার মতো। বলছেন, বুদ্ধি তো আর আত্মা নয়, তার ওপর আত্মার প্রতিবিম্ব পড়েছে শুধু। কিন্তু আত্মা স্বয়ং যেন নিজেকে সেই বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছেন, আর তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে একটা মিথ্যা আত্মস্বরূপ হয়ে, আমি, তুমি, সে, এটা, ওটা, এইসব করে সবকিছুতে ভেদ দৃষ্টি করছেন। কিন্তু আসলে তিনি 'সর্বাত্মকঃ'—সকলের আত্মা। এই তাঁর স্বরূপ। কিন্তু মায়ার জন্যে জীবাত্মা নিজের স্বরূপ ভুলে নিজেকে দেহধারী জীব বলে মনে করে আর 'বহু' দেখে।

উপাধিসম্বন্ধবশাৎ পরাত্মা হ্যুপাধিধর্মাননুভাতি তদ্গুণঃ।
অয়োর্বিকারানবিকারিবহ্নিবৎ সদৈকরূপোঽপি পরঃ স্বভাবাৎ॥ ১৯১

অন্বয় : স্বভাবাৎ (স্বভাবতই) পরঃ (ভিন্ন) [উপাধিগুলোর থেকে] সদা একরূপঃ-অপি (সর্বদা একরূপ হয়েও) পরাত্মা হি (পরমাত্মাই) উপাধিসম্বন্ধবশাৎ (উপাধিগুলির সঙ্গে সম্বন্ধবশত) তদ্গুণঃ (তাদের গুণযুক্ত হয়ে) উপাধিধর্মান্ (উপাধির ধর্মগুলিই) অনুভাতি (প্রকাশ করেন) অবিকারি-বহ্নিবৎ (অবিকারী অগ্নি যেমন) অয়ঃ-বিকারান্ (লোহার বিকার [রূপে প্রকাশ হয়])।

সরলার্থ : উপাধিগুলির সঙ্গে সম্বন্ধবশত সর্বদা একরূপ হয়েও পরমাত্মা, নিজের স্বভাবের থেকে ভিন্ন উপাধির গুণযুক্ত হয়ে উপাধির ধর্মগুলিই প্রকাশ করেন। অবিকারী অগ্নি যেমন লৌহপিণ্ডের সংযোগে তার আকার অনুযায়ী বিকারপ্রাপ্তরূপে প্রতিভাত হয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, আগুনের মধ্যে হয়তো আমি লম্বা চেপটা গোল এইসব নানা আকারের লোহা ফেলে দিয়েছি। আগুনে তেতে সেগুলো যখন লাল হয়ে গেছে, তখন মনে হয় যেন লোহা নয়, আগুনই লম্বা চেপটা গোল এইরকম নানা আকার নিয়েছে। কিন্তু সেটা তো সত্যি নয়। অবিকারী অগ্নির কোনও রকম বিকার হয় না। তেমনি পরমাত্মাও অবিকারী, সবসময় একরকম। কিন্তু উপাধিগুলোর সঙ্গে সংযোগের ফলে তাদের আরোপিত গুণগুলিও নিজের গুণ বলে মনে করেন ও সেই গুণগুলি অনুযায়ী আচরণ করেন। 'উপাধিসম্বন্ধবশাৎ পরাত্মা হি-উপাধিধর্মান্-অনুভাতি তদ্গুণঃ'; উপাধিগুলোর সঙ্গে সম্বন্ধের বশে পরমাত্মা সেইসব গুণযুক্ত হয়ে উপাধির ধর্মগুলোই প্রকাশ করেন। 'অয়ঃ-বিকারান্-অবিকারি বহ্নিবৎ সদা-একরূপঃ-অপি

পরঃ স্বভাবাৎ'; সর্বদা একরূপ হয়েও পরমাত্মা যে এইভাবে নিজের স্বভাবের থেকে অন্যরকমভাবে প্রকাশিত হন, এ যেন অবিকারী অগ্নির সংযোগে লোহার পিণ্ডের বিকারের মতো। পরমাত্মা যিনি 'নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবঃ', তিনি উপাধির গুণগুলো নিচ্ছেন। সে গুণগুলো কি কি ? উপাধি একটা আরোপিত বস্তু, অনিত্য, মিথ্যা, পরিবর্তনশীল। নানা বিচিত্র ভাবের প্রভাবে এ মলিন, শুদ্ধ নয়। পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ, বুদ্ধ, জ্ঞানই তাঁর স্বভাব। আর উপাধি অজ্ঞান প্রসূত। উপাধির জন্যে আমাদের বন্ধন, আত্মা নিত্যমুক্ত। তবে মনে হচ্ছে বটে যে উপাধির গুণগুলো আত্মায় যুক্ত হয়েছে কিন্তু এগুলো শুধু আরোপিত হয়ে আছে, এর জন্যে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ আত্মার কোনও বিকার হয় নি। যদিও মনে হয় যে উপাধির যোগে আত্মা ওই উপাধিগুলোর ধর্ম অনুযায়ী প্রকাশিত হচ্ছেন, আসলে কিন্তু তপ্ত লোহার বিকার যেমন আগুনের বিকার নয়, তেমনি নির্বিকার আত্মারও কোনও বিকার হয়নি। তিনি 'সদা-একরূপঃ', সবসময়ে একইরূপে অবস্থান করছেন।

শিষ্য উবাচ

ভ্রমেণাপ্যন্যথা বাঽস্তু জীবভাবঃ পরাত্মনঃ।
তদুপাধেরনাদিত্বান্নানাদের্নাশ ইষ্যতে॥ ১৯২

অন্বয় : শিষ্যঃ উবাচ (শিষ্য বললেন)—পরাত্মনঃ জীবভাবঃ (শুদ্ধ আত্মার জীবভাব) ভ্রমেণ (ভ্রমের কারণে) বা (অথবা) অন্যথা-অপি (অন্য কারণেই) অস্তু (হোক) তৎ-উপাধেঃ (সেই উপাধির) অনাদিত্বাৎ (অনাদিত্ব স্বীকৃত বলে) অনাদেঃ (আদি-হীন বস্তুর) নাশঃ (বিনাশ) ন ইষ্যতে (সম্ভব হয় না)।

সরলার্থ : শিষ্য বললেন, শুদ্ধ আত্মার জীবভাব ভ্রমবশত হোক বা অন্য যে কোনও কারণে হোক না কেন তিনি যে উপাধি গ্রহণ করেন সেই অবিদ্যারূপ উপাধি অনাদি বলা হয়। আর অনাদিবস্তুর নাশ তো সম্ভব নয়।

ব্যাখ্যা : শিষ্য আগে যেসব প্রশ্ন করেছিলেন সেগুলোর উত্তর গুরু দিয়েছেন। সেই উত্তরের মধ্যে পঞ্চকোশের কথা বলা হয়েছে আর বলা হয়েছে যে এগুলো সব উপাধি, এগুলোকে আত্মার ওপর আরোপ করা হয়েছে। আবার এই সব অবিদ্যারূপ উপাধি অনাদি একথাও গুরু বলেছেন। অবিদ্যার নাশ হলে আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ হয় আর তখনই জীবের বন্ধন মুক্তি, এও গুরুই বলেছেন। এখন তাই শিষ্য প্রশ্ন করছেন, অবিদ্যারূপ উপাধি যদি অনাদি হয় তাহলে তার নাশ হবে কি করে ? অনাদিবস্তুর নাশ হওয়া তো অসম্ভব।

অতোঽস্য জীবভাবোঽপি নিত্যা ভবতি সংসৃতিঃ।
ন নিবর্তেত তন্মোক্ষঃ কথং মে শ্রীগুরো বদ॥ ১৯৩

অন্বয় : অতঃ (এই কারণে) অস্য (এই দেহাভিমানী আত্মার) জীবভাবঃ অপি (নিজেকে জীব ভাবাও) ন নিবর্তেত (নিবৃত্ত হতে পারে না) সংসৃতিঃ (সংসারে যাতায়াত) নিত্যা ভবতি (নিত্যকাল ধরে চলতে থাকে) [তাহলে] কথং (কি করে) মে (আমার) তৎ-মোক্ষঃ (সেই মুক্তি [হবে]) শ্রীগুরো বদ (হে গুরুদেব আমায় বলুন)।

সরলার্থ : উপাধি অনাদি বলে এদের নাশ হবে না আর দেহাভিমানী আত্মার জীবভাবও নিবৃত্ত হবে না। সংসারে যাতায়াত নিত্যকাল ধরে চলবে। তাহলে, হে গুরুদেব, আমার মুক্তি কি করে হবে ? সেই কথা আমাকে বলুন।

ব্যাখ্যা : আগের প্রশ্নের জের টেনে শিষ্য বলছেন, তাই যদি হয়, অনাদি উপাধির যদি নাশ না হয়, তাহলে আত্মার জীবভাবও তো কোনও দিন যাবে না আর জীবের সংসার যাতায়াতও নিত্যকাল ধরে চলবে। তাহলে তার মুক্তি কি করে হবে ? কাজেই, হে গুরুদেব, আমার নিজের মুক্তি কি করে হবে, সেইটা আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন।

শ্রীগুরুঃ উবাচ

সম্যক্ পৃষ্টং ত্বয়া বিদ্বন্ সাবধানেন তচ্ছৃণু।
প্রামাণিকী ন ভবতি ভ্রান্ত্যা মোহিতকল্পনা॥ ১৯৪

অন্বয় : শ্রীগুরুঃ উবাচ (শ্রীগুরু বললেন) বিদ্বন্ (বিদ্বান তুমি) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) সম্যক্ পৃষ্টং (খুব ভালো প্রশ্ন করা হয়েছে) ভ্রান্ত্যা (ভ্রমের দ্বারা) মোহিত-কল্পনা (মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের 'আমরা জীব' এই মিথ্যা কল্পনা) প্রামাণিকী ন ভবতি (প্রমাণসিদ্ধ নয়) তৎ সাবধানেন শৃণু (তা মন দিয়ে শোন)।

সরলার্থ : শ্রীগুরু বললেন, হে বিদ্বান, তুমি খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। ভ্রান্তির কারণে উদ্ভূত মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের 'আমি জীব' এই মিথ্যাকল্পনা প্রমাণসিদ্ধ নয়। এখন যা বলছি তা খুব মন দিয়ে শোন।

ব্যাখ্যা : শ্রীগুরু বললেন, বিদ্বান তুমি, তুমি খুবই ভালো প্রশ্ন করেছ। আসল কথা হচ্ছে ভ্রান্তির কারণে মানুষ মোহাচ্ছন্ন হয়ে 'আমি বদ্ধ জীব' এইরকম মিথ্যাকল্পনা করে, এই কল্পনা প্রমাণসিদ্ধ নয়। কথাটা তোমায় বুঝিয়ে বলছি, খুব মন দিয়ে শোন।

ভ্রান্তিং বিনা ত্বসংগস্য নিষ্ক্রিয়স্য নিরাকৃতেঃ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধো নভসো নীলতাদিবৎ॥ ১৯৫

অন্বয় : অসঙ্গস্য (সঙ্গরহিত) নিষ্ক্রিয়স্য (ক্রিয়ারহিত) নিরাকৃতেঃ (আকারশূন্য

[আত্মার]) ভ্রান্তিং বিনা (ভ্রান্তি ছাড়া) নভসঃ (আকাশের) নীলতাদিবৎ (নীলবর্ণ ইত্যাদি রূপের মতো) অর্থসম্বন্ধ (বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ) ন ঘটেত (ঘটে না)।

সরলার্থ : আকাশের নীলবর্ণ বলে ধারণা যেমন অজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনও কারণে ঘটে না, তেমনি অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার আত্মার বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধের বোধ অজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনও কারণে ঘটে না।

ব্যাখ্যা : আকাশের কোনও বর্ণ নেই। কিন্তু লোকে বলে আকাশ নীল। এটা ভুল করে বলে। তেমনি অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকৃতি আত্মার বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এইরকম ভাবাটাও ভুল। 'ভ্রান্তিং বিনা তু-অসঙ্গস্য নিষ্ক্রিয়স্য নিরাকৃতেঃ ন ঘটেত-অর্থ-সম্বন্ধঃ'—ভ্রান্তি ছাড়া অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার আত্মার কখনও বিষয়ের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ হতে পারে না। আত্মাকে অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ও নিরাকার বলছেন। শ্রুতিতে আত্মার যেমন বর্ণনা আছে তার থেকেই এই বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলছেন, 'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ' (বৃ, ৪।৩।১৫), এই পুরুষ অসঙ্গ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলছেন, 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং', তাঁকে কোনও অংশে ভাগ করা যায় না, তাঁর কোনও ক্রিয়াশক্তি থাকে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আবার বলছেন, 'অস্থূলম্ অনণুম্ অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্'(বৃ, ৩।৮।৮); অর্থাৎ তিনি নিরাকার। তিনি স্থূলও নন, অণুপ্রমাণও নন, হ্রস্বও নন, দীর্ঘও নন। তিনি সর্বত্র আছেন, সব কিছুতে আছেন তাই তাঁর কোনও আকার নেই। বলছেন, এইরকম যিনি সেই আত্মা তো কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসই নন। তিনি কোনও বিষয়ই নন তা বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হবেন কি করে ? একটা বিষয়ের সঙ্গে আর একটা বিষয়ের সম্বন্ধ হতে পারে কিন্তু যা অবিষয় তার সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ হবে কি করে ? যদি মনে করে থাক যে আত্মা বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছেন, তাহলে সেটা খুব ভুল ভেবেছ। কিরকম ভুল জান ? 'নভসো নীলতাদিবৎ'; বর্ণহীন আকাশকে যেমন নীল বলে দেখো, আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে বল—আকাশ কালো হয়ে আছে, সূর্যাস্তের রক্তিম আভা আকাশের গায়ে দেখে মনে কর আকাশ লাল হয়ে আছে। আসলে এইসব রঙ আকাশের গায়ে আরোপিত হয়ে আছে, এদের সঙ্গে আকাশের কোনও সম্বন্ধ নেই। তেমনি আত্মা অসঙ্গ, তাঁর সঙ্গে কোনও বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ থাকতে পারে না। সম্বন্ধ আছে বলে যদি মনে কর তাহলে জেনো সেটা তোমার ভ্রান্তি।

স্বস্য দ্রষ্টুর্নির্গুণস্যাক্রিয়স্য প্রত্যগ্‌বোধানন্দরূপস্য বুদ্ধেঃ।
ভ্রান্ত্যা প্রাপ্তো জীবভাবো ন সত্যো মোহাপায়ে নাস্ত্যবস্তুস্বভাবাৎ॥ ১৯৬

অন্বয় : দ্রষ্টুঃ (দ্রষ্টা) নির্গুণস্য (নির্গুণ) অক্রিয়স্য (ক্রিয়ারহিত) প্রত্যগ্-বোধ-আনন্দ রূপস্য (প্রত্যেকের অন্তরে বোধ ও আনন্দরূপে অবস্থিত) স্বস্য (আত্মার) জীবভাবঃ (জীবভাব) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) ভ্রান্ত্যা প্রাপ্তঃ (ভ্রান্তির কারণে প্রাপ্ত) ন সত্যঃ (সত্য নয়) অবস্তু-স্বভাবাৎ (সত্যবস্তু নয় বলে) মোহ-অপায় (মোহ অপসৃত হলে) ন অস্তি (থাকে না)।

সরলার্থ : দ্রষ্টা, নির্গুণ, অক্রিয়, প্রত্যেকের অন্তরে বোধ ও আনন্দ রূপে বিরাজমান আত্মার জীবভাব বুদ্ধির বিভ্রান্তির কারণে আসে। এ সত্য নয়। এই অজ্ঞান অবস্তু বলে, অজ্ঞানজনিত মোহ সরে গেলেই এই জীবভাব আর থাকে না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, বুদ্ধির বিভ্রান্তির জন্যে আত্মায় মিথ্যা জীবভাব আরোপিত হয়। 'স্বস্য দ্রষ্টুঃ-নির্গুণস্য-অক্রিয়স্য প্রত্যগ্-বোধ-আনন্দরূপস্য বুদ্ধেঃ ভ্রান্ত্যা প্রাপ্তঃ জীবভাবঃ'; যিনি দ্রষ্টা, সাক্ষীস্বরূপ হয়ে আছেন, নির্গুণ, অক্রিয়, প্রত্যেকের অন্তরে বোধরূপে, আনন্দরূপে বিরাজ করছেন, তাঁর জীবভাব কি করে আসে ? বুদ্ধির বিভ্রান্তির কারণে। জীবের দোষগুণ আছে, কাজ ছাড়া সে থাকতে পারে না। আত্মা ঠিক তার বিপরীত। তাহলে সকলের অন্তরে যিনি বোধরূপে, আনন্দরূপে অবস্থান করছেন সেই আত্মা নিজেকে জীব ভাবছেন কি করে ? বলছেন, বুদ্ধি অজ্ঞানের জন্যে গুলিয়ে গেছে, সে তাই ভুল করে আত্মার ওপর উপাধিরূপে জীবের দোষগুণ সব চাপিয়েছে। এগুলো সত্য নয়, আরোপিত বস্তু, মিথ্যা। কিন্তু মায়ার প্রভাবে আত্মা যেন মোহগ্রস্ত হয়ে নিজেকে জীব ভাবছেন। 'মোহ-অপায়ে নাস্তি-অবস্তু স্বভাবাৎ'; এই জীবভাবটা অবস্তু, মিথ্যা, তাই এর স্বভাবই হচ্ছে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। অজ্ঞানজনিত মোহ অপসারিত হলেই এ আর থাকে না। উপাধিতে আত্মবুদ্ধি এসেছিল অজ্ঞানের জন্যে। জ্ঞান হলেই অজ্ঞান চলে যায়। তখন আর উপাধির কোনও বাস্তব সত্তা থাকে না।

যাবদ্‌ভ্রান্তিস্তাবদেবাস্য সত্তা মিথ্যাজ্ঞানোজ্জৃম্ভিতস্য প্রমাদাৎ।
রজ্জ্বাং সর্পো ভ্রান্তিকালীন এব ভ্রান্তের্নাশে নৈব সর্পোঽপি তদ্বৎ॥১৯৭

অন্বয় : প্রমাদাৎ (প্রমাদ বশতঃ) মিথ্যাজ্ঞান-উজ্জৃম্ভিতস্য (মিথ্যাজ্ঞান থেকে উৎপন্ন) অস্য (জীবভাবের) সত্তা (অস্তিত্ব) যাবৎ(যতক্ষণ) ভ্রান্তিঃ-তাবৎ-এব (ভ্রান্তি ততক্ষণই) রজ্জ্বাং (রজ্জুতে) সর্পঃ (সর্পজ্ঞান) ভ্রান্তিকালীনঃ এব (ভ্রান্তির সময়েই থাকে) ভ্রান্তেঃ নাশে (ভ্রান্তির নাশ হলে) সর্পঃ অপি (সর্পও) ন এব (থাকে না) তৎ-বৎ (সেইরকম)।

সরলার্থ : বিচারের অভাবজনিত ভ্রম থেকে উৎপন্ন মিথ্যাজ্ঞানের সৃষ্টি জীবভাব। এর অস্তিত্ব ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ এই ভ্রান্তি থাকে। রজ্জুতে সর্পের মিথ্যাজ্ঞান ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ দড়িটাকে সাপ বলে মনে হচ্ছে। এই ভুলটা ভেঙে গেলেই দড়িটাকে দড়িই মনে হয় সাপ আর মনে হয় না। সেইরকমই অজ্ঞান চলে গেলে আমাদের জীবভাবও আর থাকে না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, কোন্‌টা আত্মা আর কোন্‌গুলো অনাত্মা এই বিচারে আমাদের একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। তাই দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি নিয়ে তৈরী একটা ব্যক্তিসত্তাকে ভাবছি আমি জীব। 'যাবদ্‌ভ্রান্তিঃ-তাবদ্-এব-অস্য সত্তা মিথ্যাজ্ঞান-উজ্জৃম্ভিতস্য প্রমাদাৎ'; ঠিক ঠিক বিচারের অভাবে একটা 'প্রমাদাৎ' অর্থাৎ বিরাট একটা ভুল থেকে যে মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে তারই সৃষ্টি এই জীবভাব আর এর অস্তিত্ব ততক্ষণই যতক্ষণ এই ভুলটা আছে। এখানে 'অস্য' বলতে বোঝাচ্ছেন জীবভাবের। তারপর রজ্জুসর্পের উদাহরণ দিচ্ছেন। বলছেন, 'রজ্জ্বাং সর্পঃ ভ্রান্তিকালীন এব ভ্রান্তেঃ নাশে ন-এব সর্পঃ-অপি তদ্বৎ'; রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, ভ্রান্তি যতক্ষণ আছে ততক্ষণই আছে, ভ্রান্তি চলে গেলে সাপটাও মিলিয়ে যায়। দড়িটা পড়ে আছে, ভেবেছি সাপ। ভীষণ ভয় পেয়েছি। সাপের জ্ঞানটা মিথ্যা হলেও যতক্ষণ আমি দড়িটাকে সাপ বলে ভাবছি ততক্ষণ সত্যিই সেটা আমার কাছে সাপ। কিন্তু যখন দড়িটাকে দড়ি বলেই চিনছি তখন আর সাপ নেই। সেইরকমই আমরা নিজের স্বরূপ ভুলে জীবরূপী এই দেহ-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে যে ব্যক্তিসত্তা তাকেই 'আমি' ভাবছি। বলছেন, তোমার এই জীবরূপের অস্তিত্ব ততক্ষণই যতক্ষণ তোমার অজ্ঞান আছে। অজ্ঞানের জন্যে দেহ-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধিগুলোকেই 'আমি' ভাবছি, অধিষ্ঠান যিনি সেই আত্মাকে চিনছি না। শাস্ত্র পড়ে, গুরুর উপদেশ শুনে যখন জানতে পারব যে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব সৎ-চিৎ-আনন্দ আমার স্বরূপ, সেই মুহূর্তে ওই উপাধিগুলো তাদের বাস্তব সত্তা হারিয়ে ফেলবে। সেগুলো দড়ির ওপর মিথ্যা সাপের কল্পনার মতো মিলিয়ে যাবে।

অনাদিত্বমবিদ্যায়াঃ কার্যস্যাপি তথেষ্যতে।
উৎপন্নায়াং তু বিদ্যায়ামাবিদ্যকমনাদ্যপি। ১৯৮
প্রবোধে স্বপ্নবৎ সর্বং সহমূলং বিনশ্যতি।
অনাদ্যপীদং নো নিত্যং প্রাগভাব ইব স্ফুটম্।। ১৯৯

অন্বয় : অবিদ্যায়াঃ (অবিদ্যার) তথা কার্যস্য অপি (আর তার কাজেরও) অনাদিত্বম্ (অনাদিত্ব) ইষ্যতে (স্বীকৃত হয়ে থাকে) তু বিদ্যায়াম্ উৎপন্নায়াম্ (কিন্তু বিদ্যা উৎপন্ন হলে) সর্বং আবিদ্যকম্ (অবিদ্যার কার্য, অন্তঃকরণ ও জগৎ) অনাদি অপি (অনাদি হলেও) প্রবোধে (জেগে উঠলে) স্বপ্নবৎ (স্বপ্নের মতো) সহমূলং (মূল অবিদ্যার সঙ্গে) বিনশ্যতি (নাশ পায়) ইদম্ (অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন) অনাদি-অপি (অনাদি হলেও) প্রাগভাবঃ ইব (প্রাগভাবের মতো) নো নিত্যম্ (নিত্য নয়) [এটা] স্ফুটম্ (স্পষ্ট উপলব্ধি হয়)।

সরলার্থ : অবিদ্যা আর অবিদ্যার কাজ এই সংসার এ দুটোই অনাদি বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হলে অবিদ্যার কাজ এই অন্তঃকরণ ও জগৎ, অনাদি হওয়া সত্ত্বেও, তাদের মূল অবিদ্যার সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। জেগে উঠলে স্বপ্ন যেমন আর থাকে না সেই রকম এগুলোও আর থাকে না। অবিদ্যার থেকে উৎপন্ন এই জগৎ অনাদি হলেও প্রাগভাবের মতো নাশশীল, নিত্য নয়। এটা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, অবিদ্যা বা মায়া এবং তার কার্য এই যে জগৎ-সংসার—এ যে অনাদি এটা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু এ-ও সত্যি যে ব্রহ্মজ্ঞান হলে এ সমস্তর নাশ হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের এটাই অভিজ্ঞতা। এখানে এই অবিদ্যার নাশ কি করে হয় তার যুক্তিটা দিচ্ছেন। বলছেন, 'অনাদিত্বম্-অবিদ্যায়াঃ কার্যস্য-অপি তথা-ইষ্যতে'; অবিদ্যা আর অবিদ্যার কার্যের অনাদিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। 'উৎপন্নায়াং তু বিদ্যায়াম্-আবিদ্যকম্-অনাদি-অপি প্রবোধে স্বপ্নবৎ সর্বং সহমূলং বিনশ্যতি'; কিন্তু বিদ্যা উৎপন্ন হলে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হলে, 'আবিদ্যকম্' মানে অবিদ্যার কাজ অন্তঃকরণ ও জগৎ, 'অনাদি অপি' অনাদি হলেও, 'বিনশ্যতি', নষ্ট হয়ে যায়। কিভাবে নষ্ট হয় ? 'প্রবোধে স্বপ্নবৎ', জেগে উঠলে যেমন স্বপ্ন মিলিয়ে যায় সেইরকম ভাবে এগুলো সব মিলিয়ে যায়। বলছেন, 'সহমূলং বিনশ্যতি', এই অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ সৃষ্টির মূল যে অবিদ্যা সেই মূলসুদ্ধ এরা বিনষ্ট হয়ে যায়। 'অনাদি-অপি-ইদম্ নো নিত্যম্ প্রাগভাব ইব স্ফুটম্'; যদিও এইসব দৃশ্যবস্তু অনাদি কিন্তু এগুলো নিত্য নয় 'প্রাগভাব'-এর মতো এদের নাশ হয়। উৎপত্তির আগে পর্যন্ত কোন জিনিসের যে-অভাব তাকে বলে 'প্রাগভাব'—প্রাক্-অভাব। 'প্রাক্' মানে পূর্বে, অর্থাৎ উৎপত্তির আগে একটা জিনিসের অভাব ছিল। এটা ন্যায়শাস্ত্রের শব্দ। প্রাক্-অভাব অনাদি, কিন্তু সান্ত। উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিসটার অভাব শেষ হয়। তাই 'প্রাগভাবে'র আদি নেই কিন্তু অন্ত আছে। এই রকমই বিদ্যার অভাব যে অবিদ্যা সেটা অনাদি হলেও বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়ে যায়। জ্ঞান হলে আর অজ্ঞান থাকে না। আলো এলে অন্ধকার আর থাকতে পারে না।

অনাদেরপি বিধ্বংসঃ প্রাগভাবস্য বীক্ষিতঃ।
যদ্‌বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ পরিকল্পিতমাত্মনি।। ২০০
জীবত্বং তু ততোঽন্যস্তু স্বরূপেণ বিলক্ষণঃ।
সম্বন্ধস্ত্বাত্মনো বুদ্ধ্যা মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ।। ২০১

অন্বয় : অনাদেঃ প্রাগভাবস্য অপি (অনাদি প্রাগভাবেরও) বিধ্বংসঃ (বিনাশ) বীক্ষিতঃ (দেখা যায়) বুদ্ধি-উপাধি-সম্বন্ধাৎ (বুদ্ধিরূপ উপাধির সঙ্গে সংযোগ থেকে) যৎ আত্মনি (যা আত্মায়) পরিকল্পিতং (পরিকল্পিত হয়) [তা] তু জীবত্বম্ (নিশ্চয় জীবভাব) তু (কিন্তু) অন্যঃ (শুদ্ধ আত্মা) স্বরূপেণ (নিজের স্বরূপে) ততঃ বিলক্ষণঃ (জীব থেকে

আলাদা) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির সঙ্গে) আত্মনঃ (আত্মার) সম্বন্ধঃ (সম্বন্ধ) মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ (মিথ্যাজ্ঞান থেকে উৎপন্ন)।

সরলার্থ : প্রাগভাব অনাদি হলেও তার বিনাশ দেখা যায়। কাজেই বুদ্ধিরূপ উপাধির সঙ্গে সংযোগ থেকে আত্মার মধ্যে যে জীবভাবের প্রকাশ হয় সেটা কল্পিত। আত্মা স্বরূপে জীবের থেকে আলাদা। বুদ্ধির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ মিথ্যাজ্ঞান থেকে উৎপন্ন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, বুদ্ধির সঙ্গে সংযোগের ফলেই আত্মার মধ্যে জীবভাব লক্ষ্য করা যায়। এটা কিন্তু একটা কল্পনা। কারণ বুদ্ধি একটা উপাধি, এ আত্মার ওপর আরোপিত হয়েছে, আত্মা অধিষ্ঠান। বুদ্ধির গুণগুলো আত্মার মনে করলে দড়িতে সাপের কল্পনার মতো হবে। সাপের সঙ্গে দড়ির সম্বন্ধটা যেমন একটা মিথ্যা সর্পজ্ঞান থেকে হয়েছিল বুদ্ধির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধটাও তেমনি, একটা মিথ্যাজ্ঞান প্রসূত। বলছেন, 'যদ্ বুদ্ধি-উপাধি-সম্বন্ধাৎ পরিকল্পিতম্-আত্মনি জীবত্বং তু'; বুদ্ধিরূপ উপাধির থেকে যা আত্মায় কল্পনারূপে আরোপিত তা নিশ্চয় জীবভাব। 'ততঃ-অন্যঃ-তু স্বরূপেণ বিলক্ষণঃ'; 'ততঃ' মানে তার থেকে অর্থাৎ এই উপাধির থেকে, 'অন্যঃ' অর্থাৎ আত্মা 'স্বরূপেণ বিলক্ষণঃ', স্বরূপত এই উপাধির গুণযুক্ত জীবের থেকে আলাদা। 'সম্বন্ধঃ-তু-আত্মনঃ বুদ্ধ্যা মিথ্যাজ্ঞান পুরঃ-সরঃ'; বুদ্ধির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ একটা মিথ্যাজ্ঞান প্রসূত। এই যে উপাধির গুণগুলো আত্মার ওপর আরোপিত হয়েছে বলে আত্মাকে জীবভাবগ্রস্ত ভাবা এটা ভুল। কারণ এই গুণগুলো আত্মার ওপর পরিকল্পিত হয়েছে। একটা দড়িকে অন্ধকারে ভুল করে যখন সাপ ভাবি তখন সাপের কল্পনাটা দড়ির ওপর আরোপ করি। এই মিথ্যা সাপের ধারণাটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ দড়িটা আমার কাছে একটা সাপ। কিন্তু দড়ি অধিষ্ঠান, সে সবসময় দড়িই আছে। তেমনি উপাধির সঙ্গে সম্বন্ধের ফলে উপাধির জীবভাব আত্মার বলে মনে হচ্ছে কিন্তু জীবের থেকে আত্মা চিরকালই 'বিলক্ষণঃ', আলাদা। আত্মা নিত্য জ্ঞানস্বরূপ, নিত্য আনন্দস্বরূপ। জীব নশ্বর, অজ্ঞান বা অবিদ্যাই তার সত্তা। এই সত্তার নাশ হলেই অর্থাৎ উপাধির নাশ হলেই আত্মা তাঁর নিজের স্বরূপে দীপ্যমান হয়ে ওঠেন। বলছেন, অবিদ্যার সৃষ্টি এই উপাধি অনাদি হলেও তার নাশ সম্ভব। কারণ 'অনাদেঃ-অপি বিধ্বংসঃ প্রাগভাবস্য বীক্ষিতঃ', অনাদি প্রাগভাবেরও বিনাশ দেখা যায়। জ্ঞানের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের অভাব যে অজ্ঞান সেটার নাশ হয়। তেমনি মিথ্যাজ্ঞান থেকে বুদ্ধির সঙ্গে আত্মার যে সম্বন্ধ হয়েছিল সেটা প্রকৃত স্বরূপজ্ঞান হলেই চলে যায়। আত্মজ্ঞান হলে উপাধির আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না।

বিনিবৃত্তির্ভবেৎ তস্য সম্যগ্‌জ্ঞানেন নান্যথা।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানং শ্রুতের্মতম্ ॥২০২

অন্বয় : সম্যক্-জ্ঞানেন (পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা) তস্য (সেই অজ্ঞানের) বিনিবৃত্তিঃ (নিবৃত্তি) ভবেৎ (হবে) ন অন্যথা (এর আর অন্যথা নেই) ব্রহ্ম-আত্মা-একত্ব বিজ্ঞানম্ (ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান) সম্যক্-জ্ঞানম্ (যথার্থ জ্ঞান) শ্রুতেঃ মতম্ (শ্রুতির এই মত)।

সরলার্থ : পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে, এর কোনও অন্যথা নেই। আমার আত্মাই ব্রহ্ম, এই জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান, শ্রুতি একথা বলেছেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'বিনিবৃত্তিঃ ভবেৎ', বিশেষভাবে দূর হয়ে যাবে, তোমার অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়ে যাবে। কি করে? 'সম্যক্ জ্ঞানেন'—পূর্ণ জ্ঞানের সাহায্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, আলো এলে অন্ধকার একটু একটু করে চলে যায় না, একেবারে চলে যায়। জ্ঞান হলে, একটু অজ্ঞান রইল, একটু জ্ঞান হলো এরকম হয় না। পরিপূর্ণ জ্ঞান, অজ্ঞান আর নেই। বলছেন, 'বিনিবৃত্তিঃ ভবেৎ তস্য সম্যক্ জ্ঞানেন ন অন্যথা'—'বি' মানে বিশেষভাবে পরিপূর্ণভাবে, 'নিবৃত্তি' পরিপূর্ণভাবে হবে; 'সম্যক্ জ্ঞানেন', পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা, 'ন অন্যথা', এর আর অন্যথা নেই। কিন্তু কিসের নিবৃত্তি হবে? বলছেন,'বিনিবৃত্তিঃ-ভবেৎ তস্য'; 'তস্য'—সেইটার; সেটা কি ? না অজ্ঞান। আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি এগুলো সব উপাধি, এগুলোকে নিয়ে আমাদের যে ব্যক্তিসত্তা সেটাকে 'আমি' মনে করছি। যা অনিত্য তা নিত্য মনে করে আসক্ত হয়ে আছি। এই আসক্তির নিবৃত্তি হবে, দেহে আত্মবুদ্ধি চলে যাবে, অজ্ঞান দূর হবে। তখন কি হবে? 'ব্রহ্ম-আত্মা-একত্ব-বিজ্ঞানং'—আমিই ব্রহ্ম, তিনি আমি এক, এই জ্ঞান হবে। বলছেন, এই বিজ্ঞান, এই যে বিশেষ জ্ঞান একেই পূর্ণজ্ঞান, সম্যক্ জ্ঞান বলা হয়। কে বলছে একথা ? 'শ্রুতেঃ মতম্'—শ্রুতি এই কথা বলছেন।

তদাত্মানাত্মনোঃ সম্যগ্‌বিবেকেনৈব সিদ্ধ্যতি।
ততো বিবেকঃ কর্তব্যঃ প্রত্যগাত্মসদাত্মনোঃ ॥২০৩

অন্বয় : তদা (অতএব) আত্মা-অনাত্মনোঃ (আত্মা, অনাত্মা, অর্থাৎ সৎ, অসৎ-এর জ্ঞান) সম্যক্- বিবেকেন-এব (যথাযথ বিচারের দ্বারাই) সিদ্ধ্যতি (নিষ্পন্ন হয়) ততঃ (সেইজন্যে) প্রত্যক্-আত্ম-সৎ-আত্মনোঃ (প্রত্যগাত্মা ও সৎ-স্বরূপ পরমাত্মা যিনি তাঁর) বিবেকঃ কর্তব্যঃ (বিচার করণীয়)।

সরলার্থ : আত্মা-অনাত্মা বা সৎ-অসৎ-এর জ্ঞান, সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারাই স্পষ্ট হয়। তাই প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মার যথার্থ ধারণার জন্যে বিচার করা কর্তব্য।

ব্যাখ্যা : বলছেন, তুমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞানই তো জ্ঞান, তোমায় বিবেকবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে এই জ্ঞানটা দৃঢ় করতে হবে। বারবার বিচার করতে হবে, ভুল হয়ে যাবে আবার ঠিক করতে হবে। 'তদা-আত্মা- অনাত্মনোঃ সম্যক্ বিবেকেনৈব সিদ্ধ্যতি'। আমার স্বরূপটা কি, এই চিন্তা করতে হবে। 'তদা', অতএব আমি সব সময় 'আত্মা-অনাত্মনোঃ', সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য, আত্মা-অনাত্মার বিচার করব। এই বিচার করে আমাদের কি লাভ হবে? নিজের আত্মাই যে সব, এটা বুঝতে পারব। এ সংসারে নিত্য ও অনিত্য মিশে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : যেন দুধ আর জল, চিনি আর বালি মিশে আছে। কোন্‌টা নিত্য আর কোন্‌টা অনিত্য এটা আমরা বিচার করি না, কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র বলছেন, তুমি বিচার কর, সৎ-অসৎ-এর বিচার কর। 'সৎ' মানে যা ত্রিকাল-অবাধিত, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ তিন কালেই আছে। এরকম জিনিস আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু একজন আছেন— তিনি ঈশ্বর, পরমাত্মা, ব্রহ্ম। তাই বলছেন, 'ততঃ বিবেকঃ কর্তব্যঃ প্রত্যগাত্মসদাত্মনোঃ'। এই যে আমি নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করছি এই আমিটা 'প্রত্যগাত্মা'। একে 'সদাত্মনোঃ'—সকলের আত্মা যিনি, সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে এক বলে বুঝতে হবে। এইটা তুমি বিচার করে বোঝ। প্রত্যগাত্মা হচেছ জীব। সদাত্মা হচেছন ব্রহ্ম। দুই-ই যে এক, এটা বুঝতে হবে। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত আত্মাই আমার স্বরূপ, এইভাবে চিন্তা করতে হয়, এই বিচার করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় যেটা কাঁচা আমি সেটাই আবার পাকা আমি। বেদান্ত, প্রথমে ব্রহ্ম সত্যং জগৎ-মিথ্যা বলে জগৎটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন, তারপর আবার বলছেন, জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ, ব্রহ্ম ছাড়া কোনও বস্তু নেই, সবই ব্রহ্ম। বেদান্তের মূল তত্ত্বকথা হচ্ছে, তুমি নিজেকে অসহায় ভেবো না, অক্ষম ভেবো না, ছোট ভেবো না, তুমি স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর মানে ব্যক্তি-ঈশ্বর নন। সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী নির্গুণ নিরাকার নিরুপাধিক পরমাত্মা, ব্রহ্ম।

জলং পঙ্কবদত্যন্তং পঙ্কাপায়ে জলং স্ফুটম্।
যথা ভাতি তথাত্মাপি দোষাভাবে স্ফুটপ্রভঃ ॥২০৪

অন্বয় : অত্যন্তং (অত্যন্ত) পঙ্কবৎ (পাঁকযুক্ত) জলং (জল) পঙ্ক-অপায়ে (পাঁক সরালে) যথা (যেমন) স্ফুটং ভাতি (স্বচ্ছ নির্মল রূপে প্রকাশ পায়) তথা (সেইরকম) আত্মা অপি (আত্মাও) দোষ-অভাবে (অজ্ঞানরূপ দোষ মুক্ত হলে) স্ফুটপ্রভঃ (স্ব-স্বরূপে উদ্ভাসিত হন)।

সরলার্থ : অত্যন্ত পঙ্কযুক্ত জল যেমন পঙ্ক অপসারণ করলে স্বচ্ছ নির্মল রূপে প্রকাশ পায় সেইরকম আত্মাও অজ্ঞানরূপ দোষের নিরাকরণ হলে স্ব-স্বরূপে ভাস্বর হন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, জীবাত্মা যদি উপাধিমুক্ত হয় তাহলে সে পরমাত্মার সঙ্গে এক, তখন সে সত্য, নিত্য, কিন্তু তার আগে অনিত্য জীব হিসাবে মিথ্যা। যেমন 'জলং পঙ্কবৎ অত্যন্তং', জলে যখন অত্যন্ত পাঁক জমে তখন 'পঙ্ক-অপায়ে জলম্ স্ফুটম্', পাঁকটাকে সরালেই নির্মল জল ফুটে ওঠে। সেই কাজটাই করতে হবে। পাঁকটাকে সরাও, তাহলেই স্বচ্ছ পরিষ্কার জল দেখা যাবে। 'তথা আত্মা-অপি দোষ-অভাবে স্ফুটপ্রভঃ'; পাঁক সরালে যেমন পরিষ্কার জল দেখা যায় তেমনি দোষগুলো অর্থাৎ উপাধিগুলো সরালে আত্মা স্ব-স্বরূপে ফুটে উঠবেন। এই যে আত্মার ওপর আরোপ করেছি এত সব উপাধি, এগুলো দোষ, এদের নেতি নেতি করে ত্যাগ করলে আত্মা ফুটে উঠবেন। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, এঁরই প্রভাবে আমি সব কিছু করছি। মন কাজ করছে, বুদ্ধি কাজ করছে, আমি কথা বলছি, হাত-পা নাড়াচ্ছি, সবই এঁর প্রভাবে হচ্ছে। ইনি স্বয়ংপ্রকাশ, এঁকে প্রকাশ করার জন্যে অন্য কিছুর দরকার নেই। একটা আলোকে প্রকাশ করার জন্যে যেমন অন্য আর একটা আলো লাগে না সেইরকম। উপাধিরূপ দোষগুলো আত্মার ওপর চাপিয়েছি, অজ্ঞান দিয়ে তাঁকে ঢেকে ফেলেছি, পঙ্কিল করেছি। পাঁকটাকে ফেলে দিতে হবে তাহলেই তিনি স্বমহিমায় নির্মল চিদাত্মা রূপে উদ্ভাসিত হবেন।

অসন্নিবৃত্তৌ তু সদাত্মনা স্ফুটং প্রতীতিরেতস্য ভবেৎ প্রতীচঃ।
ততো নিরাসঃ করণীয় এব সদাত্মনঃ সাধ্বহমাদিবস্তুনঃ ॥২০৫

অন্বয় : অসৎ নিবৃত্তৌ (মিথ্যা উপাধিসমূহের নিরসন হলে) তু (অবশ্যই) এতস্য (এই) প্রতীচঃ (প্রত্যগাত্মার বা চিদাত্মার) সদাত্মনা (সৎস্বরূপ শুদ্ধ আত্মার সঙ্গে)স্ফুটম্ (প্রকাশ) প্রতীতিঃ ভবেৎ (নিশ্চিত প্রত্যয়ে অনুভব হবে) ততঃ (সেইজন্যে) সদাত্মনঃ (সৎস্বরূপ আত্মা থেকে) অহম্-আদি-বস্তুনঃ (অহঙ্কার ইত্যাদি বস্তুর) সাধু (সম্পূর্ণভাবে) নিরাসঃ (নিরসন) এব করণীয় (অবশ্য কর্তব্য)।

সরলার্থ : মিথ্যা উপাধিগুলি সরিয়ে ফেলতে পারলে জীবাত্মার বা চিদাত্মার সৎস্বরূপ শুদ্ধ আত্মার সঙ্গে একত্র প্রকাশ নিশ্চিত প্রত্যয়ে অনুভব হবে। সেইজন্যে সৎস্বরূপ আত্মা থেকে অহঙ্কার ইত্যাদি বস্তুর সম্পূর্ণ রূপে নিরসন একান্ত কর্তব্য।

ব্যাখ্যা : উপাধিগুলি সরাতে পারলেই যদি আত্মা ফুটে ওঠেন তাহলে আমাদের কর্তব্য কি? যা অসৎ তার নিবৃত্তি। বলছেন, 'অসৎ-নিবৃত্তৌ', অসৎ বস্তু যা তা সরাতে পারলে, 'এতস্য প্রতীচঃ সদাত্মনা স্ফুটম্'; এই যে আমার প্রত্যগাত্মা বা চিদাত্মা, এ সৎস্বরূপ আত্মার সঙ্গে ফুটে উঠবে। 'তু প্রতীতিঃ ভবেৎ'; নিশ্চিত প্রত্যয় হবে, এই একত্বের স্পষ্ট অনুভব হবে। কাজেই যা অসৎ সেগুলো দূর কর।

এ যদি পার, অনিত্য বস্তু যদি সরাও তাহলে যে নিত্যবস্তুর আশ্রয়ে উপাধিগুলি আছে, সেই আত্মা, চিদাত্মায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবেন। কি করে অনিত্যবস্তু, উপাধিগুলো সরাব? জ্ঞান দিয়ে। জ্ঞান তো আলোর মতো। দড়িটাকে দড়ি বলে চিনতে পারছি আলো এলে, সাপের ভ্রমটা চলে যায় আলো এলে। সেইরকম জ্ঞানের দ্বারা অনিত্যবস্তু উপাধিগুলো মিথ্যা বলে জানলে, 'প্রতীতিঃ ভবেৎ এতস্য প্রতীচঃ সদাত্মনা'; তখন স্পষ্টভাবে দেখতে পাব, যাকে জীব ভেবেছিলাম সেটা আমার আত্মা। 'ততঃ নিরাসঃ করণীয়'; 'নিরাসঃ' মানে সরিয়ে দেওয়া, যা হোক করে উপাধিগুলো সরিয়ে দেওয়া, এইটাই করতে হবে, এটাই করণীয়। করলে কি হবে ? 'সদাত্মনঃ সাধু-অহম্-আদি-বস্তুনঃ'; আমার যে কাঁচা আমি আছে—আমি এত বড় বংশের ছেলে, আমি এত সব করেছি, এইসব ভাবগুলো যদি বিচারের দ্বারা সরিয়ে দিতে পারি, 'অহম্-আদি-বস্তুনঃ', অহংভাব, কাঁচা আমি, এগুলো যদি,'সাধু'—সম্যক্ রূপে, সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কার করতে পারি, 'সদাত্মনঃ', আমার সৎস্বরূপ আত্মা থেকে, তাহলে আমার সেই আত্মাই চিদাত্মায় ফুটে উঠবেন। এইটাই করণীয়। কাজটা আর কিছু নয়। আয়নাটায় ময়লা রয়েছে সেটা পরিষ্কার করা, জলের মধ্যে পাঁক রয়েছে সেটা সরিয়ে দেওয়া, যে অজ্ঞতা রয়েছে সেটা দূর করা। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বলে জ্ঞান আমাদের ভেতরেই আছে। কতগুলো বাধা, প্রতিবন্ধক আছে, সেগুলো সরিয়ে দিলেই জ্ঞান আপনি ফুটে উঠবে।

অতো নায়ং পরাত্মা স্যাদ্ বিজ্ঞানময়শব্দভাক্।
বিকারিত্বাজ্জড়ত্বাচ্চ পরিচ্ছিন্নত্বহেতুতঃ।
দৃশ্যত্বাদ্ব্যভিচারিত্বান্নানিত্যো নিত্য ইষ্যতে॥২০৬

অন্বয় : অতঃ (পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে) অয়ং বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ (এই বিজ্ঞানময় শব্দ যুক্ত বস্তু) পরাত্মা (পরমাত্মা) ন স্যাৎ (হতে পারে না) বিকারিত্বাৎ (বিকারশীল বলে) জড়ত্বাৎ (জড়ত্বের জন্যে) পরিচ্ছিন্নত্ব-হেতুতঃ (সীমাবদ্ধতার কারণে) দৃশ্যত্বাৎ (দৃশ্য বলে) ব্যভিচারিত্বাৎ (পরিবর্তনশীল বলে) অনিত্যঃ (অনিত্য বস্তু) নিত্যঃ (নিত্য বস্তু) ন ইষ্যতে (হতে পারে না)।

সরলার্থ : আগে পরমাত্মার সম্বন্ধে যেসব আলোচনা হয়েছে সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী বিজ্ঞানময় শব্দযুক্ত বস্তু বা বিজ্ঞানময়কোশ কখনও পরমাত্মা হতে পারে না। কারণ এই বিজ্ঞানময়কোশ বিকারশীল, জড়, একটা পরিধির মধ্যে আবদ্ধ, দৃশ্যবস্তু ও পরিবর্তনশীল। কাজেই এই অনিত্য বস্তু কখনও নিত্য বস্তু পরমাত্মা হতে পারে না।

ব্যাখ্যা : এখানে বিজ্ঞানময়কোশের কথা বলছেন। এই বিজ্ঞানময়কোশ আমাদের বুদ্ধি, এর খুব প্রয়োজন আছে। বেদান্তে পঞ্চকোশের কথা বলা হয়। অন্নময়কোশ, প্রাণময়কোশ, মনোময়কোশ, বিজ্ঞানময়কোশ, আনন্দময়কোশ। এ সবগুলোরই প্রয়োজন আছে। অন্নময়কোশ মানে দেহ। এই দেহ না থাকলে দেহাতীত হবার চেষ্টাই করতে পারতাম না। এই কোশগুলো সব উপাধি, অনিত্য, কিন্তু আমাদের সব উপাধিগুলোরই প্রয়োজন আছে। দেহ না থাকলে আমরা এগোতেই পারতাম না। এই যে মনুষ্যত্ব, এ তো দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এগুলি নিয়ে; এগুলি সব অস্ত্র, এদের দিয়েই অবিদ্যাকে মারতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, একটা কাঁটা ফুটেছে, আর একটা কাঁটা দিয়ে সেটা তুলে দুটোই ফেলে দাও। এখানে বলছেন, 'অতঃ ন অয়ং পরাত্মা স্যাৎ বিজ্ঞানময়শব্দভাক্'—এই বিজ্ঞানময় শব্দযুক্ত বস্তু অর্থাৎ বিজ্ঞানময়কোশ পরাত্মা নয়, পরমাত্মা নয়। কেন সেটা পরমাত্মা নয় বলছেন? 'বিকারিত্বাৎ জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্ব-হেতুতঃ'—বিকারযুক্ত বলে, জড় বলে, পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ বলে। 'বিকারযুক্ত' কারণ আমাদের মনে কাম, ক্রোধ, সঙ্কল্প ইত্যাদি বহুরকমের বিকার এই বুদ্ধি থেকে আসে। আর সীমাবদ্ধ কারণ বুদ্ধি একটা গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না। এইসব বৈশিষ্ট্যগুলিই আত্মার বিপরীত। আত্মা অজর, অমর, অনন্ত, নিরাকার, নির্গুণ, চৈতন্যস্বরূপ। জরা নেই, মৃত্যু নেই, অন্ত নেই, আকার নেই, গুণ নেই। আত্মা কি সেটা বোঝাতে গেলে 'না' শব্দটা ব্যবহার করতে হয়। এটা নয়, এটা নয়, নেতি নেতি করে বুঝতে হয়। বুদ্ধিটা আত্মা হচ্ছে না 'দৃশ্যত্বাৎ', আমার জানার বিষয় হচ্ছে বলে। কারণ, বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করে যা ঠিক করছি সেটা আবার নিজেই জানছি, আমার জানার বিষয় হচ্ছে। আরেকটা কারণ : 'ব্যভিচারিত্বাৎ', পরিবর্তনশীল বলে, বদলে যায় বলে। বুদ্ধি একরকম থাকে না, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি পালটায়। আবার সুষুপ্তির সময় বুদ্ধির অস্তিত্বই টের পাই না, সে যেন কোথায় হারিয়ে যায়। তাই বলছেন, 'অনিত্যঃ নিত্যঃ ন ইষ্যতে', এ অনিত্য বস্তু নিত্য হতে পারে না। বুদ্ধি কখনও পরমাত্মা হতে পারে না।

আনন্দপ্রতিবিম্বচুম্বিততনুর্বৃত্তিস্তমোজৃম্ভিতা
স্যাদানন্দময়ঃ প্রিয়াদিগুণকঃ স্বেষ্টার্থলাভোদয়ঃ।
পুণ্যস্যানুভবে বিভাতি কৃতিনামানন্দরূপঃ স্বয়ং
সর্বো নন্দতি যত্র সাধু তনুভৃন্মাত্রঃ প্রযত্নং বিনা॥২০৭

অন্বয় : আনন্দপ্রতিবিম্বচুম্বিততনুঃ (আনন্দস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্বরূপ) তমোজৃম্ভিতা বৃত্তিঃ (অজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত আনন্দময় বৃত্তি) আনন্দময়ঃ স্যাৎ (আনন্দময়কোশ বলে অভিহিত) প্রিয়াদিগুণকঃ (প্রিয় প্রভৃতি গুণযুক্ত) স্ব-ইষ্টার্থ-লাভ-উদয়ঃ (বাঞ্ছিত বস্তুর লাভে উৎপন্ন) কৃতিনাম্ (কৃতী পুরুষদের) পুণ্যস্য অনুভবে (পুণ্যের অনুভবে) আনন্দরূপঃ স্বয়ং বিভাতি (আনন্দ স্বতই প্রকাশ পায়)

যত্র (যে আনন্দময়কোশে) সর্বঃ (সকল) তনুভৃৎ-মাত্রঃ (দেহধারী জীব মাত্র) প্রযত্নং বিনা (বিনা যত্নে) সাধু (সম্যগরূপে) নন্দতি (সুখ অনুভব করে)।

সরলার্থ : আনন্দময়কোশ যেন আনন্দস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্বরূপ। কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা আনন্দময় বৃত্তির প্রকাশ হচ্ছে বলে এ তমোয় আবৃত। বাঞ্ছিত বস্তু লাভের যে আনন্দ তা তিন প্রকার, প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ, এগুলি আনন্দময়কোশের অন্তর্গত। আবার পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে কৃতী পুরুষদের আত্মপ্রসাদজনিত যে আনন্দ স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত তাও আনন্দময়কোশ-ভুক্ত। দেহধারী জীবমাত্রই বিনা চেষ্টায় পর্যাপ্ত সুখ অনুভব করে কিন্তু এই সুখ অজ্ঞানমিশ্রিত বিষয়ানন্দ বলে স্থায়ী নয়।

ব্যাখ্যা : আনন্দময়কোশের কথা বলছেন। এ আত্মার খুব কাছাকাছি কিন্তু আত্মা নয়। আত্মা আনন্দস্বরূপ কি না, তাই কোন জাগতিক আনন্দও আমরা যখন পাই, তখন যেন সেই আত্মার স্পর্শ পাই, আনন্দস্বরূপ আত্মার খুব কাছে চলে যাই যেন। 'আনন্দপ্রতিবিম্বচুম্বিততনুঃ'—এই আনন্দময়কোশ, এ যেন আনন্দস্বরূপ আত্মার ছায়া-শরীর। 'বৃত্তিঃ-তমোজৃম্ভিতা'—কিন্তু অজ্ঞান রয়েছে এর পেছনে। তমোর দ্বারা, অজ্ঞানের দ্বারা এই আনন্দময় বৃত্তির প্রকাশ হয়েছে। অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছি, মন-বুদ্ধি-অহংকার সব কোথায় তলিয়ে গেছে। অন্তঃকরণ নেই তাহলে এই সুখ-অনুভবের বৃত্তি কোথা থেকে আসছে ? বেদান্ত বলছেন, আনন্দস্বরূপ আত্মার চৈতন্য প্রভায় অতিসূক্ষ্ম অজ্ঞানবৃত্তির দ্বারা এই আনন্দের অনুভব হচ্ছে। অতিসূক্ষ্ম বলছেন কেন ? কারণ সংস্কারগুলো যেন বীজাকারে অজ্ঞানের সঙ্গে মিশে আছে। 'স্যাৎ আনন্দময়ঃ'—এই হচ্ছে আনন্দময়কোশ, এতে আনন্দও আছে, অজ্ঞানও আছে। সব রকম আনন্দের অনুভূতি এই আনন্দময়কোশে হয়। 'প্রিয়াদিগুণকঃ স্ব-ইষ্ট-লাভ-উদয়ঃ'—যেটা আমার 'ইষ্ট' অর্থাৎ যে-জিনিসটা মনে মনে চাইছি, তাকে কেন্দ্র করে আমার যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দটা এই আনন্দময়কোশে হয়। এই আনন্দ তিন রকমের। ইষ্ট বস্তু দেখলে যে আনন্দ, তা হল 'প্রিয়'। সেটা পেয়ে গেলে যে আনন্দ—'মোদ'। তারপর সেই বাঞ্ছিত বস্তু যদি ভোগ করতে পারি তো আরও আনন্দ—সেটা হল 'প্রমোদ'। এই তিন প্রকার আনন্দের অনুভূতিই আনন্দময়কোশে হয়। 'পুণ্যস্য অনুভবে বিভাতি কৃতিনাম্ আনন্দরূপঃ স্বয়ং'—পুণ্যকর্ম করছি, নিজেদের কৃতীপুরুষ মনে করছি, খুব আনন্দ হচ্ছে, এই আনন্দটাও কিন্তু আনন্দময় কোশেরই প্রকাশ। জীবমাত্রই শরীর ধারণ করে নানা রকম আনন্দ পেয়ে থাকে, সেসব আনন্দের অনুভূতি এই আনন্দময়কোশেই হয়। 'সর্বঃ নন্দতি যত্র সাধু তনুভৃৎমাত্রঃ প্রযত্নং বিনা'; এই যে আনন্দময়কোশ এখানে 'তনুভৃৎ-মাত্রঃ', অর্থাৎ যে-কোনও দেহধারী জীবই 'বিনা প্রযত্নং', কোনও চেষ্টা না করেই 'সম্যক্ নন্দতি', প্রচুর আনন্দ পায়। কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত বলে এ সব আনন্দই বিষয়ানন্দ, ক্ষণিক।

আনন্দময়কোশস্য সুষুপ্তৌ স্ফূর্তিরুৎকটা।
স্বপ্নজাগরয়োরীষদিষ্টসন্দর্শনাদিনা॥ ২০৮

অন্বয় : আনন্দময়-কোশস্য (আনন্দময়কোশের) সুষুপ্তৌ (সুষুপ্তিতে) উৎকটা (অত্যন্ত বেশী) স্ফূর্তিঃ (প্রকাশ) স্বপ্নজাগরয়োঃ (স্বপ্নে ও জাগরণে) ইষ্ট-সন্দর্শনাদিনা (বাঞ্ছিত বস্তুর দর্শন ইত্যাদিতে) ঈষৎ (অল্প প্রকাশ)।

সরলার্থ : আনন্দময়কোশের সুষুপ্তিতে সর্বাধিক প্রকাশ। স্বপ্নে, জাগরণে, বাঞ্ছিত বস্তুর দর্শন ইত্যাদিতে এই প্রকাশ অল্প।

ব্যাখ্যা : বলছেন, আনন্দময়কোশের সব থেকে বেশী প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় সুষুপ্তি অবস্থায়। 'আনন্দময়কোশস্য সুষুপ্তৌ স্ফূর্তিঃ উৎকটা', যেন উৎকট আনন্দ। গভীর ঘুম, স্বপ্ন নেই, দেহ কাজ করছে না, মন কাজ করছে না, সব যেন আত্মার মধ্যে হারিয়ে গেছে, খুব আনন্দ, কিন্তু অজ্ঞান আছে তাই অচৈতন্যের মতো পড়ে আছি। আনন্দস্বরূপ আত্মার খুব কাছে অবস্থান করছি তাই এত আনন্দ, কিন্তু অবিদ্যা আছে বলে স্বরূপজ্ঞান হচ্ছে না। সমাধি আর সুষুপ্তির মধ্যে পার্থক্য এইটাই। সমাধি অবিদ্যাবর্জিত। সমাধি হলে স্বরূপজ্ঞান হয়ে যায়। আর এত আনন্দ হয় যে, জগতের কোন আনন্দের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। বলছেন : 'স্বপ্নজাগরয়োঃ-ঈষৎ-ইষ্ট-সংদর্শনাদিনা'— ঘুমের মধ্যেও আনন্দ আছে আবার জাগরণেও আনন্দ আছে। ইষ্টবস্তু যখন পাচ্ছি তখন আনন্দ, সুখস্বপ্নে আনন্দ। কিন্তু এইসব আনন্দ ঈষৎ, অল্প। সবচেয়ে বেশী আনন্দ সুষুপ্তি অবস্থায়। তবে এ আনন্দ 'তমোজৃম্ভিতা', 'তমঃ'—অজ্ঞান, অজ্ঞানের দ্বারা এর প্রকাশ। জগতে অজস্র ভোগের সামগ্রী সেসবের প্রাপ্তিতে অল্পবিস্তর আনন্দ সকলেরই হয় কিন্তু এ আনন্দ ক্ষণিক। প্রাপ্তিতে যেমন আনন্দ আছে অপ্রাপ্তিতে তেমনি দুঃখ আছে। শুধু ব্রহ্মানন্দই অবিমিশ্র আনন্দ, কোনও কম-বেশী নেই। একবার জ্ঞান হলে যে আনন্দ সে আনন্দ আর ফুরোয় না, সবসময় আছে, চিরস্থায়ী।

নৈবায়মানন্দময়ঃ পরাত্মা সোপাধিকত্বাৎ প্রকৃতের্বিকারাৎ।
কার্যত্বহেতোঃ সুকৃতক্রিয়ায়া বিকারসংঘাতসমাহিতত্বাৎ॥২০৯

অন্বয় : অয়ম্ (এই) আনন্দময়ঃ (আনন্দময়কোশ) ন এব পরাত্মা (কখনই পরমাত্মা নয়) সোপাধিকত্বাৎ (উপাধিযুক্ত বলে) প্রকৃতেঃ-বিকারাৎ (অবিদ্যাজনিত বিকারের কারণে) সুকৃতক্রিয়ায়াঃ (পুণ্যকর্মের) কার্যত্বহেতোঃ (অনুষ্ঠান-নির্ভর বলে)

বিকার-সংঘাত-সমাহিতত্বাৎ (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থার বিকার সমন্বিত বলে ও বিকারশীল অন্নময় ইত্যাদি পঞ্চকোশের অন্তঃস্থ বলে)।

সরলার্থ : আনন্দময়কোশ কখনই পরমাত্মা হতে পারে না। কারণ এ দেহাদি উপাধি-যুক্ত, অবিদ্যার জন্যে বিকারশীল, পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান-নির্ভর ও বিকারশীল পঞ্চকোশের অন্তঃস্থ আর জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার বিকারের সঙ্গে যুক্ত।

ব্যাখ্যা : বলছেন, নানা কারণে এই আনন্দময়কোশকেও পরমাত্মা বলা যাবে না। প্রথমত, 'সোপাধিকত্বাৎ'—এ উপাধি-যুক্ত, কিন্তু আত্মা নিরুপাধিক। দেহ-মন-বুদ্ধি এসব আনন্দময়কোশের উপাধি। এগুলি নিয়ে আমার একটা ব্যক্তিসত্তা আছে বলেই আমি আনন্দ পাচ্ছি। উপাধি আছে, তাই আনন্দময়কোশ আত্মা নয়। তারপরে 'প্রকৃতেঃ-বিকারাৎ'—অবিদ্যার বিকারে এই কোশের উৎপত্তি। সব কোশেরই উৎপত্তি অবিদ্যা থেকে। অবিদ্যা থেকে যা উৎপন্ন তা আত্মা হতে পারে না। 'কার্যত্বহেতোঃ সুকৃত-ক্রিয়ায়াঃ'—ভালো কাজ করলে আনন্দ হয়। সব আনন্দ তো আনন্দময় কোশেই হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে আনন্দময়কোশের অবস্থাটা পুণ্যকর্মের অনুশীলনের ওপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু আত্মা স্বাধীন, স্বতন্ত্র। তাই আনন্দময়কোশ 'আত্মা' নয়। আবার 'বিকার-সংঘাত-সমাহিতত্বাৎ'—আত্মা অবিকারী, কিন্তু আনন্দময়কোশে সব সময় নানারকম বিকার বা পরিবর্তন হচ্ছে। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে সে যাচ্ছে। তিন অবস্থাতেই নানারকম আনন্দ হচ্ছে। নানারকম পরিবর্তন হচ্ছে তার মধ্যে। আবার পাঁচটা কোশের মধ্যে সবচেয়ে ভেতরের কোশ বলে, অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি কোশের বিকারগুলোও একে প্রভাবিত করছে। দেহ, মন, বুদ্ধির অবস্থাভেদে আনন্দের ইতর-বিশেষ হচ্ছে ও আনন্দময়কোশে বিকার আসছে। বিকার-সমন্বিত বলে 'আনন্দময়কোশ' আত্মা হতে পারে না।

পঞ্চানামপি কোশানাং নিষেধে যুক্তিতঃ শ্রুতেঃ।
তন্নিষেধাবধি সাক্ষী বোধরূপোঽবশিষ্যতে॥২১০

অন্বয় : যুক্তিতঃ শ্রুতেঃ (যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণের হেতু) পঞ্চানাম্ অপি কোশানাম্ (পাঁচটি কোশই) নিষেধে (আত্মা অর্থে নিষিদ্ধ হলে) তৎ-নিষেধ-অবধি (সেই নিষেধ অর্থাৎ নেতি নেতি বিচারের অন্তে) সাক্ষী বোধরূপঃ (সাক্ষীস্বরূপ বোধস্বরূপ আত্মা) অবশিষ্যতে (অবশেষ রূপে থাকেন)।

সরলার্থ : যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণের সাহায্যে অন্নময় ইত্যাদি পঞ্চকোশই নেতি নেতি

বিচারে মিথ্যা ও অনাত্মা বলে অগ্রাহ্য হয়ে গেলে যা অবশিষ্ট থাকে তা হলো সেই সাক্ষীস্বরূপ, বোধস্বরূপ পরমাত্মা।

ব্যাখ্যা : তাহলে দেখা যাচ্ছে, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় এই পাঁচটি কোশই বাতিল হয়ে গেলো পরমাত্মা নয় বলে। এই কোশগুলো যেন আত্মার ওপরে পাঁচটা আবরণ—স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, এইভাবে চলছে। কিন্তু এই কোশগুলো যে বাতিল হয়ে গেলো সেটা কি করে হলো ?'নিষেধে যুক্তিতঃ শ্রুতেঃ', যুক্তি ও শ্রুতি এই দুয়ের সাহায্যে। যুক্তি আছে আবার শ্রুতি কেন বলছেন ? কারণ আমাদের যে জ্ঞান সে তো একদিনে একজনের চেষ্টায় হয়নি— শত শত বছর ধরে, শত শত লোকের চেষ্টায় এ জ্ঞান আহরণ করা হয়েছে। সমস্ত মানব জাতির যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তার থেকে যে জ্ঞান সেটা আমরা ত্যাগ করি কি করে ? যেসব ব্যক্তি এই জ্ঞান অর্জন করেছেন, যাঁদের চিন্তায় এই জ্ঞানের স্ফুরণ হয়েছে তাঁরা সাধারণ ব্যক্তি নন। তাঁদের অনুভূতি, তাঁদের দর্শন সত্য দর্শন। এসব এই শ্রুতিতে জমা হয়ে আছে। আমরা বলি এই বেদ বা শ্রুতি অপৌরুষেয়—অনেক পুরুষের অনেক জ্ঞান এতে সঞ্চিত হয়ে আছে, তাঁদের নাম নেই কিছু নেই, কিন্তু তাঁদের যে জ্ঞান সেটা আছে। এ যেন একটা ধারা চলছে, স্রোত চলে আসছে, একজনকে কেন্দ্র করে নয়, অনেকের অনেক অবদান নিয়ে এ চলেছে। সবাই সত্যদ্রষ্টা ঋষি, তাঁদের যে জ্ঞান তাই জমা হয়েছে। তাঁদের কিরকম দর্শন ! সবাইকে ডেকে বলছেন, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ' (শ্বে ২।৫)—অমৃতের পুত্র তোমরা শোন, দেবতারা তোমরা শোন। 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' (শ্বে ৩।৮)—আমি সেই মহান পুরুষকে জেনেছি যিনি জ্ঞানস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ, সূর্যের মতো, আদিত্যের মতো বর্ণ, সমস্ত অজ্ঞতার পারে, সমস্ত অজ্ঞানের অন্ধকার পেরিয়ে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন। 'তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' (শ্বে ৩।৮)। আর কোনও পথ নেই, তাঁকে জানলেই মৃত্যু অতিক্রম করে অমৃত লাভ করবে। তাই বলছেন,'যুক্তিতঃ শ্রুতেঃ'। শ্রুতির জ্ঞান যেমন চাই তেমনি যুক্তিও রাখতে হবে। বিচার আমি করব বই কি, বিচার করব, শ্রুতিতে যা বলেছেন সেটা মিলিয়ে দেখব। জ্ঞান যদি একজনের হতে পারে তো সবারই হতে পারে। যে পথটা শ্রুতি বলেছেন সেই পথে চললে যে ফল লাভ করার কথা সেটা সকলেরই পাবার কথা। তাই যুক্তি দিয়ে বিচার করে এগোতে হবে। এখন কোশগুলো তো নিষিদ্ধ হলো, তাহলে কি রইল? 'তৎ-নিষেধ-অবধি-সাক্ষী বোধরূপঃ অবশিষ্যতে', নিষেধ হয়ে গেলো, পঞ্চকোশকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া হলো তাহলে কি রইল? 'সাক্ষী' সেই আত্মা রইল, সব সময় তিনি রয়েছেন। প্রদীপটা সবসময় জ্বলছে।

পুজোর সময় যেমন একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয় সেইরকম আত্মদীপ সবসময় জ্বলছে। সাপটা মিথ্যে হয়ে গেলো কিন্তু দড়িটা সব সময় রয়েছে, সাপ বলে মনে হোক বা না হোক। 'সাক্ষী বোধরূপঃ অবশিষ্যতে'—আত্মার ওপর থেকে আবর্জনা, এই পঞ্চকোশ, অহংজ্ঞান ইত্যাদি সব ত্যাগ করেছি। পেঁয়াজের খোসা সব ছাড়িয়ে ফেলেছি। এবার যেখানে এসেছি সেই অবশেষে তিনি আছেন, জ্ঞানস্বরূপ, বোধস্বরূপ, সাক্ষী, তিনি আছেন, দেখছেন। আমি দেহটা নিয়ে নাচানাচি করছি, মনটা দিয়ে কত কি চিন্তা করছি, বুদ্ধিকে কত ভাবে খাটাচ্ছি,তিনি সব দেখছেন—বোধস্বরূপ,সাক্ষী, দ্রষ্টা। দেখছেন, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

যোঽয়মাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্নির্বিকারো নিরঞ্জনঃ।
সদানন্দঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মত্বেন বিপশ্চিতা ॥২১১

অন্বয় : যঃ অয়ম্-আত্মা (এই যে আত্মা) স্বয়ংজ্যোতিঃ (জ্যোতিঃস্বরূপ) পঞ্চকোশ- বিলক্ষণঃ (পঞ্চকোশ বর্জিত) অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ (তিনটি অবস্থার সাক্ষী হয়ে) নির্বিকারঃ (বিকারহীন) নিরঞ্জনঃ (নির্মল) সদানন্দঃ (আনন্দস্বরূপ [রূপে বিদ্যমান]) বিপশ্চিতা (বিদ্বান ব্যক্তির দ্বারা) সঃ (এই শুদ্ধ আত্মা) স্ব-আত্মত্বেন (নিজের আত্মা বলে) বিজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্য)।

সরলার্থ : এই যে আত্মা যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, অন্নময়াদি পঞ্চকোশ-বর্জিত, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষী হয়ে বিকারহীন, অঞ্জনহীন, আনন্দস্বরূপ রূপে বিরাজমান, তিনিই বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে নিজের আত্মা বলে জ্ঞাতব্য।

ব্যাখ্যা : আত্মার পরিচয় দিচ্ছেন। এই যে আত্মা তিনি কে? 'স্বয়ংজ্যোতিঃ',তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, নিজের আলোয় নিজে আলোকিত। 'পঞ্চকোশঃ বিলক্ষণঃ'; পঞ্চকোশ বর্জিত তিনি, এই পঞ্চকোশ তাঁর লক্ষণ নয়, পঞ্চকোশ থেকে আলাদা তিনি। 'অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্- নির্বিকারঃ', জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, আমাদের এই তিনটি অবস্থা। এই তিনটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রতিদিন যাই। তিনি এগুলির সাক্ষী হয়েও নির্বিকার হয়ে আছেন। তিনি আছেন কিন্তু তাঁর কোনও বিকার নেই। তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তিনি সব সময় সাক্ষী, চুপ করে আছেন। তিনি 'নিরঞ্জনঃ সদানন্দঃ'; তাঁর মধ্যে কোনও অঞ্জন নেই, মলিনতা নেই, কখনও ছিল না, তিনি আনন্দস্বরূপ। 'সঃ বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মত্বেন বিপশ্চিতা'; এই শুদ্ধ আত্মাই যে আমার আত্মা, সেটাই জানতে হবে। যিনি পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর পক্ষে এটাই জ্ঞাতব্য। পণ্ডিত,

বিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি তিনি কি করেন? শ্রুতির জ্ঞান ও যুক্তির সাহায্যে নেতি নেতি করে পঞ্চকোশ ইত্যাদি সব বর্জন করে এই শুদ্ধ আত্মাকে নিজের আত্মা বলে জানেন। নেতি নেতি করে শেষ পর্যন্ত যা থাকল সেই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁকে প্রকাশ করার জন্যে আর কিছু লাগে না, তিনি স্বয়ংজ্যোতি।

শিষ্য উবাচ

মিথ্যাত্বেন নিষিদ্ধেষু কোশেষ্বেতেষু পঞ্চসু।
সর্বাভাবং বিনা কিঞ্চিন্ন পশ্যাম্যত্র হে গুরো।
বিজ্ঞেয়ং কিমু বস্ত্বস্তি স্বাত্মনাত্মবিপশ্চিতা ॥ ২১২

অন্বয় : শিষ্য উবাচ (শিষ্য বললেন) হে গুরো, মিথ্যাত্বেন (হে গুরুদেব, মিথ্যা বলে) এতেষু পঞ্চসু কোশেষু (এই পাঁচটি কোশ) নিষিদ্ধেষু (নিষিদ্ধ হয়েছে বলে, নেতি নেতি বিচারে বর্জনীয় বলে) অত্র (এখানে) সর্ব-অভাবং বিনা (সবকিছুর অভাব ছাড়া) কিঞ্চিৎ (আর কিছুই) ন পশ্যামি (দেখছি না) আত্মবিপশ্চিতা (আত্মবিচারশীল ব্যক্তির দ্বারা) স্ব-আত্মনা (নিজের আত্মস্বরূপ বলে) বিজ্ঞেয়ং বস্তু (জানার মতো বস্তু) কিম্ অস্তি (কি আছে) উ (নাকি নেই)?

সরলার্থ : শিষ্য বললেন, গুরুদেব, মিথ্যা বলে পঞ্চকোশ বর্জনীয় হলে অন্তরে বাইরে সবকিছুর অভাব বা শূন্য ছাড়া আর কিছুই তো দেখছি না। আত্মবিচারশীল ব্যক্তির পক্ষে নিজের আত্মা বলে বিজ্ঞেয় হবে এমন কোন বস্তু কি আছে? নাকি কিছুই নেই?

ব্যাখ্যা : শিষ্য বলছেন ঃ নেতি নেতি করে মিথ্যা বলে সব তো তাড়িয়ে দিলাম, তাহলে রইলটা কি? তাহলে কি সব শূন্য? এই প্রশ্ন জড়বাদীর প্রশ্ন। এটা মস্ত বড় প্রশ্ন। এই নিয়ে পাশ্চাত্যে কত প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন চলে। নচিকেতাও যমকে এই প্রশ্ন করেছে—কেউ বলে মৃত্যুর পরে কিছু থাকে, কেউ বলে থাকে না। আপনি এর উত্তর জানেন, আমাকে বলুন। শিষ্যও এখানে সেই প্রশ্ন করছে, বলছে, 'মিথ্যাত্বেন নিষিদ্ধেষু কোশেষু এতেষু পঞ্চসু'; মিথ্যা বলে পাঁচটা কোশেই তো নিষেধ জারি হলো,'সর্ব-অভাবং বিনা কিঞ্চিৎ ন পশ্যামি অত্র হে গুরো'; কাজেই হে গুরুদেব, কিছু নেই, সব শূন্য, এ ছাড়া আর কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। 'বিজ্ঞেয়ম্ কিম্ উ বস্তু- অস্তি স্ব-আত্মনা-আত্মবিপশ্চিতা'; আত্মবিচার যাঁরা করেন তাঁদের পক্ষে আত্মস্বরূপ কোন্ বস্তু বিজ্ঞেয় হবে? নাকি সেরকম কিছু নেই ? কাকে জানব ? কিছুই তো নেই মনে হচ্ছে। পঞ্চকোশ অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সবই তো উড়িয়ে দিয়েছেন, কি বাকী রইল তাহলে ?

শ্রীগুরুঃ উবাচ

সত্যমুক্তং ত্বয়া বিদ্বন্ নিপুণোঽসি বিচারণে।
অহমাদিবিকারাস্তে তদভাবোঽয়মপ্যনু॥২১৩
সর্বে যেনানুভূয়ন্তে যঃ স্বয়ং নানুভূয়তে।
তমাত্মানং বেদিতারং বিদ্ধি বুদ্ধ্যা সুসূক্ষ্ময়া॥ ২১৪

অন্বয় : শ্রীগুরুঃ উবাচ (শ্রীগুরু বললেন) বিদ্বন্ ত্বয়া সত্যম্ উক্তং (হে বিদ্বান, তুমি ঠিক বলেছ) নিপুণঃ অসি বিচারণে (তুমি বিচারে খুব পটু) তে অহম্ আদি বিকারাঃ (সেইসব অহঙ্কার ইত্যাদি বিকার) তৎ অভাবঃ অপি (আবার সে সমস্তর অভাব) অয়ম্ অনু (এর পশ্চাতে) সর্বে (সব কিছু) যেন (যাঁর দ্বারা) অনুভূয়ন্তে (অনুভূত হয়) যঃ স্বয়ং (যিনি নিজে) ন অনুভূয়তে (অন্য কিছুর অনুভবের বিষয় হন না) সুসূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা (অতি সূক্ষ্ম-বুদ্ধির সহায়ে) তং বেদিতারম্ আত্মানং (সেই বেত্তা আত্মাকে) বিদ্ধি (জান)।

সরলার্থ : শ্রীগুরু বললেন—হে বিদ্বান, তুমি ঠিক বলেছ, তুমি বিচারে খুব পটু। অহঙ্কার প্রভৃতি বিকার ও সেসবের যে অভাব—এ সবের পিছনে যিনি আছেন, যাঁর সাহায্যে সব কিছু অনুভূত হয় অথচ যিনি অন্য কিছুরই অনুভবের বিষয় নন, অতি সূক্ষ্ম-বুদ্ধির সাহায্যে তুমি সেই জ্ঞাতা আত্মাকে জান।

ব্যাখ্যা : শিষ্যের প্রশ্ন শুনে গুরু খুশি হয়েছেন। বলছেন, 'সত্যম্ উক্তম্ ত্বয়া বিদ্বন্ নিপুণঃ-অসি বিচারণে'—ঠিক বলেছ, বিদ্বান তুমি, তুমি বিচার করতে খুব পটু। 'অহম্-আদি বিকারাঃ-তে তৎ-অভাবঃ অয়ম্-অপি-অনু'; অহঙ্কার ইত্যাদি সমস্ত বিকার ও সেসবের যে অভাব তার পিছনে কিছু তো আছে। তোমার যে আমি-জ্ঞান, তোমার দেহ, তোমার মন, এসব গেলে থাকল কি? 'সর্বে যেন অনুভূয়ন্তে যঃ স্বয়ং ন অনুভূয়তে'—সব কিছু যাঁর অনুভবগ্রাহ্য অথচ যিনি স্বয়ং কোনও কিছুরই অনুভবের বিষয় নন, তিনি থাকেন। যিনি সবাইকে বুঝতে পারছেন কিন্তু যাঁকে কেউ বুঝতে পারছে না, তিনিই থাকছেন। এই যে তুমি ঘুমোচ্ছ জাগছ, আমি দেহ নই মন নই এসব বলছ, এ কে বলাচ্ছে? এই যে নেই বলে জানছ, এ কে জানাচ্ছে ? এই যে তুমি এগুলি উড়িয়ে দিচ্ছ, সেটা কে দেওয়াচ্ছে ? 'তম্-আত্মানং বেদিতারং বিদ্ধি বুদ্ধ্যা সুসূক্ষ্ময়া'; সেই তিনিই 'বেদিতারং', বেত্তা, সেই আত্মাই সব কিছু জানছেন। যিনি এ সব কিছুর বেত্তা, জ্ঞাতা, তাঁকেই তুমি জান। খুব সূক্ষ্ম-বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে জানতে হবে। তিনি আছেন,তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না,কি করে দেখবে? নিজেকে দেখবে কি করে ? এই যে তুমি সব বর্জন করলে কি

করে করলে, কে বর্জন করালে ? তোমার পিছনে একজন আছেন বলেই তো পারলে। দড়িটাকে সাপ ভেবেছিলে কিন্তু দড়ি ছিল বলেই তো সর্পভ্রম হয়েছিল, মরীচিকা দেখেছিলে সেটা মরুভূমি ছিল বলেই তো দেখেছিলে। আত্মা তোমার মধ্যে আছেন, তাঁকে জান, সূক্ষ্ম-বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করে তাঁকে ধরার চেষ্টা কর। আমাদের এই যে 'আমি' সেটা নিয়ে আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে আছি। আমাদের দেহ আশ্রয় করে এই 'আমি' আমাদের প্রত্যেককে যেন আলাদা আলাদা সত্তা দিয়েছে কিন্তু আমাদের আরও একটা 'আমি' আছে, সেটা সকলের আমি। এটা আমরা বুঝতে পারি কি করে ? বুঝতে পারি সুষুপ্তি অবস্থা থেকে। জাগ্রত অবস্থায় ও স্বপ্ন অবস্থায় আমাদের যে 'আমি' আছে সেটা টের পাই কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় 'আমি'টাকে আর বুঝতে পারি না—তবু 'আমি' নিশ্চয় একটা থাকে। তা না হলে জেগে উঠি কি করে ? কি করে বলি যে, খুব ঘুমিয়েছি ? একটা 'আমি' নিশ্চয়ই ছিল, সাক্ষী হয়ে যে সব কিছু দেখছিল। এই যে আমি, ইনিই সকলের আমি, আত্মা। ইনিই 'বেদিতারং', বেত্তা। অতি সূক্ষ্ম-বুদ্ধির সাহায্যে এঁকে জানতে হবে।

তৎসাক্ষিকং ভবেৎ তত্তদ্ যদ্ যদ্ যেনানুভূয়তে।
কস্যাপ্যননুভূতার্থে সাক্ষিত্বং নোপযুজ্যতে॥ ২১৫

অন্বয়: যৎ যৎ (যা যা) যেন (যার দ্বারা) অনুভূয়তে (অনুভূত হয়) তৎ তৎ (সেই সেই বিষয়) তৎ সাক্ষিকং ভবেৎ (সেই অনুভবীকে সাক্ষিরূপে রেখে প্রকাশিত হয়) ন অনুভূত-অর্থে (অননুভূত বিষয়ে) কস্য-অপি (কারোরই) সাক্ষিত্বং (সাক্ষী ভাব) ন-উপযুজ্যতে (উপযোগী হয় না) ।

সরলার্থ: যে-যে বিষয়ের অনুভব হয়েছে সেই-সেই বিষয়ের অস্তিত্বের সাক্ষিরূপে সেই অনুভবীই বিদ্যমান থাকেন। অননুভূত বিষয়ে কারোরই সাক্ষী হওয়ার কথা ওঠে না।

ব্যাখ্যা: আত্মা যে জানার বিষয় নন, তিনিই সবকিছুর বেত্তা, সেই কথাটাই শিষ্যকে বুঝিয়ে বলছেন। 'তৎসাক্ষিকং ভবেৎ তৎ-তৎ যৎ-যৎ যেন অনুভূয়তে'; যে যে বস্তু যার দ্বারা অনুভূত হয় সেই সেই বস্তু যে আছে তার সাক্ষিস্বরূপ একজনই থাকে—যে অনুভব করেছে। যা আমি দেখছি সেটা আছে, আমি তার দ্রষ্টা, এই অনুভব আমার হচ্ছে। আর এই অনুভব হচ্ছে বলেই আমার কাছে সেই বস্তুর অস্তিত্ব আছে। আমার দেহ-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার, এই জগৎ, এগুলো আছে বলে আমিই অনুভব করছি, আবার এগুলো যে অনিত্য, মিথ্যা, সেটাও আমিই জানছি। এগুলো সব জ্ঞেয় বস্তু, দৃশ্য। আমি জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, সাক্ষী। কিন্তু এই যে সাক্ষিস্বরূপ আমি আছি, এই বোধ

আমার হচ্ছে বলেই সমস্ত বিষয় থেকে আমি আলাদা হয়ে গেছি, কিছুর সঙ্গে আর জড়িয়ে নেই। সেই বোধস্বরূপ আমার যে সত্তা, আমার আত্মা, সেটা তো আর বিষয় হতে পারে না, আমিই তো তাই। সেইজন্যে দ্রষ্টাভাবে, সাক্ষিভাবে বোধস্বরূপ আত্মাকে কি করে দেখব ? এ আমার অনুভবগম্য নয়। তাই বলছেন, 'কস্য-অপি-অন্-অনুভূত-অর্থে সাক্ষিত্বং ন উপযুজ্যতে'। যে বিষয়ের অনুভব হয় নি সেই বিষয়ে সাক্ষিভাব কারোরই থাকতে পারে না। অননুভূত বিষয়ে সাক্ষিত্ব আছে বললে সাক্ষিত্ব শব্দটার ভাবের উপযোগী কথাই হয় না। কাজেই যা আমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বলে অনুভব করতে পারি না তার সাক্ষী হিসেবে আমি আছি, এটা বলা যায় না। আত্মাকে জানতে গেলে জ্ঞেয়-জ্ঞাতা-জ্ঞান সব এক হয়ে যায়। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই সবকিছুর সাক্ষী, তাঁর সাক্ষী বলে কিছু নেই। জগৎ চলছে, কত বিচিত্র সব ঘটনা ঘটছে, জন্মমৃত্যুর প্রবাহ চলছে। সব পরিবর্তনশীল, মুহূর্তে, মুহূর্তে পালটাচ্ছে। আর এ সবকিছুর সাক্ষিরূপে একমাত্র নিত্যবস্তু যিনি আছেন তিনি আমার আত্মা। তাঁর আবার কি সাক্ষী থাকবে ? তাঁর কোনও সাক্ষী নেই। শিষ্য প্রশ্ন করেছিলেন, নেতি নেতি করে সব তো উড়িয়ে দিলেন তাহলে রইলটা কি ? এখানে উত্তর দিচ্ছেন, এই যে মিথ্যাবোধে সব উড়িয়ে দেওয়া হলো তারপরে সেই বোধস্বরূপ তিনিই শুধু রইলেন। তিনি সব অনুভবের সাক্ষী কিন্তু তিনি অনুভবের বিষয় নন। কি করে হবেন ? তিনিই তো সাক্ষী। তাঁর কোনও সাক্ষী নেই।

অসৌ স্বসাক্ষিকো ভাবো যতঃ স্বেনানুভূয়তে।
অতঃ পরং স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রত্যগাত্মা ন চেতরঃ॥ ২১৬

অন্বয়: যতঃ (যেহেতু) অসৌ (এই) স্বসাক্ষিকঃ ভাবঃ (নিজেই নিজের সাক্ষী এই ভাব) স্বেন (নিজের দ্বারা) অনুভূয়তে (অনুভূত হয়) অতঃ (অতএব) প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা) স্বয়ং (নিজেই) সাক্ষাৎ পরং (সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা) ইতরঃ চ ন (অন্য কিছুই নয়) ।

সরলার্থ: যেহেতু 'আমি নিজেই নিজের সাক্ষী' এই ভাব আমারই অনুভূতি সেই কারণে আমার যে প্রত্যগাত্মা তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা—অন্য কিছুই নন।

ব্যাখ্যা: বলছেন, আমার যে ব্যক্তিসত্তা আছে, দেহ-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি পরিচয় নিয়ে, তার তো একটা অহংবুদ্ধি আছে আর সেই অহংবুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপ যিনি আছেন তাঁকে আমরা জীবাত্মা বলি। জীবাত্মা আমার ব্যক্তিসত্তার সাক্ষিরূপে আছেন। কিন্তু জীবাত্মার সাক্ষিরূপে আর কি কিছু আছে ? তিনি নিজে ছাড়া আর কোনও সাক্ষী তাঁর আছে বলে তো অনুভব হচ্ছে না। 'অসৌ স্বসাক্ষিকঃ ভাবঃ',

আমিই আমার সাক্ষী, এই ভাব। এটা বলে কি বোঝাতে চাইছেন ? আমি কাজ করি, চিন্তা করি, সবের মধ্যেই আমার একটা অনুভূতি থাকে যে আমি এইসব করছি। আমি তো করছি কিন্তু কে করাচ্ছে ? আমার প্রত্যগাত্মা সাক্ষিরূপে আছেন, তিনি নিজে কিছু করছেন না, কিন্তু তিনি আছেন বলেই আমি এইসব করতে পারছি। কিন্তু তাঁর সাক্ষী কে ? তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ নেই। আমার আত্মা দ্রষ্টারূপে আছেন বলে আমি আছি, এই জীবজগৎ আছে দৃশ্যরূপে। কিন্তু আমি যখন নিজেকে আত্মা বলে জানছি তখন সেই আত্মভাবে আমার কি অনুভব হচ্ছে ? আমি তখন অনুভব করতে পারছি যে এই পরিবর্তনশীল জগতের আমি ছাড়া কোনও সত্তা নেই। এর অধিষ্ঠানরূপে আমিই আছি একমাত্র নিত্য পদার্থ। এই নামরূপাত্মক জগতের বৈচিত্রের মধ্যে তখন আর আমি বহু দেখছি না, এক সত্তা আমাকেই দেখছি, আমি নিজেই যেন নিজের সাক্ষিস্বরূপ হয়ে আছি। এই 'স্বসাক্ষিকঃ ভাবঃ' আমার নিজের অনুভূতি। তাই বলছেন, এই 'স্বসাক্ষিকঃ ভাবঃ যতঃ স্বেন-অনুভূয়তে', যেহেতু এই 'স্বসাক্ষিকঃ ভাবঃ' আমার নিজের দ্বারা অনুভূত 'অতঃ পরং স্বয়ং প্রত্যগাত্মা ন চেতরঃ', অতএব প্রত্যগাত্মাই স্বয়ং পরমাত্মা, অন্য কিছু নয়। আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, আমি পরব্রহ্মকে জেনেছি, আমি সকলের মধ্যে নিজেকেই দেখছি, আমিই সকলের মধ্যে অন্তঃস্থ হয়ে আছি। 'একদেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।' সেই এক যিনি সবকিছুর মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছেন আমিই তিনি। এইরকম যখন একটা অবস্থা হয়, যখন প্রত্যগাত্মা সাক্ষিরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে দেখছেন আবার অনুভব করছেন যে তিনিই এসবের সত্তারূপে আছেন অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা নিজেই নিজের সাক্ষী হয়ে আছেন, তখন তিনি সেই পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। তাই বলছেন, নিজেই নিজের সাক্ষী এই ভাব যখন নিজের অনুভূতি, তখন প্রত্যগাত্মা পরমাত্মাই, অন্য কিছু নন।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটতরং যোঽসৌ সমুজ্জৃম্ভতে
প্রত্যগ্রূপতয়া সদাহমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্নৈকধা।
নানাকারবিকারভাগিন ইমান্ পশ্যন্নহংধীমুখান্
নিত্যানন্দচিদাত্মনা স্ফুরতি তং বিদ্ধি স্বমেতং হৃদি॥২১৭

অন্বয় : যঃ-অসৌ (এই যিনি) প্রত্যগ্রূপতয়া (প্রত্যগাত্মারূপে) সদা অহম্-অহম্-ইতি (সর্বদা 'আমি-আমি' এইরূপে) ন একধা (একভাবে নয় অর্থাৎ বহুভাবে) অন্তঃস্ফুরণ্ (সর্ব অন্তরে ফুটে উঠে) জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি প্রভৃতি সকল অবস্থাতে) স্ফুটতরং (স্পষ্টরূপে) সমুজ্জৃম্ভতে (প্রকাশ পান) নানাকারবিকারভাগিনঃ (বিবিধ পরিণাম ও পরিবর্তনশীল) ইমান (এই সব) অহং-

ধী-মুখান্ (অহং, বুদ্ধি প্রভৃতিকে) পশ্যন্ (দ্রষ্টারূপে দেখে) নিত্যানন্দচিদাত্মনা (নিত্য আনন্দরূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সঙ্গে এক হয়ে) হৃদি স্ফুরতি (হৃদয়ে প্রকাশ পান) তম্ (তাঁকে) স্বম্ এতং (নিজের স্বরূপ এই বলে) বিদ্ধি (জান)।

সরলার্থ : যিনি সর্বদা 'আমি-আমি' এইরূপে অন্তঃস্থ থেকে বহু প্রকারে ফুটে উঠে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি প্রভৃতি সকল অবস্থায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পান ও বিবিধ পরিণাম ও পরিবর্তনশীল আকারে অহঙ্কার, বুদ্ধি প্রমুখ সবকিছুকে দ্রষ্টারূপে দেখে নিত্য আনন্দরূপ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মারূপে হৃদয়ে উদ্ভাসিত হন, তাঁকে নিজের স্বরূপ বলে জান।

ব্যাখ্যা : বলছেন, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি আমাদের এই তিন অবস্থায় তিনি সব সময় আছেন। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এগুলো দেহ-মনের ব্যাপার, কিন্তু আমার যে আত্মা তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—'প্রত্যগ্রূপতয়া', আমার প্রত্যগাত্মা, জীবাত্মারূপে। আসলে জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক, নাম-রূপ দিয়ে পৃথক করেছি। বলছেন, 'সদা অহম্ অহম্ ইতি অন্তঃ স্ফুরণ্ ন একধা'; আমি আমি করে বিভিন্ন উপাধির আবরণে তাঁকে ঢেকে রেখেছি, তিনি কিন্তু আছেন, 'অন্তঃ স্ফুরণ্'—এই সমস্ত নাম-রূপের অন্তঃস্থ থেকে তিনি ফুটে উঠছেন। 'ন একধা', একভাবে নয়, বহুভাবে, 'স্ফুটতরং সমুজ্জৃম্ভতে', স্পষ্টরূপে প্রকাশ হচ্ছেন। 'নানা-আকার বিকার ভাগিনঃ'; নানা আকার আবার বিকার, কত ভাবে আছেন ! আমি-আমি করে অনেক বিশেষণ বসিয়ে যাচ্ছি, আমি এই, আমি সেই, আমি এইসব করছি, কিন্তু এ সব কিছুর পরিণাম আছে, পরিবর্তন আছে। 'ইমান্ পশ্যন্ অহং-ধী-মুখান', আমার বুদ্ধিতে এইসব উপাধি যুক্ত হচ্ছে। আমি ধনী, আমি পণ্ডিত, আমি জমিদার, আমি ব্রাহ্মণ—আমার বুদ্ধিতে এসব আসছে, কিন্তু আত্মা আত্মাই, তিনি এসব কিছু নন, তিনি দ্রষ্টা হয়ে রয়েছেন। আত্মাই তো সত্যস্বরূপ,আমার বুদ্ধি আত্মার কাছে আছে বলে এসব সত্যি বলে মনে হচ্ছে। তারপর বলছেন 'নিত্যানন্দ চিদাত্মনা স্ফুরতি তং বিদ্ধি স্বম্ এতং হৃদি'; আমি কে ? আমি নিত্যানন্দ চিদাত্মা, এই আত্মা থেকেই সবকিছু 'স্ফুরতি'—প্রকাশ পাচ্ছে। 'তং বিদ্ধি', তাঁকে জান, 'স্বম্-এতং হৃদি', তুমি যে আমি-আমি করছ সেই আমিই যে সত্যিকারের আমি সেটা হৃদয়ে ফুটিয়ে তোল।

ঘটোদকে বিম্বিতমর্কবিম্বমালোক্য মূঢ় রবিমেব মন্যতে।
তথা চিদাভাসমুপাধিসংস্থং ভ্রান্ত্যাহমিত্যেব জড়োঽভিমন্যতে॥ ২১৮

অন্বয় : মূঢ়ঃ (অজ্ঞ ব্যক্তি) ঘটোদকে (ঘটের মধ্যেকার জলে) অর্কবিম্বম্ (সূর্যের ছায়া) বিম্বিতম্ (প্রতিফলিত) আলোক্য (দেখে) রবিম্ এব (সূর্যই) মন্যতে (মনে করে) তথা (সেইরকম) জড়ঃ (জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি) ভ্রান্ত্যা (ভ্রমবশত) উপাধিসংস্থং (বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধিতে প্রতিফলিত) চিদাভাসং (শুদ্ধচৈতন্যের প্রতিবিম্বকে) অহম্ এব ইতি অভিমন্যতে ('আমি এ-ই' বলে মনে করে)।

সরলার্থ : যে মূর্খ সে যেমন ঘটের জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখে সেই ছায়াকেই সূর্য বলে মনে করে সেইরকম যার স্থূলবুদ্ধি সে ভ্রমবশতঃ বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিতে শুদ্ধচৈতন্যের যে ছায়া পড়ে তাকেই 'আমি' বলে ধারণা করে।

ব্যাখ্যা : আগে বলেছেন, আত্মা থেকেই যে সবকিছু প্রকাশ পাচ্ছে এটা তুমি বোঝ। আসলে তোমার যিনি সত্যিকারের 'আমি' তাঁকে তুমি চিনছ না, উপাধির জন্যে বিকৃতরূপে দেখছ। এই কথাটাই আবার একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন। বলছেন, 'ঘটোদকে বিম্বিতম্-অর্কবিম্বম্-আলোক্য মূঢ়ঃ রবিম্-এব মন্যতে'; ঘটে জল আছে, তাতে সূর্যের ছায়া পড়েছে, 'বিম্বিতম্ অর্ক', সেই প্রতিবিম্ব-সূর্য দেখে, 'বিম্বম্-আলোক্য মূঢ়ঃ রবিম্-এব মন্যতে'—যে মূর্খ সে সূর্য ভাবছে, সূর্যের ছায়াকেই সে সূর্য মনে করছে, নির্বোধ ব্যক্তি ছায়াকে দেখে কায়া বলে ধরে নিচ্ছে। 'তথা চিৎ-আভাসম্-উপাধিসংস্থং ভ্রান্ত্যা অহম্ ইতি-এব জড়ঃ-অভিমন্যতে'; 'চিদাভাসম্', চিৎ মানে চৈতন্য তার আভাস মানে ছায়া। আমার আত্মার ছায়া পড়েছে ওই উপাধির ওপর। কোন উপাধি ? আমার মন আমার বুদ্ধি, তার ওপর আত্মার ছায়া পড়েছে; 'ভ্রান্ত্যা', ভুল করে, 'অহম্-ইতি-এব', এগুলোকেই 'আমি' মনে করছি। দেহটাকে আমি মনে করছি, মনটাকে আমি মনে করছি, বুদ্ধিকে আমি মনে করছি কিন্তু ওই আত্মাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাঁর ছায়ায়, তাঁর আলোয় দেহমন এসব দেখে এদেরই 'আমি' ভাবছি। 'জড়ঃ এব অভিমন্যতে'—জড়বুদ্ধি যার সে-ই এরকম মনে করে। জড়বুদ্ধি না হলে, মূর্খ না হলে আমি এরকম মনে করতাম না। আমার যে চৈতন্য তার ছায়া পড়ে আমাদের মন বুদ্ধি ইত্যাদি চৈতন্যময় মনে হচ্ছে; উপমা দিয়ে বলছেন, এই মনে হওয়াটা জলে প্রতিফলিত সূর্যের ছায়া দেখে তাকে সূর্য মনে করার মতো মূর্খতা। জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব সূর্যের মতো দেখায়। আমরাও জড়বুদ্ধির জন্যে দেহ-মনকে আত্মা বলে ভুল করি। কিন্তু পণ্ডিতরা কি করেন? তাঁরাও কি এরকম ভুল করেন? না। পরের কয়েকটা শ্লোকে সেটাই বলছেন।

ঘটং জলং তদ্গতমর্কবিম্বং বিহায় সর্বং বিনিরীক্ষ্যতেঽর্কঃ।
তটস্থ এতত্ত্রিতয়াবভাসকঃ স্বয়ংপ্রকাশো বিদুষা যথা তথা॥২১৯

অন্বয় : যথা (যেমন) ঘটং (ঘট) জলং (জল) তদ্গতম্ অর্কবিম্বং (তার মধ্যে

প্রতিফলিত সূর্যের প্রতিবিম্ব) সর্বং বিহায় (সবকিছু ত্যাগ করে) বিদুষা (বিদ্বান ব্যক্তির দ্বারা) এতৎ-ত্রিতয়-অবভাসকঃ (এই তিনের প্রকাশক) তটস্থঃ (উপাধি-বর্জিত) স্বয়ং প্রকাশঃ (স্ব-প্রকাশ) অর্কঃ (সূর্য) বিনিরীক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয়) তথা (সেইরকম)।

সরলার্থ : যেমন, ঘট, তার ভেতরের জল ও সেই জলে প্রতিফলিত সূর্যের প্রতিবিম্ব, এ সবকিছুকে ত্যাগ করে যিনি বিদ্বান তিনি এই তিনের প্রকাশক স্বয়ংপ্রকাশ সূর্যকে দেখেন, সেইরকম।

ব্যাখ্যা : বলছেন, যাঁরা বিদ্বান, পণ্ডিত, তাঁরা কিন্তু সূর্যের ছায়া দেখে ভোলেন না। তাঁরা এই ছায়ার প্রকাশক সূর্যকেই দেখতে পান। একটা ঘট আছে তাতে জল আছে, দিনের বেলায় তাতে সূর্যের ছায়া পড়েছে। আমাদের দেহ যেন একটা ঘট আর আমাদের যে আত্মবুদ্ধি বা বুদ্ধি সেটা যেন জল, সেই জলে আত্মার ছায়া পড়েছে। বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞানময়কোশ আত্মার তো খুব কাছাকাছি তাই বুদ্ধিতে আত্মার ছায়া পড়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বলে আমাদের মন-বুদ্ধি সব মস্তিষ্কের অন্তর্গত। মস্তিষ্কের মধ্যে সূক্ষ্ম সব স্নায়ুতন্ত্রী আছে তারা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়াযন্ত্রগুলোর সংযোগ করেছে। এদের সাহায্যে আমরা দেখতে পাই, শুনতে পাই। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলেও আমরা যখন অচৈতন্য হয়ে পড়ি তখন আর শুনতে পাই না, চোখ খোলা থাকলেও দেখতে পাই না। তাহলে চৈতন্য কি মস্তিষ্কের অন্তর্গত নয় ? বিজ্ঞান বলে তা নয় চৈতন্যও মস্তিষ্কেই আছে কিন্তু কিভাবে যে আছে সেটা এখনও বোঝা যায় নি। বেদান্ত শাস্ত্র বলেন, মন,বুদ্ধি সব জড় কিন্তু আত্মার চৈতন্যে চৈতন্যময় বলে মনে হয়। এই কথাটাই উদাহরণ দিয়ে বলছেন, 'ঘটং জলং তৎ-গতং অর্কবিম্বং'; ঘট আছে, জল আছে, তাতে অর্কের মানে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে। 'বিহায় সর্বং বিনিরীক্ষ্যতে অর্কঃ'; সবকিছুকে ত্যাগ করে সূর্যকে দেখতে হবে। সবকিছু মানে ঘট, জল ও সূর্যের প্রতিবিম্ব, এই তিনকে ত্যাগ করে এদের 'অবভাসকঃ' অর্থাৎ প্রকাশক 'তটস্থ' অর্থাৎ উপাধিবর্জিত স্বয়ংপ্রকাশ সূর্যকে দেখতে হবে। নেতি-নেতি করে ত্যাগ করছি, আমি ঘটকে চাই না, জলকে চাই না, জলে যে অর্কবিম্ব দেখছি তাকেও চাই না, আকাশে যে সূর্য তাঁকে দেখব। এই সূর্যই 'ত্রিতয়' অর্থাৎ ঘট, জল ও তাতে প্রতিফলিত অর্কবিম্ব, এই তিনকে প্রকাশ করছেন। আমি এই তিনকে চাই না, এই তিনটিকে যিনি প্রকাশ করছেন সেই স্বয়ংপ্রকাশ সূর্যকে চাই, যে আত্মায় আমরা আত্মবান হয়েছি, যিনি স্বয়ংপ্রকাশ সূর্যের মতো, তাঁকেই চাই, অন্য কিছু চাই না। ঘট , জল, অর্কবিম্ব, এগুলো সব উপাধি, 'তটস্থ' হচ্ছেন উপাধিবর্জিত সূর্য। বিদ্বান যাঁরা তাঁরা কি করেন ? তাঁরা দেহ-মন-বুদ্ধি

এগুলো যে অনিত্য উপাধিমাত্র এটা বিচার করে বোঝেন, তারপর এদের সব নেতি নেতি করে ত্যাগ করে সেই উপাধিবর্জিত স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে দেখতে পান।

দেহং ধিয়ং চিৎপ্রতিবিম্বমেবং বিসৃজ্য বুদ্ধৌ নিহিতং গুহায়াম্।
দ্রষ্টারমাত্মানমখণ্ডবোধং সর্বপ্রকাশং সদসদ্‌বিলক্ষণম্॥২২০
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মমন্তর্বহিঃশূন্যমনন্যমাত্মনঃ
বিজ্ঞায় সম্যঙ্‌নিজরূপমেতৎ পুমান্ বিপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুঃ॥২২১
বিশোক আনন্দঘনো বিপশ্চিৎ স্বয়ং কুতশ্চিন্ন বিভেতি কশ্চিৎ।
নান্যোঽস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্তের্বিনা স্বতত্ত্বাবগমং মুমুক্ষোঃ॥২২২

অন্বয় : এবং (এইভাবে) দেহং (দেহকে) ধিয়ং (বুদ্ধিকে) চিৎপ্রতিবিম্বম্ (বুদ্ধিতে প্রতিফলিত চিদাত্মার প্রতিবিম্বকে) বিসৃজ্য (পরিত্যাগ করে) বুদ্ধৌগুহায়াম্ (বুদ্ধিগুহায়) নিহিতং (অবস্থিত) দ্রষ্টারম্ (দ্রষ্টা) অখণ্ডবোধম্ (নিত্য জ্ঞানস্বরূপ) সর্বপ্রকাশং (সর্ববস্তুর প্রকাশক) সৎ-অসৎ-বিলক্ষণম্ (কার্য কারণের লক্ষণবর্জিত) আত্মানং (আত্মাকে) নিত্যং (নিত্য) বিভুং (সর্বব্যাপী) সর্বগতং (সর্বচারী) সুসূক্ষ্মং (অতি সূক্ষ্ম) অন্তঃ-বহিঃ-শূন্যম্ (ভিতর বাহির ছাড়া) আত্মনঃ (নিজের আত্মা থেকে) অনন্যম্ (অন্য কিছু নয়, অভিন্ন) এতৎ নিজরূপং (নিজের এই রূপ) সম্যক্ বিজ্ঞায় (ভালোভাবে জেনে) পুমান্ (আত্মজ্ঞ পুরুষ) বিপাপ্মা (নিষ্পাপ) বিরজঃ (রজোগুণের চঞ্চলতা ও মলিনতা থেকে মুক্ত) বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুহীন) [হন] কশ্চিৎ বিপশ্চিৎ (কোনও কোন নিত্যজ্ঞানী বিদ্বান) স্বয়ং (নিজে) বিশোকঃ (শোকশূন্য) আনন্দঘনঃ (আনন্দস্বরূপ) কুতশ্চিৎ (কিছু থেকেই) ন বিভেতি (ভয় পান না) মুমুক্ষোঃ (মুমুক্ষুর পক্ষে) স্বতত্ত্ব-অবগমং বিনা (আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ ছাড়া) ভববন্ধমুক্তেঃ (সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির) অন্যঃ পন্থাঃ ন অস্তি (অন্য কোন পথ নেই)।

সরলার্থ : এইভাবে দেহ, বুদ্ধি ও বুদ্ধিতে প্রতিফলিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মার ছায়া, এই তিনকে ত্যাগ করে বুদ্ধির গভীরে নিহিত যে আত্মা, যিনি দ্রষ্টা, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, সর্বব্যাপী, সর্বভূতে বিরাজমান,অতিসূক্ষ্ম, তাঁকে নিজ আত্মা হতে অভিন্ন ও নিজস্বরূপ বলে ভালোভাবে জেনে আত্মজ্ঞ পুরুষ নিষ্পাপ, অচঞ্চল, অমলিন ও মৃত্যুহীন হয়ে যান। কোন কোন স্বরূপদর্শী পুরুষ শোকরহিত, আনন্দস্বরূপ হয়ে অবস্থান করেন ও কোনও কিছু থেকেই আর ভয় পান না। মুমুক্ষু যিনি তাঁর পক্ষে আত্মজ্ঞান ছাড়া ভববন্ধন থেকে মুক্তির আর কোনও পথ নেই।

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বলেছেন, বুদ্ধির ওপর যে আত্মার ছায়া তাকে স্বরূপজ্ঞান করা আর ঘটের জলে সূর্যের ছায়া দেখে তাকে সূর্য মনে করা একই রকমের মূর্খতা। কিন্তু যে বুদ্ধিমান সে যেমন ঘট, জল, অর্কবিম্ব সব ছেড়ে সূর্যকেই দেখে, সেইরকম দেহ-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি সব উপাধিগুলো বর্জন করে আত্মাকেই জানতে হবে। বলছেন, 'দেহং ধিয়ং চিৎপ্রতিবিম্বম্-এবং বিসৃজ্য'—দেহ, 'ধিয়ং' অর্থাৎ বুদ্ধি আর 'চিৎপ্রতিবিম্ব' মানে বুদ্ধিতে যে আত্মার ছায়া পড়েছে সেইটে, অর্থাৎ আমাদের অহংবুদ্ধি। এই তিনটিকে ত্যাগ করে বুদ্ধির গুহায় নিহিত যিনি, বুদ্ধির সুগভীর স্তরে যিনি আছেন,যিনি আমাকে চালাচ্ছেন,তাঁকে জানতে হবে। ওই রথের কথা মনে রাখতে হবে। যিনি রথী তাঁকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না সারথিকে দেখছে, কিন্তু তিনিই সব চালাচ্ছেন। বুদ্ধিকেও চালাচ্ছেন, দেহটাকেও চালাচ্ছেন। সেই যে আত্মা তিনি কিরকম ? 'দ্রষ্টারম্'—দ্রষ্টা, সাক্ষী; শ্রীরামকৃষ্ণ বলে দিয়েছেন, প্রদীপ জ্বলছে, সেই আলোকে কেউ ভালো বই পড়ছে কেউ খারাপ বই পড়ছে, প্রদীপ সাক্ষী, দ্রষ্টা। লোকে বলে ভগবান করেছেন; ভগবান কি করবেন? তিনি সাক্ষী, ওই প্রদীপটার মতো, তিনি আছেন বলেই আমরা আছি,তাঁর শক্তিতেই আমরা শক্তিমান। তিনি দ্রষ্টা, দেখছেন। খেলা চলছে, তিনি নিরপেক্ষ দর্শক, এ দলেরও নন ও দলেরও নন। আত্মা সাক্ষিস্বরূপ। 'অখণ্ডবোধম্'; বোধ মানে জ্ঞান, চৈতন্য, অখণ্ড মানে তৈলধারার মতো, কোনও ছেদ নেই, এখানে এক খণ্ড ওখানে এক খণ্ড, তা নয়। অখণ্ড—সর্বত্র রয়েছেন, সবসময় রয়েছেন। 'সর্বপ্রকাশং', তিনি সবকিছু প্রকাশ করছেন, তিনি আছেন বলেই সবকিছু আছে। ওই একের পিঠে শূন্য বসালে যেমন সংখ্যা বাড়ে কিন্তু এক না থাকলে সব শূন্য, সেইরকম। তিনি আছেন বলে সব প্রকাশিত হচ্ছে, তাঁর দ্বারাই সবকিছু প্রকাশিত, এইটে জেনে নিতে হবে। 'সদসদ্ বিলক্ষণম্', এখানে 'সৎ' মানে কার্য যা দেখতে পাচ্ছি, যা ব্যক্ত আর 'অসৎ' হচ্ছে কারণ যা অব্যক্ত, কারণটা আমি দেখতে পাই না। যেমন বীজ থেকে গাছ হচ্ছে, বীজটা কারণ, গাছটা কার্য। আমরা বীজটা দেখতে পাই না এটা অসৎ, কিন্তু গাছটা দেখছি এটা সৎ। তিনি কিন্তু কার্যকারণ ছাড়া। তিনি কোনও কারণের জন্যে যে আছেন তা নয়, তিনি আছেন বলেই সবকিছু আছে। একটা চুম্বক পড়ে আছে, আসেপাশে যেসব লোহার টুকরো ছিল সেগুলো চুম্বককে ঘিরে লাফালাফি করছে, চুম্বক চুপ করে আছে। তিনি ওই চুম্বকের মতন। তিনি কার্যও নন কারণও নন। আত্মা কার্য-কারণের নিয়মে বাঁধা পড়েন না। তিনি যে সবকিছু সৃষ্টি করছেন তাও নয়। কিন্তু তিনি আছেন বলে তাঁর প্রভাবে সমস্ত সৃষ্টি চলছে, জগৎ-সংসার সব-কিছু প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি শুধু নিরাকার নন, তিনি নির্গুণ তাই দয়া মায়া ইত্যাদি গুণ তাঁর নেই। তাঁকে আমরা দয়াময় বলি, স্রষ্টা বলি, তিনি কিন্তু এসব কিছু

নন। তিনি সমস্ত কার্য-কারণের বাইরে, 'সদসদ্ বিলক্ষণম্', কার্য-কারণের কোনও লক্ষণ তাঁর মধ্যে নেই, কাজেই কোন গুণ তাঁর ওপর আমরা আরোপ করতে পারি না। 'নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মমন্তর্বহিঃশূন্যমনন্যমাত্মনঃ'—তিনি নিত্য, অতীতে ছিলেন বর্তমানে আছেন ভবিষ্যতে থাকবেন। তাঁকে সত্য বলা হয়। সত্য বলতেও আমরা বুঝি যা শাশ্বত, সব সময় আছে, সনাতন। আবার বলছেন, 'বিভুং'—সর্বব্যাপী। 'সর্বগতং'—তিনি সর্বগত, সবাইকার মধ্যে আছেন। আমার মধ্যে আছেন আবার সমস্ত জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, গ্রহনক্ষত্র, এসবের মধ্যেও আছেন। তিনি সত্তা, আমাদের সকলের সত্তা তিনি। 'সুসূক্ষ্মং'—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; 'অন্তঃ-বহিঃ শূন্যম্'—তাঁর অন্তরও নেই বাহিরও নেই, ভেতরবার শূন্য; তিনি 'অনন্যম্-আত্মনঃ'—আমার যে আত্মা তার থেকে তিনি অন্য কিছু নন, পৃথক নন, অভিন্ন।

'বিজ্ঞায় সম্যক্ নিজরূপম্ এতৎ'; নিজের এই রূপকে ভালোভাবে জেনে আত্মজ্ঞ পুরুষ কি হন ? নিজেকে দেহ মনে করি সেটা অজ্ঞতা, আত্মজ্ঞানই 'জ্ঞান' অন্য জ্ঞান 'জ্ঞান' নয়। যিনি নিজের স্বরূপ জেনেছেন তাঁর কি হয়? 'বিপাপ্‌মা বিরজঃ বিমৃত্যুঃ'—তাঁর কোনও পাপ নেই, মানে পাপও নেই পুণ্যও নেই; 'বিরজঃ'—রজোগুণ নেই, তাঁর মধ্যে কোনও চাঞ্চল্য নেই মলিনতা নেই; 'বিমৃত্যুঃ'—মৃত্যু নেই; তাঁর জন্ম হয় নি মৃত্যু হবে কি করে? আত্মা তিনি অজর, অমর। গীতায় বলা হয় তাঁকে আগুনে পোড়ানো যায় না, অস্ত্র দিয়ে ছেদ করতে পারা যায় না, জল তাঁকে দ্রবীভূত করতে পারে না, বাতাস তাঁকে শুষ্ক করতে পারে না। তিনি সবসময় এক অবস্থায় আছেন, তাঁর কোনও পরিবর্তন নেই— এই আমাদের স্বরূপ। তারপর বলছেন, 'বিশোকঃ আনন্দঘনঃ বিপশ্চিৎ'; বিশোকঃ—কোনও শোক নেই; আনন্দঘনঃ—শুধু আনন্দ, ভিতরে আনন্দ বাইরে আনন্দ, আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। এরকম নয় যে একসময় আনন্দে ভরপুর হয়ে আছি আবার একটু পরেই আর আনন্দ নেই। সবসময় আনন্দ, আনন্দ ছাড়া কিছু নেই। 'বিপশ্চিৎ'—যে স্বরূপকে জেনেছে। সে 'ন বিভেতি কুতশ্চিৎ,—কাউকে ভয় করে না। যার দুই বোধ নেই সে কাকে ভয় করবে? কোনও ভয় নেই। সে তো সকলের মধ্যে নিজেকেই দেখছে, সাপের মধ্যেও তিনি, ব্যাঙের মধ্যেও তিনি। কাকে ভয় করবে? শ্রীরামকৃষ্ণকে 'মা' যেমন দেখিয়েছিলেন, ভক্তদের অনুরোধ ঠেলতে না পেরে মাকে বলেছিলেন, মা তুমি যদি ইচ্ছে কর তো যাতে একটু খেতে পারি সেটা করে দাও, এরা সব বলছে; মা দেখিয়ে দিলেন কত মুখ দিয়ে তিনি খাচ্ছেন। বিশ্বতোমুখঃ, যেন বিশ্বরূপ দর্শন, গীতায় যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন, সব তাঁর মধ্যে রয়েছে। 'ন-অন্যঃ-অস্তি পন্থাঃ ভববন্ধ মুক্তেঃ বিনা স্বতত্ত্ব অবগমং মুমুক্ষোঃ'। 'স্বতত্ত্ব', আমি কে এই জ্ঞান বিনা মুমুক্ষুর মুক্তি নেই। মুক্তি চাইলে তাকে আত্মতত্ত্ব জানতে হবে। 'ভববন্ধমুক্তিঃ';

ভব হচ্ছে এই সংসার, এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র, এর থেকে আমরা মুক্তি চাইছি। এই সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি চাইছি কিন্তু এর থেকে মুক্তির জন্যে 'স্বতত্ত্ব-অবগমং'— নিজেকে জানা, আত্মতত্ত্ব বোঝা ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

শাস্ত্র বলছেন যদি এই জন্মেই সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যেতে চাও, যদি জীবন্মুক্ত হয়ে থাকতে চাও তো সেটাও সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যেমন খোড়ো নারকোল, নাড়া দিলে খড়খড় করছে, ছোবড়া থেকে আলাদা হয়ে গেছে। আমি দেহের মধ্যে আছি কিন্তু আমি জানি, আমি দেহ থেকে ভিন্ন,আমি আত্মা। একবার যে এটা জেনেছে সে আর কখনও ভুল করবে না, এই আনন্দের স্বাদ যে একবার পেয়েছে সে আর বন্ধনের মধ্যে পড়বে না। আমরা মহাপুরুষ মহারাজকে (শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী শিবানন্দ) দেখেছি, হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছেন, সারা রাত বুকে বালিশ চাপা দিয়ে কাটিয়েছেন, সকালে কিন্তু মুখ জ্বলজ্বল করছে। হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ কেমন আছেন ? উত্তর দিতেন, ভালো আছি বাবা খুব ভালো আছি। তবে যদি তুমি আমার শরীরের কথা বল—এটা তো জড়, এর ষড়্‌বিকার আছে, বৃদ্ধ হয়েছে, এর একদিন মৃত্যু হবেই। কিন্তু ঠাকুর বুঝিয়ে দিয়েছেন আমার স্বরূপটা, সে সবসময় আনন্দে আছে। এখানে বলছেন, 'বিনা স্বতত্ত্ব-অবগমং' মুক্তির আর কোনও পথ নেই। আমরা তো স্বরূপতঃ বদ্ধ নই, এই দেহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেকে বদ্ধ ভাবছি। কিন্তু নিজেকে যদি জেনে যাই, আমার অজ্ঞানটা যদি চলে যায়, তাহলে আর কোনও বন্ধন নেই।

ব্রহ্মাভিন্নত্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্।
যেন অদ্বিতীয়মানন্দং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে বুধৈঃ ॥২২৩

অন্বয় : ব্রহ্ম-অভিন্নত্ব বিজ্ঞানং (ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার অভেদ জ্ঞান) ভবমোক্ষস্য (সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির) কারণম্ (কারণ) যেন (যে জ্ঞানের দ্বারা) বুধৈঃ (বিবেকী ব্যক্তিগণের দ্বারা) অদ্বিতীয়ম্-আনন্দং ব্রহ্ম (অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম) সম্পদ্যতে (প্রাপ্তি ঘটে)।

সরলার্থ : ব্রহ্মের থেকে আমি অভিন্ন এই জ্ঞানই সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির কারণস্বরূপ। আর এই জ্ঞানের দ্বারাই বিবেকী ব্যক্তিরা অদ্বিতীয় আনন্দরূপ ব্রহ্ম লাভ করেন ও ব্রহ্মই হয়ে যান।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'ব্রহ্ম-অভিন্নত্ব বিজ্ঞানং'; ব্রহ্ম থেকে তুমি অভেদ এই জ্ঞান, 'ভবমোক্ষস্য কারণম্', সংসার থেকে মুক্তির কারণ। আমরা সবাই মুক্তি চাইছি, freedom স্বাধীনতা। কত রকমের মুক্তি কাম্য হতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে বড় মুক্তি

হচ্ছে এই জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি। এই চক্র থেকে আমাদের মুক্তি নেই কারণ এই দেহের মধ্যে আটকে আছি আর দেহকেন্দ্রিক নানা বাসনা— ভালো খাব, ভালো পরব, অনেক টাকা চাই, প্রতিষ্ঠা চাই, এইসব নিয়ে আছি। এই জন্যেই, এই বাসনার জন্যেই আমাদের মুক্তি নেই। একটা দেহ গেলো তো আর একটা দেহের জন্যে ঘুরছি, দেহটা না পেলে তো ভোগ হবে না, তাই দেহ চাই। বলা হয় এই দেহটা 'ভোগ-আয়তনম্', তাই আবার জন্ম নিই, দুঃখ পাই, তখন বলি, আর নয় আর নয়, আর এসব ভালো লাগে না, কিন্তু পর মুহূর্তেই সেসব ভুলে গিয়ে যে-কে-সেই। আসলে আমরা চাইছি সুখদুঃখের পারে যেতে, সুখও নেই, দুঃখও নেই এরকম একটা অবস্থায়। শান্তি, আনন্দ আর কিছুতে নেই। এই অবস্থাটা জীবন্মুক্ত অবস্থা। দুরকমের মুক্তি আছে। জীবন্মুক্তি আর বিদেহমুক্তি। বিদেহমুক্তি হচ্ছে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি আর জীবন থাকতেই জ্ঞান হয়ে যে মুক্তি তাকে বলে জীবন্মুক্তি। যাঁরা জীবন্মুক্ত তাঁরা মুক্ত হয়েও দেহ রাখেন জীবের কল্যাণের জন্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এ সংসারটা ধোঁকার টাটি আবার আর এক অবস্থায় মজার কুটি—এই আর এক অবস্থা জীবন্মুক্ত অবস্থা। জ্ঞান হয়ে গেছে কিনা, জানা হয়ে গেছে স্বরূপটা কি। আমি দ্রষ্টা, মজা দেখছি। সংসারটা চলছে, আমি দেখছি, দেহের সুখদুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। স্বামীজী কিরকম জোর করে বলছেন, এই মুহূর্তে ভাবো তুমি মুক্ত, তুমি মুক্তই হয়ে যাবে। আমাদের গুরু কি করেন, সব কথা বলে টলে তারপর বলছেন 'তৎ-ত্বম্-অসি শ্বেতকেতো'—তুমিই তিনি। তার আগে প্রস্তুতি চাই, চিত্তশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি হলে গুরু দেখিয়ে দিচ্ছেন, 'তৎ-ত্বম্-অসি'। সেই সিংহের বাচ্চার ভেড়াদের সঙ্গে মানুষ হওয়ার গল্প—সে ভেড়াদের সঙ্গে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে, সিংহকে দেখে ভয়ে পালাচ্ছে, সিংহ তাকে ধরে এনে জলের মধ্যে তার ছায়ার সঙ্গে নিজের ছায়া মিলিয়ে বলছে, দেখো, তুমি আমি এক, এই—তৎ-ত্বম্-অসি। কেন আমাদের এরকম হয়? কেন স্বরূপকে ভুলে যাই? বুদ্ধদেব এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইতেন না। বলতেন, ভ্রমটা দূর কর, কেন হয়েছে জানার দরকার নেই। কেন ভুল হয় এ বিচার করার কি দরকার? আমরা বলি অবিদ্যা, মায়া, এইসবের জন্যে ভুল হয়। এই ভ্রান্তি অনাদি কিন্তু অনন্ত নয়, এর অন্ত আছে। তাই গুরু যখন দেখেন শিষ্যের চিত্তশুদ্ধি হয়েছে তখন বলেন—'তৎ-ত্বম্-অসি'—তুমিই তিনি। এইসব জীবন্মুক্ত পুরুষ, অবতার পুরুষ, এঁদের দেখে আমরা বুঝতে পারি মুক্তি বলে একটা জিনিস আছে। তাই বলছেন, 'ব্রহ্ম-অভিন্নত্ববিজ্ঞানম্ ভবমোক্ষস্য কারণম্'; এই জ্ঞান, ব্রহ্ম থেকে আমি অভিন্ন, এটাই সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির কারণ। 'যেন', যার দ্বারা, অর্থাৎ এই জ্ঞান হলে, 'অদ্বিতীয়মানন্দং ব্রহ্ম'—অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম; 'সম্পদ্যতে বুধৈঃ';

'বুধৈঃ' বিবেকী ব্যক্তিদের দ্বারা 'ব্রহ্ম সম্পদ্যতে' ব্রহ্ম লাভ ঘটে আর তাঁরা ব্রহ্মই হয়ে যান। যেসব শুদ্ধচিত্ত বিচারশীল ব্যক্তিরা ব্রহ্ম লাভ করেন তাঁরা 'ব্রহ্মৈব ভবতি', ব্রহ্মই হয়ে যান।

ব্রহ্মভূতস্তু সংসৃত্যৈ বিদ্বান্ নাবর্ততে পুনঃ।
বিজ্ঞাতব্যমতঃ সম্যগ্ ব্রহ্মাভিন্নত্বমাত্মনঃ॥ ২২৪

অন্বয় : ব্রহ্মভূতঃ বিদ্বান্ (ব্রহ্মে স্থিত বিদ্বান্) তু (অবশ্যই) পুনঃ (পুনরায়) সংসৃত্যৈ (সংসারের জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘোরার জন্যে) ন আবর্ততে (ফিরে আসেন না) অতঃ (এই জন্যে) আত্মনঃ (আত্মার থেকে) ব্রহ্ম-অভিন্নত্ব (ব্রহ্মের অভিন্নত্ব) সম্যক্ বিজ্ঞাতব্যম্ (বিশেষরূপে জানা কর্তব্য)।

সরলার্থ : ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়েছে যাঁর সেই বিদ্বান কখনই আবার সংসারচক্রে আবর্তিত হতে ফিরে আসেন না। এইজন্যে আত্মার থেকে ব্রহ্ম যে অভিন্ন এটা জানা বিশেষভাবে কর্তব্য।

ব্যাখ্যা : বলছেন, তুমি যদি ব্রহ্মকে লাভ কর তাহলে আর সংসারে বারবার আসতে হবে না। এই আসা-যাওয়া কেন ? বাসনার জন্যে। বাসনা চলে গেলে আর সংসারে আসতে হবে না। শ্রীশ্রীমা বলছেন, প্রার্থনা যদি কিছু করতে হয় তো প্রার্থনা কর, আমায় নির্বাসনা করে দাও। ওইরকম গ্রাম্য একজন মহিলা কিরকম একটা শব্দ ব্যবহার করছেন, 'নির্বাসনা'। বাসনাই তো বন্ধনের কারণ। আমাদের শাস্ত্র বলছেন, বাসনা যেন আগুনে ঘি ঢালা। হয়তো মনে হলো একটা বাসনা পূরণ করে নিই তারপর বাসনা ত্যাগ করব, কিন্তু তা আর হয় না। একটা বাসনা পূর্ণ হলো তো আর একটা এলো, আরও যেন বেড়ে গেলো। সেইজন্যে বলছেন, শুধু ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বং আনশু' (কৈ, ২)। বাসনা যদি আছেই তো একেবারে বড় বাসনাটা ধরব, ব্রহ্মকে চাইব। আনন্দ সেখানে অফুরন্ত, অন্য সব আনন্দ ছিটেফোঁটা, তার থেকেই আসছে। বলছেন, 'ব্রহ্মভূতঃ'—যে ব্রহ্ম হয়ে গেছে—আমরা তো ব্রহ্ম হয়েই আছি, বুঝতে পারছি না অজ্ঞানের জন্যে। অজ্ঞানটা দূর করব কি করে? 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া'—অজ্ঞানের তিমির অন্ধকার জ্ঞান দিয়ে দূর করতে হবে, আলো দিয়ে অন্ধকার তাড়াতে হবে। বলছেন, যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ব্রহ্ম হয়ে গেছে সে 'সংসৃত্যৈ বিদ্বান্ ন আবর্ততে পুনঃ'; সংসারের জন্মমৃত্যুর চক্রে আর ফিরে আসে না। দেহটা ত্যাগ করে চলে যায়, আর আসে না। তার তো বাসনা নেই তাই মৃত্যু হলে আর জন্ম হয় না। অতএব 'বিজ্ঞাতব্যম্ অতঃ সম্যক্'। আগে একটা intellectual conviction দরকার।

শাস্ত্র পড়ে বিচার করলে এরকম একটা ধারণা জন্মায় যে আমি এ দেহটা নই। এই বুদ্ধি দিয়ে জানাটারও দরকার আছে। তারপর খুব ভালো করে জানতে হবে 'ব্রহ্ম-অভিন্নত্ব আত্মনঃ'—আত্মা থেকে ব্রহ্ম ভিন্ন নন, এইটা ভালো করে জানতে হবে। জানলে কি হবে? 'ব্রহ্মভূতঃ' হয়ে যাবে। সে জেনে নিয়েছে সে-ই ব্রহ্ম, তাকে আর তখন সংসারে ফিরে আসতে হবে না।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিশুদ্ধং পরং স্বতঃসিদ্ধম্।
নিত্যানন্দৈকরসং প্রত্যগভিন্নং নিরন্তরং জয়তি॥২২৫

অন্বয় : সত্যং (সত্যস্বরূপ) জ্ঞানং (জ্ঞানস্বরূপ) অনন্তং (অন্তহীন) বিশুদ্ধং (বিশুদ্ধ) পরং (সর্বশ্রেষ্ঠ) স্বতঃসিদ্ধম্ (প্রমাণ-নিরপেক্ষ) নিত্য-আনন্দ-একরসং (নিত্য,অখণ্ড,আনন্দস্বরূপ) প্রত্যক্-অভিন্নং(জীবাত্মার থেকে অভিন্ন) নিরন্তরং (বাহ্য-অভ্যন্তর ভেদশূন্য) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) জয়তি (প্রকাশমান)।

সরলার্থ : সত্য-জ্ঞান-অনন্ত, বিশুদ্ধ, সর্বশ্রেষ্ঠ, স্বয়ংপ্রমাণ, নিত্য, আনন্দস্বরূপ, জীবাত্মার স্বরূপভূত, ভেদরহিত ব্রহ্ম সবসময় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান।

ব্যাখ্যা : 'সত্যং জ্ঞানম্-অনন্তং ব্রহ্ম বিশুদ্ধং পরং স্বতঃসিদ্ধম্', এগুলি কিন্তু বিশেষণ নয়, এগুলো তাঁর স্বরূপ। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, তিনি অনন্ত, তিনি 'বিশুদ্ধ', কোনও মলিনতা তাঁর মধ্যে আসতে পারে না। আমরা যখন বড়, ছোট এইসব শব্দগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করি তখন তার মধ্যে একটা তুলনার ভাব থাকে, যেটাকে ছোট ভাবছি সেটা অন্য কিছুর থেকে ছোট, এখানে সেসব কিছু থাকছে না। তিনি বিশুদ্ধ মানে বিশুদ্ধতার স্বরূপ, তিনিই বিশুদ্ধতা। তিনি 'স্বতঃসিদ্ধ'—তিনি নিজেই নিজের প্রমাণ, কোনও প্রমাণ দিয়ে তাঁকে প্রতিপন্ন করতে হয় না। কোনও একটা জাগতিক বস্তু—সেটা একজন করেছে, তাকে আবার কে করল—এমনি করে চলতে থাকে। কিন্তু ব্রহ্মকে কেউ সৃষ্টি করে নি, তিনি স্বয়ম্ভু, তাই তিনি স্বতঃসিদ্ধ। 'নিত্য-আনন্দ-একরসং প্রত্যক্-অভিন্নং নিরন্তরং জয়তি'; নিত্য তিনি, তিনি স্বরূপত আনন্দ; এগুলি কিন্তু কোনও বিশেষণ নয়, তাঁর স্বরূপটা বোঝাবার জন্যে এই শব্দগুলো ব্যবহার করছি। 'একরসং'—একভাবে সর্বদা আছেন, এখন একরকম অন্য সময় আর একরকম, তা নয়। 'প্রত্যগভিন্নং'—'প্রত্যক্' মানে জীব, প্রত্যেক, তিনি প্রত্যেকের থেকে অভিন্ন, তিনি জীবাত্মার থেকে অভিন্ন, জীব আর ব্রহ্ম এক, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। এখন তো আমরা শরীরসর্বস্ব। শরীর ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে সব এক দেখি। যা কিছু দেখছি সব তিনি, আর কিছু নেই। শুধু নামরূপটা পৃথক আর নামরূপের মধ্যে যিনি আছেন তিনি এক—এটাই

দেখতে পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বালিশের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, পিঠের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। নানা রকম বালিশ, নানা রকম পিঠে, কিন্তু ভিতরে এক তুলো এক পুর। বেদান্ত তাই নামরূপটা বর্জন করতে বলছেন; এক তিনি 'গুহাহিত' হয়ে রয়েছেন, আমাদের দেহের গুহায় লুকিয়ে আছেন। নামরূপটা মিথ্যে বলে বুঝতে পারলে তিনি 'নিরন্তরং জয়তি', তিনি সবসময় জ্বলজ্বল করছেন দেখতে পাবে।

সদিদং পরমাদ্বৈতং স্বস্মাদন্যস্য বস্তুনোঽভাবাৎ।
ন হ্যন্যদস্তি কিঞ্চিৎ সম্যক্ পরমার্থতত্ত্ববোধদশায়াম্॥ ২২৬

অন্বয় : স্বস্মাৎ (আত্মা থেকে) অন্যস্য বস্তুনঃ (অন্য বস্তুর) অভাবাৎ (অভাববশতঃ) ইদং (এই আত্মা) সৎ (সত্য) পরম-অদ্বৈতং (শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয়) পরমার্থতত্ত্ববোধদশায়াম্ (পরমার্থতত্ত্ববোধ হলে যে অবস্থা হয় সেই দশায়) অন্যৎ কিঞ্চিৎ (অন্য কিছুই) সম্যক্ (স্বতন্ত্ররূপে) হি (নিশ্চয়) ন অস্তি (থাকে না)।

সরলার্থ : আত্মা থেকে ভিন্ন অন্য কিছু নেই বলে এই আত্মাই শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় সত্তা। পরমার্থতত্ত্ববোধ হলে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হলে যে অবস্থা হয় তাতে আত্মা থেকে ভিন্ন আর কোনও কিছুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বোধ থাকে না।

ব্যাখ্যা : বলছেন : এক জ্ঞানই জ্ঞান, অনেক আছে, দ্বিতীয় আছে এই ধারণা ভুল। আগে জগৎটাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু যখন ব্রহ্মজ্ঞান হলো তখন 'ব্রহ্মময়ং জগৎ', তখন আর কিছুই মিথ্যা নয়, সবই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম তুমিও ব্রহ্ম, ব্রহ্ম থেকে আলাদা আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না, সব এক। 'ন হি-অন্যৎ-অস্তি কিঞ্চিৎ সম্যক্ পরমার্থতত্ত্ববোধদশায়াম্', যখন আমার পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান হলো অর্থাৎ যখন আত্মজ্ঞান হলো তখন এক আমাকেই সর্বত্র দেখছি। 'সৎ-ইদং পরম অদ্বৈতং'—এই আত্মা এক, দুই নন। তিনি 'পরম'—শ্রেষ্ঠ, শুধু এক। 'স্বস্মাৎ'—আমার থেকে, আমার 'আমি'র থেকে। 'অন্যস্য বস্তুনঃ অভাবাৎ', আমার থেকে আলাদা অন্য কোনও বস্তু আর নেই, সেইজন্যে সর্বত্র শুধু আমাকেই দেখছি। 'একঃ দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ', (শ্বে, ৬।১১)। আমি সব হয়েছি, কুকুর-বেড়াল হয়েছি, মানুষ হয়েছি আবার ভগবান হয়েছি—সব আমি, সৎস্বরূপ আমি। 'পরমার্থতত্ত্ববোধদশায়াম্'; পরমার্থতত্ত্ব বুঝেছি তাই আমার এই অবস্থা হয়েছে, এই দশা হয়েছে। এই অবস্থায় কি বুঝেছি আমি ? 'ন অন্যৎ অস্তি কিঞ্চিৎ'—এক আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। তিনিই আছেন শুধু, দ্বিতীয় কিছু নেই। ব্রহ্মজ্ঞান হলে তাঁকেই সর্বত্র দেখি। আমরা নামরূপ দিয়ে অখণ্ড ব্রহ্মকে যেন খণ্ড খণ্ড করতে চাচ্ছি। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলছেন, পুকুরের ওপরে একটা বাঁশ ফেলে দিয়েছি, জলটা দু-ভাগ

মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে এক জল। তেমনি, ব্রহ্ম 'একরসঃ', অখণ্ড। নাম-রূপের জন্যে তাঁকে খণ্ড মনে হচ্ছে, বহু মনে হচ্ছে। যখন আমি পরমার্থতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারি, তখন দেখি এক সত্য, দুই নেই, বহু নেই। রামপ্রসাদ বলছেন, মা বিরাজেন ঘটে, ঘটে। ব্রহ্মজ্ঞান হলে আমার মধ্যে তিনি, আমার বাইরেও তিনি। সর্বত্র শুধু তিনিই।

যদিদং সকলং বিশ্বং নানারূপং প্রতীতমজ্ঞানাৎ।
তৎ সর্বং ব্রহ্মৈব প্রত্যস্তাশেষভাবনাদোষম্॥২২৭

অন্বয় : যৎ ইদং (এই যে) সকলং বিশ্বং (সকল জগৎ) অজ্ঞানাৎ (অজ্ঞানবশতঃ) নানারূপম্ প্রতীতম্ (নানারূপে প্রতীত হচ্ছে) তৎ সর্বং (সে সমস্ত) প্রত্যস্ত-অশেষভাবনাদোষম্ (চিন্তার বহু দেখার অন্তহীন দোষ চলে গেলে) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই)।

সরলার্থ : এই যে সমস্ত জগৎ অজ্ঞানবশতঃ নানারূপে প্রতীয়মান হচ্ছে সেটা আমাদের চিন্তা ও কল্পনার বহু দেখার অন্তহীন দোষের জন্যে। এই দোষ চলে গেলে সে সবই ব্রহ্ম বলেই জানব।

ব্যাখ্যা : একই কথা একটু অন্যভাবে আবার বলছেন। 'যৎ-ইদং সকলং বিশ্বম্ নানারূপম্ প্রতীতম্ অজ্ঞানাৎ'; এই যে আমরা নানারূপ দেখছি এটা ভুল। অজ্ঞানের জন্যে এই ভুল হচ্ছে। বৈচিত্র আছে নামরূপের জন্যে, আসলে সবই কিন্তু এক। 'তৎ সর্বং ব্রহ্ম-এব প্রত্যস্ত-অশেষ ভাবনাদোষম্'; আমাদের চিন্তার মধ্যে অশেষ দোষ রয়ে গেছে। সেই দোষটা হচ্ছে 'এক'-এর জায়গায় বহু দেখা। সব সময় বহু দেখছি। অজ্ঞানের জন্যে, অবিদ্যার জন্যে নামরূপের আড়ালে যে এক সৎস্বরূপ রয়েছেন, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। এই 'অশেষ ভাবনা দোষ'—নানা দেখার দোষটা যখন 'প্রত্যস্ত' হবে, থেমে যাবে, তখন দেখব 'তৎ সর্বং ব্রহ্মৈব'। সর্বভূতে সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই দেখব।

মৃৎকার্যভূতোঽপি মৃদো ন ভিন্নঃ কুম্ভোঽস্তি সর্বত্র তু মৃৎস্বরূপাৎ।
ন কুম্ভরূপং পৃথগস্তি কুম্ভঃ কুতো মৃষাকল্পিতনামমাত্রঃ॥২২৮

অন্বয় : কুম্ভঃ (কলস) মৃৎকার্যভূতঃ অপি (মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে নানা আকারে প্রকাশিত হলেও) মৃদঃ (মৃত্তিকা থেকে) ভিন্নঃ (পৃথক) ন অস্তি (নয়) তু (কিন্তু) সর্বত্র (সর্বত্র) কুম্ভরূপম্ (কলসরূপে) মৃৎস্বরূপাৎ (মৃত্তিকা থেকে) পৃথক্ (ভিন্ন কিছু) ন অস্তি (থাকে না) কুম্ভঃ কুতঃ (কুম্ভ কোথায়) মৃষাকল্পিত নামমাত্রঃ (মিথ্যা কল্পিত নামমাত্র)।

সরলার্থ : কুম্ভ মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে নানাভাবে প্রকাশ হলেও মৃত্তিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বরূপত মাটি থেকে আলাদা 'কুম্ভ' বলে কোনও পদার্থই জগতে নেই। মাটি দিয়ে তৈরী বিভিন্ন আকারের 'কুম্ভ' বলে যে বস্তুটির সৃষ্টি হয় তার পৃথক অস্তিত্ব কোথায় ? এ তো মিথ্যা-কল্পিত নাম মাত্র।

ব্যাখ্যা : এখানে মাটি আর কলসীর উদাহরণ দিচ্ছেন। 'মৃৎকার্যভূতঃ-অপি মৃদঃ ন ভিন্নঃ কুম্ভঃ-অস্তি সর্বত্র তু মৃৎস্বরূপাৎ'; মাটি ছাড়া কুম্ভ বলে কি কোনও আলাদা বস্তু আছে? এই যে মাটির সব পাত্র দেখছি, এগুলো মাটির কার্য আর মাটিটা হচ্ছে এদের কারণ। এক মাটি থেকে নানা রকম পাত্র হয়েছে। কিন্তু মাটির এই যে নানা রকম বিকার দেখছি তা মাটিকে বাদ দিয়ে কিছু তো নয়। 'মৃদঃ ন ভিন্নঃ'—এগুলি মাটি ছাড়া আর কিছু নয়। 'ন কুম্ভরূপং পৃথক্ অস্তি'; কুম্ভ বলে মাটিকে দেখছি, মাটির থেকে তার কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। কুম্ভের আকার যেটা সেটা মাটি ছাড়া তো আর কিছু নয়। 'কুম্ভঃ কুতঃ'—কুম্ভ কোথায় ? 'মৃষা-কল্পিত নামমাত্রঃ'; এটা একটা নাম শুধু, সেটা মিথ্যা-কল্পিত। 'মৃষা'—মিথ্যা। মাটি, তার বিভিন্ন রূপান্তর, কিন্তু এক মাটি। সেইরকম এক আত্মা, এক ব্রহ্ম কিন্তু কত নাম রূপ। নাম-রূপটা তাঁর ওপর চাপানো হয়েছে। তার জন্য তাঁকে বহু বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে এক ব্রহ্ম। এক ব্রহ্মই সব হয়েছেন, সবকিছু প্রকাশ করছেন। যা কিছু বস্তু সব এক জায়গাতেই যাচ্ছে, এক থেকেই আসছে। এই সৃষ্টি আর ধ্বংস শুধু রূপান্তর।

কেনাপি মৃদ্‌ভিন্নতয়া স্বরূপং ঘটস্য সংদর্শয়িতুং ন শক্যতে।
অতো ঘটঃ কল্পিত এব মোহান্মৃদেব সত্যং পরমার্থভূতম্॥ ২২৯

অন্বয় : কেন অপি (কারোর দ্বারাই) মৃৎ-ভিন্নতয়া (মাটি ছাড়া) ঘটস্য স্বরূপং (ঘটের স্বরূপ) সংদর্শয়িতুং (দেখানোর) ন শক্যতে (সামর্থ্য হয় না) অতঃ (অতএব) ঘটঃ (ঘট) মোহাৎ (অজ্ঞান থেকে) কল্পিতঃ এব (কল্পিত মাত্র) মৃৎ এব (মৃত্তিকাই) পরমার্থভূতং (পরমার্থরূপ) সত্যং (সত্য)।

সরলার্থ : কারোর পক্ষেই মাটি ছাড়া ঘটের স্বরূপ দেখানো সম্ভব নয়। অতএব ঘট অজ্ঞানজনিত কল্পনামাত্র, মৃত্তিকাই পরমার্থরূপ সত্য।

ব্যাখ্যা : আবার সেই ঘটের উপমা দিয়েই বোঝাতে চাইছেন : এই যে নানা দেখছি এ ভুল, অজ্ঞান থেকে আসছে, সবকিছুর মধ্যে তিনিই আছেন, সেই পরমাত্মাই সর্বভূতে রয়েছেন। 'কেনাপি মৃদ্‌ভিন্নতয়া স্বরূপং ঘটস্য সংদর্শয়িতুং ন শক্যতে'; মাটি ছাড়া ঘটের স্বরূপ কেউ দেখাতে পারে না। এই যে ঘট, এটা কল্পিত, মাটিটাই সত্য। ঘটটা মাটি থেকে তৈরী হলো আবার ভেঙে গিয়ে মাটিই হয়ে গেলো, তাহলে

মৃত্তিকা মৃত্তিকাই রইল। 'অতঃ ঘটঃকল্পিত এব মোহাৎ মৃদ্-এব সত্যং পরমার্থভূতম্'; ঘটটা অনিত্য তার স্বরূপ মাটিটাই সত্য। তেমনি জীবের জীবত্ব অনিত্য, সত্য পরমাত্মা। তিনি নানা রূপ নিয়েছেন, ভালো হয়েছেন মন্দ হয়েছেন। এক ছিলেন বহু হলেন—'একোঽহং বহুস্যাম্' (তৈ, ২।৬)। মরীচিকা দেখছি, এটা ভ্রান্তি, কিন্তু যে বালির জন্যে মরীচিকা সেটা সত্যি। সেটা আধার, অধিষ্ঠান। এই বিচিত্র জগৎ, নামরূপের জগৎ মিথ্যা, কিন্তু যিনি অধিষ্ঠান সেই ব্রহ্ম সত্য। একে বন্ধু মনে করছি ওকে শত্রু মনে করছি, আসলে কিন্তু এক সত্তা, এক পরমাত্মা সবাইকার মধ্যে। নাম আর রূপ নিয়ে আমরা পৃথক হয়েছি—এগুলো আত্মার ওপর আবরণ, চাপানো হয়েছে—যেমন মাটিটাই সত্য, তার ওপর ঘটের আবরণ সাময়িকভাবে চাপানো হয়েছে।

সদ্‌ব্রহ্মকার্যং সকলং সদেবং তন্মাত্রমেতন্ন ততোঽন্যদস্তি।
অস্তীতি যো বক্তি ন তস্য মোহো বিনির্গতো নিদ্রিতবৎপ্রজল্পঃ॥২৩০

অন্বয় : সকলং (সবকিছুই) সৎ-ব্রহ্মকার্যং (সৎস্বরূপ ব্রহ্মের কার্য বলে) সৎ এবম্ (ব্রহ্ম সৎস্বরূপই বটে) এতৎ (এই জগৎ) তৎ-মাত্রম্ (সৎস্বরূপ ব্রহ্মমাত্র) ততঃ (তাঁর থেকে) অন্যৎ (অন্য কিছু) ন অস্তি (নেই) যঃ বক্তি (যে বলে) অস্তি ইতি (আছে বটে) তস্য মোহঃ (তার মোহ) ন বিনির্গতঃ (দূর হয়নি) নিদ্রিতবৎপ্রজল্পঃ (তার কথা নিদ্রিত ব্যক্তির প্রলাপের মতো)।

সরলার্থ : জগতের সবকিছু সৎস্বরূপ ব্রহ্মের কার্য বলে স্বরূপত 'সৎ'ই বটে। এই জগৎও সৎস্বরূপ ব্রহ্মমাত্র, ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন আর কিছু নেই। যে বলে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু আছে তার এখনও মোহ যায়নি, তার কথা নিদ্রিত ব্যক্তির অসংলগ্ন প্রলাপবাক্যের মতো।

ব্যাখ্যা : 'সদ্ ব্রহ্মকার্যং সকলং'; ব্রহ্ম থেকেই সবকিছু হয়েছে। কারণ হচ্ছেন ব্রহ্ম আর তাঁর কার্য বা ফল হচ্ছে এই বিচিত্র জগৎ, নাম আর রূপের জগৎ। 'তৎ-মাত্রং এতৎ ন ততঃ অন্যৎ-অস্তি'; এ সবই তিনি, ব্রহ্মছাড়া অন্য আর কিছু নেই। 'অস্তি-ইতি যঃ বক্তি'; যে অন্যরকম বলে অর্থাৎ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য বস্তু আছে এরকম কথা বলে, সে আবোল-তাবোল বকছে, তার এখনও মোহ যায়নি—'ন তস্য মোহঃ বিনির্গতঃ'। তার কথা 'নিদ্রিতবৎপ্রজল্পঃ'; আমরা তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক সময় কথা বলি, সেইরকম তার কথা যেন ঘুমের মধ্যে বলা অসংলগ্ন কথা। 'ন ততঃ অন্যৎ-অস্তি', তিনিই শুধু আছেন, তাঁর থেকে অন্য কিছু নেই। 'সদ্‌ব্রহ্মকার্যং সকলং'—সব ব্রহ্ম থেকে এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, একদিন দেখলুম গঙ্গা

থেকে এক রমণী, অন্তঃসত্ত্বা, উঠে এলেন, সন্তান প্রসব করলেন, তাকে যত্ন করলেন, আদর করলেন, তারপর খেয়ে ফেললেন। তাঁর থেকেই জন্ম, তিনিই পালন করছেন আবার তিনিই ধবংস করছেন। যা কিছু আমরা দেখছি সব তিনি। তিনি ছাড়া আর অন্য কিছু নেই। জগতের সবকিছু—জগৎটাই—ব্রহ্ম থেকে এসেছে, ব্রহ্মের কার্য। ব্রহ্ম থেকে যা কিছু ঘটেছে সব ব্রহ্ম। তাই যদি কেউ বলে তিনি ছাড়া অন্য কিছু আছে তাহলে বুঝতে হবে সে মোহগ্রস্ত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মানুষ কত কি কথা বলে, তার কথা সেইরকম।

ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিত্যেব বাণী শ্রৌতী ব্রূতেঽথর্বনিষ্ঠা বরিষ্ঠা।
তস্মাদেতৎ ব্রহ্মমাত্রং হি বিশ্বং নাধিষ্ঠানাদ্ ভিন্নতারোপিতস্য॥ ২৩১

অন্বয় : ইদং বিশ্বম্ (এই বিশ্ব) ব্রহ্ম-এব (ব্রহ্মই) ইতি-এব (এই রকমই) অথর্বনিষ্ঠা (অথর্ববেদের মুণ্ডক উপনিষদের) বরিষ্ঠা (শ্রেষ্ঠা) শ্রৌতী বাণী (শ্রুতিবাক্য) ব্রূতে (বলে থাকেন) তস্মাৎ (সেইজন্যে) হি (অবশ্যই) এতৎ বিশ্বং (এই বিশ্ব) ব্রহ্মমাত্রম্ (ব্রহ্মমাত্র) অধিষ্ঠানাৎ (অধিষ্ঠান থেকে)আরোপিতস্য (আরোপিতের) ন ভিন্নতা (পার্থক্য নেই)।

সরলার্থ : এই বিশ্ব ব্রহ্মমাত্র—এই কথা অথর্ববেদের মুণ্ডক-উপনিষদে বলা হয়েছে। এই শ্রুতিবাক্য বরিষ্ঠ, অতিমান্য। অতএব এই বিশ্ব ব্রহ্মমাত্র, অধিষ্ঠান থেকে আরোপিত বস্তু ভিন্ন নয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'ব্রহ্ম-এব-ইদং-বিশ্বম্'—ব্রহ্মই এই বিশ্ব। একথা কে বলছেন? 'বাণী শ্রৌতী'—শ্রুতি-র বিশেষণ 'শ্রৌতী', শ্রুতি এই কথা বলছেন। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র। আমরা শ্রুতিকে অপৌরুষেয় বলি কারণ শ্রুতিতে যাঁদের অভিজ্ঞতার কথা আছে তাঁরা প্রত্যক্ষ যা দর্শন করেছেন, জেনেছেন, তাই বলেছেন। তাঁদের অনেকেরই নাম জানা যায় না, তাঁরা শুধু বলছেন, এগুলি তোমরা যাচাই করে নাও, একই রকম অনুভব একই রকম অভিজ্ঞতা তোমাদের হয় কি না দেখে নাও। 'ব্রূতে অথর্ব নিষ্ঠা'—অথর্ববেদ এই কথা বলছেন, অথর্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডক উপনিষদ্ এই কথা বলছেন। কি বলছেন ? 'তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্ম মাত্রং হি বিশ্বম্'; এই যে মানুষ বলছি, গাছপালা বলছি এসব ভুল, আসলে সব ব্রহ্ম, তিনি নানা রকমের নামরূপ নিয়ে আমাদের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 'ন অধিষ্ঠানাৎ ভিন্নতা-আরোপিতস্য', অধিষ্ঠান থেকে আরোপিত বস্তু ভিন্ন নয়। ব্রহ্ম হচ্ছেন অধিষ্ঠান, আর নাম-রূপ সব তার ওপর চাপানো হয়েছে, যেন নানা রকম ছাপ মেরে ভিন্ন করেছি। কিন্তু তিনিই বস্তু আর সব অবস্তু। কাউকে ভালো বলছি কাউকে মন্দ

বলছি কিন্তু একই ব্রহ্ম—'ব্রহ্মৈব ইদং বিশ্ব'—একথা শ্রুতি বলেছেন। শ্রুতিশাস্ত্র অপৌরুষেয়, শ্রুতিবাক্য যাঁদের তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। এই সত্য ত্রিকাল-অবাধিত; অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, এই তিন কালেই এই সত্য আছে—নিত্য, সনাতন। আমরা বলি, সেটাই সত্য যা absolute truth, অনপেক্ষ। যেগুলো relative truth, আপেক্ষিক সত্য, সেগুলো আমরা ধরি না, তাদের আমরা ব্যবহারিক সত্য বলি, অনিত্য। যেমন এই যে গোলপার্কের প্রতিষ্ঠান এ আজ আছে কিন্তু অতীতে ছিল না আর সুদূর ভবিষ্যতেও নিশ্চয় থাকবে না। আমরা সত্য বলি তাকে যা নিত্য, সনাতন, ত্রিকাল-অবাধিত। তাই বলছেন, 'অথর্ব নিষ্ঠা সর্ববরিষ্ঠা'; 'বরিষ্ঠা' মানে সবচেয়ে বড়। অথর্ববেদে যে মুণ্ডক-উপনিষদ্ আছে তার কথা বলছেন। শ্রুতির কথা তো মানতে হয়। সত্যদ্রষ্টা ঋষির অপরোক্ষ অনুভূতির ফলশ্রুতি এই শ্রুতি, কাজেই একে মানতে হয়। আপনি অন্য কোনও বিদ্বান ব্যক্তির কথা হয়তো মানলেন না, কিন্তু শ্রুতি হচ্ছে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের অভিজ্ঞতার বিবরণ। একে মানতে হয়। সেই শ্রুতি বলছেন 'তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্মমাত্রম্ হি বিশ্বম্'; এই বিশ্ব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়। বলছেন, 'ন অধিষ্ঠানাৎ ভিন্নতা আরোপিতস্য'; আরোপিত যা তা অধিষ্ঠানের থেকে ভিন্ন কিছু নয়। ব্রহ্ম অধিষ্ঠান, জগৎটা তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এ-ও ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়।

সত্যং যদি স্যাজ্জগদেতদাত্মনা
ন তত্ত্বহানির্নিগমাপ্রমাণতা।
অসত্যবাদিত্বমপীশিতুঃ স্যান্-
নৈতত্ত্রয়ং সাধু হিতং মহাত্মনাম্ ॥ ২৩২

অন্বয় : যদি (যদি) এতৎ জগৎ (এই জগৎ) আত্মনা (স্বরূপে, ব্রহ্ম থেকে আলাদাভাবে) সত্যং স্যাৎ (সত্য হয়) তত্ত্বহানিঃ ন (তত্ত্ববস্তু হিসেবে এর বিনাশ হতো না) নিগম-অপ্রমাণতা (বেদবাক্যের অপ্রমাণতা) ঈশিতুঃ অপি (ঈশ্বরেরও) অসত্যবাদিত্বম্ (অসত্যবাদিতা) স্যাৎ (হতো) মহাত্মনাং (বিচারশীল মহৎ ব্যক্তিদের কাছে) এতৎ ত্রয়ং (এই তিনটি) ন সাধু হিতং (গ্রহণযোগ্য নয়)।

সরলার্থ : এই জগৎ যদি স্বরূপত সত্য হতো তাহলে সত্যস্বরূপ জগতের কোনও নাশ হতো না। আর তাহলে বেদ মিথ্যা বলে প্রমাণ হতো আবার অবতারপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অসত্যবাদী হতেন। বিচারশীল মহাত্মা যাঁরা তাঁদের কাছে এই তিনটির কোনটাই গ্রাহ্য নয়।

ব্যাখ্যা : শঙ্করাচার্য বলছেন, তুমি জগৎটাকে যদি সত্য বল তাহলে শাস্ত্র যা বলছেন

তা মিথ্যে হয়ে গেলো, অবতারপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যা বলছেন, তা মিথ্যে হচ্ছে আর জগৎ সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের যা অভিজ্ঞতা তাও মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে। সত্য বলতে আমরা কি বুঝি সেটা পরিষ্কার করে নিতে হবে। সত্য হচ্ছে যা নিত্য আর মিথ্যা হচ্ছে যা অনিত্য। সৎ মানে যা আছে, চিরকাল আছে। জগৎটা কি সেই অর্থে সত্য? আমরা তো দেখছি জগৎ পরিবর্তনশীল, এই জগতে আমরা অনবরত ভাঙা-গড়া দেখছি, আজ যা ছিল কাল তা থাকছে না। জগৎ কথাটা গম্ ধাতু থেকে এসেছে, যা চলছে তাই জগৎ। যেন একটা জলের স্রোত। বস্তুত এই যুক্তি বুদ্ধদেবও দিয়েছেন, বলছেন, তোমরা গঙ্গা বল, গঙ্গা কি? না একটা জলরাশি, সেই জল বয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তুমি যে জলরাশি দেখছ পরের মুহূর্তে তার থেকে অন্য জলরাশি দেখছ, এই পরিবর্তনশীল জলরাশিকেই তুমি গঙ্গা বলছ। তেমনি এই জগৎ—চলছে, পরিবর্তনশীল। আজকে একজনকে দেখছি, কাল হয়তো সে নেই, কত পরিবর্তন হচ্ছে, কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু পাচ্ছি না। যা পরিবর্তনশীল, অনিত্য, তাকে আমরা সত্য বলি না। সেটা আপেক্ষিক সত্য, স্থান-কাল দিয়ে সীমিত। আমি এখন এখানে আছি, একটু পরে থাকব না—আমার এই থাকাটা স্থান-কাল দিয়ে সীমিত, স্থান-কালের ওপর নির্ভর করে আছে, অপেক্ষা করে আছে। যা আত্যন্তিক সত্য তা কোন কিছুর ওপর নির্ভর করে না, তার কোনও পরিবর্তন নেই। বেদান্তে যে জগৎকে মিথ্যা বলছে তা এই অর্থে যে এ পালটে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল, মরণশীল জগৎ—এ অনিত্য তাই মিথ্যা। এখানে আমার সুখ-দুঃখ সব ক্ষণিক। এইটা ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

'সত্যং যদি স্যাৎ জগৎ এতৎ আত্মনা ন তত্ত্বহানি'—জগৎ যদি সত্য হতো তাহলে এখানে আমরা বিনাশ দেখতে পেতাম না। আমরা তো কত কি ধবংস হতে দেখতে পাই, সেসব তাহলে হতো না সুষুপ্তিতে আমাদের কাছে জগৎটারই কোন অস্তিত্ব থাকে না, সেটাও তাহলে হত না, আর এগুলো সবই হত 'নিগম-অপ্রমাণতা'। আগম আর নিগম তন্ত্র আর বেদ অর্থে ব্যবহার হয়। আবার অন্যরকম ব্যাখ্যা আছে—আগম মানে নিঃশ্বাস নেওয়া, নিগম মানে নিঃশ্বাস ছাড়া। এখানে নিগম মানে বেদ। বলছেন, জগৎ যদি সত্য বলি তাহলে বেদের 'অপ্রমাণতা' হয়, বেদ ভুল প্রমাণিত হয়। কারণ শাস্ত্র তো বলছেন, ব্রহ্ম সত্যং জগৎ- মিথ্যা, এই কথা তাহলে আর সত্য থাকছে না। তারপর বলছেন, 'অসত্য-বাদিত্বম্-অপি-ঈশিতুঃ স্যাৎ'; 'ঈশিতুঃ' মানে ঈশ্বরের। এখানে ঈশ্বর বলতে অবতারপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে বোঝাচ্ছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বারবার করে বলছেন, আত্মাই সত্য, জন্মমৃত্যুহীন, আর দেহ ইত্যাদি বস্ত্রের মতো চাপানো জিনিস, দেহ জীর্ণ হলে ত্যাগ করে নতুন নিতে হয়; এগুলো অনিত্য, তুমি অর্থাৎ তোমার স্বরূপ যে আত্মা তিনি

শুধু নিত্য, সনাতন। জগৎকে সত্য বললে অবতারপুরুষও অসত্যবাদী হয়ে যাচ্ছেন। আবার আমাদের অভিজ্ঞতায়ও দেখি জগৎ পরিবর্তনশীল। তাই বলছেন, 'মহাত্মনাম্', অর্থাৎ যাঁরা মহৎ ব্যক্তি, বিচারশীল ব্যক্তি, এই তিনটি মিথ্যা হয়ে যাওয়া তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। কাজেই, জগৎ সত্য নয়, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। তিনিই এই জগৎ-সংসার সব চালাচ্ছেন। চালাচ্ছেন মানে, তিনি নিজে কিছু করছেন না, কিন্তু তিনি আছেন বলেই সব চলছে। 'তস্য ভাসা সর্বম্-ইদম্ বিভাতি' (মু ২।২। ১০)—তাঁর আলোতেই সবকিছু আলোকিত।

ঈশ্বরো বস্তু-তত্ত্বজ্ঞো ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভূতানীত্যেবমেব ব্যচীক্লৃপৎ ॥২৩৩

অন্বয় : বস্তুতত্ত্বজ্ঞঃ (বস্তুস্বরূপের জ্ঞাতা) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) অহং চ (আমিও) তেষু (সেই সকল জাতবস্তুতে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নই) ভূতানি চ (ভূত-সকলও) মৎ-স্থানি ন (আমাতে নেই) ইতি-এবং-এব (এই ভাবেই) ব্যচীক্লৃপৎ (সমর্থন করেছেন)।

সরলার্থ : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বস্তুর স্বরূপ জানেন। তিনি,'আমি সেইসব বস্তুতে নেই' আর 'সেসব বস্তুও আমাতে নেই' এই বলে আগের শ্লোকে যা বলা হয়েছে তার সমর্থন করেছেন।

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে যা বলা হয়েছে তার সমর্থনে এখানে গীতা থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তির উল্লেখ করছেন। 'ঈশ্বরঃ-বস্তুতত্ত্বজ্ঞঃ-ন-চ-অহং তেষু-অবস্থিতঃ'; বস্তু যাকে আমরা বলি তার স্বরূপটা ঈশ্বর জানেন। বলছেন, এটা বলতে পারা যায় না যে 'অহং তেষু অবস্থিতঃ'—সমস্ত জীবের মধ্যে আমি আছি। আর এও বলা যায় না যে 'মৎস্থানি ভূতানি'—সমস্ত জীব আমার মধ্যে আছে। গীতায় ভগবান বলছেন, 'ময়া ততম্ ইদম্ সর্বম্ জগদ্ অব্যক্ত মূর্তিনা' (গী ৯।৪) —আমি সমস্ত জগৎ অব্যক্তভাবে পরিব্যাপ্ত করে আছি, 'মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চ অহং তেষু অবস্থিতঃ'—সমস্ত জীবজগৎ আমাতে আছে কিন্তু আমি তাদের মধ্যে নেই, আমি তাদের দ্বারা সীমিত নই। অর্থাৎ তিনি আধার, আধেয় নন। তিনিই সবকিছুর আশ্রয়। তাই সবকিছুর মধ্যে তিনি আছেন বললে সঠিক বলা হয় না, তাঁকে সীমিত করে ফেলা হয়। আবার বলছেন : 'ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' (গী, ৯/৫)। আমার যোগ ঐশ্বর্য দেখো। আসলে এই সব প্রাণী বা জগৎ কোন কিছুই আমার মধ্যে নেই, আমি নির্লিপ্ত। আমার যোগ-মায়ার জন্যে মনে হয় সর্বভূতে আমি আছি, আর সবকিছু আমাতে আছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই

আমি জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হই না। এ সব আমার মায়া-শক্তির খেলা। তাই বলছেন : 'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'। 'ভূতভৃৎ ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ'; আমার আত্মা ভূতবস্তুতে অবস্থিত না থেকেও সে সবের ধারক ও উৎপাদক। তিনিই শুধু আছেন আর কেউ নেই। এ জগতের অধিষ্ঠান তিনি, তিনিই সত্য আর সমস্ত অনিত্য, মিথ্যা।

যদি সত্যং ভবেদ্ বিশ্বং সুষুপ্তাবুপলভ্যতাম্।
যন্নোপলভ্যতে কিঞ্চিদতোঽসৎস্বপ্নবন্মৃষা॥ ২৩৪

অন্বয় : বিশ্বং (বিশ্ব) যদি সত্যং ভবেৎ (যদি সত্য হয়) সুষুপ্তৌ (তাহলে সুষুপ্তিতে) উপলভ্যতাম্ (উপলব্ধি হতো)যৎ (যেহেতু) কিঞ্চিৎ ন উপলভ্যতে (কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না) অতঃ (সেইজন্যে) অসৎ স্বপ্নবৎ মৃষা (স্বপ্নের মতো মিথ্যা)।

সরলার্থ : বিশ্ব যদি সত্য হতো তাহলে সুষুপ্তিতেও তার উপলব্ধি হতো। যেহেতু তা হয় না সেইহেতু বিশ্ব স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মতোই সত্তাহীন, মিথ্যা।

ব্যাখ্যা : বলছেন, জগৎ যদি সত্যই হবে তাহলে আমরা যখন সুষুপ্তিতে থাকি তখন কেন জগতের অনুভব হয় না ? আমার জাগ্রত অবস্থায় আমি জগৎ দেখছি। আমরা যখন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি তখনও জগৎকে দেখতে পাই—কত জায়গায় যাচ্ছি কত কি করছি, কাজেই জগতের ধারণা একটা থাকছে। কিন্তু সুষুপ্তির সময় তো আমাদের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সব নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, সেই অবস্থায় আমরা জগৎকে দেখতে পাই না— জগৎ যদি সত্য হতো তাহলে নিশ্চয় দেখতে পেতাম। বিশ্ব যদি সত্য হতো তাহলে সুষুপ্তির সময়ও জগৎ থাকত। 'যৎ ন উপলভ্যতে কিঞ্চিদ্ অতঃ অসদ্ স্বপ্নবৎ মৃষা'; যখন সুষুপ্তিতে উপলব্ধি হলো না তখন এটা স্বপ্নের মতোই মিথ্যা। জগৎ যে মিথ্যা তার প্রমাণ হচ্ছে, এটা শুধু জাগা অবস্থায় সত্য, স্বপ্ন অবস্থায় সত্য কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় আর একে উপলব্ধি করতে পারি না। রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো আমরা জগৎটাকে দেখছি, সেটা অজ্ঞানের জন্যে। জ্ঞান হলেই শুধু দড়ি দেখব, ব্রহ্ম দেখব।

অতঃ পৃথঙ্নাস্তি জগৎ পরাত্মনঃ পৃথক্ প্রতীতিস্তু মৃষা গুণাদিবৎ।
আরোপিতস্যাস্তি কিমর্থবত্তাধিষ্ঠানমাভাতি তথা ভ্রমেণ॥ ২৩৫

অন্বয় : অতঃ (অতএব) পরাত্মনঃ (পরমাত্মা থেকে) পৃথক্ (ভিন্ন) জগৎ ন অস্তি (জগৎ নেই) পৃথক্ প্রতীতিঃ (ভিন্নতার ধারণা) তু (অবশ্যই) গুণাদিবৎ (আরোপিত গুণ ইত্যাদির মতো) মৃষা (মিথ্যা) আরোপিতস্য (যা আরোপিত তার) কিম্ অর্থবত্তা (কী অর্থ আছে) অধিষ্ঠানং (অধিষ্ঠান) তথা (সেই আরোপিত বস্তুরূপে) ভ্রমেণ (ভ্রমবশতঃ) আভাতি (প্রকাশ পায়)।

সরলার্থ : অতএব জগতের পরমাত্মা থেকে আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই। জগতের আলাদা একটা সত্তার ধারণা আরোপিত গুণাদির মতোই মিথ্যা। যা আরোপিত তার কীই বা সত্তা আছে? ভ্রমবশত অধিষ্ঠান আরোপিত বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়।

ব্যাখ্যা : পর পর কয়েকটি শ্লোকে বুঝিয়েছেন যে, জগৎটা মিথ্যা যখন একে নামরূপের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখি। এই জগৎই সত্য যখন একে ব্রহ্ম বলে জানি। এক সত্তা তার ওপর আমরা উপাধির ছাপ মেরে বলছি, এটা মানুষ, এটা উদ্ভিদ, এটা জন্তু। একই আত্মা, বিভিন্ন নাম রূপ চাপিয়ে পৃথক পৃথক বস্তু তৈরী করেছি। 'অতঃ পৃথঙ্ নাস্তি জগৎ পরাত্মনঃ'; পরমাত্মা থেকে জগৎ পৃথক নয়। ওই যে সাপ দেখেছিলাম সেটা দড়ি থেকে পৃথক নয়। তেমনি জগৎ ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয়। বলছেন, 'পৃথক্ প্রতীতিস্তু মৃষা গুণাদিবৎ'। আমরা পৃথক দেখি, পৃথক বলে যে আমাদের প্রতীতি হয়, এগুলো মিথ্যা, গুণের মতো। গুণ তো একটা কিছু আধারকে আশ্রয় করবে, সেই আধারই সত্য। তেমনি সাপ মিথ্যা, দড়ি সত্য। দড়িকে আশ্রয় করে সাপের মিথ্যা জ্ঞানটা থাকে। দড়িটা—আধার বা অধিষ্ঠান। তেমনি জগৎ মিথ্যা, তার পেছনে অধিষ্ঠান রূপে যে ব্রহ্ম আছেন, তিনিই সত্য। তারপর বলছেন, 'আরোপিতস্য-অস্তি কিম্-অর্থবত্তা'—আরোপিত বস্তুর কি-ই বা সত্তা আছে ? নাম রূপ হচ্ছে আরোপিত বস্তু। এদের একটা অধিষ্ঠান চাই, যার ওপর এদের আরোপ করা যায়। অধিষ্ঠান বাদ দিয়ে এদের কোন আলাদা সত্তা নেই। অধিষ্ঠানই সত্য, যেগুলো আরোপ করা হয়েছে সেগুলো মিথ্যা, নাম-রূপ মিথ্যা। 'অধিষ্ঠানং আভাতি তথা ভ্রমেণ'—অধিষ্ঠানই আরোপিত বস্তুরূপে ভুল করে প্রকাশিত হয়, তাই আরোপিত বস্তুকে সত্য বলে মনে হয়। সাপের মধ্যে দিয়ে দড়িই প্রকাশ পায়, জগতের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মই সবসময় প্রকাশ পাচ্ছেন। আমরা আমাদের ভুলের জন্যেই অধিষ্ঠান যিনি তাঁকে না দেখে তাঁর ওপর আরোপিত বস্তুটিকে দেখি, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে অধিষ্ঠানই প্রকাশ পান।

ভ্রান্তস্য যদ্ যদ্ ভ্রমতঃ প্রতীতং ব্রহ্মৈব তত্তদ্ রজতং হি শুক্তিঃ।
ইদন্তয়া ব্রহ্ম সদৈব রূপ্যতে ত্বারোপিতং ব্রহ্মণি নামমাত্রম্॥২৩৬

অন্বয় : ভ্রান্তস্য (অজ্ঞের কাছে) যৎ যৎ (যা যা) ভ্রমতঃ (ভ্রম থেকে) প্রতীতং (প্রতীত হয়) তৎ তৎ (সেই সেই বস্তু) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) শুক্তিঃ হি (শুক্তিই) রজতম্ (রজতরূপে দৃশ্যমান) ইদন্তয়া (এই জগৎরূপে) ব্রহ্ম সদা-এব (ব্রহ্ম সর্বদা) রূপ্যতে (প্রকাশ পান) তু ব্রহ্মণি (তাই ব্রহ্মে) আরোপিতং (আরোপিত জগৎ) নামমাত্রম্ (নামমাত্র)।

সরলার্থ : অজ্ঞ-ব্যক্তির কাছে যে-যে বস্তু ভ্রমবশত বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় সেই-সেই বস্তু ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। শুক্তিই রজতরূপে উদ্ভাসিত হয়। এই জগৎ রূপে ব্রহ্ম সদা প্রকাশিত কিন্তু ব্রহ্মে আরোপিত জগৎ শুধু নামমাত্র।

ব্যাখ্যা : একই কথা আবার বোঝাচ্ছেন। যেমন রজ্জু-সর্পের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, এখন উপমা দিচ্ছেন রজত-শুক্তির। শুক্তি মানে ঝিনুক। রোদ পড়ে ঝিনুক চক্‌চক্ করছে, মনে হচ্ছে রুপো। একটা সাদৃশ্য থাকা দরকার— দড়িকে সাপ ভাবছি কিন্তু যদি একটা চেয়ার পড়ে থাকত তাকে সাপ ভাবতাম না। কিছুটা সাদৃশ্য থাকা চাই, সাপ অনেকটা দড়ির মতো দেখতে বলেই দড়িকে সাপ ভাবছি। 'ভ্রান্তস্য যৎ যৎ ভ্রমতঃ প্রতীতং ব্রহ্ম-এব তৎ-তৎ রজতং হি শুক্তিঃ'; আমরা সবাই ভ্রান্ত, কিন্তু ভুল করে আমরা যা-যা দেখছি তা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। কারোর হয়তো চোখের অসুখ হয়েছে, সে সবকিছু দুটো দুটো দেখছে, এটা ভুল, যেমন জনডিস হলে যে সবকিছু হলুদ দেখায় সেটা ভুল। আমরা তেমনি মায়ার জন্যে, অজ্ঞানের জন্যে ভুল দেখছি। ভুল করে কি দেখছি ? ব্রহ্মকেই দেখছি, কিন্তু ব্রহ্মকে জগৎ মনে করছি। যে অজ্ঞ সে-ও ব্রহ্মই দেখে কিন্তু শুক্তিকে যেমন আমরা ভুল করে রজত মনে করি সেইরকম ভুল করে সে ব্রহ্মকে মানুষ ভাবে, কখনো শত্রু ভাবে কখনো মিত্র ভাবে। 'ইদন্তয়া ব্রহ্ম সদা-এব রূপ্যতে ত্বারোপিতং ব্রহ্মণি নামমাত্রম্', আগে তো জগৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এখন বলছেন, এই জগৎ ব্রহ্মই— এই যে নানা দেখছি আসলে সব ব্রহ্ম। সবসময় ব্রহ্মই বিরাজ করছেন, ব্রহ্মকেই দেখছি, 'তু-আরোপিতং ব্রহ্মণি নামমাত্রম্', ব্রহ্মের ওপর এইসব নামরূপ আরোপ করছি। ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলে চিনছি না, জগৎ বলে দেখছি। আসলে আমরা তাঁকেই দেখছি, চিনতে পারছি না। তিনি এক সত্তা তাঁকে নামরূপ দিয়ে চিহ্নিত করে বহু দেখছি, ভুল করছি।

অতঃ পরং ব্রহ্ম সদদ্বিতীয়ং বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং নিরঞ্জনম্।
প্রশান্তমাদ্যন্তবিহীনমক্রিয়ং নিরন্তরানন্দরসস্বরূপম্॥ ২৩৭
নিরস্তমায়াকৃতসর্বভেদং নিত্যং সুখং নিষ্কলমপ্রমেয়ম্।
অরূপমব্যক্তমনাখ্যমব্যয়ং জ্যোতিঃ স্বয়ং কিঞ্চিদিদং চকাস্তি॥ ২৩৮

অন্বয় : অতঃ (এই কারণে) কিঞ্চিৎ (যা কিছু) ইদং (এই জগৎ রূপে) চকাস্তি (প্রকাশ পাচ্ছে) [সেসব] পরং ব্রহ্ম (পরম ব্রহ্ম) [তিনি] সৎ-অদ্বিতীয়ং (সৎস্বরূপ অদ্বিতীয়) বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং (বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ) নিরঞ্জনম্ (মলিনতাহীন) প্রশান্তম্ (শান্ত)আদি-অন্ত-বিহীনম্ (অনাদি অনন্ত) অক্রিয়ং (ক্রিয়াহীন) নিরন্তর (ছেদহীন) আনন্দরসস্বরূপম্ (আনন্দরসস্বরূপ) নিরস্তমায়াকৃতসর্বভেদং (মায়াজনিত সমস্ত ভেদ

তাঁতে নিরস্ত হয়ে গেছে) নিত্যং সুখং (নিত্য-সুখস্বরূপ) নিষ্কলম্ (কলাহীন অর্থাৎ অখণ্ড হ্রাসবৃদ্ধিরহিত) অপ্রমেয়ম্ (প্রমাণের অবিষয়, পরিমাপ হয় না) অরূপম্ (রূপবর্জিত) অব্যক্তম্ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) অনাখ্যম্ (আখ্যাহীন) অব্যয়ং (ব্যয়-হীন) জ্যোতিঃস্বয়ং (স্বয়ং তিনি জ্যোতিস্বরূপ)।

সরলার্থ : এই কারণে (এই দৃশ্যমান জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম বলে) এই জগৎ রূপে যা কিছু প্রকাশিত সেসবই স্বরূপত পরম ব্রহ্ম। তিনি সৎস্বরূপ, অদ্বিতীয়, জ্ঞানস্বরূপ, নিরঞ্জন, প্রশান্ত, আদি-অন্ত-হীন। তিনি অক্রিয়, অখণ্ড, আনন্দস্বরূপ, মায়াকৃত ভেদশূন্য, নিত্য-সুখস্বরূপ, হ্রাসবৃদ্ধিরহিত। তিনি প্রমাণের অবিষয়। তাঁর পরিমাপ করা যায় না। তাঁর কোনও রূপ নেই। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাঁকে কোনও আখ্যা দেওয়া যায় না। তিনি অব্যয়, তাঁর কোনও ক্ষয় নেই নাশ নেই। তিনি জ্যোতিস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ।

ব্যাখ্যা : আগের পরপর কয়েকটি শ্লোকে বুঝিয়েছেন এ জগতের যে নানা রূপ দেখছি সে শুধু ভুলের জন্যে, আসলে সব সেই ব্রহ্ম, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। এখন বলছেন, ব্রহ্ম কিরকম। 'অতঃ পরং ব্রহ্ম সৎ-অদ্বিতীয়ং বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং নিরঞ্জনম্'—তিনি সৎস্বরূপ, অদ্বিতীয়, বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ; 'বিজ্ঞানঘনং', যেন জমাট বাঁধা জ্ঞান, তিনি 'নিরঞ্জনম্', তাঁর মধ্যে কোনও অঞ্জন নেই, মলিনতা নেই, 'প্রশান্তম্', তিনি শান্ত। কেন শান্ত ? কারণ সাধারণত যেখানে দুই থাকে সেখানে সংঘর্ষ হয়, সেখানে বিক্ষোভ থাকে, এখানে দুই তো নেই অদ্বিতীয়, কাজেই প্রশান্ত। 'আদি-অন্ত বিহীনম্', তাঁর আরম্ভ নেই, অন্তও নেই; যার আরম্ভ আছে তার অন্তও আছে, যার শুরু আছে তার শেষও আছে; 'অক্রিয়ম্', কার্য নেই, কোনও রকম ক্রিয়া নেই, চপলতা নেই, চাঞ্চল্য নেই। আমরা যখন কিছু করি, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করি, একটা কিছু পাবার জন্যে করি, একটা কামনা থাকে। তাঁর কোনও বাসনা নেই, অভাববোধ বা অপূর্ণতা নেই, তিনি আপ্তকাম। এইজন্যে তিনি নিষ্ক্রিয়, অক্রিয়। এটা লক্ষ্য করা যায় যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে সাধারণত নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়, তা না হলে বোঝানো যায় না। অক্রিয়, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, নিরুপাধিক ইত্যাদি সব নেতিবাচক শব্দ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। কারণ, তিনি আসলে কি রকম, সেটা সঠিকভাবে বলা যায় না। তাই, তিনি কি রকম নন, সেটা বলে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। 'নিরন্তর-আনন্দরসস্বরূপম্'; 'নিরন্তর', কোন অন্তর নেই, কোন ছেদ নেই, uninterrupted। 'আনন্দরসস্বরূপম্', শুধু আনন্দ, আনন্দরস, আনন্দের ধারা, অবিমিশ্র আনন্দ। আমাদের যত আনন্দ সব আনন্দের উৎপত্তি ঈশ্বর, সে বৈষয়িক

আনন্দ হোক আর অন্য আনন্দ হোক। আমরা ভুল করে অন্য আনন্দের পিছনে ছুটি, কিন্তু ঈশ্বরের আনন্দই আনন্দ তার কোনও ছেদ নেই। তাই ঈশ্বরকে যে ভালোবাসে তার কোনও দুঃখ থাকে না, সে সবসময় আনন্দে ডুবে থাকে। 'নিরস্তমায়াকৃতসর্বভেদম্'; এই যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ, এই ভেদ কোথা থেকে আসছে? বস্তুত আমাদের মধ্যে কোনও ভেদ নেই, আমরা এক, কিন্তু ভেদ যেটা দেখছি সেটা মায়াকৃত। মায়ার জন্যে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, ভালো-মন্দ কত রকম বিচিত্র বিপরীত জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু এসব উপাধি, চাপানো জিনিস, মিথ্যা। মায়া থাকলে এই সব ভেদ থাকে। কিন্তু ব্রহ্মে মায়া নেই তাই সেখানে সব ভেদ, সব বৈচিত্র নিরস্ত হয়ে গেছে। 'নিত্যং সুখং নিষ্কলম্ অপ্রমেয়ম্', তিনি নিত্য, তিনি সুখস্বরূপ, তিনি 'নিষ্কলম্', অংশ নেই, কোনও কলা নেই, খণ্ড নেই, অখণ্ড। টুকরো টুকরো, এখানে একটু ওখানে একটু, এরকম নন। সম্পূর্ণ। 'অপ্রমেয়ম্', তিনি প্রমাণের অবিষয়,তাঁর কোন ইয়ত্তা করা যায় না, মাপা যায় না; দ্বিতীয় বস্তু থাকলে তবে মাপা যায়, এক তিনি রয়েছেন, দ্বিতীয় কিছু নেই কাকে দিয়ে মাপবো ? 'অরূপম্-অব্যক্তম্-অনাখ্যম্-অব্যয়ম্'; 'অরূপম্', কোনও রূপ নেই, 'অব্যক্তম্', ব্যক্ত নন, তাঁকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, দেখতে পাওয়া যায় না, তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কোনও আখ্যা দেওয়া যায় না, নাম দেওয়া যায় না, designate করা যায় না, 'এই' বলে চিহ্নিত করা যায় না। 'অব্যয়ম্', ব্যয় নেই ক্ষয় নেই। ক্ষয় নেই মানে বৃদ্ধিও নেই—উলটোটাও মেনে নিতে হবে। 'জ্যোতিঃ স্বয়ং'—জ্যোতিস্বরূপ। 'কিঞ্চিৎ-ইদং চকাস্তি'; তিনি একমাত্র বস্তু, 'চকাস্তি'—উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাচ্ছেন। সবকিছুর মধ্যে দিয়ে তিনিই উদ্ভাসিত হচ্ছেন। শুধু তিনিই আছেন আর সৎস্বরূপ তাঁর প্রভাবে আমরাও আছি। তাঁর যেন ছায়া পড়েছে আমাদের ওপর, তিনি আছেন বলেই আমরা আছি।

জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানশূন্যমনন্তং নির্বিকল্পকম্।
কেবলাখণ্ডচিন্মাত্রং পরং তত্ত্বং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৩৯

অন্বয় : জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান-শূন্যম্ (জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান—এই তিনটিই নেই) অনন্তম্ (দেশ কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন, অন্তহীন) নির্বিকল্পকম্ (কোনও বিকল্প নেই) কেবল-অখণ্ড-চিৎ-মাত্রং (কেবল অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ) পরং তত্ত্বং (পরম তত্ত্বকে) বুধাঃ (সত্যদর্শী পণ্ডিতরা) বিদুঃ (জানেন)।

সরলার্থ : জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান, এই তিনটিই তাঁর মধ্যে নেই। তিনি অন্তহীন, তাঁর কোনও বিকল্প নেই। তিনি অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপ। এই পরমতত্ত্বকে ব্রহ্মনিষ্ঠ পণ্ডিতগণ জানেন।

ব্যাখ্যা : পরম ব্রহ্ম যে কিরকম সেটা আগের শ্লোকে বলার চেষ্টা করেছেন, এখানে আবার সেই কথাই আর একটু বুঝিয়ে বলছেন। 'জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান শূন্যম্' এই তিনটিই তাঁর মধ্যে নেই। জ্ঞাতৃ মানে যে জানছে, জ্ঞেয় মানে যা জানছি, জ্ঞান মানে এই জানা ব্যাপারটা। এই তিনটি পৃথকভাবে যে কোন জাগতিক জ্ঞানে থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম-জ্ঞানে এই তিনটির ভেদ থাকে না, 'ত্রিপুটীভেদ' থাকে না। 'অনন্তম্'—তাঁর অন্ত নেই, 'নির্বিকল্পকম্'—কোনও বিকল্প নেই, পণ্ডিত -মূর্খ, ধনী-দরিদ্র এসব বিকল্প, উপাধি। পাণ্ডিত্য যেমন বন্ধন—স্বামীজী বলছেন, সোনার শেকল—মূর্খতাও তেমনি বন্ধন, তাঁর এসব কিছু নেই। তাঁর মধ্যে 'দুই' নেই, 'বহু' নেই। তিনি এক, এক অবস্থায় আছেন। 'কেবল-অখণ্ড - চিৎ-মাত্রং'। 'কেবল' একটা অদ্ভুত কথা অর্থাৎ শুধু তিনি আছেন, কোনও বৈচিত্র নেই; 'অখণ্ডচিৎমাত্রং'—শুধু চৈতন্য,এক অখণ্ড চৈতন্য। 'পরং তত্ত্বং বিদুঃ বুধাঃ'; পরম তত্ত্ব অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান; যাঁদের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে শাস্ত্রজ্ঞান স্পষ্ট হয়েছে, তাঁরা তাঁকে জানেন। আমরা জানি না, তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। তাঁরা বলে দিচ্ছেন কিরকমভাবে বিচার করতে হবে। সেটা আমায় করে দেখতে হবে, আচরণ করে বুঝে নিতে হবে।

অহেয়মনুপাদেয়ং মনোবাচামগোচরম্।
অপ্রমেয়মনাদ্যন্তং ব্রহ্ম পূর্ণমহং মহঃ ॥২৪০

অন্বয় : অহেয়ম্ (অত্যাজ্য) অনুপাদেয়ম্ (যে বস্তুকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়) মনোবাচাম্-অগোচরম্ (বাক্য ও মনের অগোচর) অপ্রমেয়ম্ (পরিমাপ করা যায় না) অনাদি-অন্তং (আদি ও অন্ত হীন) পূর্ণং ব্রহ্ম (পূর্ণব্রহ্ম) মহঃ (মহিমান্বিত, অলৌকিক তেজঃস্বরূপ) অহম্ (আমি)।

সরলার্থ : অত্যাজ্য, অনুপাদেয়, বাক্যমনাতীত, অপ্রমেয়, আদি-অন্ত হীন, মহান তেজঃস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মই আমি।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অহেয়ম্-অনুপাদেয়ম্'—অত্যাজ্য, অগ্রাহ্য; যা আমরা ত্যাগ করতে পারি না তাই 'অহেয়ম্'; হেয় মানে যা ত্যাগ করতে পারি, ত্যাজ্য, আর উপাদেয় মানে যা গ্রহণ করতে পারি। একটা জিনিস যেটা আমার থেকে আলাদা সেটাই আমরা ত্যাগ করতে পারি বা গ্রহণ করতে পারি—আমি তো নিজেকে ত্যাগ করতে পারি না বা গ্রহণ করতে পারি না। আত্মাকে কেউ ত্যাগ করতে পারে না, তিনিই দেহকে ত্যাগ করেন, আমরা বলি উনি দেহত্যাগ করেছেন। আত্মা এমন একটা জিনিস নয় যে সেটা নিয়ে একজন আর একজনকে দিয়ে দেবে। আত্মাকে ত্যাগও করতে পারা যায় না গ্রহণও করতে পারা যায় না। 'মনোবাচাম্-অগোচরম্';

তিনি বাক্যমনাতীত, ভাষায় তাঁকে প্রকাশ করা যায় না, মন দিয়ে তাঁকে ধরতে পারা যায় না। 'অপ্রমেয়ম্'— তাঁকে মাপা যায় না,দুই নেই তো কিসের তুলনায় তাঁর পরিমাপ হবে? 'অনাদি-অন্তং', আদি নেই, অন্ত নেই। 'ব্রহ্ম পূর্ণম্-অহং মহঃ'; আমিই সেই পূর্ণ-ব্রহ্ম; 'মহঃ'—মহঃ মানে মহৎ, আর একটা অর্থ তেজঃস্বরূপ। ব্রহ্ম মানে তো বৃহত্তম, আমরা তাঁকে কি যে বলি বুঝতে পারি না তাই ব্রহ্ম বলি। আবার কিছু বলে বোঝানো যায় না বলে বলি 'তৎ'। 'তৎ' শব্দটাই ঠিক শব্দ— সে, তিনি। যাঁকে জানি না তাঁকে এইভাবে বলি। ব্রহ্ম মানে বৃহত্তম। বললেই মনে হবে ছোটটা কি ব্রহ্ম নয় ? সবই তো তিনি, তিনিই একমাত্র আছেন। 'অহং মহঃ'; আমিই সেই মহৎ, মহিমান্বিত পরম সত্তা। কিছু বলতে পারি না, ভাষা দিয়ে বর্ণনা করতে পারি না, চিন্তা দিয়ে ধরতে পারি না, কিন্তু আমিই সেই মহান পূর্ণ ব্রহ্ম।

তত্ত্বং পদাভ্যামভিধীয়মানয়োর্ব্রহ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োর্যদিত্থম্।
শ্রুত্যা তয়োস্তত্ত্বমসীতি সম্যগেকত্বমেব প্রতিপাদ্যতে মুহুঃ ॥২৪১
ঐক্যং তয়োর্লক্ষিতয়োর্ন বাচ্যয়োর্নিগদ্যতেঽন্যোন্যবিরুদ্ধধর্মিণোঃ।
খদ্যোতভান্বোরিব রাজভৃত্যয়োঃ কূপাম্বুরাশ্যোঃ পরমাণুমের্বোঃ ॥২৪২

অন্বয় : যৎ (যে জন্যে) তত্ত্বমসি-ইতি শ্রুত্যা (তত্ত্বমসি এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা) ইত্থম্ (এইরকমভাবে) তৎ-ত্বং পদাভ্যাম্ (তৎ ও ত্বং এই দুটি পদ থেকে) তয়োঃ (তাদের) অভিধীয়মানয়োঃ (লক্ষিত ভাবযুক্ত) শোধিতয়োঃ (শোধিত) ব্রহ্ম-আত্মনোঃ (ব্রহ্ম ও আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার) সম্যক্-একত্বম্-এব (সম্পূর্ণ একত্বই) প্রতিপাদ্যতে মুহুঃ (বারবার প্রতিপাদিত হয়) [তা হচ্ছে] তয়োঃ (তাদের) ঐক্যং (একত্ব) লক্ষিতয়োঃ (লক্ষিত অর্থের) নিগদ্যতে (উক্তিরূপে এসেছে) অন্যোন্যবিরুদ্ধ- ধর্মিণোঃ (পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী বস্তুর) বাচ্যয়োঃ ন (আক্ষরিক অর্থের নয়) খদ্যোতভান্বোঃ (জোনাকিপোকার ও সূর্যের) রাজভৃত্যয়োঃ (রাজার ও ভৃত্যের) কূপাম্বুরাশ্যোঃ (কূপের ও জলরাশির বা সমুদ্রের) পরমাণুমের্বোঃ (পরমাণুর ও মেরুর) ইব (ন্যায়)।

সরলার্থ : যে জন্যে 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা লক্ষিত ভাবযুক্ত ও শোধিত ব্রহ্ম ও জীবাত্মার সম্পূর্ণ একত্ব মুহুর্মুহু প্রতিপাদিত হয়, তা হচ্ছে এদের ঐক্য লক্ষিত অর্থের, পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী বস্তুর আক্ষরিক অর্থের উক্তিতে নয়। উপমা— জোনাকি ও সূর্য, রাজা ও ভৃত্য, কূপ ও সমুদ্র, পরমাণু ও মেরুপর্বত। এই বিরুদ্ধভাবযুক্ত বস্তুর মধ্যে ঐক্য যেমন আক্ষরিক অর্থে সম্ভব নয় কিন্তু আয়তন এবং পদ বর্জন করলে সম্ভব তেমনি ব্রহ্ম ও জীবের একত্বও আক্ষরিক অর্থে অসম্ভব কিন্তু উপাধি বর্জন করলে অর্থাৎ শোধন করে নিলে সম্ভব।

ব্যাখ্যা : এবার যা বলছেন, তা মহাবাক্য সম্বন্ধে। 'তত্ত্বং পদাভ্যামভিধীয়মানয়োঃ ব্রহ্ম-আত্মনঃ শোধিতয়োঃ যৎ-ইত্থম্'। গুরু বলছেন, 'তত্ত্বমসি'— তুমিই সেই। 'তৎ'—তিনি; 'ত্বম্'—তুমি। 'তৎ-ত্বম্' এই যে 'পদাভ্যাম্' অর্থাৎ দুটো শব্দ, এদের 'অভিধীয়মানয়োঃ'—লক্ষণীয় অর্থের ব্যবহার করছেন এখানে। কাকে লক্ষ্য করে বলছেন ? স্বরূপত এঁরা যে-ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে 'তৎ' আর 'ত্বম্' শব্দ দুটি ব্যবহার করছেন। 'ব্রহ্ম-আত্মনোঃ শোধিতয়োঃ যৎ ইত্থম্'; 'ব্রহ্ম-আত্মনোঃ' —এখানে ব্রহ্ম অর্থে ঈশ্বর বোঝাচ্ছেন আর আত্মা অর্থে জীবাত্মা। 'শোধিতয়োঃ' — শুদ্ধ করা হয়েছে, শোধন করা হয়েছে। ঈশ্বর আর জীবাত্মা এই দুয়ের যা উপাধি তা মুছে ফেলা হয়েছে। উপাধি মুছে ফেললে কি দাঁড়াবে ? দুই-ই এক । ব্রহ্ম আর জীবাত্মা এক। 'শ্রুত্যা তয়োঃ-তত্ত্বমসি ইতি সম্যক্ -একত্বম্-এব প্রতিপাদ্যতে মুহুঃ'—শ্রুতি বারবার করে 'তৎ' আর 'ত্বম্'-এর এই একত্ব ঘোষণা করছেন, ব্রহ্ম আর জীবাত্মার একত্ব প্রতিপাদন করছেন। এই একত্ব বুঝতে গেলে মনটাকে শুদ্ধ করতে হবে, ধুয়ে নিতে হবে, আমাদের যে উপাধি সেগুলো সরিয়ে দিতে হবে। গুরু যে আমাকে 'ত্বম্' বলছেন, সেটা উপাধি-সহ আমাকে বলছেন। দেহ-মন-বুদ্ধি, পঞ্চকোশ—এসব আছে তো, এগুলিই উপাধি। অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ, মনোময় কোশ, বিজ্ঞানময় কোশ, আনন্দময় কোশ—স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, একটার পর একটা স্তর আসছে। জীবের উপাধি এগুলি। আর ঈশ্বরের উপাধি কি? না মায়া। ব্রহ্ম নির্গুণ নিরুপাধিক। মায়া আশ্রয় করে তিনি ঈশ্বর হয়েছেন, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন। প্রলয়ের সময়ে তিনি বীজাকারে অব্যক্ত হয়ে থাকছেন, আবার স্থিতির সময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্যক্ত হয়ে প্রকাশ হচ্ছেন। আমাদের যেমন শরীর ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি তাঁরও যে প্রকাশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তা ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি তখন অব্যক্ত হয়ে যান, আবার সৃষ্টির সময় স্বেচ্ছায় নিজেকে ব্যক্ত করেন। এটাই তাঁর উপাধি আর আমাদের এই পঞ্চকোশের উপাধি। তুমি যদি উপাধির অংশটা বাদ দাও, তাহলে যা থাকল তাতে দুই-ই এক। এক তিনিই আছেন, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনিই এই পঞ্চকোশের দেহের মধ্যে। তফাতটা কোথায়? শুধু এই দেহের আয়তনের তফাত। তুমি যদি এই উপাধি-অংশটা বাদ দাও তাহলে এক আত্মা, কখনও তিনি এই ছোট দেহের মধ্যে, আবার কখনও সর্বভূতে, সর্বজীবের মধ্যে থেকে সর্বব্যাপী হয়ে বিরাজ করছেন, কিন্তু সেই এক আত্মা। উপাধি মুছে ফেললে জীব ও ঈশ্বর এক। বিন্দু সিন্ধুতে মিশে গেলো। বিন্দু তার উপাধি ত্যাগ করে সিন্ধুতে মিশে গেলো। মুহুর্মুহু শ্রুতি এই কথাই বলছেন। মনে রাখতে হবে যখন বলছেন 'তত্ত্বমসি' তখন বাচ্যার্থটা নিও না,আক্ষরিকভাবে নিও না। একটা হচ্ছে আক্ষরিক অর্থ আর একটা অন্তর্নিহিত অর্থ—অন্তর্নিহিত অর্থটা নাও।

'ঐক্যং তয়োঃ লক্ষিতয়োঃ ন বাচ্যয়োঃ নিগদ্যতে'; অন্তর্নিহিত অর্থ নিলে জীব আর ব্রহ্ম এক। 'অন্যোন্য-বিরুদ্ধধর্মিণোঃ'— নানা বিরুদ্ধ ধর্ম আছে, ছোট-বড়, ভালো-মন্দ, এগুলো উপাধি, এগুলো বাদ দাও কিন্তু অন্তর্নিহিত ঐক্যটা দেখো, এটাই লক্ষিত অর্থ। উদাহরণ দিয়ে বলছেন, 'খদ্যোত ভান্বোরিব রাজভৃত্যয়োঃ কূপ-অম্বুরাশ্যোঃ পরমাণুমের্বোঃ'; জোনাকি পোকা আর সূর্য এক হয় কি করে? এদের ঐক্য হচ্ছে আলো দিচ্ছে। বেশী-কমটা ধরতে হবে না, আলো দেওয়াটাই এদের ঐক্য। 'রাজভৃত্যয়োঃ', রাজা আর ভৃত্য, এরা দুই, এক হলো কি করে? পদমর্যাদায় আলাদা কিন্তু মানুষ হিসেবে এক। আবার বলছেন, 'কূপ অম্বুরাশ্যোঃ'—কূপ আর সমুদ্র, আয়তনে অনেক তফাত কিন্তু স্বরূপত জল হিসেবে এক। পরমাণু আর মেরু পর্বত, একই উপাদান কিন্তু আকার বিভিন্ন—আকারটা বাদ দিলে এক। এই বিভিন্ন আকার, আয়তন এগুলো উপাধি এগুলো বাদ দিলে স্বরূপত এক, তেমনি উপাধি বাদ দিলে সব তিনি, সব ব্রহ্ম,—'অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান'। আমিই তিনি তিনিই আমি।

তয়োর্বিরোধোঽয়মুপাধিকল্পিতো ন বাস্তবঃ কশ্চিদুপাধিরেষঃ।
ঈশস্য মায়া মহদাদিকারণং জীবস্য কার্যং শৃণু পঞ্চকোশম্॥ ২৪৩

অন্বয়: তয়োঃ (তাদের) অয়ং বিরোধঃ (এই বিরোধ) উপাধিকল্পিতঃ (উপাধিদ্বারা কল্পিত) এষঃ উপাধিঃ (এই উপাধি) কশ্চিৎ (কিছু) বাস্তবঃ ন (বাস্তব নয়) শৃণু (শোন) ঈশস্য (ঈশ্বরের) [উপাধি] মহৎ-আদি-কারণং (মহৎ প্রভৃতির কারণরূপ) মায়া (মায়া) জীবস্য (জীবের) [উপাধি] কার্যং (মহৎ-আদির কার্য) পঞ্চকোশম্ (পঞ্চকোশ)।

সরলার্থ: তাদের অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব নিয়ে বিরোধ উপাধিকল্পিত। এই উপাধি বাস্তব কিছু নয়। উপাধি কি তা শোন—মহৎ-ইত্যাদির উৎপত্তির কারণ মায়া হচ্ছে ঈশ্বরের উপাধি, আর জীবের উপাধি হল মহৎ-ইত্যাদির পরিণাম পঞ্চকোশ।

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বুঝিয়েছেন, এখানে বলছেন তাদের অভেদত্ব নিয়ে আমরা যে বিরোধ করি সে বিরোধ উপাধিকল্পিত। ভেদ দেখি উপাধির জন্যে। উপাধি অংশে জীব ও ব্রহ্ম আলাদা, কিন্তু উপাধি তো একটা চাপানো জিনিস, আগন্তুক, এর বাস্তব সত্তা কিছু নেই। ঈশ্বর আর জীব, এদের মধ্যে তফাত কোথায়? তফাত মায়ায়। মায়া আছে বলে তিনি মহৎ হয়ে আছেন, অব্যক্ত হয়ে তিনি বীজাকারে আছেন, অনুলোম হয়ে আছেন। আবার তিনি নিজেকে বিস্তার করছেন, বিলোম হচ্ছেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ব্যক্ত হচ্ছেন, জীবের

মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছেন। ভগবান গীতায় অর্জুনকে বলছেন, দেখো প্রলয়কালে এই সমস্ত জীবজগৎ আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয়ে থাকে—অর্থাৎ কারণরূপে থাকে, বীজাকারে থাকে, অনুলোম হয়ে থাকে। আরও বলছেন, সৃষ্টির আরম্ভে আমি 'প্রকৃতিং স্বাম্ অবষ্টভ্য'(গী ৯।৮),আমার অবিদ্যারূপা মায়াশক্তিকে বশ করে এই জন্ম-মৃত্যুর অধীন সমস্ত জীব-জগৎকে বারবার সৃষ্টি করি। তার মানে এইসব পঞ্চকোশের শরীরে নানা জীবের আকারে তিনি বারবার ব্যাকৃত হচ্ছেন, নিজেকে বিস্তার করছেন, বিলোম হচ্ছেন। বলছেন, 'বিসৃজামি'—সৃষ্টি করি, কিন্তু আসলে নিজেকে ব্যক্ত করছেন। হিন্দুরা মনে করে ধবংস বা সৃষ্টি বলে কিছু নেই, রূপের পরিবর্তন, নামের পরিবর্তন, কিন্তু একই বস্তু। এখানেও তাই। তিনি বীজাকারে ছিলেন আবার সর্বজীবে ব্যক্ত হলেন, সর্বব্যাপী হলেন। কারণ কার্যে পরিণত হলো। কিন্তু ঈশ্বর মায়াধীশ, তিনি সব সময়ই আছেন, সবকিছুর মধ্যে আছেন, নির্লিপ্ত হয়ে আছেন। এইটাই বলতে চাইছেন যে জীবই ঈশ্বর। জীবের উপাধি পঞ্চকোশ আর ঈশ্বরের উপাধি মায়া—উপাধি সরিয়ে দিলেই জীব আর ঈশ্বর দুই-ই এক, শুধু ব্রহ্ম।

এতাবুপাধী পরজীবয়োস্তয়োঃ সম্যঙ্‌নিরাসে ন পরো ন জীবঃ।
রাজ্যং নরেন্দ্রস্য ভটস্য খেটকস্তয়োরপোহে ন ভটো ন রাজা॥ ২৪৪

অন্বয়: এতৌ (এই দুটি) পরজীবয়োঃ (ঈশ্বর এবং জীবের) উপাধী (উপাধি) তয়োঃ (এই দুই উপাধির) সম্যক্-নিরাসে (সম্পূর্ণভাবে নিরসন হলে) ন পরঃ ন জীবঃ (ঈশ্বর থাকেন না জীবও থাকে না) নরেন্দ্রস্য রাজ্যং (রাজার রাজ্য) ভটস্য (যোদ্ধার) খেটকঃ (শস্ত্র) তয়োঃ (সেই দুটির) অপোহে (অপসারণ হলে) ন ভটঃ (যোদ্ধা থাকে না) ন রাজা (রাজা থাকে না)।

সরলার্থ: জীব ও ঈশ্বরের এই দুটি উপাধি অর্থাৎ মায়াকৃত পঞ্চকোশ ও মহৎ-প্রকৃতির কারণরূপা মায়া, এদের নিরসন হলে ঈশ্বরও থাকেন না জীবও থাকে না। যেমন, যাঁর রাজ্য আছে তিনি রাজা, যিনি অস্ত্রধারণ করেছেন তিনি যোদ্ধা, কিন্তু রাজার যদি রাজ্য না থাকে আর যোদ্ধার যদি অস্ত্র না থাকে তাহলে রাজাও থাকছে না যোদ্ধাও থাকছে না (তখন রাজা যোদ্ধা দুজনেই শুধু মানুষ)।

ব্যাখ্যা: জীব আর ব্রহ্ম এক এই প্রসঙ্গ আবার করছেন। আমরা তো জীব আর ব্রহ্ম আলাদা ভাবি। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুল, অজ্ঞতা থেকে আসছে, আসলে এ দুটো আলাদা নয়। উপাধির জন্যে দুই দেখছি। বলছেন, 'এতৌ উপাধী পরজীবয়োঃ', 'পরঃ' মানে পরাত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর—যিনি শ্রেষ্ঠ—সংক্ষেপে বলা হচ্ছে পরঃ, আর জীব বলে জীবাত্মাকে বোঝাচ্ছেন। আমরা হচ্ছি জীবাত্মা, ঈশ্বর হচ্ছেন পরমাত্মা। বলছেন, 'এতৌ উপাধী পরজীবয়োঃ', ঈশ্বরের উপাধি

আর জীবের উপাধি; জীবের উপাধি পঞ্চকোশ আর ঈশ্বরের উপাধি মায়া ও মায়ার আশ্রয়ে যা কিছু হয়েছে সব, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এই মায়াটা যদি সরিয়ে নিই, আর আমি জীব আমার উপাধি এই পঞ্চকোশকে যদি সরিয়ে নিই তাহলে আমার আত্মা আর তাঁর আত্মা এক হয়ে গেলো। তাই বলছেন, 'তয়োঃ সম্যক্-নিরাসে ন পরঃ ন জীবঃ'। 'সম্যক্-নিরাসে'—উপাধি সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দিলে—'ন পরঃ ন জীবঃ'—পরমাত্মাও নেই জীবও নেই। তখন তাঁর আত্মা আর আমার আত্মা এক হয়ে গেলো। জীবের উপাধি পঞ্চকোশ আর ঈশ্বরের উপাধি মায়া, এ-দুটো সরে গেলেই তিনি আমি এক। কোন্ অংশে এক? আত্মা অংশে, চৈতন্য অংশে, অন্য অংশে নয়। তখন 'ন পরঃ ন জীবঃ', পরমেশ্বরও নেই জীবও নেই, শুধু অখণ্ডচৈতন্য বিদ্যমান। উদাহরণ দিয়ে বলছেন, 'রাজ্যং নরেন্দ্রস্য', রাজা, তাঁর উপাধি হচ্ছে রাজ্য। রাজত্বটা যদি চলে যায়,—রাজা হয়তো সিংহাসনচ্যুত হয়ে গেলো, তখন সে সাধারণ মানুষ। তেমনি 'ভটস্য খেটকঃ'; 'ভটঃ' মানে যোদ্ধা আর 'খেটকঃ' মানে অস্ত্র। যোদ্ধার উপাধি অস্ত্র। যে যোদ্ধা তার অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হলো, তখন সে সাধারণ লোক। 'তয়োঃ অপোহে', উপাধিগুলো বাদ দিয়ে দিলে 'ন ভটঃ ন রাজা' তখন যোদ্ধাও নেই, রাজাও নেই। উপাধির জন্যে একজন যোদ্ধা একজন রাজা। এই উপাধি অংশটা যদি বাদ দিই, এটা নিয়ে তো কেউ জন্মাইনি, এই অংশ দুটি যদি বাদ দিই তাহলে রাজা যোদ্ধা উভয়েই শুধু মানুষ। সেই রকমই জীবের উপাধি আর ঈশ্বরের উপাধি চলে গেলে থাকছে যা, তা সৎস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম।

অথাত আদেশ ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং নিষেধতি ব্রহ্মণি কল্পিতং দ্বয়ম্।
শ্রুতিপ্রমাণানুগৃহীতবোধাৎ তয়োর্নিরাসঃ করণীয় এব॥ ২৪৫

অন্বয়: 'অথাত আদেশঃ' ইতি শ্রুতিঃ ('অথাত আদেশঃ' এই শ্রুতিবাক্য) স্বয়ং (নিজে) ব্রহ্মণি কল্পিতং (ব্রহ্মে কল্পিত) দ্বয়ং (দুই দেখা) নিষেধতি (নিষেধ করছেন) শ্রুতি-প্রমাণ-অনুগৃহীত-বোধাৎ (শ্রুতি-প্রমাণ থেকে শাস্ত্রের অনুগ্রহে যে জ্ঞান লাভ হয় তার থেকে) তয়োঃ (কার্য ও কারণরূপ উপাধি দুটির) নিরাসঃ (অপসারণ) করণীয়ঃ এব (করাই কর্তব্য)।

সরলার্থ: 'অথাত আদেশঃ' এই শ্রুতিবাক্য স্বয়ং ব্রহ্মে দ্বৈতভাবের কল্পনা নিষিদ্ধ করছেন। শ্রুতি-প্রমাণ থেকে আহরিত শ্রুতিরই অনুগ্রহজাত শাস্ত্রজ্ঞান থেকে কার্য ও কারণরূপ দুটি উপাধিরই নিরসন কর্তব্য।

ব্যাখ্যা: এবার শ্রুতির কথা বলছেন। যুক্তি দিয়ে বললেন, উদাহরণ দিয়ে বললেন, তারপর আবার শ্রুতির কথা বলছেন। আগে বলেছেন এই সব সূক্ষ্মতত্ত্ব বোঝার

জন্যে যুক্তি ও শ্রুতি দুয়েরই সাহায্য চাই। শ্রুতি হচ্ছে শাস্ত্র। যুক্তি দিয়ে তো কত কিছু প্রমাণ করা যায়। যিনি খুব বুদ্ধিমান তিনি যুক্তি দিয়ে একটা প্রমাণ করে দিলেন আবার যিনি তাঁর চেয়েও বুদ্ধিমান তিনি অন্য যুক্তি দিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তটা খণ্ডন করে দিলেন। যুক্তি, reason, কখনও supreme নয়, শেষ কথা নয়। সেইজন্যে বলছেন যুক্তির সঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞান চাই। আমাদের শাস্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের শাস্ত্র হচ্ছে অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নয়। ব্যক্তির থেকে আসেনি। তাহলে কোথা থেকে এলো? আকাশ থেকে? না তা নয়। শাশ্বত যে 'সত্য' তা আত্মপ্রকাশ করেছে শুদ্ধমন, সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে, তাঁদের কাছে সত্য প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা নিজেদের গোপন রেখেছেন, কেউ সাধারণতঃ বলেননি আমার এই পরিচয়। সেই সত্য ব্যক্তি-পরম্পরায় চলে এসেছে, আজ সেই সত্য লিপিবদ্ধ হয়েছে আর তাকে আমরা শাস্ত্র বলছি। এই সত্য যাচাই করা যেতে পারে, যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা করা যেতে পারে। যা সত্য তা সবসময় সত্য। সত্য আমরা কাকে বলব? যা স্থান কাল সবকিছুর ঊর্ধ্বে সবসময় সত্য। তাই বলছেন শ্রুতি হচ্ছে সত্য, সে সত্যকে প্রচার করছে। অন্যান্য ধর্মে, একজন মহাপুরুষ এলেন, তিনি অনেক কথা বললেন, সবাই লিখে নিলো। কিন্তু দেখা যায় তাঁদের শিষ্য-শিষ্যারা যা লিপিবদ্ধ করেছে তার মধ্যে বিভেদ আছে। কত কথা বাদ হয়ে গেছে আবার প্রক্ষিপ্ত কত কথা বাইরে থেকে ঢুকে গেছে। এই তাদের শাস্ত্র। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র অপৌরুষেয়। কোনও ব্যক্তিকে আশ্রয় করে নয়,—impersonal truth, নৈর্ব্যক্তিক সত্য, সর্বকালীন সত্য, সর্ব দেশে সত্য।

এখানে বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা বলছেন: 'অথাত আদেশ ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং নিষেধতি'—স্বয়ং শাস্ত্র একে নিষেধ করে দিচ্ছেন। আগে যুক্তি দিয়ে, উপমা দিয়ে বললেন, জীব আর ব্রহ্ম এক, তফাত শুধু উপাধি। এখানে বলছেন, শাস্ত্রেও সেই একই কথা দেখতে পাচ্ছি। শাস্ত্র নিষেধ করে দিচ্ছেন। কি নিষেধ করছেন? 'ব্রহ্মণি কল্পিত দ্বয়ং', ব্রহ্মের ওপর দুই-এর কল্পনা নিষেধ করছেন। কি দুই? জীব আর ব্রহ্ম। উপাধির জন্যে দুই মনে হয়। শ্রুতি এই 'দুই' নিষেধ করছেন, উপাধি নিষেধ করছেন, কার্য ও কারণ নিষেধ করছেন। এখানে কোন দ্বৈতভাব নেই, অখণ্ড চৈতন্য। একটা যেন সমুদ্র, জ্ঞানসমুদ্র, তাকে যদি বাঁধ দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে ওই বাঁধগুলো উপাধি, এগুলো দিয়ে তাঁকে খণ্ড করছি কিন্তু তিনি 'অদ্বয়ং', তাঁকে এরকম খণ্ড খণ্ড করা যায় না। তাই বলছেন, 'অথাত আদেশঃ শ্রুতিঃ স্বয়ং নিষেধতি ব্রহ্মণি কল্পিতং দ্বয়ম্'; এক ব্রহ্ম, একে তুমি দুই দেখছ, জীবত্ব আরোপ করছ, এই আরোপ কল্পিত। 'শ্রুতি-প্রমাণ-অনুগৃহীত বোধাৎ', শাস্ত্রবাক্য যেন আশীর্বাদ; যেন অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। সেই অনুগ্রহটা

বুঝতে পেরে—'তয়োঃ নিরাসঃ করণীয় এব', এই উপাধি দুটোর নিরসন করতে হবে। জীবাত্মা আর পরমাত্মা, মানুষ আর ঈশ্বর এই উপাধি দুটো বর্জন করতে হবে। সবাই শাস্ত্রের কথা বুঝতে পারে না, শাস্ত্রের এই অনুগ্রহ যারা বুঝতে পেরেছে তারা ভাগ্যবান। শাস্ত্র বলছেন, ভালোমন্দ, ছোটবড়, এসব উপাধি, চাপানো জিনিস। যেন এক একটা ছাপ মারা হয়েছে—ভালোর ছাপ, মন্দর ছাপ, এইসব ছাপ দিয়ে আমরা সব আলাদা-আলাদা করছি। কিন্তু তিনি অভেদ-চৈতন্য, কোনও ভেদ নেই, এক। শুদ্ধ মন শুদ্ধ বুদ্ধি হলে এইসব শাস্ত্রবাক্যের ধারণা হয়, শাস্ত্রের অনুগ্রহ বুঝতে পারা যায়।

নেদং নেদং কল্পিতত্বান্ন সত্যং রজ্জুদৃষ্টব্যালবৎ স্বপ্নবচ্চ।
ইত্থং দৃশ্যং সাধু যুক্ত্যা ব্যাপোহ্য জ্ঞেয়ঃ পশ্চাদেকভাবস্তয়োর্যঃ॥ ২৪৬

অন্বয় : ন-ইদং, ন-ইদং (এ নয়, এ নয়) কল্পিতত্বাৎ (কল্পিত বলে) ন সত্যং (সত্য নয়) রজ্জু-দৃষ্ট-ব্যালবৎ (রজ্জুতে দৃষ্ট সর্পের মতো) চ স্বপ্নবৎ (ও স্বপ্নের মতো) ইত্থং (এই রকম ভাবে) যুক্ত্যা (যুক্তি সহায়) সাধু (বিদগ্ধভাবে) দৃশ্যং (যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাকে) ব্যাপোহ্য (অস্বীকার করে) পশ্চাৎ (পরে) তয়োঃ (জীব ও ব্রহ্মের) যঃ একভাবঃ (যে অদ্বৈত ভাব) [তাই] জ্ঞেয়ঃ (জানার বিষয়)।

সরলার্থ : 'এ নয়, এ নয়' এই রকম করে যা রজ্জুতে সর্পদর্শনের মতো ও স্বপ্নের মতো কল্পনা-আশ্রিত ও অসত্য, সেই সব দৃশ্যবস্তুকে সুযুক্তির সহায়ে অস্বীকার করে, পরে জীব ও ব্রহ্মের যে অভেদত্ব সেটাই জানতে হবে।

ব্যাখ্যা: জীব ও ব্রহ্ম এক, একথা কত ভাবে বললেন, এখন বোঝাচ্ছেন কি করে আমাদের এই দুই দেখার শেষ হবে। কি করে হবে ? 'দুই' দেখাটা যে কল্পনা সেটা বুঝতে হবে আর বিচার করে এই কল্পনাটা দূর করতে হবে। উদাহরণ দিচ্ছেন, রজ্জু-সর্পের। অন্ধকার পথ, একটা দড়ি পড়ে আছে, তাকে সাপ ভাবছি। এটা কি করে যাবে? বিচার করতে হবে। ন ইদং, ন ইদং, নেতি -নেতি । এইভাবে এগোতে হবে, কোন্টা সৎ আর কোন্টা অসৎ তার বিচার করতে হবে। অন্ধকারে দড়িটাকে সাপ মনে করছি, আলো এলেই ভুলটা ভাঙছে, দেখছি সাপ নয় দড়ি। 'ন ইদং ন ইদং'—এটা নয়, এটা নয় অর্থাৎ এটা সত্য নয়, 'কল্পিতত্বাৎ'—এটা কল্পিত, আমি কল্পনা করছি, যেমন 'রজ্জু ব্যালবৎ'; 'ব্যাল' মানে সাপ, রজ্জুকে যেমন সাপ দেখছি। আবার 'স্বপ্নবৎ চ'—স্বপ্নে কত কি দেখি, সেইরকম। সুখস্বপ্ন দেখি আবার কত দুঃস্বপ্ন দেখি, ঘুম ভাঙলে দেখছি সব মিথ্যা। কিন্তু যখন স্বপ্ন দেখি তখন সব সত্যি বলেই মনে হয়। এই জগৎটা আমরা এমনি ভাবেই দেখছি, ব্রহ্মকে

দেখতে পাচ্ছি না। যদি দেখতে পেতাম সবই ব্রহ্ম, তাহলে সেটা ঠিক দেখা হতো; কিন্তু তা তো দেখছি না, বহু দেখছি, বৈচিত্র দেখছি, নানা দেখছি। এই দেখাটা মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। 'ইত্থং দৃশ্যং সাধু যুক্ত্যা', যুক্তি দিয়ে বুঝব, যা দেখছি তা সত্য নয়। শুধু যুক্তি নয় শ্রুতিও তাই বলছেন। 'দৃশ্যং', এই সমস্ত অভিজ্ঞতা, দৃশ্য, যা আমরা জগতে দেখি; 'সাধু যুক্ত্যা', পরিণত সঠিক যুক্তি দিয়ে; 'ব্যাপোহ্য', বর্জন করে, অস্বীকার করে; কি করতে হবে? 'জ্ঞেয়ঃ পশ্চাৎ তয়োঃ যঃ একভাবঃ'; 'তয়োঃ', এই দুই-এর অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের; 'যঃ এক ভাবঃ', এই যে এক ভাব এটা আমাদের জানতে হবে। 'নেতি-নেতি' করে জীবের দেহ ইত্যাদি উপাধি আর ঈশ্বরের উপাধি যে মায়া, এ দুটো বাদ দিতে হবে। এ দুটো বাদ দিলে সব এক। যুক্তি দিয়ে আমরা এটা বলছি আবার শ্রুতিও এক কথাই বলছেন—জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয়।

ততস্তু তৌ লক্ষণয়া সুলক্ষ্যৌ তয়োরখণ্ডৈকরসত্বসিদ্ধয়ে।
নালং জহত্যা ন তথাঽজহত্যা কিন্তূভয়ার্থাত্মিকয়ৈব ভাব্যম্॥ ২৪৭

অন্বয়: ততঃ তু (তারপরে) তয়োঃ (তাদের অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের) অখণ্ড-একরসত্ব-সিদ্ধয়ে (অখণ্ডত্ব ও একরসত্ব প্রমাণ করার জন্যে) তৌ (তাঁদের) লক্ষণয়া (লক্ষণা দ্বারা) সুলক্ষ্যৌ (ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে) জহত্যা (জহতী-লক্ষণা দ্বারা) ন অলং (যথেষ্ট হবে না) তথা (সেই রকম) অজহত্যা (অজহতী-লক্ষণা দ্বারাও) ন (হবে না) কিন্তু (কিন্তু) উভয়-অর্থ-আত্মিকয়া এব (জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা এই দুটোকে একত্র করেই) ভাব্যম্ (আত্মস্বরূপের বিচার করতে হবে)।

সরলার্থ: তারপর, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ভাব জানার পর, এই দুয়ের অখণ্ডত্ব ও একরসত্ব প্রমাণ করার জন্যে এদের লক্ষণা দ্বারা বিশ্লেষণ করে বিচার করতে হবে। জহতী-লক্ষণা দ্বারা এই দুই-এর ঐক্য বোঝা যাবে না, অজহতী-লক্ষণা দ্বারাও নয়; এই দুই লক্ষণা একত্র করে জহতী-অজহতী লক্ষণা বা ভাগ-লক্ষণার দ্বারা বিচার করে আত্মস্বরূপের ধারণা করতে হবে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, জীব ও ব্রহ্মের যে একভাব সেটা তো শাস্ত্রবাক্য মনে রেখে আর যুক্তির সাহায্যে বুঝতে হবে, কিন্তু সেই যুক্তির প্রয়োগ কিভাবে হবে? সেইটা বোঝাবার জন্যে লক্ষণা কথাটার ব্যবহার করছেন। লক্ষণা বলতে শব্দের একটা বিশেষ বৃত্তিকে বোঝায়। কোনও শব্দের প্রধান যে অর্থ সেটা ধরলে অনেক সময় একটা কিম্ভূতকিমাকার মানে হয়। তখন আমরা সেই মানেটা ছেড়ে কিছু ত্যাজ্য-গ্রাহ্য করে শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে অথচ ঠিক আক্ষরিক অর্থ নয় এইরকম একটা মানে ধরে ব্যাপারটা বুঝি। এই জিনিসটাকে শব্দের লক্ষণাবৃত্তি বলে। এই

লক্ষণাবৃত্তি তিন রকমের—জহতী, অজহতী ও ভাগ বা ভাগত্যাগ লক্ষণা বা জহৎ-অজহৎ লক্ষণা। জহতী লক্ষণার উদাহরণ হচ্ছে—'গঙ্গায়াম্ ঘোষঃ', মানে গঙ্গাতীরে ঘোষপল্লী। 'গঙ্গায়াম্' বলতে তো আমরা মুখ্য অর্থ গঙ্গানদীতে বলে জানি, এখানে কিন্তু সেটা ত্যাগ করে গঙ্গাতীরে বলে বুঝতে হবে। অজহতী লক্ষণার উদাহরণ—শ্বেতঃ ধাবতি। সাদা দৌড়য় কি করে? মানে একটা সাদা ঘোড়া বা আর কোনও সাদা প্রাণী দৌড়চ্ছে। এখানে সাদার সঙ্গে ঘোড়া অথবা অন্য কোনও সাদা প্রাণী যোগ করতে হচ্ছে। আমাদের শাস্ত্র এইরকম, যেন ঘনীভূত ভাব। তাই গুরুমুখে এর যথার্থ ব্যাখ্যা শুনতে হয়, শুধু শব্দার্থ বুঝলে শাস্ত্র বোঝা হয় না। বেদান্ত তো বারবার বলছেন 'জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ', জীব আর ব্রহ্ম এক, এটাই তো সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমরা জীব আর ব্রহ্ম আলাদা দেখি, সেটা অজ্ঞান, জ্ঞান হচ্ছে এক দেখা। তাহলে কি করতে হবে? 'ততস্তু তৌ লক্ষণয়া'; 'ততঃ', অতএব; 'তৌ', জীব ও ব্রহ্মের; 'লক্ষণয়া', লক্ষণগুলি দিয়ে; 'সুলক্ষ্যৌ', ভালোভাবে বিচার করলে; 'তয়োঃ-অখণ্ড-একরসত্ব সিদ্ধয়ে', এই দুয়ের একত্ব, একরসত্ব, সিদ্ধ হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, বিস্তীর্ণ জলরাশি, তাতে একটা বাঁশ ফেলে দিলে দেখায় যেন ভাগ হয়ে গেছে কিন্তু বাঁশটা সরিয়ে দিলেই অখণ্ড জলরাশি, কোন ভাগ নেই। তেমনি এই বিশ্বচরাচর বৈচিত্রে ভরা। জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, গাছপালা— এইসব নাম আর রূপ। এই নাম-রূপকে বাদ দিলে কি থাকছে? এক অখণ্ড সত্তা, বিশাল অন্তহীন অস্তিত্বের সমুদ্র; 'একরসঃ অখণ্ডঃ', কোনও ভাগ নেই, খণ্ড নেই, এক সত্তা। 'নালং জহত্যা ন তথা-অজহত্যা'; আগে যে আমরা করলাম, জহতি, অজহতি, কিছু ত্যাগ করতে হবে আবার কিছু সংযোগ করতে হবে, সেইভাবে জীব ও ঈশ্বরের যে লক্ষণগুলো প্রধানত চোখে পড়ে সেগুলো বাদ দিতে হবে আর যে চৈতন্য অংশ সেটা ধরতে হবে। কিন্তু 'ন অলং', এতেও যথেষ্ট হবে না, 'উভয়-অর্থ-আত্মিকয়া এব ভাব্যম্'; এই দুই অর্থ এক করে নিয়ে তবে ধারণা করতে হবে। সেটা কিভাবে হবে পরের শ্লোকে তা আসছে।

স দেবদত্তোঽয়মিতীহ চৈকতা বিরুদ্ধধর্মাংশমপাস্য কথ্যতে।
যথা তথা তত্ত্বমসীতিবাক্যে বিরুদ্ধধর্মানুভয়ত্র হিত্বা।। ২৪৮
সংলক্ষ্য চিন্মাত্রতয়া সদাত্মনোরখণ্ডভাবঃ পরিচীয়তে বুধৈঃ।
এবং মহাবাক্যশতেন কথ্যতে ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যমখণ্ডভাবঃ ।।২৪৯

অন্বয়: সঃ দেবদত্তঃ (সেই দেবদত্ত) অয়ম্-ইতি (এইই বটে) ইহ (এখানে) বিরুদ্ধ-ধর্মাংশম্ (দেশকাল ইত্যাদি বিরুদ্ধধর্ম-অংশ) অপাস্য (ত্যাগ করে) যথা চ (যে ভাবে) একতা (ব্যক্তিসত্তার অভিন্নতা) কথ্যতে (বলা হয়) তথা (সেই রকম ভাবে) তৎ-ত্বম্-অসি ইতি বাক্যে ('তত্ত্বমসি' এই বেদান্তের মহাবাক্যে) উভয়ত্র (জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের) বিরুদ্ধ-ধর্মান্ (বিরুদ্ধ ধর্মগুলোকে) হিত্বা (ত্যাগ করে) সৎ-আত্মনোঃ (ব্রহ্ম ও জীবের) ঐক্যম্-অখণ্ড ভাবঃ (একত্ব ও অভেদ ভাব) চিন্মাত্রতয়া (চৈতন্য মাত্র লক্ষণের দ্বারা) সংলক্ষ্য (সঠিকভাবে বিচার করে) বুধৈঃ (আত্মজ্ঞ পুরুষগণ কর্তৃক) পরিচীয়তে (চিনিয়ে দেওয়া হয়) এবং (এই ভাবে) ব্রহ্ম-আত্মনোঃ (ব্রহ্ম ও জীবের) ঐক্যম্-অখণ্ডভাবঃ (একত্ব ও অভেদ ভাব) মহাবাক্য-শতেন (বেদান্তের অন্যান্য মহাবাক্য এবং শত শত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা) কথ্যতে (বলা হচ্ছে)।

সরলার্থ: 'এই সেই দেবদত্তই এখানে' এই ভাবের কথায় আগের পরিচিত দেবদত্তের সঙ্গে এখন দেখা দেবদত্তের দেশকালকর্ম ইত্যাদি বিরুদ্ধ ধর্মাংশগুলো বাদ দিয়ে আগের দেবদত্তের সঙ্গে বর্তমানে দেখা দেবদত্তের ব্যক্তিসত্তার অভিন্নতা যেমন স্বীকার করে নেওয়া হয় সেইরকমই বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের 'তৎ' ও 'ত্বম্' অংশের উপাধিগুলো বর্জন করে শুধু চৈতন্য অংশের দ্বারা বিচার করে আত্মজ্ঞ পুরুষগণ 'তৎ' ও 'ত্বম্' অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবের অদ্বয়ভাব বুঝিয়ে দেন। বেদান্তের অন্য সকল মহাবাক্যে এবং অসংখ্য শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের এই অভিন্নতার কথা বারবার করে বলা হচ্ছে।

ব্যাখ্যা: এখানে বলছেন, শব্দের যে জহৎ-অজহৎ লক্ষণা বা ভাগ-লক্ষণা, যাতে জহতি আর অজহতি এই দুটো লক্ষণাকে এক করে নেওয়া হয় অর্থাৎ কিছু বাদ দিয়ে কিছু যোগ করে শব্দের যে নিহিত অর্থ সেটা ধরতে হয়, সেই ভাবেই 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যকে বুঝতে হবে। সেটা কিরকম? বলছেন, ধর, একজনকে তুমি জানতে অনেক দিন আগে, তার নাম দেবদত্ত, হয়তো তার সঙ্গে অন্য এক জায়গায়, অন্য পরিবেশে দেখা হয়ে গেলো, তুমি চিনতে পেরে বললে—ও এই সেই দেবদত্ত! তাহলে কি হলো? তাকে তুমি যেখানে জানতে সেটা হয়তো একটা অন্য জায়গা ছিল, সময়টাও ছিল অনেক দিন আগের আর তখন সে হয়তো অন্যরকম পোশাক পরত, অন্য কাজ করত। এখন সে সব পালটে গেছে, কিন্তু তুমি স্থান-কাল, আপাত পার্থক্য সব বাদ দিয়ে আসল মানুষটাকে দেখছ। সেটা দেখেই বলছ, 'সঃ দেবদত্তঃ অয়ম্ ইতি ইহ চ একতা', সেই দেবদত্তই এখানে; 'বিরুদ্ধ-ধর্মাংশ অপাস্য কথ্যতে', এটা যখন বলছ তখন যে-দেবদত্তকে তুমি অন্য পারিপার্শ্বিকে জানতে, তার স্থান-কাল, চেহারার বা পোশাকের পরিবর্তন এইসব 'বিরুদ্ধধর্মাংশ' বাদ দিয়ে তুমি বলছ, খুঁটিনাটি তফাতগুলো বাদ দিয়ে তাকে দেখছ। তাই তখন তুমি 'একতা' দেখছ, দেবদত্ত মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছ। বুঝতে পারছ

যে, সেই দেবদত্ত আর এই দেবদত্ত এক। বিরুদ্ধ ভাব বর্জন করে, মানুষটার ব্যক্তিসত্তার ঐক্যকে গ্রহণ করে তুমি দেবদত্তকে চিনছ। 'যথা তথা তত্ত্বমসি', তত্ত্বমসি মহাবাক্য সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা। 'তৎ'—ব্রহ্ম, 'ত্বম্'—তুমি। এদের মধ্যে বিরুদ্ধভাব আছে, কিন্তু সেগুলো তুচ্ছ কর, বর্জন কর, তখন 'তৎ' আর 'ত্বম্' এক। তুমিই ব্রহ্ম। জীবঃ ব্রহ্মৈব। আগে বলেছেন রাজার রাজ্য গেলে, যোদ্ধার অস্ত্র গেলে, দুজনেই সাধারণ মানুষ—এগুলো উপাধি, বারবার করে বলছেন এগুলো বাদ দিতে, এগুলো আগন্তুক, চাপানো জিনিস। একটা পোশাক পরেছি কিন্তু আমি তো সেই পোশাকটা নই, এটা মনে রাখতে হবে সব সময়। বিরুদ্ধভাব এগুলো, বাদ দাও। 'বিরুদ্ধ-ধর্মান্ উভয়ত্র হিত্বা'; বিরুদ্ধভাব ত্যাগ করে দিতে হবে, জীব ব্রহ্ম দুয়েরই বিরুদ্ধভাব বর্জন করতে হবে। 'সংলক্ষ্য চিন্মাত্রতয়া', চৈতন্য অংশের ওপর লক্ষ্য স্থির করে বুঝতে হবে জীব ও ব্রহ্ম এক। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব চৈতন্য অংশে। জীবের উপাধি পঞ্চকোশ আর ঈশ্বরের উপাধি মায়া। উপাধি দুটো ফেলে দিলে থাকছে শুধু চিৎ-মাত্র, চৈতন্য, চিৎ-শক্তি। চৈতন্য অংশে জীব ও ব্রহ্ম এক। 'সৎ-আত্মনোঃ অখণ্ডভাবঃ'; 'সৎ' অর্থাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দের যে 'সৎ' সেই অস্তিত্ব মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্ম, আর 'আত্মনোঃ' মানে জীবাত্মার। 'সদাত্মনোঃ'—পরমাত্মা আর জীবাত্মার। 'অখণ্ডভাবঃ' অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার কোনও খণ্ড নয়, এক। 'পরিচীয়তে বুধৈঃ'; 'বুধৈঃ' মানে পণ্ডিতরা নন, সেইসব মানুষ যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়েছে। এঁরা 'পরিচীয়তে', পরিচয় করিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন। জীবাত্মা আর পরমাত্মা যে এক, এই ধারণা এঁরা আমাদের মনে দৃঢ় করে দেন। 'এবং মহাবাক্যশতেন কথ্যতে।' 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'—এগুলি মহাবাক্য। এইসব মহাবাক্যে বারবার এই জীব আর ব্রহ্মের একত্বের কথা বলা হয়েছে। আবার অন্যান্য অনেক শ্রুতিবাক্যেও এই একত্বের কথা বলা হয়েছে। দয়া করে আমাদের বোঝাবার জন্যে বলেছেন। 'ব্রহ্ম-আত্মনোঃ ঐক্যম্ অখণ্ডভাবঃ'; ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য, জীব আর ব্রহ্ম যে এক অখণ্ড—শাস্ত্র একথা শত শত বার বলছেন।

অস্থূলমিত্যেতদসন্নিরস্য সিদ্ধং স্বতো ব্যোমবদপ্রতর্ক্যম্।
অতো মৃষামাত্রমিদং প্রতীতং জহীহি যৎ স্বাত্মতয়া গৃহীতম্॥
ব্রহ্মাহমিত্যেব বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা বিদ্ধি স্বমাত্মানমখণ্ডবোধম্॥ ২৫০

অন্বয়: এতৎ অসৎ (এই অসৎ জগৎ) 'অস্থূলম্' ইতি (অস্থূলম্ অহ্রস্বম্ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সহায়ে) নিরস্য (নিরসন করে) স্বতঃ সিদ্ধং (স্বতঃসিদ্ধ) ব্যোমবৎ অপ্রতর্ক্যং (আকাশের মতো সর্বব্যাপী বলে তর্কের অতীত) অখণ্ড বোধং (অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ) স্বম্ আত্মানং (নিজের আত্মাকে) অহং ব্রহ্ম (আমি ব্রহ্ম) ইতি এব (এই ভাবে) বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা (শুদ্ধবুদ্ধিদ্বারা) বিদ্ধি (জান) অতঃ (অতএব) ইদং প্রতীতং (এই প্রতীয়মান জগৎ-প্রপঞ্চ) যৎ (যা) স্ব-আত্মতয়া (নিজের সঙ্গে একাত্ম করে) গৃহীতম্ (গৃহীত হয়েছে) মৃষামাত্রম্ (তা শুধু মিথ্যা বলে) জহীহি (ত্যাগ কর)।

সরলার্থ: বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত 'অস্থূলম্' ইত্যাদি বাক্যের সাহায্যে এই অনিত্য জগৎ-প্রপঞ্চকে অগ্রাহ্য করে আকাশের মতো সর্বব্যাপী, তর্কাতীত, অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ নিজের আত্মাকে শুদ্ধবুদ্ধির সাহায্যে জান। অতএব এই যে দৃশ্যমান জীবজগৎ যাকে নিজের সঙ্গে একাত্ম করে গ্রহণ করেছ সেসব মিথ্যামাত্র বোধে ত্যাগ কর।

ব্যাখ্যা: এখানে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ থেকে উল্লেখ করছেন। মনে রাখতে হবে প্রসঙ্গটা কি—তৎ-ত্বম্-অসি। 'তৎ' কে? তাঁর নাম জানি না ধাম জানি না কিন্তু তিনি সর্বভূতে আছেন; তিনি আছেন বলেই আমি আছি, সেই তিনি—তিনিই তুমি, তাঁকে তুমি ব্রহ্ম বল, পরমাত্মা বল, যা বল, তুমি সেই। আমি আর তিনি এক? আমি এত ছোট আর তিনি এত বড়, আমরা এক ? হ্যাঁ, আমরা এক; কোন্ অংশে এক? চৈতন্য অংশে। উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন, কুয়োর জল আর সমুদ্রের জল একই, তবে পরিমাণের তফাত আছে। একটা জোনাকি পোকা আর সূর্য, এও আলো, সেও আলো, শুধু পরিমাণগত তফাত কিন্তু গুণগত তফাত নেই, এক। উদাহরণ দেওয়া হয়, ঘটাকাশ আর মহাকাশ। মহাকাশ মানে বাইরের আকাশ আর ঘটাকাশ মানে ঘটের ভেতরের আকাশ। ঘট একটা ছোট পাত্র, তার ভেতরেও আকাশ বাইরেও আকাশ। 'তৎ' যেন সেই বাইরের আকাশ, মহাকাশ। তার সঙ্গে তুমি এক। তফাতটা কোথায়? ওই যে ঘট, দেহ একটা, সেটা তোমায় আলাদা করে রেখেছে, কিন্তু তুমি সেই 'তৎ'। এই 'তৎ' কি রকম? বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলছেন, 'অস্থূলম্-অনণু-অহ্রস্বম্-অদীর্ঘম্-আলোহিতম্'(বৃ ৩।৮।৮) তিনি স্থূল নন, অণু নন, দীর্ঘ নন, হ্রস্ব নন, ইত্যাদি। 'অ' অর্থাৎ নেতি। এ নয়, এ নয় করে তাঁকে ধরতে হবে। 'ইতি-এতৎ-নিরস্য'—এইভাবে নেতি-নেতি করে অনিত্য জীবজগৎ অস্বীকার করে এগুতে হবে। তার ফলে কি পাব ? 'সিদ্ধং স্বতঃ ব্যোমবৎ-অপ্রতর্ক্যম্', আমার যে আত্মা, যিনি স্বতঃসিদ্ধ, নিজেই নিজের প্রমাণ, তাঁকে পাব। তিনি আকাশের মতো সর্বব্যাপী এবং তর্কাতীত। তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন চলে না। 'অখণ্ডবোধম্'—আমার আত্মা অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ। 'স্বম্-আত্মানম্ অখণ্ডবোধম্ ব্রহ্ম-অহম্-ইতি এব বিদ্ধি বিশুদ্ধ বুদ্ধ্যা'—অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ নিজের সেই আত্মাকে শুদ্ধবুদ্ধির সাহায্যে 'আমিই ব্রহ্ম' এইভাবে

জান। 'অতঃ মৃষামাত্রম্ ইদং প্রতীতং', অতএব এই দৃশ্যমান জগৎ যা 'মৃষামাত্রম্', মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়, আর 'যৎ স্ব-আত্মতয়া গৃহীতং', যাকে নিজের সঙ্গে এক করে ধরে বসে আছ, 'জহীহি', তাকে ত্যাগ করে দাও। বলছেন, যা চাপানো জিনিস, উপাধি, সেগুলো সরিয়ে দিলেও যে আমি সেই আমিই থাকছি। এই নামরূপাত্মক জগৎ এ মিথ্যা, চৈতন্যই আমাদের সত্যিকারের সত্তা, সবাইকার মধ্যে এক চৈতন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তোমাদের সবাইকার মধ্যে নারায়ণকে দেখছি। একবার ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী আর প্রেমানন্দ স্বামীজী পূর্ববাংলায় নাগমশায়ের বাড়ী গেছেন, নাগমশায় তখন গত হয়েছেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলছেন, দেখো, দেখো বাবুরামদা সব চৈতন্য, জীবজগৎ সব চৈতন্য। তাঁকে আমরা ব্রহ্ম বলি, চৈতন্য বলি, তিনিই সব ঢেকে রেখে দিয়েছেন। যেন চৈতন্যের সমুদ্র, আর আমরা তার এক একটি তরঙ্গ। ব্রহ্ম দর্শন হলে এইরকম হয়, সব এক দেখি, নাম, রূপ কিচ্ছু নেই, এক চৈতন্য। নিজেকে ঐ চৈতন্যরূপে জানতে হবে।

মৃৎকার্যং সকলং ঘটাদি সততং মৃন্মাত্রমেবাহিতং
তদ্বৎ সজ্জনিতং সদাত্মকমিদং সন্মাত্রমেবাখিলম্।
যস্মান্নাস্তি সতঃ পরং কিমপি তৎ সত্যং স আত্মা স্বয়ং
তস্মাৎ তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎ পরম্।। ২৫১

অন্বয় : ঘটাদি সকলং মৃৎকার্যং (ঘট ইত্যাদি সমস্ত মাটির কাজ) সততং (সর্বদা) আহিতং (বিভিন্ন রূপে উপস্থাপিত হয়) মৃৎমাত্রম্-এব (কিন্তু সবই শুধু মাটি) তৎ-বৎ (সেইরকম) ইদম্ অখিলম্ (এই দৃশ্যমান জগৎ) সৎ-জনিতং ('সৎ' থেকেই জাত) সৎ-আত্মকম্ সৎ-মাত্রম্-এব (সৎস্বরূপ, নিত্যসত্য ব্রহ্মমাত্র) যস্মাৎ (যে হেতু) সতঃ পরং (সৎ থেকে ভিন্ন) কিম্ অপি (কিছুই) ন অস্তি (নেই) তৎ সত্যং (সেই তিনিই সত্য) সঃ স্বয়ং আত্মা (তিনি স্বয়ং আত্মা) তস্মাৎ (সেই জন্যে) প্রশান্তম্ (প্রশান্ত) অমলম্ (নির্মল) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) অদ্বয়ম্ (অদ্বিতীয়) ব্রহ্ম যৎ (ব্রহ্ম যিনি) তৎ-ত্বম্-অসি (তিনিই তুমি)।

সরলার্থ : ঘট ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তু, যেগুলো মাটির কাজ, সেগুলো আসলে মাটি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেইরকম এই যে নামরূপাত্মক জগৎ তা 'সৎ' থেকেই জাত তাই এসবই সৎস্বরূপ নিত্যসত্য ব্রহ্মমাত্র। বস্তুত 'সৎ' থেকে ভিন্ন কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। তাই সেই সৎস্বরূপ তিনিই সত্য, তিনিই স্বয়ং আত্মা; সেইজন্যে ব্রহ্ম, যিনি প্রশান্ত, নির্মল, শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, তিনিই তুমি।

ব্যাখ্যা : বলছেন, মাটির তৈরী নানা জিনিস, তাদের বৈচিত্র আছে, আকার ভেদ

আছে, কিন্তু 'মৃৎ মাত্রম্'— মাটি ছাড়া সেগুলি আর কিছু নয়। মাটি থেকে এসেছে, সব মাটি। সেইরকম আমরা ব্রহ্ম থেকে এসেছি, এক সত্তা, কাজেই সবাই আমরা এক। 'মৃৎকার্যং সকলং ঘটাদি'—মাটির ঘট, মাটির পাত্র, বিভিন্ন আকার, কিন্তু সবই সেই মাটি থেকে এসেছে। উপনিষদে আছে, কয়েকজন তরুণ বিদ্যার্থী একসঙ্গে হয়ে প্রশ্ন করছে—আমরা কোথা থেকে এসেছি ? তারপর তারা ধ্যানে বসল ও গভীর ধ্যানে জানতে পারল—আমরা সবাই সেই ব্রহ্ম থেকে এসেছি, এক সত্তা, সৎস্বরূপ ব্রহ্ম। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই 'সৎ' থেকেই উৎপন্ন। আপাত বৈচিত্র অনেক, কিন্তু এক সত্তা। বলছেন, 'ঘটাদি সততং মৃৎ-মাত্রম্ এব আহিতং'; 'আহিতং'—এসেছে, উপস্থাপিত হয়েছে, মাটির ঘট ইত্যাদি মাটি থেকেই এসেছে, মাটিই এসবের কারণ, উপাদান কারণ। 'তৎবৎ সৎ-জনিতং'— তেমনি 'সৎ' থেকে, 'সৎবস্তু' থেকে, ব্রহ্ম থেকে আমরা সবাই এসেছি। 'সদাত্মকম্ ইদম্ সৎ-মাত্রম্ এব অখিলম্'— এই যে জগৎ দেখছি তা সৎস্বরূপ ব্রহ্মই,অস্তিত্বমাত্র। 'যস্মাৎ-নাস্তি সতঃ পরম্ কিম্-অপি'— কাজেই 'সৎ' ছাড়া আর কিছুই নেই। একটি মাত্র বস্তু আছে—'সৎ-চিৎ-আনন্দ', সৎস্বরূপ-জ্ঞানস্বরূপ-আনন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ। আমরা সবাই সেই 'সৎ' থেকে এসেছি, শুধু নামরূপের পার্থক্য। যেমন মাটির তৈরী কত জিনিস হতে পারে কিন্তু মাটিই তো সব, তেমনি এক ব্রহ্ম শুধু রূপ আর নামের পার্থক্য। একজনকে মানুষ বলছি আবার আর কিছুকে ফুল বলছি, কোনও একটাকে আকাশ বলছি, কিন্তু সব সেই 'সৎ' থেকে আসছে। মানুষও ব্রহ্ম জন্তু জানোয়ারও ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম। 'তৎ সত্যং সঃ আত্মা স্বয়ং'; আমি স্বীকার করলাম সবই ব্রহ্ম কিন্তু আমিও যে ব্রহ্ম এটা না জানলে হবে না। সবই ব্রহ্ম বলে জানলাম কিন্তু আমি নিজে যে ব্রহ্ম এটা না জানলে কিছুই জানা হবে না। গুরু এইটে করেন, বুঝিয়ে দেন। 'স স্বয়ং আত্মা প্রশান্তম্ অমলম্ ব্রহ্ম অদ্বয়ম্ যৎ পরম্ তৎ-ত্বম্-অসি'। তাঁর মধ্যে কোনও চাঞ্চল্য নেই, তিনি প্রশান্ত। দুই থাকলেই চাঞ্চল্য, কোনও দুই নেই তো, তাই তিনি প্রশান্ত। 'অমলম্'— তাঁর মধ্যে কোনও মল নেই, তিনি নির্মল। 'অদ্বয়ম্'—কোনও দুই নেই তাই তিনি অদ্বয়। এইরকম ব্রহ্ম, যিনি 'পরম্' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ—'তৎ-ত্বম্-অসি', তিনিই তুমি। 'তত্ত্বমসি' এই বাক্য মহাবাক্য, এর থেকে বড় কথা আর হয় না। গুরু শিষ্যকে এর থেকে বড় শিক্ষা আর কি দিতে পারেন? এই জ্ঞান যদি হয় তাহলে আর তুমি নিজেকে নগণ্য ভাবতে পারবে না। কারণ তুমি জেনেছ যে, সেই যে মহান, প্রশান্ত, নির্মল, অদ্বয় ব্রহ্ম তুমি তা-ই।

নিদ্রাকল্পিত দেশ-কাল-বিষয়-জ্ঞাত্রাদি সর্বং যথা
মিথ্যা তদ্বদিহাপি জাগ্রতি জগৎ স্বাজ্ঞানকার্যত্বতঃ।
যস্মাদেবমিদং শরীর-করণ-প্রাণাহমাদ্যপ্যসৎ
তস্মাৎ তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎপরম্।। ২৫২

অন্বয় : নিদ্রাকল্পিত দেশ-কাল-বিষয়-জ্ঞাতৃ-আদি (নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখা কল্পিত দেশ, কাল, নানা বিষয় ও এসবের জ্ঞাতা ইত্যাদি) সর্বং (সবই) যথা মিথ্যা (যেমন মিথ্যা) তৎবৎ (সেইরকম) ইহ জাগ্রতি অপি (এখনকার জাগ্রত অবস্থাতেও) জগৎ (জগৎ সংসার) স্ব-অজ্ঞান কার্যত্বতঃ (স্বীয় অজ্ঞানের ক্রিয়ায় প্রতিভাত বলে মিথ্যা) যস্মাৎ (যেহেতু) এবং ইদং শরীর করণ-প্রাণ-অহম্- আদি-অপি (এই শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অহঙ্কার ইত্যাদিও) অসৎ (অনিত্য, মিথ্যা) তস্মাৎ (তাই জন্যে) যৎ প্রশান্তম্-অমলম্-অদ্বয়ম্ পরম্ ব্রহ্ম (যে প্রশান্ত, নির্মল, অদ্বয় পরম ব্রহ্ম) তত্ত্বমসি (তিনিই তুমি)।

সরলার্থ : ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখা দেশ, কাল, নানা বিষয় ও এসবের জ্ঞাতা ইত্যাদি যেমন মিথ্যা সেইরকমই জাগ্রত অবস্থায় যে জগৎ দেখি তা নিজেরই অজ্ঞানের ক্রিয়ায় প্রতিভাত বলে মিথ্যা। এই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অহঙ্কার ইত্যাদি সবই অনিত্য তাই যিনি প্রশান্ত, নির্মল, অদ্বয় পরমব্রহ্ম তুমি স্বরূপত তাই, তিনিই তুমি।

ব্যাখ্যা : আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন স্বপ্নে কত কি দেখি। কত কি করছি, কত জায়গায় যাচ্ছি, কত কি খাচ্ছি, কত কি বলছি, যেই ঘুম ভাঙল সব মিথ্যে হয়ে গেলো, বিছানায় পড়ে আছি। 'নিদ্রাকল্পিত দেশ-কাল-বিষয় জ্ঞাত্রাদি সর্বং'— ঘুমের মধ্যে এইসব যে দেখছি, 'যথা মিথ্যা তদ্‌বদ্-ইহ-অপি জাগ্রতি জগৎ'— সেগুলো যেমন মিথ্যা তেমনি জেগে যে জগৎ দেখছি সেও মিথ্যা। আমি স্বপ্নে কত কি দেখছিলাম, কিন্তু সে তো স্বপ্ন, সেসব কিছুই সত্যি নয়, মিথ্যে। তেমনি এই যে জগৎ যা আমরা দেখছি 'স্ব-অজ্ঞান কার্যত্বতঃ'— তা নিজের অজ্ঞানের জন্যেই সত্যি বলে মনে হয়। যেমন স্বপ্নে দেখা কোনও কিছুরই বাস্তব সত্তা নেই তেমনি আমাদের যে এক আত্মা তাকে যে আমরা জেগে থেকেও নানারূপে দেখছি আর এসব সত্যি বলে মনে করছি এটা ভুল, বাস্তব সত্য নয়, অজ্ঞান থেকে আসছে। আমি এই দেহটাকে সত্য মনে করছি, আর সবাইকার দেহকেও সত্য মনে করছি, তাই কারোর সঙ্গে বিবাদ আবার কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব—কত কাণ্ডকারখানা, কত ঘটনা ঘটছে, এসব ঘটাচ্ছেন অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া। 'জাগ্রতি অপি', আমি জেগেও ভুল করছি। আমার 'আমি' আর অন্য একজনের 'আমি'—দুই দেখছি। এটা অজ্ঞান। আসলে এক 'আমি', এক আত্মা সকলের মধ্যে। আমরা সব সময় 'আমি আমি' করছি, কিন্তু এক আত্মাই তো সকলের মধ্যে, সূত্রের মতো আমাদের সবাইকে একসঙ্গে গেঁথে রেখেছে—সূত্রে মণিগণা ইব (গী, ৭।৭)— যেমন অনেকগুলো মণি সুতোয় গেঁথে মণির হার হয় সেইরকম। 'যস্মাৎ-ইব-শরীর-করণ-প্রাণ-অহম্-আদি-অপি অসৎ'— সব অসৎ, অনিত্য তাই মিথ্যা। দেহ

মিথ্যা, 'করণ' বা ইন্দ্রিয় মিথ্যা, প্রাণ, আমার অহংবুদ্ধি—এসবই মিথ্যা, অর্থাৎ অনিত্য, পরিবর্তনশীল, থাকবে না। যখন স্বপ্ন দেখি তখন যা-সব দেখি সেগুলো যেমন মিথ্যা, তেমনি জেগে জেগে আমরা যে নানা দেখি সেগুলোও সত্যি নয়। এগুলো অসৎ, অনিত্য, তাই মিথ্যা। এই যে আমরা একটা ঘরে বসে আছি এটা কি মিথ্যা ? তা নয়, কিছু সময়ের জন্যে আমাদের এখানে থাকাটা সত্যি, কিন্তু এটা আপেক্ষিক সত্য, স্থান কালের ওপর নির্ভরশীল, এই অর্থে মিথ্যা। তাই বলছেন, 'তস্মাৎ তত্ত্বমসি'— মনে রেখো তুমি তাই। কিরকম আমি ? আগের শ্লোকে যা বলেছেন, সেটাই আবার বলছেন, 'প্রশান্তম্ অমলম্ ব্রহ্ম অদ্বয়ং যৎ পরম্'; প্রশান্ত, নির্মল, অদ্বয় যে পরম ব্রহ্ম, তুমি তা-ই—তৎ-ত্বম্-অসি। বেদান্ত এই মহাবাক্য বারবার বলছেন—তাঁর সঙ্গে তুমি এক। অনিত্যবস্তু নিয়ে ভুলে থেকো না, তোমার স্বরূপকে জান। তিনি আর তুমি এক, এটা বোঝ।

যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং তদ্‌বিবেকে
তত্তন্মাত্রং নৈব তস্মাদ্‌বিভিন্নম্।
স্বপ্নে নষ্টং স্বপ্নবিশ্বং বিচিত্রং
স্বস্মাদ্‌ভিন্নং কিং নু দৃষ্টং প্রবোধে।। ২৫৩

অন্বয় : যত্র (যেখানে) ভ্রান্ত্যা (ভ্রান্তির দ্বারা) কল্পিতং (বস্তু কল্পিত হয়) তদ্‌বিবেকে (সেই অধিষ্ঠানরূপ বস্তুর জ্ঞান হলে) তৎ-তৎ-মাত্রম্ (তা তার স্বরূপেই থাকে) তস্মাৎ (তার থেকে অর্থাৎ সেই অধিষ্ঠানরূপ বস্তু থেকে) বিভিন্নম্ ন এব (ভিন্ন অন্য কিছুই আর থাকে না) দৃষ্টং বিচিত্রং স্বপ্নবিশ্বং (স্বপ্নের বিচিত্র দৃষ্ট জগৎ) স্বপ্নে নষ্টং (স্বপ্নেই মিলিয়ে যায়) প্রবোধে (জাগ্রত অবস্থায়) স্বস্মাৎ ভিন্নং (দ্রষ্টারূপী স্বয়ং আমার থেকে ভিন্ন) কিম্ নু (আর কিছু কি থাকে) ?

সরলার্থ : ভুলের জন্যে যেখানে কোনও কল্পিত বস্তুর আরোপ হয়, ভুল ভাঙলে অর্থাৎ সেই অধিষ্ঠানরূপ আসল বস্তুর জ্ঞান হলে সেই বস্তুর স্বরূপমাত্রই থাকে। স্বপ্নে দেখা জগৎ স্বপ্নেই মিলিয়ে যায়। জাগ্রত অবস্থায় দ্রষ্টারূপী স্বয়ং 'আমি' ছাড়া আর কিছু কি থাকে ?

ব্যাখ্যা : এখানে বলছেন, এই নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞান যখন হয় তখন পরমাত্মাই একমাত্র সত্য এই বোধই থাকে, অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব তখন স্বপ্নের মতো কল্পনা বলে মনে হয়। বলছেন, 'যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং'—যেখানে অর্থাৎ যে বস্তুতে ভ্রান্তির দ্বারা কল্পিত বস্তুর আরোপ হয়, 'তদ্‌বিবেকে'—সেই অধিষ্ঠানরূপ বস্তুর জ্ঞান হলে, 'তৎ-তৎ-মাত্রম্ ন-এব তস্মাদ্ বিভিন্নম্'—শুধু সেই বস্তুই স্বরূপত থাকে,

তার থেকে আলাদা আর কিছুই থাকে না। অন্ধকারে দড়ি দেখে সেটাকে সাপ বলে ভুল করেছি। ভয়ে অস্থির; আলো এলো, দেখছি,আরে এটা তো একটা দড়ি! আলো এলো মানে জ্ঞান হলো, তখন দড়িকে দড়ি বলে চিনতে পারছি, দড়ির স্বরূপে তাকে দেখছি। সাপটা কোথায় গেলো? সে ওই দড়িতেই মিলিয়ে গেলো। তাই বলছেন, 'তস্মাদ্ বিভিন্নম্ ন এব', অধিষ্ঠানই থাকছে, তার থেকে আলাদা আর কিছুই থাকছে না। 'স্বপ্নে নষ্টং স্বপ্ন-বিশ্বং বিচিত্রং দৃষ্টং'—স্বপ্নে দেখা যে বিচিত্র জগৎ তা স্বপ্নেই মিলিয়ে যায়। 'স্বস্মাৎ ভিন্নং কিম্ নু প্রবোধে'; 'প্রবোধে'—ঘুম ভেঙে যখন পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে চেতনা হয়, বোধ হয়, তখন 'স্বস্মাৎ ভিন্নং কিম্ নু'—সেই অস্তিত্বস্বরূপ নিজের আত্মা ছাড়া আর কিছু কি থাকে? আর কিছুই থাকে না। অজ্ঞান ছিল, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার মতো এই জগৎটাকে নানা নামরূপের মধ্যে নানা ভাবে দেখছিলাম। যখন অজ্ঞান চলে গেলো জ্ঞান হলো, তখন যেন জেগে উঠে দেখছি, যিনি অধিষ্ঠান, অস্তিত্বস্বরূপ, যিনি সকলের আত্মা, আমারও আত্মা, তিনিই শুধু আছেন, আর কিছু নেই।

জাতিনীতিকুলগোত্রদূরগং নামরূপগুণদোষবর্জিতম্।
দেশ-কালবিষয়াতিবর্তি যদ্ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥২৫৪

অন্বয় : যৎ ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম) জাতি-নীতি-কুল-গোত্র দূরগং (জাতি, নীতি, কুল, গোত্র ইত্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য) নাম-রূপ-গুণ-দোষ বর্জিতং (নামরূপ ও দোষ-গুণ বর্জিত) দেশ-কাল-বিষয় অতিবর্তি (দেশ-কাল ও বিষয়কে অতিক্রম করে আছেন) তৎ-ত্বম্- অসি (তুমি সেই তিনি) ভাবয়-আত্মনি (হৃদয়ে এই ধ্যান কর)।

সরলার্থ : যে ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির, ধর্মনীতি-সমাজনীতি প্রভৃতি বিধি-নিষেধের সম্পর্ক নেই, যাঁর কুল বা গোত্র নেই, যিনি নামরূপ ও দোষগুণ বর্জিত, যিনি দেশ-কাল ও সমস্ত বিষয় অতিক্রম করে আছেন তুমিই সেই ব্রহ্ম। তত্ত্বমসি, এই মহাবাক্য হৃদয়ে ধ্যান কর।

ব্যাখ্যা : সেই একই প্রসঙ্গ, 'তত্ত্বমসি'। বলছেন, 'জাতিনীতিকুলগোত্রদূরগং', আত্মার জাতি নীতি, এসব নেই। আমাদের যেমন একটা জাতিবোধ আছে, আমি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, অথবা আমি বাঙালী বা পাঞ্জাবী, বা আমি ভারতীয়, তাঁর মধ্যে সেসব কিছু নেই। 'নীতি', বিভিন্ন ধর্ম অনুযায়ী মানুষের মধ্যে যেসব নীতিবোধ গড়ে ওঠে, বা সামাজিক যেসব নীতিবোধ মানুষের মধ্যে প্রচলিত থাকে, আত্মার সেসব কিছু থাকে না। 'কুল', আমাদের পূর্বপুরুষরা কোন্ বংশের ছিলেন, তাঁদের কি কুলগৌরব এই সমস্ত; 'গোত্র', আমাদের গোত্র থাকে; আমাদের মূল কোথায় সেইটে বোঝার জন্যে। হিন্দুদের গোত্র কোনও একজন ঋষির সঙ্গে যুক্ত, তাঁর থেকেই বংশের শুরু তাই তাঁর নামেই গোত্র—ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি। এগুলো সব চাপানো জিনিস, উপাধি। এ সমস্ত আত্মার থেকে 'দূরগং'—দূর হয়ে গেছে, দূরে চলে গেছে। বলছেন, 'নামরূপদোষগুণ বর্জিতং'; আমাদের নামরূপ দোষগুণ থাকে, কিন্তু আত্মার এসব কিছু নেই। তিনি নাম-রূপ-দোষ-গুণ শূন্য। 'দেশকাল-বিষয়-অতিবর্তি'—দেশ, কাল, বিষয় এসবের ঊর্ধ্বে তিনি। আমরা তো দেশ, কাল, বিষয় দিয়ে খণ্ডিত হয়ে গেছি কিন্তু আত্মা অখণ্ড, এসবের ঊর্ধ্বে। হিন্দুধর্মের এটা মূল ধারণা যে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ খুব সুন্দর একটা উপমা দিতেন : খোড়ো নারকোল। ভেতরটা শুকিয়ে গেছে, খড়-খড় করছে, তাই খোড়ো নারকোল। খড়খড় করে শব্দ হয় কারণ ভেতরের শাঁস আর ছোবড়া এটা আলাদা হয়ে গেছে। এই ছোবড়াটা হচ্ছে দেহ আর শাঁসটা হচ্ছে আত্মা— এই দুটো আলাদা হয়ে গেছে। 'দেশকাল-বিষয়-অতিবর্তি', এই দেশ, কাল, বিষয় এগুলো হচ্ছে গণ্ডি, সীমারেখা। জায়গা, সময় এসব আপেক্ষিক, আত্মা অনপেক্ষ, নিত্য, সনাতন। 'যৎ ব্রহ্ম তৎ-ত্বম্-অসি ভাবয় আত্মনি'—এই রকম যে ব্রহ্ম, যিনি সব রকম উপাধিবর্জিত, সেই তিনিই তুমি। মনে মনে এই চিন্তা কর।

যৎপরং সকলবাগগোচরং গোচরং বিমলবোধচক্ষুষঃ।
শুদ্ধচিদ্ঘনমনাদি বস্তু যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥২৫৫

অন্বয় : যৎ (যা) পরং (শ্রেষ্ঠ) সকল-বাক্-অগোচরং (বাক্যের অবিষয়) বিমলবোধচক্ষুষঃ (শুদ্ধবুদ্ধির) গোচরং (বিষয়) শুদ্ধচিৎ-ঘনম্ (নির্মল চৈতন্যস্বরূপ) অনাদি (আরম্ভরহিত) যৎ ব্রহ্মবস্তু (যে ব্রহ্মবস্তু) তৎ-ত্বম্-অসি (তাই তুমি) আত্মনি-ভাবয় (এইটে অন্তরে ধ্যান কর)।

সরলার্থ : যিনি শ্রেষ্ঠ, ভাষায় যাঁকে প্রকাশ করা যায় না, যিনি শুদ্ধবুদ্ধির গোচর সেই নির্মল চৈতন্যস্বরূপ অনাদি যে ব্রহ্মবস্তু তিনিই যে তুমি অন্তরে তা ধ্যান কর।

ব্যাখ্যা : বলছেন, যিনি 'পরম' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ,যাঁর থেকে ভালো আর কিছু হয় না, ভাষায় যাঁকে প্রকাশ করা যায় না, যিনি শুধু শুদ্ধবুদ্ধির গোচর সেই তিনিই সকলের আত্মা, তোমারও আত্মা, এইটা বোঝ, তৎ-ত্বম্-অসি। 'সকল-বাক্-অগোচরং'— তিনি বাক্যের অগোচর, বাক্য দিয়ে তাঁকে ব্যক্ত করা যায় না। ভাষা সব সময়ই ভাসা-ভাসা, একটা ওপর-ওপর বর্ণনা দেয়, খুব গভীর কোনও ভাব আমরা কি ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করতে পারি? পারি না। যা 'পরম', শ্রেষ্ঠ, তা আমরা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি না। উপনিষদে বলছে : 'যতো বাচো নিবর্তন্তে

অপ্রাপ্য মনসা সহ (তৈ, ২।৪) —ভাষা, মন সব সেখান থেকে ফিরে আসে। আত্মা ভাষার গোচরে আসেন না। তাহলে তিনি কিসের গোচরে আসেন ? শুদ্ধবুদ্ধির। বলছেন, 'গোচরং বিমল-বোধচক্ষুষঃ'; 'বিমল'—নির্মল, 'বোধ'—বুদ্ধি, চিৎশক্তি, 'চক্ষুষঃ'—দৃষ্টির। আমাদের হিন্দুধর্মে এই শুদ্ধির ওপর খুব জোর দেওয়া হয়; আমরা বলি চিত্তশুদ্ধি হলে আত্মা আপনি প্রকাশিত হবেন। আয়নার ময়লাটা পরিষ্কার হলে তবে তো তার মধ্যে নিজের চেহারাটা ফুটে উঠবে। শুদ্ধি বলতে আমরা কি বুঝি? সবচেয়ে বড় অশুদ্ধি—অহঙ্কার; দেশ, কাল, জাতিগোত্র এইসব নিয়ে অহঙ্কার। এগুলিই চিত্তের মালিন্য। আবার দেখা যায় আমার অহঙ্কার নেই এটা বোঝাতে গিয়েও একটা অহঙ্কার এসে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যেমন অশ্বথ গাছের ফেঁকড়ি, একটা কাটলে তো তার থেকে আর একটা গাছ গজালো। অহঙ্কার সেই রকম। 'বিমল-বোধচক্ষুষঃ', একটা আয়নায় ময়লা পড়েছে, পরিষ্কার করে নিলে নিজেকে ঠিক ঠিক দেখতে পাবে। আব একটা উদাহরণ : স্বামীজী বলছেন, জল যখন তরঙ্গায়িত, জলের মধ্যে যখন আলোড়ন আছে তখন জলের তলাটা দেখতে পাওয়া যায় না। মন যখন স্থির হয়েছে, পরিষ্কার হয়েছে, তখন আপনা-আপনি জ্ঞান হবে। জলের ওপর যেমন শেওলা পড়ে থাকে শেওলা সরিয়ে দিলেই পরিষ্কার জল, সেইরকম অহঙ্কার ইত্যাদির ময়লায় আমাদের মন অস্বচ্ছ হয়ে আছে। এগুলো চলে গেলেই আত্মা সেই শুদ্ধ মনে জ্বলজ্বল করতে থাকবেন। 'শুদ্ধ চিৎ-ঘনম্-অনাদি বস্তু'; 'ঘনম্', ঘন কথাটা কিরকম! কোনও ফাঁক নেই, অন্তর নেই, অখণ্ড চৈতন্য। 'চিৎ-ঘনম্-অনাদি', অনাদি মানে যার কোনও আদি নেই। ব্রহ্ম, তাঁর তো জন্ম হয়নি, তাঁর কোনও আদিও নেই অন্তও নেই। এই দেহের জন্ম হয় তাই মৃত্যুও হয়, কিন্তু আত্মা, তাঁর জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। অনন্ত সেই যে ব্রহ্ম, 'তৎ-ত্বম্-অসি ভাবয়-আত্মনি', তিনিই তুমি। কত রকমে বোঝাচ্ছেন, কিন্তু এক সিদ্ধান্ত, তত্ত্বমসি—তিনিই তুমি। আমাদের এত ত্যাগ-তপস্যা সবই সেই এককথা জানার জন্যে—তৎ-ত্বম্-অসি। এইটাই সিদ্ধান্ত। তাই বলছেন, এইটা ভাবো, এইটা বোঝ—তৎ-ত্বম্-অসি।

ষড়্ভিরূর্মিভিরযোগি যোগি-হৃদ্ভাবিতং ন করণৈর্বিভাবিতম্।
বুদ্ধ্যবেদ্যমনবদ্যমস্তি যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৬

অন্বয় : ষড়্ভিঃ ঊর্মিভিঃ (ছটি তরঙ্গের দ্বারা) অযোগি (অস্পৃষ্ট) যোগি-হৃৎ-ভাবিতম্ (যোগীদের হৃদয়ে ধ্যানে ধৃত) করণৈঃ (ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা) ন বিভাবিতম্ (অননুভূত) বুদ্ধি-অবেদ্যম্ (সাধারণ বুদ্ধির অগম্য) যৎ (যে) অনবদ্যং (নির্দোষ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) তৎ-ত্বম্-অসি ভাবয়-আত্মনি (তিনিই তুমি এই ভাবনা মনের মধ্যে কর)।

সরলার্থ : ছটি তরঙ্গ যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, যোগীদের ধ্যানে যিনি ধরা থাকেন, ইন্দ্রিয়রা যাঁকে ধরতে পারে না, বুদ্ধি যাঁকে বুঝতে পারে না, সেই সমস্ত দোষের অতীত যে ব্রহ্ম তিনিই তুমি—মন দিয়ে এই ভাবনা কর।

ব্যাখ্যা : ব্রহ্ম যে কি তা যদিও মুখে বলা যায় না তবু এটা বেশ বোঝা যায় যে, আমাদের যেগুলি ধারণার যন্ত্র, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি, এসব দিয়ে তাঁর ধারণা হয় না। মন আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়। বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের যা-কিছু সংঘাত তা আমাদের মনে এক একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মনটা যেন একটা জলাশয়, আর এই প্রতিক্রিয়াগুলি যেন সেই জলে এক একটা তরঙ্গ তুলছে। বলছেন, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ এই ছয় ব্যাপারে মনে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় সেগুলোই হল তরঙ্গ। সেগুলোই আমাদের সব থেকে বেশী বিপর্যস্ত করে। আমরা সাধারণ জীব এই ছটি তরঙ্গের আঘাতেই তো উঠছি আর পড়ছি। কিন্তু ব্রহ্মকে এই ছটি তরঙ্গ স্পর্শই করতে পারে না। 'ষড়্ভিঃ ঊর্মিভিঃ অযোগি'—তিনি ছটি তরঙ্গের দ্বারা অস্পৃষ্ট। নির্লিপ্ত, নির্বিকার। আর কি ? 'যোগিহৃদ্ভাবিতম্'—যোগীরা তাঁদের হৃদয়ে তাঁর ধ্যান করেন। 'ন করণৈঃ বিভাবিতম্'—তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন; 'করণৈঃ' মানে ইন্দ্রিয়দের দ্বারা। ইন্দ্রিয়দের সাহায্যে তাঁকে ধরা যায় না। 'বুদ্ধি-অবেদ্য', অপরিশুদ্ধ যে বুদ্ধি তা দিয়ে তাঁকে বোঝা যায় না। 'অনবদ্যং যৎ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয় আত্মনি'—সমস্ত রকম দোষবর্জিত এই যে ব্রহ্ম তিনিই তুমি—এই কথা মনে ভাব। মনের মধ্যে এই চিন্তা সব সময় কর। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের ধ্যান কর।

ভ্রান্তিকল্পিতজগৎকলাশ্রয়ং স্বাশ্রয়ং চ সদসদ্বিলক্ষণম্।
নিষ্কলং নিরুপমানবদ্ধি যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৭

অন্বয় : ভ্রান্তিকল্পিতজগৎকলাশ্রয়ং (ভ্রান্তিকল্পিত জগতের কল্পনার আশ্রয়) স্বাশ্রয়ং (নিজেই নিজের আশ্রয়) চ সৎ-অসৎ বিলক্ষণম্ (স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু থেকে ভিন্ন) নিষ্কলং (অখণ্ড) নিরুপমানবৎ হি (উপমারহিতের মতোই) যৎ ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম) তত্ত্বমসি ভাবয়-আত্মনি (তিনিই তুমি এই ধ্যান হৃদয়ে কর)।

সরলার্থ : এ জগৎ ভ্রান্তিকল্পিত। এই কল্পনার আশ্রয় ব্রহ্ম, যিনি নিজেই নিজের আশ্রয়, যিনি স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনও কিছুই নন, অখণ্ড, উপমারহিত, সেই তিনিই তুমি, এইটা হৃদয়ে ধ্যান কর।

ব্যাখ্যা : বলছেন : স্বপ্ন যেমন মিথ্যা সেইরকম এই জগৎ ভ্রান্তিকল্পিত, মনের সৃষ্টি। কিন্তু এর আশ্রয় সেই ব্রহ্ম যিনি 'স্বাশ্রয়ং'—নিজেই নিজের আশ্রয়। এবং আমিই সেই ব্রহ্ম, আর সেটা চিন্তা করাই কর্তব্য। যেমন আমরা স্বপ্নে কত কি দেখি, সুখের

স্বপ্নে সুখ অনুভব করি, দুঃখের স্বপ্নে দুঃখ, সেইরকমই এ জগতের সুখ-দুঃখ-ভয়-ভাবনা। আমরা যেমন দড়িটাকে সাপ মনে করে ভয় পেয়ে আলো আনাচ্ছি, আলোয় দেখছি, না এটা তো দড়ি, সাপের ধারণাটা ভুল। সেইরকম এই জগৎ। স্বপ্নের সব কাণ্ডকারখানার মতোই এ মিথ্যা কল্পনা। এই কল্পনা একটা কিছুকে নিশ্চয় আশ্রয় করে আছে। যেমন ছায়াছবির পরদা কতগুলি কল্পিত ঘটনার আশ্রয়, দড়িটা সাপের কল্পনার আশ্রয়। তেমনি জগৎ মিথ্যা কল্পনা কিন্তু এ ব্রহ্মকে আশ্রয় করেই আছে। বলছেন, এ জগতের এত সব কাণ্ড এর আশ্রয়টা কোথায়? কিসের ওপর এসব ঘটছে? আত্মা, তিনিই আশ্রয়। এই যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তার আশ্রয় হচ্ছেন আত্মা। এসব হচ্ছে আমাদের আত্মা আছেন বলে, তাঁর আশ্রয়ে এসব চলছে। কিন্তু আত্মার আশ্রয় কোথায় ? তাঁর আবার কি আশ্রয়? তিনি 'স্বাশ্রয়ং'—নিজেই নিজের আশ্রয়। তাঁর কোনও আশ্রয়ের দরকার নেই, তিনি 'স্ব-আশ্রয়ং'। তিনি হচ্ছেন 'সৎ-অসৎ বিলক্ষণম্', সবকিছু থেকে, এ জগতে স্থূল, সূক্ষ্ম যা-কিছু আছে সেসবের থেকে 'বিলক্ষণম্'—পৃথক, আলাদা। আধার আর আধেয়, আধার হচ্ছে আশ্রয় আর আধেয় হচ্ছে যাকে আশ্রয় দিচ্ছি। জগৎটা আধেয়, চাপানো জিনিস, কিন্তু তিনি আধার, 'বিলক্ষণম্'; তাঁর কোনও পরিবর্তন নেই, যেমন সিনেমায় কত মারামারি কাটাকাটি, কিন্তু পরদায় কোনও রক্তের দাগ পড়ে না। তারপর বলছেন, 'নিষ্কলং নিরুপমানবৎ-হি'—আত্মার কোনও বিভাগ নেই, তাঁর কোনও উপমা নেই, কোনও তুলনা নেই—তিনি এক, অদ্বিতীয়। কোনও দুই নেই, তুলনা কি করে হবে? একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষের তুলনা হয়, দুই আছে তাই তুলনা হয়, কিন্তু ব্রহ্ম 'একম্ এব-অদ্বিতীয়ম্', কার সঙ্গে তুলনা হবে ? 'যৎ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়-আত্মনি'; 'যৎ ব্রহ্ম'—এরকম যে ব্রহ্ম, 'তত্ত্বমসি ভাবয় আত্মনি'—তুমি সেই, এটা তুমি সবসময় ভাব। একই কথা বারবার করে বলছেন, তুমি ভাব যে তুমিই সেই ব্রহ্ম। তার মানে কি আমি ধাপে ধাপে এগোব ? আমি কি একটু একটু করে ব্রহ্ম হয়ে যাব? তা নয়, তুমি ব্রহ্ম আছই, সেটা জেনে নেওয়া। নিজেকে ছোট বলে মনে করে আমরা স্বরূপকে চিনছি না। স্বামীজী বলছেন, 'reverse the process'। ব্রহ্ম নিজেকে ভুল করে জীব ভাবছে, ক্ষুদ্র ভাবছে। উলটো ভাবো। সবসময় মনে কর তুমি সেই সর্বশক্তিমান, অনাদি, অনন্ত ব্রহ্ম। এইরকম ভাবতে ভাবতে তোমার জ্ঞান হবে, নিজের স্বরূপ বুঝতে পারবে।

জন্মবৃদ্ধিপরিণত্যপক্ষয়ব্যাধিনাশনবিহীনমব্যয়ম্।
বিশ্বসৃষ্ট্যববিঘাতকারণং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৮

অন্বয় : ব্রহ্ম জন্ম-বৃদ্ধি-পরিণতি-অপক্ষয়-ব্যাধি-নাশনবিহীনম্ অব্যয়ম্ বিশ্বসৃষ্টি-

অববিঘাত-কারণম্ (ব্রহ্ম জন্ম-বৃদ্ধি-পরিণাম-ক্ষয়-ব্যাধি-বিনাশরহিত, অব্যয় এবং বিশ্বের সৃষ্টির ও নাশের কারণ) তৎ-ত্বম্-অসি ভাবয়-আত্মনি (তিনিই তুমি অন্তরে এই ধ্যান কর)।

সরলার্থ : বিশ্বের সৃষ্টি ও নাশের কারণ, জন্ম বৃদ্ধি পরিণতি ক্ষয় ও নাশবিহীন অব্যয় যে ব্রহ্ম, তিনিই তুমি এই চিন্তা মনে মনে কর।

ব্যাখ্যা : সত্যটা কি? আত্মাই সত্য। 'জন্ম-বৃদ্ধি-পরিণতি-অপক্ষয়-ব্যাধি-নাশনবিহীনম্ অব্যয়ম্', আত্মার পরিবর্তন নেই, ব্যাধি নেই, ক্ষয় নেই, অবস্থাভেদে তাঁর ভাবান্তর হয় না, এক তিনি সবসময় একরকম। হিন্দুমত হচ্ছে, দেহটা থাকবে না কিন্তু 'আমি' অর্থাৎ আত্মা চিরকাল থাকবে। এই হচ্ছে বেদান্ত। 'জন্ম-বৃদ্ধি-পরিণতি'—দেহের জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয় সেই দেহ পরিণত হয়, তারপরে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু আত্মা অনাদি, অনন্ত, অপরিবর্তনীয়; জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, কোনও হ্রাসবৃদ্ধি নেই। দেহের অবস্থান্তর হয়, আজ ভালো আছি, কাল ভালো নেই, কিন্তু আত্মা একভাবেই আছেন সবসময়। এই কথাটাই বেদান্ত জোরের সঙ্গে বলছেন বারবার করে। বারবার বলছেন কেন? কারণ এটা ধারণা করা শরীরসর্বস্ব জীবের পক্ষে খুব শক্ত। তাই শাস্ত্র বারবার করে বুঝিয়ে বলছেন, অবিনশ্বর আত্মাই একমাত্র সত্য। নশ্বর দেহ, আজ আছে, কাল নেই, এর পেছনে ছুটো না। জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণতি এসব শরীরের ব্যাপার। 'অপক্ষয়' মানে ক্ষয়; শরীর সে পুষ্টিলাভ করে বৃদ্ধি পায় কিছু সময় ধরে, তারপর ভাঙতে থাকে,ক্ষয় শুরু হয়, শরীর নষ্ট হয়ে যায়, মৃত্যু হয়। সবাই মৃত্যুর অধীন, সাধুসন্ত সবাই। কিন্তু একজন সাধু আর একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে তফাত হচ্ছে, সাধু জানেন তিনি জন্মমৃত্যুহীন, রোগব্যাধি সব দেহের বিকার, আর একজন সাধারণ মানুষ, সে একটু অসুস্থ হলেই মনে করে, আমি ভালো নেই, খুব কষ্ট পাচ্ছি। সাধু জানেন তিনি এই দেহ নন তাই শরীরের কষ্ট তাঁকে বিচলিত করতে পারে না, তিনি জানেন তিনি আত্মা, দেহের কষ্ট আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। গীতায় ভগবান বলেছেন, জীর্ণ দেহ জীর্ণ বস্ত্রের মতো ত্যাগ করে জীব নতুন দেহ ধারণ করে। এই যে ধারণা যে দেহটা আমি নই, আমি আত্মা, এটা আমরা সহজে নিতে পারি না। কিন্তু কিরকম একটা ধারণা ! আমি সবের ঊর্ধ্বে, আমি সম্রাট, আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই, বৃদ্ধি নেই, দেহের মৃত্যু হয়, আমার নয়—শুধু চিন্তা করলেও মনে শক্তি আসে। 'জন্ম-বৃদ্ধি-পরিণতি-অপক্ষয়-ব্যাধিনাশনবিহীনম্-অব্যয়ম্'—আত্মা যিনি তাঁর জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণতি, ক্ষয়, ব্যাধি, মৃত্যু কিছুই নেই, তিনি অক্ষয়, অব্যয়। দেহ-মনের থেকে আলাদা হয়ে আত্মা যে আছেন সেটা বুঝব কি করে? আমরা তো দেখি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের মধ্যে কত

কি করি। বিছানায় পড়ে আছি অথচ নানা ঘটনার যে উত্তেজনা সেটাও স্বপ্নের মধ্যে পুরোদমে ভোগ করছি। এর মানে কি? মানে এই যে, দেহ কাজ করছে না কিন্তু মন কাজ করছে, স্বপ্নের মধ্যে আমার যা-কিছু অভিজ্ঞতা সবই মনের মধ্যে হচ্ছে। অর্থাৎ দেহের থেকে মন আলাদা। তারপর যখন গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই, সুষুপ্তি হয়, তখন স্বপ্ন নেই, মানে মনের কাজ নেই। তাহলে মন কোথায় গেলো ? মন থেমে গেছে। দেহ তো থেমেই আছে। অথচ যেই জেগে উঠি অমনি আবার দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি, ভাবনা-চিন্তা। মনও কাজ করছে, দেহও কাজ করছে। তার মানে কি ? দেহ মন ছাড়াও অন্য কিছু একটা আছে, তিনিই আত্মা। আত্মাই দেহকে চালাচ্ছেন, মনকে চালাচ্ছেন। তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, বৃদ্ধি নেই, পরিণাম নেই, এক তিনি সর্বদা একই ভাবে আছেন, সেই আত্মা শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, সর্ববৃহৎ ব্রহ্ম। 'বিশ্বসৃষ্টি-অববিঘাত কারণং'—এই বিশ্বজগতের কারণ ব্রহ্ম, তাঁর জন্যেই এর স্থিতি আবার তাঁর জন্যেই এর লয়। আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মা থেকেই জগতের প্রকাশ, স্থিতি ও লয়। আমরা তো সৃষ্টিতে বিশ্বাস করি না, আমরা বলি যা অপ্রকাশিত ছিল তার প্রকাশ হলো। বলছেন, এইরকম যে ব্রহ্ম তুমি তাই। 'তত্ত্বমসি ভাবয় আত্মনি'—তুমিই তিনি, মনের মধ্যে এই চিন্তা কর।

অস্তভেদমনপাস্তলক্ষণং নিস্তরঙ্গজলরাশিনিশ্চলম্।
নিত্যমুক্তমবিভক্তমূর্তি যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৯

অন্বয় : যৎ ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম) অস্তভেদম্ (অভেদ, কোন ভেদ নেই) অনপাস্তলক্ষণম্ (সৎস্বরূপ, সত্তামাত্র লক্ষণ) নিস্তরঙ্গজলরাশিনিশ্চলম্ (তরঙ্গবিহীন স্থির সমুদ্রের মতো নিশ্চল) নিত্যমুক্তম্ (নিত্যমুক্ত) অবিভক্তমূর্তি (বিভাগবর্জিত) তৎ-ত্বম্-অসি ভাবয়-আত্মনি (তিনিই তুমি, এই ধ্যান কর)।

সরলার্থ : সেই ব্রহ্ম যিনি অভেদ, সত্তামাত্র যাঁর লক্ষণ, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের জলরাশির মতো যিনি স্থির, যিনি নিত্যমুক্ত ও যাঁর মধ্যে কোনও বিভাগ নেই, তিনিই তুমি—এই ধ্যান কর।

ব্যাখ্যা : পরপর কয়েকটি শ্লোকেরই প্রসঙ্গ 'তত্ত্বমসি'। এখানে বলছেন, ওই যে সেই তিনি যাঁর কোনও সংজ্ঞা হয় না যাঁর সঙ্গে তুমি এক তিনি কিরকম জান? 'অস্তভেদম্-অনপাস্তলক্ষণম্'। 'অস্তভেদম্'—অভেদ, অবস্থা ভেদে ভিন্ন নন, তিনি সবসময় একরকম, homogeneous, তাঁর মধ্যে কোনও অসমতা নেই; 'অনপাস্তলক্ষণম্'—অস্তিত্বমাত্র, সত্তামাত্র তাঁর লক্ষণ। তিনি সৎস্বরূপ, সবকিছুর সত্তারূপে তিনি আছেন। তাঁর অস্তিত্ব চিরকালীন। আমাদেরও সবাইকার অস্তিত্ব

আছে, আমার একটা অস্তিত্ব আছে, অন্য আর একজনেরও একটা অস্তিত্ব আছে, কিন্তু আমরা এখন আছি বলে কিছু পরেও যে থাকব এমন নয়। শুধু আত্মা সব অস্তিত্বের ধারক, সবসময় তিনি আছেন। তিনি যেন 'নিস্তরঙ্গজলরাশিনিশ্চলম্'—অগাধ সমুদ্র, কোনও তরঙ্গ নেই, সামান্য চাঞ্চল্যও নেই—স্থির, নিশ্চল, প্রশান্ত। কিরকম একটা কল্পনা ! যদি ঢেউ ওঠে তাহলে নানাভাব আসে, বৈচিত্র আসে, একটা হয়তো বড় ঢেউ আর একটা ছোট ঢেউ, কিন্তু তরঙ্গ না থাকলে অচঞ্চল জলরাশি সমান স্থির। বেদান্ত বলেন, এক আত্মা, অদ্বিতীয় 'আত্মা'। 'আত্মা' মানে আমি। আমরা সবাই শুধু আমি-আমি করছি। এই যে আমিত্ব, অহংবুদ্ধি, এটা আমাদের সবাইকার মধ্যে আছে, একটা পিঁপড়ের মধ্যেও আছে। এই আমিত্ব, আত্মসচেতনতা, এ আমাদের সকলের মধ্যেকার এক সূত্র। অলডাস হাক্সলি বলেছেন এইটাই আমাদের highest common factor, গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। এই নয় যে এই অহং বিভক্ত হয়ে আছে, এক বস্তু, এক আমি। বিভিন্ন নাম আর রূপের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন মনে হচ্ছে। বেদান্ত বলছেন, ইনি যে কিরকম তা মুখে বলা যায় না, এঁর নাম নেই, যা হোক কিছু বলতে পার কিন্তু এক বস্তু। ইনি আছেন বলেই আমরা আছি আর এঁর মধ্যেই আমাদের শেষ। কিছু বলে এঁর বর্ণনা হয় না, তাই বলছেন আকাশবৎ। ব্রহ্ম বৃহত্তম, সর্বব্যাপী আবার অণুর থেকেও ক্ষুদ্র। তিনি বড়র মধ্যেও আছেন ছোটর মধ্যেও আছেন। আকাশের মতোই সর্বত্র আছেন। এক তিনি আমাদের সকলের মধ্যে আছেন। শুধু নাম আর রূপের পার্থক্যের জন্যে আমরা নিজেদের পৃথক ভাবি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যেমন একজন লোক নানারকমের মুখোশ পরলে তাকে নানারকম দেখায় সেই রকম এক আত্মা, বিভিন্ন নাম আর রূপ। বলছেন, 'নিস্তরঙ্গজলরাশিনিশ্চলম্'; যা মূল তাতে যদি ফিরে যাই, তাহলে দেখব অপার অস্তিত্বের সাগর, তরঙ্গ নেই, কোন অসমতা নেই, শুধু একত্ব। যিনি শুধু এক, তাঁর কি কোনও নাম দেওয়া যায়? একটা নাম দিলেই তো তিনি অন্য কিছুর থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। তিনি শুধু অনাদি অনন্ত এক বিরাট অস্তিত্ব, বিস্তীর্ণ একত্ব। 'নিত্যমুক্তম্-অবিভক্তমূর্তি'; তিনি নিত্যমুক্ত, তাঁর কোনও বন্ধন নেই। কি করে বন্ধন হবে? তিনি তো এক, কোনও ছোট-বড় থাকলে ছোটকে দাবিয়ে বড় ওঠে, তিনি এক তাই অবাধিত, মুক্ত। তিনি 'অবিভক্তমূর্তি'—তাঁর মধ্যে কোনও বিভাগ নেই, খণ্ড নেই, এক অখণ্ড সত্তা। 'যৎ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয় আত্মনি'—এইরকম যে ব্রহ্ম, তা-ই তুমি, এই ভাবনা সব সময় কর।

একমেব সদনেককারণং কারণান্তরনিরাস্যকারণম্।
কার্যকারণবিলক্ষণং স্বয়ং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬০

অন্বয় : একম্-এব সৎ (একই সত্তা) অনেককারণং (অনেক বিষয়ের উৎপত্তি বা

প্রকাশের কারণ) কারণান্তর নিরাসি (অন্য কারণ নিরাসের কর্তা) অকারণম্ (কারণশূন্য) কার্যকারণ বিলক্ষণম্ (কার্যকারণ থেকে ভিন্ন) ব্রহ্ম স্বয়ং (স্বয়ং ব্রহ্ম) তৎ-ত্বম্-অসি ভাবয় আত্মনি (তিনিই তুমি অন্তরে এই চিন্তা কর)।

সরলার্থ : ব্রহ্ম একমাত্র সত্তা, অনেক বিষয়ের উৎপত্তি ও প্রকাশের কারণ, অন্য কারণের নিরসনকারী, স্বয়ং কারণবিহীন এবং কার্য-কারণ থেকে পৃথক। তিনিই তুমি, অন্তরে এই ধ্যান কর।

ব্যাখ্যা : সেই একই প্রসঙ্গ, তত্ত্বমসি। বলছেন, 'একম্-এব-সৎ-অনেক কারণম্'— এক অস্তিত্ব, অস্তিত্বমাত্র। যা কিছু এসেছে সব ওই এক থেকে এসেছে। বৈচিত্র আছে কিন্তু মূলে ঐ এক সত্তা। 'অনেককারণং', এই যে বহু দেখছি, তিনিই এসবের কারণ, তিনিই বহুরূপ নিয়েছেন। কিন্তু এক তিনি সবকিছুর মধ্যে আছেন। 'কারণান্তর নিরাসি-অকারণম্'—তিনি নিজে কিন্তু কারণের উর্ধ্বে। তিনিই সবকিছুর একমাত্র কারণ, কিন্তু অন্য কোনও কিছুই তাঁর কারণ নয়। এ জগতের সবকিছুই কার্য-কারণের নিয়মে বাঁধা। একটা গাছ, তার অনেক ডালপালা, সেটা কার্য, আর ছোট যে বীজ যেটা দেখা যায় না সেইটে কারণ। কারণ ছাড়া কার্য হয় না। তাঁর কিন্তু কোনও কারণ নেই, তিনি 'অকারণম্'। 'একম্-এব-সৎ-অনেক কারণম্'—এই যে অনেক দেখছি সেটা তাঁর থেকেই হয়েছে, তিনিই কারণ। মাকড়সা এত বড় জাল বুনেছে, সব মাকড়সার থেকে এসেছে। তেমনি এই জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে এসেছে কিন্তু তিনি কারও থেকে আসেননি, তাঁর কোন কারণ নেই। কিন্তু তিনি 'অনেককারণং'। এখানে 'কারণ' বলতে মায়াকে ধরা হচ্ছে। যখন ব্রহ্মকে 'কারণ' বলা হচ্ছে বা স্রষ্টা বলা হচ্ছে, তখন সগুণ ব্রহ্ম বুঝতে হবে। সগুণ ব্রহ্ম মানে যখন তিনি তাঁর মায়া-শক্তির সঙ্গে আছেন। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়—তিনি কিছু করেন না। তাই তিনি কখনও কারণ নন, স্রষ্টা নন। ব্রহ্ম তাঁর অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। মায়া কারণ, জগৎ মায়ার কার্য। ব্রহ্ম মায়া এবং তার কার্য যে জগৎ, দুই থেকেই ভিন্ন, এটাই এখানে বলছেন। 'কার্য কারণ বিলক্ষণম্'—তিনি কার্যও নন কারণও নন, তিনি কার্য কারণের বাইরে। 'স্বয়ং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয় আত্মনি'—তুমি স্বয়ং ব্রহ্ম, তিনিই তুমি, এই চিন্তা কর। একই কথা বারবার কত ভাবে বলছেন। একটাই উদ্দেশ্য ঃ আমরা যাতে 'আমি আর তিনি এক' এই চিন্তা নানা ভাবে নানা দিক দিয়ে করতে পারি।

নির্বিকল্পকমনল্পমক্ষরং যৎ ক্ষরাক্ষরবিলক্ষণং পরম্।
নিত্যমব্যয়সুখং নিরঞ্জনং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি।। ২৬১

অন্বয় : নির্বিকল্পকম্-অনল্পম্ (কোনও বিকল্প নেই, অল্প নয়, অসীম) অক্ষরং

(ক্ষয়হীন) ক্ষর-অক্ষর-বিলক্ষণম্ (ক্ষয়িষ্ণু জগৎ ও ক্ষয়হীন জগৎ-শক্তি থেকে ভিন্ন) পরম্ (সর্বোত্তম, শ্রেষ্ঠ) নিত্যম্ (নিত্য) অব্যয়সুখম্ (নিত্যানন্দস্বরূপ) নিরঞ্জনং (অঞ্জনহীন, কালিমাহীন) যদ্‌ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম) তত্ত্বমসি ভাবয়-আত্মনি (তিনিই তুমি এই ধ্যান কর)।

সরলার্থ : যাঁর কোনও বিকল্প হয় না, যিনি অপরিসীম, অক্ষয়, যিনি এই ক্ষয়িষ্ণু জগৎ নন ও এই জগতের পিছনে যে অনাশী শক্তি আছে তাও নন, যিনি সর্বোত্তম, শাশ্বত, নিত্যানন্দ, অঞ্জনহীন ব্রহ্ম, তিনিই তুমি, অন্তরে এই ধ্যান কর।

ব্যাখ্যা : এখানেও সেই একই কথা বলছেন ঃ 'তত্ত্বমসি'। যা ভাবতে থাকবে তাই হয়ে যাবে তুমি। যদি ভাবো তুমি ভালো তাহলে ভালো হয়ে যাবে, আর যদি ভাবো তুমি অক্ষম, দুর্বল তাহলে তাই হবে। বলছেন, তুমিই যে সেই 'অবাঙ্‌মনসগোচর' 'তৎ' এই ভাবনা সবসময় মনের মধ্যে ধরে রাখ, তাহলেই একদিন জানতে পেরে যাবে তুমিই তিনি। বলছেন, 'নির্বিকল্পকম্-অন্-অল্পম্-অক্ষরং'। 'নির্বিকল্পকম্'—কোনও বিকল্প নেই, কোনও জুড়ি নেই, কোনও কিছুর মতোই নয়; 'অন্-অল্পম্'—ন অল্প, অল্প নয়, অসীম, অনন্ত; 'অক্ষরম্'—ক্ষয় নেই; ক্ষর মানে ক্ষয় আছে যার, 'অক্ষর'—ক্ষয় নেই। 'যৎ ক্ষর-অক্ষর বিলক্ষণম্ পরম্'; এ জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল, নশ্বর, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এরকম কিছুও আছে যার কোনও ক্ষয় নেই। কিন্তু যার কোনও পরিবর্তন নেই, ক্ষয় নেই, এরকম বস্তুকে চিনব কি করে? একটাই উপায়, যা পালটাচ্ছে, যার ক্ষয় আছে এমন কিছুর সঙ্গে তুলনা করে বুঝতে হবে। 'ক্ষর-অক্ষর', ক্ষর হচ্ছে এই বিশ্বজগৎ, আর অক্ষর হচ্ছে এর অন্তরালে যে অনন্ত শক্তি রয়েছে, যার ক্ষয় হয় না, তাই। কিন্তু ব্রহ্মকে তো কোনও গুণ দিয়ে বিশেষিত করা যায় না। তিনি কি এই বিশ্বজগৎ? তা তো নয়। তবে কি তিনি বিশ্বের পিছনে যে অক্ষয় শক্তি রয়েছে তাই ? তাও নয়। অক্ষয় শক্তি বলতে এখানে মায়াকে বোঝাচ্ছে। কোনও গুণ আরোপ করে তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না। তিনি স্রষ্টাও নন, সৃষ্টিও নন। তাঁর অন্ত করা যায় না। তাঁর কোনও বর্ণনা হয় না, বর্ণনা করতে গেলেই তাঁকে সীমিত করে ফেলব। তিনি 'পরম'—শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম। 'নিত্যম্-অব্যয়সুখম্'; তিনি নিত্য, সবসময় একই রকম, ত্রিকাল অবাধিত। 'অব্যয়সুখম্'। আমাদেরও সুখের অনুভূতি আছে, ভালো লাগার অনুভূতি আছে, কিন্তু তা স্থায়ী নয়, সবসময়ের জন্যে নয়। এখানে কিন্তু সুখ, আনন্দ সবসময় আছে। তিনি সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। 'অব্যয়'—কমে যায় না, হ্রাস পায় না। ব্রহ্মানন্দ সবসময়কার আনন্দ, তার কোনও কমতি নেই কখনও। আমরা এই আনন্দের জন্যেই ব্রহ্মকে জানতে চাই। 'নিরঞ্জনং'—কালিমা নেই, অঞ্জন নেই। এইরকম যে ব্রহ্ম তিনিই তুমি এই ভাবনা মনের মধ্যে ধরে রাখ।

যদ্‌বিভাতি সদনেকধা ভ্রমান্নামরূপগুণবিক্রিয়াত্মনা।
হেমবৎ স্বয়মবিক্রিয়ং সদা ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬২

অন্বয় : যৎ স্বয়ং (যিনি স্বয়ং) হেমবৎ (সোনার মতো) সদা (সর্বকালে) অবিক্রিয়ং সৎ (বিকার-হীন হয়ে আছেন) ভ্রমাৎ (ভ্রম থেকে) নামরূপগুণবিক্রিয়া-আত্মনা (নাম-রূপ ও গুণের বিকারযুক্ত সত্তাসহ) অনেকধা (অনেকভাবে) বিভাতি (প্রকাশ পাচ্ছেন) তৎ ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্ম) ত্বম্ অসি (তুমি) আত্মনি ভাবয় (মনের মধ্যে এই ভাবনা কর)।

সরলার্থ : যিনি স্বয়ং সর্বকালে স্বর্ণের মতো বিকারহীন এবং ভ্রমের কারণেই যিনি নামরূপ ও গুণের বিকারজনিত বিবিধসত্তা নিয়ে প্রকাশমান, সেই ব্রহ্ম তুমিই, মনের মধ্যে এই ভাবনা কর।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'যদ্ বিভাতি সদ্ -অনেকধা'—আমরা আমাদের চারদিকে কত কি দেখছি, কত রূপ, কত নাম, কত বিভিন্ন সত্তা। 'যদ্ বিভাতি'—যা প্রকাশ হচ্ছে; 'ভ্রমাৎ-নাম-রূপ-গুণ-বিক্রিয়া-আত্মনা'—আমরা বৈচিত্র দেখছি, বহু দেখছি, এই বহুর কি কোনও বাস্তবসত্তা আছে? না, 'বিক্রিয়া'—বিকার, যা এক তা বহুরূপে প্রকাশ হয়েছে। এই বহু আসলে নাম, রূপ ও গুণের বিকার। 'ভ্রমাৎ'—ভুল থেকে; অজ্ঞানের জন্যে আমরা বহু দেখি কিন্তু তফাত শুধু নাম, রূপ আর গুণের, এক ব্রহ্মই সব হয়েছেন। কত নাম, কত রূপ, চরিত্রের কত বৈশিষ্ট্য, বিচিত্র জগৎ, কিন্তু এ সমস্ত বৈচিত্রের অন্তর্নিহিত এক সত্য—ব্রহ্ম। তিনি সবসময় একই আছেন। কিরকম? 'হেমবৎ', হেম মানে সোনা; সোনা দিয়ে কতরকমের গয়না গড়ানো যায়, সেগুলোর সব বিভিন্ন আকার কিন্তু একই সোনা। কতরকমের অলঙ্কার, নাম আর রূপে আলাদা আলাদা হয়ে আছে, সোনা কিন্তু সোনাই থাকছে। সেই রকম নাম-রূপের জন্যে বহু মনে হচ্ছে, কিন্তু ব্রহ্ম 'অবিক্রিয়ম্'—বিকার নেই তাঁর। কতরকমের পোশাক পরতে পারি, ভিন্ন ভিন্ন পোশাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, এইগুলি বিকার, 'বিক্রিয়া'। আমি নিজে একই আছি, শুধু রূপ পালটাচ্ছে। সোনার চুড়ি, বালা, হার বা আরও অন্য কিছু গড়াতে পারা যায়, কিন্তু সোনা সোনাই থাকছে। এই নামরূপ এগুলো সব চাপানো জিনিস, অধ্যাস, সত্যি নয়। 'স্বয়ং অবিক্রিয়ং'—তুমি নিজে পালটাওনি, অবিকারী তুমি। 'সদা ব্রহ্ম'—সবসময় ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে আছ। তুমিই যে তিনি এটা জান, মনের মধ্যে এই ধ্যান কর।

যচ্চকান্ত্যনপরং পরাৎপরং প্রত্যগেকরসমাত্মলক্ষণম্।
সত্যচিৎসুখমনন্তমব্যয়ং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬৩

অন্বয় : যৎ ন-অপরং (যা অপর নয়) পরাৎপরং (শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেয়) প্রত্যক্-একরসম্ (সকলের অন্তরে অখণ্ড চৈতন্য) আত্মলক্ষণম্ (আত্মস্বরূপ) সত্য-চিৎ-সুখম্ (সচ্চিদানন্দ) অনন্তম্-অব্যয়ম্ (অনন্ত ও অব্যয়) ব্রহ্ম চকাস্তি (ব্রহ্ম উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন) তত্ত্বমসি ভাবয়-আত্মনি (তিনিই তুমি হৃদয়ে এই ধ্যান কর)।

সরলার্থ : যিনি অপর নন, শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেয়, সকলের অন্তরের অখণ্ডচৈতন্য, আত্মস্বরূপ সচ্চিদানন্দ, অনন্ত, অব্যয় ব্রহ্ম, যিনি উজ্জ্বলরূপে রয়েছেন, তিনিই তুমি, হৃদয়ে এই ধ্যান কর।

ব্যাখ্যা : এখানে আগের শ্লোকে যা বলেছেন তার প্রায় পুনরাবৃত্তি করছেন। বলছেন, 'যৎ চকাস্তি'—যা প্রকাশ হচ্ছে, তোমার আশেপাশে যা দেখছ তা ব্রহ্মের থেকে আলাদা নয়। 'ন-অপরং পরাৎপরং প্রত্যক্-একরসম্-আত্মলক্ষণম্', আমরা যা দেখছি আলাদা কেউ নয়। 'ন-অপরম্'—কেউ অপর নয়, এক, শুধু দেখাচ্ছে যেন আলাদা আলাদা। 'পরাৎপরং', পরঃ মানে শ্রেষ্ঠ; কাকে দেখছি? 'পরাৎপরং'—শ্রেষ্ঠর থেকেও যিনি শ্রেয়, ভালোর থেকেও যিনি ভালো, তাঁকেই দেখছি। অর্থাৎ ব্রহ্মকে দেখছি। এই পরম ব্রহ্ম 'একরসম্', এক অখণ্ডসত্তা, প্রত্যেকের মধ্যে আছেন, সকলের মধ্যে আছেন। 'আত্মলক্ষণম্'—ইনিই আত্মা, এক আত্মা 'ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত' (অবি, ১২) কিন্তু দেখাচ্ছে যেন প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন। 'সত্য-চিৎ-সুখম্' মানে সৎ-চিৎ-আনন্দ; সত্য মানে সৎ, নিত্য; চিৎ—চৈতন্য, বোধশক্তি 'জ্ঞান'; 'সুখম্'—আনন্দ। 'অনন্তম্'—চিরকালের জন্যে রয়েছেন, শেষ নেই, অন্ত নেই; 'অব্যয়ং'—অব্যয়, ক্ষয় নেই, ব্যয় নেই, মৃত্যুহীন, অমৃত। এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, যাঁর ক্ষয় নেই, ব্যয় নেই, শেষ নেই, মৃত্যু নেই, সেই এক তিনি আমাদের সকলের মধ্যে রয়েছেন। এই যে 'আমি আমি' করি, এই আমি সবাইকার মধ্যে রয়েছে। একটা পিঁপড়ে, তাকেও আঘাত করলে সে ফিরে দাঁড়ায়—যেন বলতে চায়, কি আমাকে তুমি অপমান করছ ! এই আমি—আমরা সবাই এই আমি বোধ নিয়ে আছি, সবাই আমরা আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করি। যেন অনেকগুলো ফুল রয়েছে, একটা সুতো দিয়ে সেগুলো গেঁথে দিয়েছি, একটা মালা হয়েছে, কিন্তু সুতোটা সব ফুলের ভেতর দিয়ে গেছে। তেমনি এক আত্মা সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন। 'মা বিরাজেন ঘটে ঘটে',আমি একটা ঘট, তুমি একটা ঘট, প্রত্যেকে এক একটা ঘট, সব ঘটের মধ্যে মা আছেন। এক আত্মা আমাদের সকলের মধ্যে আর সেই যে আত্মা, তিনিই তুমি। বলতে গেলে আমার মধ্যেও তুমি আবার অন্য সকলের মধ্যেও তুমি, যা কিছু আছে সে সবের মধ্যেই তুমি রয়েছ। তুমিই সেই ব্রহ্ম—এইটে মনে রেখো সবসময়, এই ধ্যান সবসময় কর।

উক্তমর্থমিমমাত্মনি স্বয়ং ভাবয়েৎ প্রথিতযুক্তিভির্ধিয়া।
সংশয়াদিরহিতং করাম্বুবৎ তেন তত্ত্বনিগমো ভবিষ্যতি॥ ২৬৪

অন্বয় : উক্তম্-ইমম্ অর্থম্ (আগে বলা তত্ত্বমসি বাক্যের এই অর্থ) আত্মনি স্বয়ং (নিজের অন্তরে) প্রথিত যুক্তিভিঃ-ধিয়া (সুসিদ্ধ যুক্তি ও বুদ্ধি সহকারে) ভাবয়েৎ (অনুধ্যান করতে হবে) তেন (এর দ্বারা) সংশয়-আদি রহিতং (সন্দেহাতীতভাবে) করাম্বুবৎ (হাতে ধরা জলের মতো) তত্ত্বনিগমো ভবিষ্যতি (তত্ত্বজ্ঞান করায়ত্ত হবে)।

সরলার্থ : আগে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের যে-অর্থ বলা হয়েছে তাই সুসিদ্ধ যুক্তি ও বুদ্ধি সহকারে নিজের অন্তরে অনুধ্যান করতে হবে। এইভাবে সমস্ত সংশয়ের অবসান হয়ে তত্ত্বজ্ঞান হাতে ধরা জলের মতো আয়ত্তাধীন হবে।

ব্যাখ্যা : আগের পরপর দশটা শ্লোকের ভাব হচ্ছে 'তৎ-ত্বম্-অসি ভাবয় আত্মনি'। আমরা 'তৎ' শব্দটা ব্যবহার করি এটা বোঝাবার জন্যে যে একজন আছেন কিন্তু তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না, তাঁকে আমরা বলি সেই; তিনিই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমসত্য। সেই 'তৎ' যে তুমি, এই চিন্তা সর্বদা করতে থাকলে তুমি তাঁকে জানতে পারবে, নিজের স্বরূপ জানতে পারবে, তিনি আর তুমি যে এক বুঝতে পারবে। এই কথাটাই আবার জোর দিয়ে এখানে বলছেন। 'উক্তম্-অর্থম্-ইমম্-আত্মনি স্বয়ং ভাবয়েৎ'; যা বলা হয়েছে অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' এই কথাটার অর্থ নিয়ে নিজের মনের মধ্যে ভাবনা করতে হবে। এই চিন্তা, এই ভাবনা তোমার মধ্যে সবসময় ধরে রাখ। এটাই সবসময় বিচার কর, অধ্যয়ন কর, ধ্যান কর। এসব কিভাবে করবে? 'প্রথিত যুক্তিভিঃ ধিয়া'; 'প্রথিত যুক্তি'— প্রসিদ্ধ যুক্তি, শাস্ত্র অনুমোদিত যুক্তি, এইসব যুক্তি শুদ্ধবুদ্ধির সাহায্যে ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ কর। 'নেতি নেতি' করে একটার পর একটা অনিত্যবস্তু বর্জন করতে করতে সেই 'তৎ'-এ এসে থেমে যাও। তিনিই তোমার আত্মা, সকলের আত্মা। আমাদের মন বলে একটা জিনিস আছে, এটা একটা ব্যাপক জিনিস। মনের যে অংশটা সঙ্কল্প-বিকল্পে দোলায়মান তাকেই আমরা সাধারণ অর্থে মন বলি। বুদ্ধি মনেরই একটা অংশ কিন্তু সে নিশ্চয়াত্মিকা, বিচার করে, কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক সে সেটা স্থির করে। চিত্ত আর অহঙ্কার মনের আরও দুটো অংশ। চিত্ত হচ্ছে হৃদয়াবেগ আর অহঙ্কার হচ্ছে আমিত্ব বুদ্ধি। আমার একটা আমি আছে, সেজন্যে আমাদের ইচ্ছা হয়, রাগ হয়। তারপর চিত্ত, সেখানে ভালোবাসা ঘৃণা এইসব হয়। সাধারণভাবে মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার এই চারটিকেই বেদান্তে অন্তঃকরণ বলা হয়। আর অন্তঃকরণের সব রকম ভাব এবং ক্রিয়ার সঙ্গেই অহঙ্কার মিশে থাকে। অহঙ্কারের প্রভাবে আমাদের বুদ্ধি মলিন হয়ে যায়। বেদান্তে চিত্তশুদ্ধির কথা বলা হয়, তার

মানে অহঙ্কারের জন্যে চিত্তে যে মলিনতা আসে সেটা ধুয়ে-মুছে ফেলা। চিত্তশুদ্ধি হলে বুদ্ধিও শুদ্ধ হয়ে যায়, সে বুদ্ধিতে আর আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ভাব থাকে না। এই শুদ্ধবুদ্ধির সাহায্যে শাস্ত্রবাক্য মেনে বিচার করতে হবে। শাস্ত্রবাক্য কেন মানব? কারণ, যা শাশ্বত সত্য, তাই আমাদের শাস্ত্র। এ অপৌরুষেয়। আমাদের শাস্ত্রে যা আছে তা কোনও বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা নয়, মননশীল মানুষের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা। এ পরীক্ষিত সত্য। এর উপলব্ধি তোমারও হতে পারে, যদি তুমি শাস্ত্রের নির্দেশ মান। তাই বলছেন শাস্ত্র অনুমোদিত যুক্তি সহকারে তুমি বিচার কর তাহলেই 'সংশয়াদিরহিতং করাম্বুবৎ তত্ত্বনিগমো ভবিষ্যতি', তত্ত্বজ্ঞান তোমার মধ্যে প্রতিভাত হবে। কোনও সংশয়ের অবকাশ থাকবে না। হাতের মুঠোয় জল ধরা আছে, আর কি কোনও সংশয় থাকতে পারে যে জল আমার হাতের মধ্যে আছে কি নেই? অন্য লোকে হয়তো জানে না, কিন্তু আমি তো জানি যে হাতে জল আছে ! তেমনি তত্ত্বজ্ঞান তোমার 'করাম্বুবৎ' বোধগম্য হবে, কোনও সংশয় থাকবে না।

সম্‌বোধমাত্রং পরিশুদ্ধতত্ত্বং বিজ্ঞায় সংঘে নৃপবচ্চ সৈন্যে।
তদাশ্রয়ঃ স্বাত্মনি সর্বদা স্থিতো বিলাপয় ব্রহ্মণি বিশ্বজাতম্॥ ২৬৫

অন্বয় : সৈন্যে চ নৃপবৎ (সেনাদের মধ্যে রাজার মতন) সংঘে (দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সমাহার জীবে) তদ্-আশ্রয়ঃ (সেই আশ্রয়) সম্‌বোধমাত্রং (জ্ঞানস্বরূপ) পরিশুদ্ধ-তত্ত্বং (চৈতন্যস্বরূপ শুদ্ধ আত্মাকে) বিজ্ঞায় (জেনে)স্বাত্মনি সর্বদা স্থিতঃ (স্বস্বরূপে সর্বদা স্থিত [তুমি]) বিশ্বজাতং (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীবজগৎকে) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) বিলাপয় (লয় করে দাও)।

সরলার্থ : সৈন্যদের মধ্যে রাজা যেমন সর্বাধিনায়ক তেমনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সমাহার জীবে সেই আশ্রয়, জ্ঞানস্বরূপ, শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মা। সেই আত্মাকে জেনে স্বস্বরূপে স্থিত হয়ে তুমি বিশ্ব ও জীবজগৎকে ব্রহ্মে লয় করে দাও।

ব্যাখ্যা : বলছেন, জীব হচ্ছে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন ইত্যাদির সমাহার। তাকে 'সংঘ' বলা হচ্ছে এখানে। আর আত্মা হচ্ছেন সেই সংঘের রাজা। তিনি সবকিছুর নিয়ামক আবার নিজে এ সবকিছুর থেকে আলাদা। 'সংঘে নৃপবৎ-চ সৈন্যে'। আমাদের একটা করে শরীর আছে, কতসব ইন্দ্রিয় আছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এগুলো আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় আর বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু হচ্ছে আমাদের কর্মেন্দ্রিয়, তার ওপর আবার রয়েছে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। এরা হচ্ছে আমাদের সৈন্য। এদের নিয়ে কত লড়াই করছি আমরা; কিন্তু এদের চালাবার জন্যে একজন রাজা চাই যার হয়ে এরা লড়াই করবে। তা এই রাজাটি কে? আত্মা, জ্ঞানস্বরূপ

আত্মা। বলছেন, 'সম্‌বোধমাত্রং'। বোধ হচ্ছে জ্ঞান। 'সম্‌বোধমাত্রং', 'সম্'— সম্যক্, সম্পূর্ণ; 'সম্‌বোধ'—পূর্ণজ্ঞান, ঠিক ঠিক জ্ঞান, সম্পূর্ণ জ্ঞান। 'পরিশুদ্ধ তত্ত্বং'—শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ সত্তা, যা কোনও কিছুর ওপর নির্ভর করে নেই। যা অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে তা আর শুদ্ধ থাকে না, শুধু কথাটা শুদ্ধ থেকে এসেছে, শুধুজ্ঞান—সম্পূর্ণ জ্ঞান। 'বিজ্ঞায় সংঘে নৃপবৎ-চ সৈন্যে', এই আত্মাকে জান, কিন্তু কিভাবে? 'নৃপবৎ-চ সৈন্যে'; তিনি রাজা, সর্বাধিনায়ক। সৈন্যদল আছে, তাদের নির্দেশ দেবার জন্যে তো একজন চাই। তেমনি এই যে আমি, এ কি কতকগুলো জিনিসের সমাহার ? জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অহংকার এইসব নিয়ে আমি, এই আমিটা কে? এটা দর্শনের একটা খুব বড় প্রশ্ন। বুদ্ধদেব রথের উপমা দিতেন। বৌদ্ধ নাগসেনার সঙ্গে গ্রীকরাজা মিলিণ্ডার এই নিয়ে কথা হচ্ছে, নাগসেনা বোঝাতে চাইছেন, এই আমিটা কে। মিলিণ্ডা রথে চেপে এসেছেন, তাঁকে বলছেন, এই যে রথে এসেছ, এই রথটা কোন্‌টা? চাকাটা? তোমার ওই পাটাতনটা না ওপরে যে ছাউনি আছে সেটা? মিলিণ্ডা বলছেন, না, সবগুলো নিয়ে। তেমনি এই যে আমি সেটা কি আমার হাতটা না পা-টা না দেহের অন্য একটা অঙ্গ? না তা নয়, এরা সব আমার সৈন্য, আমি রাজা, সেনাপতি; এগুলি সব আমার অনুগত ভৃত্য, আমার আদেশে চলছে, আমি সর্বাধিনায়ক। তাই বলছেন : 'তদাশ্রয়ঃ স্বাত্মনি সর্বদা স্থিতঃ'; মনে রেখো তারা তোমাকে আশ্রয় করে আছে, 'তদাশ্রয়ঃ'। উপনিষদে একটা কথা আছে, রথের চাকার যে অরা বা spokes আছে সেগুলি সব নাভিতে বাঁধা আছে। সেইরকম এই যে সব অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়, সব তোমার ওপর নির্ভর করে আছে, তুমি নির্দেশ দিলে তবে তারা লড়াই করতে নামবে। 'স্ব-আত্মনি সর্বদা স্থিতঃ', তোমার মধ্যে তুমি সর্বদা রয়েছ, এরা তোমার ওপর নির্ভর করে আছে। 'ব্রহ্মণি বিলাপয় বিশ্বজাতম্'—এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জীবজগৎ দেখছ, সব তুমি ব্রহ্মে বিলোপ করে দাও। তার মানে কি ? তুমি সব ব্রহ্ম বলেই দেখো। বেদান্তের এইটাই ব্যাপার। প্রথমে নেতি নেতি করে সবকিছু অনিত্য বলে ত্যাগ করা তারপর যখন সত্য-বস্তুর ধারণা হলো, অনুভব হলো, তখন উপলব্ধি যে, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। ব্রহ্মময়ং জগৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ বোঝাচ্ছেন, নিত্য আর লীলা। নিত্য হচ্ছে সৎস্বরূপ ব্রহ্ম, আবার যাঁরা এটা জেনেছেন তাঁরা দেখছেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব তাঁর লীলা। শ্রীরামকৃষ্ণ বেলের উপমা দিচ্ছেন। বেল একটা ফল; তুমি ব্রহ্মকে নিচ্ছ মানে বেলের সারটাকে নিচ্ছ, কিন্তু বেলকে নিতে হলে তার শাঁস, বীচি সব নিতে হবে কারণ এই সবসুদ্ধ নিয়েই তো বেল ফলটা। তেমনি এই জগৎসংসার সব ব্রহ্মে অধ্যস্থ হয়ে আছে, এসবই তো ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়, তাই 'বিলাপয় ব্রহ্মণি বিশ্বজাতম্'। সবকিছু ব্রহ্মে সমর্পণ

করে দাও, ব্রহ্মে লয় করে দাও। 'যথা অরা নাভৌ'—যেমন চাকার অরা অর্থাৎ spokes গুলো hubs এ ধরা আছে, সেইরকম এই জগৎ ব্রহ্মে ন্যস্ত হয়ে আছে। 'ব্রহ্মময়ং জগৎ', আবার বলছেন, 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ', সবই ব্রহ্ম। যখন জগৎকে ব্রহ্ম ছাড়া দেখি তখন খণ্ডিত হয়ে যাই, দুই দেখি, কিন্তু যখন সর্বত্র ব্রহ্ম দেখি তখন জগৎ ব্রহ্ম, জীব ব্রহ্ম, সব ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। এক তিনিই আছেন, তিনিই সব। এইটাই বলতে চাইছেন।

বুদ্ধৌ গুহায়াং সদসদ্‌বিলক্ষণং ব্রহ্মাস্তি সত্যং পরমদ্বিতীয়ম্।
তদাত্মনা যোঽত্র বসেদ্ গুহায়াং পুনর্ন তস্যাঙ্গ গুহাপ্রবেশঃ॥ ২৬৬

অন্বয় : বুদ্ধৌ গুহায়াং (বুদ্ধির গুহাতে) সৎ-অসৎ বিলক্ষণং (স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষণ বর্জিত) পরম্-অদ্বিতীয়ম্ সত্যং ব্রহ্ম-অস্তি (শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম বিরাজমান) তৎ-আত্মনা (তাঁর সঙ্গে একাত্ম) যঃ (যিনি) অত্র গুহায়াং (এই গুহাতে) বসেৎ (অবস্থান করেন) অঙ্গ (হে অঙ্গস্বরূপ শিষ্য) তস্য (তার) পুনঃ (পুনরায়) গুহাপ্রবেশঃ (মাতৃগর্ভরূপ গুহায় প্রবেশ)ন (হয় না)।

সরলার্থ : শ্রেষ্ঠ,অদ্বিতীয়, সৎস্বরূপ, স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষণ বর্জিত, পরম ব্রহ্ম বুদ্ধিগুহায় বিরাজ করছেন। যিনি তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে এই বুদ্ধিগুহাতে অবস্থান করেন, হে অঙ্গস্বরূপ শিষ্য, তাঁর আর পুনর্বার মাতৃগর্ভরূপ গুহা-প্রবেশ ঘটে না।

ব্যাখ্যা : কেউ আমরা পরাধীন থাকতে চাই না। আমাদের সংসারবন্ধন, বারবার সংসারে আসা-যাওয়া, জন্ম আর মৃত্যু, এই ভববন্ধন থেকে মুক্তি কি করে হবে ? সেকথাই এখানে বলছেন। 'বুদ্ধৌ গুহায়াং'—বুদ্ধিরূপ গুহাতে; বুদ্ধিকে গুহা বলা হচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে যেন একটা গুহা আছে, গভীর তাই তার ভেতরে কি আছে আমি জানতে পারছি না। কিন্তু বুদ্ধি যদি শুদ্ধ হয় তাহলে বুদ্ধির গভীরে যা আছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন জানতে পারব কি আছে ওই বুদ্ধি-গুহায়। দর্পণটা যতক্ষণ ময়লা ছিল ততক্ষণ সেই দর্পণে যা-কিছু দেখেছি সব অস্পষ্ট, ময়লাটা যদি পরিষ্কার করা যায় তাহলে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাবে। তেমনি বুদ্ধি যদি শুদ্ধ হয় তাহলে সেই বুদ্ধির গভীরে যিনি আত্মা তিনি জ্বলজ্বল করতে থাকবেন। শুদ্ধবুদ্ধি মানে কি? যে বুদ্ধি থেকে সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয়ে গেছে। শ্রীশ্রীমা বলতেন, নির্বাসনা হও। কেন নির্বাসনা হবো? কারণ যতক্ষণ বাসনা আছে ততক্ষণ যন্ত্রণা। একটা বাসনা চরিতার্থ হলো তো আর একটা বাসনা এলো, আগুনে ঘি ঢালার মতো, আর বাসনা পূর্ণ না হলেই দুঃখ। তাই বাসনা জয় করতে হবে। শাস্ত্র তাই বৈরাগ্যের কথা বলেছেন। 'বুদ্ধৌ গুহায়াম্', কি আছে সেখানে? 'সৎ-অসৎ বিলক্ষণম্', এখানে 'সৎ' মানে

স্থূল, ব্যক্ত আর 'অসৎ' হচ্ছে সূক্ষ্ম, অব্যক্ত ; 'বিলক্ষণম্' মানে যার কোনও লক্ষণ নেই। এমন একটা চিহ্ন নেই যা দিয়ে তাঁকে বর্ণনা করতে পারি। সৎ-অসৎ থেকে তিনি বিলক্ষণ অর্থাৎ তিনি স্থূলও নন সূক্ষ্মও নন। সেই ব্রহ্ম, যিনি সৎ-অসৎ বিলক্ষণ, বুদ্ধিরূপ গুহায় তিনি আছেন। 'সত্যম্ পরম্-অদ্বিতীয়ম্', তিনি শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, নিত্য সত্য, সবসময় আছেন। চুপ করে আছেন, সাক্ষিস্বরূপ দ্রষ্টা। কিন্তু তিনি আছেন বলেই সবকিছু চলছে। এই যে সৃষ্টি হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, এসব প্রকৃতি ঘটাচ্ছে কিন্তু তিনি আছেন বলেই প্রকৃতি কাজ করছে। সংসারের মধ্যে কতরকম কাণ্ড ঘটছে, কত হাসি, কান্না, এসব হচ্ছে তিনি আছেন বলে। সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, সবকিছু হচ্ছে তিনি আছেন বলে, তিনি আশ্রয়। তিনি 'সত্যং পরম্-অদ্বিতীয়ম্'—তাঁর কোনও দ্বিতীয় নেই, কোনও বিকল্প নেই, কোনও জুড়ি নেই; এই বুদ্ধিতে তিনি বিরাজ করছেন, তাই বুদ্ধি কাজ করছে, মন কাজ করছে, তিনি সেনাপতিরূপে চুপ করে বসে আছেন। 'তদাত্মনা যঃ অত্র বসেৎ'; সেই আত্মার সঙ্গে একসাথে যিনি বুদ্ধিগুহায় বাস করেন, তাঁর মুক্তি হয়ে গেছে। আগে আমরা মুক্তির কথা বলেছি, মুক্তি দুরকমের, বিদেহমুক্তি আর জীবন্মুক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলছেন, জীবন্মুক্ত অবস্থা বড় আনন্দের অবস্থা; জ্ঞান হয়ে গেছে, তুমি বুঝেছ তুমিই সব, তুমি আত্মা তখন এমন আনন্দ যে তার মতো আনন্দ আর হয় না। 'তদ্-আত্মনা যঃ অত্র বসেৎ', জ্ঞান হয়ে গিয়ে তিনি এখানেই অবস্থান করছেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হয়ে আছেন, তিনি আত্মক্রীড়, নিজের সঙ্গে যেন খেলা করছেন, মজা করছেন। তুমি জান তুমি চিরকাল আছ আর যাদের দেখছ তারাও তুমি, তাই তাদের নিয়ে তুমি মজা করছ। বলছেন এরকমভাবে যে থাকে, 'আত্মনা যঃ অত্র বসেৎ'—যিনি আত্মার মধ্যেই অবস্থান করছেন তাঁর, 'পুনঃ ন তস্যাঙ্গ গুহাপ্রবেশঃ', মাতৃজঠররূপ গুহায় তিনি আর প্রবেশ করেন না, তাঁর আর জন্ম নেই। 'অঙ্গ'—এখানে গুরু শিষ্যকে অঙ্গ বলছেন। শিষ্য তাঁর প্রিয়, নিজের অঙ্গের মতো, তাই অঙ্গ বলছেন। 'তস্য ন পুনঃ গুহাপ্রবেশঃ অঙ্গ'; শিষ্যকে বলছেন, হে অঙ্গ, যার আত্মজ্ঞান হয়েছে সে আর জননীর জঠরগুহায় প্রবেশ করে না। এই জীবনেই যাঁর জ্ঞান হয়েছে তিনি জীবন্মুক্ত। স্থিতপ্রজ্ঞ। তাঁর ব্রাহ্মীস্থিতি। ব্রহ্মে তাঁর সর্বদা অবস্থান। কাজেই তিনি আর জননীর জঠরগুহায় প্রবেশ করেন না, জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যান।

জ্ঞাতে বস্তুন্যপি বলবতী বাসনানাদিরেষা
কর্তা ভোক্তাপ্যহমিতি দৃঢ়া যাস্য সংসারহেতুঃ।
প্রত্যগ্‌দৃষ্ট্যাত্মনি নিবসতা সাপনেয়া প্রযত্নান্-
মুক্তিং প্রাহুস্তদিহ মুনয়ো বাসনাতানবং যৎ॥ ২৬৭

অন্বয় : বস্তুনি জ্ঞাতে অপি (বস্তুজ্ঞান হলেও) কর্তা ভোক্তা-অপি-অহম্-ইতি (কর্তা ভোক্তা আমিই এই ভাব) এষা দৃঢ়া বলবতী অনাদিঃ বাসনা (এই দৃঢ়মূল বলবতী অনাদি বাসনা) যা অস্য সংসারহেতুঃ (যা এই জন্মমৃত্যু ঘেরা সংসারের হেতু) সা প্রত্যাক্ দৃষ্ট্যা (তা আত্মদৃষ্টির দ্বারা) আত্মনি নিবসতা (নিজের আত্মায় অবস্থিত থেকে) প্রযত্নাৎ অপনেয়া (বিশেষ যত্নে দূরীকরণীয়) ইহ (এই জীবনে) যৎ বাসনাতানবং (যা বাসনার ক্ষয়) তৎ মুক্তিম্ (তাই মুক্তি) মুনয়ঃ প্রাহুঃ (মুনিগণ বলে থাকেন)।

সরলার্থ : বস্তুজ্ঞান হলেও 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা' রূপ অত্যন্ত বলবতী দৃঢ়মূল এই বাসনা, যার কোনও আদি নেই, যা জন্মমৃত্যুর চক্ররূপ এই সংসারের হেতু—সেই বাসনার অপনয়ন করতে হবে পরম যত্নে, আত্মদৃষ্টির সাহায্যে, নিজের আত্মস্বরূপে স্থিত থেকে। মুনিগণ বলেন এই জীবনে বাসনার ক্ষয়ই মুক্তি।

ব্যাখ্যা : এখানে যেন একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন। বলছেন, তোমার বস্তুজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হলেও সাবধান থেকো, যাতে না তোমার বাসনা-জনিত সংস্কার আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বস্তুজ্ঞান কি ? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। বস্তুজ্ঞান হলো অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানলাম। উপলব্ধি করলাম, আমি আত্মা, এই দেহটা আমি নই। খুব ভালো, কিন্তু তবুও সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের অনেকদিনের সংস্কার, সেগুলো সহজে যায় না, তাই আত্মজ্ঞান লাভ করলেও ওই আত্মচিন্তা—'তত্ত্বমসি' আমাদের সবসময় করে যেতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, একটা গাছ, সেটা করাত দিয়ে কেটে দেওয়া হলো, তখুনি গাছটা পড়ে যাবে না, বাতাস এলে বা একটা ধাক্কা দেওয়া হলে তবে পড়বে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে momentum, বাংলায় বলে ভরবেগ। একটা কিছু ঠেলে নিয়ে কিছুদূর গিয়ে ছেড়ে দিলেও সেটা ওই ভরবেগের দরুন কিছুদূর আপনি চলে যায়। সেইরকমই অনেকদিন ধরে যে দেহটাকে আমি বলে ভেবে এসেছি, এখন জ্ঞান হওয়ায়, বুঝতে পারছি এটা আমি নই, এটা একটা চাপানো জিনিস, অনিত্য, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যাবে দেহের ওপর একটা টান রয়ে গেছে, দেহটাকে নিত্য মনে করছি, দেহটাকে 'আমি' মনে করছি। তাই বলছেন : 'জ্ঞাতে বস্তুনি-অপি বলবতী বাসনা অনাদিঃ এষা '; বস্তুজ্ঞান হয়েছে তবু সতর্কদৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, 'বলবতী বাসনা অনাদিঃ এষা'; এই যে বাসনা, ইচ্ছা,আকাঙ্ক্ষা, এ অনাদি এবং অত্যন্ত বলবতী। কতরকমের বাসনা, স্থূল আবার সূক্ষ্ম। স্থূলগুলোকে দেখতে পাই। বড়লোক হব, অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি হবে—এগুলো স্থূল, এসব আমরা দেখতে পাই। আর সূক্ষ্ম বাসনাগুলো দেখতে পাই না। মনের ভেতরে

লুকিয়ে থাকে, সময় হলে প্রকাশ পায়। এদের সংখ্যাই বেশী। এদের চেনাই কঠিন। এই বাসনা এসেছে অজ্ঞতা থেকে। কিন্তু কি করে এলো? আমার স্বরূপ সেটা ভুলে গেলাম কি করে? অজ্ঞানের জন্যে। বলছেন, বাসনা অনাদি কিন্তু সান্ত। অর্থাৎ এর অন্ত আছে। আদি নেই, শুরুটা জানি না—আমাদের জেনেও কাজ নেই। কবে অজ্ঞান এলো, কি করে এলো, কত জন্মজন্মান্তর ধরে অজ্ঞান চলছে এসব আমার জেনে কাজ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, বড় আশ্বাসের কথা এই যে অজ্ঞান সান্ত, চলে যায়। কত মহাপুরুষ এসেছেন যাঁদের অজ্ঞান চলে গেছে, শাস্ত্রও বলছেন অজ্ঞান সান্ত, এটাই আশার কথা। মুক্তি বলে যে একটা জিনিস আছে সেটা তো বুঝতে পারছি ! তাই বলছেন তোমার স্বরূপজ্ঞান হয়েছে, তুমি জেনেছ তুমি আত্মা কিন্তু তবুও তোমাকে বাসনা এবং সূক্ষ্ম অহংকার সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। 'কর্তা ভোক্তা অহম্ ইতি দৃঢ়'—আমি আমি ! আমি কর্তা, আমি ভোক্তা—এই অহঙ্কার দৃঢ় হয়ে আছে। আমাদের আমিত্বটা কি ? মায়া। মায়া কাকে বলে? না, অহংতা আর মমতা—এই মায়া। মায়ার জন্যে এগুলো আসে। বলছেন, এ সহজে যায় না, জ্ঞান হলেও যায় না। কেন যায় না? শাস্ত্র বলছেন, জ্ঞান তো সব পুড়িয়ে দিয়ে গেছে, তোমার অজ্ঞানের যে বীজ তাকেও পুড়িয়ে দিয়েছে। ওই যে মায়াদড়ি সেটা পুড়ে গেছে, ছাই হয়ে গেছে কিন্তু আকারটা আছে। সেটা দিয়ে আর বাঁধতে পারবে না, তবু একটা ছায়া যেন রয়ে গেছে—ওই পোড়া দড়ি। এটা শ্রীরামকৃষ্ণের উদাহরণ। তোমার অজ্ঞান চলে গেছে, বন্ধন কেটে গেছে, তুমি মুক্ত, কিন্তু ওই মায়াদড়ির ছায়া সেটা 'সংসারহেতুঃ'—আবার তোমায় জড়াবে সংসারে । ক্ষতি করতে পারবে না কিন্তু কষ্ট দেবে। এই অজ্ঞান, মায়া, এ অত্যন্ত বলবতী, এর শিকড় মনের মধ্যে কতদূর যে গেছে, শক্ত হয়ে বসে আছে। এর যে ছায়া সেটাও যেন ভয়ানক শক্ত মনে হয়। 'যা অস্য সংসারহেতুঃ'; এর জন্যেই সংসার, মানে আমাদের জন্মমৃত্যু এইসব। সংসার মানে যা সরছে অর্থাৎ অনিত্য, পরিবর্তনীয়, সরছে। 'সৃ' ধাতু থেকে 'সংসার' শব্দ—গতিশীল, পালটে যাচ্ছে। এই সংসারবন্ধন থেকে নিস্তার পেতে গেলে কি করতে হবে? খুব যত্ন করে 'অপনেয়', অপসারণ করতে হবে—ওই ছায়াটাও আমি চাই না। 'প্রত্যগ্‌দৃষ্ট্যা আত্মনি নিবসতা'; 'প্রত্যগ্‌দৃষ্টি'—আত্মদৃষ্টি, মানে আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান হলে কি হবে? 'আত্মনি নিবসতা'—আত্মায় আমি অবস্থান করব, সেখানে আমার শিকড় গাড়ব। আত্মজ্ঞান হলে অচল, অটল হয়ে দৃঢ়ভাবে নিজের আত্মায় আমি বসে থাকব। এই হচ্ছে কথা, ওই যে অজর অমর আত্মা, তার জ্ঞান হলে তাতে আমি দৃঢ় থাকব, প্রতিষ্ঠিত থাকব, স্থির হয়ে থাকব। নিবাস মানে বাসস্থান, সেটাই আমার বাসস্থান, সেই আত্মবুদ্ধিতে আমি সবসময় নিবদ্ধ থাকব। 'সা অপনেয়া', 'সা' মানে ওই যে

অবিদ্যা, অজ্ঞান, বাসনা, সেইটা; 'অপনেয়া'—তুলে ফেলতে হবে, ধুয়ে-মুছে ফেলতে হবে; প্রযত্নান্—যত্নের সঙ্গে, খুব চেষ্টা করে বাসনা দূর করতে হবে। তা যদি পার, নির্বাসনা যদি হতে পার তাহলেই মুক্তি। নির্বাসনা কি করে হয়? কোনও কিছু চাইব না, বাসনা থাকবে না, আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। তার মানে কি নিঃস্ব হয়ে থাকব? তা নয়, চাইতে যদি কিছু হয় তো সবচেয়ে বড় জিনিস চাইব—মুক্তি চাইব। বা শ্রীশ্রীমা যেমন বলছেন, নির্বাসনা চাইব। কারণ, নির্বাসনা থেকেই মুক্তি। গীতায় কিরকম বলছেন, 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ' (গী, ৬।২২)—যা পেলে মনে হবে আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে! কি পেলে এরকম হবে ? ভগবানকে পেলে। কেন ভগবান? কারণ ভগবানই সবকিছু হয়েছেন, ভগবান লাভ করলেই আর কিছু চাইবার থাকে না। 'মুক্তিম্ প্রাহুঃ তদ্-ইহ মুনয়ঃ বাসনাতানবং যৎ', 'বাসনাতানবং'—বাসনাক্ষয়, 'তানব' মানে ক্ষীণতা। বাসনার ক্ষয় হলেই মুক্তি। যার বাসনা নেই তার মুক্তিও হয়ে গেছে, মুনিরা এরকম বলেন।

অহং মমেতি যো ভাবো দেহাক্ষাদাবনাত্মনি।
অধ্যাসোঽয়ং নিরস্তব্যো বিদুষা স্বাত্মনিষ্ঠয়া।। ২৬৮

অন্বয় : দেহ অক্ষাদৌ (দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি) অনাত্মনি (অনাত্মবস্তুতে) অহং মম-ইতি যঃ ভাবঃ (যে আমি-আমার বোধ) অয়ং অধ্যাসঃ (এই অধ্যাস) স্ব-আত্মনিষ্ঠয়া (স্বীয় আত্মায় নিষ্ঠা সহকারে) বিদুষা (বিদ্বান আত্মজ্ঞ পুরুষের দ্বারা) নিরস্তব্যঃ (নিরসন কর্তব্য)।

সরলার্থ : দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি অনাত্মবস্তুতে যে আমি-আমার বোধ এ অধ্যাস। বিদ্বান আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজ আত্মায় নিবিষ্ট থেকে এর নিরসন করেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন : দেহকে নিয়ে আমরা কত আড়ম্বর করি, কিন্তু দেহ ও দেহ-সংক্রান্ত সবই চাপানো জিনিস, মিথ্যা। 'অহং মমেতি যঃ ভাবঃ দেহ-অক্ষাদৌ-অনাত্মনি'—'অক্ষ' মানে ইন্দ্রিয়—হাত-পা-চোখ-কান এইসব। এগুলো সব অনাত্মবস্তু, আত্মার থেকে আলাদা, আত্মার ওপর চাপানো জিনিস। কিন্তু এগুলোকেই ভাবছি 'অহং' আর 'মম'। এই দেহটাকে 'আমি' মনে করছি আর ভাবছি 'আমার' হাত, পা, চোখ, কান, এইসব। শুধু কি তাই? এই দেহটাকে কেন্দ্র করে একটা বিরাট জগৎ সৃষ্টি করছি। আমার এই সমাজ, আমার এই জাতি, আমার এতসব আছে ইত্যাদি। কিন্তু এসব অনাত্মা, আত্মা নয়, নিত্যবস্তু নয়। ভুল করে এগুলোর ওপর 'আমি আমার' বোধ চাপিয়ে দিয়েছি। এ হলো 'অধ্যাস', এটা 'নিরস্তব্যঃ'—দূর করতে হবে। কি করে দূর করব? 'আত্মনিষ্ঠয়া'—নিজের স্বরূপ

চিন্তার দ্বারা। এছাড়া ভ্রান্তি দূর করার আমাদের আর কোনও উপায় নেই। জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান দূর হয়, আলোর দ্বারাই অন্ধকার দূর হয়, সত্যের দ্বারাই মিথ্যা দূর হয়। 'আত্মনিষ্ঠয়া'—আত্মচিন্তা করে অধ্যাস দূর করতে হবে। নিজের স্বরূপকে জানা আর এই চিন্তায় সবসময় নিবিষ্ট হয়ে থাকা এই হচ্ছে আত্মনিষ্ঠা, এমনি করেই অধ্যাস দূর হবে। সবসময় আত্মচিন্তা—আমি কে, আমার স্বরূপ কি? যত আমি এই চিন্তা করব তত আমার শরীরচিন্তা, যা বদ্ধমূল হয়ে আছে, সেটা চলে যাবে। এখন শরীর খারাপ হলে আমার খারাপ লাগে, শরীর ভালো হলে ভালো লাগে, কারণ শরীরটাই 'আমি' হয়ে আছি। স্বরূপচিন্তা করতে করতে আত্মাতেই আমার স্থিতি হবে, শরীরটাকে আমি বলে আর ভুল হবে না।

জ্ঞাত্বা স্বং প্রত্যগাত্মানং বুদ্ধিতদ্‌বৃত্তিসাক্ষিণম্।
সোঽহমিত্যেব সদ্‌বৃত্ত্যানাত্মন্যাত্মমতিং জহি॥ ২৬৯

অন্বয় : বুদ্ধি-তৎ-বৃত্তি-সাক্ষিণম্ (বুদ্ধি ও তার সমস্ত বৃত্তির সাক্ষীস্বরূপ) প্রত্যক্-আত্মানং (নিজের আত্মাকে) জ্ঞাত্বা (জেনে) সঃ-অহম্-ইতি-এব (সেই তিনিই আমি এই ভাব নিয়ে) সৎ-বৃত্ত্যা (প্রজ্ঞাসম্পন্ন বৃত্তির দ্বারা) অনাত্মনি (অনাত্মবস্তুতে) আত্মমতিং (আত্মবুদ্ধি) জহি (বিনষ্ট কর)।

সরলার্থ : বুদ্ধি ও তার সমস্ত বৃত্তির সাক্ষীস্বরূপ যে আত্মা তাঁকে জেনে 'তিনি আমি' এই ভাব নিয়ে প্রজ্ঞাসম্পন্ন বৃত্তির দ্বারা অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি বিনষ্ট কর।

ব্যাখ্যা : আগে যে বলেছেন মন বুদ্ধি এসবে 'আমি আমার' করাটা অজ্ঞানের কাজ সেই কথাটাই এখানে আরও স্পষ্ট করে বলছেন। 'জ্ঞাত্বা স্বং প্রত্যক্-আত্মানং'—নিজেকে জেনে, তোমার যে প্রত্যক্-আত্মা তাঁকে জেনে বোঝ যে তিনিই তোমার মন বুদ্ধি সব চালাচ্ছেন। 'বুদ্ধি তৎ-বৃত্তিসাক্ষিণম্'; আমাদের বুদ্ধির কত রকম কার্যকলাপ, মনের কত কার্যকলাপ; বৃত্তি মানে মনের তরঙ্গ, ঢেউ, কত ভাবের ঢেউ মনের মধ্যে উঠছে ! এই যে কত কিছু কাণ্ড ঘটছে সাক্ষীস্বরূপ তিনি আছেন বলেই সেসব ঘটছে। তিনি যেন মাষ্টারমশাই, হাতে চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'সঃ- অহং'—যে-তিনি বুদ্ধির সব কার্যকলাপ সাক্ষী হয়ে চালাচ্ছেন, সেই তিনিই আমি। আমি সাক্ষী, এই যে ভাব এটাই 'সৎবৃত্তি'—অর্থাৎ যে বৃত্তিতে আত্মাকে চেনা যায়, আত্মজ্ঞান হয়। 'সৎবৃত্ত্যা অনাত্মনি আত্মমতিং জহি'; অনাত্মা হচ্ছে এইসব মন বুদ্ধি ইত্যাদি যা আত্মা নয়। বলছেন, সৎবৃত্তির দ্বারা 'অনাত্মনি' অর্থাৎ যা আত্মা নয় সেইসব বস্তুতে 'আত্মমতিং জহি'—আত্মবুদ্ধি নষ্ট কর। এই যে অনাত্মাতে আত্মমতি করছ, আত্মা বলে ভাবছ, এই যে ভুল করছ, এটাকে নষ্ট করে

দাও। আমরা তো মন বুদ্ধি সবকিছুকে 'আমি' মনে করি। মন বুদ্ধি এসব অধ্যাস, এগুলো সরিয়ে দাও, এই ভুল ভাবাকে শেষ করে দাও। এসব মিথ্যে বলে জান, সেই সাক্ষীস্বরূপ তাঁকেই সত্যি বলে বুঝে নাও। তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ, সাক্ষী রূপে থেকে যা তিনি করাচ্ছেন সেসব দেখতে পাচ্ছি। তাই বলছেন, 'জ্ঞাত্বা স্বং প্রত্যক্-আত্মানং বুদ্ধি-তৎ-বৃত্তি-সাক্ষিণং সোঽহং'— সেই সাক্ষীস্বরূপ তিনিই আমি। 'সৎ-বৃত্ত্যা অনাত্মনি আত্মমতিং জহি'—তাঁকে নিজের স্বরূপ রূপে জান এবং সৎবৃত্তির সহায়ে অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি করাটা নিঃশেষে বিনষ্ট কর।

লোকানুবর্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহানুবর্তনম্।
শাস্ত্রানুবর্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৭০

অন্বয় : লোকানুবর্তনং (লোকের অনুবর্তী হওয়া) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) দেহানুবর্তনং (দেহকে কেন্দ্র করে সুখের চেষ্টা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) শাস্ত্রানুবর্তনং (পাণ্ডিত্যের জন্যে শাস্ত্রচর্চা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) স্ব-অধ্যাস (নিজের ওপরের অধ্যাস) অপনয়ং কুরু (অপসারিত কর)।

সরলার্থ : লোকের অনুবর্তী হয়ে চলা ত্যাগ করে, দেহকে ঘিরে সুখের চেষ্টা ছেড়ে আর পাণ্ডিত্যের জন্য শাস্ত্রচর্চা থেকে বিরত হয়ে নিজের ওপরের অধ্যাস দূর কর।

ব্যাখ্যা : এখানে আবার সাবধান করে দিচ্ছেন। তিনটে জিনিস থেকে সাবধান হতে হবে। একটা হচ্ছে, লোকলজ্জা, লোকে কি বলবে এই ভয়। লোককে খুশি করার চেষ্টা। কোনও ভালো কাজ করতে যাচ্ছি, আমার বিবেক যা বলবে তাই করা উচিত, কিন্তু লোকে কি বলবে সেই ভেবে করতে পারি না। এই ভাব ত্যাগ করতে হবে। বলছেন, 'লোকানুবর্তনং ত্যক্ত্বা', লোকে কি বলবে সেই কথা ভেবে চলবে না। 'ত্যক্ত্বা দেহানুবর্তনং', দেহের সুখের জন্যে চোলো না। দেহের সুখ, দেহের আরাম, এর জন্যে কত কি করি আমরা, সব সুখ-দুঃখ যেন দেহকেই ঘিরে। দেহ নিয়ে যেন অস্থির হয়ে আছি। এইভাবে চললে হবে না। সেইজন্যে আমাদের শাস্ত্র বলেন মাঝে মাঝে মৃত্যু চিন্তা করা ভালো। আবার বলছেন, 'শাস্ত্রানুবর্তনং ত্যক্ত্বা'। সাবধান করে দিচ্ছেন, শুধু পাণ্ডিত্য বাড়ানোর জন্যে শাস্ত্রচর্চা কোরো না। আমাদের শাস্ত্র যেন একটা জাল, এই জালে যেন বাঁধা পড়ে যেও না। শাস্ত্রে কি আছে? তুরীয়ানন্দজী মহারাজ খুব শাস্ত্র পড়তেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, তোমাদের শাস্ত্রে কি আছে? 'ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা', এই তো? তিনি বলছেন, হ্যাঁ তাই। শঙ্করাচার্য বলছেন, 'শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তম্ গ্রন্থকোটিভিঃ', কোটি কোটি গ্রন্থে

যা বলেছে, অর্ধেক শ্লোকে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। তা হলো : 'ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আর জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। এই হলো সমস্ত শাস্ত্রের মর্মার্থ। এটুকু জানার জন্যেই শাস্ত্রচর্চা, পাণ্ডিত্যের জন্যে নয়। কেউ কেউ আছেন একটার পর একটা শাস্ত্র পড়ে একটার পর একটা উপাধি অর্জন করে যাচ্ছেন। স্বামীজী একটা সংস্কৃত উক্তি উদ্ধৃত করে বলছেন, 'ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য'; গাধা চন্দন কাঠের বোঝা বহন করছে, ভারটাই অনুভব করছে, চন্দনের গন্ধটা পাচ্ছে না। পাণ্ডিত্য অর্জন করার জন্যে শাস্ত্র পড়তে থাকলে এই অবস্থাই হয়। বিদ্যা শুধু বোঝা হয়ে থাকে, শাস্ত্রের যে বার্তা সেটা আর অন্তরে পৌঁছায় না। তাই শাস্ত্রানুবর্তন ত্যাগ করতে বলছেন। বলছেন, এসব ছেড়ে তোমার ওপর যেসব অধ্যাস আছে সেগুলো সরিয়ে দাও। সেটাই তোমার একমাত্র কর্তব্য।

লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ।
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে॥ ২৭১

অন্বয় : জন্তোঃ (জীবের) লোকবাসনয়া (অন্য লোকদের খুশি করার ইচ্ছের জন্যে)শাস্ত্রবাসনয়া (শাস্ত্রচর্চা আর শাস্ত্রবিচারে বিশেষ অনুরক্তির জন্যে) দেহবাসনয়া অপি চ (আর দেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও ভোগসুখের চেষ্টার কারণেও) যথাবৎ জ্ঞানম্ (যথার্থ জ্ঞান) ন এব জায়তে (জন্মাতেই পারে না)।

সরলার্থ : অন্য সব লোকেদের খুশি করার ইচ্ছে, শাস্ত্র চর্চা ও বিচারে বিশেষ আসক্তভাব ও দেহের সুখ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা এইসব থাকলে জীবের যথার্থ জ্ঞান হতে পারে না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, জীবের যে লোকবাসনা অর্থাৎ অন্য সবাই আমাকে ভালো বলুক, আমার সম্বন্ধে খুশি থাকুক, এরকম একটা ইচ্ছে, এটা আত্মজ্ঞান লাভের পক্ষে বাধা। এই যে আমরা মানুষের মনোরঞ্জন করে চলতে চাই, সেটা কেন চাই? কারণ আমার যে একটা 'আমি' আছে যেটা আমাকে আর সকলের থেকে পৃথক করছে সেই 'আমি' এতে সুখ অনুভব করে—আমাকে কেমন সবাই ভালো বলছে, আমি অন্য পাঁচজনের থেকে কত আলাদা এরকম একটা ভাবনা বেশ ভালো লাগে। কিন্তু এ তো দুই দেখা, অজ্ঞান। যে 'আমি' সকলের 'আমি', এই ভাব আমায় তার থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। তেমনি আমার যদি শাস্ত্রচর্চা, শাস্ত্রবিচারের ওপর অত্যন্ত আসক্তি জন্মায় তার মানে হচ্ছে আমার মনোগত ইচ্ছে বিদ্বান, বুদ্ধিমান বলে একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করা। এতেও আমার অভিমানই শুধু স্ফীত হবে, স্বরূপজ্ঞান অনেক দূরে থাকবে। একই কারণে দেহের আরাম, দেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধির চিন্তা আমাকে

শুধু মিথ্যে ঘুরিয়ে মারবে; যা নিত্য, যা সত্য, আমার যে সৎস্বরূপ আত্মা তাঁর কাছে পৌঁছতে দেবে না। যা অনিত্য তাই নিয়ে যদি মেতে থাকি তো নিত্যবস্তুকে ধরব কি করে ? তাই বলছেন, লোকবাসনা,শাস্ত্রবাসনা আর দেহবাসনা যথার্থ জ্ঞান হতে দেয় না।

সংসারকারাগৃহমোক্ষমিচ্ছোরয়োময়ং পাদনিবদ্ধশৃঙ্খলম্।
বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ পটু বাসনাত্রয়ং যোঽস্মাদ্বিমুক্তঃ সমুপৈতি মুক্তিম্॥ ২৭২

অন্বয় : তৎ-জ্ঞাঃ (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ) পটু বাসনাত্রয়ং (দৃঢ়মূল বাসনা তিনটিকে) সংসারকারাগৃহ মোক্ষম্-ইচ্ছোঃ (সংসার কারাগৃহ হতে মুক্তি অভিলাষী ব্যক্তির) অয়োময়ং (লৌহময়) পাদনিবদ্ধ শৃঙ্খলং (পায়ে বাঁধা শৃঙ্খল) বদন্তি (বলেন) যঃ (যিনি) অস্মাৎ (এর থেকে) বিমুক্তঃ (মুক্ত) সমুপৈতি মুক্তিম্ (তিনি মুক্তিলাভ করেন)।

সরলার্থ : তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, সংসাররূপ কারাগৃহ থেকে মুক্তি-অভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি অত্যন্ত দৃঢ় বাসনা পায়ে বাঁধা লোহার শেকলের মতো। যিনি এই বাসনা তিনটি থেকে মুক্ত তিনি এই জীবনেই মুক্তি লাভ করেন।

ব্যাখ্যা : এখানে 'বাসনাত্রয়' বলতে আগের শ্লোকে যে তিনটি বাসনার কথা বলেছেন, সেগুলিকেই বোঝাচ্ছেন—লোকানুবর্তনং, দেহানুবর্তনং, আর শাস্ত্রানুবর্তনং। যাঁরা মুক্তি পেতে চান তাঁদের কাছে এই তিনটি বাসনা যেন লোহার শেকল, পায়ে বাঁধা রয়েছে। এই যে মুক্তি কথাটা বলা হচ্ছে, এ হচ্ছে জীবন্মুক্তি—জীবদ্দশাতেই মুক্তি। এটা কি করে সম্ভব? যদি আমি এই তিনটি বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলতে পারি তাহলে সম্ভব। বলছেন, 'সংসারকারাগৃহ'; এ আমরা নিজে সৃষ্টি করেছি, নিজেকেই এর থেকে মুক্তি পেতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিচ্ছেন, মাছ ঘুনির মধ্যে বাঁধা পড়েছে, বেরোতে পারছে না। বলছেন : 'সংসারকারাগৃহমোক্ষম্-ইচ্ছোঃ', এই সংসার কারাগার থেকে যে মুক্তি পেতে চায় সে কি করবে? সে শৃঙ্খলমুক্ত হতে চাইবে। শৃঙ্খলিত হয়ে আছে তো ! কিন্তু এ শৃঙ্খল কিসের ? 'অয়োময়ং'—লোহার শৃঙ্খল; 'বাসনাত্রয়ঃ', যে বাসনার কথা বলা হলো ওই তিনটি বাসনা হলো লোহার শেকল, তা দিয়ে আমার পা দুটো বাঁধা পড়ে আছে। 'সংসার কারাগৃহমোক্ষম্-ইচ্ছোঃ অয়োময়ং পাদনিবদ্ধ শৃঙ্খলম্'— এই সংসার থেকে মুক্তির ইচ্ছা কারও মনে যদি জাগে তাহলে প্রথমেই সে অনুভব করবে যে, লোহার শেকলে পা দুটো বাঁধা, 'অয়োময়ং পাদনিবদ্ধ শৃঙ্খলম্'। কিন্তু এই যে আমরা যেন কারাগারে শৃঙ্খলিত হয়ে আছি এটা আমরা অধিকাংশ লোকই জানি না।

বেশীর ভাগ লোক ভাবে, বেশ তো আছি, ভালো আছি, বেশ আছি। ভাগ্যবান যারা তারা কিন্তু বোঝে, তারা এর থেকে মুক্তি পেতে চায়। তারা তখন কি করে? এই বাসনার শেকল ভাঙতে চেষ্টা করে। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ তাঁরা বলছেন, 'পটু বাসনাত্রয়ং'—এই তিনটি বাসনা বড় শক্ত, পটু মানে শক্ত। সাবধান করে বলছেন, যদি মুক্তি চাও তো মনে করবে এই তিনটি বাসনা যেন লোহার শেকল, তা দিয়ে পা বাঁধা আছে। এই তিনটি বাসনা হল 'লোকানুবর্তনং', 'দেহানুবর্তনং' আর 'শাস্ত্রানুবর্তনং'। 'লোকানুবর্তন' মানে লোককে খুশি করার চেষ্টা। আর 'দেহানুবর্তন' মানে দেহকে নিয়ে মেতে থাকা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা এ সবাইকার থাকে, বুদ্ধদেব যেমন দেহ রাখবার জন্যে খেলেন; অনেক সাধনা করতে হবে, তাই শরীর ঠিক না থাকলে চলবে কি করে ? St. Francis of Assisi যেমন শরীরকে বলতেন, 'brother ass'—ভার বইবে তো তাই ass। কিন্তু শরীরসর্বস্ব হলেও চলবে না। শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে, কারণ এ একটা উপায়, আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার একটা উপায়। তার বেশি নয়। তারপর 'শাস্ত্রানুবর্তন', নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্যে অনেক শাস্ত্র পড়ছি। এ বন্ধনের কারণ। এরকম শাস্ত্রপাঠ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য আগে বলেছেন, 'ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে'। এই তিনটি বন্ধন কাটাতে পারলে মুক্তি আসবে। যাঁরা 'তত্ত্ব-জ্ঞাঃ', অর্থাৎ যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়েছে তাঁরা একথা বলছেন। 'যঃ অস্মাৎ বিমুক্তঃ সমুপৈতি মুক্তিম্'— যে এর থেকে মুক্ত হয়েছে সেই মুক্তি লাভ করে। জীবন্মুক্ত হয়ে অবস্থান করে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা দেখি 'লোকানুবর্তন' নেই—কারোর কথার ধার ধারেন না; 'দেহানুবর্তন' তো নেইই—পরনের কাপড়ের ঠিক নেই; আর 'শাস্ত্রানুবর্তন'—সে তাঁর থাকার কোনও কথাই নেই, শাস্ত্র না পড়েই তিনি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ, তাঁর জীবনই শাস্ত্রের প্রমাণ।

জলাদিসংসর্গবশাৎ প্রভূতদুর্গন্ধধৃতাগরুদিব্যবাসনা।
সংঘর্ষণেনৈব বিভাতি সম্যগ্‌বিধূয়মানে সতি বাহ্যগন্ধে॥ ২৭৩

অন্বয় : জলাদিসংসর্গবশাৎ (জল ইত্যাদির সংসর্গের হেতু) অগরুদিব্যবাসনা (অগরুচন্দনের দিব্যগন্ধ) প্রভূতদুর্গন্ধধৃতা (অত্যন্ত দুর্গন্ধে দূরীভূত) সংঘর্ষণেন এব (ঘর্ষণের দ্বারা) বাহ্যগন্ধে সম্যক্-বিধূয়মানে সতি (এই বহিরাগত গন্ধের সম্পূর্ণ নিষ্কাশন হলে) বিভাতি (চন্দনের স্বাভাবিক সুগন্ধ প্রকাশ পায়)।

সরলার্থ : জল ও জলের ভেতরের ময়লার সংসর্গে এসে, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে অগরুচন্দনের দিব্যবাস যেন দূরীভূত হয়। ভালো করে ঘর্ষণ করলে ওই বহিরাগত দুর্গন্ধ চলে যায় ও চন্দনের দিব্যগন্ধ প্রকাশ পায়।

ব্যাখ্যা : এখানে বলতে চাইছেন : আমাদের মধ্যে জ্ঞান রয়েছে কিন্তু চাপা পড়ে

রয়েছে। উদাহরণ দিচ্ছেন : অগরু চন্দনের। কত সুগন্ধ, কিন্তু জলের মধ্যে হয়তো অনেকদিন পড়ে আছে, পচে গেছে, দুর্গন্ধ হয়েছে। কিন্তু তুমি যদি ঘষতে থাক, আবার সুগন্ধ হবে। চন্দন কাঠ তো, সুগন্ধ তার মধ্যে আছেই। ঘর্ষণ করলেই সুগন্ধ বেরিয়ে আসবে। যেমন আয়নাটায় ময়লা পড়েছে, তাই তাতে নিজের রূপটা ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, বিকৃত রূপ দেখছি। ময়লাটা পরিষ্কার করে নিলেই নিজের রূপ ঠিক ঠিক দেখতে পাব। আমাদের শাস্ত্রে এই চিত্তশুদ্ধির ওপরেই জোর দেওয়া হয়। আমাদের মনের ওপর মলিনতা জমেছে। সেটাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। তার জন্যে আমরা অনিত্য বস্তুকে নিত্য মনে করছি আর দুঃখ পাচ্ছি। ভেতরে আনন্দের প্রস্রবণ রয়েছে। ওপরের আবরণটা সরিয়ে দিলেই তা বেরিয়ে আসবে, চন্দনের গন্ধের মতো। বলছেন, 'জলাদি সংসর্গবশাৎ প্রভূতদুর্গন্ধধৃতা -অগরু-দিব্যবাসনা'—জল ইত্যাদির সংসর্গে এসে অগরুতে প্রভূত দুর্গন্ধ জমেছে, এর সুগন্ধ চাপা পড়ে গেছে। এর 'দিব্যবাসনা' যেন দূরীভূত হয়ে গেছে । এখানে 'বাসনা' কথাটার অর্থ কামনা নয়—সৌরভ। অগরুর যে সৌরভ সেটা চাপা পড়ে গেছে, জলাদি সংসর্গে প্রভূত দুর্গন্ধ হয়েছে বলে। সেটা কি করে ফিরে আসবে ? 'সংঘর্ষণেন-এব বিভাতি'— 'সংঘর্ষণেন' মানে ঘর্ষণের দ্বারা, 'বিভাতি' মানে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ ঘর্ষণ করতে হবে, তাহলেই অগরুর যে দিব্যগন্ধ সেটা প্রকাশ হয়ে পড়বে। স্বামীজী যেমন বলছেন, 'Each soul is potentially divine'. সেই 'divinity'কে manifest করতে হবে, প্রকাশ করতে হবে, ফুটিয়ে তুলতে হবে—সংঘর্ষণের দ্বারা। সংঘর্ষণটা কি ? চেষ্টা, তপস্যা, বিচার। বারবার চিন্তা কর তুমি মুক্ত, তুমি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, তুমি নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। তুমি রাজার ছেলে, ভিক্ষুকের মতো ব্যবহার করছ, তুমি যে রাজার ছেলে সেটা ভুলে গেছ। বাস্তবিক, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে শাস্ত্র বলছেন, তুমি মুক্ত, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না। তবে মাঝে মাঝে এক একজন আসেন যাঁদের দেখে আমরা বুঝতে পারি, হ্যাঁ শাস্ত্র যা বলেছেন সেসব কথা ঠিক। তাঁরা কারও কাছে কিছু চান না, কোন কিছুর পরোয়া করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন, চলছেন তো চলছেন, কিছু গ্রাহ্য নেই, যেন সিংহ; স্বামীজী বলছেন, মুক্ত পুরুষ কেমন হন ? যেন বন্ধনমুক্ত সিংহ—বন্ধন ছিঁড়ে গর্জন করতে করতে যাচ্ছে, ভাবখানা যেন ঃ পারলে আমাকে বাঁধতে? কিভাবে এ সম্ভব ? সাধনার দ্বারা। 'সংঘর্ষণেন-এব বিভাতি', আমাদের মধ্যে যে জ্ঞান চাপা রয়েছে সেটা ঘর্ষণের দ্বারা ফুটে উঠবে। অনুক্ষণ স্বরূপচিন্তা, ধ্যান, সোঽহং সোঽহং, জপ—এই ঘর্ষণ। এ করতে পারলে অজ্ঞান আপনি চলে যাবে। তাঁর কথা শুনব,তাঁর কথা নিয়ে মনের মধ্যে অনবরত নাড়াচাড়া করব, তারপর ধ্যান করব। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এসব চাই, এ না হলে হবে না। 'জলাদি সংসর্গবশাৎ

প্রভূতদুর্গন্ধধৃতা অগরু দিব্যবাসনা'—অগরুর যে দিব্যবাসনা সেটা চাপা পড়ে গেছে, ময়লা জলের সংসর্গে এসে, প্রভূত দুর্গন্ধ জমেছে বলে। এই দুর্গন্ধ কিন্তু বাইরে থেকে এসেছে, 'বাহ্যগন্ধ'; এটা বাইরের জিনিস, আগন্তুক, স্বগত নয়, স্বাভাবিক নয়। এটা অধ্যাস, আরোপিত, মিথ্যা। এটা দূর করতে হবে। 'সংঘর্ষণেন এব বিভাতি সম্যক্ বিধূয়মানে সতি বাহ্যগন্ধে'; ঘর্ষণ করতে হবে, তবে ওপরের ময়লাটা পরিষ্কার হবে। তখন ওই দুর্গন্ধ, যা বাইরে থেকে এসেছে সেটা পুরোপুরি দূর হয়ে যাবে আর চন্দনের দিব্যসৌরভ বেরিয়ে আসবে। জ্ঞান আমাদের মধ্যে রয়েছে কিন্তু চাপা আছে। একটা অজ্ঞানের আবরণ পড়েছে, সেটা সরিয়ে দিতে পারলেই পূর্ণজ্ঞান জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠবে।

অন্তঃশ্রিতানন্তদুরন্তবাসনা-ধূলীবিলিপ্তা পরমাত্মবাসনা।
প্রজ্ঞাতিসংঘর্ষণতো বিশুদ্ধা প্রতীয়তে চন্দনগন্ধবৎ স্ফুটম্॥ ২৭৪

অন্বয় : অন্তঃশ্রিত-অনন্তদুরন্তবাসনা ধূলীবিলিপ্তা (জীবের অন্তঃকরণে আশ্রিত অনন্ত ও দুর্দম বাসনারূপ ধূলিতে ঢাকা পড়ে থাকা) পরমাত্মবাসনা (পরমাত্মার সৌরভ,দীপ্তি) প্রজ্ঞা অতিসংঘর্ষণতঃ (নিরন্তর আত্মচিন্তা ও আত্মবিচার রূপ সংঘর্ষণদ্বারা জ্ঞান) চন্দনগন্ধবৎ (ঘর্ষণে বেরিয়ে আসা চন্দনের সৌরভের মতো) স্ফুটম্ বিশুদ্ধা প্রতীয়তে (নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধভাবে ফুটে ওঠে)।

সরলার্থ : অন্তরে যে অনন্ত, দুর্মদ বাসনা রয়েছে তা যেন ধূলির আস্তরণের মতো পরমাত্মার সৌরভ ও দীপ্তিকে ঢেকে দিয়েছে। আত্মচিন্তা ও আত্মবিচার অভ্যাস করলে ঘর্ষণে বেরিয়ে আসা চন্দনের সুগন্ধের মতো জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার দিব্য ও বিশুদ্ধ সুবাস নিঃসন্দেহে ফুটে উঠবে।

ব্যাখ্যা : জ্ঞান আমাদের ভেতরে রয়েছে, কিন্তু অজ্ঞানের আবরণে ঢাকা পড়েছে, সেই আবরণটা সরাতে হবে। এইটাই একমাত্র কথা। এই কথাটাই আমাদের মনে গেঁথে দেবার জন্যে কত ভাবে বলছেন ! এখানে বলছেন, দেখো ব্যাপারটা কিরকম, যেন বহুদিন ধরে তোমার মনের মধ্যে ধুলো জমে রয়েছে, আয়নায় যেমন ধুলো জমে। কি ধুলো ? 'অন্তঃশ্রিত-অনন্ত দুরন্ত বাসনা'—মনের মধ্যে কত দিনের কত বাসনা জমে রয়েছে। সেগুলিই ধুলো। অগুনতি বাসনা, প্রবল বাসনা। সেই 'অনন্ত দুরন্ত' বাসনায় 'ধূলীবিলিপ্তা পরমাত্মবাসনা'; 'পরমাত্মবাসনা'—পরমাত্মার সৌরভ বা দীপ্তি ; জ্ঞানের একটা দীপ্তি আছে, সেই দীপ্তিটা চাপা পড়ে গেছে। বাল্বে ময়লা থাকলে আমরা আলোটা ভালো পাই না বা হারিকেনের চিমনিটায় কালি পড়লে সেটা পরিষ্কার না করলে আলোটা ঠিকমতো আসে না। সেইরকম তোমার মনে

জন্মজন্মান্তরের বাসনা, সংস্কার জমে আছে, সেগুলোকে তুমি দূর কর। তাহলে কি হবে? 'প্রজ্ঞা-অতিসংঘর্ষণতঃ'— জ্ঞান ফুটে বেরুবে, যেভাবে চন্দনকাঠ ঘষতে ঘষতে গন্ধ বেরিয়ে আসে। 'প্রজ্ঞা', জ্ঞান তোমার ভেতরে আছে, বারবার সংঘর্ষণ করতে করতে, চিন্তা করতে করতে ফুটে উঠবে। কিরকম? যেন মাটির তলায় সোনা আছে, খনন কর তবে তো সোনা পাবে; সোনারুপোর ওপর দিয়ে কত চলাফেরা করে যাচ্ছ, জানতে পারছ না। জ্ঞান ভেতরে রয়েছে, বাইরে থেকে আসছে না। এ বই পড়া জ্ঞান নয়—ভেতরের জ্ঞান। তুমি সংঘর্ষণ কর, খনন কর, খোঁজ, ভেতরেই তার সন্ধান পাবে—যা চাবে এখানে পাবে খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে। 'অন্তঃশ্রিত-অনন্তদুরন্তবাসনা ধূলীবিলিপ্তা পরমাত্মবাসনা'; আমাদের জ্ঞানটার কি হয়েছে? ধূলি লিপ্ত হয়েছে, ধুলো মাখা হয়ে আছে, আমাদের বাসনার জন্যে। অনন্ত বাসনা, শেষ নেই, একটা বাসনার থেকে আবার একটা বাসনা আসছে। এর ফলে কি হচ্ছে? জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আমার যে পরমাত্মা তার সৌরভ তার দীপ্তি ঢাকা পড়ে গেছে। তাহলে কি করতে হবে? সংঘর্ষণ করতে হবে। সবসময় নিজেকে মনে করাতে হবে তুমি মুক্ত, তুমি আত্মা, তুমি শুদ্ধ। তাহলে ওই যে বাসনার ধুলো মেখে আছ, সেটা চলে যাবে। আমার কি নেই? সব আছে। দেহের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ করে রাখি বলে আমি 'এক' দেখতে পাই না, কিন্তু এই দেহ নিয়ে আমি কেন থাকতে চাইব ? আমি আমার সব মলিনতা ঝেড়ে ফেলব, জ্ঞানলাভ করব। বলছেন, 'প্রজ্ঞা অতিসংঘর্ষণতঃ'—এই জ্ঞান ফুটবে বারবার ঘষতে ঘষতে। বারবার করে চিন্তা করতে হবে, আমি মুক্ত, আমি জ্ঞানস্বরূপ,আমি সর্বব্যাপী। এইরকম চিন্তা করতে করতে 'বিশুদ্ধা প্রতীয়তে চন্দনগন্ধবৎ স্ফুটম্', 'বিশুদ্ধা প্রতীয়তে'—নির্মলরূপে প্রতীয়মান হয়, প্রকাশিত হয়। 'চন্দনগন্ধবৎ স্ফুটম্'—চন্দনের গন্ধের মতো আমার আত্মা নির্মল শুদ্ধরূপে প্রকাশিত হন। অতিঘর্ষণের ফলে এ সম্ভব হয়। অতিঘর্ষণ আর কিছু নয়—বারবার মনকে বোঝানো, 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'সোঽহং'। আগের শ্লোকগুলিতে যেমন বললেন : 'তত্ত্বমসি ভাবয় আত্মনি'। এমনি করতে করতে নিজের স্বরূপ আমার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে।

অনাত্মবাসনাজালৈস্তিরোভূতাত্মবাসনা।
নিত্যাত্মনিষ্ঠয়া তেষাং নাশে ভাতি স্বয়ং স্ফুটম্॥ ২৭৫

অন্বয় : আত্মবাসনা (আত্মার সৌরভ, দীপ্তি বা আত্মাকে জানার বাসনা) অনাত্মবাসনাজালৈঃ (অনাত্মবিষয়ে আকর্ষণের অজ্ঞানরূপ আবর্জনার জালে), তিরোভূতা (আচ্ছাদিত) নিত্য-আত্মনিষ্ঠয়া (নিয়ত আত্মচিন্তারদ্বারা) তেষাং নাশে (সেসবের নাশ হলে) স্বয়ং স্ফুটং ভাতি (নিজস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে)।

সরলার্থ : অনাত্মবিষয়ে আসক্তি ও তার থেকে যে বাসনা তা জালের মতো আত্মার সৌরভ বা আত্মরূপে অধিষ্ঠানের বাসনা আবৃত করেছে। নিয়ত আত্মচিন্তার দ্বারা এগুলোর নাশ হলে নিজের স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা উজ্জ্বলরূপে ফুটে ওঠেন।

ব্যাখ্যা : আবার বলছেন, এই যে জ্ঞান এ 'স্বয়ং স্ফুটম্'—আপনা-আপনি প্রকাশ হয়। এটা রয়েছে সব সময়, কিন্তু চাপা রয়েছে, আবরণ রয়েছে এর ওপর। মায়ার আবরণী শক্তিতে ঢাকা আছে। মেঘ মধ্যাহ্ন সূর্যকে ঢেকে রেখেছে, দেখতে পাচ্ছি না, মেঘ যদি সরে যায়, তাহলে সূর্য প্রকাশ হবে। মনের কালিমা যদি কেটে যায়, জ্ঞান আপনি ফুটে উঠবে। 'অনাত্মবাসনাজালৈঃ', অনাত্মবিষয়ে আমাদের আকর্ষণ আর তার থেকে অনন্ত বাসনা, একটা জালের মতো আমার স্বরূপকে ঢেকে রেখেছে। বহির্মুখী মন অনবরত এটা চাই, সেটা চাই করছে। একটা বাসনা পূরণ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বাসনা এসে গেলো। এরকমই নিয়ম, যেন আগুনে ঘি ঢালছি। বলছেন, 'অনাত্মবাসনাজালৈঃ তিরোভূতা-আত্মবাসনা' অর্থাৎ আত্মা নয় এরকম যেসব বিষয়বাসনা তা যেন জালের মতো—আত্মাকে লাভ করার যে বাসনা তাকে ঢেকে রেখে দিয়েছে। আত্মার যে দীপ্তি, সৌরভ, তাকে ঢেকে রেখে দিয়েছে। তাহলে কি করতে হবে? 'নিত্য আত্মনিষ্ঠয়া'—সবসময় আত্মনিষ্ঠা রাখতে হবে, আত্মচিন্তা করতে হবে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। ভালো বাসনা দিয়ে মন্দ বাসনাকে সরিয়ে দিতে হবে। ছোট কিছু চাইব কেন? চাইতে হলে বড় জিনিস চাইব। 'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখম্ অস্তি' (ছা, ৭।২৩।১)— যা বিরাট, যা বড়, যা চিরদিনের, তাই চাইব। আমরা ত্যাগ বলতে এই বুঝি, বড়র জন্যে ছোটকে ত্যাগ। অনাত্মবস্তু ত্যাগ করব নিত্য-আত্মনিষ্ঠার দ্বারা। সবসময় আত্মচিন্তা করতে হবে, তাহলে 'তেষাং নাশে'— সেই সব কামনার নাশ হয়ে গেলে আত্মা ফুটে উঠবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার করে বলছেন, তুমি যদি পূর্বদিকে এগিয়ে যাও তাহলে পশ্চিম তোমার পেছনে সরে সরে যাবে। ঈশ্বরে অনুরাগ হলে বিষয়ে বিরাগ আপনিই আসবে। ব্রহ্মানন্দের যে আস্বাদ পেয়েছে তার কি আর বিষয়ানন্দ ভালো লাগে? 'নিত্য-আত্মনিষ্ঠয়া', সব সময় আত্মচিন্তা করতে করতে বাসনা সব চলে যায়। তখন 'তেষাং নাশে', সব বাসনার নাশ হলে, 'ভাতি স্বয়ং স্ফুটম্'—আত্মা স্বয়ং ফুটে ওঠেন। আমার ভেতরে আত্মা রয়েছেন, সেই আত্মা ফুটে ওঠেন। সব সময় আত্মচিন্তার দ্বারা মনের মলিনতা কেটে যাবে, মনের আবর্জনা সব চলে যাবে, আবরণ পড়েছিল সেটা চলে যাবে, মন শুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন স্বয়ং আত্মা সেই শুদ্ধ মনে আপনা-আপনি ফুটে উঠবেন।

যথা যথা প্রত্যগবস্থিতং মনস্তথা তথা মুঞ্চতি বাহ্যবাসনাম্।
নিঃশেষমোক্ষে সতি বাসনানামাত্মানুভূতিঃ প্রতিবন্ধশূন্যা॥ ২৭৬

অন্বয় : মনঃ (মন) যথা যথা (যেমন যেমন) প্রত্যক্ অবস্থিতং (সাক্ষীস্বরূপ আত্মায় স্থিত হয়) তথা তথা (সেই সেই রকমে) মুঞ্চতি বাহ্যবাসনাম্ (বাইরের বিষয়ের আসক্তি ছেড়ে যায়) বাসনানাম্ (সব বাসনার) নিঃশেষ-মোক্ষে (নিঃশেষে নাশ হলে) আত্মানুভূতিঃ সতি প্রতিবন্ধশূন্যা (আত্মানুভূতি অবাধিত হয়)।

সরলার্থ : মন যেমন যেমন সাক্ষীস্বরূপ প্রত্যগাত্মাকে অনুভব করে সেরকম সেরকম বাইরের বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বা তার জন্যে বাসনাও চলে যায়। এইসব বাসনার নিঃশেষে নাশ হলে আত্মস্বরূপ অনুভব করার আর কোনও প্রতিবন্ধক থাকে না।

ব্যাখ্যা : আগে আলোচনা করেছেন, আমাদের বাসনার আবর্জনা কিরকম আত্মাকে ঢেকে রেখে দেয়। এখন বলছেন, 'যথা যথা প্রত্যক্-অবস্থিতং মনঃ তথা তথা মুঞ্চতি বাহ্যবাসনাম্'। তোমার মধ্যে 'প্রত্যক্' অর্থাৎ সাক্ষীস্বরূপ আত্মা সব সময় রয়েছেন। মন যতটা যতটা সেই সাক্ষীস্বরূপ আত্মায় স্থির হবে, তাঁকে বুঝতে পারবে, 'তথা তথা মুঞ্চতি বাহ্যবাসনাম্', বাইরের বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ততটাই মন থেকে মুছে যাবে। আমি দেখব আমার ভেতরে আমার আত্মাকে। যত দেখতে পাব ততই এইসব বাইরের বস্তু, অনাত্মবস্তু মুছে যাবে, দূর হয়ে যাবে। আমরা যে ধ্যান করি, আমার যিনি 'ইষ্ট' তাঁর ধ্যান করি; তখন তিনিই যে আমার স্বরূপ এইটাই তো মনে রাখি। এই ইষ্টচিন্তা যত আমি করতে থাকব ততই যা অন্-ইষ্ট তা আমার মন থেকে দূরে চলে যাবে। যতই ভালোর চিন্তা করব মন্দ ততই আপনা-আপনি দূরে চলে যাবে। মনটা এমন সুরে বাঁধা হয়ে যাবে যে অন্য আর কিছু ভাবতেই পারব না। 'নিঃশেষমোক্ষে সতি বাসনানাম্', এইসব বাসনা যখন সব নষ্ট হয়ে যাবে, 'নিঃশেষ' মানে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, তখন 'আত্মানুভূতিঃ প্রতিবন্ধ-শূন্যা'—আত্মানুভূতির আর কোনও প্রতিবন্ধ নেই। আত্মানুভূতি সে ছিলই সব সময়। তার একটা আবরণ ছিল, প্রতিবন্ধক ছিল। সেটা সরে গেল, আর কোন বাধা থাকল না, আমার আত্মানুভূতি হয়ে গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মন ধোপাবাড়ির কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ ধরবে। মনটাকে রাঙিয়ে নিতে হবে। বিষয়ের রঙে নয়, আত্মচিন্তা—সেই রঙে রাঙিয়ে নেব। যতটা রাঙাব ততটাই বাইরের বাসনা মন থেকে ত্যাগ হয়ে যাবে। যখন সমস্ত বাসনাগুলি নিঃশেষে শেষ হয়ে যাবে তখন আত্মজ্ঞান আপনি ফুটে উঠবে।

স্বাত্মন্যেব সদা স্থিত্বা মনো নশ্যতি যোগিনঃ।
বাসনানাং ক্ষয়শ্চাতঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৭৭

অন্বয় : যোগিনঃ (আত্মার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির) মনঃ (মন) স্ব-আত্মনি (নিজের

আত্মায়) সদা (সর্বদা) স্থিত্বা (স্থিত থেকে) নশ্যতি (নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়) অতঃ (এর থেকে) বাসনানাং ক্ষয়ঃ চ (বাসনাসমূহেরও ক্ষয় হয়) স্ব-অধ্যাস (নিজের স্বরূপের ওপর দেহাদিতে অহংবুদ্ধিরূপ অধ্যাস) অপনয়ং কুরু (অপসারণ কর)।

সরলার্থ : যোগীর অর্থাৎ যিনি যুক্তাত্মা তাঁর মন সর্বদা আত্মাতেই অবস্থান করে বলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, আর এর ফলস্বরূপ সমস্ত বাসনারও ক্ষয় হয়। নিজের স্বরূপের ওপর দেহাদিতে অহংবুদ্ধিরূপ যে অধ্যাস আরোপ করেছ তার অপসারণ কর।

ব্যাখ্যা : বেদান্ত বলছেন এই জগৎ মিথ্যা। কিন্তু মিথ্যা আত্যন্তিক অর্থে, ব্যবহারিক অর্থে নয়। আত্যন্তিক অর্থটা আমরা মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারি না, সংসারে জড়িয়ে পড়ি, দুঃখ পাই। বলছেন, কেন জড়িয়ে পড়েছ জান? তোমার যে অনন্ত বাসনা! একটা বাসনা তার থেকে আর একটা বাসনা, এই বাসনাগুলো একটা জালের মতো তোমায় জড়িয়ে ফেলেছে। এর থেকে যদি মুক্ত হতে চাও তো সব সময় আত্মচিন্তা কর। তুমি কে? কি তোমার স্বরূপ?—এইরকম চিন্তা অনুক্ষণ করতে থাকলে তোমার বাসনা ধীরে ধীরে চলে যাবে। এখানে বলছেন, 'স্বাত্মনি এব সদা স্থিত্বা'। 'স্ব-আত্মনি'—আমাকে আমার নিজের আত্মায় সব সময় থাকতে হবে, নিজের মধ্যে থাকতে হবে। তাহলে কি হবে ? আমি আমার স্বরূপটাকে জানতে পারব। আমি ব্রহ্ম, আমি দেহ নই, এটা যদি মনে রাখতে পারি আর এই চিন্তা যদি সব সময় করি তাহলে এই ধারণাটা খুব দৃঢ় হয়ে যাবে। এখন আমি নিজেকে চিনি না, আমি আমার কাছে অজানা, অপরিচিত। তাই বলছেন, 'মনঃ নশ্যতি যোগিনঃ', যারা যোগী, আত্মার সঙ্গে সর্বদা যুক্ত, তাদের মনের নাশ হয়ে যায়। আত্মার সঙ্গে যদি আমি যুক্ত থাকি, অর্থাৎ আমার স্বরূপ যে আত্মা এই বোধটা যদি আমার মধ্যে দৃঢ়ভাবে থাকে, তাহলে আমার আর কোনও মন নেই। কারণ, আত্মার কোনও মন নেই। তাহলে কি হয়? 'বাসনানাং ক্ষয়ঃ চ অতঃ'— তার সঙ্গে সঙ্গে সব বাসনারও ক্ষয় হয়ে যায়। তারপর বলছেন, তুমি 'স্বাধ্যাস অপনয়ং কুরু'—'স্ব-অধ্যাস', তোমার নিজের ওপরের অধ্যাস, যা তুমি নিজেই চাপিয়ে দিয়েছ, যেমন নিজের শরীরটার ওপর চাদর চাপাও, সেটা সরিয়ে দাও। তুমি নিজেকে কোনও দিন ভাবছ খুব সবল, আবার কোনও দিন ভাবছ দুর্বল, কখনও ভাবছ ধনী আবার কখনও অন্য কিছু। নিজের ওপর কত বিশেষণ চাপিয়ে দিচ্ছ, আরোপ করছ। তুমি কে, এইটা বিচার করে তোমার বাসনা সব দূর কর, আর বাসনা থেকে যেসব অধ্যাস নিজের ওপর চাপিয়েছ, যেসব দোষ-গুণ আরোপ করেছ সেগুলো 'অপনয়ং কুরু'—দূরে সরিয়ে দাও। মনের নাশ হলে বাসনার নাশ হবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার অধ্যাসও চলে যাবে। অধ্যাস চলে যাওয়া মানেই তোমার আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে।

তমো দ্বাভ্যাং রজঃ সত্ত্বাৎ সত্ত্বং শুদ্ধেন নশ্যতি।
তস্মাৎ সত্ত্বমবষ্টভ্য স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৭৮

অন্বয় : তমঃ (তমোগুণ) দ্বাভ্যাং (রজঃ ও সত্ত্ব এই দুই গুণের দ্বারা) রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ থেকে) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) শুদ্ধেন (শুদ্ধ সত্ত্বগুণের দ্বারা) নশ্যতি (নাশ হয়) তস্মাৎ সত্ত্বম্ অবষ্টভ্য (অতএব সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে) স্ব-অধ্যাস-অপনয়ং কুরু (নিজের ওপরের 'আমি-আমার' বোধ রূপ অধ্যাস দূর কর)।

সরলার্থ : তমোগুণ রজঃ ও সত্ত্ব এই দুই গুণের দ্বারা নাশ পায়, সত্ত্বগুণ থেকে রজোগুণের নাশ আর সত্ত্বগুণ শুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা নষ্ট হয়। অতএব সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে নিজের ওপর যে 'আমি-আমার' বোধের অধ্যাস চাপিয়েছ তা দূর কর।

ব্যাখ্যা : বলছেন, আমাদের মধ্যে তিনটি গুণ আছে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এগুলি বন্ধনের কারণ। গুণের আর একটা মানেও কিন্তু রজ্জু। সবার মধ্যেই এই তিন গুণ আছে। শুধু তমঃ, এ কেউ না, শুধু রজঃ বা শুধু সত্ত্বও কেউ না, এই তিনটি গুণ মিশিয়ে আছে। আমরা অনেক সময় বলি, এ বড় তামসিক, এ তমোগুণী; তার লক্ষণ, সে অনেকক্ষণ ঘুমোয়, অলস, বুদ্ধি-সুদ্ধি বিশেষ নেই। আর রজোগুণী—সে খুব চঞ্চল, সব সময় চনমন চনমন করছে, প্রাণবন্ত, কাজকর্মে খুব উৎসাহ, কিন্তু ভুলও করে। যে ছটফট করে, স্থির হয়ে থাকতে পারে না, সে ভুলও করে। স্বামীজী বলছেন, আমাদের দেশ তমোয় ডুবে আছে এখানে রজোগুণ আসা ভালো। তমঃ আর সত্ত্ব একেবারে বিপরীত কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এদের লক্ষণগুলো অনেকটা এক মনে হয়। যে সত্ত্বগুণী সে ধীর-স্থির আর যে তমোগুণী সেও ধীর-স্থির কারণ তার নড়াচড়া করতে ভালোই লাগে না। তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে আলস্য, জড়তা; আর যার সত্ত্বগুণ সে ধীর-স্থির, বিচক্ষণ, অনেক ভেবেচিন্তে কাজ করে সে। সত্ত্বগুণ সবারই দরকার। বলছেন, 'তমঃ দ্বাভ্যাং'; তমোগুণ দূর করব কি করে? 'দ্বাভ্যাং', দুটো গুণ বাড়িয়ে; কোন্ দুটো গুণ ? সত্ত্ব আর রজঃ। যার মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য তার সত্ত্বের দরকার, রজোগুণেরও দরকার। 'রজঃ সত্ত্বাৎ'; রজঃ যেন race horse, টগবগ টগবগ করছে, তাকে লাগাম দিয়ে না টানলে সে যে কি করবে তার ঠিক নেই, হয়তো ভুল পথে চলে যাবে—তাকে সত্ত্বগুণ দিয়ে টেনে রাখ। আর সত্ত্বগুণ, সেটাও বন্ধন। স্বামীজী বলছেন, লোহার শেকল যেমন শেকল, সোনার শেকলও শেকল। আমরা গুণাতীত হব, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণই ছাড়িয়ে যাব, ত্রিগুণাতীত হব। 'সত্ত্বং শুদ্ধেন নশ্যতি'; সত্ত্বের সত্ত্ব রয়েছে, শুদ্ধ সত্ত্ব, সেটা বন্ধনের কারণ নয়, সেটা স্থির, চুপ করে আছে। তিনটে গুণ সাম্য অবস্থায় আছে, যেন নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। যেই

একটু চাঞ্চল্য এলো অমনি তরঙ্গ উঠল, ভালো-মন্দের তরঙ্গ। কিন্তু ভালোটাও একটা বন্ধন, মন্দটাও একটা বন্ধন, আমরা ভালো-মন্দ দুয়ের ঊর্ধ্বে যাব। ভালো চাইলে তার সঙ্গে একটু মন্দও এসে যাবে। শুধু সত্ত্ব, এ হয় না, একটু খাদ এসে যাবে। আমাদের আত্মজ্ঞান যখন হয় সেই অবস্থায় সব গুণগুলি একটা সাম্য অবস্থায় এসেছে, কমবেশী নেই, নিস্তরঙ্গ, সমান—সেই যে অবস্থা তাকে বলা হচ্ছে শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্ব ভাব মানে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি। এটা চাই, সেটা চাই, এটা করব, সেটা করব—এসব কিছু নেই। সব কিছুতেই সন্তোষ। 'তস্মাৎ সত্ত্বং অবষ্টভ্য'—অতএব সত্ত্বকে অবলম্বন করে— শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে, শুদ্ধসত্ত্বরূপ কাঁটা দিয়ে সত্ত্ব কাঁটা তুলে ফেলে, 'স্বাধ্যাস অপনয়ং কুরু'—নিজের ওপর যা সব আরোপ করেছ তুমি, ধনী-দরিদ্র-পণ্ডিত-মূর্খ-সমাজ-জাতি-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আমি-আমার বোধ, সেগুলি অপনয়ন কর, দূর কর। আমি নির্গুণ, নিরাকার। ভালোও নই, মন্দও নই। ভালো- মন্দ, এতো আপেক্ষিক জিনিস, একজনের পক্ষে যেটা ভালো আর একজনের পক্ষে সেটা মন্দ। আমরা যে অবস্থায় যেতে চাইছি সেটা ভালো-মন্দ সমস্ত গুণের ঊর্ধ্বে একটা সাম্য অবস্থা, একটা নির্গুণ নির্বিশেষ অবস্থা। তাই বলছেন, 'তস্মাৎ সত্ত্বং অবষ্টভ্য স্বাধ্যাস-অপনয়ং কুরু'।

প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ।
ধৈর্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৭৯

অন্বয় : প্রারব্ধং (পূর্বজন্মের ফলপ্রসূ কর্ম) বপুঃ পুষ্যতি (এই শরীরকে ধারণ ও পালন করছে) ইতি নিশ্চিত্য (এটা নিশ্চিতভাবে জেনে) নিশ্চলঃ (স্থির হও) ধৈর্যম্ -আলম্ব্য (ধৈর্য ধারণ করে) যত্নেন (যত্ন সহকারে) স্ব-অধ্যাস (নিজের ওপরের অধ্যাস) অপনয়ং কুরু (অপসারণ কর)।

সরলার্থ : জন্মজন্মান্তরের ফলপ্রসূ কর্ম হচ্ছে প্রারব্ধ। প্রারব্ধের জন্যেই আমাদের শরীর ধারণ ও তার পোষণ, এটা নিশ্চিতভাবে জেনে স্থির হও ও দেহকেন্দ্রিক কর্ম-প্রচেষ্টা ত্যাগ কর। ধৈর্য অবলম্বন করে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তোমার নিজের ওপরে চাপানো অধ্যাস দূর কর।

ব্যাখ্যা : আমরা তো দেহসর্বস্ব, দেহকেন্দ্রিক, কিন্তু মনে রাখতে হবে এই দেহটা প্রারব্ধের ফলে হয়েছে। প্রারব্ধ কথাটা প্রারম্ভ এই শব্দের বিশেষণ, মানে হলো : আরম্ভ হয়েছে। কি আরম্ভ হয়েছে? আমার যত সঞ্চিত কর্ম, জন্মজন্মান্তরের যত কর্ম তার কিছু অংশ ফল দিতে শুরু করেছে। সেটাই প্রারব্ধ। আমাদের হিন্দুমত হচ্ছে আমাদের প্রতিটা কর্মেরই ফল আছে। ভালো কর্মের ভালো ফল, মন্দ কর্মের

মন্দ ফল। এই ফলগুলি জমা থাকে। মানুষ যে-রকম কাজই করুক, সব সময় সে যে সঙ্গে সঙ্গে তার ফল পায় তা নয়। অনেক সময় অবশ্য পেয়েও যায়। কিন্তু সাধারণতঃ ফল পায় যথাসময়। যথাসময় মানে এমন সময় যখন সেই কর্ম ফলপ্রসূ হবে। বলছেন, আমার যে এই দেহটা হয়েছে সেটা আমার জন্মজন্মান্তরের প্রারব্ধ কর্মের ফলে হয়েছে। 'প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুঃ'; এই দেহ প্রারব্ধের ফল, 'ইতি নিশ্চিত্য'— এটা নিশ্চিত জেনে, এ যে আছে এটা মেনে নিয়ে, 'নিশ্চলঃ', স্থির হও। আবার এমন কিছু করব না যাতে আমার বন্ধন বাড়ে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন এমন কিছু না করি যাতে নতুন করে বন্ধন হয়। 'ধৈর্যম্-আলম্ব্য'— ধৈর্য অবলম্বন করে, 'যত্নেন', যত্ন সহকারে, চেষ্টা করে, কষ্ট করে, 'স্বাধ্যাস-অপনয়ং কুরু', নিজের ওপরের অধ্যাস দূর কর। তোমার যে আত্মা, যে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ, তার ওপর একটা দেহ চাপিয়ে দিয়েছ আর সেই দেহকে কেন্দ্র করে কতরকম কল্পনা করছ—আমি এ বাড়ীর কর্তা, আমি ধনী, গণ্যমান্য ব্যক্তি, এত সব আমিই সৃষ্টি করেছি ইত্যাদি। 'অপনয়ং কুরু'—এসব ভাঙো, তোমাকেই ভাঙতে হবে। আমি যা সৃষ্টি করেছি তা আমিই ভাঙব, ভাঙতে হবে। এ দেহটা তো আমার সৃষ্টি আবার এই দেহের ওপর আরও কিছু চাপিয়েছি, সেটা আমাকেই নাবাতে হবে। আমিই আমার ভাগ্যবিধাতা। আমি যেন একজন ভাস্কর, আমাকে একটা পাথর দিয়ে বলা হয়েছে বুদ্ধমূর্তি গড়তে। আমি ঠুকঠুক করে ঐ মূর্তি গড়ছি, 'যত্নেন'। তেমনি আমায় নিজেকে নিজে গড়তে হবে। কি করে করব? বলছেন, 'স্বাধ্যাস অপনয়ং কুরু'। অধ্যাসগুলো সব দূরে সরিয়ে দাও। কি করে অধ্যাসগুলো দূর করবে ? তোমার স্বরূপ চিন্তা কর। সেটা কিভাবে করতে হবে? পরের শ্লোকে সেকথাই বলছেন।

নাহং জীবঃ পরং ব্রহ্মেত্যতদ্ব্যাবৃত্তিপূর্বকম্।
বাসনাবেগতঃ প্রাপ্তস্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮০

অন্বয় : অহং পরং ব্রহ্ম (আমি পরম ব্রহ্ম) ন জীবঃ (জীব নই) ইতি (এইরকম চিন্তা দিয়ে) অতৎব্যাবৃত্তি পূর্বকম্ ('তৎ' থেকে ভিন্ন, অনাত্মবস্তু বর্জন করে) বাসনা বেগতঃ প্রাপ্ত (জন্মজন্মান্তরের বাসনার প্রবাহে লব্ধ) স্ব-অধ্যাস (নিজের দেহাভিমানরূপ অধ্যাস) অপনয়ং কুরু (দূর কর)।

সরলার্থ : আমি পরম ব্রহ্ম, দেহাভিমানী জীব নই, এই চিন্তা মনের মধ্যে ধরে রেখে যা 'তৎ' নয় অর্থাৎ যা অনাত্মবস্তু তা বর্জন কর এবং জন্মজন্মান্তরের বাসনার প্রবাহে আত্মায় যে দেহবুদ্ধি এসেছে সেই অধ্যাস দূর কর।

ব্যাখ্যা : কিভাবে স্বরূপ চিন্তা করে অধ্যাস দূর করতে হবে এখানে তাই বলছেন। 'নাহং জীবঃ'—আমি জীব নই; জীব হলো দেহ-আশ্রিত, দেহ-অভিমানী;

অভিমান বলতে এই বোঝাচ্ছে যে এই দেহটাকে 'আমি' মনে করা। একটা সুন্দর উদাহরণ বেদান্তশাস্ত্রে দেওয়া হয়। এই যে আকাশ, আকাশ তো সর্বব্যাপী, সর্বত্র আছে কিন্তু একটা ঘটের মধ্যেও আকাশের একটা টুকরো দেখতে পাই। তাকে বলছি ঘটাকাশ, ঘটের মধ্যেকার আকাশ। আর বাইরের যে আকাশ তাকে বলে মহাকাশ। পরমাত্মা সর্বব্যাপী, অনন্ত, অসীম। তিনি যেন ঘটের বাইরের মহাকাশ আর জীব হলো ঘটাকাশ। আকাশ যেমন ঘটে রয়েছে, তাই ঘটাকাশ, তেমনি অসীম আত্মা যে দেহে আবদ্ধ হয়েছেন, তিনিই জীব। দেহ-অভিমানী আত্মা—এই দেহই আমি এই অভিমান আছে যার—সে-ই জীব। যিনি দেহ আশ্রিত নন, দেহ অভিমানী নন, তিনিই পরমাত্মা। 'নাহং জীবঃ পরং ব্রহ্ম'; এইটাই চিন্তা করতে হবে—আমি জীব নই, আমি পরম ব্রহ্ম। 'পরম্' শব্দটা এলেই বুঝতে হবে পরমাত্মাকে বোঝাচ্ছেন। আমি 'পরম্'—শ্রেষ্ঠ, Supreme, আমি ব্রহ্ম। 'ইতি-অতৎ ব্যাবৃত্তি পূর্বকম্'; 'অ-তৎ'—যা 'তৎ' নয়, 'তৎ' ছাড়া। এই 'তৎ' শব্দটা গভীর অর্থবহ। আমরা 'তৎ' কাকে বলছি? ওই যে পরম ব্রহ্ম, সে-ই হলো 'তৎ'। আমরা নেতি-নেতি করে সব উড়িয়ে দিচ্ছি, এটা নয়, এটা নয়, সব মিথ্যা মিথ্যা করে যাচ্ছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যেন পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছি। সারটাকে খুঁজছি, একটার পর একটা খোসা তুলে ফেলে দিচ্ছি; তেমনি আমরা এটা মিথ্যা, এটা মিথ্যা বলে সব ত্যাগ করছি। শেষ পর্যন্ত যেটা থাকে সেটা কি আমরা জানি না, সেটাকেই বলছি 'তৎ', পরমাত্মা। তাঁকে পরমাত্মা বলছি বটে কিন্তু পরমাত্মা কোনও বস্তু নন, তিনি যেন অজ্ঞাতকুলশীল। তিনি নামরূপের ঊর্ধ্বে, তাঁকে কোনও বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত করতে পারি না। কিছু বলে বোঝাতে পারি না বলে 'সেই' বা 'তৎ' বলছি তাঁকে। 'অ-তৎ' মানে পরমাত্মা ছাড়া আর সবকিছু—সংসার, জীবজগৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এ-সব 'অ-তৎ' অর্থাৎ অনাত্মা, তাই অনিত্য। 'ব্যাবৃত্তি-পূর্বকম্'—এই অনিত্য বস্তুগুলো ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ করে কি করতে হবে? 'বাসনা বেগতঃ প্রাপ্ত স্বাধ্যাস অপনয়ং কুরু'—বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে আমার ওপর আমি অনেক অধ্যাস চাপিয়েছি। সেই অধ্যাস দূর করতে হবে। ধনী, গণ্যমান্য, বিদ্বান ইত্যাদি, এসব তো বাসনার জন্যেই সৃষ্টি, এগুলিকে দূর কর। এই অধ্যাসগুলোকে দূর করতে বলছেন। আমি কি চাইছি? শাঁসটা চাইছি, খোসাটা বাদ দিতে চাইছি। খোসাটা অধ্যাস। সেটা কি করে করব? বলছেন, 'নাহং জীবঃ'—নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে, আমি জীব নই, আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত। নিজেকে যে মুক্ত মনে করে সে মুক্ত, যে বদ্ধ মনে করে সে বদ্ধ। নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে, আমি পরম ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি মুক্ত। তাহলে বাসনার জন্যে যেসমস্ত অধ্যাস আমার উপরে এসেছে, সেগুলি দূর হয়ে যাবে।

শ্রুত্যা যুক্ত্যা স্বানুভূত্যা জ্ঞাত্বা সার্বাত্ম্যমাত্মনঃ।
ক্বচিদাভাসতঃ প্রাপ্তস্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮১

অন্বয় : শ্রুত্যা (শ্রুতিবাক্যসহায়ে) যুক্ত্যা (যুক্তির দ্বারা) স্ব-অনুভূত্যা (নিজের অনুভূতি অবলম্বনে) আত্মনঃ (আত্মার) সার্ব-আত্ম্যম্ (সর্বস্বরূপতা) জ্ঞাত্বা (জেনে) ক্বচিৎ (কখনও) আভাসতঃ (আভাসের মতো) প্রাপ্ত-স্বাধ্যাস-অপনয়ং কুরু (এসে যাওয়া স্বাধ্যাসের নিরসন কর)।

সরলার্থ : শ্রুতিবাক্য, যুক্তি আর নিজের অনুভূতি দিয়ে এক আত্মা সকলের মধ্যে বিদ্যমান এটা জেনে কখনও নিজের আত্মায় অধ্যাসের লেশমাত্র এলেও তার নিরসন কর।

ব্যাখ্যা : বাসনার প্রভাবে আমাদের মধ্যে অনেক রকম সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে, আমি ভালো, আমি মন্দ, এরকম কত কি অভিমানের সৃষ্টি হয়েছে, এগুলো অধ্যাস, এদের দূর করতে হবে। কি করে করবে? বলছেন, 'শ্রুত্যা যুক্ত্যা স্বানুভূত্যা'—শ্রুতির সাহায্যে, যুক্তির সাহায্যে আর নিজের অনুভূতি দিয়ে। শাস্ত্র কি বলছেন শোন, তোমার যুক্তি দিয়েও বিচার করে দেখ, তারপরে যা শুনেছ আর বিচার করে বুঝেছ, তা অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। শ্রুতি, যুক্তি আর অনুভূতি—এই তিনটেকেই মিলে যেতে হবে। তবেই বুঝব আমি যা জেনেছি, ঠিক জেনেছি। এর মধ্যে যুক্তিটা খুব গোলমেলে জিনিস। একটা শিশুর যুক্তি আর একজন বিদ্বান, অভিজ্ঞ ব্যক্তির যুক্তি এক হবে না। একজন অপরিণত বুদ্ধির মানুষ আর একজন পরিণত বুদ্ধির বিদ্বান মানুষ, এ দুজনের যুক্তি এক হবে না। Absolute reasons বা শুদ্ধ যুক্তি বলে কিছু নেই। সব relative, আপেক্ষিক। দুজন মানুষের যুক্তি এক হয় না। তাই বলছেন শ্রুতি প্রথম। শ্রুতি অর্থাৎ যাকে আমরা শাস্ত্র বলি, সেটা কি? হিন্দুশাস্ত্র বলতে উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্গীতা, এই তিনটি প্রধান। এদের প্রস্থানত্রয় বলা হয়। তিনটি পথ। এর মধ্যে উপনিষদ্ আর ব্রহ্মসূত্র শ্রুতি, আর গীতা হলো স্মৃতি। কিন্তু শ্রুতি না হলেও গীতাকে শ্রুতির সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। আমাদের মূল শাস্ত্র শ্রুতি। স্মৃতি-পুরাণ এগুলো শ্রুতির ব্যাখ্যা। শ্রুতি অপৌরুষেয়। কোনও ব্যক্তিকে আশ্রয় করে এগুলি আসেনি, সত্য যেন আপনা- আপনি, নিজেকে প্রকাশ করেছে। এই হচ্ছে আমাদের শাস্ত্র, এ কোনও ব্যক্তি বিশেষের কথা নয়। বাইবেলে যেমন—যীশুখ্রীষ্ট যা বলেছেন তাই লিপিবদ্ধ রয়েছে, আমাদের শ্রুতি কিন্তু সেরকম নয়, কোনও ব্যক্তিকে আশ্রয় করে নয়, কোনও পুরুষকে আশ্রয় করে নয়—অপৌরুষেয়। যে সত্য বারবার পরীক্ষিত হয়েছে শ্রুতিতে তাই আছে। 'শ্রুত্যা যুক্ত্যা স্বানুভূত্যা'— শ্রুতির সাহায্যে, যুক্তির সাহায্যে

আর নিজের অনুভূতির সাহায্যে আমাকে জ্ঞান লাভ করতে হবে। কি জ্ঞান ? 'সার্বাত্ম্য-আত্মনঃ'। মানে, এক আত্মা সকলের আত্মা, ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত। এক চন্দ্র কিন্তু তার ছায়া অনেক জায়গায় রয়েছে, সমুদ্রে তার ছায়া, নদীতে তার ছায়া, একটা পাত্রে জল আছে তাতে তার ছায়া। মনে হবে যেন অনেক চাঁদ, কিন্তু তা নয়, এক চন্দ্র। একই আত্মা আমার মধ্যে আবার আর সকলের মধ্যে, 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ', (শ্বেঃ, ৬।১১), 'ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত', 'মা বিরাজেন ঘটে ঘটে'। এক আত্মা সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন। এক আকাশ, ঘটের মধ্যে যে আকাশ সেটা ঘটাকাশ, আবার ঘটের বাইরে দিগন্তবিস্তৃত যে আকাশ সেটা মহাকাশ, দুটো আকাশ কি আবার দুরকম হবে? একই। তেমনি এক আত্মা আমাদের সকলের মধ্যে। আমরা দেহটাকে আমি মনে করে কারোর সঙ্গে বিরোধ বাধাচ্ছি আবার কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করছি। কিন্তু আসলে আমরা এক। এই এক-জ্ঞানটাই শ্রুতি, যুক্তি আর অনুভূতি দিয়ে আনতে হবে। আর এই জ্ঞান যদি একবার এসে যায় তাহলে সামান্য 'বহু'-র ধারণা এলেও সেটা আমি সঙ্গে সঙ্গে দূর করতে পারব। বলছেন ঃ 'ক্বচিৎ-আভাসতঃ প্রাপ্ত স্ব-অধ্যাসঃ'—অজ্ঞানের জন্যে তো আলাদা ভাব আসতে পারে, যদি এসে যায় তাহলে সেটাকে তাড়াতাড়ি 'অপনয়ং কুরু'— দূর করে দাও। কখনও যদি মনে হয় এই দেহটা আমি, কখনও যদি মনে হয় আমি পৃথক , কখনও যদি মনে হয় আমি দরিদ্র, আমি ধনী, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ ইত্যাদি, জানবে এসব অধ্যাস। ঐ অধ্যাস দূর করতে হবে। আসলে আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। শ্রুতি, যুক্তি আর নিজের অনুভূতি, এই তিনটে দিয়ে আত্মাকে জানতে হবে। এক আত্মা সকলের। যে আত্মা রামের আত্মা, যে আত্মা শ্যামের আত্মা, সেই আত্মা আমারও আত্মা—এইটা আমায় জানতে হবে। তিনি নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ। কোনও বৈশিষ্ট্য থাকলে তিনি সকলের মধ্যে একভাবে কি করে থাকবেন ? তাঁর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। বৈশিষ্ট্যগুলো অধ্যাস, তাঁর ওপর আরোপ করছি, এগুলি দূর করতে হবে।

অনাদানবিসর্গাভ্যামীষন্নাস্তি ক্রিয়াঃ মুনেঃ।
তদেকনিষ্ঠয়া নিত্যং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮২

অন্বয় : মুনেঃ (মননশীল ব্যক্তির) ন-আদান-বিসর্গাভ্যাম্ (বিষয়ের গ্রহণ ও বর্জনের অভাবহেতু) ঈষৎ- ক্রিয়াঃ ন-অস্তি (কিছুমাত্র কর্মপ্রয়াস থাকে না) নিত্যং তৎ- একনিষ্ঠয়া (সর্বদা সেই 'তৎ' যিনি তাঁতে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে) স্বাধ্যাস-অপনয়ং কুরু (নিজের ওপরের অধ্যাস দূর কর)।

সরলার্থ : যিনি মুনি অর্থাৎ মননশীল তাঁর কোনও গ্রহণ ও বর্জন থাকে না বলে

কিছুমাত্র কর্মপ্রয়াসও থাকে না। সর্বদা সেই তৎ-নিষ্ঠা অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠা সহকারে নিজের ওপর চাপানো অধ্যাস দূর কর।

ব্যাখ্যা : আমরা জানি মানুষের একটা ধর্ম আছে। সেটা কি? মানুষ মনন করতে পারে, চিন্তা করতে পারে, বিচার করতে পারে, ভালো-মন্দ সে বাছাই করে নিতে পারে। বলছেন, তুমি যদি মুনি হও অর্থাৎ মননশীল হও তাহলে নিজে বোঝ তুমি কে। সবার মধ্যে এক তুমি, কোনও দুই নেই। যেখানে দুই নেই সেখানে আদান-প্রদান কি করে হবে? কে কাকে দেবে! 'অনাদানবিসর্গাভ্যাম্ ঈষৎ নাস্তি ক্রিয়াঃ মুনেঃ'; 'আদান' হচ্ছে নেওয়া আর 'বিসর্গঃ' মানে বিসর্জন অর্থাৎ দেওয়া। এই যে আদান আর প্রদান এ কখন হয়? যখন দুই থাকে। দুই নেই—এক, তাই কোন আদান-প্রদানও নেই। আমাদের সমস্ত কর্মচাঞ্চল্যের মূলে আদান-প্রদান, বাইরের জগতের সঙ্গে আদান-প্রদান। সব এক, তাই আদান-প্রদান নেই, কোন কর্মচাঞ্চল্য নেই। 'ঈষন্নাস্তি ক্রিয়াঃ'—একটুও ক্রিয়া নেই, কর্মপ্রয়াস নেই। কার নেই ? 'মুনেঃ'—যে মননশীল ব্যক্তি, চিন্তাশীল ব্যক্তি তার কাছে নেই, কারণ সে জেনে গেছে দুই নেই, এক। তাহলে কি কর্তব্য? 'তৎ-একনিষ্ঠয়া'— সেই তাঁতে নিষ্ঠা রেখে; সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে একাগ্রতার সঙ্গে এই বিচার করে যাও যে, আমিই তিনি। আমি দেহ নই, মন-বুদ্ধি নই, আমি শুদ্ধ আত্মা। 'নাহং জীবঃ', আমি জীব নই, আমি পরমব্রহ্ম। এই চিন্তা সব সময় করে 'স্বাধ্যাস-অপনয়ং কুরু', দেহ-মন ইত্যাদির অধ্যাস সরিয়ে দাও। এই যে বলছেন, 'ঈষৎ নাস্তি ক্রিয়াঃ মুনেঃ', কোনও ক্রিয়া নেই, কর্মত্যাগ—এর অর্থ কি ? গীতায় কিন্তু ভগবান বলছেন, কাজ করবে না তো কি? কাজ না করে কি কেউ থাকতে পারে? কাজ কর, কিন্তু আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি কিছু করছি এটা মনে করে কিছু করো না। এই ভাবটা ত্যাগ করে কাজ কর। আমরা কাজ করছি, নিজের বাসনা নিয়ে কাজ করছি। গীতায় বলছেন, সেটা নয়, ফলের আকাঙ্ক্ষা করো না, সব ফল তাঁকে দিয়ে দাও, 'মা ফলেষু কদাচন', নিজের জন্যে কিছু করো না। কাজ করো তুমি লোকহিতার্থং, ঈশ্বরার্থং। এইভাবে কাজ কর। এখানে বলছেন, তুমিই সেই পরমব্রহ্ম, এই কথাটা যদি সব সময় মনে রাখ তাহলে তোমার মধ্যে কোনও আদান-প্রদান নেই, তোমার মধ্যে কোনও ক্রিয়া নেই। তুমি মনে রেখো, ওই যে দ্রষ্টা, সাক্ষী, তুমি তা-ই। সব কর শুধু আমি করছি এই অভিমানটা রেখো না। ভাববে যে, তিনি করছেন, তিনি করিয়ে নিচ্ছেন, আমি কিছু করছি না, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। এই করলেই তোমার আর আদান-প্রদানের ক্রিয়া নেই। তুমি সেই তাঁকে ধরে থেকে দেহ-মন-বুদ্ধি এসব যে তুমি নও এই জ্ঞানটা দৃঢ় করে নাও।

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মত্বদার্ঢ্যায় স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৩

অন্বয় : তত্ত্বমসি-আদি বাক্যোত্থ (তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্য থেকে উত্থিত) ব্রহ্ম-আত্মা-একত্ব বোধতঃ (ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব বোধের সহায়ে) ব্রহ্মণি-আত্মত্ব দার্ঢ্যায় (ব্রহ্মে আত্মভাব দৃঢ় করার জন্যে) স্ব-অধ্যাস অপনয়ং কুরু (নিজের ওপর চাপানো অধ্যাস দূর কর)।

সরলার্থ : 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য থেকে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ববোধের যে ধারণা হয়, তার সহায়ে ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি দৃঢ় করার জন্যে নিজের ওপর চাপানো অধ্যাস দূর কর।

ব্যাখ্যা : আবার সেই একই প্রসঙ্গ। আমার এই যে আমিত্ব এটা কি করে ত্যাগ করব? দুটো উপায়। আমিটাকে খুব বড় করে ফেল্লাম, সকলের আমিই আমি, সে একটা হতে পারে। আর ভক্তিপথে যদি যাই তাহলে—তিনি আমায় যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলছি। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলছেন, থাক শালা 'আমি' 'দাস আমি' হয়ে। সেখানে 'আমি' নেই, আমার ইচ্ছে বলে কিছু নেই, আমার অভিমানটা নেই। এখানে ওই প্রথম উপায়টা ধরেই এগোতে বলছেন। বলছেন, 'তত্ত্বমসি-আদি-বাক্যোত্থ-ব্রহ্মাত্মা-একত্ব-বোধতঃ'। তত্ত্বমসি ও বেদান্তের আর সব মহাবাক্য আমি শুনলাম, কিন্তু কান দিয়ে বেরিয়ে গেলো, সেরকম নয়। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করতে হবে। মহাবাক্য শুনতে হবে, তারপর ধ্যান করতে হবে। একটা Conviction বা প্রত্যয় আসতে হবে— হ্যাঁ, আমি বুঝেছি, আমি যে সত্যিই তা-ই, আমি যে ব্রহ্ম, সেটা বুঝেছি। 'তত্ত্বমসি-আদি বাক্য-উত্থ ব্রহ্মাত্মা-একত্ব বোধতঃ'; 'উত্থ' মানে উত্থিত। এই তত্ত্বমসি বাক্য থেকে আমরা কি পাচ্ছি? এর থেকে কি উত্থিত হয়েছে, কি বেরিয়ে এসেছে? 'ব্রহ্ম-আত্মা-একত্ব বোধতঃ', ব্রহ্ম এবং আত্মা এক, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, জীব ও শিব এক। এটা বোধ করতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, তা না হলে হবে না। 'ব্রহ্মণি আত্মত্ব দার্ঢ্যায়'— আমিই যে ব্রহ্ম এই জ্ঞানটা দৃঢ় করার জন্যে—'স্বাধ্যাস অপনয়ং কুরু'—এই দেহ-মন ইত্যাদির অধ্যাস দূর করে দাও। তার মানে কি আত্মহত্যা করার কথা বলছেন? তা নয়। দেহবুদ্ধিটা দূর করতে বলছেন। গীতায় (২।২২) যেমন বললেন, পোশাকটা যেমন তুমি নও সেইরকমই এই দেহটা তুমি নও। পোশাক পুরোনো হলে সেটা ফেলে নতুন পোশাক পরতে হয়, তেমনি শরীর জীর্ণ হলে সেটা ছেড়ে একটা নতুন দেহ নিতে হয়। এই দেহটা একটা অধ্যাস, আরোপ করেছি। আমি নিত্য মুক্ত, সেই আমি সকলের আমি অথচ তাকে

ধরে আমি একটা দেহের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি। এই যে অজ্ঞতা, এই যে দেহকে আমি মনে করছি অজ্ঞানের জন্যে, এটা দূর করতে হবে। বলছেন, 'তত্ত্বমস্যাদি বাক্যোত্থ ব্রহ্মাত্মা-একত্ব বোধতঃ', তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্যে ব্রহ্ম ও আত্মার যে একত্ব বোঝাচ্ছেন সেটা 'দার্ঢ্যায়'— দৃঢ় করার জন্যে 'স্বাধ্যাস-অপনয়ং কুরু'—নিজের ওপর যে অধ্যাস চাপিয়েছ তা দূর কর। 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বেদান্তের এইসব মহাবাক্য যেন সিংহগর্জন। এগুলি ভাসা ভাসা শুনলে হবে না, এইসব বাক্যের ধ্যান করতে হবে,অপরোক্ষ অনুভূতি করতে হবে, নিশ্চিতভাবে জানতে হবে। করামলকবৎ— হাতের মুঠোর মধ্যে আমলকী ফল ধরা আছে, অন্য কেউ না জানুক আমি তো জানি আমার হাতের মুঠোয় কি আছে। এরকম নিশ্চিতভাবে নিজের স্বরূপ জানতে হবে। সবাই বলছে দেহটাই তো সব অন্য আর কিছু আবার কি? আমি কিন্তু জানি সত্য কি, সেটা আমার মুঠোর মধ্যে ধরা আছে। স্বামীজী বলছেন, খাঁচার মধ্যে আটকে আছে সিংহ, সে খাঁচা ভেঙে গর্জন করতে করতে বেরিয়ে আসছে— পারলে আমায় আটকে রাখতে? অধ্যাস দূর করে এইরকম বেরিয়ে এসো।

অহংভাবস্য দেহেঽস্মিন্ নিঃশেষবিলয়াবধি।
সাবধানেন যুক্তাত্মা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৪

অন্বয় : অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) অহংভাবস্য (আমি বোধের) নিঃশেষ-বিলয় - অবধি (নিঃশেষে লোপ হওয়া পর্যন্ত) সাবধানেন যুক্তাত্মা (সাবধানতার সঙ্গে আত্মায় যুক্ত থেকে) স্বাধ্যাস অপনয়ং কুরু (নিজের ওপর চাপানো অধ্যাস দূর কর)।

সরলার্থ : এই দেহে অহংভাব নিঃশেষে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে আত্মায় যুক্ত থেকে নিজের ওপর চাপানো অধ্যাস দূর কর।

ব্যাখ্যা : বলছেন, দেখো যতদিন তোমার এই দেহে অহংভাব থাকবে, দেহটাকেই আমি মনে করবে ততদিন তোমাকে সাবধানে থাকতে হবে। আমিটা কে? আত্মা, ব্রহ্ম, যাকে আমরা পরমাত্মাও বলি। কিন্তু ভুল করে দেহটাকে আমি মনে করছি। আর এই ভুলের মাসুল আমাদের জন্ম-জন্মান্তর ধরে দিতে হচ্ছে। একটা কথা আছে না,'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'! আমরা সবাই ওই ফাঁদে পড়ে গেছি। নিজের স্বরূপকে ভুলে গেছি তাই কাঁদছি। একটু হাসছিও বটে, কিন্তু একটু সুখের আস্বাদ পেলে দুঃখটা আরও প্রবল হয়। এই অবস্থার পরিবর্তন কি করে হবে? অজ্ঞানটা যাবে কি করে? জ্ঞান হলে, আত্মজ্ঞান হলে অজ্ঞান চলে যাবে। বলছেন, 'অহংভাবস্য দেহে অস্মিন্ নিঃশেষ বিলয় অবধি'— এই দেহে যে অহংবুদ্ধি করেছি

এটার নিঃশেষে 'বিলয়' না হওয়া পর্যন্ত সাবধান থাকতে হবে। দেহটাকে 'আমি' মনে করে বসে আছি, এই অজ্ঞান যাবে যখন আত্মজ্ঞান হবে তখন। বলছেন, 'সাবধানেন যুক্তাত্মা স্বাধ্যাস অপনয়ং কুরু'; খুব সাবধানে আত্মার সঙ্গে আমায় যুক্ত হতে হবে। সব সময় সতর্ক হয়ে বিচার করে যেতে হবে। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' (ক, ১।৩।১৪); এই পথটা কঠিন পথ, যেন ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে চলা। সত্যদ্রষ্টা যাঁরা এপথে চলে গন্তব্যে পৌঁছেছেন তাঁরা বলছেন ক্ষুরের ধারের মতো এই পথ দিয়ে চলতে গেলে খুব সাবধানে থাকতে হবে। এই জগৎ-সংসার এসব ত্যাগ করে শুধু আত্মা সত্য আর সব মিথ্যা, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা', এটা মনে জেনে নিজের ওপরে আরোপিত অধ্যাস দূর করতে হবে। 'স্ব-অধ্যাস-অপনয়ং কুরু'; আত্মার ওপর দেহকে অধ্যাসরূপে চাপিয়েছ। দেহ মানে দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার সব চাপিয়েছ, এরকম আরও কত কি চাপিয়েছ। এই যে অধ্যাস তুমি আত্মার ওপর আরোপ করেছ সেগুলোর তুমি 'অপনয়ং কুরু'— নিরসন কর।

প্রতীতির্জীবজগতোঃ স্বপ্নবদ্ভাতি যাবতা।
তাবন্নিরন্তরং বিদ্বন্! স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৫

অন্বয় : বিদ্বন্ (হে বিদ্বান) যাবতা (যতদিন পর্যন্ত) জীবজগতোঃ প্রতীতিঃ (জীব ও জগতের জ্ঞান) স্বপ্নবৎ ভাতি (স্বপ্নের মতোও প্রতিভাত হচ্ছে) তাবৎ (ততদিন পর্যন্ত) নিরন্তরং (সর্বদা) স্ব-অধ্যাস-অপনয়ং কুরু (আত্মায় আরোপিত অধ্যাস অপনয়ন কর)।

সরলার্থ : হে বিদ্বান, যতদিন জীবজগতের জ্ঞান তোমার কাছে স্বপ্নের মতোও প্রতিভাত হচ্ছে ততদিন সর্বদা তোমার আত্মায় আরোপিত অধ্যাস অপসারণ করতে থাক।

ব্যাখ্যা : গুরু শিষ্যকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। বলছেন, তুমি এটা জেনো যে যতক্ষণ তোমার কাছে জীবজগৎ আছে, যতক্ষণ বৈচিত্র দেখছ, সেটা যদি স্বপ্নের মতো ভাসা-ভাসাও হয় তাহলেও, হে বিদ্বান, তুমি সব সময় সজাগ থাকবে। কিন্তু তুমি তো জান এক জ্ঞানই জ্ঞান, দুই জ্ঞান অজ্ঞান। তুমি তো বিদ্বান, শাস্ত্র-টাস্ত্র অনেক পড়েছ, এখন অনুভবের চেষ্টা করছ, তাই খুব সতর্ক হয়ে অধ্যাস দূর কর। তুমিই যে ব্রহ্ম, এই চিন্তা কর আর নেতি, নেতি করে অধ্যাসগুলো বর্জন কর। 'যাবতা জীব জগতোঃ প্রতীতিঃ', যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার এই জীবজগতের প্রতীতি হচ্ছে, জ্ঞান হচ্ছে। সেই জ্ঞানটা যদি আভাসের মতোও হয়, 'স্বপ্নবৎ ভাতি'—তাহলেও

সেটাকে তুমি বরদাস্ত কোরো না। 'স্বপ্নবৎ ভাতি'—স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তুমি অনেক দূর এগিয়ে গেছ। জগৎটা আর অতটা সত্য বলে মনে হচ্ছে না—স্বপ্নে দেখা জিনিসের মতো মনে হচ্ছে, আভাস-মাত্র মনে হচ্ছে। তাহলেও সেটা চরম জ্ঞান নয়। একটু ভেদ রয়ে গেছে, দুই রয়ে গেছে, বৈচিত্র রয়েছে। তোমার দেহ-মন ইত্যাদি নিয়ে যে ব্যক্তিসত্তা, সেটা তোমার আত্মার ওপর তখনও ছায়া ফেলছে, তাই এরকম যতক্ষণ হচ্ছে, 'তাবৎ-নিরন্তরং', ততক্ষণ তোমাকে নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হবে। কি চেষ্টা করবে ? 'স্বাধ্যাস অপনয়ং কুরু'—নিজের ওপর আরোপিত অধ্যাস দূর কর। যে অজ্ঞানের জন্যে ভুল করে দেহ-মন-বুদ্ধি-জীব-জগৎ সত্যি বলে ভাবছ সেই অজ্ঞানটা দূর কর।

নিদ্রায়া লোকবার্তায়াঃ শব্দাদেরপি বিস্মৃতেঃ।
ক্বচিন্নাবসরং দত্ত্বা চিন্তয়াত্মানমাত্মনি॥ ২৮৬

অন্বয় : নিদ্রায়া (নিদ্রা থেকে) লোকবার্তায়াঃ (লোকেদের সঙ্গে অনর্থক কথাবার্তা থেকে) শব্দাদেঃ অপি (আর শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের হেতু) বিস্মৃতেঃ (আত্মবিস্মৃতির) ক্বচিৎ (কিছুমাত্র) অবসরং ন দত্ত্বা (অবকাশ না দিয়ে) আত্মনি আত্মানং চিন্তয় (অন্তরে আত্মস্বরূপের ধ্যান কর)।

সরলার্থ : নিদ্রা, পাঁচজনের সঙ্গে অনর্থক কথাবার্তা আর শব্দ, স্পর্শ, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষণের জন্যে যে আত্মবিস্মৃতির সম্ভাবনা থাকে, তাকে কিছুমাত্র অবকাশ না দিয়ে নিজের অন্তরে আত্মস্বরূপের ধ্যান কর।

ব্যাখ্যা : বলছেন, তোমার উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ করা, তার জন্যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এছাড়া তো আর কিছু নেই, কিন্তু বাধা অনেক আছে। যেমন, ধর তুমি উচ্চ চিন্তা করছ, সেরকম আলোচনাও করছ, এমন সময় এক বন্ধু এসে গেল, অন্য রকম কথা শুরু হয়ে গেল। বলছেন কতভাবে আমাদের ভুল হয়ে যায়, কত বাধা পাই—'নিদ্রায়া লোকবার্তায়াঃ'। ঘুম পেয়ে গেল, ঘুমের মধ্যে আত্মচিন্তা কোথায় তলিয়ে গেল। কিংবা লোকের সঙ্গে রসাল গল্প করছি। আবার 'শব্দাদেঃ', মানে সব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এই সব ইন্দ্রিয়সুখের বিষয়গুলো—আমাদের বহির্মুখী করে, বাইরের দিকে টানে। এগুলোর থেকে আমাদের বিস্মৃতি হয়। কি বিস্মৃতি? আমি কে, সব ভুলে যাই। 'তত্ত্বমসি' শুনে খুব উৎসাহ এল, কিন্তু এরা সব ভুলিয়ে দেবে। বলছেন : হতে দিও না, 'ক্বচিৎ-ন-অবসরং দত্ত্বা'—একটুও আশকারা দিও না, সব সময় 'চিন্তয়-আত্মানম্-আত্মনি'—তুমি যে পরমাত্মা এই ধ্যান কর সবসময়। মনকে অন্তর্মুখী করতে হবে। বাইরের জগৎ সব সময়

তোমায় টানছে, তোমার আত্মবিস্মৃতি ঘটাচ্ছে। তোমায় ভুলিয়ে দিচ্ছে, সময় নষ্ট হচ্ছে। এসব করো না। 'ক্বচিৎ-ন-অবসরং দত্ত্বা'—মনকে অন্য চিন্তা করার কোনও অবসর দিও না, সব সময় তুমি যে আত্মা সেই চিন্তা কর। 'তৈলধারাবৎ', তৈলধারার মধ্যে যেমন কোনও ছেদ থাকে না সেইরকম। এইরকম মানুষও তো দেখতে পাওয়া যায়, যাঁদের সব সময় এই চিন্তা চলছে। কারণ একবার জানলেই তো হয় না, ভুল হয়ে যেতে পারে। তাই নিরন্তর এই চিন্তা করে যাও, 'আত্মানম্-আত্মনি', নিজের ভেতরে আত্মস্বরূপের ধ্যান সব সময় করে যাও। জীব মনে করছে সে বদ্ধ, তাই সে জীব। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। যদি সব সময় আত্মচিন্তা করা যায় তাহলে জীব পাশমুক্ত হয়ে যায়, শিব হয়ে যায়।

মাতাপিত্রোর্মলোদ্ভূতং মলমাংসময়ং বপুঃ।
ত্যক্ত্বা চণ্ডালবদ্দূরং ব্রহ্মীভূয় কৃতী ভব॥ ২৮৭

অন্বয় : মাতা-পিত্রোঃ (মাতা ও পিতার) মল-উদ্ভূতং (মল অর্থাৎ শোণিত ও শুক্রের সংযোগে উৎপন্ন) মলমাংসময়ং বপুঃ (মলমাংসময় শরীর) চণ্ডালবৎ দূরং ত্যক্ত্বা (চণ্ডালের মতো অস্পৃশ্যজ্ঞানে দূরে ত্যাগ করে—অর্থাৎ শরীরে আমিবুদ্ধি ত্যাগ করে) ব্রহ্মীভূয় (ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের একত্ব অনুভব করে) কৃতী ভব (কৃতার্থ হও)।

সরলার্থ : মাতাপিতার শোণিত শুক্রে উৎপন্ন এই মলমাংসময় শরীর, এর ওপর অহংভাব অস্পৃশ্য চণ্ডালের স্পর্শ বাঁচানোর মতো দূরে সরিয়ে দিয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে কৃতকৃতার্থ হও।

ব্যাখ্যা : বলছেন, এই যে দেহের প্রতি আকর্ষণ এটা ত্যাগ কর। এটা 'মলমাংসময়ং বপুঃ', এটাকে অস্পৃশ্য মনে কর, এর ওপর আকৃষ্ট হবে না। যেমন ছোট ছেলেমেয়েরা একটা খেলনা, হয়তো teddy bear, আঁকড়ে ধরে থাকে, কিছুতেই ছাড়বে না—আমরা সেরকম এই দেহটাকে আঁকড়ে আছি। দেহসর্বস্ব হয়ে আছি, দেহের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই আছি। অবশ্য কেউ কেউ আছে যাদের দেহ ততটা নয়, মন; গান ভালোবাসে, শিল্পকলা ভালোবাসে, সাহিত্য ভালোবাসে, উচ্চচিন্তা ভালোবাসে। তারতম্য আছে; কেউ কেউ একেবারে স্থূল আবার কেউ কেউ একটু সূক্ষ্ম। এরকম করে সূক্ষ্মতর তারপর সূক্ষ্মতম। সূক্ষ্মতম যে অবস্থা তখন, 'আত্মানম্-আত্মনি', আত্মচিন্তা ছাড়া অন্য কিছু আর আমার কাছে নেই। অন্য জিনিস, সেগুলো গৌণ, অধ্যাস। সেগুলো আমি বর্জন করছি। এখানে বলছেন, দেহটা তোমার এলো কোথা থেকে? পিতামাতার মলময় শোণিত-শুক্র থেকে এসেছে।

কি দিয়ে তৈরী সেটা তো বুঝতেই পারছ, তাহলে আর এটাকে ভালোবেসো না। অস্পৃশ্যের মতো এটাকে 'ত্যক্ত্বা চণ্ডালবৎ দূরম্'—ত্যাগ করে দূরে সরিয়ে দাও। কি দিয়ে ত্যাগ করব? একটা মলিন জিনিস, অস্পৃশ্য জিনিস, সেটা হাত দিয়ে ছুঁই কি করে? এটা বিচারের জন্যে বলছেন। শাস্ত্রকে ভুল বুঝলে হবে না। দেহের যত্ন করব না, তা নয়, দেহের সাহায্যেই আমার যা কিছু কাজ। কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা উপায়, উপেয় নয়। এই দেহটাকে ত্যাগ করে দূরে সরিয়ে দেবো মানে এই নয় যে আমি আত্মহত্যা করব। দেহে যে অহংবুদ্ধি করেছি সেটা ত্যাগ করতে হবে। শ্রীশ্রীমা বলছেন, একদিন এই দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছি, দেখি দেহটা পড়ে আছে, মনে হলো এই কুৎসিত দেহটা আমার? আর দেহের ভেতর ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু তাঁদের তো লোককল্যাণ, তাই সেই দেহে আবার ঢুকলেন। স্বামী শিবানন্দ, মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, এই দেহ হাড়-মাংস-পঞ্চভূতের খাঁচা, বুঝে নিয়েছি এটা জড়, এর ষড়্‌বিকার আছে, জায়তে, বর্ধতে, পরিণমতে, তারপর এক সময় ক্ষীয়তে—ক্ষয় হয়, তারপর নশ্যতি—নষ্ট হয়। এই দেহ নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই, দুঃখ করারও কিছু নেই, 'ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি'। মনে রাখতে হবে দেহের তুষ্টিসাধন, দেহানুবর্তন, এটা আমার উদ্দেশ্য নয়, এটা ছাড়তে হবে। দেহের পেছনে আমরা কত সময় নষ্ট করি—আজ মনে হচ্ছে শরীরটা ভালো নেই—বাড়ীর লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এখানে বলছেন, এরকম করো না, দেহের জন্যে অত চিন্তা করো না, ওর প্রতি অত মনযোগ দিও না। এই ছোট্ট একটা দেহ, তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছি। নিজেকে তো ছড়িয়ে দিতে পারি, এই মন দিয়ে তো ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের করে নিতে পারি! ব্রহ্মাণ্ডও যদিও পারমার্থিক অর্থে মিথ্যা তাহলেও এরকম মানুষ আছেন যাঁরা সকলের কল্যাণ চিন্তা করেন, ভালো করতে চান। আমি নিজেকে ছোট করব কেন? বড় করব। তাই বলছেন, 'ব্রহ্মীভূয় কৃতী ভব'—তুমি ব্রহ্ম হয়ে যাও। ব্রহ্ম হয়ে কৃতী হও। নিজেকে ছোট করো না, ক্ষুদ্র করো না, তুমি কৃতী হও, কৃতকৃতার্থ হও, ধন্য হও। ব্রহ্ম, তিনি বৃহত্তম, তুমি ব্রহ্ম হও। তুমি সাধুদের মুখে শুনেছ, তাঁরা বলেন, তুমি ব্রহ্ম। তা-ই ভাব, নিজেকে বড় ভাব, সবচেয়ে বড়। যদি নিজেকে ছোট ভাবতে পার তাহলে বড় ভাবতে পার না কেন? আমি বড় ভাবব, বড় হব, বড় কথা বলব, 'নাল্পে সুখম্ অস্তি' (ছা, ৭।২৩।১), আমি কেন ছোট হব? নিজেকে অপমান করব কেন? আমরা তো নিজেকে অপমান করছি, সেইজন্যে শঙ্করাচার্য এক জায়গায় বলছেন, 'আত্মহনন্', অর্থাৎ নিজেকে ছোট ভাবা, দুর্বল ভাবা, অক্ষম ভাবা, পাপী ভাবা, এ তো আত্মহনন। 'ব্রহ্মীভূয়', বড় হও, সবচেয়ে বড় হও, ব্রহ্ম হও। দেহের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছ কেন? ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, এই দেহটাকে মৃত্যু গ্রাস করে

রেখেছে—'শরীরং আত্তং মৃত্যুনা' (ছা, ৮।১২।১)। যেদিন জন্মেছি সেদিনই যেন মরে গেছি; এক পা, দু পা করে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি। আমাদের শাস্ত্র তাই আদরবতী জননীর মতো বারবার করে বলছেন, দেখো, এ দেহ তোমার থাকবে না, প্রস্তুত থেকো। এই নশ্বর দেহটার পেছনে না ছুটে তুমি 'ব্রহ্মীভূয় কৃতী ভব'। ব্রহ্ম হয়ে যাও।

ঘটাকাশং মহাকাশ ইবাত্মানং পরাত্মনি।
বিলাপ্যাখণ্ডভাবেন তূষ্ণীং ভব সদা মুনে॥ ২৮৮

অন্বয় : ঘটাকাশং মহাকাশ ইব (ঘটে আবদ্ধ আকাশ আর মহাকাশ যেমন এক হয়ে মিশে যায় সেইরকম) পরাত্মনি আত্মানং (পরমাত্মায় নিজের আত্মাকে) বিলাপ্য (লয় করে দিয়ে) মুনে (হে মুনি) সদা অখণ্ডভাবেন (সর্বদা অখণ্ডভাবের চিন্তার দ্বারা) তূষ্ণীং ভব (তুমি মৌন হয়ে থাকো)।

সরলার্থ : ঘটের মধ্যেকার আকাশ আর মহাকাশ যেমন একাকার হয়ে যায় তেমনি, হে মুনি তুমি নিজের আত্মাকে পরমাত্মায় লয় করে দিয়ে সর্বদা অখণ্ডভাবের চিন্তায় মৌন হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা : জীবাত্মা আর পরমাত্মা বস্তুত আলাদা কিছু নয়, একই, এইটা বোঝাবার জন্যে ঘটাকাশ আর মহাকাশের উপমা দিচ্ছেন। বলছেন, 'ঘটাকাশং মহাকাশ ইবাত্মানং পরাত্মনি'; ঘটের মধ্যে আবদ্ধ একটা আকাশ আবার দিগন্তবিস্তৃত ওই একটা আকাশ, এ দুটো এক। তেমনি জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক, এটা মনে রেখো। 'অখণ্ডভাবেন', এই এক জেনে, অখণ্ড এটা জেনে তুমি, যা তোমার আত্মা বলে ভাবছ, তাকে পরমাত্মায় লয় করে দাও। 'বিলাপ্য-অখণ্ডভাবেন তূষ্ণীং ভব সদা মুনে'—বলছেন, হে মুনিবর, তুমি তো মননশীল, চিন্তা করতে পার। চিন্তা করে দেখো তোমার আত্মা আর পরমাত্মা এক। একটা ঘটের আকারের মধ্যে এক টুকরো আকাশ আছে, ওই আকারটা যদি সরিয়ে দিই, ঘটটা যদি ভেঙে দিই, তাহলে ঘটাকাশ আর মহাকাশ একাকার হয়ে যায়। তেমনি আমি একজন ব্যক্তি, এই যে তোমার অভিমান এইটেই তোমাকে অর্থাৎ তোমার আত্মাকে পরমাত্মার থেকে যেন পৃথক করেছে। এই আমিটাকে ঘুচিয়ে দাও, ঘটটাকে ভেঙে দাও, তাহলেই তোমার আত্মা আর পরমাত্মা এক হয়ে যাবে। তুমি তো পরমাত্মা। তুমি বিশেষ একটা কিছু, তুমি পরমাত্মার থেকে আলাদা একটা খণ্ড, এই ভাবনাটা ভুল। এটা ছেড়ে, জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক ও অখণ্ড, এই ভাবে নিবিষ্ট হয়ে, হে মুনি তুমি মনন কর, চিন্তা কর, ধ্যান কর। আর এই চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে চুপ করে থাকো।

স্বপ্রকাশমধিষ্ঠানং স্বয়ংভূয় সদাত্মনা।
ব্রহ্মাণ্ডমপি পিণ্ডাণ্ডং ত্যজ্যতাং মলভাণ্ডবৎ॥ ২৮৯

অন্বয় : সৎ-আত্মনা (সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মই আত্মা এই বোধের দ্বারা) স্বপ্রকাশম্-অধিষ্ঠানং স্বয়ংভূয় (নিজের স্বপ্রকাশ স্বভাব ও সবকিছুর অধিষ্ঠানরূপ অস্তিত্ব অনুভব করে) ব্রহ্মাণ্ডং পিণ্ডাণ্ডম্ (ব্রহ্মাণ্ড ও নিজের দেহকে) মলভাণ্ডবৎ ত্যজ্যতাম্ (মলভাণ্ডের মতো হেয় জ্ঞানে ত্যাগ কর)।

সরলার্থ : সৎস্বরূপ ব্রহ্মই আত্মা স্বয়ং এই বোধের দ্বারা নিজের স্বপ্রকাশ স্বভাব ও সবকিছুর অধিষ্ঠানরূপ অস্তিত্ব অনুভব করে ব্রহ্মাণ্ড ও নিজের দেহ, এদের মলভাণ্ডের মতো হেয় জ্ঞান করে ত্যাগ কর।

ব্যাখ্যা : এখানে বলছেন যে এই ব্রহ্মাণ্ড ও তোমার নিজের দেহ, এগুলোর থেকে সমস্ত মনোযোগ তুলে নাও। তোমার দেহের ওপর অহংবুদ্ধি রেখো না আর এই ব্রহ্মাণ্ডকে অনাত্মবস্তু বলে জেনে এর ওপর কোনও মমত্ববুদ্ধি রেখো না। বলছেন, 'স্বপ্রকাশম্-অধিষ্ঠানম্ স্বয়ংভূয় সদাত্মনা'; এই আত্মা স্বপ্রকাশ, প্রকাশ হচ্ছে তার স্বরূপ। একটা আলোকে দেখার জন্যে যেমন আর একটা আলো লাগে না সেইরকম। 'স্বপ্রকাশম্-অধিষ্ঠানং'—আমি স্বপ্রকাশ আবার নিজেই নিজের অধিষ্ঠান, প্রকাশিত থাকার জন্যে আমার কোনও আশ্রয় লাগে না। আমি 'স্বয়ংভূয়'; আপনি আপনি হয়েছি, আমাতেই আছি, আমি 'অধিষ্ঠানম্', আমি স্বাধীন, আমি 'সদাত্মা'—অস্তিত্ব স্বরূপ; আমার জন্ম হয়নি, মৃত্যু হয়নি, আমি নিজের প্রভায় নিজে প্রকাশিত, নিজেই নিজের আশ্রয়, সৎস্বরূপ আমি সব সময় আছি। বলছেন, এই তোমার স্বরূপ, এটা বোঝার জন্যে 'ব্রহ্মাণ্ডম্-অপি পিণ্ডাণ্ডং ত্যজ্যতাম্ মলভাণ্ডবৎ'—ব্রহ্মাণ্ড আর পিণ্ডাণ্ডং দুটোকেই মলপাত্রের মতো ত্যাগ করতে হবে। ঘৃণা জন্মাবার জন্যে মলভাণ্ড বলছেন। পিণ্ডাণ্ড কি ? দেহ। ব্রহ্মাণ্ড আর দেহ—দুটোকেই ঘৃণ্য মনে করে ত্যাগ করতে হবে। আমার দেহটা পালটাচ্ছে। জন্ম মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু আত্মা তো সব সময় এক ভাবেই আছেন। দেহ, ব্রহ্মাণ্ড, এসব একটা মলভাণ্ড—মিথ্যা, অনাত্মা, অনিত্য। বলছেন ঃ এই দেহটা অধ্যাস, এই দেহের প্রতি যে অনুরাগ, প্রেম, সেটা ত্যাগ কর। মনে রেখো তুমি স্বপ্রকাশ, তুমি নিজেই প্রকাশ হয়েছ, তোমার জন্ম নেই, তুমি স্বাধিষ্ঠান, নিজেই নিজের আশ্রয়। এই দেহটাকে ত্যাগ কর, শুধু দেহ নয়, এই ব্রহ্মাণ্ডকেও মলভাণ্ডের মতো ত্যাগ কর। মলভাণ্ড কেন? কারণ এ তো জড়। একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই যে নেতি নেতি করছি, সব বর্জন করছি, আবার বলছি ব্রহ্মময়ং জগৎ, তখন নমস্কার করছি; এরকম কেন করছি? কারণ যতক্ষণ জ্ঞান হয়নি

ততক্ষণ জগৎ মিথ্যা, জ্ঞান হলে জগৎ ব্রহ্ম, জগৎ সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে দেখলেন একজন পাগলের মতো লোক কুকুরদের সঙ্গে খাচ্ছে, খানিক পরে সে মন্দিরে এসে স্তব করছে, মন্দির গমগম করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সব লক্ষ্য করছেন, হৃদয়কে বলছেন, দ্যাখ্ দ্যাখ্, এ জীবন্মুক্ত পুরুষ। সেই পাগল চলে যাচ্ছেন, হৃদয় তাঁর পেছন পেছন যাচ্ছে, তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। হৃদয় জিজ্ঞেস করলে, কখন জ্ঞান হবে? পেছন ফিরে একটা নর্দমা দেখিয়ে বললেন, যখন নর্দমার জল আর গঙ্গার জল এক মনে হবে। রামপ্রসাদ গান গাইছেন, কবে শুচি, অশুচি এই দুই সতীন নিয়ে ঘর করব ! দুই সতীন বিপরীত, এই দুই সতীন নিয়ে কবে ঘর করতে পারব? অর্থাৎ আমার কাছে ভালো-মন্দ, শুচি-অশুচি, বন্ধু-শত্রু, সব এক হয়ে যাবে কবে? অভেদ দৃষ্টি কবে হবে। 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ'। (শ্বে, ৬।১১) এক দেবতা, এক ঈশ্বর, এক আত্মা, এই জ্ঞান যখন হলো তখন কাকে ত্যাগ করব? তখন আর ত্যাগ নেই। কিন্তু প্রথমে ত্যাগ আছে, নেতি নেতি করে সব ত্যাগ করছি 'মলভাণ্ডবৎ'। তারপর যেই জ্ঞান হয়ে গেলো তখন 'ব্রহ্মময়ং জগৎ'—সব ব্রহ্ম কোথাও কোনও ভেদ নেই।

চিদাত্মনি সদানন্দে দেহারূঢ়ামহংধিয়ম্।
নিবেশ্য লিঙ্গমুৎসৃজ্য কেবলো ভব সর্বদা॥ ২৯০

অন্বয় : দেহ-আরূঢ়াম্-অহং ধিয়ম্ (দেহে আশ্রিত অহংবুদ্ধিকে) চিদাত্মনি সদানন্দে (চৈতন্যস্বরূপ সৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ আত্মায়) নিবেশ্য (নিবিষ্ট করে) লিঙ্গম্-উৎসৃজ্য (স্থূলশরীর সূক্ষ্মশরীর ইত্যাদি যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন ত্যাগ করে) সর্বদা কেবলঃ ভব (সর্বদা স্বস্বরূপে স্থিত হও)।

সরলার্থ : দেহকে আশ্রয় করে যে অহংবুদ্ধি আত্মাকে আবৃত করেছে তাকে চৈতন্যস্বরূপ, সৎস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ আত্মায় নিবিষ্ট করে স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, ইত্যাদি যে সমস্ত লিঙ্গ অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন আছে সেগুলো বিসর্জন দিয়ে তুমি শুধু সেই সচ্চিদানন্দ হয়ে থাক।

ব্যাখ্যা : আগে পরপর কয়েকটি শ্লোকে অধ্যাস অপনয় করার কথা বললেন। তারপর, এই দেহ, এই ব্রহ্মাণ্ড সব যে আবর্জনার মতো ফেলে দিতে হবে সেটা বললেন। এবার একটা সুন্দর শব্দ ব্যবহার করছেন, বলছেন, 'কেবলঃ ভব'—তুমি 'সেই' হও। যখন 'কেবলঃ' বলছি তখন এক ছাড়া দুই নেই। 'কেবলঃ'—কি একটা কথা ! এর কোনও ব্যাখ্যা করা যায় না, তিনি তিনিই আছেন, এর বেশী কিছু বলা যায় না, যা বলব ভুল বলব, তাঁর ওপর অধ্যাস চাপাব। স্বামীজী একটা ইংরেজি

চিঠিতে বলছেন, I am, এ ছাড়া তো কিছু বলার নেই। তিনি যখন দেহকে আশ্রয় করছেন তখন বহু হয়ে যাচ্ছেন আর যখন দেহ ব্যতিরিক্ত তখন তিনি 'কেবলঃ', আর কিছু বলা যায় না। বলছেন, 'চিদাত্মনি সদানন্দে দেহ-আরূঢ়াম্-অহংধিয়ম্'; এই আমি কে? চিদানন্দ, সদানন্দ, 'দেহারূঢ়াম্-অহংধিয়ম্'—এই দেহের ওপর সে অহংবুদ্ধি করে বসে আছে। অহংবুদ্ধি 'দেহারূঢ়াম্', দেহকে আশ্রয় করে আছে। আমি চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, সদানন্দ, আমি সৎ-চিৎ-আনন্দ, তার ওপর আমার এই দেহটাকে চাপিয়ে দিয়েছি, দিয়ে মনে করছি 'অহংধিয়ং', এই আমি। এই অহংবুদ্ধিটাকে, মিথ্যে আমিটাকে তুমি 'চিদাত্মনি সদানন্দে নিবেশ্য কেবলো ভব'—তোমার আত্মায় নিবিষ্ট করে 'তিনি' হয়ে যাও। তোমার আসল যে 'আমি', বিরাট আমি—তাতে মিশিয়ে দাও। 'লিঙ্গম্-উৎসৃজ্য কেবলঃ ভব সর্বদা'; সর্বদা মনে কর তুমি 'কেবলঃ'—তুমি আত্মা ছাড়া আর কিছু নও, তার সঙ্গে অধ্যাস জুড়ে দিও না। 'লিঙ্গ' মানে চিহ্ন, একটা অধ্যাস। লিঙ্গত্যাগ মানে, আমি ব্রাহ্মণ আমার শিখা-উপবীত আছে, আমি সন্ন্যাসী আমার গৈরিক আছে, এসব চিহ্ন ত্যাগ। আবার আমাদের যে সূক্ষ্মশরীর—মন বুদ্ধি অহংকার, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ—একেও লিঙ্গশরীর বলা হয়, সে অর্থও নেওয়া যায়। যেভাবেই হোক লিঙ্গ মানে দাঁড়াচ্ছে অধ্যাস। আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি অমুক বাড়ীর ছেলে, আমি ব্রাহ্মণ, এই সব অধ্যাস। 'উৎসৃজ্য'—ত্যাগ করে; ত্যাগ করে দাও, বিদায় দিয়ে দাও। এগুলো কিছুই নয়। এগুলো ত্যাগ কর, এই বিভেদ, এই বিশেষিত করা, এগুলো ত্যাগ কর। 'লিঙ্গম্-উৎসৃজ্য কেবলঃ ভব'—এসব ত্যাগ করে তুমি 'কেবলঃ ভব'। শান্তম্ শিবম্ কেবলম্—কিছু বলা যায় না চুপ করে থাকতে হয়। কি বলব? তাঁকে ভালো বললে মন্দটা কে ? সব তো তিনি। কিছু বলা যায় না, কোনও রকমে ধরা যায় না, বাক্যমনাতীত, যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—বাক্য মনের উর্ধ্বে তিনি। তাই বলছেন, সমস্ত অধ্যাস ত্যাগ করে তুমি সেই 'কেবলঃ ভব সর্বদা'।

যত্রৈষ জগদাভাসো দর্পণান্তঃপুরং যথা।
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি॥ ২৯১

অন্বয় : যথা দর্পণান্তঃপুরং (যেমন দর্পণে একটা নগরের প্রতিবিম্ব ন্যস্ত হয় সেইরকম) যত্র-এষঃ জগৎ-আভাসঃ (যাতে এই জগৎ প্রতিভাসিত) তৎ ব্রহ্ম-অহং (সেই ব্রহ্ম 'আমিই') ইতি জ্ঞাত্বা (এইটে জেনে) কৃতকৃত্যঃ ভবিষ্যসি (কৃতকৃতার্থ হবে)।

সরলার্থ : দর্পণে যেমন একটা নগরের প্রতিচ্ছায়া ন্যস্ত হয় সেইরকম যাঁর ওপর এই জগতের প্রতিভাস ন্যস্ত সেই ব্রহ্ম 'আমিই' এইটা জেনে কৃতকৃতার্থ হবে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, এই নাম-রূপের জগৎ, তার কত রকমের বৈচিত্র। মানুষ, ইতর প্রাণী, উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, এসব নিয়ে এই জগৎ। বলছেন, এর আধারটা কোথায় ? এ কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে? তাঁর উপর। তিনি নিত্য, তিনি আছেন বলে আমরা আছি। তিনিই আমি। আমার স্বরূপটা কিরকম ? যেন একটা আয়না। আয়নার মধ্যে দিয়ে নগর দেখছি। একটা আয়নায় কত কি ধরা পড়ছে, একটা শহর ধরা পড়ছে, আমার নিজের চেহারাটা ধরা পড়েছে। আয়না না থাকলে আমার মুখই আমি দেখতে পেতাম না, আমি আমাকেই দেখতে পেতাম না। আয়নায় যে এতসব প্রতিভাস, এই যে সব ছায়া, সেসব আয়না না থাকলে আমরা দেখতে পেতাম না। সেইরকম আত্মা না থাকলে এই জগৎটাকেও আমরা দেখতে পেতাম না, বুঝতেও পারতাম না। বলছেন, 'যত্র এষঃ জগৎ-আভাসঃ দর্পণান্তঃপুরং যথা'; আয়নায় যেমন নগরের ছায়া ধরা আছে তেমনি যাঁর মধ্যে এই জগতের প্রতিভাস ধরা আছে, ন্যস্ত রয়েছে, 'তৎব্রহ্ম-অহম্-ইতি'—সেই ব্রহ্ম আমিই। দড়িটাকে সাপ বলে ভুল করছি, ওই সাপটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? কাকে আশ্রয় করে আছে? ওই দড়িটাকে। মরীচিকা দেখছি সেটা বালি আছে বলেই তো দেখছি, ওই মরীচিকা বালির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি এই জগৎ ব্রহ্মে ন্যস্ত হয়ে আছে। সেই ব্রহ্মই আমি, আমার আত্মা—যেমন আয়নার কোনও পরিবর্তন নেই, প্রতিবিম্বগুলো পালটাচ্ছে, তেমনি আত্মার কোনও পরিবর্তন নেই, শুধু জগৎই পরিবর্তনশীল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যাদুকরই সত্য, যা দেখছ তা সত্য নয়। যাদুকর কত রকমের খেলা দেখাচ্ছে, সেসব সত্যি নয় যাদুকরই সত্য। 'যত্র এষঃ জগৎ-আভাসঃ', এই যে জগৎ দেখছি আমরা, সেটা যেন 'দর্পণান্তঃপুরং যথা'—দর্পণের মধ্যে যেমন একটা পুর অর্থাৎ একটা নগরের ছায়া পড়ে, সেইরকম। আমাদের আত্মায় এই জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড, সবকিছু প্রতিফলিত হচ্ছে আর সেটা হচ্ছে বলেই এসব দেখতে পাচ্ছি। 'ইতি জ্ঞাত্বা'—এইটা জেনে। এই যে আমি সবকিছুর ধারক, আমার ওপর সবকিছু ন্যস্ত হয়ে আছে, 'ইতি জ্ঞাত্বা'—এটা জেনে 'কৃতকৃত্যঃ ভবিষ্যসি'। 'কৃত' মানে যা করা হয়ে গেছে, আর 'কৃত্যঃ' মানে যা করার কথা, 'কৃতকৃত্যঃ' অর্থাৎ যা করার সব করা হয়ে গেছে। বলছেন, দর্পণে প্রতিফলিত একটা নগরের ছায়ার মতো এই জগৎ যে-ব্রহ্মে প্রতিফলিত সেই ব্রহ্মই যে 'আমি', এটা জেনে তুমি চরিতার্থ হবে, কৃতকৃত্য হবে, ধন্য হবে।

যৎ সত্যভূতং নিজরূপমাদ্যং চিদদ্বয়ানন্দমরূপমক্রিয়ম্।
তদেত্য মিথ্যাবপুরুৎসৃজেতৎ শৈলূষবদ্‌বেষমুপাত্তমাত্মনঃ।। ২৯২

অন্বয় : যৎ (যে) সত্যভূতং (সত্যস্বরূপ) আদ্যং (আদি থেকে বর্তমান) নিজরূপম্ (নিজের স্বরূপ) চিৎ-অদ্বয়-আনন্দম্-অরূপম্-অক্রিয়ম্ (চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, আনন্দস্বরূপ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়) তৎ-এত্য (সেই স্বরূপে গতি লাভ করে) শৈলূষবৎ আত্মনঃ উপাত্তম্ বেষম্ (নটের মতো নিজের গৃহীত বেশ) মিথ্যা বপুঃ উৎসৃজেতৎ (অনিত্য শরীরে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে)।

সরলার্থ : নট যেমন অভিনয়কালে ভূমিকা অনুযায়ী বেশ গ্রহণ করে, সেই রকমই তোমার অনিত্য শরীর। সত্যভূত, চৈতন্যঘন, অদ্বিতীয়, আনন্দস্বরূপ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয় তোমার সেই স্বরূপে উপনীত হয়ে নশ্বর দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর।

ব্যাখ্যা : বলছেন, আমাদের ভুল একটাই যে আমরা এই দেহটাকে 'আমি' মনে করছি। এই দেহ পালটাচ্ছে। একদিন বালক ছিলাম আজ বৃদ্ধ হয়েছি—মনে করছি এ তো খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু শাস্ত্র বলছেন এটা যে স্বাভাবিক মনে করছ সেটাই তোমার ভুল। স্বাভাবিক হচ্ছে তোমার কোনও পরিবর্তন নেই, তুমি আত্মা। বলছেন, মনে কর তুমি একটা নাটক করছ, রাজা সেজেছ, রাজার মতো ব্যবহার করছ, নাটকটা হয়ে গেলে পোশাক-টোশাক নাবিয়ে দিয়ে তুমি যা ছিলে তাই হয়ে গেলে। এই জীবনটা যেন ওইরকম একটা অভিনয়। এ জগতে প্রত্যেকের এক একটা ভূমিকা আছে, আর নাটকে যেমন সুখ-দুঃখ কত ঘটনা সব ঘটে আমাদের জীবনের হাসি-কান্নাও সেইরকম। মনে রাখতে হবে যে এটা মিথ্যা, এটা সাময়িক। তাহলে কোন্‌টা সত্য ? বলছেন, 'সত্যভূতম্'—যেটা তোমার স্বরূপ সেটা সত্যরূপ আত্মা, সেটা 'আদ্যং'—একেবারে গোড়া থেকে আছে; সেটা কি ? 'চিৎ'—চৈতন্যস্বরূপ। এ দেহটা জড়, সেটা কিন্তু তা নয়, সেটা চিৎ, চৈতন্যস্বরূপ, জ্যোতিস্বরূপ। 'অদ্বয়'—এক, দুই নয়, একজনের যা অন্যেরও তাই। মাঝে মাঝে বেদান্ত শাস্ত্রে আত্মাকে বলা হয় 'আকাশবৎ'। যদিও আকাশ জড় আর আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু আকাশ সর্বব্যাপী, অদ্বয়, আকাশের কোনও দুই নেই, এই অর্থে আকাশের সঙ্গে আত্মার তুলনা করা হয়। আত্মা 'আনন্দম্-অরূপম্-অক্রিয়ম্'। আত্মাকে আমরা 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' বলি। আমাদের যে আনন্দ সেটা একটা বস্তু বা অবস্থার ওপর নির্ভরশীল আনন্দ, আত্মা স্বয়ংই আনন্দ—আনন্দস্বরূপ। তিনি 'অরূপম্'—নির্গুণ, নিরাকার। তিনি 'অক্রিয়ম্'—কিছুই করছেন না অথচ তিনি না থাকলে কিছুই চলবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলছেন, চুম্বকের পাশে লোহার গুঁড়োগুলো লাফালাফি করছে, সেটা চুম্বক আছে বলেই। সেইরকম আমাদের সব ক্রিয়াকলাপ এই আত্মা আছেন বলে। তিনি নিষ্ক্রিয়, সাক্ষী, কিন্তু তিনি আছেন বলেই জগতের সব কর্মচাঞ্চল্য। এইটাই আমার স্বরূপ, আমি ভুলে গেছি। আমার সত্যিকারের যে রূপ সেটা হচ্ছে, 'চিৎ-অদ্বয়-আনন্দম্-অরূপম্-অক্রিয়ম্'। এইটাই আমার 'নিজরূপম্-আদ্যম্'—আমার নিজের রূপ, গোড়া থেকেই আছে। 'তৎ এত্য'—তুমি এই অবস্থায়

পৌঁছাও, তুমি এটা জান। আমি যে ব্রহ্ম এটা আমার স্বভাব। এটা যে আমায় আয়ত্ত করতে হবে তা নয়, এটা শুধু জানতে হবে। তাই বলছেন, 'তৎ এত্য'—তোমার স্বরূপে পৌঁছে গিয়ে, তুমি যা তাই জেনে, 'মিথ্যা বপুঃ উৎসৃজেত', এই যে তুমি দেহের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিয়েছ, নিজেকে দেহ মনে করছ, এই মিথ্যাজ্ঞান 'উৎসৃজৈতৎ'—এটাকে তুমি ত্যাগ কর। বলছেন, 'শৈলূষবৎ বেষম্-উপাত্তম্-আত্মনঃ'—তুমি অভিনেতার বেশের মতো আত্মায় যেটা আরোপ করেছিলে সেটা ত্যাগ কর। অভিনয়ের সময় মঞ্চের যে চরিত্র তার উপযোগী পোশাক পরেছিলে। এখন মঞ্চ থেকে নেমে এসে সেই পোশাক ফেলে দিয়ে নিজের মতো হয়ে যাও, পোশাকটা আঁকড়ে থেকো না। অর্থাৎ তোমার এই দেহের ওপর যে আকর্ষণ, সেটা তুমি ত্যাগ কর। মঞ্চের ওপর যখন ছিলে তখন কখনও রাজার ভান করেছিলে, আবার কখনও প্রজার ভান করছিলে, এখন মঞ্চ থেকে নেমে এসে সেসব ভান ত্যাগ কর, তুমি যা তাই হও। মনে রেখো তুমি হচ্ছ ওই 'যৎ সত্যভূতং নিজরূপম্-আদ্যম্ চিদ্-অদ্বয়-আনন্দম্-অরূপম্-অক্রিয়ম্'। এটা তুমি জানবে আর এই যে তুমি সংসারে এসে অভিনয় করছ সেটা ত্যাগ করবে।

সর্বাত্মনা দৃশ্যমিদং মৃষৈব নৈবাহমর্থঃ ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ।
জানাম্যহং সর্বমিতি প্রতীতিঃ কুতোঽহমাদেঃ ক্ষণিকস্য সিধ্যেৎ ॥২৯৩

অন্বয় : ইদং দৃশ্যম্ (এই দৃশ্যমান জগৎ) সর্বাত্মনা (সর্ব দিক থেকে) মৃষা এব (মিথ্যাই, অনিত্য) ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ (অল্প কালের স্থায়িত্ব দেখা যায় বলে) অহম্ (অহঙ্কার) অর্থঃ (পরমার্থ) ন এব (কখনই নয়) কুতঃ (কি করে) ক্ষণিকস্য অহম্-আদেঃ (ক্ষণস্থায়ী অহংবুদ্ধি ইত্যাদির) অহং সর্বং জানামি (আমি সব জানি) ইতি প্রতীতিঃ (এইরকম বোধ) সিধ্যেৎ (সম্ভব হতে পারে) ?

সরলার্থ : এই দৃশ্যমান জগৎ ও দেহাদি সব মিথ্যা, অনিত্য। শুধু ক্ষণকালের জন্যে স্থায়ী বলে অহঙ্কার কখনও পরমার্থ অর্থাৎ পরমাত্মা হতে পারে না। এই ক্ষণস্থায়ী অহং ইত্যাদির 'আমি সব জানি' এরকম একটা বোধ হওয়া কি করে সম্ভব ?

ব্যাখ্যা : এখানে বলছেন, শুধু দেহটাকেই মিথ্যা বলে জানলে হবে না, এই যে অহংভাব, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, এটাকেও মিথ্যা বলে সরিয়ে দিতে হবে। আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, এগুলো সব অহংভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ একে কাঁচা আমি বলছেন। এই ক্ষুদ্র 'অহং বুদ্ধি' ত্যাগ করতে হবে। দেহটাকে শুধু মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলাম তাতে হলো না। আমি মরে গেলাম, দেহ চলে গেল কিন্তু আমার অহংবুদ্ধি, সেটা তো রইল। 'সর্বাত্মনা দৃশ্যম্-ইদং মৃষা এব', এই যে দৃশ্যমান জগৎ, 'সর্বাত্মনা মৃষা এব'—সবদিক দিয়ে দেখলেই এ মিথ্যা। এখানে আগে বুঝতে হবে আমরা মিথ্যাটা কি অর্থে বলছি। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বিদ্রূপ করে বলছেন—হ্যাঁ, দাঁত ব্যথা করছে সেটা মিথ্যা ! আসলে মিথ্যা মানে এগুলি ব্যবহারিকভাবে মিথ্যা নয়, আত্যন্তিক অর্থে মিথ্যা। এগুলি আপেক্ষিক সত্য—আত্যন্তিক সত্য নয়, নিত্য নয়। আমরা সত্য বলতে যা বুঝি তা নিত্য, অতীতে সত্য ছিল, বর্তমানে সত্য, ভবিষ্যতেও সত্য থাকবে। এই যে দেখছ দৃশ্যমান জগৎ, এটা আপেক্ষিক সত্য, ব্যবহারিক সত্য, কিন্তু নিত্য নয়। এই যে 'ইদং' বলা হলো, তার মধ্যে আমার দেহটাও পড়ছে, আমার ঐ 'কাঁচা আমি' বা অহংবুদ্ধি পড়ছে, জগতের সবকিছুই পড়ছে। এসব মিথ্যা, সর্বৈব ভাবে মিথ্যা অর্থাৎ অনিত্য। 'ন এব অহমর্থঃ ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ'। বলছেন : আমার যে একটা 'অহংবুদ্ধি' আছে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আমি এই জগৎটাকে দেখছি আর ভাবছি, 'আমার দেহ, আমার পরিবার, আমার দেশ, আমার সমাজ' ইত্যাদি, সেই 'অহং' কিন্তু পরমার্থ নয়—'ন এব অহম্ অর্থঃ'। এখানে 'অর্থ' মানে পরমার্থ, পরমাত্মা। কেন নয় ? 'ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ'—দেখতে পাচ্ছি বলে যে, এই অহং ক্ষণিক, অনিত্য। কি করে বুঝতে পারি এই 'অহং' বা 'আমি' ক্ষণিক ? বলছেন, এ তো প্রতিদিনের ঘটনা, সুষুপ্তির মধ্যে আমার 'আমি' অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধি, জীবাত্মা, সব কোথায় তলিয়ে যায় আবার জেগে উঠে অন্যরকম হয়; কাজেই এই 'আমি' তো অনিত্য বটেই। 'জানামি-অহং সর্বম্-ইতি প্রতীতিঃ'—এই 'আমি' কি করে মনে করতে পারবে যে, আমি সব জানি ? এই ক্ষুদ্র 'আমি' দিয়ে আমি সেই কথাটা বলতে পারি না। 'কুতঃ অহমাদেঃ ক্ষণিকস্য সিধ্যেৎ', আমি যা কিছু জানি তা আমার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, বুদ্ধি দিয়ে, তাই আমার যে জ্ঞান সে জ্ঞান সীমিত, এ জ্ঞান পরমাত্মার জ্ঞান নয়, আসল জ্ঞান নয়। এই জ্ঞান এই দেহটাকে আশ্রয় করে, আমার জীবাত্মাকে আশ্রয় করে, কিন্তু এগুলো তো সব ক্ষণিক। তাই বলছেন, 'আমি সব জানি', একথাটা একটা ক্ষণিক বস্তু কি করে বলে ? সে কি অতীতকে জানে বা ভবিষ্যৎকে জানতে পারে ? বর্তমানটা কিছুটা হয়তো জানতে পারে, সর্বজ্ঞ তো হতে পারে না। ব্রহ্মকে যে জানে সেই শুধু সর্বজ্ঞ হতে পারে। মুণ্ডক উপনিষদে আছে, কয়েকজন বিদ্যার্থী প্রশ্ন করছেন 'কস্মিন্ নু বিজ্ঞাতে সর্বম্-ইদম্ বিজ্ঞাতম্ ভবতি'—কি জানলে সব জানা হয় (মু, ২।২।১০)? উত্তরে বলছেন, ব্রহ্মকে জানলে সব জানা হয়। ব্রহ্মকে 'আমি' বলে জানলেই সর্বজ্ঞ হওয়া যায়। ক্ষণিক বস্তুতে যদি 'অহং বুদ্ধি' থাকে তাহলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায় না। 'কুতঃ অহম্-আদেঃ ক্ষণিকস্য সিধ্যেৎ'; যে আমি ক্ষণিক সে কি করে ভাবতে পারে আমি সর্বজ্ঞ ?

অহংপদার্থস্ত্বহমাদিসাক্ষী নিত্যং সুষুপ্তাবপি ভাবদর্শনাৎ।
ব্রূতে হ্যজো নিত্য ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং তৎ প্রত্যগাত্মা সদসদ্ বিলক্ষণঃ ॥২৯৪

অন্বয় : তু (কিন্তু) অহং পদার্থঃ (আমিত্বের সারবস্তু শুদ্ধ-আত্মা) অহম্-আদি-সাক্ষী (অহংকার ইত্যাদির সাক্ষী) নিত্যং (চিরন্তন) সুষুপ্তৌ-অপি (সুষুপ্তিতেও) ভাবদর্শনাৎ (সাক্ষী হয়ে আছেন বলে) শ্রুতি ব্রূতে হি (শাস্ত্র নিশ্চিতভাবে বলেন) অজঃ নিত্যঃ ইতি (জন্ম নেই, চিরবর্তমান ইত্যাদি) স্বয়ং তৎ প্রত্যগাত্মা (প্রত্যগাত্মা সেই 'তৎ' স্বয়ং) সদ্-অসদ্ বিলক্ষণঃ (স্থূল-সূক্ষ্ম, কার্য-কারণ এসব লক্ষণ বিযুক্ত)।

সরলার্থ : কিন্তু অহংবোধের সারবস্তুরূপ আশ্রয় শুদ্ধ আত্মা, তিনি অহংকার ইত্যাদির সাক্ষীস্বরূপ। সুষুপ্তিতেও তিনি সাক্ষীরূপে বর্তমান থাকেন বলে চিরন্তন, নিত্য। শ্রুতি অসংশয়ে বলেন তিনি অজঃ নিত্যঃ ইত্যাদি। তিনি স্বয়ং প্রত্যেকের আত্মা, তিনি স্থূলও নন সূক্ষ্মও নন, কার্যও নন কারণও নন কিন্তু সর্বদা বর্তমান।

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বলেছেন, আমার যে-আমি দেহ-মনকে আশ্রয় করে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় যেটা আমার 'কাঁচা আমি', সে কখনও সর্বজ্ঞ হতে পারে না। এখন বোঝাচ্ছেন এই কাঁচা আমি আর পাকা আমির পার্থক্যটা কোথায়। 'অহং-পদার্থ তু অহম্-আদি সাক্ষী'। এখানে প্রথম 'অহং'টা হচ্ছে 'পাকা আমি'। দ্বিতীয় 'অহম্'টা 'কাঁচা আমি'। পাকা আমিটা কাঁচা আমির সাক্ষী। সেটাই সত্যিকারের আমি। তিনি সাক্ষী, দ্রষ্টা, নিত্যবস্তু—সবসময় আছেন। এই জীবজগৎ মুহুর্মুহু সৃষ্টি হচ্ছে আর ধ্বংস হচ্ছে, আমার শরীরটা গড়ছে, ভাঙছে, আর আমি, 'অহম্-পদার্থঃ', যা substance বা বস্তু, তা শুধু সাক্ষী, দ্রষ্টা। তাঁর কোনও ক্রিয়া নেই। কেন ? কারণ, আমরা কাজ করি কোনও একটা প্রয়োজনে, কিন্তু এই যাঁকে আমরা আত্মা বলছি তাঁর কোনও প্রয়োজন বোধ নেই। আমিই তো সব হয়েছি, যা কিছু আছে সবই আমি, তাহলে কার কাছে কি চাইব ? কাজেই অক্রিয়, কিছুই করেন না তিনি। সর্বত্র আমি, শুধু এক বড় আমি, সর্বগ্রাসী, সর্বব্যাপী। এ আমি নিত্য, অক্রিয়। 'অহং পদার্থঃ' অর্থাৎ আমার পাকা আমি-টা না থাকলে আমার যে ক্ষুদ্র অহং, বা কাঁচা আমি, সেটাও থাকত না। দড়ি না থাকলে সাপের ভ্রান্তিটাও থাকত না—দড়িটা আশ্রয়। সেই রকম পাকা আমিটা কাঁচা আমির আশ্রয়। 'সুষুপ্তৌ-অপি ভাবদর্শনাৎ', এই পাকা আমি সুষুপ্তিতেও আছেন, নিত্য সাক্ষী হয়ে আছেন। এসব আমাদেরই অভিজ্ঞতার কথা হচ্ছে। সুষুপ্তিতে তো আমরা সত্যি সত্যি মরে যাই না, কিন্তু আমার যে আত্মাকে নিয়ে কাজ-কারবার সে নেই সেখানে। তাহলে কে আছেন ? পরমাত্মা আছেন—যিনি আমার চিরকালের আত্মা, আমার স্বরূপ। 'ব্রূতে হি অজঃ নিত্যঃ ইতি শ্রুতিঃ'; শাস্ত্রও ঠিক এই কথাই বলছেন। 'ব্রূতে'—বলে থাকেন; কে বলছেন ? 'শ্রুতিঃ'। শাস্ত্র বলেন এই আত্মা 'অজঃ'—জন্ম নেই; যার জন্ম নেই তার মৃত্যুও নেই। তিনি 'অজঃ অমরঃ নিত্যঃ'। নিত্য মানে ত্রিকাল-অবাধিত, যা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব সময় রয়েছে, তাকে বলি নিত্য। বলছেন, 'স্বয়ং তৎ প্রত্যগাত্মা'—তিনিই স্বয়ং প্রত্যগাত্মা, সকলের আত্মা।

যেমন গুরু বলে দেন, 'তৎ-ত্বম্-অসি' সেইরকম বলছেন, তুমি প্রত্যগাত্মা, তুমিই স্বয়ং তৎ। সেই পরমাত্মা, যিনি নিত্য, যিনি অজ, তুমি সেই—এটা তুমি জেনে রেখো। তারপর আবার একটা কথা বলছেন, 'সৎ-অসৎ-বিলক্ষণঃ'; তিনি 'সৎ' এবং 'অসৎ' থেকে পৃথক। এখানে 'সৎ-অসৎ' মানে স্থূল, সূক্ষ্ম। স্থূল—যা আমরা দেখি, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর সূক্ষ্ম—যা দেখতে পাই না, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এই উভয় থেকেই তিনি আলাদা। আবার 'সৎ-অসৎ'-এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে কার্য-কারণ। কার্য হচ্ছে ফল, যা দেখতে পাচ্ছি, যা সৃষ্টি হয়েছে আর কারণ হচ্ছে যা দেখতে পাচ্ছি না, যার থেকে সৃষ্টি। কার্যটা দেখতে পাচ্ছি—'সৎ' আর কারণটা দেখতে পাচ্ছি না—'অসৎ'। যেমন গাছ আর তার বীচি। বীচিটা অসৎ, কারণ দেখতে পাচ্ছি না তো। গাছটা 'সৎ', গাছটা দেখেই অনুমান করছি নিশ্চয় একটা বীচি ছিল। বলছেন, যিনি আত্মা তিনি 'সৎ-অসৎ বিলক্ষণঃ', তিনি স্থূলও নন সূক্ষ্মও নন, কার্যও নন কারণও নন। দেখতে পাই বা না পাই, তিনি সব সময় আছেন, তিনি নিত্য। তিনি আছেন বলেই আমি আছি। তিনিই আমি। আমাদের সকলের 'আমি' তিনি।

বিকারিণাং সর্ববিকারবেত্তা নিত্যাবিকারো ভবিতুং সমর্হতি।
মনোরথস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটং পুনঃ পুনর্দৃষ্টমসত্ত্বমেতয়োঃ ॥ ২৯৫

অন্বয় : বিকারিণাং (স্থূল, সূক্ষ্ম সমস্ত পরিবর্তনশীল বস্তুর) সর্ববিকারবেত্তা (সর্ব প্রকার বিকারের দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা) নিত্য-অবিকারঃ (নিত্য বিকারশূন্য) ভবিতুং সম্-অর্হতি (হওয়া নিশ্চয় উচিত) মনোরথ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু (জাগ্রত অবস্থার কল্পনায়, স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে) স্ফুটং (স্পষ্ট) পুনঃ-পুনঃ দৃষ্টম্ (বারবার দৃষ্ট) এতয়োঃ (এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে) অসত্ত্বম্ (সত্তা নেই)।

সরলার্থ : বিকারশীল বস্তুর সর্বপ্রকার বিকারের দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা যিনি তাঁর নিত্য ও অবিকারী হওয়াই যুক্তিযুক্ত। জাগ্রত অবস্থার কল্পনায় এবং স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অভিজ্ঞতা থেকে বার-বার স্পষ্ট হয় যে এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সত্তা নেই, এসব অসত্য।

ব্যাখ্যা : এখানে বিকারের কথা বলছেন। বিকার মানে পরিবর্তন। যা পরিবর্তনশীল তা অনিত্য, মিথ্যা। কিন্তু এমন কি কিছু আছে যা পরিবর্তনশীল নয় ? হ্যাঁ আছে। হিন্দুমতে একমাত্র বস্তু যা পরিবর্তনশীল নয়, তা হলো আমাদের আত্মা। তাঁকে ব্রহ্ম বলি। তিনি নিত্যবস্তু, সব সময় আছেন। তিনি কোনও সৃষ্ট-বস্তু নন। 'জন্য' বস্তু যাকে বলি, যার একটা নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট কালে জন্ম হয়েছে, তা তিনি নন। আত্মা স্থান, কাল এসবের ঊর্ধ্বে। তিনি আছেন বলে সবকিছু আছে—যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'এক', একের পরে শূন্য বসালে সংখ্যা বেড়ে যায়, কিন্তু 'এক'টাকে যদি মুছে দিই তো সব শূন্য হয়ে যায়। তিনি আছেন বলেই সবকিছু আছে, 'তস্য ভাসা সর্বম্-ইদম্ বিভাতি'—তাঁর

আলোতেই সবকিছু আলোকিত (মু, ২।২।১০)। তিনি সবকিছুর আধার, তাঁতেই সবকিছু ন্যস্ত রয়েছে। তাঁর বিকার নেই, মানে নামের পরিবর্তন নেই, রূপের পরিবর্তন নেই, স্বভাবের পরিবর্তন নেই। সর্বব্যাপী তিনি, সর্বভূতে নিহিত রয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, একটা ভাষার গণ্ডীর মধ্যে তাঁকে টেনে আনা যায় না। তিনি হচ্ছেন 'বিকারিণাং সর্ববিকারবেত্তা'; তাঁর নিজের কোনও পরিবর্তন নেই কিন্তু যতকিছু পরিবর্তন হচ্ছে তিনি তার সাক্ষী, তিনি সেগুলি জানেন, দেখছেন। কিন্তু নিজে তিনি নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ, শুধু সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন। জগতের সবকিছুই তো বিকারশীল, পরিবর্তন তো হচ্ছেই, ভাঙা-গড়া চলছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, আবার আমাদের এই শরীরটার মধ্যে কতকিছু ঘটে যাচ্ছে। কত নতুন cells জন্মাচ্ছে আবার মরেও যাচ্ছে, আমরা টেরও পাই না। কত জন্ম-মৃত্যু, ভাঙা-গড়া, সৃষ্টি-প্রলয় এসব ঘটছে। সেসবের দ্রষ্টা ও সাক্ষী হয়ে তিনি আছেন। তিনি কিন্তু নিত্য ও অবিকারী। 'নিত্য-অবিকারঃ ভবিতুং সম্-অর্হতি'—এরকমই তাঁর হওয়া উচিত। কারণ, সমস্ত বিকারের যিনি সাক্ষী, তাঁর নিজের অবিকারী-ই হওয়া উচিত। নিবেদিতা মা-কালীর সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন 'এ্যালবার্ট হল'-এ, তার আগে স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করছেন—আচ্ছা যদি আমি বলি কালী শিবের একটা স্বপ্নবিশেষ? স্বামীজী বলছেন, হ্যাঁ, তা বলতে পার। শিব হচ্ছেন সাক্ষী আর মা কালী ভাঙা-গড়া, সৃষ্টি-প্রলয় এসব করছেন। স্বপ্নে যেমন আমরা ভাঙাগড়ার খেলা খেলি সেইরকম কালী লীলা করছেন। শিব নিত্য, অক্রিয়, দ্রষ্টা, সাক্ষী, অধিষ্ঠান। আর কালী লীলাময়ী, ত্রিগুণাত্মিকা, শিবকে আশ্রয় করে মায়ার খেলা খেলছেন। কিন্তু পরিবর্তন হওয়ার জন্যে তো একটা আধার চাই। এই যে ভাঙা-গড়া বা বিকার, এটা ঘটতে পারে যদি একটা নিত্য জিনিস থাকে। তাই বলছেন, এরকম একটা জিনিস থাকা উচিত যা নিত্য ও অবিকারী। তারপর বলছেন, সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ ওঠে ও নাবে, তেমনি আমাদের মনে কত বাসনার তরঙ্গ উঠছে আর নামছে। 'মনোরথ' মানে বাসনা। কত রকমের বাসনা আসছে। বলছেন, 'মনোরথস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটং'। যখন আমি জেগে আছি, ভাবছি এটা হলে হতো, ওটা এইভাবে করলে হতো—এসব মনোরথ, মনটা যেন রথে চড়ে বেড়াচ্ছে, কত কল্পনা করছি। তারপর স্বপ্ন; স্বপ্নে তো আমরা কত কি দেখি, মনে হয় যেন সত্যি সত্যি দেখছি। স্বপ্নও একটা অভিজ্ঞতা, যখন দেখছি সত্যি বলেই মনে করছি। আবার সুষুপ্তির যে অবস্থা—কি যে হয়ে যায় কিছুই বুঝতে পারি না, যেন মরে গেছি। এসব অভিজ্ঞতা 'স্ফুটম্'—স্পষ্টভাবে যেন দেখতে পাচ্ছি, 'পুনঃ-পুনঃ'—এ তো আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। 'দৃষ্টম্-অসত্ত্বম্-এতয়োঃ'—জেগে যা দেখছি সেটাও মিথ্যে, স্বপ্নে যা দেখছি তাও মিথ্যে, আবার সুষুপ্তি অবস্থায়, দেখি না কিছুই কিন্তু কিছু যে থাকে না সেটাও মিথ্যে, 'অসত্ত্বম্'—এসবের কোনও সত্তা নেই। জাগ্রত অবস্থায় এই স্থূল শরীরটাকে দেখছি, কিন্তু ঘুমোলে দেখছি না, আমার স্থূল শরীরটা বিছানায় পড়ে থাকছে

কিন্তু মনটা কাশী যাচ্ছে, স্বপ্নে যেন মনে হচ্ছে শরীরটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাহলে শরীরটা মিথ্যা, অনিত্য। আবার সুষুপ্তিতে যখন আছি তখন সূক্ষ্ম শরীরটাও নেই, তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার মনটা আর শরীরটা দুটোই 'অসত্ত্বম্'—সত্তা নেই, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুটো শরীরই মিথ্যা। মিথ্যার সংজ্ঞাটা হচ্ছে অনিত্য, এটা ভুললে চলবে না। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? সেটাই পরের শ্লোকে বলছেন।

অতোঽভিমানং ত্যজ মাংসপিণ্ডে পিণ্ডাভিমানিন্যপি বুদ্ধিকল্পিতে।
কালত্রয়াবাধ্যমখণ্ডবোধং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমুপৈহি শান্তিম্॥ ২৯৬

অন্বয় : অতঃ (অতএব) বুদ্ধিকল্পিতে (বুদ্ধির কল্পনায় আশ্রিত) মাংসপিণ্ডে (স্থূলদেহে) অপি (আর) পিণ্ড-অভিমানিনি (দেহে অভিমান থেকে মনে যে অহংবুদ্ধি সেই সূক্ষ্মদেহে) অভিমানং ত্যজ (অভিমান ত্যাগ কর) কালত্রয়-অবাধ্যম্ (ত্রিকাল অবাধিত) অখণ্ড বোধং (পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ) স্বম্-আত্মানং জ্ঞাত্বা (নিজের আত্মস্বরূপকে জেনে) শান্তিম্-উপৈহি (শান্তি লাভ কর)।

সরলার্থ: অতএব তোমার বুদ্ধির কল্পনায় আশ্রিত যে অহংবুদ্ধি স্থূলদেহে ও সূক্ষ্মদেহে রয়েছে সেটা ত্যাগ কর। তুমি ত্রিকাল অবাধিত, নিত্য, পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ—নিজের আত্মাকে এইভাবে জেনে শান্তি লাভ কর।

ব্যাখ্যা : বলছেন, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি যে আমার এই স্থূলদেহ আর সূক্ষ্মদেহ, এ দুটোরই আসলে কোনও সত্তা নেই, এরা অনিত্য। অতএব কি করতে হবে? এই যে আমি-আমার ভাব, অহংতা আর মমতা, এ ত্যাগ করতে হবে। অভিমান ত্যাগ কর। 'অভিমানং ত্যজ মাংসপিণ্ডে', মাংসপিণ্ড আমাদের এই শরীর। এই শরীরটাকে মাংসপিণ্ড বলছেন কেন? বলার কারণ আর কিছু নয়, একটা রূঢ় সত্য প্রকাশ করছেন। এই শরীরটাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াচ্ছি, এই শরীরটার জন্যে কত পরিশ্রম করছি, মানুষের সঙ্গে কত ঝগড়া করছি। বলছেন : শরীরটার ওপর অভিমান ত্যাগ কর। তুমি এই শরীর নও, তুমি হচ্ছ আত্মা, অবিকারী, দ্রষ্টা, সাক্ষী। এই দেহটা তোমার ওপর চাপানো জিনিস, অধ্যাস। এই মনটাও চাপানো, অহংবুদ্ধিটাও চাপানো। তাই বলছেন, 'অতঃ-অভিমানং ত্যজ মাংসপিণ্ডে'। তারপর বলছেন : শুধু দেহে তোমার অভিমান ত্যাগ করলে হলো না, তোমার মনেও তো একটা অভিমান রয়েছে, সেটাও ত্যাগ কর। 'পিণ্ডাভিমানিনি-অপি বুদ্ধিকল্পিতে'—স্থূলদেহে যেমন একটা অভিমান আছে তেমনি সূক্ষ্মমনেও একটা অভিমান তোমার বুদ্ধিতে এসে যাচ্ছে। দুটোই তুমি ত্যাগ কর। স্বামীজী একটা কবিতায় বলছেন, এই আমি যেন গর্জে গর্জে উঠছে। বাস্তবিক আমার দেহ, আমার জাতি, আমার দেশ, আমার সমাজ, সবকিছুকে উপলক্ষ করে এই আমি যেন গর্জে গর্জে উঠছে, এর থেকে নিস্তার নেই। এই যে ক্ষুদ্র অভিমান,

বা আমিত্ব—এটাই আমাদের বন্ধন। 'ত্যজ অভিমানং'; যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুকে 'আমি' মনে করতে পারি তাহলেই আমি মুক্ত। স্বামীজী একটা সুন্দর কথা বলেছেন। বলছেন, এই যে জীব, এর পরিধিটা বিরাট কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে দেহ। আর ঈশ্বর বা ব্রহ্ম, তাঁরও পরিধির শেষ নেই, অনন্ত, কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু সর্বত্র আছে। তিনি সর্বব্যাপী, সকলের মধ্যে আছেন, তাই এই কথা বলছেন। 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ' (শ্বে, ৬।১১)। আর জীব, তার পরিধিটা বিরাট কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে দেহ, কারণ জীব আত্মকেন্দ্রিক আর দেহটাকেই সে আমি মনে করে। দেহ মানে স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ দুই-ই। এই অভিমান ত্যাগ কর, এগুলো সব বুদ্ধিকল্পিত। তোমার স্থূল-শরীর, সূক্ষ্ম-শরীর, এসবে তুমি অভিমান করছ কিন্তু তুমি জেনে রেখো এগুলি সব তোমার বুদ্ধির কল্পনা, এগুলিতে অভিমান ত্যাগ কর। করে কি করব? 'কালত্রয়-অবাধ্যম্-অখণ্ডবোধম্ জ্ঞাত্বা স্বম্-আত্মানং উপৈহি শান্তিম্'। 'কালত্রয়-অবাধ্যম্-অখণ্ডবোধম্'—এই যে আমি দেহ আশ্রিত হয়ে গেলাম, এক টুকরো দেহের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখলাম, অমনি আমি খণ্ডিত হয়ে গেলাম। বলছেন, তুমি অখণ্ড। তোমার বোধ, তোমার জ্ঞান খণ্ডিত নয়, অখণ্ড। তুমি সর্বব্যাপী, তুমি 'কালত্রয়-অবাধ্যম্'—ত্রিকাল অবাধিত, কাল তোমায় বাধা দিতে পারে না। তুমি অতীতে ছিলে, বর্তমানে আছ, ভবিষ্যতে থাকবে। অর্থাৎ তুমি নিত্য, তুমি স্থানকালের উর্ধ্বে। 'জ্ঞাত্বা স্বম্-আত্মানম্-উপৈহি শান্তিম্'—এটা জেনে অর্থাৎ নিজের আত্মাকে অখণ্ড-জ্ঞানস্বরূপ, ত্রিকাল-অবাধিত বলে জেনে তুমি শান্তি লাভ কর। শান্তিতে উপনীত হও। আমরা শান্তি শান্তি করি, কিন্তু আত্মজ্ঞান না হলে শান্তি হয় না। আমি কে, এটা না জানলে সত্যি সত্যি আমাদের শান্তি হয় না। যতক্ষন স্থানকালের মধ্যে আমরা বদ্ধ হয়ে থাকব ততক্ষণ শান্তি হবে না। বলছেন, 'কালত্রয়-অবাধ্যম্-অখণ্ডবোধম্'—এই তিন কাল তোমায় বাঁধতে পারে নি। তুমি অখণ্ডবোধ, জ্ঞানস্বরূপ, এটা যখন জানবে তখন শান্তি লাভ করবে।

ত্যজাভিমানং কুলগোত্রনামরূপাশ্রমেষ্বার্দ্রশবাশ্রিতেষু।
লিঙ্গস্য ধর্মানপি কর্তৃত্বাদীংস্ত্যক্ত্বা ভবাখণ্ড সুখস্বরূপঃ ॥ ২৯৭

অন্বয় : আর্দ্র-শবাশ্রিতেষু (আর্দ্র শবতুল্য দেহকে আশ্রয় করে বর্তমান) কুল-গোত্র-নাম-রূপ-আশ্রমেষু (কুল-গোত্র-নাম-রূপ-আশ্রম ইত্যাদিতে) অভিমানং ত্যজ (অভিমান ত্যাগ কর)। লিঙ্গস্য-অপি ধর্মান্ (আবার লিঙ্গ-শরীরের যেসব ধর্ম) কর্তৃত্ব-আদীন্-ত্যক্ত্বা (কর্তৃত্ব ইত্যাদি ত্যাগ করে) অখণ্ড সুখস্বরূপ ভব (তোমার স্বরূপ যে অখণ্ড সুখ, তুমি তাই হও)।

সরলার্থ : আর্দ্রগলিত শবের মত তোমার এই যে দেহ সেই দেহ আশ্রয় করে কুল-গোত্র-নাম-রূপ-আশ্রম ইত্যাদিতে যে অভিমান রয়েছে সেই অভিমান ত্যাগ কর।

আর তোমার লিঙ্গ-শরীরের ধর্ম যে কর্তৃত্ব ইত্যাদি তাও ত্যাগ করে তুমি যে অখণ্ড সুখস্বরূপ সত্তা তাই হও।

ব্যাখ্যা : আবার সেই একই কথা বলছেন যে, স্থূলদেহ ও লিঙ্গশরীর দুটোতেই অভিমান ত্যাগ করতে হবে। 'ত্যজ-অভিমানং কুলগোত্রনামরূপাশ্রমেষু-আর্দ্র-শবাশ্রিতেষু'—এই দেহটা মরা গলিত শবের মত। একে আশ্রয় করে যে কুল-গোত্র-আশ্রম ইত্যাদির অভিমান, সেটা ত্যাগ কর। দেহের প্রতি আমাদের যে দুর্বার আকর্ষণ সেটা যাতে নষ্ট হয়ে যায় সেইজন্যে দেহটাকে আর্দ্র শব বলছেন। দেহ আজ একরকম আছে কাল আর একরকম হচ্ছে। এটা জড়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এটা যেন একটা পচে যাওয়া শবের মত আমাদের আত্মাকে আবৃত করেছে, আর আমি এর ওপর কুল-গোত্র-নাম-রূপ-আশ্রম ইত্যাদি অধ্যাস চাপিয়ে সেই অধ্যাসগুলোতেই অহংবুদ্ধি করে বসে আছি। আবার আমাদের লিঙ্গ-শরীর আছে যেটাকে সূক্ষ্ম-শরীর বলি। সেটাও জড়, কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের এই স্থূল দেহটা ভোগ-আয়তন, যা ভোগ করতে চাই তার সমস্ত ব্যবস্থা এই দেহটার মধ্যে আছে। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর যেটা, সেটাতে মন, অহংকার, কর্ম, সংস্কার এইসব আছে। মরে গেলে স্থূলশরীরটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরটা থাকে। বলছেন, 'ত্যজ অভিমানং কুল-গোত্র-নাম-রূপ-আশ্রমেষু-আর্দ্রশবাশ্রিতেষু'—এই আর্দ্রশবের মত দেহ আশ্রয় করে যেসব কুল-গোত্র-নাম-রূপ-আশ্রম ইত্যাদির অধ্যাস চাপিয়েছ সেগুলোতে অভিমান ত্যাগ কর। আর 'লিঙ্গস্য ধর্মান্-অপি-কর্তৃত্ব-আদীন্-ত্যক্ত্বা ভব-অখণ্ডসুখস্বরূপ'; আর তোমার যে লিঙ্গশরীর, যেটা তুমি দেখতে পাও না, সেটাতে তোমার সংস্কার অনুযায়ী কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি ভাব রয়েছে। আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, এইসব ভাব রয়েছে। সেই কর্তৃত্ব ইত্যাদির ভাব ত্যাগ করে তুমি অখণ্ড সুখস্বরূপ হও। তোমার স্বরূপটা তো সৎ-চিৎ-আনন্দ, এইটা তুমি সব সময় মনে রেখো। তুমি অখণ্ড সুখস্বরূপ। সুখ, আনন্দ, এ যদি দেহকে আশ্রয় করে তাহলে সেই সুখ সাময়িক। আমার যদি অসুখ করে তাহলে হয়তো আমি খেতে পারব না, নানারকম দেহের যন্ত্রণায় মনটা আমার বিষণ্ন হয়ে থাকবে। কিন্তু এই দেহ ও মন, এর উর্ধ্বে যদি থাকতে পারি, তাহলে সব সময় আমার আনন্দ। আমি সৎ-চিৎ-আনন্দ—আমার জ্ঞানও আছে, আনন্দও আছে। আর এটা আমার দেহের ওপর নির্ভর করে না, মনের ওপর নির্ভর করে না, কিছুর ওপর নির্ভর করে না। এটা আমার স্বভাব, স্বতঃসিদ্ধ। তাই বলছেন, তুমি সূক্ষ্মশরীরের ওপর, মনের ওপর, এই যে 'আমি পণ্ডিত', 'আমি ধনী' এইসব ভাব চাপিয়েছ এগুলো 'ত্যক্ত্বা ভব-অখণ্ড সুখস্বরূপঃ'—এইসব কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব ভাব ত্যাগ করে তোমার যে অখণ্ড সুখস্বরূপ স্বভাব, তাই হয়ে যাও। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে 'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখম্ অস্তি'। (ছা, ৭।২৩।১) তোমার যে স্বরূপ সেই ভূমাকে জানলে তবে তোমার সুখ লাভ হবে। ছোট কিছুতে তোমার সুখ নেই।

যতক্ষণ দেহ-মনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবে ততক্ষণ তোমার যে আনন্দস্বরূপ সত্তা সেখানে তুমি পৌঁছতে পারবে না। দেহ-মনে অহংভাব ফেলে দাও, 'ভব-অখণ্ডসুখস্বরূপঃ'।

সন্ত্যন্যে প্রতিবন্ধাঃ পুংসঃ সংসারহেতবঃ দৃষ্টাঃ।
তেষামেব মূলং প্রথমো বিকারো ভবত্যহংকারঃ॥২৯৮

অন্বয়: পুংসঃ (পুরুষের) সংসারহেতবঃ (সংসার-বন্ধনের কারণস্বরূপ) অন্যে প্রতিবন্ধাঃ (অন্য অনেক প্রতিবন্ধক) দৃষ্টাঃ সন্তি (দেখা যায়) তেষাম্ মূলং (সেসবের মূল) ভবতি (হচ্ছে) প্রথমঃ বিকারঃ (প্রথম বিকার) অহঙ্কারঃ (অহংকার)।

সরলার্থ: জীবের সংসার-বন্ধনের কারণরূপে অন্য আরও অনেক প্রতিবন্ধক দেখতে পাওয়া যায়। সেসবের মূল হচ্ছে প্রথম বিকার অহঙ্কার।

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে বললেন, স্থূল আর সূক্ষ্ম শরীরে আমাদের যে অহংবুদ্ধি সেটাই আমাদের স্বরূপজ্ঞান হতে দিচ্ছে না। এখন বলছেন, এদুটো তো আছেই, এছাড়াও অন্য প্রতিবন্ধক আছে। কিন্তু সবকিছুর মূল হচ্ছে অহংকার। বলছেন, এই বিকারটা ত্যাগ কর, আমিরূপ বিকার, এটা ত্যাগ কর। 'সন্তি-অন্যে প্রতিবন্ধাঃ', 'প্রতিবন্ধাঃ' অর্থাৎ বাধা। স্থূল-দেহ সূক্ষ্ম-দেহ এ দুটো বাধার কথা বলেছেন, কিন্তু আরও অনেক বাধা আছে। 'পুংসঃ সংসার -হেতবঃ দৃষ্টাঃ'; কেন সংসার হয়? কেন জন্ম-মৃত্যু ঘটে? কেন স্বরূপজ্ঞান হতে চায় না ? এই বাধাগুলোর জন্যে। এই যে সংসার, এই সংসার সংসার করে যেন একটা জাল সৃষ্টি করেছি—যেমন গুটিপোকা নিজের লালা দিয়ে একটা জাল সৃষ্টি করে আর সেই জালের মধ্যে সে বদ্ধ থাকে, সেখানেই তার মৃত্যু। আমরা তেমনি অহংতা আর মমতা দিয়ে একটা জাল সৃষ্টি করেছি। অহংতা আর মমতা নিয়েই আমাদের সংসার। আমরা এক একজন যেন এক একটা দ্বীপ। এই দ্বীপের মধ্যে এক একজন বাস করছি, এক একটা দ্বীপ পাঁচিল তুলে আলাদা করেছি, নিজেকে একটা সীমার মধ্যে পৃথক করে রেখেছি। এই নিয়ে আমাদের সংঘর্ষ, আমার দ্বীপের মধ্যে কেউ এলেই আমি ফোঁস করব। এমনি করে একটা জগৎ সৃষ্টি করেছি, সেখানে বদ্ধ হয়ে থেকে মনে করছি খুব ভালো আছি। স্বামীজী একটা বক্তৃতায় বলছেন এই মুক্তির কল্পনার কথা। পাশ্চাত্যদেশের ওরা ভাবছে, কি? মুক্ত হব মানে দেহ থেকে আমি আলাদা হয়ে যাব? আমি মরে যাব? স্বামীজী বলছেন, না, এ মৃত্যু নয়। এ হলো অমর হয়ে যাওয়া, অমৃতত্ব লাভ করা। কিরকম জান? একটা জলবিন্দু সে সিন্ধুর মধ্যে পড়ছে, আমাকে বাঁচাও বাঁচাও বলছে, সে ছোট ছিল বড় হতে যাচ্ছে, সে ক্ষুদ্র ছিল ভূমা হতে চলেছে, খণ্ড ছিল অখণ্ড হচ্ছে, কিন্তু সে আর্তনাদ করছে, বাঁচাও, বাঁচাও।

এ-ও তাই। সব সময় ছোট একটা আয়তনের মধ্যে, দেহের মধ্যে থেকে মানুষ মনে করছে সে বেশ ভালো আছে—দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাব? ওরে বাবা, সেরকম মুক্তি চাই না। এই আমাদের অবস্থা। এই অভিমান থেকে কত যে কষ্ট পাই তা ভেবে পাওয়া যায় না। বলছেন, দেখো যতগুলি প্রতিবন্ধ আছে 'তেষাম্ মূলং', তাদের মধ্যে মূলটা 'প্রথমঃ বিকারঃ ভবতি অহঙ্কারঃ'—আমাদের প্রথম বিকার অহঙ্কার। আমার যখন মৃত্যু হলো, আমার দেহ তো চলে গেলো আমার আমিত্ব কিন্তু রইল। আমি সেই আমিত্ব, বাসনা, কর্ম ইত্যাদি পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে চললাম, আমিত্ব আছে বলে আবার জন্ম হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলছেন, আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। তা এই আমিত্বের সৃষ্টিটা কি করে হলো? ধরা যাক cosmos, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে; আকাশ আছে, বাতাস আছে, তেজ, অগ্নি, উত্তাপ আছে, জল আছে, মাটি আছে, এরা সব সাম্য অবস্থায় আছে, তারপর একটা বিক্ষেপ হলো , তখন এই পঞ্চভূত একটা আর একটার সঙ্গে মিশতে থাকলো, permutation, combination, এরকম হয়ে সৃষ্টি হলো। তারপর হঠাৎ এক অহঙ্কার, cosmic অহঙ্কার, বিশ্বজোড়া 'অহং', তাঁকে আমরা ঈশ্বর বলি, ব্রহ্মা বলি, হিরণ্যগর্ভ বলি, একটা individualization in cosmic sense, তৈরী হলো। তখনও এক, তারপর তিনি বললেন আমি বহু হব আর তাঁর শরীর থেকে যেন আমরা সব এক-একটা, খণ্ড খণ্ড অভিমান নিয়ে, নামরূপ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঐ cosmic (বিশ্বজনীন) নাম আর রূপ খণ্ড খণ্ড হয়ে বিভিন্ন নাম আর রূপ নিয়ে প্রকাশ হলো। তাই বলছেন, 'প্রথমঃ বিকারঃ ভবতি অহঙ্কারঃ', এই অহঙ্কারটা আমাদের দূর করতে হবে। আমাদের এই অহঙ্কার থেকে, 'আমি আমি' ভাব থেকে অসংখ্য বিকার আসছে। আমাদের এত সব কামনা-বাসনা এসব ওই অহংবুদ্ধি থেকে। আমি যদি জানতে পারি এই আমিই সব হয়েছে, আমি ছাড়া আর কিছু নেই তাহলে তো আমার আর কিছু পাবার থাকে না। আমরা যদি একটা খালি কলসী পুকুরের জলে ডুবিয়ে দিই, তাহলে তার ভেতরেও জল, বাইরেও জল, অন্তঃপূর্ণ, বহিঃপূর্ণ। যতক্ষণ ঘটটা আছে ততক্ষণ 'অন্যঃ অসৌ অন্যঃ অহম্' (বৃ, ১।৪।১০)—আমি অন্য আবার বাইরে আর সবাই অন্য, অর্থাৎ অন্য সকলের থেকে আমি আলাদা, এই ভাব। ঘটটা ভেঙে দিলেই সব একাকার হয়ে গেলো। এই নামরূপের একটা পৃথক সত্তা, এই নিয়ে আমরা আলাদা হয়ে আছি। ঘটটা ভেঙে দিলেই পুকুরের যে অখণ্ড জল তাই থাকবে। আমাদের দেহটা যেন ঐ ঘট। দেহতে আমি বলে অভিমান করছি বলেই আমাদের সব ঝঞ্ঝাট। এই আমি-বোধটা সরিয়ে দাও।

যাবৎ স্যাৎ স্বস্য সম্বন্ধোঽহংকারেণ দুরাত্মনা।
তাবন্ন লেশমাত্রাপি মুক্তিবার্তা বিলক্ষণা॥ ২৯৯

অন্বয়: দুরাত্মনা অহঙ্কারেণ (দুরাত্মা অহঙ্কারের সঙ্গে) যাবৎ (যতক্ষণ) স্বস্য (নিজের)

সম্বন্ধঃ স্যাৎ (সম্পর্ক থাকবে) তাবৎ (ততক্ষণ) বিলক্ষণা মুক্তিবার্তা (দুর্লভ মুক্তির সংবাদ) লেশমাত্র-অপি ন (একটুও পাওয়া যাবে না)।

সরলার্থ: যতক্ষণ দুরাত্মা অহঙ্কারের সঙ্গে একটা আত্মকেন্দ্রিক সম্বন্ধ থাকবে ততক্ষণ আশ্চর্য মুক্তির খবর কিছুমাত্র পাওয়া যাবে না।

ব্যাখ্যা: বলছেন, এই অহঙ্কার দুরাত্মা একে জয় করা কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, থাক শালা আমি দাস আমি হয়ে। তোমার যে সত্যিকারের আমি তাকেই ভগবান বলছ। যাঁকে তুমি ইষ্ট বলছ অর্থাৎ যে রূপ তুমি ভালোবাস, তুমি মনে করছ তিনি বাইরে আছেন, কিন্তু তা নয়, তিনি তোমার মধ্যেই আছেন। তুমি যদি নিজেকে তাঁর দাস মনে কর আর সর্বদা তাঁর সেবায় রত থাক তাহলে অনুক্ষণ তাঁর চিন্তায় তুমি তাঁর মতই হয়ে যাবে, তোমার যে কাঁচা আমি, যে আমি তোমায় খণ্ডিত করেছে তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী, তুমি যেমন ভাববে তুমি তেমনি হবে। যা মতি সা গতি, তোমার মন যাতে তাতেই তুমি পৌঁছবে। বলছেন 'যাবৎ স্যাৎ স্বস্য সম্বন্ধঃ অহঙ্কারেণ দুরাত্মনা' —যতক্ষণ দুরাত্মা অহঙ্কারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে 'তাবৎ ন লেশমাত্র-অপি মুক্তিবার্তা বিলক্ষণা'—ততক্ষণ মুক্তির কোনও বার্তা লেশমাত্রও পাওয়া যায় না, মুক্তির কোনও আশাই নেই। মুক্তি একটা অত্যন্ত আশ্চর্য জিনিস। কিন্তু 'আমি' থাকলে মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। বলছেন, এই অহঙ্কার দুরাত্মা, দুষ্টু; নিজেকে কেন্দ্র করে যতক্ষণ এই দুরাত্মা অহঙ্কারটা থাকবে 'তাবৎ ন লেশমাত্র -অপি মুক্তিবার্তা বিলক্ষণা'—ততক্ষণ মুক্তির কোনও বার্তাই পাওয়া যাবে না। মুক্তি হবেই না। তাহলে বাধাটা কোথায়? এই 'আমি'। আমি অমুকের ছেলে, আমি অমুক জায়গায় চাকরি করি, আমার কত প্রতিষ্ঠা, এইসব আমি-কেন্দ্রিক অভিমান যতদিন থাকবে ততদিন তোমার মুক্তি হবে না। বলছেন, 'তাবৎ ন লেশমাত্র-অপি মুক্তিবার্তা'—মুক্তির কথা ওঠেই না যতক্ষণ তোমার মধ্যে অহঙ্কার রয়েছে। বলছেন, 'মুক্তি বিলক্ষণা'— দুর্লভ, একটা দুর্লভ জিনিস, এ তুমি সহজে পাবে না। তোমার মধ্যে এই আমি লেশমাত্র থাকলে তোমার মুক্তির কোনও সম্ভাবনাই নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ছুঁচের মধ্যে সুতো পরাতে চাইছ কিন্তু সুতোয় একটুও ফেঁসো থাকলে সেটা পারবে না। সেইরকম লেশমাত্র অহঙ্কার থাকলে মুক্তি হবে না।

অহঙ্কারগ্রহান্মুক্তঃ স্বরূপমুপপদ্যতে।
চন্দ্রবদ্বিমলঃ পূর্ণঃ সদানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ।। ৩০০

অন্বয়: অহঙ্কার-গ্রহাৎ মুক্তঃ (অহঙ্কারের গ্রাস থেকে মুক্ত) চন্দ্রবৎ (রাহুগ্রাসমুক্ত চন্দ্রের মতো) বিমলঃ পূর্ণঃ সদানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ (বিমল, পূর্ণ, সদানন্দ, স্বয়ংজ্যোতি) স্বরূপম্ উপপদ্যতে (স্বরূপ প্রকাশ হয়)।

সরলার্থ: অহঙ্কারের গ্রাস থেকে মুক্ত হলে নিজের স্বরূপ রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মতো বিমল সৌন্দর্যে নিজের প্রভায় জ্যোতিষ্মান সদানন্দ রূপে প্রকাশ হন।

ব্যাখ্যা: বলছেন, এই যে অহঙ্কার এ কি রকম জান? চন্দ্রগ্রহণ হয়, রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে। আমাদের অহঙ্কার ওই রাহুর মতো আমাদের গ্রাস করেছে। রাহু যখন চন্দ্রকে সবটা গ্রাস করে তখন অন্ধকার, দেখতে পাই না, আলো আর নেই। আমাদের গ্রাস করে রেখেছে ওই দুরাত্মা অহঙ্কার, অজ্ঞানের অন্ধকারে রেখেছে। এই যে 'অহং' বলে একটা পদার্থ, যাকে কেন্দ্র করে দেহ, মন, বুদ্ধি, আমার আত্মীয়, আমার পরিবার, আমার সমাজ, এমনি করে যেন একটা সাম্রাজ্য তৈরী করেছি, এইটা ছাড়তে হবে, এই 'আমি আমার' ভাবটা ছাড়তে হবে। কথামৃততে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, নাহং, নাহং, তুঁহুঁ, তুঁহুঁ। 'আমি নই, তুমি'। আমি ভাবছি আমি করছি, আসলে তিনি করছেন। আমরা পুতুল নাচ দেখি, পুতুলের পেছনে দড়ি বাঁধা আছে, একজন সেই দড়ি টেনে তাদের নাচাচ্ছে, তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। এ-ও ঠিক তাই। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সকলের ভেতরে থেকে আমিই তাদের চালাচ্ছি। এইটাই সত্যিকারের আমি, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, পাকা আমি। আমি যখন নিজেকে আলাদা করে 'আমি' বলছি সেটা কাঁচা আমি, মিথ্যা আমি। সেই আমিই সত্য, যে আমি সকলের আমি। বেদান্ত এই কথাটাই বোঝাতে চাইছেন। তুমি ছোট নও, তুমি বড়, তুমি এই দেহে সীমাবদ্ধ নও, তুমি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত। এইটাই বুঝতে হবে। বলছেন, 'অহঙ্কারগ্রহাৎ-মুক্তঃ'—অহঙ্কাররূপ গ্রহ থেকে মুক্ত; গ্রহ শব্দের দুটো অর্থ আছে। একটা যেমন আমরা গ্রহণ বলি, গ্রাস; আর একটা হচ্ছে মুঠো, যেন আমাদের মুঠোর মধ্যে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, আমরা স্বাধীন নই। যদি গ্রহকে রাহু মনে করি, তাহলে রাহু যেন আমাদের গ্রাস করেছে, আবার গ্রহণ বলতে যদি মনে করি যেন আমাদের হাত দিয়ে গ্রহণ করেছে, তাহলেও মানে হচ্ছে আমাদের ধরে রেখেছে। 'অহঙ্কারগ্রহাৎ-মুক্তঃ'; এই অহঙ্কারের হাত থেকে কোনও রকমে যদি পালাতে পারি। কেটে ফেলতে হবে এই অহঙ্কারকে, সেটা পারলে আমার স্বরূপ জানতে পারব। তার মানে আমার যদি চিত্তশুদ্ধি হয়, যে অহঙ্কারের জন্যে নিজেকে সকলের থেকে পৃথক ভাবছি, সেটা যদি চলে যায় তাহলে 'স্বরূপম্-উপপদ্যতে', আমি আমার স্বরূপকে জানতে পারব। স্বরূপ লাভ করলে কিরকম হবে? তোমার অহঙ্কাররূপ রাহুর গ্রাস থেকে তুমি মুক্ত হয়েছ—কাজেই চন্দ্র রাহুর গ্রাস থেকে মুক্ত হলে যেমন উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র হয়ে প্রকাশ পায়, তুমি সেই রকম উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ হবে। 'চন্দ্রবদ্বিমলঃ', চন্দ্র যখন রাহুর গ্রাসে থাকে তখন সে 'বিমলঃ' নয়; তখন চন্দ্রকে দেখলে দুঃখ হয়, তারপর যখন রাহুর গ্রাস থেকে চন্দ্র মুক্ত হলো,

তখন চন্দ্র 'বিমলঃ', সুন্দর, মুক্ত, পবিত্র। স্বরূপজ্ঞান হলে আমি সেরকম হব। আর কি হব ? 'পূর্ণঃ'। আমরা তো এখন পূর্ণ নই, অপূর্ণ; সব সময় আমাদের একটা অভাববোধ; একটা void, একটা অপূর্ণতা; কিসের যে অভাব, কেনই বা অভাব—বুঝতে পারি না। গীতাতে বলছেন—যা পেলে সব পাওয়া হয়ে যাবে—অর্থাৎ নিজেকে যদি পাই, নিজেকে যদি জানি, নিজেকে যদি চিনি, তাহলে আর অভাববোধ থাকবে না। আমরা এখন নিজেকে জানি না, চিনি না। তাই একটা অভাববোধ—কি যেন চাইছি, কি যেন পাইনি—সব সময় আমাদের মধ্যে রয়েছে। পূর্ণতার অনুভূতি আমাদের নেই। ইংরেজি একটা কবিতায় আছে, having nothing have all—কিছু নেই, তবু যেন সব পেয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তো তা-ই দেখি, কিছুই নেই তবু কত আনন্দ, সব সময় আনন্দে পূর্ণ হয়ে আছেন—পূর্ণকাম, আপ্তকাম, আত্মকাম। বলছেন, 'পূর্ণঃ সদানন্দঃ'; আমরা এবেলায় যদি আনন্দ করি তো ওবেলায় দুঃখ। আমাদের স্বভাবই আনন্দ, কিন্তু আমরা সদানন্দ থাকতে পারি কই? আমাদের আনন্দ বস্তুনির্ভর, তাই পারি না। কিন্তু একবার নিজেকে জানলে 'সদানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ' হতে পারি আমরা। তিনি স্বয়ং প্রকাশ, নিজের আলোয় আলোকিত, স্বয়ংপ্রভঃ, স্বয়ংভূঃ। কেউ তাঁকে সৃষ্টি করেনি, 'কেবলঃ', একা, অথচ সব। বলছেন, তোমার যখন অহঙ্কার চলে যাবে তখন তোমার মধ্যে যে জ্ঞান আছে সেটা ফুটে উঠবে। তুমি পূর্ণ হবে। ওইরকম বিমল হবে আর দেখবে তুমি স্বয়ংপ্রভ। তোমার মধ্যে যে জ্ঞান, তোমার মধ্যে যে আলো, তা কোনও কিছুর ওপর নির্ভর করে নেই। তুমি স্বাধীন, স্বতন্ত্র, একা—একম্-এব-অদ্বিতীয়ম্।

যো বা পুরে সোঽহমিতি প্রতীতো বুদ্ধ্যা প্রক্লৃপ্তস্তমসাতিমূঢ়য়া।
তস্যৈব নিঃশেষতয়া বিনাশে ব্রহ্মাত্মভাবঃ প্রতিবন্ধশূন্যঃ ॥ ৩০১

অন্বয়: যঃ বা (যে বস্তু) অতিমূঢ়য়া তমসা বুদ্ধ্যা (অত্যন্ত নির্বোধের তমোগুণে আবৃত বুদ্ধির দ্বারা) প্রক্লৃপ্তঃ (উৎপন্ন) সঃ (সেই বস্তু) পুরে (এই দেহাদিতে) অহম্-ইতি প্রতীতঃ ('আমিই এই', এরকম ধারণা সম্পন্ন) তস্য এব (সেই অহঙ্কারের) নিঃশেষতয়া বিনাশে (নিঃশেষে বিনাশ হলে) প্রতিবন্ধশূন্যঃ ব্রহ্ম-আত্মভাবঃ (ব্রহ্মই আত্মা এই ভাব অবাধিত হয়)।

সরলার্থ: যে বস্তু নির্বোধ ব্যক্তির তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধির দ্বারা উৎপন্ন সেই অহং এই দেহাদিতে 'এইটাই আমি', এরকম ধারণা করে রেখেছে। সেই অহঙ্কারের নিঃশেষে বিনাশ হলে ব্রহ্মই আত্মা এই ভাব বিনা বাধায় পরিস্ফুট হয়।

ব্যাখ্যা: বলছেন, এই শরীরটাকে তুমি 'আমি' মনে করছ, অজ্ঞতার জন্যে একে আমি মনে করে কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু যদি এই অজ্ঞান নিঃশেষে দূর করতে পার তাহলে তুমি জানতে পারবে তুমিই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মাত্মভাবের অনুভব তোমার অবাধিত হবে। তুমি ব্রহ্ম এটা তুমি মনে রেখো। যদি প্রতিবন্ধ না থাকে, যদি বাধা না থাকে তো জ্ঞান তোমার আপনা-আপনি ফুটে উঠবে। তোমার জ্ঞান তো চিরকালই রয়েছে। যেমন চন্দ্র সব সময় রয়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে আমরা চন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছি না, কিছুক্ষণের জন্যে চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হয়েছে। আকাশে মেঘ করেছে, কিছুক্ষণের জন্যে সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি না, মেঘ সরে গেলেই আবার দেখতে পাব। পরিষ্কার জলের ওপর শেওলা পড়েছে, শেওলাটা সরিয়ে দিলেই পরিষ্কার জল দেখতে পাব। তেমনি প্রতিবন্ধ যেটা রয়েছে সেটা দূর করতে হবে। আমার অজ্ঞানটাই প্রতিবন্ধক। স্বামীজী বলছেন, তুমি কি হাত জোড় করে বলবে, হে অন্ধকার, হে অজ্ঞতা, হে নির্বুদ্ধিতা, হে মূর্খতা, তুমি সরে যাও? কিছু করবে না? করতে হবে তোমাকে। আমাদের অজ্ঞতা দূর হবে কি করে? জ্ঞানের দ্বারা। অন্ধকার দূর হবে কি করে? আলোর দ্বারা। সেই আলোটা কি? আমার স্বরূপজ্ঞান। এই স্বরূপজ্ঞান হলে আমার অজ্ঞান চলে যাবে। এই স্বরূপজ্ঞানের প্রতিবন্ধক কি? অহঙ্কার। অহঙ্কার চলে গেলেই আমার স্বরূপজ্ঞান আপনি প্রকাশ হবে। চন্দ্র যেমন সব সময় আছেন, শুধু সাময়িকভাবে রাহুগ্রস্ত হয়েছিলেন, আমরাও তেমনি সাময়িকভাবে, আমাদের মূঢ়তার জন্যে এই দেহটাকে আমি মনে করছি। এই মূঢ়তা, এই অজ্ঞান আমায় দূর করতে হবে। তাই বলছেন, 'যঃ বা পুরে সঃ-অহম্-ইতি প্রতীতঃ'। প্রতীতি মানে বিশ্বাস, ধারণা। আমার ধারণাটা কি? এই 'পুর' বা শরীরটাই আমি। আমি আমাকে এই শরীরের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি। 'বুদ্ধ্যা প্রক্লৃপ্তঃ'—আমার বুদ্ধিতে এইরকম ধারণা উৎপন্ন হচ্ছে, 'তমসা-অতি মূঢ়য়া'—অতি মূঢ়তার জন্যে, 'তমসা'—অন্ধকারের জন্যে অর্থাৎ অজ্ঞানের জন্যে। একটা দড়ি পড়ে আছে তাকে সাপ ভাবছি অন্ধকারের জন্যে; অন্ধকার যাবে কি করে? আলোর দ্বারা। অজ্ঞান যাবে জ্ঞানের আলোয়। জ্ঞানের দীপ যদি জ্বালতে পারি তাহলে অজ্ঞান চলে গিয়ে আমার স্বরূপ প্রকাশিত হবেন। 'যঃ বা পুরে সঃ-অহম্-ইতি প্রতীতঃ বুদ্ধ্যাঃ প্রক্লৃপ্তঃ তমসা অতি মূঢ়য়া'; আমার মধ্যে এই যে একটা প্রতীতি হচ্ছে, দেহটাকে আমি মনে করছি, এটা ভুল, ভ্রান্তি। এই ভুলটা উৎপন্ন হচ্ছে আমার অজ্ঞানের জন্যে, মূঢ়তার জন্যে। 'তস্য-এব নিঃশেষতয়া বিনাশে', একে যদি নিঃশেষে দূর করতে পারি তাহলে কি হবে? 'ব্রহ্ম-আত্মভাবঃ প্রতিবন্ধশূন্যঃ', তখন আমিই যে ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, এটা আমি জানতে পারব। 'প্রতিবন্ধশূন্যঃ', আর তো কোনও বাধা নেই, রাহু সরে গেছে, তখন আমি 'স্বয়ংপ্রভঃ', আমি 'পূর্ণঃ', আমি 'বিমলঃ সদানন্দঃ'। নিজের এই স্বরূপটা আমি তখন দেখব, জানব। স্বামীজী একটা খুব সুন্দর কথা বলতেন, each soul is potentially divine, প্রত্যেকের মধ্যে দৈবীসত্তা আছে; সেটা স্ফুটোন্মুখ হয়ে আছে। যদি আমি চেষ্টা করি একটা ফুলের কুঁড়ির মতো সেটা ফুটবে ধীরে ধীরে। স্বামীজী বলছেন, আমার জীবনের উদ্দেশ্যটা কি? ওই দৈবীসত্তাটাকে ফুটিয়ে তোলা,

by work or by worship or by knowledge, নিষ্কাম কর্ম কর বা ঈশ্বরের উপাসনা কর অথবা এই জ্ঞানপথে চল। অনন্ত শক্তি আমাদের মধ্যে রয়েছে, সেটা জানতে হবে। কোনও রকমে সেই শেওলা যেটা জলের ওপরে পড়েছে, সেটা সরিয়ে দিলেই অমৃতবারি। বলছেন, ওই যে তোমার অহঙ্কার, ঐ প্রতিবন্ধটা সরিয়ে দিলেই তুমিই ব্রহ্ম—তোমার 'ব্রহ্ম-আত্মভাব' জেগে উঠবে। তখন শুধু আনন্দ। এত আনন্দ যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না।

ব্রহ্মানন্দনিধির্মহাবলবতাহংকারঘোরাহিনা
সংবেষ্ট্যাত্মনি রক্ষ্যতে গুণময়ৈশ্চণ্ডৈস্ত্রিভির্মস্তকৈঃ।
বিজ্ঞানাখ্যমহাসিনা শ্রুতিমতা বিচ্ছিদ্য শীর্ষত্রয়ং
নির্মূল্যাহিমিমং নিধিং সুখকরং ধীরোঽনুভোক্তুং ক্ষমঃ॥ ৩০২

অন্বয়: মহাবলবতা-অহংকার-ঘোর-অহিনা (অহংকাররূপ মহা বলবান ভয়ঙ্কর সর্পের দ্বারা) গুণময়ৈঃ চণ্ডৈঃ ত্রিভিঃ মস্তকৈঃ (সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময় তিনটি ভয়ানক মস্তকের সহায়) ব্রহ্মানন্দনিধিঃ (ব্রহ্মানন্দরূপ রত্ন) সংবেষ্ট্য (বেষ্টন করে) আত্মনি রক্ষ্যতে (নিজের কাছে রক্ষা করছে) ধীরঃ (বিবেকী পুরুষ) বিজ্ঞানাখ্য মহা-অসিনা (জ্ঞান বিচার নামক মহা খড়গের দ্বারা) শ্রুতিমতা (শ্রুতির নির্দেশ অনুযায়ী) শীর্ষত্রয়ং বিচ্ছিদ্য (তিনটি মস্তক ছিন্ন করে) ইমম্-অহিম্ (এই সর্পকে) নির্মূল্য (নির্মূল করে) সুখকরং নিধিং (সুখকর রত্ন) অনুভোক্তুং ক্ষমঃ (ভোগের অধিকারী হন)।

সরলার্থ: অহঙ্কার যেন অত্যন্ত বলবান এক ভয়ঙ্কর সর্পের মতো। এই সর্পের তিনটি ভয়ানক মাথা, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। তার দ্বারা এ ব্রহ্মানন্দ-রূপ অমূল্য রত্নকে বেষ্টন করে নিজের কাছে রেখে রক্ষা করছে। বিবেকী পুরুষ বিজ্ঞান নামক মহান অসির দ্বারা শ্রুতি নির্দেশিত উপায়ে এর তিনটি মাথা ছিন্ন করে এই সর্পকে নির্মূল করে ফেলে ও সুখকর ব্রহ্মানন্দরূপ মহামূল্য রত্ন ভোগ করতে সক্ষম হন।

ব্যাখ্যা: বলছেন, তোমার মধ্যে কত বড় একটা রত্ন রয়েছে, কিন্তু তুমি তার নাগাল পাচ্ছ না। যেমন, একটা সাপের মাথায় একটা মহামূল্য মণি জ্বলছে, সে সেটা মাথা থেকে নামিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘিরে রেখেছে যাতে কেউ না নিতে পারে। তেমনি তোমার আত্মস্বরূপ মণিকে যেন অহঙ্কার বা অজ্ঞানরূপ সাপ বেড়ে রেখে দিয়েছে। সেটাকে কাটতে হবে, তবে তুমি সেই মণিটা পাবে। বলছেন, 'ব্রহ্মানন্দনিধিঃ-মহাবলবতা-অহংকারঘোর-অহিনা'; অহি—সাপ, সে ব্রহ্মানন্দনিধিকে বেষ্টন করে রেখে দিয়েছে। কি রকম সাপ সেটা? বলবান, ভয়ঙ্কর। তার পরিচয় কি? অহঙ্কার, আমিত্ব, অহংবুদ্ধি। তার জন্যেই ব্রহ্মানন্দ আমার নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। অহঙ্কার মানে ভালো অহঙ্কার নয়, ভালো

অহঙ্কার হচ্ছে যে-আমি সকলের আমি। এ তা নয়। এ হচ্ছে সেই অহঙ্কার যা এই দেহ, মন, বুদ্ধি, এগুলিতে আত্মবুদ্ধি করেছে। যেগুলি অধ্যাস, মিথ্যা, সেগুলিকে সে আমি বলে ভাবছে। এই অহঙ্কাররূপ যে ভয়ঙ্কর সাপ, সে আমার ব্রহ্মানন্দরূপ যে নিধি তাকে ঘিরে রেখে দিয়েছে। 'সংবেষ্ট্য আত্মনি রক্ষ্যতে'; সে খুব ভালো করে ঘিরে তাকে নিজের কাছে আগলে রেখেছে, আমি নাগাল পাচ্ছি না। সেই সাপ আবার তিনটে মাথা দিয়ে আমার ব্রহ্মানন্দনিধিকে আগলাচ্ছে। কি রকম সেই মাথাগুলি ? 'গুণময়ৈঃ চণ্ডৈঃ ত্রিভিঃ মস্তকৈঃ'; ভয়ানক তিনটে গুণময় মস্তকের দ্বারা এই নিধিকে আগলাচ্ছে। 'গুণময়ঃ'—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণসম্পন্ন, এরাই তো আমাদের বন্ধনের কারণ। আমরা মায়াকে বলি ত্রিগুণময়ী, এই তিনটি গুণই আমাদের বন্ধনের কারণ। সত্ত্বগুণ যেন সোনার শেকল কিন্তু স্বামীজী বলছেন, সোনার শেকলও তো শেকল। লোহার হোক আর সোনার হোক, দুরকম শেকলই বাঁধে। এই তিন গুণই বন্ধনের কারণ। তা এই সাপের তিনটি মাথা হল তিনটি গুণ— সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এদের কি করতে হবে? 'বিজ্ঞানাখ্য মহা-অসিনা'—জ্ঞানরূপ মহা অসি দিয়ে। মা কালীর হাতে যেমন খড়গ থাকে, তেমনি জ্ঞানের প্রকাণ্ড একটা খড়গ দিয়ে কচ্‌কচ্‌ করে তার মাথা তিনটে কাটতে হবে। অর্থাৎ আমাদের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই যে তিনটি গুণ, এদের ঊর্ধ্বে যেতে হবে, ত্রিগুণাতীত হতে হবে। 'শ্রুতিমতা'—শ্রুতি বলে দেবে কিভাবে কাটব। জ্ঞান, বিবেক, বিচার দিয়ে কাটতে হবে। শ্রুতির কথা অনুযায়ী 'বিচ্ছিদ্য শীর্ষত্রয়ং'—তিনটি মাথাই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে 'নির্মূল্য অহিম্-ইমম্'—সাপটাকে একেবারে নির্মূল করে দিতে হবে, একটুও রেখে দিলে হবে না। তাহলে 'নিধিং সুখকরং অনুভোক্তুং ক্ষমঃ'—জ্ঞান আমাদের ভেতরেই আছে, অহঙ্কারকে সরিয়ে দিতে পারলেই, মায়ার তিনটে গুণের ঊর্ধ্বে যেতে পারলেই আমাদের ভেতরের স্বরূপজ্ঞান জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠবে। তা যদি করতে পার, তাহলে তোমার মধ্যে যে নিধি বা রত্ন আছে, যা এত সুখকর যে বলে বোঝানো যায় না, যে নিধি কেবল 'ধীরঃ অনুভোক্তুং ক্ষমঃ'—বিবেকী পুরুষরাই অনুভব করতে পারেন, তুমিও তার অধিকারী হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ব্রহ্মানন্দ পেলে বিষয়ানন্দ কি আর ভালো লাগে? অমৃতের আস্বাদ পেলে চিটে গুড় আর ভালো লাগে না।

যাবদ্‌বা যৎকিঞ্চিদ্‌বিষদোষস্ফূর্তিরস্তি চেদ্দেহে।
কথমারোগ্যায় ভবেৎ তদ্‌বদহন্তাপি যোগিনো মুক্ত্যৈ॥ ৩০৩

অন্বয়: যাবৎ (যতদিন পর্যন্ত) দেহে (শরীরে) চেৎ (যদি) যৎ কিঞ্চিৎ (অতি সামান্য মাত্র) বিষদোষ স্ফূর্তিঃ অস্তি (বিষের ক্রিয়া থেকে যায়) কথং (তাহলে কি করে) আরোগ্যায় ভবেৎ (আরোগ্যলাভ হতে পারে) তৎ-বৎ (সেইরকম) অহম্-তা-অপি (অহংভাবও) যোগিনঃ মুক্ত্যৈ (যোগীর মুক্তিলাভের ব্যাপারে)।

সরলার্থ: শরীরে যদি একটুও বিষের ক্রিয়া থেকে যায় তাহলে আরোগ্যলাভ কি করে হতে পারে? তেমনি অহংভাবের লেশমাত্রও যদি থেকে যায় তাহলে যোগীর মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়?

ব্যাখ্যা: আগে বললেন অহঙ্কাররূপ ভয়ঙ্কর সাপ আমার ব্রহ্মানন্দকে আগলে রেখেছে, আমার নাগালের বাইরে করে দিয়েছে। এখন বলছেন, সেই সাপের বিষ তোমার শরীরে যেন একটুও না থাকে। সাপের বিষ শরীরে যদি সামান্য একটুও থাকে তাহলে কি শরীর সুস্থ থাকে? বলছেন, অজ্ঞানের লেশমাত্র থাকবে না। বলছেন, 'যৎ কিঞ্চিৎ বিষদোষস্ফূর্তিঃ অপি চেৎ দেহে', সাপের বিষ যদি শরীরে একটুও থাকে তাহলে 'কথম্-আরোগ্যায় ভবেৎ', কি করে তুমি বলতে পার তুমি আরোগ্যলাভ করেছ? তুমি আরোগ্যলাভ করনি। তেমনি সত্যিকারের জ্ঞান যখন হবে তখন অজ্ঞানের একটুও লেশ থাকবে না। কোনও সন্দেহ নেই, কোনও দ্বিধা নেই। পূর্ণ প্রত্যয়। কি দেখলাম, ঠিক দেখলাম তো ? ভগবানকে দেখলাম না ভূত দেখলাম ? এরকম নয়। কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের যে দেখা সেটা কি রকম ? হঠাৎ একজনকে দেখলাম; মনে হচ্ছে, চিনি ? না চিনি না তো, ঠিক বুঝতে পারছি না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জ্ঞান তাতে এরকম ভুল হতে পারে। কিন্তু যে জ্ঞান অতীন্দ্রিয়—অতি-ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াতীত—তাতে কোনও ভুল হবার নেই। আমাদের এই যে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্, এরা সব ভুল তো করতেই পারে। যতক্ষণ আমাদের মধ্যে অহঙ্কার আছে ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলোই আমাদের জ্ঞানের মাধ্যম থেকে যায়, তাই ভুলের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যে জ্ঞান অতীন্দ্রিয়, transcendental, তাতে কোনও ভুল থাকতেই পারে না। সেই জ্ঞানের নাগাল আমরা পাই না অহঙ্কারের জন্যে। তাই বলছেন, 'তৎ-বৎ অহম্-তা-অপি যোগিনঃ মুক্ত্যৈ'; অহংতা অর্থাৎ অহংবুদ্ধি, egoism, তার লেশমাত্র থাকলে হবে না। ইন্দ্রিয়াতীত যে জ্ঞান, আত্মজ্ঞান, তা অহঙ্কারের নিঃশেষে বিনাশ না হলে হবে না। বলছেন, শরীরে একটুও সাপের বিষ থাকলে যেমন সুস্থ হওয়া যায় না তেমনি মুক্তিকামী যোগীপুরুষের মুক্তি হবে না যদি 'কিঞ্চিৎ-মাত্র' অহঙ্কার তার মধ্যে থেকে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা দিতেন, সুতোয় একটুও ফেঁসো থাকলে সেই সুতো ছুঁচে ঢুকবে না।

অহমোঽত্যন্তনিবৃত্ত্যা তৎকৃতনানাবিকল্পসংহৃত্যা।
প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকাদিদমহমস্মীতি বিন্দতে তত্ত্বম্॥ ৩০৪

অন্বয়: প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকাৎ (জীবের স্বরূপতত্ত্ব বিচার থেকে) অহমঃ অত্যন্ত নিবৃত্ত্যা (অহঙ্কারের নিঃশেষে নিবৃত্তির দ্বারা) তৎকৃত-নানা-বিকল্প-সংহৃত্যা (তার সৃষ্টি নানা বিকার ও সংশয়, বিপর্যয় ইত্যাদির নিরসন হলে) ইদম্-অহম্-অস্মি (এই শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই আমি) ইতি (এই প্রকার) বিন্দতে তত্ত্বম্ (তত্ত্ব লাভ হয়)।

সরলার্থ: জীবের আত্মতত্ত্ব বিচারের ফলে অহঙ্কারের নিঃশেষে নিবৃত্তি হলে ও অহঙ্কারকৃত বহুবিধ বিকল্পের যে অবতারণা তার নিরসন হলে এই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম আমিই, এই তত্ত্ব লাভ হয়।

ব্যাখ্যা: আমাদের এই অহংতা, শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে 'কাঁচা আমি' বলেছেন, তাকে নিয়েই যত ঝঞ্ঝাট। বলছেন, 'অহমঃ অত্যন্ত নিবৃত্ত্যা'—এই অহং-এর অত্যন্ত নিবৃত্তি হলে আমার তত্ত্ব লাভ হবে। 'অত্যন্ত'—'অতি-অন্ত', একেবারে শেষ পর্যন্ত, অতি অন্ত পর্যন্ত নিবৃত্তি হতে হবে। 'তৎকৃতনানাবিকল্পসংহৃত্যা'; এই অহং থেকে আবার কত ডালাপালা ! শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, একটা কলাগাছ কেটে ফেল্লুম, ভাবলুম বুঝি শেষ করে দিলুম, কিন্তু তা না, আবার একটা শাখার মতো বেরিয়ে আসে। এই অহঙ্কার থেকে কত বিকল্প, আমাকে কেন্দ্র করে ঘর, বাড়ি সমাজ কত কি—সব বিকল্প, বিকার, অধ্যাস। যেমন আমি জামা পরেছি, শার্ট-সোয়েটার-ওভারকোট দেহের ওপর চাপিয়েছি, তেমনি আমি নির্গুণ, তার ওপর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এসব চাপিয়েছি। এগুলো সব সরিয়ে দাও। এসবের নিবারণ হলে 'প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকাৎ-ইদম্-অহম্-অস্মি-ইতি বিন্দতে তত্ত্বম্'; 'প্রত্যক্তত্ত্ব'—আমার মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে, শুদ্ধ তত্ত্ব। শুদ্ধ মানে পবিত্র নয়—শুদ্ধ হচ্ছে নির্গুণ, নির্বিশেষ, যার ওপরে কোনও অধ্যাস নেই। অর্থাৎ পরমাত্মা। তিনি নির্গুণ, নিরাকার, তাঁর ইতি করা যায় না, তিনি বাক্যমনাতীত, কিছু বলা যায় না তাঁর সম্বন্ধে। তাঁর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, তাই তাঁকে বিশেষিত করা যায় না। বলছেন, 'অহম্-অস্মি-ইতি বিন্দতে তত্ত্বম্'। 'তত্ত্বম্'—'তৎ' এর জ্ঞান। 'ইদম্' বলতে বুঝি যা আমরা দেখছি, জানছি, সেইসব। আর 'তৎ' হচ্ছে যা ইন্দ্রিয়াতীত, যা বুঝতে পারছি না। কিযে তা বলতে পারছি না, সেই 'তৎ' এর জ্ঞান হচ্ছে তত্ত্ব। সেই নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ, শুদ্ধ যিনি, তিনিই আমি, এই তত্ত্ব আমার লাভ হয়। কি করে হয়? বিচারের দ্বারা হয়। কতরকম করে শুধু এই কথাটাই বলছেন ! তাই শঙ্করাচার্য বলছেন, শাস্ত্র আদরবতী, সব সময় বলছেন : এটা করো, সেটা করো। শুধু শুনলেই হবে না, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এসব করতে হবে, তবে তত্ত্ব লাভ হবে। 'প্রত্যক্তত্ত্ব'—আমার মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে তার তত্ত্ব। এই তত্ত্ব আমরা জানতে পারি না অহঙ্কারের জন্যে, আমি কর্তা আমি ভোক্তা, এই অহংবুদ্ধির জন্যে। এই যে ভ্রান্তি এ কেন এসেছে আমরা জানি না, কিন্তু এমন মানুষ দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা আর এই ভ্রমের মধ্যে নেই। তাঁরা নির্লিপ্ত, কোনও কিছুর তোয়াক্কা করেন না, নিজের আনন্দে ভরপুর হয়ে আছেন। এই অজ্ঞান আমাদের অনবরত ঘোরাচ্ছে, যে জ্ঞান আমাদের ভেতরে আছে তাকে জানতে দিচ্ছে না। উপনিষদের এটাই কথা যে, আমাদের আনন্দ বাইরে নেই, ভেতরে আছে। এটা যাঁরা জেনেছেন, তাঁরা আনন্দে আছেন। তাই বলছেন, তোমার যে অহং তাকে একেবারে

নির্মূল করে ফেলে তত্ত্ব লাভ কর, তাহলেই তুমি অপার আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকবে।

অহংকারে কর্তর্যহমিতি মতিং মুঞ্চ সহসা
বিকারাত্মন্যাত্মপ্রতিফলজুষি স্বস্থিতিমুষি।
যদধ্যাসাৎ প্রাপ্তা জনিমৃতিজরাদুঃখবহুলা
প্রতীচশ্চিন্মূর্তেস্তব সুখতনোঃ সংসৃতিরিয়ম্॥ ৩০৫

অন্বয়: আত্ম-প্রতিফল-জুষি (চৈতনস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত) অহংকারে বিকার-আত্মনি (বিকারশীল অহংকাররূপ আত্মভাবে) কর্তরি-অহং (কর্তৃত্বে আমি) ইতি মতিং (এই বুদ্ধিকে) স্বস্থিতি মুষি (স্বরূপে স্থিতির অপহারক জেনে) যৎ-অধ্যাসাৎ (যে অধ্যাস থেকে) চিৎ-মূর্তেঃ-সুখতনোঃ তব প্রতীচঃ (চৈতন্যস্বরূপ আনন্দমূর্তি তোমার প্রত্যগাত্মার) জনি-মৃতি-জরা-দুঃখবহুলা (জন্ম-মৃত্যু-জরাযুক্ত বহু দুঃখপূর্ণ) সংসৃতিঃ-ইয়ম্ (এই সংসার যাতায়াত) প্রাপ্তাঃ (প্রাপ্তি ঘটে) মুঞ্চ সহসা ([তা] এই ক্ষণে ত্যাগ কর)।

সরলার্থ: চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রতিচ্ছায়াযুক্ত অহঙ্কারের যে-বিকারশীল আত্মভাবে 'আমি কর্তা' এই বুদ্ধি হয়েছে, তাকে স্বরূপস্থিতির অপহারক বলে জেনো। এই যে অধ্যাস, যা থেকে তোমার চৈতন্যস্বরূপ আনন্দমূর্তি প্রত্যগাত্মার জন্ম-মৃত্যু-জরাযুক্ত বহু দুঃখের সংসারে যাতায়াত প্রাপ্তি ঘটেছে, তা এখুনি ত্যাগ কর।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'অহঙ্কারে কর্তরি-অহম্-ইতি মতিং মুঞ্চ সহসা', এই 'আমি কর্তা' ভাব, এই যে আমাদের মূর্খতা অজ্ঞতা, একে 'মুঞ্চ সহসা'— এখুনি ত্যাগ কর, করে এগোও। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণের গল্প বলতেন। একজন ব্রাহ্মণের খুব সুন্দর একটা বাগান ছিল। একটা গরু ঢুকে সেই বাগান নষ্ট করছিল। ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে তাকে এমন মেরেছে যে গরুটা মরে গেছে। ব্রাহ্মণ তখন ভাবছে এই যে গোহত্যার পাপ এ আমার কেন হবে? আমি তো কর্তা নই, হাতের দেবতা ইন্দ্র, ইন্দ্রই আমাকে দিয়ে ওই গরুটাকে মারিয়েছেন। তখন ইন্দ্র একজন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে বলছেন, বাঃ কি সুন্দর বাগান; কে এসব করলে? ব্রাহ্মণ খুব খুশি হয়ে বলছে, আমি করেছি। এমন সময় মরা গরুটাকে পড়ে থাকতে দেখে ইন্দ্র বলছেন, এঃ, এখানে একটা গরু কে মেরে ফেলে রেখেছে? কে এ কাজ করলে? ব্রাহ্মণ বলছে ইন্দ্র করেছেন। ইন্দ্র তা শুনে বলছেন, বাগানটা তুমি করেছ আর গরু মারাটা ইন্দ্র করেছেন? হয় বল, দুটোই তুমি করেছ, নয়তো কোনটাই তুমি করনি। কর্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে ঠিক বিচার করে, বেদান্তের অপব্যাখ্যা করে নয়। বলছেন, 'অহঙ্কারে কর্তরি-অহম্-ইতি মতিং মুঞ্চ সহসা'; 'কর্তরি-অহং'— কর্তার বেলায় আমি, এই 'মতি'—বুদ্ধি, 'মুঞ্চ'— তুমি ত্যাগ কর, 'সহসা'—এখুনি ত্যাগ কর। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, তুমি তাতে প্রতিষ্ঠিত

হও। তুমি তাতে স্বস্থিতি লাভ কর, স্থিরভাবে অধিষ্ঠিত হও। তাহলে কি হবে? ভবযন্ত্রণা চলে যাবে। 'যদ্-অধ্যাসাৎ প্রাপ্তা জনিমৃতিজরাদুঃখবহুলা', এই যে আমাদের অধ্যাস, অধ্যাস মানে আরোপ, এগুলো ত্যাগ কর। এরই জন্যে আমি আমাকে এই দেহের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি, আর এই অহঙ্কারের জন্যে জন্ম, মৃত্যু, জরা, এইরকম আমার কত দুঃখ। আমার কি হয়েছে! আমার বিপরীত বুদ্ধি হয়েছে। 'প্রতীচঃ চিৎ-মূর্তি'— আমার প্রত্যগাত্মা চিৎ-মূর্তি, চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু সেটা বুঝতে পারছি না, উলটো ভাবছি। বেদান্ত কিরকম সব উদাহরণ দিচ্ছেন— যদি ন্যাবা হয় তাহলে সব হলুদ দেখব, আবার একরকম চোখের অসুখ হলে, তাতে সব দুই দেখা যায়—আমার সেইরকম কিছু একটা হয়েছে, সব ভুল দেখছি। আমি যে নিত্যমুক্ত, চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, সেসব ভুল হয়ে গেছে। তার ফলে এই 'সংসৃতিঃ'—এই সংসার, জন্ম, মৃত্যু, এই যাতায়াত। সব আমার এই আমিত্বের জন্যে হচ্ছে। আমাতে 'আমি কর্তা' এটা আরোপ করেছি, অধ্যাস, তার জন্যে 'বিকার-আত্মনি প্রতিফলজুষি'; আমার সবকিছু বিকারগ্রস্ত হয়েছে, নিজেতে আমি এসব আরোপ করছি। বলছেন, এই অধ্যাস এলো কোথা থেকে? অহঙ্কার থেকে। 'অহঙ্কারে কর্তরি-অহম্-ইতি মতিং মুঞ্চ সহসা'; এই যে অহঙ্কার, 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা' এই ভাব এসব ছাড়ো। এই যে অজ্ঞান বলা হয়, মায়া বলা হয়, যার জন্যে আমার সংসারে যাতায়াত, সেটা কি? অহংতা আর মমতা 'আমি' আর 'আমার'। বলছেন, এই বুদ্ধি ত্যাগ কর, 'সহসা', এক ঝটকায় ত্যাগ কর, একটু একটু করে নয়, একেবারে ঝেড়ে ফেলো। আমি আমার অহঙ্কারকে 'আমি' ভেবে ভুল করছি। এটা অধ্যাস, এ দূর করতে হবে। এ যেন আমার যে 'স্বস্থিতি' —নিজের স্বরূপে স্থিতি, সেটা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। আকাশে যেমন একটা কালো মেঘ সূর্যকে ঢেকে ফেলে এও সেরকম আমার চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে ঢেকে ফেলেছে, চুরি করে নিয়েছে। আমি শুদ্ধ, নিজেকে অশুদ্ধ ভাবছি, আমি মুক্ত, নিজেকে বদ্ধ ভাবছি। 'স্বস্থিতি মুষি'—আমার 'স্বস্থিতি', নিজের স্বরূপে অবস্থান, এটাকে যেন 'মুষি' অর্থাৎ কেড়ে নিয়েছে। আমার চোখে একটা ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে, নিজেকে আমি চিনতে পারছি না। আশ্চর্য ! নিজেকেই চিনতে পারছি না। সেইজন্যে 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বেদান্তের এইসব মহাবাক্য শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য। বারবার শুনতে হয়, মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে হয়, ধ্যান করতে হয়। তখন নিজেকে চেনা যায়।

সদৈকরূপস্য চিদাত্মনো বিভোরানন্দমূর্তেরনবদ্যকীর্তেঃ।
নৈবান্যথা ক্বাপ্যবিকারিণস্তে বিনাহমধ্যাসমমুষ্য সংসৃতিঃ॥ ৩০৬

অন্বয়: সদা (সর্বদা) একরূপস্য চিদাত্মনঃ-বিভোঃ-আনন্দমূর্তেঃ-অনবদ্যকীর্তেঃ

অবিকারিণঃ তে (একইরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, সর্বব্যাপী, আনন্দস্বরূপ, অতুলনীয়কীর্তি, বিকাররহিত তোমার) অমুষ্য (এর বাইরের) অহম্-অধ্যাস বিনা (অহংরূপ অধ্যাস ছাড়া) সংসৃতিঃ (সংসারে যাতায়াত) ক্ব-অপি অন্যথা নৈব (অন্য কিছুর জন্যে কখনও হয় না)।

সরলার্থ: সর্বদা একইরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, সর্বব্যাপী, আনন্দস্বরূপ, অতুলনীয় কীর্তি অবিকারী তোমার সংসারে যাতায়াত, এর বাইরের যে অহং সেই অধ্যাস ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে কখনও হয় না।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'সদা একরূপস্য',—যে সব সময় একরূপ তার। তার কোনও পরিবর্তন নেই, তা কোনও অবস্থানির্ভর নয়, সব সময় একরকম। কে এরকম ? আত্মা। আমরা তো তা নই, আমরা অবস্থানির্ভর, পরাধীন। শরীরে ঠাণ্ডা লাগছে তো আমারও ঠাণ্ডা লাগছে, গরম লাগছে তো আমারও গরম লাগছে। অধ্যাস, শরীরটাকে আমি ভেবেছি, তাই এই অবস্থা। 'চিদাত্মা'—চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, 'বিভুঃ'—সর্বব্যাপী, আকাশের মতো, আকাশ যেমন সর্বব্যাপী, সর্বত্র আছে, সেইরকম। আনন্দমূর্তিঃ—আনন্দস্বরূপ। 'অনবদ্যঃ'—ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, অতুলনীয়। 'অনবদ্যকীর্তিঃ'—এই যে আত্মা এর কোনও তুলনা হয় না। কোনও দুই নেই তাই তুলনাহীন। তারপর বলছেন, 'অবিকারিণঃ' তাঁর কোনও পরিবর্তন নেই। দ্বিতীয় কিছু নেই তো, কার প্রভাবে তিনি প্রভাবিত হবেন? কার কারণে কোনও পরিবর্তন হবে? তারপর বলছেন, 'নৈব-অন্যথা ক্ব-অপি-অবিকারিণঃ তে বিনা-অহম্-অধ্যাসম্-অমুষ্য সংসৃতিঃ'; 'বিনা অধ্যাসম্'—অধ্যাস যদি না থাকে তাহলে সংসারও নেই। আমার এ সংসার অধ্যাসের জন্যে, অধ্যাস না থাকলে জন্ম নেই, সংসার নেই। 'ক্ব-অপি সংসৃতিঃ', তুমি যদি অবিকারী হও, সদা একরূপ হও, তুমি যদি অধ্যাস না কর, নিজেকে যদি এই দেহ-মন-বুদ্ধি বলে না ভাব, তাহলে চৈতন্যস্বরূপ, বিভু, আনন্দস্বরূপ, তোমার সংসারবন্ধন কি করে হবে? তোমার সংসারবন্ধনের কারণ, 'সদা-একরূপস্য চিদাত্মনঃ বিভোঃ আনন্দমূর্তেঃ অনবদ্যকীর্তেঃ' তোমার ওপর তুমি 'অহম্-অধ্যাসম্' চাপিয়েছ। দেহ-মন-বুদ্ধি নিয়ে তোমার যে-আমি, তুমি সেই 'অহম্'-এর 'অধ্যাস' তোমার চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় চাপিয়েছ। এই অধ্যাসটা 'অমুষ্য'—ওখানকার, বাইরের। তোমার স্বরূপের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তোমার সংসারবন্ধনটা কিন্তু 'আমি-আমার' এই অধ্যাসের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে, এই অধ্যাস যদি না থাকে তাহলে সংসার নেই। 'নৈব-অন্যথা'—এর কোনও অন্যথা নেই। জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধন যে সংসার সেটা অধ্যাস আছে বলেই আছে। সেটা ছাড়া 'ক্ব-অপি সংসৃতিঃ'—সংসার কি করে থাকে?

তস্মাদহঙ্কারমিমং স্বশত্রুং ভোক্তুর্গলে কণ্টকবৎ প্রতীতম্।
বিচ্ছিদ্য বিজ্ঞানমহাসিনা স্ফুটং ভুঙ্ক্ষ্বাত্মসাম্রাজ্যসুখং যথেষ্টম্ ।।৩০৭

অন্বয়: তস্মাৎ (সেইজন্যে) ভোক্তুঃ-গলে কণ্টকবৎ প্রতীতম্ (ভোক্তার গলায় কাঁটার মতো প্রতীয়মান) স্বশত্রুং ইমম্-অহঙ্কারম্ (নিজের শত্রু এই অহঙ্কারকে) বিজ্ঞান-মহা-অসিনা (বিজ্ঞানরূপ মহা-অসিরদ্বারা) বিচ্ছিদ্য (ছিন্ন করে) স্ফুটং আত্ম-সাম্রাজ্যসুখম্ (ফুটে ওঠা আত্মস্বাতন্ত্র্যরূপ সাম্রাজ্যসুখ) যথেষ্টম্ (যেমন ইচ্ছে) ভুঙ্ক্ষ্ব (ভোগ কর)।

সরলার্থ: তাই জন্যে ভোক্তার গলায় কাঁটার মতো আত্মশত্রু এই অহঙ্কারকে বিজ্ঞানরূপ মহা অসিরদ্বারা ছিন্ন করে, স্বয়ং ফুটে ওঠা তোমার যে স্বাতন্ত্র্যবোধ, তাকে সম্রাটের সাম্রাজ্যভোগের মতো যেমন ইচ্ছে ভোগ কর।

ব্যাখ্যা: বলছেন, তোমার গলায় একটা কাঁটা ফুটেছে, সেটা তোমায় সব সময় কষ্ট দিচ্ছে, কাঁটাটা তুলে ফেলতে হবে। ঐ কাঁটাটা কি ? না অহঙ্কার। অহঙ্কার নিয়েই তো আমাদের যত ঝামেলা। তাই বারবার করে শাস্ত্র স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আমাদের সমস্ত দুঃখের মূলে রয়েছে অহঙ্কার। এই যে দেহের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া এই দেহাত্মবুদ্ধিই অহঙ্কার। হিন্দুদের মূল ধর্মচিন্তা হচ্ছে যে আমি আত্মা, দেহ থেকে ভিন্ন। দেহটা আমাদের কিরকম? যেন একটা পোশাক, জীর্ণ হলে ফেলে দিয়ে আর একটা নিতে হয়। দেহ আর আত্মা আলাদা, এখন আমি এটা ভুলে গিয়ে এই দেহটাকেই আমি মনে করছি, দেহের অসুখকে আমার অসুখ মনে করছি। আমাদের সমস্ত দুঃখের মূল হচ্ছে এই—আমরা দেহকেন্দ্রিক, দেহের সেবা করি, দেহের দাস। তাই হিন্দুশাস্ত্র বলছেন, এই দেহাত্মবুদ্ধি তোমার যে-অজ্ঞান থেকে এসেছে সেটা যে-কোনও প্রকারে দূর কর। কিরকম একটা উদাহরণ দিচ্ছেন ! 'অহঙ্কারম্-ইমম্ স্বশত্রুং', এই অহঙ্কার তোমার শত্রু। সেটা কিরকম? 'ভোক্তুঃ গলে কণ্টকবৎ প্রতীতম্'; খেতে খেতে গলায় একটা কাঁটা ফুটে গেল। আমি খাব কি, কাঁটাটা সব সময় খচখচ করছে। তেমনি অহঙ্কারটা সব সময় গলায় কাঁটা ফোটার মতো রয়েছে, তার ফলে কোন কিছুতেই আমার স্বস্তি নেই, সুখ নেই, আরাম নেই। এই দেহটা এ যেন গলায় একটা কাঁটা। দেহের প্রতি এই যে মমত্ববুদ্ধি, এই 'আমি', এ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমাদের সুখ নেই। যে কোনও প্রকারে এই অজ্ঞানকে দূর করতে হবে। আমাকে জানতে হবে যে, দেহের অতিরিক্ত একটা বস্তু আছে। সেটা আমার আত্মা। তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু সেই আত্মা আমাদের চালাচ্ছেন, আমাদের মনকে চালাচ্ছেন, ইন্দ্রিয়গুলোকে চালাচ্ছেন, নেপথ্যে থেকে সব করছেন। তিনি যন্ত্রী আমরা যন্ত্র, তিনি আমাদের চালাচ্ছেন। তাহলে আমাদের যে অজ্ঞান সেটা দূর করব কি করে? জ্ঞানের দ্বারা।

বলছেন, 'বিজ্ঞানমহা-অসিনা', জ্ঞানরূপ মহা-অসির দ্বারা। বিরাট খাঁড়া দরকার, কারণ এই যে আমার শত্রু এ ভয়ানক শত্রু। একে কাটার জন্যে একটা বিরাট খাঁড়া না হলে হবে না। 'বিজ্ঞানমহা-অসিনা বিচ্ছিদ্য', জ্ঞান দিয়ে একে বিচ্ছিন্ন করে ফেলো, তখন 'স্ফুটং', ফুটে উঠবে, স্বরূপজ্ঞান তখন আপনা-আপনি ফুটে উঠবে। জ্ঞান তো স্বয়ংপ্রকাশ, একটা আলোকে দেখবার জন্যে আর একটা আলোর দরকার হয় না। 'স্ফুটং'— পরিষ্কার হয়ে প্রকাশ হচ্ছে, আর ভুল হবার নেই। আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে যা জানি তা ভুল হতে পারে, চোখে ভুল দেখতে পারি, কিন্তু এই জ্ঞান অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, এতে আর ভুল হবার কিছু নেই। এই জ্ঞান immediate, personal, direct। নিজের আত্মার সরাসরি অনুভব। এ হলো আত্মসাক্ষাৎকার। এই জ্ঞান সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ, অপরোক্ষ। এ জ্ঞান একবার যদি হয় তাহলে আর মুছে যায় না। এই জ্ঞান করামলকবৎ— তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে আসল ফলটা আছে, অন্য লোকে জানুক বা না জানুক তুমি তো জান এই ফল তোমার হাতে রয়েছে। তাই বলছেন, 'ভুঙ্ক্ষ্ব আত্মসাম্রাজ্যসুখম্ যথেষ্টম্'; যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ তা ফুরিয়ে যায়, কিন্তু এই আত্মসাম্রাজ্যের সুখ এ ফুরোয় না, তুমি যেমন ইচ্ছে একে ভোগ কর। শাস্ত্র বলছেন এই আমাদের জীবনের লক্ষ্য, এই আত্মসাম্রাজ্যলাভ। আমি আমার সম্রাট; আমরা নিজেকে ভুলে গেছি তাই দাস হয়ে আছি, দেহের দাস। বলছেন এই অজ্ঞানটা দূর কর, তাহলেই আত্মসাম্রাজ্য ভোগ করতে পারবে, তোমার দাসত্ব চলে যাবে, তুমি যে সম্রাট সেই পরিচয়টা ফিরে আসবে।

ততোঽহমাদের্বিনিবর্ত্য বৃত্তিং সংত্যক্তরাগঃ পরমার্থলাভাৎ।
তূষ্ণীং সমাস্স্বাত্মসুখানুভূত্যা পূর্ণাত্মনা ব্রহ্মণি নির্বিকল্পঃ।। ৩০৮

অন্বয়: ততঃ (অতএব) অহমাদেঃ (আমি আমার ইত্যাদি ভাবের) বৃত্তিং (বৃত্তিকে) বিনিবর্ত্য (নিবৃত্ত করে) পরমার্থলাভাৎ (পরমার্থলাভের কারণে) সংত্যক্তরাগঃ (আসক্তিবর্জিত) আত্মসুখ-অনুভূত্যা (আত্মসুখ-অনুভূতির দ্বারা) নির্বিকল্প (বিকল্প রহিত) পূর্ণ-আত্মনা (পরিপূর্ণ আত্মাসহ) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) তূষ্ণীং সমাস্স্ব (নিশ্চুপভাবে সমাসীন হও)।

সরলার্থ: অতএব 'আমি আমার' ভাবের যেসব বৃত্তি সেগুলোকে নিবৃত্ত করে পরমার্থলাভের জন্যে আসক্তি বর্জিত ও নির্বিকল্প হয়ে তুমি আত্মসুখানুভূতি নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মায় নিশ্চুপভাবে ব্রহ্মে সমাসীন হয়ে থাক।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'ততঃ-অহমাদেঃ বিনিবর্ত্য'—অতএব অহঙ্কার ইত্যাদির নিবর্তন করে—আত্মজ্ঞান লাভ কর। 'অহমাদি' বলছেন অর্থাৎ শুধু তো আমি নয় 'আমি আমার'—আমার পরিবার, আমার জাতি, আমার সমাজ, এইরকম 'আমি আমার' কত ডালপালা। একে দাবিয়ে রাখ, বাড়তে দিও না, এর নিবৃত্তি কর। বলছেন, এই অহঙ্কার থেকে আবার কত বৃত্তি আসছে, মনের মধ্যে তরঙ্গ উঠছে, চাঞ্চল্য আসছে—এসব হতে দিও না। 'সংত্যক্তরাগঃ পরমার্থলাভাৎ'; অহঙ্কার ত্যাগ করলে সংসারও চলে যাবে, এই দেহ ইত্যাদির প্রতি যে রাগ অর্থাৎ অনুরাগ, আকর্ষণ, আসক্তি এসব ত্যাগ হয়ে যাবে। তুমি তো দেহটাকে আমি মনে করে জাপটে ধরে রেখেছ, এর প্রতি তোমার অত্যন্ত অনুরাগ হয়েছে, কিন্তু এ তো তুমি নও। তোমার জামাটা যেমন দেহের ওপর চাপিয়েছ তেমনি তোমার দেহটা আত্মার ওপর চাপিয়েছ, এটা অধ্যাস, এটা দূর কর। তখন কি হবে? 'সংত্যক্তরাগঃ পরমার্থলাভাৎ', যেই আসক্তি ত্যাগ করলাম ওমনি আর কোন বন্ধন নেই—আত্মজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে এসে যাবে। সূর্য মেঘে ঢাকা ছিল, মেঘটা যেই সরে গেলো সূর্য প্রকাশ হয়ে পড়ল। জ্ঞান তো সব সময় রয়েছে তোমার মধ্যে, কিন্তু ঢাকা রয়েছে, চাপা আছে, অহঙ্কার ঢেকে রেখেছে। দেহটাকে আমি না ভেবে তোমার যে আত্মা তাকেই আমি ভাব, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় মোড় ফিরিয়ে দাও, দেহ-মন-বুদ্ধি এসবের কোনটাই তুমি নও, এটা তুমি বুঝে নাও। তাহলেই তোমার পরমার্থ লাভ হবে আর অমনি দেহকেন্দ্রিক বস্তুতে তোমার আসক্তি চলে যাবে। ছোট জিনিস নিয়ে থেকো না, বড় জিনিস লাভ কর। 'পরম-অর্থ'—সবচেয়ে বড়, অর্থ মানে বিষয়, পরম মানে শ্রেষ্ঠ; রূপলাবণ্য কাম্য হতে পারে, অর্থ কাম্য হতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলো সেই আত্মজ্ঞান, সেটাই 'পরমার্থ।' আত্মজ্ঞান লাভই সব থেকে বড় লাভ। গীতায় বলছেন, 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ' (গী, ৬।২২)—যা পেলে মনে হয় আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে। পূর্ণকাম, আপ্তকাম। 'পরমার্থলাভাৎ'; তখন কি? 'তূষ্ণীং সমাস্স্ব আত্মসুখ-অনুভূত্যা'—চুপ করে বসে থাক। আত্মসুখানুভূতি নিয়ে শান্ত হয়ে থাক। আমার আত্মাকে জানার সুখ অনুভব করছি আর আমার কোনও সুখের দরকার নেই। চুপ করে বসে আছি, একেবারে গোড়ায় চলে গেছি, সব আনন্দের উৎস যেখানে সেই আনন্দ অনুভব করছি। আর আমায় দেহের সাহায্য নিতে হবে না, একেবারে উৎসে চলে গেছি।'পূর্ণ-আত্মনা'; আমি পূর্ণ; আমাদের সবাইকার একটা অপূর্ণতা, একটা অভাববোধ থাকে, কিন্তু এখন আমি আপনাতে আপনি পূর্ণ, বাইরের থেকে আমার আর কিছু পাবার নেই। 'তূষ্ণীং সমাস্স্ব পূর্ণাত্মনা ব্রহ্মণি নির্বিকল্পঃ'; পূর্ণ আত্মায় নির্বিকল্প তুমি শান্তভাবে ব্রহ্মে সমাসীন হয়ে থাক। আমার স্বরপটাকে আমি বুঝে নিয়েছি। ব্রহ্ম মানে বৃহত্তম, আমি সেই ব্রহ্ম, আমি সব, আমি পূর্ণ, আমি ভরপুর হয়ে আছি। আমি নির্বিকল্প, আমার বিকল্প কেউ নেই, আমার কোন রূপান্তর নেই, আমি কোনও অবস্থানির্ভর নই, কাজেই আমি চুপ করে বসে আছি। শুধু মজা দেখছি। এই যে দ্রষ্টা, সাক্ষী, এ কখন হয়? যখন আর কিছু

পাবার থাকে না। সবাই ছটফট করছে, কত হাসি-কান্না—আমি মজা দেখছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, প্রথমে হচ্ছে, এ সংসার ধোঁকার টাটি—জগৎ মিথ্যা। কিন্তু পরে—ব্রহ্মময়ং জগৎ—আমি সব হয়েছি, এক সত্তা, সর্বত্র। তখন মজার কুটি, মজা দেখছি। তাই বলছেন, 'তূষ্ণীং সমাস্স্ব'—চুপ করে বসে থাক। মানুষ কখন চুপ করে বসে থাকে? যখন আর কিছু পাবার থাকে না। যখন খিদে থাকে তখন 'খেতে দাও' বলে গোল করি। খাওয়া হয়ে গেলে, পরিপূর্ণ আমি তূষ্ণীং, আরাম করে বসে আছি। আমি শুধু দেখছি, সাক্ষী; আকর্ষণ, বন্ধন সব ত্যাগ করেছি, এখন চুপ করে বসে আছি। নিজের মধ্যে, নিজের অন্তঃপুরে আমিই ভোক্তা আমিই ভোগ্য। এই সুখ বাইরের নয়, তাই এই সুখ 'পূর্ণ-আত্মনা', পূর্ণ সুখ। আমাদের যেসব সুখ বাইরের সুখ সেগুলোর মধ্যে সব সময় একটা অপূর্ণতা থাকে। টাকা নিয়ে বেশ লাগছে, টাকা ফুরিয়ে গেলো; রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে বেশ সুখে আছি কিন্তু ক্ষমতা আরও বাড়াতে চাইছি তা না হলে পুরো সুখ হচ্ছে না। উপনিষদে সেই দুই পাখির উদাহরণ আছে, একটা পাখী গাছের ফল খাচ্ছে, একটা ফল খুব মিষ্টি, খেয়ে খুব খুশি। আবার অন্য একটায় ঠোকর মেরেছে, তেতো, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ চলে গেলো, দুঃখ। অন্য একটা পাখী সে ওপরের ডালে বসে আছে, কোন কিছুই খাচ্ছে না, শান্ত, নীরব, চুপ করে বসে আছে। আমাদের অবস্থা ওই নীচের পাখীটির মতো, একবার এটা চাইছি আরেকবার ওটা চাইছি, কিছুতেই তৃপ্তি নেই। কিন্তু ওপরের পাখী, সে শান্ত, চুপ করে আছে, সে সব পেয়েছে। আত্মজ্ঞান হলে আমাদের সব পাওয়া হয়ে যায় তখন আর কিছু চাইবার থাকে না। নিজেকে জানা, নিজের পরিচয় জানা, আত্মজ্ঞান লাভ করা যেন সাম্রাজ্য লাভ করা। এতদিন শুধু কি করেছি ? চাই, চাই, চাই। এসবের এখন শেষ হলো, এখন আমি 'নির্বিকল্পঃ'; ব্রহ্মের মধ্যে ডুবে গেছি, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গেছি, আমার আলাদা কিছু নেই। যতক্ষণ আলাদা ছিল ততক্ষণ অপূর্ণতা ছিল, দুঃখ ছিল, এখন শুধু আনন্দ, 'আত্মসাম্রাজ্যসুখম্'। বিবেকচূড়ামণি এই কথাই সকলকে বলছেন, কেন সংসারের মধ্যে ঘুরে মরছ? তোমার ভেতরেই তোমার আনন্দ। মিথ্যা সংসার ছেড়ে আনন্দলাভ কর, পরমার্থ লাভ কর।

সমূলকৃত্তোঽপি মহানহং পুনর্ব্যুল্লেখিতঃ স্যাদ্ যদি চেতসা ক্ষণম্।
সঞ্জীব্য বিক্ষেপশতং করোতি নভস্বতা প্রাবৃষি বারিদো যথা॥ ৩০৯

অন্বয় : মহান্-অহং (মহাশক্তিশালী অহং) সমূলকৃত্তঃ অপি (মূল থেকে কাটা হয়ে গেলেও) পুনঃ (পুনরায়) চেতসা (মনের শক্তির দ্বারা) যদি ক্ষণম্ (যদি ক্ষণিকের জন্যেও) ব্যুল্লেখিতঃ স্যাৎ (উত্থিত হয়) সঞ্জীব্য (বেঁচে উঠে) বিক্ষেপশতং করোতি (শত শত বিক্ষেপ ঘটায়) যথা (যেমন) প্রাবৃষি (বর্ষাকালে) নভস্বতা (বায়ুর দ্বারা নীত) বারিদঃ (মেঘ)।

সরলার্থ : এই মহাশক্তিশালী অহং একেবারে মূল থেকে কাটা হয়ে গেলেও যদি ক্ষণিকের জন্যেও মনের মধ্যে উত্থিত হয় তাহলে সে যেন সঞ্জীবিত হয়ে শত শত বিক্ষেপের সৃষ্টি করতে থাকে। বর্ষাকালে জলভরা মেঘ বায়ুচালিত হয়ে যেমন করে।

ব্যাখ্যা : এখানে অহঙ্কার সম্বন্ধে সতর্ক করে দিচ্ছেন। বলছেন, দেখো তোমার জ্ঞান হলো, তুমি তোমার অজ্ঞানটা, ওই অহঙ্কারটা, জ্ঞানরূপ খড়গ দিয়ে নির্মূল করে দিলে; দিলেও কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার না। ওই যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, অশ্বত্থ গাছ কেটে ফেললেও আবার দেখবে একটা ফেকড়ি বেরিয়েছে, সেইরকম আমাদের অহঙ্কার। তাই বলছেন, সাবধান, সবসময় সাবধান, আবার তোমার অহঙ্কার গজিয়ে যেতে পারে; তোমার সংস্কার আছে তো, যতক্ষণ সংস্কার আছে ততক্ষণ অহঙ্কার আবার এসে যেতে পারে। ইংরেজিতে momentum বলে একটা কথা আছে, বাংলায় বলে ভরবেগ। ছোট ছেলেরা একটা চাকা লাঠি দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে তার সঙ্গে কিছুদূর ছুটে গিয়ে তারপর ছেড়ে দেয় আর সেই চাকাটা তখন আপনি কিছুদূর চলে যায়, এইটা momentum বা ভরবেগ। শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটা উদাহরণ দিয়েছেন। বলছেন, একটা গাছ কড়াত দিয়ে কাটা হয়েছে, কাটলে গাছটা তক্ষুণি পড়ে যায় না, একটা দমকা হাওয়া এলে বা একটা ধাক্কা দিলে পড়ে যায়। তেমনি আমার জ্ঞান লাভ হয়ে গেছে, ওই জ্ঞান অসি দিয়ে আমার যে অহঙ্কার তাকে সমূলে ছেদ করেছি; তবুও অহঙ্কার এসে যেতে পারে। কিরকম জান তো? আকাশে কোনও মেঘ নেই, পরিষ্কার আকাশ, হঠাৎ আকাশে কোথা থেকে মেঘ এসে গেল, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। সেইজন্যে বলছেন সব সময় সজাগ, সতর্ক থাকতে হবে। হাতে একটা চাবুক নিয়ে আছি, বিষয়চিন্তাকে বলছি, খবরদার, আমার কাছে আসবি না। নিশ্চিন্ত হবে না, মনে করছ তোমার অজ্ঞানটা নিঃশেষে চলে গেছে, তবু তোমায় সতর্ক থাকতে হবে, তার একটু কিছু হয়তো থেকে গেল, সে তোমায় আবার ভুল করাবে। এখানে বলছেন, 'সমূলকৃত্তঃ-অপি মহান্-অহং', সমূলে কেটে ফেলেছি তবু এই 'মহান্'—অত্যন্ত শক্তিশালী 'অহং'—এটা মরেও মরে না। 'মহান্-অহং পুনঃ-ব্যুল্লেখিতঃ', মেরে ফেলেছি ভেবেছি, আবার কোথা থেকে গজিয়ে উঠলো, 'স্যাৎ যদি চেতসা ক্ষণম্'—এক মুহূর্তের জন্যেও যদি তোমার মধ্যে এই অহঙ্কার জেগে ওঠে তাহলে সে কি করবে? 'সঞ্জীব্য বিক্ষেপশতং'— সে তখন বেঁচে উঠে তোমার মনের মধ্যে 'বিক্ষেপশতং', শত শত বিক্ষেপ আনবে, চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে। কি রকম? 'নভস্বতা প্রাবৃষি বারিদঃ যথা'; বর্ষাকাল, পরিষ্কার আকাশ, আকাশে একটুকরো মেঘ দেখছি শুধু, ভাবছি ও কিছু নয়, হঠাৎ সেই মেঘ হাওয়ায় ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়েছে আকাশ কালো করে। অনেক বৃষ্টি নিয়ে এলো, একেবারে ভাসিয়ে দিল ওই ছোট মেঘ। তোমার সেই ভয়ানক শক্তিশালী অহং, সে সব সময় তোমায় বলছে, একটু আসতে দাও। কিন্তু একটু এলেই

সে একেবারে ভাসিয়ে দেবে। যেমন অনেকে বলে, একটু মদ খেলে কি হয়? কিন্তু সেই একটুই আবার ভাসিয়ে দেবে। সেইরকম এই মহাশক্তিশালী অহংকে হয়তো সমূলে কেটে ফেলেছি, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও আমার মধ্যে যদি এই অহঙ্কারের প্রকাশ ঘটে তাহলে সে আবার বেঁচে উঠে মনের মধ্যে শত শত বিক্ষেপের সৃষ্টি করতে থাকবে। কাজেই সাবধান থেকো, নিশ্চিন্ত হবে না, সদাজাগ্রত থেকো। তুমি সব সময় বিচার কর তুমি দেহ নও, মন নও, বুদ্ধি নও। এমনি করে মনকে সজাগ রাখ সব সময়, নিশ্চিন্ত থেকো না।

নিগৃহ্য শত্রোরহমোঽবকাশঃ ক্বচিন্ন দেয়ো বিষয়ানুচিন্তয়া।
স এব সংজীবনহেতুরস্য প্রক্ষীণজম্বীরতরোরিবাম্বু ॥ ৩১০

অন্বয় : নিগৃহ্য (নিগৃহীত করে অর্থাৎ বশে এনে) অহমঃ শত্রোঃ (অহঙ্কাররূপ শত্রুর) বিষয়-অনুচিন্তয়া (বিষয়চিন্তা সহযোগের) ক্বচিৎ অবকাশঃ (কিছুমাত্র অবকাশ) ন দেয়ঃ (দিতে নেই) সঃ এব (সেটাই) প্রক্ষীণজম্বীরতরোঃ (শুকিয়ে যাওয়া লেবুগাছের পক্ষে) অম্বু ইব (জলের মতো) অস্য (এর অর্থাৎ অহঙ্কারের) সংজীবনহেতুঃ (পুনর্জীবন লাভের কারণ)।

সরলার্থ: অহঙ্কাররূপ শত্রুকে বশে আনার পর তাকে আর বিষয়চিন্তার সঙ্গে যুক্ত থাকার কোনও অবকাশ দিতে নেই। জল যেমন শুকিয়ে যাওয়া লেবুগাছে প্রাণ সঞ্চার করে সেইরকম এই বিষয়চিন্তা মৃতপ্রায় অহঙ্কারকে আবার সঞ্জীবিত করে।

ব্যাখ্যা: বলছেন, এই অহঙ্কার তো আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, অনেক কৌশল করে একে নিগ্রহ করে মৃতপ্রায় করে ফেলেছি, এখন সে আমার বশে এসেছে। কিন্তু আবার যদি বিষয়চিন্তা করি তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়-প্রসঙ্গ সহ্য করতে পারতেন না। কাশীতে গেছেন, মথুরবাবু সঙ্গে আছেন, জমিদার মানুষ, আর একজন জমিদারের সঙ্গে বিষয়কথা বলছেন। ঠাকুর থাকতে পারলেন না, কাঁদতে লাগলেন, মা এখানেও বিষয়কথা শুনতে হবে ? আমি তো তাহলে দক্ষিণেশ্বরেই ভালো ছিলাম ! বিষয়কথা বললে বা ভাবলে বিষয় অনুরাগ বাড়তে থাকবে। এ কিরকম জানো? লেবুগাছ শুকিয়ে গেছে, তুমি তাতে জল ঢালছ। গাছটা জম্বীর—লেবুগাছ, 'প্রক্ষীণ'—শুকিয়ে গেছে, মরে যাবার মতো হয়েছে, তাতে জল ঢাললে আবার সে বেঁচে উঠবে। তেমনি আমার বিষয়ানুরাগ ওইসব কথা বলতে বলতে আবার ফিরে আসবে, তখন বিষয়টাই ভালো লাগবে, ব্যস্, যে কে সেই। আবার আমি 'আমার বিষয়', 'আমার জিনিস', 'আমি আমি' করে মেতে উঠব। সেইজন্যে বলছেন, না বিষয়চিন্তা করবে না। 'নিগৃহ্য শত্রোঃ অহমঃ-অবকাশঃ ক্বচিৎ-ন দেয়ঃ বিষয়-

অনুচিন্তয়া'; এই অহঙ্কারকে কোনরকম অবকাশ দিও না, সুযোগ দিও না। সুযোগটা কি? এই বিষয়চিন্তা। বিষয়চিন্তাটা কিরকম? 'সঃ এব সংজীবনহেতুঃ-অস্য প্রক্ষীণজম্বীরতরোঃ ইব-অম্বু'; সেটা ওই যে মৃতপ্রায় অহঙ্কার, তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে, যেমন একটা 'প্রক্ষীণ জম্বীরতরোঃ'—শুকিয়ে যাওয়া লেবুগাছ, তার জল পেলে যেমন হয়। আসল কথাটা হচ্ছে কি? ভালো আর মন্দ দুটো আছে। মন্দর জায়গায় ভালোটা চিন্তা কর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যতই তুমি পুবের দিকে এগিয়ে যাবে পশ্চিম ততই পেছনে পড়ে থাকবে। ব্রহ্মানন্দ যে একবার পেয়েছে, বিষয়ানন্দ তার কাছে আলুনি লাগে। যে ঈশ্বরচিন্তা করছে তার আর বিষয়চিন্তা ভালো লাগবে না, আবার যে বিষয়চিন্তা করছে তার ঈশ্বরচিন্তা ভালো লাগে না। শাস্ত্র বলছেন, এই আমিত্ব, এটা মহাশত্রু। তাই সব সময় ভাবতে হবে, আমি না তুমি, তুমি মানে ঈশ্বর। সবাই 'তুমি' কিংবা সবাই 'আমি'। এই যে দৃষ্টিভঙ্গী এটার কথাই বলছেন।

দেহাত্মনা সংস্থিত এব কামী বিলক্ষণঃ কাময়িতা কথং স্যাৎ।
অতোঽর্থসন্ধানপরত্বমেব ভেদপ্রসক্ত্যা ভববন্ধহেতুঃ ॥৩১১

অন্বয়: দেহাত্মনা সংস্থিতঃ এব কামী (দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই কামনাপরায়ণ) বিলক্ষণঃ (এর বিপরীত লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ দেহাভিমানশূন্য ব্যক্তি) কথং কাময়িতা স্যাৎ (কি করে কামী হতে পারে) অতঃ (এই কারণে) অর্থসন্ধান পরত্বম্-এব (বিষয়চিন্তা-পরতাই) ভেদপ্রসক্ত্যা (অতিশয় আসক্তির দ্বারা ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করে) ভববন্ধহেতুঃ (সংসার-বন্ধনের কারণ হয়)।

সরলার্থ: দেহে যে আত্মবুদ্ধি করেছে সেই ব্যক্তিই কামনাসম্পন্ন বা কামী। যার ভাব অন্যপ্রকার অর্থাৎ যে দেহাভিমানহীন সে কি করে কামী হতে পারে? বিষয়চিন্তা-পরতাই আসক্তির সংযোগে ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করে, সংসার-বন্ধনের কারণ হয়।

ব্যাখ্যা: বলছেন, এই যে দেহাত্মবোধ, দেহবুদ্ধি, এর থেকেই কামনা-বাসনা সব আসে। আমি ভালো থাকব, ভালো খাব, খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করব, এইরকম সব কামনা। তাই বলছেন, 'দেহাত্মনা সংস্থিত এব কামী'; কামী কাকে বলে? কাম মানে কামনা, কামী মানে বাসনা আছে যার। আমি যে সন্তানের কামনা করছি, অর্থের কামনা করছি, সব নিজের জন্যে, আমি আমার জন্যে সব করছি, 'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি' (বৃ, ২।৪।৫)—এই যে ভালোবাসি নিজেকে, নিজের প্রতি ভালোবাসার জন্যেই সবাই আমার প্রিয়। 'দেহাত্মনা সংস্থিত এব কামী'; কে কামী? যে দেহটাকেই আমি মনে করে। কিন্তু আমাদের গোড়ার কথা আর শেষ কথা হচ্ছে এই যে, দেহটা আত্মার থেকে আলাদা। হ্যাঁ দেহটাকে রক্ষা করতে হবে। একথা কেউ অস্বীকার করছে না,

কিন্তু দেহসর্বস্ব হবো না। যে দেহটাকে আমি মনে করে সে কামী। 'বিলক্ষণঃ কাময়িতা কথং স্যাৎ'; যে তা করে না তার আর কামনা-বাসনা কি করে থাকবে? 'অতঃ অর্থসন্ধানপরত্বম্-এব', অতএব, 'অর্থসন্ধানপরত্বম্'—বিষয়ের প্রতি অনুরাগই, 'ভেদপ্রসক্ত্যা'—আসক্তির দ্বারা ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করছে। আত্মা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। আমি যা কিছু খুঁজছি সব বাইরে খুঁজছি তাই আত্মা থেকে সরে আসছি। আমাকে অন্তরের দিকে ফিরতে হবে। আমি যদি দেহটা আত্মা, এই ভুলটাই না করি, তাহলে 'কাময়িতা কথং স্যাৎ'—আমার আর কামনার কি থাকতে পারে? দেহকে কেন্দ্র করেই তো আমাদের যত কামনা-বাসনা, দেহটার থেকে আমি আলাদা, এই ধারণা যদি দৃঢ় হয় তাহলে আর কোনও কামনা-বাসনা থাকবে না। 'অতঃ অর্থসন্ধান পরত্বম্-এব ভেদপ্রসক্ত্যা'; অর্থ মানে হচ্ছে বিষয়। আমরা পরমার্থ বলতে বুঝি যা অর্থের উর্ধ্বে। অর্থ হচ্ছে যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, কিন্তু পরমার্থ হচ্ছে পরমাত্মা, যা শ্রেষ্ঠ, যার থেকে শ্রেয়স্কর আর কিছু হতে পারে না। পরমার্থ হচ্ছে আত্মজ্ঞান, ঈশ্বর, পরমাত্মা। বলছেন, 'অর্থসন্ধান-পরত্বম্-এব', আমাদের সব সময় অর্থের সন্ধান চলেছে। সব সময় চাই, চাই, আমি যেন ভিক্ষুক। এটাই আমাকে আত্মা থেকে পৃথক করে দিচ্ছে। আমার প্রভুত্বের দরকার, ভিক্ষাবৃত্তির নয়। আমি যে প্রভু এটা যদি বুঝে নিতে পারি, দেহাতিরিক্ত একটা কিছু আছে এটা যদি বুঝে নিতে পারি তাহলে সংসারে আর অতটা জড়িয়ে পড়ব না।

মানুষের মধ্যে একটা divine discontent থাকে। এ থাকাটা ভগবানের আশীর্বাদ, এই অতৃপ্তি না থাকলে মানুষ ভোগ-সুখ নিয়ে ভুলে থাকত। কিন্তু মানুষ তা পারে না। একটা ভালো সংসার, অর্থ আছে, মান-সম্মান আছে, সব আছে, তবু যেন সুখ নেই, শুধু এসবে তার তৃপ্তি নেই। আর কিছু কি আছে, যা আমি পেলাম না? এসব তো পাচ্ছি, হাত দিয়ে অনুভব করছি, মুখ দিয়ে স্বাদ নিচ্ছি, কিন্তু এছাড়া আর কিছু কি আছে? What else, What else? এহ বাহ্য, এ তো বাইরের, অতঃ কিম্? অতঃ কিম্? আমরা খুঁজছি, আর কি আছে ? যা পেলে আর কিছু চাইতে ইচ্ছে হবে না, সেটা খুঁজছি। সেটা আমাদের ভেতরেই আছে, কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধি আছে বলে বুঝতে পারছি না। দেহটাকে 'আমি' মনে করছি বলে হাজার রকম কামনা আমার মনে জাগছে। আর সেটাই হচ্ছে আমাদের 'ভববন্ধহেতুঃ'; ভব মানে জন্ম। জন্ম হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু। আমরা সবাই এই জন্মমৃত্যুর ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেছি। এর থেকে বেরোতে পারছি না তার কারণ আমাদের মন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। দেহ থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারলে আমার কামনা-বাসনা চলে যাবে তখন আমি আত্মাকে জানতে পারব। আনন্দের জন্যে আর বাইরের দিকে চাইতে হবে না, আমার ভেতরে যে আনন্দের

খনি আছে সেই আনন্দে আমি ডুবে থাকব। জন্ম, মৃত্যু, এই দুটোর মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় আর থাকব না।

কার্যপ্রবর্ধনাদ্বীজপ্রবৃদ্ধিঃ পরিদৃশ্যতে।
কার্যনাশাদ্বীজনাশস্তস্মাৎ কার্যং নিরোধয়েৎ॥ ৩১২

অন্বয় : কার্যপ্রবর্ধনাৎ (কার্যের বৃদ্ধি থেকে) বীজপ্রবৃদ্ধিঃ (কর্মের বীজ বাসনার বৃদ্ধি) পরিদৃশ্যতে (দেখতে পাওয়া যায়) কার্যনাশাৎ (কর্মের নাশ থেকে) বীজনাশঃ (বাসনার নাশ হয়) তস্মাৎ (সেইজন্যে) কার্যং (সকাম কর্ম) নিরোধয়েৎ (নিবৃত্ত করতে হবে)।

সরলার্থ : কার্যের বৃদ্ধি হলে কর্মের বীজ যে বাসনা তার বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যায়। আর কর্মত্যাগ হলে বাসনার নিবৃত্তি হয়। অতএব সকামকর্ম ত্যাগ করতে হবে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'কার্যপ্রবর্ধনাৎ বীজপ্রবৃদ্ধিঃ পরিদৃশ্যতে'; বাসনার থেকে অনেক কাজ হচ্ছে আবার কাজ থেকে বাসনা আসছে। এইরকম চলছে, ইংরেজিতে যাকে বলে vicious circle। গাছ থেকে বীজ, বীজ থেকে গাছ। কাজ করতে শাস্ত্র বারণ করছেন না। শুধু বলছেন, মমত্ববুদ্ধি রেখো না, 'আমি আমার' করো না। স্বামীজী বলছেন, I shall wear out rather than rust out.—কাজ করে করে আমি ক্ষয় হয়ে যাব কিন্তু বসে বসে জং ধরার মতো থাকব না। কিন্তু কিভাবে কাজ করব ? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, বড়লোকের বাড়ীর ঝিয়ের মতো থাকবে। ঝি মনিবের ছেলেকে বলছে, 'আমার হরি', কিন্তু মনে মনে সে জানে, হরি তার কেউ নয়, তার ছেলে তার বাড়ীতে আছে। অনাসক্তভাবে কাজ করতে হবে। কার্যটা যেন গাছ আর বাসনা তার বীজ। বাসনাতাড়িত হয়ে আমরা কাজ করছি আবার কাজ থেকে নতুন বাসনা আসছে, আবার কাজ আবার বাসনা, এইভাবে চলছে। 'কার্যপ্রবর্ধনাৎ বীজপ্রবৃদ্ধিঃ পরিদৃশ্যতে'; আমরা জগতে দেখতে পাচ্ছি যত কাজ করছে মানুষ ততই বাসনা বেড়ে যাচ্ছে। কত লোকে বলেন, retire করেছি আর কাজ করব না—কিন্তু কাজ শেষপর্যন্ত ঠিকই করতে থাকেন। তাই গীতায় ভগবান বলছেন, কাজ না করে আমরা থাকতে পারি না, কাজ আমাদের করতেই হয়। কিন্তু কিভাবে কাজ করব সেটাই হচ্ছে জানার। বলছেন : 'কার্যনাশাৎ বীজনাশঃ তস্মাৎ কার্যং নিরোধয়েৎ'; 'কার্যনাশাৎ' বলতে সকাম কর্মের নাশ বোঝাচ্ছেন। দুরকমের কাজ আছে—সকাম আর নিষ্কাম কর্ম। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'কর্মণ্যেব অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' (গী, ২।৪৭)—কর্মে তোমার অধিকার কিন্তু ফলে নয়। ফলের আশা না করে কি করে কাজ করা সম্ভব? ঈশ্বরার্থম্। তুমি সকলের মঙ্গলের জন্যে কাজ কর, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কাজ কর। কাজ করতে হবে নির্লিপ্ত হয়ে, অহঙ্কার না রেখে। আমার বাড়ী, আমার ঘর, এই ভাব যেন না থাকে; সব কাজ

ঈশ্বরের কাজ বলে করা, তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি করছি, এটা ঠিক ঠিক মনের মধ্যে ধরে রাখা। এইভাবে কাজ করতে পারলে আর কর্ম থেকে বাসনার বৃদ্ধি হবে না। সকলের হিতের জন্যে কাজ করছি। আমি করছি না, যেমন করাচ্ছেন তেমনি করছি। আমরা কি করি? আমরা ভাবি আমার সংসার আমি না থাকলে কে দেখবে? কে হাল ধরবে? এই করে আমরা নিজেরাও কষ্ট পাই অন্যকেও কষ্ট দিই। কাজ মানে কিন্তু শুধু হাতেকলমে কাজ নয়। কি করলে ভালো হয় সেই চিন্তা, মনে মনে কতসব পরিকল্পনা করা, এসবও কাজ, সকামকর্ম। আর সকামকর্ম যত বেশী করতে থাকব, আমার বাসনাও তত বাড়তে থাকবে, এইটা আমাদের সকলের অভিজ্ঞতা। তাই বলছেন, 'তস্মাৎ কার্যং নিরোধয়েৎ'; কার্য অর্থাৎ সকামকর্ম। যদি কোনও একটা বাসনার থেকে কাজ করি তাহলে কর্ম থেকে আবার বাসনা আসে। তাই সকাম কর্ম নাশ হলে বাসনারও নাশ হয়। কর্মের বীজ নষ্ট হয়ে গেলে আর কর্ম নেই। তাই কার্য নিরোধ করতে বলছেন। কাজ থামিয়ে দেওয়া মানে এই নয় যে অলস হয়ে বসে থাকব। কাজ করব কিন্তু অহংবুদ্ধি নিয়ে নয়, এইভাবে কাজ করলে আর বাসনার বৃদ্ধি হবে না। ঈশ্বর করাচ্ছেন তাই করছি, এইভাবে কাজ করা মানেই 'কার্যনিরোধ', সেইটে করতে বলছেন। অভ্যাসের দ্বারা এটা করতে পারা সম্ভব। ঈশ্বরচিন্তা করতে থাকলে ক্রমশ আর বিষয় প্রসঙ্গ ভালো লাগে না। ঈশ্বরের কথাই ভাল লাগে। রুচিটা বদলে যায়, মানুষটা বদলে যায়, ঈশ্বরপ্রসঙ্গই তখন ভালো লাগে। তেমনি যা করছি সব ঈশ্বরের জন্যে করছি এরকম সব সময় ভাবতে চেষ্টা করলে একসময় সব কাজই তাঁর কাজ বলে মনে হবে।

বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্যং কার্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্ধতে সর্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ততে॥ ৩১৩

অন্বয় : বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্যং (বাসনার বৃদ্ধি হলে সকাম কর্ম) বর্ধতে (বেড়ে যায়) চ (আর) কার্যবৃদ্ধ্যা (কর্মের বৃদ্ধির দ্বারা) বাসনা (বাসনা) পুংসঃ (পুরুষের) সংসারঃ (জন্ম-মরণের প্রবাহ) সর্বথা (কোন সময়) ন নিবর্ততে (নিবর্তন হয় না)।

সরলার্থ : বাসনার বৃদ্ধি হলে কাজ বেড়ে যায় আর সকামকর্ম বাড়লে বাসনাও বাড়ে। পুরুষের সংসার অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর প্রবাহ কোনও কালেই থামে না।

ব্যাখ্যা : সকামকর্ম কিভাবে আমাদের সংসারচক্রে ঘোরায় সেই কথা বলছেন। 'বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্যং কার্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা'—বাসনা যদি বাড়তে থাকে, তাহলে কাজ বাড়বে। কাজ বাড়লে আবার বাসনা বাড়বে। বাসনা থেকে কাজ, কাজ থেকে আবার বাসনা, আবার কাজ—এরকমই চলতে থাকে। এইরকম চলতে থাকে বলে মানুষ সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয় না। সংসারের জন্মমৃত্যুর চক্রে সে ঘুরতেই থাকে। বলছেন,

এরকম হলে 'পুংসঃ সংসারঃ ন নিবর্ততে', 'পুংসঃ' বললেও মানে কিন্তু নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের। বাসনা থাকলে মানুষের সংসার নিবৃত্ত হয় না, জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খাওয়া বন্ধ হয় না। এই যে জন্মমৃত্যু এ তো আমরা চলতে দিচ্ছি বলে চলছে। আমরাই তো আমাদের ভাগ্যবিধাতা। এই বাসনা—চাই, চাই, চাওয়ার আর শেষ নেই। মরে গেলাম, আবার একটা দেহ চাই ভোগের জন্যে। এই দেহটাকে বলা হয় ভোগ-আয়তন; ভোগ করব কি করে দেহ যদি না থাকে? তাই চক্রাকারে চলছে জন্ম, মৃত্যু। শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা দিচ্ছেন : জেলে জাল ফেলেছে মাছ ধরবে বলে, বেশীরভাগ মাছ কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে আছে, জেলে তাদের টেনে তুলছে। কিন্তু দু-একটা মাছ জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। দু-একজন মানুষ, যাদের বাসনা নেই, তারা ঐভাবে সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ঘুড়ির উদাহরণ দিতেন। রামপ্রসাদের গানে আছে : মা যেন ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন, কিন্তু সুতোটা নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। দু-একটা মাত্র ঘুড়ি কখনো-সখনো সুতো কেটে উড়ে যায়, মা তখন খুশি হয়ে হাততালি দেন। তা এই বাসনার জন্যেই আমাদের সংসারে যাতায়াত, আমরা নিজেরাই নিজের সংসার সৃষ্টি করি। বাসনা আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বাসনা যদি ভগবানের জন্যে হয়? সেটা কিরকম? ক্ষুদিরাম (শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃদেব) যাচ্ছেন ভাগ্নের বাড়ী, মেদিনীপুরে। মাঝে মাঝে যেতেন। পথে দেখছেন সুন্দর বেলপাতা, মনে হলো—বাঃ! কি সুন্দর বেলপাতা, এগুলো নিয়ে গিয়ে শিবের পুজো করি। বেলপাতা নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন, ভাগ্নের কাছে আর যাওয়া হলো না। এও বাসনা, কিন্তু এ বাসনায় বন্ধন নেই, এ তো নিজের জন্যে নয়। নিজের সুখের জন্যে যে বাসনা সেগুলোই বন্ধন আনে। সেই বাসনা ত্যাগ করতে হবে। কারণ, এই বাসনার জন্যে সংসারে নিবৃত্তি আর হয় না।

সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈ তদ্দ্বয়ং প্রদহেদ্‌যতিঃ।
বাসনাবৃদ্ধিরেতাভ্যাং চিন্তয়া ক্রিয়য়া বহিঃ॥ ৩১৪

অন্বয় : সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈঃ (সংসারবন্ধন ছিন্ন করার জন্যে) যতিঃ (যোগী) তদ্দ্বয়ং (এই দুটি) প্রদহেৎ (পুড়িয়ে ফেলবেন) এতাভ্যাং (এই দুটির দ্বারা) চিন্তয়া (চিন্তার দ্বারা অর্থাৎ বিষয় চিন্তার দ্বারা) বহিঃ ক্রিয়য়া (বাহ্যকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা) বাসনাবৃদ্ধিঃ (বাসনা বাড়ে)।

সরলার্থ : সংসারবন্ধন ছিন্ন করার জন্যে যিনি যোগী তিনি এ দুটো দগ্ধ করে ফেলবেন। এই দুটির দ্বারা অর্থাৎ বিষয়চিন্তা ও সেই অনুযায়ী বাহ্যকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা বাসনার বৃদ্ধি হয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈঃ তদ্দ্বয়ং প্রদহেৎ যতিঃ'; যতি মানে যিনি যত্ন করেন, সাধন করেন। সাধু বা যোগী বলতে পারা যায়। তিনি কি করেন? 'প্রদহেৎ'—পুড়িয়ে ফেলেন। কি পুড়িয়ে ফেলেন? 'তদ্দ্বয়ং'—ওই দুটো জিনিস। বাসনা আর তার ফল যে কর্ম, এই দুটোকে তিনি পুড়িয়ে ফেলেন। কেন করেন ? 'সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈঃ'—সংসারের যে বন্ধন সেটা ছেদ করার জন্যে। এই যে সংসারচক্রে আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি, বারবার জন্মাচ্ছি মরছি, এর ইতি করার জন্যে। শাস্ত্র বলছেন, এই সংসারের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসা এ তোমার নিজের হাতেই আছে, এর মধ্যে কোনও যাদু নেই। বিচার করে যা অনিত্য বলে জানবে তার থেকে মন তুলে নিয়ে সেই মন ঈশ্বরকে দিতে হয়। এটা অভ্যাস করতে হয়। বলছেন, 'অভ্যাসযোগযুক্তেন' (গী, ৮।৮), অভ্যাস একটা যোগ; যেটা প্রতিদিন করা যায়, সেটা অভ্যাস হয়ে যায়, না করলে খারাপ লাগে। ঈশ্বরচিন্তা অভ্যাস করলে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বাড়ে। আর বাসনাবৃদ্ধি কি করে হয় ? 'বাসনাবৃদ্ধিঃ এতাভ্যাং চিন্তয়া ক্রিয়য়া বহিঃ'; প্রথমে মনে মনে বিষয়ের চিন্তা করছি, তারপর কাজেও তাই করছি—এই দুটোর জন্যে বাসনা বাড়ে। আগে চিন্তা, তারপর কাজ, চিন্তাটাই তো প্রতিফলিত হয় কাজে। তাই বলছেন, তোমার মনের বাসনা যদি ত্যাগ করতে পার তাহলে কাজেও আর বাসনা থাকবে না। তোমার বন্ধন চলে যাবে।

তাভ্যাং প্রবর্ধমানা সা সূতে সংসৃতিমাত্মনঃ।
ত্রয়াণাং চ ক্ষয়োপায়ঃ সর্বাবস্থাসু সর্বদা॥ ৩১৫
সর্বত্র সর্বতঃ সর্বব্রহ্মমাত্রাবলোকনৈঃ।
সদ্‌ভাববাসনাদার্ঢ্যাত্তত্ত্রয়ং লয়মশ্নুতে॥ ৩১৬

অন্বয় : সা (সেই বাসনা) তাভ্যাং (এই দুটির দ্বারা অর্থাৎ বিষয়চিন্তা আর সকামকর্মের দ্বারা) প্রবর্ধমানা (ক্রমান্বয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে) আত্মনঃ (জীবের) সংসৃতিম্ সূতেঃ (সংসার বন্ধনের জন্ম দেয়) ত্রয়াণাং (তিনটির অর্থাৎ বাসনা, বিষয়চিন্তা আর সকামকর্মের) ক্ষয়-উপায়ঃ (ক্ষয়ের উপায়) সর্বাবস্থাসু (সকল অবস্থায়) সর্বদা (সব সময়) সর্বত্র (সর্বস্থানে) সর্বতঃ (সমস্তভাবে) সর্ব-ব্রহ্মমাত্র-অবলোকনৈঃ (সবকিছুতে শুধু ব্রহ্মদর্শনের দ্বারা) সদ্‌ভাববাসনাদার্ঢ্যাৎ (ব্রহ্মে আত্মভাবের বাসনা দৃঢ় হলে) তৎ-ত্রয়ং (এই তিনটি) লয়ম্-অশ্নুতে (আপনি লয় পায়)।

সরলার্থ : সেই বাসনা বিষয়চিন্তা আর সকামকর্মের সহযোগে বৃদ্ধি পেয়ে জীবের সংসার-বন্ধনের সৃষ্টি করে। বাসনা, বিষয়চিন্তা আর সকামকর্ম, এই তিনটির ক্ষয়ের উপায় হচ্ছে সর্ব অবস্থায়, সব সময়, সব জায়গায়, সর্বভাবে, সবকিছুতে শুধু

ব্রহ্মদর্শনের দ্বারা ব্রহ্মে আত্মভাবের বাসনা দৃঢ় করা। এটা করতে পারলেই ওই তিনটি আপনি লয় হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বলেছেন বাসনার নিবৃত্তি হলে আমাদের সংসারবন্ধন চলে যাবে, অর্থাৎ জন্ম আর মৃত্যু, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, এই প্রবাহ থেমে যাবে। এখানে বলছেন এই বাসনাকে কি করে দূর করা যায়। আমার বাসনা—বাড়ী চাই, গাড়ী চাই, অনেক ধনদৌলত চাই, মান সম্মান চাই, এই রকম সব; তারপর সেগুলো কিরকম হবে এই নিয়ে চিন্তা, আবার সেগুলো পাবার জন্যে যা করা দরকার সেইসব কাজ করা। বলছেন, এই তিনটিকেই ত্যাগ করতে হবে। বলে না, কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করতে হয়—কায় তো সবচেয়ে শেষে, তার আগে বাক্য, তারও আগে মন। মনে চিন্তা করছি, মুখে তাই নিয়ে আলোচনা করছি। আবার সেই বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কত কি করছি। এই তিনটেই ত্যাগ করতে হবে। 'তাভ্যাং প্রবর্ধমানা সা সূতে সংসৃতিম্-আত্মনঃ'; এই বাসনা আর বাসনার তৃপ্তির জন্যে আমার আকুলি-বিকুলি, তার থেকে 'সূতে'— জন্মায়; কি জন্মায়? 'সংসৃতিম্-আত্মনঃ'—আত্মার সংসৃতি। সংসৃতি মানে 'সংসারবন্ধন'। বাসনা আর বাসনাদ্বারা তাড়িত হয়ে আমরা যে চিন্তা আর কাজ করি সেগুলিই আমাদের এই সংসার-বন্ধনের কারণ। তিনটিই ত্যাগ করতে হবে। কি রকম ত্যাগ? আবর্জনার মতো ফেলে দিলাম, একবার ফেলে দিয়েছি, জঞ্জাল, সেদিকে আর তাকাব না। সব সময় এইভাবে মনকে ধরে রেখেছি, কোনও বাসনা আসতে দিচ্ছি না। এই একটা উপায়, কিন্তু নেতিবাচক উপায়। আবার ইতিবাচক উপায়ও আছে। কি সেটা? 'ত্রয়াণাং ক্ষয়-উপায়ঃ'—এই তিনটির ক্ষয়ের উপায় 'সর্ব-অবস্থাসু সর্বদা সর্বত্র সর্বতঃ সর্বব্রহ্মমাত্র-অবলোকনৈঃ', আমি সর্ব অবস্থায়, সব সময়, সব জায়গায় সর্বতোভাবে ব্রহ্মকেই দেখব। 'সর্বতঃ'—সকলভাবে তিনি রয়েছেন; 'সর্বব্রহ্মমাত্র-অবলোকনৈঃ'— সকলের মধ্যে ব্রহ্মকে সর্বত্র যখন দেখতে থাকব তখন ভোগ্যও নেই ভোগও নেই ভোক্তাও নেই। সবই তিনি, সেই ব্রহ্ম। সবাইকার মধ্যে শুধু তাঁকেই দেখছি, তিনিই রয়েছেন। এই হচ্ছে ইতিবাচক পদ্ধতি। স্বামীজী যখন পাশ্চাত্যদেশ থেকে ফিরে এলেন তার আগে থেকেই সমাজসংস্কারের কাজ খুব চলছে। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ চালু করার চেষ্টা, তারপর বাল্যবিবাহ বন্ধ করা এই রকম নানা সমাজ- সংস্কার চলছে। কিন্তু স্বামীজী বললেন, এই রকম সমাজসংস্কার করে মূল সমস্যার সমাধান হবে না। সমাজের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করতে হবে। শরীরে যদি ব্যাধি থাকে তাহলে রোগ নিরাময় করার জন্যে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হয়। আমাদের স্বাস্থ্য ভাঙে কখন? দেহে রোগ হয় কখন? যখন আমাদের দেহের সেই resistance বা প্রতিরোধ শক্তি থাকে না। স্বামীজী বলছেন, সমাজদেহে যদি শক্তিসঞ্চার করতে পারি তাহলে এই সমস্ত ব্যাধি—ছোট ছোট যত সমস্যা একটু একটু করে নয়,

একসঙ্গে দূর হয়ে যাবে। তিনি বলতেন : আমি root and branch reform চাই, গোড়া থেকে সব ঠিক করতে চাই। সমাজদেহটাকে সুস্থ, সবল করে তুললে সেটা সম্ভব। বেদান্তের ভাব সবাইকার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে, এটাই বলতেন। কত সব কুসংস্কার আমাদের সমাজে আছে! স্বামীজী বলতেন, বেদান্তের ভাব সবাইকার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে এগুলো আপনা-আপনি চলে যাবে, থাকবে না। বেদান্তের কথা বারবার শোনাতে হবে, তাহলে আর ছোট জিনিসে মন যাবে না। 'সর্বত্র সর্বতঃ সর্বব্রহ্মমাত্র-অবলোকনৈঃ' শুধু ব্রহ্মচিন্তা কর, সর্বত্র শুধু ব্রহ্ম দেখো। 'সদ্‌ভাববাসনাদার্ঢ্যাৎ তৎত্রয়ং'; কাকে 'সৎ' বলা হচ্ছে? সৎ-চিৎ-আনন্দের যে 'সৎ' সেই 'সৎ'— ঈশ্বর, ব্রহ্ম, যিনি চিরকাল আছেন। বলছেন, ব্রহ্মের চিন্তা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে কর, ডুবে যাও, তা যদি কর তাহলে 'তৎ-ত্রয়ং'— ওই তিনটি, বাসনা, বিষয়চিন্তা আর বিষয় লাভের জন্যে চেষ্টা করা, এগুলো সব চলে যাবে। এগুলো যেন সব aberrations, কতকগুলো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে— তোমার মধ্যে ব্রহ্মবুদ্ধি, ব্রহ্মভাব দৃঢ় কর, এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। 'সদ্‌ভাববাসনাদার্ঢ্যাৎ'; ঈশ্বরচিন্তা করতে ভালো লাগছে, ঈশ্বরচিন্তা করতে ইচ্ছে করছে, এই ভাবটা দৃঢ় করতে হবে। আমার চিন্তা তখন দেহকেন্দ্রিক না হয়ে ঈশ্বরকেন্দ্রিক হয়ে যাবে। আমাদের ভক্তিগ্রন্থে কিরকম সব কথা আছে ! মুখে যা বলি তা যদি ঈশ্বরের কথা না হয় তাহলে সেগুলো ভেকধবনি—ব্যাঙের ডাক, কানে যদি ঈশ্বরের কথা না শুনি, কানটা তাহলে অহি-বিবর। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে সব সময়, সর্বত্র যদি ঈশ্বরচিন্তা করতে পার তাহলে 'তৎ-ত্রয়ং'—ওই তিনটে অর্থাৎ বাসনা, বিষয়চিন্তা আর সকামকর্ম, এগুলো 'লয়ম্-অশ্নুতে'—আপনা-আপনি লয় পেয়ে যাবে, সংসারবন্ধন কেটে যাবে। এই হচ্ছে ইতিবাচক পথ। নেতিবাচক কিছু থাকবে, নিষেধ কিছু থাকবে, আবার ইতিবাচকও চাই, পুষ্টির জন্যে। ইতিবাচকটাই আসল। আমাদের বাসনা আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাসনা, বাসনার চিন্তা আর বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কাজ, এই তিনটে আমাদের সংসারবন্ধন ছিন্ন করার অন্তরায়। আমরা যদি এদের ধারাটা উলটে দিই, মোড় ঘুরিয়ে দিই, তাহলে কি হয়? আমাদের মনটা তো কখনও চিন্তাশূন্য হয় না, আবার কাজ না করেও আমরা থাকতে পারি না। তাই ভালো বাসনা, ভালো চিন্তা দিয়ে মনটা পূর্ণ করতে হবে। আর সব সময় এমন কাজ করতে হবে যা আমাকে ঈশ্বরের দিকে, পরমার্থের দিকে নিয়ে যায়। শাস্ত্র আমাদের স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন, সব সময়, সবরকমে ব্রহ্মকেই দেখো সর্বত্র। যেসব ছোট ছোট বিষয়ে বাসনা আছে তোমার, তার জায়গায় 'সৎ' অর্থাৎ ঈশ্বরের বাসনা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তোলো। অভ্যাস করতে করতে এরকম হয়—ঈশ্বরের চিন্তা, জপ, ধ্যান এসবই ভালো লাগে অন্য কিছু আর ভালো লাগে না। ব্রহ্মের ভাব, তাঁর মধ্যে ডুবে থাকার বাসনা দৃঢ় করতে হবে, এই বাসনা গভীর করতে হবে। তাহলে

'তৎ-ত্রয়ং', ওই যে তিনটে কাঁটা, বাসনা বিষয়চিন্তা আর সকামকর্ম, একটার থেকে আর একটা আসছে, ওই তিনটিই তখন আপনা-আপনি লয় হয়ে যাবে। বিষয়চিন্তা আর ভালোই লাগবে না। ঈশ্বরচিন্তায় মন গেলে বিষয়চিন্তা ভালো লাগে না।

ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্‌বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে॥ ৩১৭

অন্বয় : ক্রিয়ানাশে (সকামকর্মের নাশ হলে) চিন্তানাশঃ (বিষয়চিন্তার নাশ) অস্মাৎ (এর থেকে) বাসনাক্ষয়ঃ (বাসনার ক্ষয়) ভবেৎ (হয়) বাসনাপ্রক্ষয়ঃ (বাসনার প্রকৃষ্টরূপে ক্ষয়) মোক্ষঃ (মুক্তি) সা (এই বাসনাশূন্য অবস্থা) জীবন্মুক্তিঃ (জীবন্মুক্তি) ইষ্যতে (বলে কথিত হয়)।

সরলার্থ : সকামকর্মের নাশ হলে বিষয়চিন্তার নাশ হয় আর তার থেকে বাসনা ক্ষয় হয়ে যায়। বাসনার পুরোপুরি ক্ষয় হওয়া মানে মোক্ষ। এই অবস্থাকেই জীবন্মুক্তি বলে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, এই বাসনার ক্ষয় করবে কি করে? আগে কর্মটাকে বন্ধ করতে হবে, কর্ম মানে সকামকর্ম। তখন আস্তে আস্তে বিষয়চিন্তা বন্ধ হয়ে যাবে, তারপর বাসনা চলে যাবে। যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি আবার সেই সিঁড়ি দিয়েই তো উঠতে হবে। বলছেন, 'ক্রিয়ানাশে চিন্তানাশঃ'; 'ক্রিয়ানাশঃ' অর্থাৎ আমি কোনও কাজ করছি না। কিন্তু আমরা তো জানি কাজ না করে আমরা থাকতে পারি না; ক্রিয়ানাশ বলতে সকামকর্মের নাশ বোঝাচ্ছেন, নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্যে যে কাজ সেই কাজের নাশ হওয়ার কথা বলছেন। আমরা তো বাসনা নিয়ে কাজ করি, ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করি, বলছেন, এরকম কাজ থামিয়ে দাও। আমি নিজের কোনও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করছি না, সবাইকার মঙ্গলের জন্যে কাজ করছি। তার মানেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কাজ করছি; তিনি তো সর্বভূতে আছেন তাই লোকহিতার্থং আর ঈশ্বরার্থং একই অর্থ। এই কাজে আমি কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা করছি না। তার মানে কি কাজ নিষ্ফল হোক, এরকম চাইছি? তা নয়। আমি নিজের জন্যে কিছু চাইছি না, কাজের ফলাফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে দিয়েছি; এই হচ্ছে ক্রিয়ানাশ। এ কর্মে বন্ধন নেই। 'ক্রিয়ানাশে ভবেৎ চিন্তানাশঃ'; সকামকর্ম না করলে বিষয়চিন্তা আর হবে না আবার বিষয়চিন্তা না হলে বাসনা আর থাকবে না। যেভাবে উঠেছি—বাসনা, বিষয়চিন্তা, কর্ম—আবার সেই ভাবেই নামছি; কর্মত্যাগ, তার থেকে বিষয়চিন্তার নাশ আবার তার থেকে বাসনার ক্ষয়। তাহলে কি অবস্থা? 'বাসনাপ্রক্ষয়ঃ মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিঃ-ইষ্যতে'; 'প্রক্ষয়ঃ'—পুরোপুরি ক্ষয়, প্রকৃষ্টরূপে ক্ষয়, বাসনার সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়। 'বাসনাপ্রক্ষয়ঃ মোক্ষঃ'—এই বাসনার ক্ষয় হলেই তো 'মোক্ষঃ'— মুক্তি। আমাদের

এই আমিটাই তো সব বন্ধনের কারণ, আমার তুষ্টির জন্যে বাসনার জাল সৃষ্টি করে তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকি আমরা, যে আমি সর্বব্যাপী তাকে ছোট একটুখানি দেহের মধ্যে পুরে রেখেছি। এ যদি না করি, 'আমি আমার' যদি না করি তাহলে লোককল্যাণের যে বাসনা তাতে কোনও বন্ধন নেই। যে সর্বব্যাপী যে মহৎ, তাকে আর বাসনা বাঁধতে পারে না। তা যদি হয় তো— 'মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিঃ-ইষ্যতে'; আমি মরে গেলাম তারপর মুক্ত হয়ে গেলাম, এতে তো কোনও মজা নেই। জীবদ্দশাতেই যদি সব বাসনা চলে যায়, আমি মুক্ত হয়ে যাই তাহলে শুধু দ্রষ্টারূপে আমি আনন্দে থাকতে পারি। 'ক্রিয়ানাশে ভবেৎ চিন্তানাশঃ অস্মাদ্ বাসনাক্ষয়ঃ'; ক্রিয়া যা করব তা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করব; 'যৎ কৃতম্ যৎ উক্তম্ যৎ স্মৃতম্', সব তোমার উদ্দেশ্যে দিয়ে দিলাম। পুজো করছি, পুজোর যে ফল তাও ঈশ্বরকে দিয়ে দিচ্ছি। আর তো বাসনা নেই, এই ভাবই জীবন্মুক্তি। বলছেন,'বাসনাপ্রক্ষয়ঃ মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিঃ ইষ্যতে'; বাসনার সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়, তার নামই হচ্ছে 'মোক্ষঃ' সেটাই মুক্তি আবার একেই জীবন্মুক্তি বলা হয়।

সদ্‌বাসনাস্ফূর্তিবিজৃম্ভণে সত্যসৌ বিলীনাপ্যহমাদিবাসনা।
অতিপ্রকৃষ্টাপ্যরুণপ্রভায়াং বিলীয়তে সাধু যথা তমিস্রা।। ৩১৮

অন্বয় : সদ্‌বাসনাস্ফূর্তি বিজৃম্ভণে সতি (ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনার বিশেষ প্রকাশ হলে) অসৌ অহম্-আদি বাসনা অপি (এই আমি-আমার ভাব ও দেহকেন্দ্রিক বাসনাও) বিলীনা (লয় হয়ে যায়) যথা (যেমন) অতি প্রকৃষ্ট অপি তমিস্রা (অত্যন্ত গাঢ় অন্ধকারও) অরুণপ্রভায়াং (প্রাতঃসূর্যের আলোয়) সাধু (সহজেই) বিলীয়তে (বিলীন হয়ে যায়)।

সরলার্থ : রাত্রির গাঢ় অন্ধকার যেমন প্রাতঃ সূর্যের প্রভায় সহজেই বিলীন হয়ে যায় তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা প্রবল হলে এই আমি-আমার ভাব ও দেহকেন্দ্রিক বাসনারও লয় হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : ভক্তেরা বলেন, আমরা ঈশ্বরলাভ করতে চাই। আর বেদান্তী বলেন, আমরা ব্রহ্মজ্ঞান চাই। আপাতদৃষ্টিতে একই ব্যাপার।বলছেন, যেমন ভোরবেলায় সূর্য উঠলে রাত্রির ঘন অন্ধকার চলে যায় তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা তীব্র হলে বা ঈশ্বরে অনুরাগ হলে বিষয়ে অনুরাগ আপনা-আপনি চলে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এক জায়গায় একটা ঘর অন্ধকারে আছে একশ বছর ধরে, একটা যদি দেশলাই কাঠি জ্বাল তো সেই অন্ধকার নিমেষে চলে যাবে। সেই কথাই এখানে বলছেন। 'সদ্‌বাসনা স্ফূর্তি'—'স্ফূর্তি' মানে প্রকাশ, 'সৎ' মানে ঈশ্বর, ব্রহ্ম। ঈশ্বরকে লাভ করার বাসনা যদি বাড়তে থাকে—আর কিছু চাই না। অর্থ, প্রতিষ্ঠা, সন্তান-সন্ততি, স্বর্গকামনা, এসব চাই না শুধু 'সদ্‌বাসনা', ঈশ্বর লাভের আকাঙ্ক্ষা, এটা যদি প্রবল হয়—

'বিজৃম্ভণে সতি', তাহলে 'অসৌ অহম্-আদি বাসনা অপি বিলীনা', এই যে আমি-আমি ভাব, অহঙ্কার এসব বিলীন হয়ে যাবে। বলছেন, 'অহমাদি বাসনা', শুধু তো আমি নয়, আমি-আমার করে করে একটা জাল সৃষ্টি করছি, জগৎ জোড়া জাল। আমি-কেন্দ্রিক বাসনার সেই জাল বিলীন হয়ে যাবে, সৎচিন্তা যদি করি। ঈশ্বরচিন্তায় যদি আমার অনুরাগ হয় তাহলে অন্য সব বিষয়ে আকর্ষণ আপনি চলে যাবে। ঈশ্বরে আকর্ষণ হলে বিষয়ে বিকর্ষণ হবে। 'অতিপ্রকৃষ্ট-অপি-অরুণপ্রভায়াং বিলীয়তে সাধু যথা তমিস্রা'; সূর্যের আলো যেই দেখা দেবে অমনি 'অতি প্রকৃষ্ট-অপি তমিস্রা', খুব ঘন অন্ধকারও 'বিলীয়তে'— বিলীন হয়ে যায়। তেমনি তোমার অত্যন্ত দৃঢ় পুরোনো সব বাসনাও ঈশ্বর অনুরাগ এলে দূর হয়ে যাবে। 'বিলীয়তে সাধু'—সহজেই দূর হয়ে যায়। যখনই আমার ঈশ্বর অনুরাগ বাড়বে তখন আর কিছুই আমার ভালো লাগবে না ঈশ্বর ছাড়া। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এরকম দেখেছি, আর কিছুই চাচ্ছেন না, শুধু ঈশ্বরকে পাবার বাসনা। যেমন খুব ঘন অনেক দিনের অন্ধকার—সূর্যের আলোয় অনায়াসে চলে যায়, তেমনি আমাদের আমি-কেন্দ্রিক যত পুরোনো বাসনা, ঈশ্বর লাভের আকাঙ্ক্ষায় সব দূর হয়ে যায়। ঈশ্বর অনুরাগ যদি লাভ করতে পারি, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছেটাকে যদি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারি, মনটাকে যদি মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারি, তাহলেই মন থেকে অন্য সব বাসনা চলে যাবে।

তমস্তৎকার্যমনর্থজালং ন দৃশ্যতে সত্যুদিতে দিনেশে।
তথাঽদ্বয়ানন্দরসানুভূতৌ ন বাস্তি বন্ধো ন চ দুঃখগন্ধঃ।। ৩১৯

অন্বয় : উদিতে দিনেশে সতি (সূর্যোদয় হলে) তমঃ (অন্ধকার) তৎকার্যম্-অনর্থজালম্ (এর কাজ, সমস্ত কষ্টদায়ক অবস্থা ও যত অনর্থের বিস্তার) ন দৃশ্যতে (দেখতে পাওয়া যায় না) তথা (সেইরকম) অদ্বয়-আনন্দরস-অনুভূতৌ (অদ্বিতীয় আনন্দরসের অনুভূতি হলে) বন্ধঃ (বন্ধন) ন বা অস্তি (থাকে না) ন চ দুঃখগন্ধঃ (দুঃখের লেশও থাকে না)।

সরলার্থ : সূর্যোদয় হলে অন্ধকার ও অন্ধকারের আবরণে সংঘটিত যত অন্যায় কাজ ও কষ্টদায়ক অবস্থা আর দেখতে পাওয়া যায় না। সেইরকম অদ্বয় ব্রহ্মানন্দরসের অনুভূতি হলে বন্ধন চলে যায়, দুঃখের লেশও থাকে না।

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকে বলেছেন 'অরুণ প্রভায়াং'—ভোরের সূর্যের আলোয়— ঘন অন্ধকার যেমন চলে যায় তেমনি ঈশ্বর-অনুরাগ হলে আমি-কেন্দ্রিক সমস্ত দৃঢ়মূল বাসনা নষ্ট হয়ে যায়। এখন বলছেন, 'উদিতে দিনেশে সতি'—সূর্য যখন পূর্ণমহিমায় দিনের ঈশ্বররূপে উদিত হন, তখন অন্ধকার আর দেখতে পাওয়া যায় না। আর অন্ধকারের আড়ালে যেসব অকাজ-কুকাজ চলতে থাকে ও তার জন্যে যেসব কষ্ট হয়,

তা-ও সূর্যের আলো এলে আর দেখতে পাওয়া যায় না। এগুলোকে 'অনর্থজালং' বলছেন। অন্ধকারের সুযোগে অনর্থ ঘটানোর জন্যে যেন একটা জাল বিস্তার করা হয়েছে, যেন ফাঁদ পাতা আছে, যে কেউ তাতে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু দিনের আলো ফুটে উঠলে এসব কোথায় মিলিয়ে যায়। তেমনি যদি 'অদ্বয়-আনন্দরস-অনুভূতি' হয়, যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, যদি আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তাহলে সেই আনন্দের প্লাবনে সব বন্ধন চলে যাবে। 'ন বা বন্ধঃ ন চ দুঃখ-গন্ধঃ'—কোনও বন্ধন থাকবে না, দুঃখের লেশমাত্রও থাকবে না। অহঙ্কারের প্রভাবে আমাদের অন্তর তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেই অবস্থায় অন্ধের মতো 'আমি-আমার' করে বাসনার জাল বিস্তার করে তাতে বদ্ধ হয়ে আছি। ঈশ্বর অনুরাগের অরুণাভায় আমাদের মনের অন্ধকার কেটে যাবে, তারপর সেই অনুরাগ গাঢ় হলে আমরা যখন তিনিই শুধু আছেন এটা বুঝব তখন সেই 'অদ্বয়-আনন্দরসের অনুভূতিতে' বন্ধনের শেষ হবে। বাসনা থেকেই তো বন্ধন আবার অহংবুদ্ধি থেকেই বাসনা। তাই আত্মসাক্ষাৎকার হলে অহঙ্কার চলে যায়, বাসনাও আর থাকে না।

দৃশ্যং প্রতীতঃ প্রবিলাপয়ন্ সন্
সন্মাত্রমানন্দঘনং বিভাবয়ন্।
সমাহিতঃ সন্ বহিরন্তরং বা
কালং নয়েথাঃ সতি কর্মবন্ধে ॥ ৩২০

অন্বয় : বহিঃ-অন্তরং বা (বাইরে বা অন্তরে) প্রতীতঃ (চিন্তায় বিধৃত) দৃশ্যং (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ) প্রবিলাপয়ন্ সন্ (সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করে) আনন্দঘনং সৎ-মাত্রং বিভাবয়ন্ (অবিমিশ্র আনন্দস্বরূপ সত্তামাত্রের চিন্তা করে) সমাহিত সন্ (সমাহিত থেকে) কর্মবন্ধে সতি (প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় পর্যন্ত) কালং নয়েথাঃ (সময় কাটাবে)।

সরলার্থ : বাইরে বা অন্তরে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের যে অনুধাবন তার সম্পূর্ণ বিলোপ করে শুধু অবিমিশ্র আনন্দস্বরূপ সত্তামাত্র ব্রহ্ম যিনি, তাঁর ভাবনায় নিবিষ্ট হয়ে সমাহিত থেকে প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় পর্যন্ত কাল কাটাবে।

ব্যাখ্যা : আগে জীবন্মুক্তির কথা বলেছেন, এখন বলছেন, এই জীবন্মুক্ত পুরুষ, সে কি রকম? 'দৃশ্যং প্রতীতঃ প্রবিলাপয়ন্ সন্'; সব উড়িয়ে দিচ্ছে, যা কিছু দেখছে তা মনে মনে অগ্রাহ্য করছে। 'প্রবিলাপঃ'—সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করছে। 'বহিরন্তরং'—বাইরের জগতে যা দেখছে বা ভেতরে যা অনুভব করছে, সব বিলোপ করে দিচ্ছে, ব্রহ্মে সমর্পণ করে দিচ্ছে। কি রকম? ওই রজ্জু সর্প; দড়িটাকে সাপ মনে করে আমি কত কাণ্ডকারখানা করলাম, আলো এলো অমনি ভুল করে দেখা সাপটা মিলিয়ে গেলো।

মায়ার দুটো শক্তি তো, আবরণী আর বিক্ষেপী; চিত্তবিক্ষেপ ঘটে গেলো, কিন্তু এত সব চিত্তবিক্ষেপ সব শেষ হলো ওই দড়িতে, সাপটা দড়িতে পর্যবসিত হলো। 'প্রবিলাপয়ন্', এই যে জগৎ, এত কাণ্ডকারখানা এত বৈচিত্র—সব বিলোপ করে দিতে হবে ব্রহ্মে। এই নিয়ে কত তর্ক ! বেদান্তবাদীরা বলেন, একটা সৎবস্তু, নিত্যবস্তু নিশ্চয় আছে, সেটা অধিষ্ঠান, তার ওপর সবকিছু দাঁড়িয়ে আছে। এ জগৎ মিথ্যা ঠিক কথা, কিন্তু একটা নিত্যবস্তুর ওপর একে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে। দড়িটাতে সর্পভ্রম হলো, কিন্তু দড়িটা আছে বলেই তো ভ্রম হতে পারল, দড়িটা অধিষ্ঠান। মরীচিকা দেখি আমরা, সেটা দৃষ্টিভ্রম, কিন্তু মরুভূমি আছে বলেই তো মরীচিকা দেখছি। অনিত্য বলে বলে উড়িয়ে দিচ্ছি, কিন্তু 'সৎ' আছে বলেই অনিত্যবস্তু দাঁড়িয়ে আছে। যখন জীবন্মুক্তি হয়ে গেছে তখন সব ব্রহ্ম, 'ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্' (গী, ৪।২৪)। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। তিনিই চোর হয়েছেন, তিনিই পুলিস হয়েছেন, তিনিই হাকিম আবার তিনিই জেলর, জেল খাটাচ্ছেন। 'সৎ মাত্রং আনন্দঘনং বিভাবয়ন্'; 'আনন্দঘন', ঘন—তার মধ্যে ভেজাল নেই, ওপরে আনন্দ, মাঝখানে আনন্দ, নীচে আনন্দ। সেই আনন্দের কোনও ছেদ নেই, তাতে কোনও কিছুর মিশ্রণ নেই, শুধু আনন্দ। 'সৎমাত্রম্-আনন্দঘনং' যিনি, তাঁর চিন্তাই করছি। বলছেন, 'সমাহিত সন্'—সমাহিত হয়ে এইভাবে জীবন কাটাও। এই হলো জীবন্মুক্ত। গীতাতে বলছেন, স্থিতপ্রজ্ঞ। যার প্রজ্ঞা কখনও সরে যায় না, বিচলিত হয় না, সব সময় একই ভাবে থাকে সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। জীবন্মুক্তই স্থিতপ্রজ্ঞ। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন, স্থিতপ্রজ্ঞ কাকে বলে আর সমাধিস্থ অবস্থাটাই বা কি রকম? 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিম্ আসীত ব্রজেত কিম্'॥ (গী, ২।৫৪) ভগবান উত্তর দিচ্ছেন, 'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে' ॥ (গী, ২।৫৫) বলছেন, মনের সমস্ত বাসনা সে ত্যাগ করেছে। বাসনাই তো যত বন্ধনের কারণ, যদি নির্বাসনা হতে পারি তাহলে আর কোনও বন্ধন নেই। স্থিতপ্রজ্ঞের কোন বাসনা থাকে না। 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ'—নিজের মধ্যে নিজে তুষ্ট; আপ্তকাম, পূর্ণকাম; আর কিছু পাবার নেই। রামপ্রসাদ বলছেন, 'আপনাতে আপনি থাক মন, যেও নাকো কারও ঘরে।' একবার যদি নিজের স্বরূপে স্থিত হয়ে যাই, আমি কে তা বুঝে নিতে পারি, তাহলে আর কিছু পাবার থাকে না। স্বামীজী গান গাইতেন, 'সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে', আমরা বিদেশীর মতো আছি, alienated হয়ে গেছি, নিজেকে জানছি না, চিনছি না। বলছেন, 'আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ'—যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি নিজের মধ্যে নিজে তুষ্ট, 'দুঃখেষু-অনুদ্বিগ্নমনাঃ' (গী, ২।৫৬), দুঃখ আসবে কি সুখ আসবে জানি না, কোনও উদ্বেগ নেই, দুঃখ এলে আসবে। 'সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' (গী, ২।৫৬)—সুখ এলেও কোন কিছু নেই। সুখ-দুঃখ দুটোই তাঁর

কাছে সমান। 'বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে'—কোনও কিছুতে বিশেষ অনুরাগ নেই, ভয় নেই, ক্রোধ নেই, এরকম যে সেই স্থিতধীঃ। স্থিতধীঃ মানে সে জানে 'আমি আত্মা'। এই বুদ্ধি, এই জ্ঞানে সে স্থিত। একটু-একটু নয়, ভাসা-ভাসা নয়, দৃঢ় প্রত্যয়। সেই জীবন্মুক্ত। এটা হলো গীতার কথা। আর এখানে বলছেন, যে জীবন্মুক্ত সে কি করে ? 'দৃশ্যং প্রতীতঃ', দৃশ্য মানে যা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যা দেখছি, আর 'প্রতীতঃ'—মনের মধ্যে কত কি চিন্তা করছি; এসব আমি মিথ্যা বলে ত্যাগ করে দিয়েছি। 'সন্মাত্রম্-আনন্দঘনং বিভাবয়ন্' সব সময় 'সৎ' যিনি, 'আনন্দঘন' যিনি তাঁর চিন্তা করে, 'সমাহিত সন্', ডুবে গিয়ে, 'কালং নয়েথাঃ'—কাল কাটাবে। কতদিন? 'সতি কর্মবন্ধে', যতদিন প্রারব্ধ কর্ম আছে ততদিন। আর প্রারব্ধ যখন শেষ হবে, ব্যস্, সেই মুহূর্তেই শরীর চলে যাবে।

প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন।
প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ ৩২১

অন্বয় : ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং (ব্রহ্মনিষ্ঠায়) প্রমাদঃ (ভ্রমবশতঃ অবহেলা) কদাচন ন কর্তব্যঃ (কখনও করা উচিত নয়) প্রমাদঃ মৃত্যুঃ (এই ভ্রম মৃত্যুতুল্য) ব্রহ্মণঃ সুতঃ (ব্রহ্মার মানসপুত্র) ভগবান (ভগবান সনৎকুমার) ইতি আহ (এই কথা বলেছেন)।

সরলার্থ : ব্রহ্মনিষ্ঠায় ভুল করেও বিচ্যুতি হওয়া কখনও উচিত নয়। এই বিচ্যুতি মৃত্যুর সামিল, একথা বলেছেন ব্রহ্মার মানসপুত্র ভগবান সনৎকুমার।

ব্যাখ্যা : এখানে বারবার করে সাবধান করে দিচ্ছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠা, ব্রহ্মচিন্তা থেকে ক্ষণিকের জন্যেও সরে এসো না। যদি তা কর, তোমার ব্রহ্মনিষ্ঠায় যদি কোনও ফাঁক রাখো তাহলে দেখবে সেই ফাঁক দিয়ে বিষয়চিন্তা কখন ঢুকে পড়েছে। সে আবার তোমায় বিপদে ফেলে দেবে। এখানে সেই কথাই আবার আরও জোর দিয়ে বলেছেন। 'প্রমাদঃ ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন'; এই ব্রহ্মচিন্তায় প্রমাদ যেন কখনও না হয়। 'প্রমাদঃ'—ভুল, এ যেন না হয়; আগে পড়েছি সব সময় 'সর্ব-ব্রহ্মমাত্র-অবলোকনৈঃ', এর যেন ছেদ না হয়, এই একটু একটু হচ্ছে আবার কেটে যাচ্ছে, না, এরকম না, কোনও ছেদ থাকবে না, তৈলধারাবৎ। 'প্রমাদঃ মৃত্যুঃ'—এই প্রমাদ মৃত্যু। যদি এরকম হয়, ছেদ হয়, ভুলে যাই, অন্য চিন্তা করি, তাহলে সেটা মৃত্যুর সমান; 'ইতি আহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ'; ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার এই কথা বলছেন। তুমি যদি ব্রহ্মচিন্তা থেকে সরে যাও বিচলিত হও তাহলেই তোমার মৃত্যু। সত্যিই তো, আমরা তো সব মরেই আছি। নিজের স্বরূপকে ভুলে গেছি, আত্মবিস্মৃত, এর নামই তো মৃত্যু। তোমার ঈশ্বরের দিকে মন যাচ্ছে, সাবধান থেকো সেই মন আবার বিষয়ের দিকে না যায়; সে

বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে। ঈশ্বরের কথা শুনতে ভালো লাগে, ব্রহ্মচিন্তা করতে ভালো লাগে—এই যে অবস্থা, এই হলো ব্রহ্মনিষ্ঠা, যেন একটা নেশা হয়েছে, এটাই ভালো লাগছে, এটা না হলে যেন চলছে না—খুব ভাগ্যের কথা, কিন্তু এই ভাব সাবধানে ধরে রাখতে বলছেন। 'সত্যাৎ ন প্রমাদিতব্যং'—সরে যেও না কখনও, ভুলে যেও না কখনও, তোমার ভালোবাসা যেন ঠিক থাকে। ব্রহ্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরচিন্তা, ঈশ্বর অনুরাগ, এর থেকে সরে যেও না, এ-বিষয়ে অলসতা যেন না আসে। সতর্ক করে দিচ্ছেন, 'প্রমাদঃ ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন', ব্রহ্মনিষ্ঠায় কখনও যেন ভুল না হয়। 'প্রমাদো মৃত্যুঃ'—প্রমাদ মৃত্যুতুল্য, আত্মহনন। গীতাতে ভগবান বলছেন, তুমি নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা, তুমি জেনেশুনে যদি মৃত্যুর দিকে ছোট তাহলে তার ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে। ঈশ্বরের পথই জীবনের পথ, সে পথে যেতে হবে। শুভক্ষণ এসে গেছে, একে হারিও না। ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছো, এখন আর ভুল করো না। 'প্রমাদঃ ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন'; সরে যেয়ো না, এই ব্রহ্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরচিন্তার এই নেশা, এর থেকে সরে যেয়ো না। যদি যাও তাহলে 'মৃত্যুঃ'। একথা কে বলেছে? ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার বলেছেন।

ন প্রমাদাদনর্থোঽন্যো জ্ঞানিনঃ স্বস্বরূপতঃ।
ততো মোহস্ততোঽহংধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা॥ ৩২২

অন্বয় : জ্ঞানিনঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির) স্বস্বরূপতঃ (নিজের স্বরূপচিন্তায়) প্রমাদাৎ (অবহেলার থেকে) অন্যঃ (অন্য কিছু) অনর্থঃ ন (বিপদ আর হয় না) ততঃ (স্বরূপচিন্তার অভাব থেকে) মোহঃ (মোহ আসে) ততঃ (তার থেকে) অহংধীঃ (অহংবুদ্ধি) বন্ধঃ (সংসারবন্ধন) ততঃ (তার থেকে) ব্যথা (দুঃখ)।

সরলার্থ : ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে স্বরূপচিন্তায় অবহেলার থেকে অন্য বিপদ আর হয় না। আত্মচিন্তার অভাব থেকে মোহ জন্মায়, মোহ থেকে অহংবুদ্ধি আসে, তার থেকে সংসারবন্ধন আর সংসারবন্ধন থেকে অপার দুঃখ।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'ন প্রমাদাদ্-অনর্থঃ-অন্যঃ জ্ঞানিনঃ স্বস্বরূপতঃ'; যে জ্ঞানপথের সাধক, তার কাছে এই 'প্রমাদঃ' অর্থাৎ নিজের স্বরূপচিন্তা ভুলে যাওয়ার থেকে অনর্থ বা বিপদ আর কিছু নেই। স্বস্বরূপ থেকে আমার মন অন্য দিকে চলে গেছে। স্বস্বরূপচিন্তা মানেই ব্রহ্মচিন্তা, তার থেকে মন যদি অন্য দিকে চলে যায় তার চেয়ে বিপদ আর কি হতে পারে? যদি প্রমাদ হয়, যদি আমি স্বরূপচিন্তা ভুলে যাই, তাহলে ধাপে ধাপে নেমে যাব। 'ততঃ মোহঃ-ততঃ-অহংধীঃ-ততঃ বন্ধঃ-ততঃ ব্যথা'; এই স্বরূপচিন্তা, ঈশ্বরচিন্তা থেকে সরে এলেই মোহ এসে পড়বে, বিষয়বাসনা, অহঙ্কার, বন্ধন, দুঃখ,

সব এসে পড়বে। গৃহস্থ ঘুমোচ্ছে, চোর যেন টের পেয়েছে, তাই এসে পড়েছে। চোর সব খবর রাখে, কখন গৃহস্থ কি করছে, কখন ঘুমোয় কখন জাগে, সব সে জানে। যেই দেখেছে ঘুমোচ্ছে, অমনি সুযোগ বুঝে ঢুকে পড়েছে। 'ততঃ মোহঃ'—গভীর মোহ; প্রথমে মোহ এলো। তারপর কি হবে? ধাপে ধাপে নামছি, ঈশ্বরচিন্তা থেকে সরে এসেছি, প্রমাদ হয়েছে, অমনি একটা মোহ বা মাদকতা আমায় পেয়ে বসেছে; তার থেকে আবার 'অহংধীঃ'—অহঙ্কার, অহংবুদ্ধি। এই অহঙ্কারের কথা অনেকবার বলেছেন। অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি'। এই আমি-কেন্দ্রিক জীবন, দেহকেন্দ্রিক জীবন, দেহের দাস হয়ে থাকা, তার সেবা করা—এসব এসে গেলো। তারপর 'বন্ধঃ', এই বন্ধন আরম্ভ হলো, 'আমি' থেকেই বন্ধন। 'ততঃ ব্যথা', তার থেকেই যত দুঃখ। অজ্ঞান বন্ধন, জ্ঞান মুক্তি। ঈশ্বরচিন্তায় ছিলাম, ওইখান থেকে কোথায় পড়ে গেলাম। ঈশ্বরকে ধরে থাকতে পারলাম না বলেই পড়ে গেলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ছোট ছেলে যেমন শক্ত করে মার আঁচলটা ধরে রাখে সেইরকম শক্ত করে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকতে হয় বা এই ব্রহ্মচিন্তাকে ধরে রাখতে হয়। নাহলেই প্রমাদ, নাহলেই বিপদ, দুঃখ, ব্যথা। আত্মজ্ঞান লাভের পথে একজন হয়তো অনেক এগিয়ে গেছে, তখনও যদি সে ভুল করে ব্রহ্মচিন্তা থামিয়ে দেয় তাহলেই অনর্থ হবে, মোহ এসে গ্রাস করবে, অজ্ঞান এসে যাবে। তারপর অহঙ্কার আসবে। তারপরেই বন্ধন, হাতে শেকল পড়লো। অহঙ্কার এলো, অমনি হাতে শেকল পড়লো, আর তার থেকে দুঃখ। সেইজন্যে বলছেন, খুঁটি ধরে থাকো, ব্রহ্মনিষ্ঠা তোমার খুঁটি, শক্ত করে সেটা ধরে থাকো, তাহলে সংসারে আর ব্যথা পাবে না।

বিষয়াভিমুখং দৃষ্ট্বা বিদ্বাংসমপি বিস্মৃতিঃ।
বিক্ষেপয়তি ধীর্দোষৈর্যোষা জারমিব প্রিয়ম্।। ৩২৩

অন্বয় : বিদ্বাংসম্-অপি (বিদ্বান ব্যক্তিকেও) বিষয়াভিমুখং দৃষ্ট্বা (বিষয়মুখী দেখে [স্পষ্ট হয়]) বিস্মৃতিঃ (স্বরূপজ্ঞানের বিস্মরণ) ধীর্দোষৈঃ (বুদ্ধির বিকারজনিত দোষসমূহের দ্বারা) বিক্ষেপয়তি (বিক্ষেপের সৃষ্টি করে) ইব (যেমন) যোষা (নারী) প্রিয়ম্ জারম্ (প্রিয় উপপতিকে [বিচলিত করে])।

সরলার্থ : বিদ্বান ব্যক্তিকেও বিষয়মুখী হতে দেখে এটাই স্পষ্ট হয় যে স্বরূপজ্ঞানের বিস্মরণ হলে বুদ্ধি কাম ক্রোধ ইত্যাদি দোষসমূহের দ্বারা বিক্ষেপের সৃষ্টি করে, যেমন অসতী নারী প্রিয় উপপতিকে আকর্ষণ করে বিচলিত ও বিভ্রান্ত করে তোলে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, দেখো, তুমি বিদ্বান ব্যক্তি, অনেক বেদান্ত শাস্ত্র পড়েছ, কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য এ সম্বন্ধে তোমার ধারণা আছে। তাহলেও প্রারব্ধের জন্যে তোমার গোলমাল হতে পারে। বলছেন, 'বিষয়-অভিমুখং দৃষ্ট্বা বিদ্বাংসম্-অপি বিস্মৃতিঃ'; বিদ্বান ব্যক্তিরও বিষয়ের দিকে মন যেতে দেখা যায়। এতক্ষণ ব্রহ্মচিন্তা করছিলাম এখন বিষয়চিন্তা করছি, বিষয়ের দিকে মন গেছে। 'বিস্মৃতিঃ'—ভুল হয়ে গেছে। এত যে শাস্ত্রজ্ঞান হয়েছে, সব ভুলে গেলাম। বিষয়চিন্তা এমনি জিনিস, যার ঈশ্বর-অনুরাগ আছে, তাকেও ভুলিয়ে দেয়। মোহরূপ মেঘ এসে জ্ঞানকে ঢেকে ফেলল। 'বিক্ষেপয়তি ধীর্দোষৈঃ'; কামনা, বাসনা, আসক্তি, ক্রোধ, দ্বেষ, ভয়, এসব দোষ এসে আমার বুদ্ধিকে এলোমেলো করে দিল। আর তাতে কি হলো? চিত্তচাঞ্চল্য, বিক্ষেপ, বিভ্রান্তি এসব হলো। বিষয় কিরকম আকর্ষণ করে? 'যোষা জারম্-ইব প্রিয়ম্'; একজন অসতী নারী তার প্রিয় উপপতিকে যেরকম আকর্ষণ করে। এতদিন পর্যন্ত হয়তো করেনি, হয়তো সে লক্ষ্যের দিকে অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু ওই যে একটু অসাবধানতা, একটু অন্যমনস্কতা, সব গুলিয়ে দিল। এই মায়া, অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া সব ওলটপালট করে দিল। কেউ যেন না মনে করেন মায়া থেকে বেরিয়ে এসেছি। মায়ার কাছে সব সময় হাত জোড় করে থাকতে হয়, বলতে হয়, 'মা', তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আমায় মুগ্ধ করো না।

যথাপকৃষ্টশৈবালং ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি।
আবৃণোতি তথা মায়া প্রাজ্ঞং বাপি পরাঙ্মুখম্।। ৩২৪

অন্বয় : যথা (যেমন) অপকৃষ্টশৈবালং (জলের ওপরের শেওলা সরিয়ে দিলেও) ক্ষণমাত্রং (ক্ষণকালও) ন তিষ্ঠতি (সরে থাকে না) তথা (সেইরকম) মায়া (মায়া) প্রাজ্ঞম্-অপি পরাঙ্মুখম্ বা (জ্ঞানী কিন্তু আত্মচিন্তায় বিমুখ ব্যক্তিকে) আবৃণোতি (আবৃত করে)।

সরলার্থ : কোনও জলাশয় শেওলায় ঢাকা পড়ে আছে; শেওলা সরিয়ে দিলে জল দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু একবার ছেড়ে দিলেই সেই শেওলা আবার ফিরে আসে, মুহূর্তকালও সরে থাকে না। মায়াও তেমনই। আত্মজ্ঞানী পুরুষ যদি ক্ষণকালের জন্যেও ব্রহ্মচিন্তায় পরাঙ্মুখ হন তাহলেই মায়া ফিরে এসে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।

ব্যাখ্যা : এখানে কিরকম একটা সুন্দর উপমা দিয়েছেন। পুকুরের জল শেওলায় ঢাকা আছে, জল দেখা যাচ্ছে না। হাত দিয়ে শেওলাটা সরিয়ে দিলে জল দেখতে পেলে, কিন্তু একটু বাদেই আবার সেই শেওলা ফিরে এসে জল ঢেকে ফেলবে। আমাদের মনও এমনি। একটু যদি অন্যমনস্ক হও, অসতর্ক হও, তাহলে বিষয়চিন্তা আবার এসে পড়বে। 'যথা-অপকৃষ্ট শৈবালং ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি', জলের ওপরের শেওলা সরিয়ে দিয়ে মনে করছি জল পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু, 'ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি', এক মুহূর্তও সরে থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে আবার 'আবৃণোতি'—ঢেকে ফেলে; 'তথা মায়া'—মায়াও

তেমনি; ঢেকে ফেলে, মনকে গ্রাস করে। 'প্রাজ্ঞং বাপি পরাঙ্মুখম্'; যিনি প্রাজ্ঞ কিন্তু আত্মচিন্তায় পরাঙ্মুখ, যাঁর জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু আত্মচিন্তা করছেন না। ব্রহ্মচিন্তা থেকে তিনি সরে এসেছেন, স্বভূমি থেকে, নিজের জায়গা থেকে তিনি সরে এসেছেন। মায়া তাঁকে গ্রাস করবে, শেওলা যেভাবে জলকে ঢেকে ফেলে। এরকম হলে হবে না, দৃঢ়ভাবে ব্রহ্মচিন্তাকে ধরে রাখতে হবে, নিজের জায়গায় শক্ত হয়ে বসে থাকতে হবে। বুদ্ধদেব কিরকম বললেন? এই আমার আসন, যে আসনে বসেছি বোধি লাভ না করে নড়ব না। এই দৃঢ়তা, এই নিষ্ঠা থাকা চাই। শাস্ত্র তাই বলছেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য' (মু, ৩।২।৪), যে দুর্বল, বলহীন, সে কখনও আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। স্বামীজী বলতেন, দুর্বলের ইহকালও নেই, পরকালও নেই। 'প্রাজ্ঞম্-অপি পরাঙ্মুখং', প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী, কিন্তু মনটাকে অন্যদিকে দিয়েছে, যেই দিয়েছে অমনি মায়া এসে গ্রাস করেছে। কিরকম জান? পরের শ্লোকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন, একবার ব্রহ্মচিন্তায় বিচ্যুতি হলে কিভাবে ধাপে ধাপে নামতে হয়।

লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্‌যদি চিত্তমীষদ্বহির্মুখং সন্নিপতেৎ ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ সোপানপঙ্‌ক্তৌ পতিতো যথা তথা॥৩২৫

অন্বয়: চেদ্ যদি (যদি) চিত্তম্-ঈশদ্ বহির্মুখম্ (মন একটুও বহির্মুখী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়মুখী হয়) লক্ষ্যচ্যুতং (ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়) যথা (যেমন) প্রমাদতঃ (অসাবধানতাবশত) প্রচ্যুত (হস্তচ্যুত) কেলিকন্দুকঃ (খেলার বল) সোপানপঙ্‌ক্তৌ পতিতঃ (সিঁড়ির ধাপগুলোর ওপরের ধাপে পড়ে) ততঃ ততঃ (পরপর, ধাপে ধাপে) সন্নিপতেৎ (নেমে নীচে পড়ে) তথা (সেইরকম [নীচে পড়ে যায়])।

সরলার্থ: মন যদি একটুও বহির্মুখী হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, তাহলে তার লক্ষ্য যে ব্রহ্মচিন্তা, তা থেকে সে বিচ্যুত হয়ে নীচে নামতে থাকে। যেমন অসাবধানে হাত ফসকে বেরিয়ে যাওয়া খেলার বল সিঁড়ির ওপরে পড়ে ধাপে ধাপে নামতে থাকে ও একদম নীচে গিয়ে পড়ে, সেইরকম।

ব্যাখ্যা: মন যদি একটুও বহির্মুখী হয়, বিষয়চিন্তায় যদি সামান্যমাত্রও যায় তাহলে সেটাই ক্রমান্বয়ে তোমায় লক্ষ্যচ্যুত করবে, ব্রহ্মচিন্তা থেকে তোমার মন সরিয়ে দেবে। তুমি মায়ার কবলে পড়বে, বিষয়ের আকর্ষণে উত্তরোত্তর নীচে নামতে থাকবে, ঈশ্বর ভাবনা থেকে দূরে সরে যাবে। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন কিরকম ধাপে ধাপে নামে। ছোট ছেলে, হাতে বল নিয়েছে, বলটা সিঁড়ির ওপরে ফেলে দিয়েছে, দেখা যায় সেই বলটা লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছে। তেমনি আমাদের মনও একবার যদি হাতছাড়া হয়, শিকলছাড়া হয়, তাহলে নামতে নামতে কোথায় যে চলে যায় তা বলা যায় না। তাই সতর্ক থাকার জন্যে বলছেন। 'লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্‌যদি চিত্তম্-

ঈষদ্ বহির্মুখম্'; আমার লক্ষ্য তো ব্রহ্ম, সেই লক্ষ্য থেকে আমার বিচ্যুতি হবে, লক্ষ্যটাকে হারিয়ে ফেলব। কখন এরকম হতে পারে ? 'চেদ্‌যদি চিত্তম্-ঈষদ্ বহির্মুখম্'—আমার মনটা যদি একটুও বহির্মুখী হয়। মনটাকে অন্তর্মুখী করতে হবে। অন্তর্মুখী মানে আমার অন্তরে সব সময় ব্রহ্ম রয়েছেন সেই বোধটা আমি ধরে রেখে দিয়েছি, যেন হাতটা মুঠো করে ধরে রয়েছি। যদি সেই মুঠো আলগা হয় তখন কি হবে? 'বহির্মুখং'—তখন শুধু বিষয়ের দিকে মন যাবে। আর ব্রহ্ম দেখব না তখন বিষয় দেখব। যখন ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকি তখন বিষয় দেখি না শুধু ব্রহ্ম দেখি। সবাই বিষয় দেখছে, আমি ভাবছি, কোথায় বিষয় ? শুধু তো ব্রহ্ম দেখছি, 'ব্রহ্মময়ং জগৎ', ব্রহ্ম ছাড়া আর কাউকে দেখছি না। আমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম, সবকিছুই ব্রহ্ম। এই ভাব যখন মনে দৃঢ় হবে তখনই আমার ঠিক ঠিক জ্ঞান হয়েছে বলে বুঝব। এই ব্রহ্মবোধ বা ব্রহ্মচিন্তাটাই আমার থাকার কথা, কিন্তু আমি যদি একবারও এটা ভুলে যাই তাহলে কি হবে ? 'প্রমাদতঃ প্রচ্যুত কেলিকন্দুকঃ সোপানপঙ্‌ক্তৌ পতিতঃ যথা তথা'; 'কেলিকন্দুকঃ'—খেলার বল। 'কন্দুকঃ' মানে বল, ছেলেরা যে বল খেলে; 'প্রচ্যুত'—হাত ফসকে পড়ে গেছে, 'সোপানপঙ্‌ক্তৌ'—সিঁড়ির ওপর। তখন বলটা সিঁড়িতে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে, ওপরের সিঁড়ি থেকে ধাপে ধাপে নীচের সিঁড়িতে নামছে। 'পতিতঃ যথা তথা', সে নীচে, আরও নীচে, আরও নীচে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। আমার লক্ষ্যচ্যুত মনও তেমনি নীচে নামছে, ওপরের সিঁড়ি তারপর নীচের সিঁড়ি এমনি করে নামছে, আরও নামছে, মন অধোগামী হচ্ছে। নীচে নামাটা খুব সহজ, ওপরে ওঠাটাই শক্ত। তাই বলছেন, এই ভুল কোরো না, একটুও বিষয়চিন্তাকে স্থান দিও না। 'প্রমাদঃ মৃত্যুঃ'—এই ভুল মৃত্যুতুল্য। নামতে নামতে কোথায় গিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই, নামতে দিও না। একবার নামলে ওপরে তোলাটা শক্ত, নামতে দিও না। আমার ওই বোধ, ওই চেতনা, ওই নিষ্ঠা, সেটা যেন ধরে থাকতে পারি। চিরকালের জন্যে আমার দাঁড়াবার একটা জায়গা যেন খুঁজে পাই। সেটা ঐ ব্রহ্মবোধ, ব্রহ্মনিষ্ঠা। অনুক্ষণ ব্রহ্মচিন্তা। তার ওপর যদি শক্ত করে পা রেখে, বুড়ো আঙুলটা গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে কেউ আমায় সেখান থেকে সরাতে পারবে না।

বিষয়েষ্বাবিশচ্চেতঃ সংকল্পয়তি তদ্‌গুণান্।
সম্যক্ সংকল্পনাৎ কামঃ কামাৎ পুংসঃ প্রবর্তনম্॥৩২৬

অন্বয়: চেতঃ (মন) বিষয়েষু (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে) আবিশৎ (আবিষ্ট হয়ে) তদ্‌গুণান্ (তাদের গুণগুলিকে) সংকল্পয়তি (স্মরণ ও মনে মনে আলোচনা করতে থাকে) সম্যক্ সংকল্পনাৎ (বিশেষভাবে স্মরণের থেকে) কামঃ (কামনা আসে) কামাৎ (কামনার থেকে) পুংসঃ (পুরুষের) প্রবর্তনম্ (কাম্যবস্তু ভোগের চেষ্টা বারবার চলতে থাকে)।

সরলার্থ: মন বিষয়ে আবিষ্ট হলে বিষয়ের গুণগুলির স্মরণ ও আলোচনা করতে থাকে, এইসবের বিশেষভাবে স্মরণের ফলে কামনার উৎপত্তি হয়, সেই কামনা থেকে কাম্যবস্তুর ভোগের আকাঙ্ক্ষা পুরুষকে বিষয়ের পেছনে ছোটায়।

ব্যাখ্যা: একবার যদি বিষয়ের দিকে মন যায় তাহলে বিষয়ের গুণগুলির চিন্তা করতে খুব ভালো লাগে; মনের মধ্যে নানা সংকল্প তৈরী হতে থাকে আর এইসব নিয়ে বিষয়ের মধ্যে আরও বেশী জড়িয়ে পড়তে হয়। বলছেন, 'বিষয়েষু-আবিশৎ-চেতঃ'; 'চেতঃ' মানে চিত্ত, মন; 'আবিশৎ'—আকৃষ্ট, মন বিষয়ে আবিষ্ট হয়ে আছে। যার এরকম হয় সে কি করে? 'সংকল্পয়তি তদ্‌গুণান্'—বিষয়ের গুণের কথা মনে ভাবে আর মনে মনে তাই আলোচনা করে। একটা দোকানে সন্দেশ খেয়েছিলাম, সন্দেশটা ভালো ছিল, সেই দোকানে যেতে হবে। এইরকম সব ভাবনা। 'সম্যক্ সংকল্পনাৎ কামঃ'—আর মনে মনে এইসব আলোচনা করার ফলে কামনা বাড়তে থাকে, বাসনার উদ্রেক হয়; তখন কি হয়? 'কামাৎ পুংসঃ প্রবর্তনম্'; বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ তখন তার পেছনে ছুটবে। এই বাসনা এমন জিনিস যে স্থির থাকতে দেয় না, তার পেছনে ছোটাবে। আমাদের বিষয়সুখ কি? ইন্দ্রিয়সুখ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি থেকে যে সুখ, সেই সুখ। চোখ একটা ইন্দ্রিয়, কান একটা ইন্দ্রিয়, মুখ একটা ইন্দ্রিয়; এইসব ইন্দ্রিয়গুলো যেন বুভুক্ষু হয়ে আছে। তারা চাইছে উপভোগ করতে—ভালো শুনব, ভালো দেখব, ভালো খাব। শাস্ত্র কতভাবে বলছেন, শ্রেয় আর প্রেয়। আপাতদৃষ্টিতে যেগুলো সুখকর সেগুলো প্রেয়। পরিণামে যা সুখকর, যা নিত্য, তা শ্রেয়। শাস্ত্র প্রেয়কে বর্জন করতে বলছেন। আমরা তো ইন্দ্রিয়গুলোর পরিতোষ সাধন করতে চেষ্টা করি, শাস্ত্র বলছেন, তা করো না। 'বিষয়েষু-আবিশৎ-চেতঃ'; মন বিষয়ের দিকে ছুটে যায়, আবিষ্ট হয়, তখন সে কি করে? 'সংকল্পয়তি'—মনে মনে আলোচনা করে, এটা পেলে ভালো হতো, ওটা খাওয়া নিষেধ, খেলে বেশ হতো, এইরকম। এইসব আকর্ষণ ত্যাগ করতে বলছেন। যদি তুমি মনে মনে বিষয়ের গুণগুলোর চিন্তা করতে থাক—'সম্যক্ সংকল্পনাৎ', তাহলে কি হবে? ওইদিকে তোমার মন যাবে, আকর্ষণ হবে, কামনা আসবে। আর তখন, 'কামাৎ পুংসঃ প্রবর্তনম্', যেগুলো করার নয় সেগুলোও তুমি আবার করতে থাকবে। আসল কথা শাস্ত্র একটা কথাই বলছেন, সব তোমার নিজের হাতে, কি করবে সেটা ঠিক কর। সব সময় বিচার করতে বলছেন, স্বরূপচিন্তা করতে বলছেন। নিজের স্বরূপটা কি? আমি এই দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই। এগুলো যেন আবরণ। আমি শুদ্ধ আত্মা, সেই আত্মা সর্বত্র বিরাজ করছেন। এক আত্মা, তাই কারোর প্রতি আমার আকর্ষণও নেই বিকর্ষণও নেই কারণ আমিই সব। সব সময় সমতা, সাম্য। আত্মচিন্তা সর্বদা যদি করতে থাক তাহলে বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ আপনি চলে যাবে।

ততঃ স্বরূপবিভ্রংশো বিভ্রষ্টস্তু পতত্যধঃ।
পতিতস্য বিনা নাশং পুনর্নারোহ ঈক্ষ্যতে॥
সংকল্পং বর্জয়েৎ-তস্মাৎ সর্বানর্থস্য কারণম্॥৩২৭

অন্বয়: ততঃ (বিষয়চিন্তা থেকে) স্বরূপবিভ্রংশঃ (স্বরূপজ্ঞানের বিভ্রান্তি) স্বরূপবিভ্রষ্টঃ-তু (স্বরূপ-বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তি নিশ্চয়) অধঃ পততি (নীচে পড়ে যায়) পতিতস্য (অধঃপতিত ব্যক্তির) নাশং বিনা (বিনাশ ছাড়া) পুনঃ (আবার) আরোহঃ (উপরে ওঠা) ন ঈক্ষ্যতে (দেখা যায় না) তস্মাৎ (সেইজন্যে) সর্ব-অনর্থস্য কারণম্ (সব অনর্থের কারণ) সংকল্পং (বিষয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা) বর্জয়েৎ (বর্জন করতে হবে)।

সরলার্থ: বিষয়চিন্তা স্বরূপজ্ঞানের বিভ্রান্তি ঘটায়। স্বরূপচেতনা থেকে ভ্রষ্ট হলে অধঃপতন হয়। যে পতিত হয়েছে তার বিনাশ ছাড়া আবার ওঠা বড় একটা দেখা যায় না। অতএব সব অনর্থের কারণ বিষয় সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তা বর্জন করতে হবে।

ব্যাখ্যা: আমরা শাস্ত্রের সাবধানবাণী শুনছি। সতর্ক করে দিচ্ছেন। বলছেন, তোমার স্বরূপটা ভুল যেন না হয়। তোমার স্বরূপটা কি? বাক্যমনাতীত যে সত্তা, যাকে আমরা ব্রহ্ম বলি, তা-ই তোমার স্বরূপ। এটা ভুলে যদি তুমি নিজেকে জীব মনে কর, দেহকেন্দ্রিক একটা পরিচয় দাও, 'আমি অমুক' ভাব, তাহলে কি হবে? নিজেকে দুর্বল, অক্ষম, এইসব মনে হবে আর দুঃখ আসবে। আমরা তো আমাদের স্বরূপ ভুলে গেছি তাই নিজেদের ভালো ভাবতে আমাদের যেন সঙ্কোচ হয়, নিজেকে অধম ভাবি। শাস্ত্র বলেন, এটা আত্মহনন, নিজেকে ছোট ভাবতে নেই। ছোট ভাবতে ভাবতে ওই রকমই হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যে শালা নিজেকে পাপী ভাবে সে পাপীই হয়ে যায়। বলছেন, 'ততঃ স্বরূপবিভ্রংশঃ'; বিষয়চিন্তা থেকে বিভ্রান্তি হয়, নিজের স্বরূপ ভুল হয়ে যায়। এক রকমের অসুখের কথা শোনা যায়, amnesia, নিজের পরিচয় ভুলে যায়, নিজের নাম ভুলে যায়, নিজের থাকার জায়গাটা ভুলে যায়—এ যেন সেইরকম। বলছেন, ভুলে যেও না নিজেকে, স্বরূপটাকে ভুলে যেও না, এই ব্রহ্মচিন্তা, ব্রহ্মনিষ্ঠা থেকে সরে যেও না। আমরা যদি বিষয়চিন্তা করি তাহলে বিষয় যেন আমাদের লুফে নেবে। বিষয়—বিষ-হয়। এ যেন বিষ, কিন্তু আকর্ষণ করে নেবে। স্বরূপ যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে 'বিভ্রষ্টঃ তু পততি-অধঃ'; স্বরূপচিন্তা থেকে যদি কেউ বিভ্রষ্ট হয়, সরে আসে, তাহলে সে 'পততি-অধঃ'—নীচের দিকে পড়ে যায়, তার অধঃপতন হয়। কোথায় ছিলাম কোথায় চলে গেলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মনটাকে বিশ্বাস করো না। এ যেন মাছির মতো, সন্দেশও খায়, বিষ্ঠাও খায়। তাই সাবধান থাকতে হয়। যদি আমার স্বরূপকে ভুলে যাই তাহলে ওই বলটার মতো হবে। নীচে নামছে, নামছে, একদম নীচে গিয়ে তারপর দাঁড়িয়ে গেলো। 'পতিতস্য বিনা নাশং পুনঃ ন আরোহঃ

ঈক্ষ্যতে'; আর ওপরে উঠতে পারবে না। একবার নীচে পড়লে আর ওপরে ওঠা সহজ হয় না। নিজের স্বরূপটা ভুল হতে দেবে না। তুমি ছিলে আত্মস্থ, এখন বিষয়ের দিকে তোমার মন চলে গেলো, তুমি বিভ্রষ্ট হয়েছ, বিভ্রান্ত হয়েছ। তাহলে তোমার কি হবে? যার এরকম হয়, তার কি হয়? 'পততি-অধঃ'—সে নীচে পড়ে যায়। বিষয়ের লোভ, এই লোভের শেষ নেই, এ আমাদের একেবারে অধঃপাতে নিয়ে যায়। শাস্ত্র ভোগ করতে বারণ করছেন না, কিন্তু সীমিত, সংযত ভোগের কথা বলছেন। সবকিছুতে সংযম দরকার। হিন্দু সংস্কৃতি এটাই বলে। মনটা যেন হাতের মুঠোয় ধরা আছে, যা করব না ভেবেছি, তা করব না। আমাদের মনটা কিরকম? একবার এদিকে হাত বাড়াচ্ছে, আবার ওদিকে হাত বাড়াচ্ছে। দোদুল্যমান। কি করবে ঠিক করতে পারছে না। এরকম হলে হবে না। তোমায় শান্ত সমাহিত-চিত্ত হয়ে থাকতে হবে। বলছেন, 'সংকল্পং বর্জয়েৎ-তস্মাৎ সর্ব-অনর্থস্য কারণম্'; বিষয়চিন্তা বর্জন করতে হবে কারণ বিষয়ই সব অনর্থের কারণ। এই যে সংকল্প বা বিষয়চিন্তা, এ তো মনে মনে বিষয়ের ভোগ। মনে মনে যদি ভগবানের সঙ্গ করি, তাঁর সঙ্গে যদি কথা বলি তাতে যেমন আমার লাভ, তেমনি উলটোটাও সত্যি যে, মনে মনে বিষয়চিন্তা, বিষয় ভোগ করলে আমার ক্ষতি। আত্মচিন্তা করতে হবে, ব্রহ্মচিন্তা করতে হবে। আমি তদ্‌গতচিত্ত হয়ে থাকব, ঈশ্বরের মধ্যে আমি প্রবেশ করে বসে থাকব। কূটস্থ হয়ে থাকব।

অতঃ প্রমাদান্ন পরোঽস্তি মৃত্যুর্বিবেকিনো ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ।
সমাহিতঃ সিদ্ধিমুপৈতি সম্যক্ সমাহিতাত্মা ভব সাবধানঃ॥ ৩২৮

অন্বয় : অতঃ (অতএব) প্রমাদাৎ (প্রমাদের চেয়ে) পরঃ (বড়) মৃত্যুঃ (বিনাশ) বিবেকিনঃ ব্রহ্মবিদঃ (বিচারশীল ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির) ন অস্তি (নেই) সমাধৌ (সমাধিতে) সমাহিতঃ (নিমগ্ন সাধক) সম্যক্ সিদ্ধিম্ উপৈতি (সহজে সিদ্ধিলাভ করে) সমাহিতাত্মা (সমাহিতচিত্ত) ভব সাবধানঃ (তুমি সাবধান হও)।

সরলার্থ : অতএব বিচারশীল ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ সাধকের পক্ষে প্রমাদের চেয়ে বড় মৃত্যু আর নেই। যে সাধক সমাধিতে সর্বদা নিমগ্ন হয়ে থাকেন তিনি সহজেই সিদ্ধিলাভ করেন। কাজেই সমাহিতচিত্ত সাধক তুমি সাবধান থেকো।

ব্যাখ্যা : আগে বলেছেন, 'প্রমাদ ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন'। ব্রহ্মনিষ্ঠা থেকে যদি আমি ভুল করে চ্যুত হই তাহলে সেই ভুল যত নষ্টের কারণ হবে। ব্রহ্ম থেকে আমি সরে আসব না, ব্রহ্মচিন্তায় ডুবে থাকব, ব্রহ্মগত হয়ে থাকব। ব্রহ্মেতে আমি প্রতিষ্ঠিত। আমার ব্রহ্মভূমি যদি আমি ভুলে যাই তাহলে 'প্রমাদঃ মৃত্যুঃ', এখনকার আধুনিক ভাষায় 'self alienation'। বলছেন, 'অতঃ প্রমাদাৎ ন পরঃ অস্তি মৃত্যুঃ বিবেকিনঃ

ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ'; বিবেকী কে? যার বিবেক আছে। বিবেকের কি ধর্ম? বিবেক বিচার করে, নিত্য অনিত্য বিচার করে। এ সংসারে নিত্য আছে অনিত্য আছে। আমি সব সময় বিচার করব, কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য। নেতি নেতি করে বিচার করব—এটা নয়, এটা নয়, এটা আমার হানিকর, ইত্যাদি। এই বিচার হচ্ছে বিবেকীর লক্ষণ। 'বিবেকিনঃ ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ'; যে বিবেকী, বিচারশীল, তারই যদি সব ভুল হয়ে গেলো প্রমাদবশত, সে তো মৃত্যুর সামিল ! আমি ব্রহ্মলগ্ন ছিলাম, ঈশ্বরচিন্তায় ছিলাম, তার থেকে সরে এলাম, এ-ই তো মৃত্যু। মৃত্যু মানে কি? বিনাশ, ধ্বংস। ধাপে ধাপে নীচে নামতে থাকবে। আগে যে বলেছেন 'প্রচ্যুত কেলিকন্দুকঃ'—খেলার বলটা হাত ফসকে সিঁড়ির ওপরে পড়ে গেলো, গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক নীচে গিয়ে পড়ল। কোথায় ছিলাম কোথায় নেমে যাচ্ছি। মনের এই স্বভাব, নীচের দিকে যেতে চায়। তাকে কান ধরে টেনে ওপরে তুলে আনতে হবে। 'ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ'; আমি ব্রহ্মচিন্তায় ছিলাম, এখন সব ভুল হয়ে গেছে। এটা মৃত্যুর চেয়েও বড় বিনাশ। অবশ্য বুঝতে হবে এ জ্ঞান ঠিক-ঠিক জ্ঞান ছিল না, একটা 'conviction', প্রত্যয়, পড়াশোনা করে জ্ঞান। যখন উপলব্ধি হবে, অপরোক্ষ অনুভূতি হবে, তখন সব বাসনা উড়ে গেলো, ছাই হয়ে গেলো। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, জ্ঞানাগ্নিতে সব বাসনা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একটা দড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আকারটা শুধু আছে, সেটা দিয়ে আর বাঁধতে পারবে না। আত্মজ্ঞান হলে কিরকম হয়? বাসনার আকারটা শুধু থাকে। সংসারে আছে, সব কাজ করছে, কিন্তু লিপ্ত নয়, ওই পোড়া দড়ির মতো, আকারটা আছে কিন্তু তা দিয়ে আর বাঁধতে পারবে না। তাই বলছেন, সাবধান, 'অতঃ প্রমাদাৎ ন পরঃ-অস্তি মৃত্যুঃ বিবেকিনঃ ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ'; তোমার সব হলো, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলো, কিন্তু ধরে রাখতে পারলে না, আবার বিষয় এসে গেলো, মায়া এসে ভুলিয়ে দিলে। মায়া এমনই যে, একবার যদি বিষয়ের দিকে মন যায় তাহলেই জড়িয়ে পড়তে হবে। তোমার সমাধি হলো তবু সব গোলমাল হয়ে গেলো। সমাধি দু-রকমের হয়, নির্বিকল্প, সবিকল্প। সবিকল্প সমাধি হচ্ছে, নিবিষ্ট হয়ে গেছ, কিন্তু তুমিও আছ আর ভগবান আছেন, বিষয় নেই। আর নির্বিকল্প সমাধি হচ্ছে, যেমন একমুঠো লবণ জলে ফেলে দিলে গলে যায় তেমনি ভগবানের সঙ্গে তুমি এক হয়ে গেছ, আর কোনও পৃথক সত্তা নেই। নির্বিকল্প সমাধি হলে আর ভয় থাকে না। 'সমাহিতঃ সিদ্ধিম্ উপৈতি সম্যক্', সমাধিতে মগ্ন হলেই ঠিক ঠিক সিদ্ধি। সেইজন্য 'সমাহিতাত্মাঃ ভব সাবধানঃ'; 'সাবধান' মানে আলস্য রেখো না। নিরলসভাবে সেটা কর যাতে সমাহিত থাকতে পার। ব্রহ্মচিন্তায় সব সময় ডুবে থাকতে পার। 'সমাহিতঃ', ডুবে থাক, একেবারে ডুবে থাক, একটু একটু ডুবছি আবার উঠছি, এরকম নয়; সব সময়ই ব্রহ্মচিন্তা। একটু একটু ফাঁক থাকছে, বিষয়চিন্তা আসছে, তা নয়। সব সময় ব্রহ্মচিন্তা। এরকম করতে পারলে তোমার সাফল্য হবে,

সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে। কিন্তু তবুও বলছেন সাবধান ! মনের ওঠা-নামা আছে, যত ওপরে ওঠে তত নীচে নামে। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা এটা করা যায় যে একটা জায়গা থেকে নীচে আর নামবে না। বিষয়ের মধ্যে আছি, মন একবার একবার ব্রহ্মচিন্তা থেকে সরে আসতে পারে কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা এরকম করা যায় যে, ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য, এটা ভুল হয় না। আমাদের মনের স্তর আছে, কিন্তু শিকলটা যদি ঈশ্বরে বাঁধা থাকে তাহলে সংসারের কাজ করছি কিন্তু শিকলটা ঈশ্বরেই বাঁধা রয়েছে, মনটা ওইখানে পড়ে আছে, আত্মসমাহিত হয়ে আছি। এইভাবে থাকতে পারলে আর ভয় নেই।

জীবতো যস্য কৈবল্যং বিদেহে চ স কেবলঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পশ্যতো ভেদং ভয়ং ব্রূতে যজুঃ শ্রুতিঃ।। ৩২৯

অন্বয় : যস্য (যাঁর) জীবতঃ (জীবনকালেই) কৈবল্যং (মুক্ত অবস্থা) সঃ চ (তিনিই) বিদেহে (দেহ নাশ হলেও) কেবলঃ (মুক্ত) যজুঃ শ্রুতিঃ (যজুর্বেদ) ব্রূতে (বলেন) যৎকিঞ্চিৎ (কিছুমাত্র) ভেদং পশ্যতঃ (ভেদদর্শনকারীর) ভয়ং (ভয় থাকে)।

সরলার্থ : জীবদ্দশাতেই যিনি মুক্ত তিনি দেহ নাশ হলে মুক্তই থাকেন। যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেন, যে একটুও ভেদ দেখে তারই ভয় থাকে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, দেখো জীবিত অবস্থায় আমাদের মুক্তিলাভ করতে হবে, এটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এ সংসারটা তো মিথ্যে, এর দুঃখ-কষ্ট সুখ-আনন্দ সবই মিথ্যে, মায়ার খেলা। যিনি জীবন্মুক্ত তিনি এটা জানেন, তাই তাঁকে আর কিছু স্পর্শ করে না। 'জীবতঃ যস্য কৈবল্যং বিদেহে চ স কেবলঃ'; 'কৈবল্যং', কেবল থেকে কৈবল্য; এক দেখব, দুই দেখব না। আমাদের মনের এই ব্যাপার, যা চিন্তা করব তাই দেখব। ঈশ্বরে আমি যদি সমাহিত হতে পারি, তাঁর মধ্যে যদি ডুবে যেতে পারি, তাহলে অন্তরেও তাঁকে দেখছি বাইরেও তাঁকে দেখছি। এই হলো কৈবল্য—শুধু এক, 'কেবলঃ', এক ছাড়া দুই নেই। 'জীবতঃ যস্য কৈবল্যং বিদেহে চ স কেবলঃ'; আমি জীবদ্দশাতেই ঈশ্বরে ডুবে আছি, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানি না। মৃত্যু হলে, বিদেহে আমি তাহলে সেই ঈশ্বরের মধ্যেই ডুবে যাব। জীবনে সবকিছুতে এই ঈশ্বর দেখাটা অভ্যাস করতে হবে। 'যৎকিঞ্চিৎ পশ্যতঃ ভেদং'; যদি একটুও ভেদ দেখো, তাহলেই অজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এক দেখাটা জ্ঞান, দুই দেখাটা অজ্ঞান। ভেদ যদি দেখি, ঈশ্বর ছাড়া আর যদি কিছু দেখি, তার মানেই দুই দেখছি। দুই দেখলেই ভয়, ভালোবাসা। ভালোবাসা তো দুই ছাড়া হয় না, ভয়ও দুই ছাড়া হবে না। দুটোই দুঃখ। তাই বলছেন, 'যৎকিঞ্চিৎ পশ্যতঃ ভেদং', যদি একটুও তুমি ভেদ দেখো, তাহলে হবে না। আমাদের অভেদ দেখতে হবে। আমাদের শত্রুরূপেও তিনি, মিত্ররূপেও তিনি, সব তিনি। 'ব্রূতে

যজুঃ শ্রুতিঃ', যজুর্বেদে তৈত্তিরীয় উপনিষদে একটা সুন্দর কথা আছে। বলছেন, 'এষ এতস্মিন্ উদ্-অরম্ অন্তরম্ কুরুতে' (তৈ, ২।৭), কিন্তু সামান্য একটুও যদি ভেদ দেখো তাহলে তোমার কি হবে? দুঃখ। 'ভয়ং ভবতি', ভয়ও হতে পারে ভালোবাসাও হতে পারে আবার বিদ্বেষও হতে পারে। যা-ই হোক, হলেই দুঃখ। ভয় হলেও দুঃখ আবার ভালোবাসা হলেও তাকে হারাবার দুঃখ, আবার যাকে মোটে ভালো লাগে না তার সঙ্গে সম্পর্ক হলেও দুঃখ। আমাদের সম-অবস্থা পেতে হবে। ভালোবাসা, অ-ভালোবাসা, এসব দোষগুণ বিচার করে হয়। কিন্তু আমার যদি সমদর্শন হয়, সব এক দেখি, তাহলে আর দোষগুণ কিছুই দেখছি না। কৃষ্ণময়ং জগৎ, ব্রহ্মময়ং জগৎ। 'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মনি এব অনুপশ্যতি'; (ঈ, ৬) সবাইকে আমার মধ্যে দেখছি আবার 'সর্বভূতেষু চ আত্মানং', সবার মধ্যে আমাকেই দেখছি। এরকম হলে কারোর জন্যেই আর অ-ভালো লাগা থাকে না। এ-ও একটা রূপ আবার ও-ও আর একটা রূপ, কিন্তু একই। যদি এই এক জ্ঞান হয় তাহলে শুধুই ভালোবাসা, প্রতিক্রিয়াশূন্য প্রত্যাশা শূন্য ভালোবাসা। যেখানে গভীর ভালোবাসা সেখানে এক হয়ে যায়, যাকে ভালোবাসি তার কষ্টে কষ্ট, সুখে সুখ। যদি ভেদ দেখো তাহলে তুমি ভয় পাবে, কষ্ট পাবে, দুঃখ পাবে; আমাদের উদ্দেশ্য এক দেখা। দুই নেই এক, নামরূপ আলাদা কিন্তু বস্তু এক। যাঁর এরকম অবস্থা তিনিই জীবন্মুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ সবাইকে নমস্কার করছেন, সবাইকার মধ্যে নারায়ণকে দেখছেন; এক নারায়ণই ভক্ত হয়েছেন আবার ভগবান হয়ে খেলা করছেন, মজা করছেন। জগৎকে এই চোখে যিনি দেখেন তিনিই জীবন্মুক্ত। আর যিনি জীবন্মুক্ত, দেহত্যাগের পরে তিনি তো মুক্তই।

যদা কদা বাপি বিপশ্চিদেষঃ ব্রহ্মণ্যনন্তেঽপ্যণুমাত্রভেদম্।
পশ্যত্যথামুষ্য ভয়ং তদেব যদীক্ষিতং ভিন্নতয়া প্রমাদাৎ।।৩৩০

অন্বয়: এষঃ বিপশ্চিৎ (এই বিচারশীল ব্যক্তি) যদা (যদি) কদা অপি বা (কখনও) অনন্তে ব্রহ্মণি (সর্বব্যাপী অভেদ ব্রহ্মে) অপি অণুমাত্র ভেদম্ (অতি অল্পও পৃথকভাব) পশ্যতি (দেখেন) অথ (তখনই) অমুষ্য (এই ভেদদর্শী ব্যক্তির) যৎ (যে বস্তু) প্রমাদাৎ (ভ্রান্তিবশত) ভিন্নতয়া (আত্মা থেকে ভিন্নরূপে) ঈক্ষিতং (দৃষ্ট হয়) তৎ এব (সেই বস্তুই) ভয়ং (ভয়ের কারণ হয়)।

সরলার্থ: বিচারশীল সাধক যদি কখনও সর্বভূতে বিদ্যমান অভেদ ব্রহ্মে অণুমাত্র ভেদ দর্শন করেন তাহলে বিভ্রান্তির কারণে যে-বস্তু আত্মা থেকে ভিন্ন বলে তাঁর বোধ হয় সেই বস্তুই তাঁর ভয়ের কারণ হয়।

ব্যাখ্যা: বলছেন, যিনি বিচারশীল সাধক, নেতি নেতি করে সব অনিত্য বস্তু বর্জন

করে নিত্য বস্তু আত্মায় অবস্থান করছেন, তাঁরও ভুল হতে পারে। যখন ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে আছি তখন তো সব এক দেখছি। যখন সব এক দেখছি তখন আমি অভয়, যেই দুই দেখছি অমনি ভয় আসছে। বলছেন, 'যদা কদা বাপি বিপশ্চিৎ'; 'বিপশ্চিৎ'—বিবেকী, বিচারশীল; কিন্তু তবু ভুল হয়ে যায়। যদি হয়, 'কদা বাপি'—হঠাৎ যদি ভুল হয়ে যায়। 'ব্রহ্মণি-অনন্তে-অপি অণুমাত্র ভেদম্ পশ্যতি', ব্রহ্ম তো সর্বভূতে রয়েছেন, কিন্তু যদি একটুও অন্যরকম মনে হয়, এ আত্মা ওটা অনাত্মা এরকম যদি মনে হয়, তাহলে কি হবে? 'অথ-অমুষ্য ভয়ং', তাহলেই তার ভয় হবে। যখন দেখছি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই, আমিও ব্রহ্ম জীবজগৎ-ও ব্রহ্ম তখন তো আমার কিছু পাবারও নেই হারাবারও নেই, তাই কোনও ভয় নেই। কিন্তু যেই এর থেকে একটুও ব্যতিক্রম হচ্ছে অমনি ভয় আসছে। নিজের থেকে আলাদা করে অন্য সব দেখছি, আমার মনে বিপরীত ভাবের উদয় হচ্ছে তাই ভয় আসছে। 'ভয়ং তৎ-এব যদ্ ঈক্ষিতং ভিন্নতয়া প্রমাদাৎ'; 'প্রমাদাৎ'—ভুল করে। ভুল করে যে বস্তুকে নিজের থেকে আলাদা ভাবছি, সেই বস্তুই আমার ভয়ের কারণ। নিত্য অনিত্যের বিচার করে সব এক বলে দেখছিলাম, হঠাৎ কিরকম ভুল হয়ে গেলো, নাম-রূপে বিভ্রান্ত হয়ে দুই দেখতে শুরু করলাম। অমনি আমার ভয় শুরু হল। বেদান্ত শাস্ত্র বলেন, এই দুই দেখাটা কিরকম জান? চোখের দোষে চাঁদকে যেমন দুটো চাঁদ বলে দেখায় সেইরকম। বিচারশীল সাধককেও তাই সাবধানে থাকতে হবে। প্রমাদ যেন না হয়। সর্বদা যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে থাকি তাহলে দেখব ব্রহ্মময়ং জগৎ, কোনও ভেদ নেই। আর তখন কোনও ভয় নেই। কিন্তু কেউ যদি 'ব্রহ্মণি-অনন্তে-অপি-অণুমাত্র ভেদম্ পশ্যতি'—অনন্ত অভেদ ব্রহ্মে একটুও ভেদ দেখে তাহলে 'ভয়ং তদেব', সেই একটু ভিন্নতাদর্শনও ভয়ের কারণ হবে।

শ্রুতিস্মৃতিন্যায়শতৈর্নিষিদ্ধে দৃশ্যেঽত্র যঃ স্বাত্মমতিং করোতি।
উপৈতি দুঃখোপরি দুঃখজাতং নিষিদ্ধকর্তা স মলিম্লুচো যথা॥ ৩৩১

অন্বয়: যঃ (যে ব্যক্তি) শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় শতৈঃ (শত-শত শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য ও ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তির দ্বারা) নিষিদ্ধে (আত্মবস্তুরূপে নিষিদ্ধ) অত্র দৃশ্যে (এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে) স্বাত্মমতিং (আত্মবুদ্ধি) করোতি (করেন) সঃ নিষিদ্ধকর্তা (সেই নিষিদ্ধকর্মের অনুষ্ঠানকারী) মলিম্লুচঃ যথা (চোরের মতো) দুঃখোপরি দুঃখজাতং (দুঃখের উপর দুঃখ) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ: যে ব্যক্তি শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় ইত্যাদি শাস্ত্রের শত-শত বাক্য, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে আমি-বুদ্ধি করতে নিষেধ করছেন, তা মানছে না, সেই নিষিদ্ধ কর্মকারী ব্যক্তি চোরেরই মতো দুঃখের ওপর আরও দুঃখ পেয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা: যারা বিষয়কে সত্যি মনে করে তারা কেবল দুঃখই পায়। বিষয় বলতে কি

বোঝানো হচ্ছে? যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবিষয়। তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে যে 'আমি আমার' মনে করছে, এই জড় জগৎকে সত্যি মনে করে যে তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সে দুঃখই পাবে। বলছেন, 'শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় শতৈঃ-নিষিদ্ধে'—সব শাস্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় নিষেধ করছে—দুই দেখো না। 'দৃশ্যে-অত্র যঃ স্বাত্মমতিং করোতি'—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এতে যে 'আত্মবুদ্ধি' করবে, অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান ভুল হয়ে গেছে যার, বিষয়, দেহ-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি অনিত্য বস্তুকে আমি মনে করছে যে, তার কপালে দুঃখই থাকে। সে 'উপৈতি দুঃখ'—দুঃখই পায়। যে নিজেকে আত্মা মনে করে না, এই দেহকে আমি ভাবে, সে দুঃখই পায়। 'দুঃখ-উপরি দুঃখজাতং নিষিদ্ধকর্তা স মলিম্লুচঃ যথা'; বলছেন, 'নিষিদ্ধকর্তা' —যে কাজ নিষিদ্ধ সেই কাজের কর্তা। কে নিষেধ করছে? 'শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়', আমাদের শাস্ত্র। শাস্ত্র বারবার করে বলছেন, বাহ্যবিষয় যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যা পঞ্চভূতের সৃষ্টি, এতে 'আমি-আমার' বোধ রেখো না। একে যারা সত্যি মনে করে তারা দুঃখই পায়। যে দেহে তোমার এত আকর্ষণ সেটা ক্রমান্বয়ে জীর্ণ হয়ে একদিন চলে যাবে। এইরকমই সব বিষয়। এইসব কথা বোঝার জন্যে শাস্ত্র পড়তে হয়। শাস্ত্রের কথা যদি বুদ্ধি দিয়েও বোঝা যায় তাহলেও অনেকটা হয়। বলছেন, শাস্ত্র যা নিষেধ করে দিচ্ছেন, তা যে মানছে না তার 'দুঃখোপরি দুঃখজাতং'—দুঃখের উপর দুঃখ আসছে। এখানে একটা সুন্দর উপমা দিয়েছেন। বলছেন, সে 'মলিম্লুচঃ যথা'; 'মলিম্লুচঃ' একটা অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, এর মানে চোর। রাত্রিতে চলাফেরা করে, চুরি করে, ধরা পড়ে, জেলে যায়, জেল থেকে বেরিয়ে আবার চুরি করে আবার জেলে যায়। কিছুতেই সে সমাজের বা আইনের নিষেধ মানে না। তাই বারবার জেলে যায়, তার দুঃখের জীবন। এইরকম দুর্দশা তোমার হবে। দুঃখ থেকে আরও দুঃখ, দুঃখের ওপর দুঃখ জমে উঠবে। তাই সাবধান করে দিচ্ছেন, তোমার যে স্বরূপ সেই চিন্তা থেকে তুমি সরে এসো না।

সত্যাভিসন্ধানরতো বিমুক্তো মহত্ত্বমাত্মীয়মুপৈতি নিত্যম্।
মিথ্যাভিসন্ধানরতস্তু নশ্যেদ্ দৃষ্টং তদেতদ্যদচৌরচৌরয়োঃ॥ ৩৩২

অন্বয়: সত্যাভিসন্ধানরতঃ (সত্যের সাধনায় রত) বিমুক্তঃ (অবিদ্যাজনিত মোহ থেকে মুক্ত ব্যক্তি) আত্মীয়ম্ মহত্ত্বম্ (আত্মার মহত্ত্বকে) নিত্যম্ উপৈতি (সর্বদা অনুভব করেন) মিথ্যাভিসন্ধানরতঃ (অনিত্য বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত দেহাভিমানী ব্যক্তি) তু (অবশ্যই) নশ্যেৎ (নাশ পায়) তৎ যৎ এতৎ (এইটা যে ঠিক তা) অচৌর-চৌরয়োঃ (চোর আর যে চোর নয় এই দুই ব্যক্তির অবস্থার পার্থক্যে) দৃষ্টম্ (দৃষ্ট হয়)।

সরলার্থ: সত্যলাভের সাধনায় যিনি রত তিনি অবিদ্যাজনিত মোহমুক্ত হয়ে স্বীয় আত্মার

মহিমা সর্বদা অনুভব করেন। আর যে অনিত্য বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত সেই দেহাভিমানী ব্যক্তি বিনষ্টই হয়। এইটাই যে ঘটনা তা যে চোর আর যে চোর নয় তাদের অবস্থার পার্থক্য দেখে বোঝা যায়।

ব্যাখ্যা: এখানে বলছেন, জ্ঞানী আর অজ্ঞানী, এদের তফাত কোথায়? 'অচৌর-চৌরয়োঃ'; চোর আর চোর নয়, এদের মধ্যে যেমন তফাত সেইরকম। শোনা যায় আগেকার দিনে নাকি এরকম ছিল যে, চোর আর চোর নয়, এদের পরীক্ষা হচ্ছে, আগুনে পোড়া তপ্ত কুঠারে হাত দিতে হবে, যদি তোমার হাত পোড়ে তাহলে তুমি চোর আর যদি হাত না পোড়ে তাহলে তুমি চোর নও। জ্ঞানী ব্যক্তি সাবধান, সতর্ক আর অজ্ঞ ব্যক্তি অসতর্ক, অসাবধান। এই যে বলছেন, 'সত্যাভিসন্ধানরতঃ', এটা সকলের পক্ষেই খাটে। আমরা সবাই সত্যের দিকে ছুটে চলেছি, ঈশ্বর বলি, ব্রহ্ম বলি, সবই ওই সত্য। আমরা সবাই একটা জিনিসই চাই, তা হলো আনন্দ। সেটা আমাদের আত্মা, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। নিজেকে জানতে চাইছি, চিনতে চাইছি। নিজেকে ভুলে গেছি, তাই টাকা-পয়সা কত কি চাইছি আনন্দের জন্যে; কিন্তু আসলে আমরা নিজের স্বরূপকে আবিষ্কার করতে চাইছি, পরমানন্দের সন্ধান করছি, সত্যের সন্ধান করছি। বলছেন, 'সত্যাভিসন্ধানরতঃ বিমুক্তঃ মহত্ত্বম্-আত্মীয়ম্-উপৈতি নিত্যম্'; যে সত্যের সন্ধান করছে, ওই নিত্যবস্তু সে লাভ করবেই। তার তো কোনও অনিত্য বিষয়ে আকর্ষণ নেই, তাই সে নিজেকে লাভ করবে, আনন্দে ডুবে থাকবে। শাস্ত্র ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যা অনিত্য, তা মিথ্যা। আর নিত্য হচ্ছে যাকে আমরা ঈশ্বর বলি, পরমাত্মা বলি, ব্রহ্ম বলি। 'সত্যমেব জয়তে' কেন বলা হয়? যা কিছু নষ্ট হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়, সেসব অনিত্য বস্তু, যা নিত্য তা সব সময় একরকমই থাকে। যে সত্যের সন্ধান করছে সে মুক্ত হয়ে যায়। 'মহত্ত্বম্-আত্মীয়ম্-উপৈতি নিত্যম্'; যা মহৎ, বিরাট সে তাকেই আত্মা বলে চিনতে পারে, জানতে পারে। আর যে 'মিথ্যাভিসন্ধানরতঃ', সে 'নশ্যেদ্'—তার নাশ হবে। যা মিথ্যা, অনিত্য, তার অনুসন্ধানে যে রত, তার বিনাশ হবে। সে যেন তপ্ত কটাহে পড়েছে। তার দুঃখের কোন শেষ নেই। মিথ্যাকে চাইলে দুঃখই হবে। কারণ, যা মিথ্যা তা থাকে না, অনিত্য। আমি টাকা চাইছি, পেলামও, কিন্তু হারিয়ে গেলো, তখন দুঃখ। 'তদ্-এতদ্-যদ্-অচৌর-চৌরয়োঃ'; যার বিত্ত-এষণা, পুত্র-এষণা, লোক-এষণা ইত্যাদি সব বাসনা আছে, আর যার এসব বাসনা নেই, শুধু ঈশ্বরচিন্তা করে, এই দুজনকে যদি পাশাপাশি রাখি তাহলে কিরকম মনে হবে? 'তদ্ এতদ্ যদ্ অচৌর-চৌরয়োঃ'; যেমন একজন 'অচৌর'—চুরি করে না আর একজন 'চৌর'—চুরি করে, এই দুজনের যে তফাত সেরকম তফাত হবে। আমরা সবাই তপ্ত কুঠারের মতো এই সংসারকে ধরতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলে যন্ত্রণায় অস্থির হচ্ছি। আর যে নির্লিপ্ত, যে জানে সংসার অনিত্য,

নিত্যবস্তু একমাত্র ব্রহ্ম, তার আর সংসার-যন্ত্রণা নেই। এই তপ্ত কুঠারের মতো সংসারকে ধরে থাকলেও তার হাত পুড়ে যায় না। সংসার অনিত্য জেনে নির্লিপ্ত হয়ে যে আছে সংসারের আঁচ তার গায়ে লাগে না। সে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যে সংসারটাই সব মনে করে আঁকড়ে ধরছে সে সংসারের তাপে ঝলসে যায়, তার নাশ হয়।

যতিরসদনুসন্ধিং বন্ধহেতুং বিহায়
স্বয়ময়মহমস্মীত্যাত্মদৃষ্ট্যৈব তিষ্ঠেৎ।
সুখয়তি ননু নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্বানুভূত্যা
হরতি পরমবিদ্যাকার্যদুঃখং প্রতীতম্॥ ৩৩৩

অন্বয় : যতিঃ (বিচারশীল যোগী) বন্ধহেতুং (বন্ধনের কারণ) অসদ্-অনুসন্ধিং (অসৎ বস্তুর অনুসন্ধান) বিহায় (ত্যাগ করে) স্বয়ম্-অয়ম্-অহম্-অস্মি (আমিই হচ্ছি এই ব্রহ্ম) ইতি আত্মদৃষ্ট্যা-এব (এই প্রকার আত্মদৃষ্টিসহ) তিষ্ঠেৎ (অবস্থান করে থাকেন) স্বানুভূত্যা (স্বীয় আত্মার অনুভূতিজনিত) ব্রহ্মণি নিষ্ঠা (ব্রহ্মে নিষ্ঠা) ননু সুখয়তি (নিশ্চয় সুখ দান করে) অবিদ্যাকার্য (অবিদ্যার ফলস্বরূপ) প্রতীতম্ পরম্ দুঃখং (অনুভবে আসা অত্যন্ত কঠিন দুঃখ) হরতি (হরণ করে)।

সরলার্থ: বিচারশীল ত্যাগী সাধক অসৎবস্তুর অনুসন্ধান ত্যাগ করে 'আমিই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা' এই প্রকার আত্মদৃষ্টিসহ অবস্থান করেন। স্বীয় আত্মার অনুভূতিজনিত ব্রহ্মনিষ্ঠা নিশ্চয়ই সুখ দান করে ও অবিদ্যার ফলে যে কঠিন দুঃখের অনুভব হয় তা হরণ করে।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'যতিঃ-অসদ্-অনুসন্ধিং বন্ধহেতুং বিহায়'; 'যতিঃ' অর্থাৎ যিনি যত্ন করেন, সাধন করেন, ঈশ্বরচিন্তা করেন, যিনি ত্যাগী সন্ন্যাসী বা যোগী তিনি কি করেন? এই অনিত্যবস্তুর সন্ধান, এই মিথ্যার পেছনে ছোটা, বন্ধনের হেতু বলে ত্যাগ করেন। ত্যাগ করেন মানে কি? যতক্ষণ আমি এ জগতে আছি ততক্ষণ মিথ্যার মধ্যেই আছি। কিন্তু একে মিথ্যা বলে জানা, এই বোধ, এই বিশ্বাস, এটা মস্ত বড় সহায়ক। বুঝতে হবে যে ত্যাগ মানে দারিদ্র নয়। বৈরাগ্য দারিদ্র নয়; বি-রাগ—অনুরাগ নেই, বিষয়ে অনুরাগ নেই। সবই তো বিষয়, দেহটাও বিষয়। এই দেহটা আমি নই, এটা বুঝতে হবে। 'অসদ্-অনুসন্ধিং বন্ধহেতুং বিহায়'; এই অনিত্য বিষয়চিন্তা বন্ধনের কারণ বলে ত্যাগ করে তিনি কি করেন? 'স্বয়ম্-অয়ম্-অহম্-অস্মি-ইতি-আত্মদৃষ্ট্যা-এব তিষ্ঠেৎ'; 'আমিই আত্মা' এই ভাব নিয়ে থাকেন। আমিই ব্রহ্ম এই 'আত্মদৃষ্টি' নিয়ে, নিজের পরিচয়টা সব সময় ঠিক রেখে তিনি অবস্থান করেন। 'আত্মদৃষ্টি', 'দৃষ্টি' মানে এখানে জ্ঞান, 'আত্মদৃষ্টি' মানে আত্মজ্ঞান। এই দৃষ্টি বা বোধ আছে বলেই তিনি সুখে আছেন। 'সুখয়তি ননু নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্বানুভূত্যা হরতি পরম্-অবিদ্যাকার্য দুঃখং প্রতীতম্'; অবিদ্যা

মানে অজ্ঞান। অজ্ঞানের কার্য বা ফল হলো দুঃখ। সেই দুঃখ তিনি পান না। কেন পান না? 'নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্বানুভূত্যা'; আমি আত্মা এই অনুভব হয়েছে বলে। তিনি জেনেছেন 'আমিই আত্মা', যে আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। শুদ্ধ কথাটার অর্থ হচ্ছে কোনও মলিনতা নেই। মলিনতা নেই মানে কি ? স্থান, কাল এসব কিছু দিয়ে বদ্ধ নয়, কোনও বন্ধন নেই। আর নিত্য মানে তিনি সার্বভৌম, সর্বত্র আছেন, সব সময় আছেন, দেশ কাল তাঁকে বাঁধতে পারছে না। আমার দেহটা ? একটা বিশেষ সময়, একটা বিশেষ স্থানে আমি জন্মেছি, সেগুলো দিয়ে আমি সীমিত। কিন্তু আত্মা নির্গুণ, নিরাকার, সর্বব্যাপী, অসীম, অনন্ত। ভালো-মন্দ যা-কিছু গুণ সেগুলো তাঁর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তিনি অধিষ্ঠান। 'স্বয়ম্-অয়ম্-অহম্-অস্মি-ইতি-আত্মদৃষ্ট্যা-এব তিষ্ঠেৎ'; স্বয়ং আমিই এই ব্রহ্ম, এই আত্মদৃষ্টি তার হয়েছে, এই আত্মদৃষ্টি নিয়ে তিনি অবস্থান করছেন। তাই ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবেতে সমদৃষ্টি। এই যখন অবস্থা তখন খুব সুখ অনুভব হয়। 'সুখয়তি ননু'—নিশ্চয় সুখ হয়। 'নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্বানুভূত্যা'; ব্রহ্মের প্রতি তার নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা 'হরতি পরম্ অবিদ্যাকার্যদুঃখং প্রতীতম্'; হরণ করে। কি হরণ করে ? 'অবিদ্যাকার্যদুঃখম্'—অজ্ঞানের থেকে যে দুঃখ এসেছে। সেই দুঃখ তার আপনা থেকে দূর হয়ে যায় যে জানে আত্মা কি। আত্মাকে জানলে অজ্ঞানের ফল যে দুঃখ, যা সকলের কাছেই প্রতীয়মান, তা চলে যায়। যিনি যত্নশীল, বিচারশীল সাধক তিনি বিষয়চিন্তা ত্যাগ করে জানতে পারেন 'স্বয়ম্-অয়ম্-অহম্-অস্মি-ইতি'; 'আমিই সেই আত্মা', এই জ্ঞান লাভ করে 'তিষ্ঠেৎ'। বসে গেলাম, সেই জ্ঞানে স্থির হয়ে রইলাম। সেখান থেকে আর নড়চড় নেই। ওই জ্ঞানেই আমার অবস্থান। আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ওই জ্ঞানেই আমি স্থির, দৃঢ়। মুঠোর মধ্যে ঐ জ্ঞানটাকে ধরে আছি। তাহলে কি হবে? আত্মজ্ঞান যদি হয় তাহলে 'হরতি দুঃখং'; দুঃখের নাশ হয়। অজ্ঞানের ফল যে দুঃখ, যেটা সবাই আমরা অনুভব করি, সবার কাছে প্রতীয়মান হয় সেটা তখন চলে যায়। তখন আনন্দে অবস্থান।

বাহ্যানুসন্ধিঃ পরিবর্ধয়েৎ ফলং দুর্বাসনামেব ততস্ততোঽধিকাম্।
জ্ঞাত্বা বিবেকৈঃ পরিহৃত্য বাহ্যং স্বাত্মানুসন্ধিং বিদধীত নিত্যম্॥ ৩৩৪

অন্বয়: বাহ্যানুসন্ধিঃ (বাহ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে আকর্ষণ ও তার সন্ধান) ততঃ-ততঃ-অধিকাম্ (তার চেয়ে তার চেয়েও অধিক) দুর্বাসনাম্-এব ফলং (দুঃখকর ফলস্বরূপ দুঃসাধ্য বাসনাকে) পরিবর্ধয়েৎ (বাড়িয়ে তোলে) বিবেকৈঃ (বিচারের দ্বারা) জ্ঞাত্বা (জেনে) বাহ্যং পরিহৃত্য (বাহ্যবিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করে) স্বাত্মানুসন্ধিং (স্বীয় আত্মার অনুসন্ধানকে) বিদধীত নিত্যম্ (সর্বদা ধ্যানের বস্তু করবে)।

সরলার্থ: বাহ্যবিষয়ে আকর্ষণ ও তার অনুসন্ধান আরও আরও বেশী করে দুঃসাধ্য-বাসনার ফলস্বরূপ দুঃখকে বাড়িয়ে তোলে। বিচারের দ্বারা এটা বুঝে সর্বদা স্বীয় আত্মার অনুসন্ধানে ও ধ্যানে রত থাকতে হবে।

ব্যাখ্যা: বহির্মুখী মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যত 'এটা চাই ওটা চাই' করতে থাকে ততই তার দুর্বাসনা বাড়তে থাকে আর দুঃখ আসে। তাই বলছেন, 'বাহ্যানুসন্ধিঃ'; বাহ্যবিষয়ে আকৃষ্ট হচ্ছি। বাহ্য মানে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ এইসব পঞ্চভূতে তৈরী দ্রব্যের 'অনুসন্ধিঃ'—সন্ধান, এর প্রতি আকর্ষণ 'পরিবর্ধয়েৎ ফলং'; 'পরিবর্ধয়েৎ'—বাড়িয়ে দেয়; কি বাড়িয়ে দেয় ? 'ফলং'; কিসের ফল ? 'দুর্বাসনাম্-এব-ততঃ-ততঃ-অধিকাম্'; দুঃ—যা দুঃখদায়ক, 'দুর্বাসনা'—দুঃখদায়ক বাসনা, এমন বাসনা, যা দুঃখ আনবেই আনবে। 'বাহ্যানুসন্ধিঃ', যার মন বাহ্যবিষয়ে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে, তার বাসনা বেড়েই যাবে। আর তার এমন সব বাসনা দেখা দেবে যা দুঃখ আনবেই আনবে। এই বাসনার কথা বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, উট কাঁটাগাছ খেতে ভালোবাসে, তাতে এত কাঁটা যে, খেয়ে তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে তবু সে তাই খাবে। আমাদের দুর্বাসনা এইরকম। বাসনার থেকে দুঃখ আসছে তবু মানুষ সে বাসনা ছাড়তে পারছে না। এইসব অসম্ভব বাসনা রাখলে চলবে না। বিচার করতে হবে যাতে বাসনা চলে যায়। শাস্ত্র কখনও বলেন না এটা মানতেই হবে, বিশ্বাস করতেই হবে। কিন্তু বিচার করতে বলেন, ভেবে দেখতে বলেন, চিন্তা করতে বলেন। বাস্তব ঘটনা থেকে দেখছি, বাহ্য- বিষয়ের পেছনে ছুটলে বাসনা বেড়েই চলবে—'ততস্ততোঽধিকাম্'। তাই বলছেন, 'জ্ঞাত্বা বিবেকৈঃ পরিহৃত্য বাহ্যং'; 'বিবেক' মানে বিচার, বিচার করে বাহ্যকে পরিত্যাগ করে, 'স্বাত্মানুসন্ধিং বিদধীত নিত্যম্'; সর্বদা আত্মার অনুসন্ধান করবে। তুমি নিজেকে লাভ কর, তোমার শাশ্বত স্বরূপকে খুঁজে বের কর। বাহ্যবস্তু অনিত্য—আজ একরকম, কাল একরকম। এর ওপর নির্ভর করা মানেই দুঃখ ডেকে আনা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ভগবান খুব ভালো লোক, ভালো লোকের ওপর নির্ভর করলে তিনি কখনও ফেলে দেন না। ভগবান অর্থাৎ আমার আত্মা। নিত্য তিনি। তাঁর ওপর নির্ভর করা মানে নিত্যবস্তুতে নির্ভর করেছি, তাঁকে হারাবার ভয় নেই। অনিত্যকে তুমি ছেড়ে দাও, নিত্যকে ধর। সর্বদা তাঁরই ধ্যান কর, বাহ্যকে বর্জন কর।

বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্।
তস্মিন্ সুদৃষ্টে ভববন্ধনাশো বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ॥ ৩৩৫

অন্বয় : বাহ্যে নিরুদ্ধে (বাহ্যবস্তু থেকে মন নিরুদ্ধ হলে) মনসঃ প্রসন্নতা (মনের প্রসন্নতা হয়) মনঃপ্রসাদে (মন নির্মল হলে) পরমাত্মদর্শনম্ (পরমাত্মার দর্শন হয়) তস্মিন্ সুদৃষ্টে (তাঁর সম্যক্ দর্শনে) ভববন্ধনাশঃ (ভববন্ধনের নাশ হয়) বহির্নিরোধঃ (বাহ্যবিষয়ে আকর্ষণ পরিহার) বিমুক্তেঃ (মুক্তির) পদবী (উপায়)।

সরলার্থ : বাহ্যবিষয়ের আকর্ষণ থেকে মনের নিরোধ হলে প্রসন্নতা লাভ হয়। মন প্রসন্ন ও নির্মল হলে পরমাত্মার দর্শন হয়। আর তাঁর সম্যক্ দর্শনে ভববন্ধনের নাশ হয়। তাই বাহ্যবিষয়ের আকর্ষণ পরিহার মোক্ষলাভের উপায় বলে পরিগণিত।

ব্যাখ্যা : এখানে বলছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সব বস্তু মানুষকে আকর্ষণ করে সেগুলোর থেকে মনকে গুটিয়ে নিতে পারলে মনে প্রসন্নতা আসে। আর সেই প্রসন্ন স্থির শান্ত মনে পরমাত্মা প্রকাশিত হন। তখন এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খাওয়া, এই সংসারের যে বন্ধন, তার নাশ হয়। এমনভাবে বলছেন যেন প্রলোভন দেখাচ্ছেন। 'বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা'; বাহ্যবস্তু থেকে তোমার মন যদি নিরুদ্ধ করতে পার তাহলে মনের প্রসন্নতা আসবে। যা চাইছ তা যদি না পাও তাহলে দুঃখ। আবার পেলেও দুঃখ। কারণ এ তো অনিত্য। কখন ফুরিয়ে যাবে, কোথায় হাতছাড়া হয়ে যাবে, কে কেড়ে নেবে, তা তো জানা নেই। অনিত্যবস্তু, এ তো ফুরিয়ে যাবেই। তাহলে এর পেছনে ছুটছি কেন? এটা একটা মোহ, মনোমুগ্ধকর, মনকে আকর্ষণ করে। তাই আমি যদি মনকে গুটিয়ে আনতে পারি, 'বাহ্যে নিরুদ্ধে'—বাহ্যবিষয় থেকে মনটাকে যদি নিরুদ্ধ করতে পারি, তাহলে মনে প্রসন্নতা আসবে। বলছেন, 'মনসঃ প্রসন্নতা'; মনে যদি আমার প্রসন্নতা আসে তাহলে 'মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্', মনের সেই প্রসন্ন স্থির শান্ত অবস্থায় আমি পরমাত্মাকে দেখতে পাব। এখন দেখতে পাই না কেন? কারণ আমার মন অস্থির, চঞ্চল, বাইরের দিকে চলছে, ভেতরের দিকে তাকাচ্ছি না। আমাদের মনে প্রসন্নতা আসে না, কারণ আমরা বাইরের দিকে তাকাচ্ছি। বাইরের দিকে মন যদি ছোটে তাহলে কখনও প্রসন্নতা আসবে না। আর নিজের দিকে যদি মন ছোটে তাহলে প্রসন্নতা আসবে আর প্রসন্নতা এলে আমি পরমাত্মাকে দেখতে পাব। কি করে দেখতে পাব? এর একটা খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত স্বামীজী দিয়েছেন। স্বামীজী বলছেন, খুব বড় একটা দিঘি, তার জলে ঢেউ ওঠে। জল যখন তরঙ্গায়িত তখন ওপরের দিকে যা কিছু আছে তাই দেখতে পাই, দিঘির তলায় কি আছে দেখতে পাই না। কিন্তু সেই তরঙ্গ চলে গিয়ে জল স্থির হলে দিঘির তলাটা দেখতে পাই। তেমনি আমাদের মন সব সময় তরঙ্গায়িত কিন্তু 'মনঃপ্রসাদে', সেই মন প্রসন্ন শান্ত হলে মনের গভীরে যে পরমাত্মা আছেন তাঁকে দেখতে পাব। 'তস্মিন্ সুদৃষ্টে'—তাঁকে দেখতে যদি পাই, আমার স্বরূপ যিনি তাঁকে যদি ভালো করে দেখতে পাই, বুঝতে পারি তাহলে 'ভববন্ধনাশঃ'—এই সংসারবন্ধন চলে যায়। এই সংসারের সুখ-দুঃখ ভালোমন্দের পেছনে আমরা ছুটে চলেছি। বাস্তবিক সবাই আমরা একটা আলেয়ার পেছনে ছুটে চলেছি, মায়া মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছি। 'হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান?' স্বামীজী প্রশ্ন করছেন। তুমি তো বুদ্ধিমান, বিচারশীল, তুমি এই সংসারে সুখ আশা করছ? এই অনিত্যবস্তুতে সুখ কোথায়? যা দেখছ সব স্বপ্নের মতো। সুখ-দুঃখ দুইই স্বপ্ন, দুইই মিথ্যা। প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটলে আমরা কত সময়ে ভাবি আমার সব সুখ ফুরিয়ে গেলো। আর

হাসব না। কিন্তু আবার হাসছি, আবার যেমন ছিলাম তেমনি হয়েছি। এই ভববন্ধন। বন্ধন কেন? কারণ এসব আমার ইচ্ছাধীন নয়, কে যেন আমাকে দিয়ে এসব করাচ্ছে। আমাদের আত্মাই নিত্য, আর সব অনিত্য, এটা যখন বুঝতে পারি তখনই ভববন্ধনের নাশ হয়। বলছেন, 'বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ'; বাইরের নিরোধ মানে অনিত্যবস্তু ত্যাগ। এটাই উপায়, 'পদবী বিমুক্তেঃ'—মুক্তির উপায়। এটা করতে পারলেই মুক্ত হয়ে যাব। কঠোপনিষদ্ বলছেন, 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ'(ক, ২।১।১); ঈশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী করে আমাদের যেন মেরে রেখে দিয়েছেন। আমরা বাইরের দিকে তাকাই, অন্তরের দিকে তাকাই না। কিন্তু 'কশ্চিদ্ধীরঃ'—কোনও কোনও ধীর ব্যক্তি 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হন; শুধু চোখ নয়, সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি তাঁরা বাইরের জগতের থেকে বন্ধ করে রেখে দেন। তাঁরা অমৃতের অভিলাষী হয়ে যা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান তাই লাভ করেন। তাই বাহ্যবস্তুর প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করতে বলছেন। কারণ মুক্তিলাভের এটাই উপায়।

কঃ পণ্ডিতঃ সন্ সদসদ্‌বিবেকী শ্রুতিপ্রমাণঃ পরমার্থদর্শী।
জানন্ হি কুর্যাদসতোঽবলম্বং স্বপাতহেতোঃ শিশুবন্মুমুক্ষুঃ ॥ ৩৩৬

অন্বয় : সদ্-অসদ্ বিবেকী (নিত্যানিত্য বিচারশীল) শ্রুতিপ্রমাণঃ (যিনি শাস্ত্রবাক্য প্রামাণ্য বলে মানেন) পরমার্থদর্শী (যিনি আত্মদর্শনই পরম প্রাপ্তি বলে জানেন) পণ্ডিতঃ (শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান) মুমুক্ষুঃ (মুক্তিকামী) কঃ (কে) জানন্ হি (জেনেও) শিশুবৎ (অবোধ শিশুর মতো) স্বপাতহেতোঃ (নিজের পতনের কারণ) অসতঃ অবলম্বং কুর্যাৎ (অসৎ বস্তু অবলম্বন করবেন)।

সরলার্থ : এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি নিত্যানিত্য-বস্তু বিচার করেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, যিনি শাস্ত্রবাক্যকে প্রামাণ্য বলে মানেন ও আত্মজ্ঞান লাভই পরম প্রাপ্তি বলে জানেন, যিনি মুমুক্ষু, কিন্তু তা সত্ত্বেও অবোধ শিশুর মতো অসৎ বস্তু অবলম্বন করে নিজের পতনের কারণ হয়ে থাকেন?

ব্যাখ্যা : বলছেন, যিনি মুক্তিকামী, বুদ্ধিমান, পণ্ডিত, সদসদ্ বিচার করেন, শাস্ত্র মানেন, আত্মজ্ঞান লাভই পরম প্রাপ্তি বলে জানেন, তিনি কি ভুল করেও অবোধ শিশুর মতো অসৎ বস্তু অবলম্বন করে নিজের পতনের কারণ হবেন? তা কখনও হতে পারে না। আমরা সবাই মুক্তিকামী, কেউ বন্ধন চাই না। আমার এই ধনসম্পদ, মান-সম্মান, এগুলো সব আমার বন্ধন। কিন্তু এগুলো অনিত্য, এটা জেনে যদি এসবকে ব্যবহার করি, তাহলে এগুলোর প্রতি আসক্ত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। এগুলোকে যখন আমি নিত্য মনে করছি তখন আমি শিশুর মতো ব্যবহার করছি, পরনির্ভর হয়ে

যাচ্ছি, আগুনে হাত দিচ্ছি। 'কঃ পণ্ডিতঃ সন্ সদসদ্‌বিবেকী'; 'সৎ' মানে নিত্য, 'অসৎ' মানে অনিত্য। যে পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, নিত্যানিত্য বিচার করতে পারে সে 'সদসদ্‌বিবেকী'; 'শ্রুতিপ্রমাণঃ পরম-অর্থদর্শী', যে শ্রুতিকে প্রামাণ্য বলে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রের কথা মানে, 'পরমার্থদর্শী', পরমার্থকে সে লাভ করতে চায়, অন্তত 'পরমার্থ' সম্বন্ধে একটা ধারণা তার হয়েছে। পরমার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর, ভূমা; ভূমা মানে যা সবচেয়ে বড় জিনিস, ব্রহ্ম, যা নিত্য। আমি সেই ভূমাকে চাই, অল্প কিছু নেব না। 'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখম্ অস্তি', (ছা, ৭।২৩।১) সেই ভূমাই পরমার্থ। 'জানন্ হি কুর্যাৎ অসদবলম্বং'—জেনে-শুনে সে 'অসদবলম্বং' করবে ? যা অসৎ, যা অনিত্য, তাকে জেনে-শুনে অবলম্বন করবে? আমি রূপের গর্ব করতে পারি, স্বাস্থ্যের গর্ব করতে পারি, কিন্তু এগুলো তো অনিত্য, আজ আছে কাল নেই। এগুলো নিয়ে যদি আমি গর্ব করি, এগুলোকে যদি আশ্রয় করি সেটা 'স্বপাতহেতোঃ', নিজের পতনের হেতু হবে। এ তো শিশুর মতো ব্যবহার। তুমি মুমুক্ষু, পণ্ডিত, এরকম 'শিশুবৎ' ব্যবহার যদি কর তাহলে নিজেই নিজের পতনের কারণ হবে। এরকম ব্যবহার কোনও বিচারশীল পণ্ডিত ব্যক্তি, যে মুমুক্ষু, পরমার্থ কি তা জানে, সে কখনও করতে পারে না।

দেহাদিসংসক্তিমতো ন মুক্তির্মুক্তস্য দেহাদ্যভিমত্যভাবঃ।
সুপ্তস্য নো জাগরণং ন জাগ্রতঃ স্বপ্নস্তয়োর্ভিন্নগুণাশ্রয়ত্বাৎ॥ ৩৩৭

অন্বয়: দেহাদিসংসক্তিমতঃ (দেহ ও দেহকেন্দ্রিক বিষয়ে আসক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির) মুক্তিঃ ন (মুক্তি হয় না) মুক্তস্য (মুক্ত ব্যক্তির) দেহাদি-অভিমতি-অভাবঃ (দেহ ইত্যাদিতে অহং-বুদ্ধির অভাব হয়) সুপ্তস্য জাগরণং নো (ঘুমন্ত ব্যক্তির জাগ্রত অবস্থা হয় না) জাগ্রতঃ স্বপ্নঃ ন (জাগ্রত ব্যক্তির স্বপ্নাবস্থা হয় না) তয়োঃ (এই দুই অবস্থা) ভিন্নগুণাশ্রয়ত্বাৎ (বিপরীত গুণ আশ্রয় করে আছে বলে)।

সরলার্থ: দেহ ও দেহকেন্দ্রিক বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তির মুক্তি হয় না। আবার যিনি মুক্ত তাঁর দেহাদিতে অভিমানের একান্ত অভাব দেখা যায়। যেমন একই ব্যক্তি একসঙ্গে ঘুমিয়ে আবার জেগে থাকতে পারে না কারণ স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রত অবস্থা এই দুটি বিপরীত গুণসম্পন্ন অবস্থা, তেমনি দেহাদিতে আসক্তি ও অনাসক্তি একসঙ্গে কখনও থাকতে পারে না।

ব্যাখ্যা: বলছেন, সত্যি-সত্যি যদি তুমি মুক্তি চাও তাহলে এই দেহ ইত্যাদিতে মন দিও না। আর কিছু না, দেহ যে অনিত্য এটা জেনে রাখতে হবে। এখন হয়তো আমার সব আছে। এত রূপ, স্বাস্থ্য, কত টাকাকড়ি, প্রতিষ্ঠা, একেবারে রমরমা। হঠাৎ সব চলে যাবে, কিছুই থাকবে না। আশে-পাশে কত অঘটন দেখি। পাঁচ

বছরের শিশু, ফুলের মতো, শোনা গেল তার cancer। আবার নবব্বই বছরের বৃদ্ধ, বাঁচতে চান না কিন্তু তিনি ঠিক রয়ে গেলেন। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া যা ঘটবার নয় তাই ঘটাচ্ছেন। এইসব মায়ার খেলা। সংসার যেন একটা chaos, কি যে ঘটছে আর কি ঘটছে না তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। তবু মনে রাখতে পারি না যে এসব অনিত্য। তাই শাস্ত্র বলছেন, দেখেও যদি না দেখ তাহলে তোমারই ক্ষতি। জাগা লোককে কি করে জাগানো যায়! ভুল করো না, যা মিথ্যা, অনিত্য, তাকে তাই বলে জান। এখানে কিরকম বলছেন, 'দেহাদিসংসক্তিমতঃ ন মুক্তিঃ'; মুক্তি চাইছ? তাহলে বাপু এই দেহাদির প্রতি যে আকর্ষণ, সেটাকে তুমি দূর কর। 'দেহাদিসংসক্তিমতঃ', 'সংসক্তি' মানে আসক্তি, 'সংসক্তিমতঃ' মানে আসক্তিমান। যার দেহের প্রতি আসক্তি, দেহ আর দেহকেন্দ্রিক যা-কিছু তাতেই যার মন, তার 'ন মুক্তিঃ'—মুক্তি নেই। দেহে আবদ্ধ থাকলে হবে না। বিচার করতে হবে, আমি কে? দেহ? না দেহ নই। তবে কি মন? না মন নই। এমনি করে নেতি নেতি করে বিচার করতে হবে। দেহ নয়, মন নয়, বুদ্ধি নয়, এমনি করে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করতে করতে আমরা আত্মায় গিয়ে থামব। তখন সব পেয়েছি। 'মুক্তস্য দেহাদি-অভিমতি-অভাবঃ'; যে মুক্ত ব্যক্তি তার দেহ ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ নেই, অভিমতি নেই। আমাদের এই মুক্তির অবস্থাটা কি সুন্দর ! সব থাকতে পারে, কিন্তু কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ নেই। আছে তো আছে, যদি না থাকে তো নেই—এরকম ভাব। 'সুপ্তস্য নো জাগরণম্ ন জাগ্রতঃ স্বপ্নঃ'; আমি একই ব্যক্তি, একই সঙ্গে একই সময়ে জেগেও আছি আবার ঘুমিয়েও আছি, এটা তো হয় না। তেমনি মুক্ত আর বদ্ধ দুই বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে। একজন দেহকে যেন পুজো করছে আবার আরেকজন দেহের কি হলো না-হলো গ্রাহ্যই করছে না। 'সুপ্তস্য নো জাগরণং'; যে ঘুমিয়ে আছে তাকে তো আমি জাগ্রত বলতে পারি না আবার যে জেগে আছে তাকে আমি ঘুমন্ত বলতে পারি না। 'জাগ্রতঃ স্বপ্নঃ তয়োঃ ভিন্নগুণাশ্রয়ত্বাৎ'; জাগ্রত আর নিদ্রিত এই দুটো অবস্থা ভিন্ন গুণ আশ্রয় করে আছে, তাই তারা একসঙ্গে থাকতে পারে না। তেমনি যার দেহের প্রতি আকর্ষণ আর যার তা নেই, তারা বিপরীত গুণাশ্রয়ী। যদি মুক্তি চাও তাহলে দেহ ও দেহকেন্দ্রিক সবকিছু থেকে মন তুলে নাও। দেহসর্বস্ব হয়ে থাকব আবার মুক্ত হয়ে যাব এই দুটো একসঙ্গে হয় না।

অন্তর্বহিঃ স্বং স্থিরজঙ্গমেষু জ্ঞাত্বাত্মনাধারতয়া বিলোক্য।
ত্যক্তাখিলোপাধিরখণ্ডরূপঃ পূর্ণাত্মনা যঃ স্থিত এষ মুক্তঃ॥ ৩৩৮

অন্বয়: যঃ (যিনি) অন্তঃ-বহিঃ (ভিতর ও বাইরে) স্থিরজঙ্গমেষু (সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমে) স্বং (নিজেকে) জ্ঞাত্বা (জেনে) আত্মনা (শুদ্ধ মনের সহায়ে) আধারতয়া (বিশ্বজগতের

আধাররূপে) বিলোক্য (উপলব্ধি করে) ত্যক্ত্বা-অখিল-উপাধিঃ (সর্বপ্রকার উপাধি বর্জন করে) অখণ্ডরূপঃ (এক সম্পূর্ণরূপ) পূর্ণ-আত্মনা (পরিপূর্ণ আত্মভাবসহ) স্থিতঃ (অবস্থিত) এষঃ মুক্তঃ (ইনিই মুক্তপুরুষ)।

সরলার্থ: যিনি অন্তরে ও বাইরে, সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমে নিজেকে উপলব্ধি করেন আর শুদ্ধবুদ্ধি সহায়ে বিশ্বজগতের আধাররূপে স্বীয় আত্মাকে জেনে সর্বপ্রকার উপাধি বর্জন করেন ও অখণ্ড পূর্ণ আত্মারূপে অবস্থান করেন, তিনিই মুক্তপুরুষ।

ব্যাখ্যা: এখানে বলছেন, যে মুক্ত সে কিরকম। 'অন্তঃ-বহিঃ স্বং স্থিরজঙ্গমেষু জ্ঞাত্বা আত্মনা আধারতয়া বিলোক্য'; ভিতর বাহির এক আত্মা। আমি অন্তরে আছি, বাইরে আছি। 'স্থিরজঙ্গমেষু', আমি অচলেও আছি সচলেও আছি। 'জ্ঞাত্বা আত্মনা আধারতয়া', অর্থাৎ আত্মা যে এই চলমান জগতের আধার এটা জেনে সে মুক্ত। জগৎ গতিশীল চলমান, কিন্তু তার একটা আধার তো চাই, সেই আধার হচ্ছেন আত্মা। যেমন রজ্জু-সর্প বা মরীচিকা; রজ্জু বা মরুভূমি আধার। ব্রহ্মই সবকিছুর আধার। আমিই সবকিছুর আধার, আমাতেই সবকিছু ন্যস্ত। এইটে যে জানতে পেরেছে, 'বিলোক্য'—অনুভব করে, অর্থাৎ এটা যে অনুভব করেছে তার আর বহুত্ব থেকে কোনও ভ্রম হয় না। আমি উপলব্ধি করেছি আমিই সকলের মধ্যে আছি। আমার ওপরেই এই জগৎসংসার দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটা গাছের মধ্যেও আছি, কীট -পতঙ্গের মধ্যেও আছি আবার জীবজন্তু, মানুষ, সবের মধ্যে আছি। একটা হীরের মালা, একটা সূত্র সব মণিগুলোকে ধরে রেখেছে—সূত্রে মণিগণা ইব (গী, ৭।৭)। তেমনি এক আত্মা—'ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত'। যা কিছু ভূতঃ—হয়েছে, সবের মধ্যে একই আত্মা, পূর্ণ। 'পূর্ণম্-অদঃ পূর্ণম্-ইদম্ পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে'। বাইরে পূর্ণ, ভিতরে পূর্ণ, পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিচ্ছি, পূর্ণই থাকছে। এক আত্মা, একরসঃ, ঘন, অখণ্ড, পূর্ণ। এইটে যখন দেখব, যখন আমি নিজেকে সকলের মধ্যে দেখব, সকলকে নিজের মধ্যে দেখব তখন আমি মুক্ত। তাই বলছেন, 'ত্যক্ত্বা-অখিল-উপাধিঃ-অখণ্ডরূপঃ পূর্ণাত্মনা যঃ স্থিতঃ এষঃ মুক্তঃ'। আত্মা নিরুপাধিক অখণ্ডরূপ। যিনি সর্বপ্রকার উপাধি বর্জন করেছেন, পূর্ণ আত্মায় যাঁর স্থিতি, তিনিই মুক্ত।

সর্বাত্মতা বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ সর্বাত্মভাবান্ন পরোঽস্তি কশ্চিৎ।
দৃশ্যাগ্রহে সত্যুপপদ্যতেঽসৌ সর্বাত্মভাবোঽস্য সদাত্মনিষ্ঠয়া॥ ৩৩৯

অন্বয়: সর্বাত্মতা (সর্বভূতে আত্মভাব) বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ (বন্ধনমুক্তির কারণ) সর্বাত্মভাবাৎ (সর্ববস্তুতে আত্মভাবের চেয়ে) কশ্চিৎ পরঃ ন অস্তি (বড় আর কিছু নেই) অস্য (মুমুক্ষু ব্যক্তির) সদাত্মনিষ্ঠয়া (সর্বদা আত্মনিষ্ঠা সহায়) দৃশ্য-অগ্রহে (দৃশ্যমান জগতে উপরতি হলে) অসৌ সর্বাত্মভাবঃ (এই সর্বাত্মভাব) উপপদ্যতে (সিদ্ধ হয়)।

সরলার্থ: সর্বভূতে আত্মদর্শন বন্ধনমুক্তির কারণ। সর্ববস্তুতে আত্মভাবের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। সর্বদা আত্মচিন্তার দরুন মুমুক্ষু ব্যক্তির যখন এই দৃশ্যমান জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মন চলে যায় তখন তাঁর মধ্যে এই সর্বাত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাখ্যা: সর্বাত্মতার কথা বলছেন। আমি সকলের ভেতরে, আমিই সকলের আধার। 'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মনি এব অনুপশ্যতি সর্বভূতেষু চ আত্মানং ততঃ ন বিজুগুপ্সতে' (ঈ, ৬)। সবাইকার মধ্যে আমি, আবার সবাই আমার মধ্যে, এই জ্ঞান হলে আমার আর কারোর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই। 'সর্বাত্মতা বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ'; সবাইকার মধ্যে এক আত্মা, এই এক জ্ঞান মানেই বন্ধনের নাশ, মুক্তি। 'সর্বাত্মভাবাৎ-ন পরঃ অস্তি কশ্চিৎ'; সবাইকার মধ্যে এক আত্মাকে দেখার এই যে ভাব, এর থেকে 'ন পরঃ অস্তি'—বড় আর কিছু নেই। এই আত্মভাবই মুক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, বাড়ীর ছাদের জল বেরোবার পথে নানারকম মুখ থাকে, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, এইসব। সব মুখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, এক জল। তেমনি এক ব্রহ্ম বহুরূপে প্রকাশ হয়েছেন। একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি (ঋ, ১।১৬৪।৪৬)। তিনিই মানুষ হয়েছেন, ইতরপ্রাণী হয়েছেন, উদ্ভিদ হয়েছেন, এক বহু হয়েছেন। এই 'সর্বাত্মভাবাৎ ন পরঃ অস্তি কশ্চিৎ'—এই সর্বাত্মভাবের চেয়ে শ্রেয় আর কিছু নেই, এই ভাবই শ্রেষ্ঠ। 'দৃশ্য-অগ্রহে সতি উপপদ্যতে অসৌ সর্বাত্মভাবঃ অস্য আত্মনিষ্ঠয়া'। 'দৃশ্য-অগ্রহে সতি'; এই দৃশ্যমান জগৎকে আমি যদি অস্বীকার করতে পারি, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে না দেখে আমি যদি সেসবের মধ্যে আমাকেই দেখতে পাই তাহলে এই 'সর্বাত্মভাবঃ' আমার হবে। এই দৃশ্যমান জগতের প্রতি যার আগ্রহ তার কিন্তু এই ভাব হবে না। তোমাকে হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ত্যাগ করতে হবে নয়তো তোমার মধ্যে যিনি আছেন তাঁর জ্ঞান হওয়ার আশা ছাড়তে হবে। দুটো একসঙ্গে হয় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় আর দেখছি না—এরকম যদি হয়, তবে 'উপপদ্যতে অসৌ সর্বাত্মভাবঃ', এই সর্বাত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সদা-আত্মনিষ্ঠয়া', সর্বদা একাগ্র আত্মচিন্তার দ্বারা এই দৃশ্যমান জগতের প্রতি আগ্রহের নাশ হয়। আত্মচিন্তায় যদি একাগ্র হয়ে থাকি তাহলে আর নামরূপ আমি দেখব না। সেই এক আত্মা সর্বভূতে আছেন এটাই দেখব। সবার মধ্যে আত্মদৃষ্টি, এর থেকে বড় আর কিছু নেই।

দৃশ্যস্যাগ্রহণং কথং নু ঘটতে দেহাত্মনা তিষ্ঠতো
বাহ্যার্থানুভব-প্রসক্ত-মনসস্তৎতৎ ক্রিয়াং কুর্বতঃ।
সংন্যস্তাখিল-ধর্ম-কর্মবিষয়ৈর্নিত্যাত্মনিষ্ঠাপরৈ-
স্তত্ত্বজ্ঞৈঃ করণীয়মাত্মনি সদানন্দেচ্ছুভির্যত্নতঃ॥ ৩৪০

অন্বয়: দেহাত্মনা তিষ্ঠতঃ (দেহাত্মবুদ্ধি নিয়ে যে আছে) বাহ্যার্থ-অনুভব-প্রসক্ত-মনসঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ভোগের জন্যে যে আসক্তচিত্ত) তৎ-তৎ ক্রিয়াং কুর্বতঃ (ভোগ সম্পাদনের জন্যে যা যা করণীয় তা করছে) দৃশ্যস্য-অগ্রহণং ([তার] দৃশ্যপদার্থের অগ্রহণ) কথং নু ঘটতে ([তাহলে] কি করে ঘটে) সংন্যস্ত-অখিল-ধর্ম-কর্ম বিষয়ৈঃ (সমস্ত ধর্ম-কর্ম ও বিষয় সম্যক্‌রূপে ত্যাগের দ্বারা) নিত্য-আত্মনিষ্ঠা-পরৈঃ (সর্বদা আত্মনিষ্ঠাপরতাসহ) আত্মনি সদানন্দ-ইচ্ছুভিঃ (আত্মায় সদানন্দ অনুভবের অভিলাষী) তত্ত্বজ্ঞৈঃ (তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদের দ্বারা) যত্নতঃ করণীয়ম্ (যত্নের সঙ্গে [বাহ্যবিষয় বর্জন] কর্তব্য)।

সরলার্থ: দেহে আত্মবুদ্ধি করে বসে আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ভোগে আসক্তচিত্ত এবং ভোগ্যবস্তু লাভের জন্যে যা-যা করণীয় তা সবই করে যাচ্ছে—এরকম যারা তাদের কি করে বাহ্যবস্তুর অগ্রহণ হতে পারে? যাঁরা সমস্ত ধর্মকর্ম ও বিষয়বাসনা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন, সর্বদা আত্মচিন্তায় নিবিষ্ট থেকে আত্মায় সদানন্দ অভিলাষ করছেন সেইসব তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদের পক্ষে যত্নের সঙ্গে বিষয় বর্জন করা কর্তব্য।

ব্যাখ্যা: বলছেন, আমি যদি 'দেহাত্মনা' হই, দেহকেই আত্মা ভাবি, দেহ ছাড়া আর কিছু নেই ভাবি, তাহলে আমার 'দৃশ্য-অগ্রহণ' হবে না। গোড়ার কথা হচ্ছে দেহ থেকে আত্মা যে আলাদা হয়ে আছেন এটা বোঝা। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, খোড়ো নারকেল, শাঁসটা আর ছোবড়াটা আলাদা হয়ে গেছে, খড়খড় করছে। আমাদের আত্মা আছেন কতকগুলো কোশের মধ্যে। কুঠুরির মধ্যে কুঠুরি, সবচেয়ে ভেতরে আত্মা। অন্নময়কোশ, প্রাণময়কোশ, মনোময়কোশ, ইত্যাদি। তার মধ্যে আমাদের আত্মা আছেন। বলছেন, 'দেহাত্মনা তিষ্ঠতঃ'; যারা দেহেই আত্মবুদ্ধি করে আছে তাদের পক্ষে 'দৃশ্যস্য-অগ্রহণং কথং নু ঘটতে'—দৃশ্যের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অগ্রহণ কি করে আর ঘটে? যে নিজের দেহটাকেই মিথ্যে বলে ভাবতে পারছে না, সে কি করে অপরের দেহকে অস্বীকার করবে? এই দৃশ্যমান নাম-রূপের জগৎকে অগ্রহণ, অর্থাৎ এর প্রতি যে আকর্ষণ তা সে ত্যাগ করতে পারবে না। আমাদের মন ইন্দ্রিয়ের পেছনে পেছনে ছোটে, বাহ্যবিষয়ের অনুভবের জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছে। 'বাহ্যার্থ-অনুভব-প্রসক্তমনসঃ-তৎ-তৎ ক্রিয়াং কুর্বতঃ'; বাহ্যবিষয়ে মন আসক্ত হয়ে আছে আর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের জন্যে যা-যা করার তা করছে। শুধু তো মনে আসক্ত নয়। আমরা সেইভাবে ব্যবহারও করি। যার প্রতি আকর্ষণ সেটা পাবার জন্যে চেষ্টা করি। টাকা-পয়সা, রূপলাবণ্য, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, যাতে যার আকর্ষণ সে তাই পেতে চেষ্টা করে। আবার আর এক দল লোক আছে তারা 'সংন্যস্ত অখিল-ধর্ম-কর্ম-বিষয়ৈঃ'; সব অনিত্যবস্তু তারা সম্যক্‌ভাবে ত্যাগ করেছে। তারা আত্মনিষ্ঠাপর, সেই আত্মনিষ্ঠাপরতার দ্বারা তারা সমস্ত ধর্ম-কর্ম আর বাহ্যবিষয় ত্যাগ করেছে। এখানে

ধর্ম বলতে বোঝাচ্ছেন আচার-অনুষ্ঠান। 'আত্মনিষ্ঠাপরৈঃ'; আচার-অনুষ্ঠান বড় নয়, আত্মনিষ্ঠা, সেটাই আসল। তিনিই আমার আত্মা এই বোধ, এই নিষ্ঠা, এর চেয়ে বড় আর কিছু নেই। একটা শ্লোকে আছে, 'ন ধর্মেন ন কর্মণা ...'। অর্থাৎ এই বাইরের যত অনুষ্ঠান যাকে আমরা ধর্ম বলি, তা বহিরঙ্গ, তাতে হবে না। আর 'ন কর্মণা', মানে যাগযজ্ঞ, সকাম কর্ম, তাতেও হবে না। কি হবে না ? অমৃতত্ব লাভ হবে না, মুক্তি হবে না। কিসে হবে তাহলে ? 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' (কৈ, ২)—ত্যাগের দ্বারা হবে। এখানেও তাই বলছেন : ধর্ম-কর্ম-বিষয় ত্যাগ করতে হবে আর আত্মনিষ্ঠাপরায়ণ হতে হবে—'সংন্যস্ত-অখিল-ধর্ম-কর্ম বিষয়ৈঃ নিত্য-আত্মনিষ্ঠা-পরৈঃ'। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আত্মা, যে আত্মা সকলের মধ্যে, তাঁর প্রতি নিষ্ঠা রেখেছি ততক্ষণ আমি বিষয় বিমুখ, আত্মস্থ। 'তত্ত্বজ্ঞৈঃ করণীয়ম্-আত্মনি-সদানন্দ ইচ্ছুভিঃ যত্নতঃ'; তত্ত্বজ্ঞের কি করণীয় ? বা তুমি যদি সদানন্দ চাও তাহলে কি করবে? 'সংন্যস্ত-অখিল-ধর্ম-কর্ম-বিষয়ৈঃ-নিত্য-আত্মনিষ্ঠাপরৈঃ'; করণীয় হচ্ছে সবকিছু সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা আর চেষ্টা করে আত্মাতে মনটাকে স্থির রাখা। তুমি আনন্দ চাও? ছোটখাটো যে আনন্দ তা ক্ষণিক। যে আনন্দ নিত্য সেই নিত্যানন্দ পেতে চাও ? তাহলে ওই অখিল-ধর্ম-কর্ম বাহ্যবিষয় থেকে মন সরিয়ে আনো। আত্মস্থ হয়ে থাকো।

সর্বাত্মসিদ্ধয়ে ভিক্ষোঃ কৃতশ্রবণকর্মণঃ।
সমাধিং বিদধাত্যেষা শান্তো দান্ত ইতি শ্রুতিঃ॥৩৪১

অন্বয়: কৃতশ্রবণকর্মণঃ (বেদান্তশ্রবণরূপ কর্ম করেছেন এরকম) ভিক্ষোঃ (সন্ন্যাসীর জন্যে) শান্তঃ দান্তঃ ইতি (শান্তো দান্তঃ ইত্যাদি) এষা শ্রুতিঃ (এই শ্রুতিবাক্য) সর্বাত্মসিদ্ধয়ে (সর্বাত্মভাব উপলব্ধির জন্যে) সমাধিং বিদধাতি (সমাধির বিধান দিচ্ছেন)।

সরলার্থ: বেদান্ত শ্রবণ করেছেন এরকম ত্যাগী সন্ন্যাসীর সর্বাত্মভাব অনুভবের জন্যে শ্রুতি 'শান্তোদান্তঃ' ইত্যাদি বাক্যে সমাধির বিধান দিচ্ছেন।

ব্যাখ্যা: 'সর্বাত্মসিদ্ধি' অর্থাৎ সকলের মধ্যে নিজেকে দেখা। সেটাই জ্ঞানের লক্ষণ। সেটাই চরম লক্ষ্য। উপনিষদে বলছেন : 'যঃ অন্যঃ অসৌ অন্যঃ অহম্ অস্মি-ইতি ন সঃ বেদ' (বৃ, ১।৪।১০)। 'অন্য' মানে আলাদা। 'অন্য অসৌ'—যাঁকে দেখছি, তিনি আলাদা। আর 'অন্য অহং'—আমিও আলাদা। তিনি আর আমি পৃথক। এই পৃথক দেখা, দুই দেখা—এটা অজ্ঞান। সবার মধ্যে নিজেকে দেখা, 'সর্বাত্মসিদ্ধি', সেটাই হল জ্ঞান। বলছেন : 'সর্বাত্মসিদ্ধয়ে ভিক্ষোঃ কৃতশ্রবণকর্মণঃ'। ভিক্ষু মানে সন্ন্যাসী, ত্যাগী। 'কৃতশ্রবণকর্মণঃ'—শাস্ত্রশ্রবণরূপ কর্ম করা হয়েছে যাঁর। শাস্ত্র যা বলেছেন তা একবার শুনলে হয় না, বারবার শুনতে হয়, মনের মধ্যে তা নিয়ে আলোড়ন করতে হয়, তারপর মনটায় ধরে রাখতে হয়। শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন। এখানে

বলছেন : যিনি 'সর্বাত্মসিদ্ধি' লাভ করতে চাইছেন অর্থাৎ সবার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করতে চাইছেন, যিনি বেদান্তবাক্য শ্রবণ করেছেন, মনন করেছেন ও তারপর নিদিধ্যাসন করছেন এবং যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, তাঁর জন্যে শ্রুতি কি নির্দেশ দিচ্ছেন। 'সমাধিং বিদধাতি-এষা শান্তো দান্তো ইতি শ্রুতিঃ'। শ্রুতি 'সমাধি'র বিধান দিচ্ছেন, চিত্তকে সমাহিত করে রাখতে বলছেন। সেটাই লক্ষ্যে পৌঁছনোর উপায়। শঙ্করাচার্য এখানে বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা বলছেন। বৃহদারণ্যকে আছে : 'শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ' (৪।৪।২৩)। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও শ্রদ্ধা—এই সব গুণ যে সাধকের আছে, তিনি সমাধির সাহায্যে নিজের মধ্যে আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করবেন। এইসব গুণগুলিকে সম্পত্তি বলা হচ্ছে—'শমাদি ষট্ সম্পত্তি'। বিবেকচূড়ামণির শুরুতেই এই ষট্ সম্পত্তি কি বলা হয়েছে (শ্লোক ১৯-২৬), সমাধিও এই ছয় সম্পত্তির মধ্যে পড়ছে। প্রথম পাঁচটি গুণ আয়ত্ত করার পর সাধক সহজেই চিত্তকে সব সময় ব্রহ্মে যুক্ত করে রাখতে পারবে। তাহলেই সে নিজের আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করবে। তারপর দেখবে : সবার মধ্যে সেই এক আত্মা। তার আত্মাই সবার মধ্যে। 'সর্বভূতেষু চ আত্মানং সর্বভূতানি চ আত্মনি'। সবার মধ্যে সে, আবার তার মধ্যেই সবাই। এই হলো সর্বাত্মসিদ্ধি—জীবনের পরম লক্ষ্য।

আরূঢ়শক্তেরহমো বিনাশঃ
কর্তুং ন শক্যঃ সহসাঽপি পণ্ডিতৈঃ।
যে নির্বিকল্পাখ্যসমাধিনিশ্চলা-
স্তানন্তরাঽনন্তভবা হি বাসনাঃ॥ ৩৪২

অন্বয় : যে নির্বিকল্পাখ্য-সমাধি নিশ্চলাঃ (যাঁরা নির্বিকল্প সমাধিতে নিশ্চলভাবে স্থিত) তান্ অন্তরা (তাঁরা ছাড়া) পণ্ডিতৈঃ অপি (পণ্ডিত ব্যক্তিগণও) আরূঢ়শক্তেঃ অহমঃ (দৃঢ়মূল অহঙ্কারের বা আমিত্বের) সহসা (হঠাৎ) বিনাশঃ কর্তুং ন শক্যঃ (বিনাশ করতে সমর্থ হন না) হি (যেহেতু) বাসনাঃ অনন্তভবাঃ (বাসনাসমূহ অনন্ত জন্মের থেকে সঞ্চিত)।

সরলার্থ : যাঁরা নির্বিকল্প সমাধিতে নিশ্চলভাবে স্থিত হয়েছেন তাঁরা ছাড়া শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তিরাও এই অত্যন্ত দৃঢ়মূল অহংকার বা আমিত্বকে বিনাশ করতে সহসা সমর্থ হন না। কারণ এই অহংকার জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত বাসনার আশ্রয়ে দৃঢ়মূল হয়ে মনের গভীরে প্রবিষ্ট হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এখানে অহংকারের বিনাশ করার কথা বলা হচ্ছে। অহংকার অর্থাৎ আমিত্ব বা অহংবুদ্ধি। মায়ার প্রভাবে আমরা আমাদের দেহ মন ও বুদ্ধি নিয়ে যে ব্যক্তিসত্তা তাকেই আমি বলে মনে করি, আর জগৎটাকে আমার থেকে পৃথক করে দেখি। এই যে আমার ব্যক্তিসত্তা যে পৃথকভাবে সবকিছুকে দেখছে, শ্রীরামকৃষ্ণ একে 'কাঁচা আমি' বলেছেন। আর যে-আমি সকলের আমি, যে-আমি বুঝেছে যাকে ঘৃণা করছি সেও আমি আবার যাকে ভালোবাসছি সেও আমি, সেই আমি 'পাকা আমি'। তার একজ্ঞান হয়েছে, তার কাছে আর দুই নেই। আমাদের এই 'কাঁচা আমি'কে নাশ করতে হবে। কিন্তু একে বিনাশ করা বড় শক্ত। 'আরূঢ়শক্তেঃ অহমঃ'—দৃঢ়মূল এই অহংকারের শক্তিকে বিনাশ করতে পণ্ডিতরাও পারেন না। এর শিকড় আমাদের মনের অতি গভীরে চলে গেছে। ধর্ম হচ্ছে এই আমিত্বের বিনাশ করা। এ সারা জীবনের সাধনা। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা এই আমিকে বিনাশ করতে পারেন না কেন? শাস্ত্রে তো সবই বলা আছে, পণ্ডিতরা তো জানেন যে, এই পরিবর্তনশীল জগৎ-সংসার অনিত্য, সংসারের ভোগ, সুখ, মান, মর্যাদা, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, সব অনিত্য, তবু এইসবের আকর্ষণে তাঁরাও মুগ্ধ হয়ে আছেন। কারণ তাঁরা শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছেন, জীবনে রূপায়িত করেননি। শাস্ত্র যতক্ষণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝছি ততক্ষণ শুধু শব্দ। ত্যাগ, ভক্তি, জ্ঞান বলতে কি বোঝায় সে সমস্তই শাস্ত্রে বলা আছে, কিন্তু বাস্তবে কিভাবে এসবের প্রকাশ হয় সেটা সাধুসঙ্গ করে বুঝতে হয়, তারপর জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়। তা না হলে কিছু হয় না। তাই বলছেন, 'নির্বিকল্পাখ্য সমাধি' যে লাভ করেছে, এই আমিত্বকে বিনাশ করতে সে-ই পারে। নির্বিকল্প সমাধি মানে আর দুই নেই। সমাধি দু-রকম হয়, নির্বিকল্প ও সবিকল্প। সবিকল্প মানে আমার আমিটা আছে, আমিটা আছে বলে তখনও দুই আছে। নির্বিকল্প সমাধিতে কোনও দুই নেই। যেমন এক বিন্দু বৃষ্টির জল সমুদ্রে পড়ছে, যতক্ষণ সমুদ্রে পড়েনি ততক্ষণ তার পৃথক সত্তা আছে, যেই সমুদ্রে পড়ল অমনি মিশে গেলো, এক হয়ে গেলো, আর দুই নেই, এক। মৌমাছি ও ফুল সবিকল্প সমাধির উপমা, সমুদ্র ও জলবিন্দু নির্বিকল্প সমাধির উপমা। তাই বলছেন, 'নির্বিকল্পাখ্য সমাধি নিশ্চলাঃ'—নির্বিকল্প সমাধিতে যাঁরা নিশ্চল স্থির হয়ে আছেন, 'তান্ অন্তরা'—তাঁরা ছাড়া আর কারও আমিত্বের বিনাশ হয় না। কেন হয় না? বলছেন, 'অনন্তভবাঃ হি বাসনাঃ'— অনন্ত বাসনা, জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত বাসনা। তাই আমিত্ব দূর করতে পারছি না, পণ্ডিতরাও পারছেন না। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি হলে, ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে গেলে, এ আমিত্ব যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : যত বাসনা যেন তুলোর পাহাড় কিন্তু আগুন দিয়ে একে ছাই করা যায়। আগুন মানে জ্ঞানাগ্নি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'জ্ঞানাগ্নি সব কর্মফল, সমস্ত বাসনা নিঃশেষে দগ্ধ করে ফেলে।' নির্বিকল্প সমাধি না হলে এক-জ্ঞান ঠিক ঠিক হয় না।

অহংবুদ্ধ্যৈব মোহিন্যা যোজয়িত্বাবৃতের্বলাৎ।
বিক্ষেপশক্তিঃ পুরুষং বিক্ষেপয়তি তদ্গুণৈঃ॥৩৪৩

অন্বয় : বিক্ষেপশক্তিঃ (বিক্ষেপ শক্তি) আবৃতেঃ বলাৎ (আবৃতি-শক্তির ফলে বলবতী

হয়ে) মোহিন্যা অহং বুদ্ধ্যা এব যোজয়িত্বা (মোহিনী অহং-বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে) পুরুষং (পুরুষকে) তৎ-গুণৈঃ (অহং-বুদ্ধির গুণাবলীর দ্বারা) বিক্ষেপয়তি (বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল করে রাখে)।

সরলার্থ : বিক্ষেপশক্তি, আবৃতি-শক্তির বলে শক্তি লাভ করে, অহং-বুদ্ধির মোহিনী-শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে, পুরুষকে অহংকারের ধর্ম কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-রাগ-দ্বেষ ইত্যাদির প্রভাবে বিক্ষিপ্ত করে রাখে।

ব্যাখ্যা : এখানে চিত্ত-বিক্ষেপের কথা বলা হচ্ছে। মায়ার দুটো শক্তি—আবরণী আর বিক্ষেপী। মায়ার আবরণী শক্তির জন্যে মায়ার বিক্ষেপী শক্তি প্রবল হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে অহং-বুদ্ধির মোহিনী-শক্তি যুক্ত হয়ে জোর করে আমাদের চিত্তবিক্ষেপ আনছে। আমিত্বের এই যে মোহিনী-শক্তি এর জন্যে নিজেকে নিয়ে আমরা মুগ্ধ হয়ে আছি—মনে করছি জগৎ-সংসার সব আমার জন্যে, আমার ভোগের জন্যে। এই আমার থেকে অন্য সবকিছুকে পৃথক করে দেখা, এ অজ্ঞান থেকে হচ্ছে, মায়ার আবরণী শক্তির জন্যে। আসলে আমরা চারদিকে যা-কিছু দেখছি সবই ব্রহ্ম। কিন্তু আমি ব্রহ্ম দেখছি না, দেখছি আমার আত্মীয়, আমার বন্ধু, আমার প্রিয়জন। এই যে মিথ্যাজ্ঞান এ মায়ার ফল, মায়ার আবরণী শক্তির প্রভাব। অনিত্য বস্তুকে নিত্য মনে করছি। আমি যখন দুই দেখছি তখন সেটা অজ্ঞান, মিথ্যা। এই হচ্ছে আবরণী শক্তি, আর আবরণী শক্তি থেকেই বিক্ষেপী শক্তি আসছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মায়া বা মা যেন লুকোচুরি খেলছেন, ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকেছেন, খুকু ভয় পেয়ে যাচ্ছে—ঘোমটা দেওয়া এ আবার কে? এই ঘোমটাটা আবরণী শক্তি, মার মুখ ঢেকে রেখেছে, আর ভয় পাওয়াটা বিক্ষেপ। দড়িটাকে সাপ মনে করার যে মিথ্যাজ্ঞান সেটা দূর করতে হবে জ্ঞানের দ্বারা। আমি সর্বত্র ব্রহ্মকে দেখছি, এক দেখছি, দুই দেখছি না, এই জ্ঞান হলেই অজ্ঞান চলে যাবে। আলো এলে অন্ধকার চলে যাবে। যে অজ্ঞান আমাদের এত দুঃখ দিচ্ছে সেটা বিনাশ করতে হবে। কত সব বিভিন্ন জিনিস দেখছি, তাঁকে দেখছি না, কিন্তু তিনিই অধিষ্ঠান। তাঁর ওপর আমরা একটার পর একটা রূপ আরোপ করছি—এ হচ্ছে অধ্যাস। দড়ির ওপর সর্পজ্ঞান আরোপ করেছি। কিন্তু এ তো ভুল। মিথ্যা সর্পজ্ঞান দড়িকে আবরণ করেছে, সেটা চলে গেলেই ভয় চলে যাবে, বিক্ষেপ থাকবে না। মায়ার আবরণী শক্তির থেকে বিক্ষেপ আসছে। বিক্ষেপী শক্তির সঙ্গে আবার আমিত্বের মোহিনী-শক্তি যুক্ত হয়েছে। তার ফলে নিজেদের এই দেহেই সীমাবদ্ধ করে ফেলছি। ভাবছি 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা'। তার থেকেই আমাদের অসংখ্য সুখ-দুঃখ, মান-অপমান ইত্যাদি, সেগুলি সব সময় আমাদের তাড়না করে বেড়াচ্ছে, মনটাকে সুস্থির হতে দিচ্ছে না।

বলছেন 'পুরুষং বিক্ষেপয়তি তদ্‌গুণৈঃ'; অহং-বুদ্ধির এই যে স্বাভাবিক বৃত্তি, এর প্রতি অনুরাগ, ওর প্রতি বিরাগ, আমি প্রভুত্ব করব, আমি ভোগ করব ইত্যাদি বাসনা, এ সব মানুষকে চঞ্চল করে তোলে, তার চিত্তবিক্ষেপ আনে। গীতায় আছে মনের চাঞ্চল্য দূর করে শান্ত, অচঞ্চল যে হতে পারে সে 'স্থিতপ্রজ্ঞ', তার কাছে ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ সব সমান।

বিক্ষেপশক্তি-বিজয়ো বিষমো বিধাতুং
নিঃশেষমাবরণশক্তিনিবৃত্ত্যভাবে।
দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ স্ফুটপয়োজলবদ্‌বিভাগে
নশ্যেৎতদাবরণমাত্মনি চ স্বভাবাৎ।
নিঃসংশয়েন ভবতি প্রতিবন্ধশূন্যো
বিক্ষেপণং নহি তদা যদি চেন্মৃষার্থে ।।৩৪৪

অন্বয় : নিঃশেষম্ (নিঃশেষে) আবরণ শক্তি-নিবৃত্তি-অভাবে (আবরণ শক্তির নিবৃত্তি না হলে) বিক্ষেপশক্তিবিজয়ঃ বিধাতুং (বিক্ষেপ শক্তিকে জয় করা) বিষমঃ (বড় কঠিন) দৃক্‌দৃশ্যয়োঃ (দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা আত্মা অনাত্মার) স্ফুট-পয়ঃ-জলবৎ-বিভাগে (দুধ থেকে জলকে যে পৃথক করে দেখতে পারছে তার কাছে এই পার্থক্য [দ্রষ্টা ও দৃশ্যের] স্পষ্ট হলে) তদা (তখন) আত্মনি আবরণং চ (আত্মার ওপরের এই আবরণ) স্বভাবাৎ (আত্মার স্বপ্রকাশ স্বভাব-হেতু) নশ্যেৎ (নষ্ট হয়ে যায়) যদি চেৎ (যদি) মৃষার্থে (মিথ্যা এই অর্থে) বিক্ষেপণং নহি (বিক্ষেপ না থাকে) তদা (তখন) নিঃসংশয়েন (নিঃসন্দেহে) [আবরণশক্তি বিজয়] প্রতিবন্ধশূন্যঃ ভবতি (প্রতিবন্ধশূন্য হয়)।

সরলার্থ : আবরণ শক্তির নিঃশেষে নিবৃত্তি না হলে বিক্ষেপ শক্তিকে জয় করা বড় শক্ত ব্যাপার। হংস যেমন জলমিশ্রিত দুধ থেকে দুধকে আলাদা করে গ্রহণ করতে পারে সেই রকম সত্য-মিথ্যায় মিশ্রিত বস্তু থেকে মিথ্যাকে বর্জন করে সত্যকে গ্রহণ করতে পারলে আত্মাকে আবৃত করেছে যে আবরণ শক্তি তা নষ্ট হয়ে যায়। তখন মিথ্যাজ্ঞান-জনিত বিক্ষেপ আর থাকে না। স্ব-প্রকাশ আত্মার স্বস্বরূপে প্রকাশের সব বাধা দূর হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : বিক্ষেপ শক্তিকে জয় করা বড় কঠিন ব্যাপার। আবরণ শক্তি না গেলে বিক্ষেপ যায় না। শাস্ত্র বলছেন, এই আবরণ শক্তি আমাদের সত্যজ্ঞানকে আবৃত করে রেখেছে। এই পরিবর্তনশীল অনিত্য সংসারকে নিত্য মনে করে আমরা অনবরত ভুল করছি। দেহকে 'আমি' মনে করছি। যিনি অধিষ্ঠান তাঁর ওপর এই দেহকে আরোপ করেছি। কিন্তু আত্মা নিত্যবস্তু, তাঁর কোনও পরিবর্তন নেই। নাম-রূপের উপাধি আরোপ করে আমরা আত্মাকে আবৃত করেছি। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ এইসব বিশেষ বিশেষ

উপাধিদ্বারা যিনি নির্গুণ তাঁকে গুণ দিয়ে আবদ্ধ করেছি, 'এক'কে 'বহু' করে তুলেছি। বেদান্ত বলছেন, এইসব ঢাকা, আবরণ সরিয়ে না দিলে বিক্ষেপ দূর হবে না। একে দূর করার জন্যে নিজেকে জানতে হবে। বলছেন, এই 'বিক্ষেপশক্তিবিজয়ো বিষমো বিধাতুং'—বিক্ষেপশক্তিকে জয় করা বড় শক্ত। কেন? না, 'নিঃশেষম্-আবরণশক্তি নিবৃত্তি-অভাবে'—অজ্ঞান বা আবরণ শক্তির নিঃশেষে নিবৃত্তির অভাবে। অজ্ঞানকে আগে জ্ঞানের দ্বারা পুরোপুরি দূর করতে হবে তবে বিক্ষেপ যাবে। আবরণ শক্তির নিবারণ যদি না হয়, যে ঢাকনিটা আছে সেটা যদি তুলে ফেলতে না পারি তো হবে না। আমি আমার চোখে হাত দিয়ে ঢেকে রেখে বলছি দেখতে পাচ্ছি না। হাতটাকে সরাতে হবে। অল্প একটু সরিয়ে একটু দেখলে হবে না, পুরোপুরি চাই। বলছেন, 'নিঃশেষম্'—নিঃশেষে, সম্পূর্ণভাবে। একটু-আধটু দেখলে হবে না, সম্পূর্ণ করে দেখতে হবে। আমার আত্মদৃষ্টি সম্পূর্ণ হতে হবে, জ্ঞান সম্যক্ হতে হবে। জ্ঞান কখনও একটু-আধটু হয় না। একটু জ্ঞান একটু অজ্ঞান এরকম হয় না। আলো আর অন্ধকার একসঙ্গে থাকতে পারে না। একবার যদি জেনে যাই আমি পরমাত্মা, আমার জন্ম নেই মৃত্যু নেই, আমার ওপর একটা নাম-রূপ আরোপ করা হয়েছে, আমি এই নাম-রূপ নিয়ে সেজেছি,বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছি, হাসছি কাঁদছি মজা করছি আবার অস্থিরও হচ্ছি—তাহলে আর ভুল হবে না। আমার যদি সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় তাহলে এই আবরণ শক্তি নিঃশেষে চলে যাবে, আর তাহলেই বিক্ষেপ আর হবে না। তখন 'দৃগ্দৃশ্যয়োঃ স্ফুটপয়োজলবদ্বিভাগে'। তখন 'দৃগ্দৃশ্যয়োঃ'—নিত্য আর অনিত্য, আত্মা আর অনাত্মা, দ্রষ্টা ও দৃশ্য, পৃথক করে দেখতে পাব। 'পয়োজলবদ্', পয়ো আর জল, দুধ আর জলের মতো। এই সংসারটা এইরকম, সত্য-মিথ্যায় মিশে আছে। 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য'—মিথ্যা আছে আবার সত্যও আছে। কিরকম? না এই যে দড়িটাকে সাপ দেখছি, সেটা দড়িটা আছে বলেই তো দেখছি। সাপটা মিথ্যা কিন্তু দড়িটা সত্যি। মিথ্যা সাপের পিছনে সত্যি দড়িটা আছে বলেই সাপের দৃষ্টিভ্রমটা হচ্ছে। দড়িটা আধার, এটাতে সর্পকে আরোপ করে আমার ভুল হচ্ছে। তাই বলছেন, এই 'দৃগ্দৃশ্যয়োঃ', এদের পার্থক্য, দুধ আর জলের পার্থক্যের মতো, 'স্ফুট' মানে স্পষ্ট হতে হবে। নিত্যজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান স্পষ্ট হতে হবে। আমি দেখছি মানুষ, কিন্তু এ তো মানুষ নয়, ব্রহ্ম। নাম-রূপে আমি ভুলব না, দড়িটাকে সাপ বলে ভুল করব না। বলছেন, 'স্ফুট পয়োজলবদ্বিভাগে', হংস যেমন জল মেশানো দুধ থেকে দুধটাকে আলাদা করে নেয় তেমনি নিত্য-অনিত্যের পার্থক্য বিভাগ করে নিত্যকে জানতে হবে। যদি আমি জেনে যাই 'ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা',তখন 'নশ্যেৎ-তদ্-আবরণম্-আত্মনি চ স্বভাবাৎ', আত্মার ওপর যে আবরণ পড়েছিল তা নষ্ট হয়ে যাবে। 'স্বভাবাৎ' অর্থাৎ স্বভাবতই নষ্ট হয়ে যাবে, কারণ জ্ঞানের স্বভাব অজ্ঞান দূর করা যেমন আলোর

স্বভাব অন্ধকার দূর করা। আবরণ একবার যদি উঠিয়ে ফেলতে পারি অমনি আমার জ্ঞান স্পষ্ট হবে, আত্মজ্ঞান লাভ হবে। জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ, জ্ঞান মানেই স্বরূপ-জ্ঞান। তখন অনাত্ম বস্তুতে আর নিত্যজ্ঞান হবে না। আয়নায় ময়লার আবরণ পড়েছিল,ময়লাটুকু মুছে ফেলতেই আমার চেহারা আয়নায় স্পষ্ট হলো। আত্মার ওপর যে আবরণ পড়েছে, যার জন্যে নিজেকে চিনতে পারছি না, সেটা চলে গেলেই আমার স্বরূপকে চিনতে পারব। তারপর বলছেন, 'নিঃসংশয়েন ভবতি প্রতিবন্ধশূন্যা', প্রতিবন্ধশূন্য কেন? না আমার ওপর যে অজ্ঞানের আবরণ ছিল সেটার জন্যেই তো আত্মাকে 'আমি' বলে চিনতে পারছিলাম না, সেটাই ছিল প্রতিবন্ধক। আবরণটা সরে যেতেই আত্মা স্বস্বরূপে প্রকাশ হয়েছেন। দড়িটাকে আর যখন সাপ বলে ভুল করছি না তখন সাপের ভয়ে চঞ্চল হয়ে চিত্ত-বিক্ষেপের আর প্রশ্ন নেই। নিজের চোখকে তো কেউ ভুল বোঝাতে পারবে না। তাই 'প্রতিবন্ধশূন্যা'। তখন,'বিক্ষেপং নহি তদা যদি চেন্মৃষার্থে'—মৃষা মানে মিথ্যা। এ জগৎটা মিথ্যা। আমার পুত্র-কন্যা, বন্ধুবান্ধব সব মিথ্যা, পরিবর্তনশীল, অনিত্য। এসব থাকবে না। আমার দেহ থাকবে না, ধনসম্পদ থাকবে না, মানসম্মান থাকবে না, কিছু থাকবে না। এইটা জেনে নেওয়া, জগৎটাকে অনিত্য বলে জেনে নেওয়া, 'মৃষার্থে', মৃষা এই অর্থে জেনে নেওয়া। তখন আর বিক্ষেপ থাকবে না—'বিক্ষেপং নহি তদা যদি চেন্মৃষার্থে'। সংসার অনিত্য বলে জেনে তারপর সংসার করলে আর দুঃখ থাকবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, জ্ঞানের পরে বিজ্ঞান। তিনি বলছেন, এ সংসার মিথ্যে, 'ধোঁকার টাটি'। কিন্তু যখন জেনে গেলাম ব্রহ্মই সব হয়েছেন, যা কিছু দেখছি সবই ব্রহ্ম, তখন এ সংসার আর দুঃখের কারণ নয়। তখন 'মজার কুটি'। এই জানাটা কিন্তু নিঃশেষে হতে হবে। সংসার অনিত্য কিন্তু নিত্যও একজন আছেন, তিনি অজর-অমর-নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব,অমৃত স্বরূপ। এই দেহটাকে 'আমি' মনে করে কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু একবার যদি ভেবে দেখি কত সুন্দর কত পবিত্র আমি, কে আমাকে মারে? আমি অজর অমর। এই দেহটা ছিন্ন বস্ত্রের মতো একদিন ফেলে দিয়ে চলে যাব। ভয়ের কিছুই নেই। অভীঃ, অভয়। আমরা যাকে মুক্তি বলি সেটা ভয়কে জয় করা, অভয় হওয়া।

সম্যগ্বিবেকঃ স্ফুটবোধজন্যো বিভজ্য দৃগ্দৃশ্যপদার্থতত্ত্বম্।
ছিনত্তি মায়াকৃতমোহবন্ধং যস্মাদ্বিমুক্তস্য পুনর্ন সংসৃতিঃ।। ৩৪৫

অন্বয়: দৃক্-দৃশ্য-পদার্থ-তত্ত্বম্ (দ্রষ্টা ও দৃশ্যপদার্থের তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ) বিভজ্য (বিভাগ করে) স্ফুটবোধজন্যঃ (অনুভূতিলব্ধ বোধজাত) সম্যক্-বিবেকঃ (যথার্থ বিবেক) মায়াকৃত-মোহবন্ধং (মায়ার দ্বারা সৃষ্ট মোহবন্ধন) ছিনত্তি (ছিন্ন করে

ফেলে) যস্মাৎ (যার ফলে) বিমুক্তস্য (মুক্ত ব্যক্তির) পুনঃ (পুনরায়) সংসৃতিঃ ন (সংসার হয় না)।

সরলার্থ: দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থের তত্ত্বকে অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ পৃথকভাবে অনুভব করার ফলে যথার্থ বিবেক জন্মায়। সেই বিবেক মায়া-জনিত মোহবন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। তার ফলে মুক্ত ব্যক্তির আর সংসার হয় না অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না।

ব্যাখ্যা: এখানে বলছেন : মায়ার জন্যে আমাদের বিবেক ঠিক ঠিক কাজ করে না, দ্রষ্টা ও দৃশ্যবস্তুর স্বরূপ বুঝতে পারি না। মায়াতে আমাদের সব ভুল হয়ে যায়। নিত্যকে অনিত্য মনে করি, অনিত্যকে নিত্য মনে করি। বলছেন : 'সম্যক্ বিবেকঃ'—যথার্থ বিবেক। নিত্য-অনিত্য বস্তু বিবেক। কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য, কোন্‌টা আত্মা আর কোন্‌টা অনাত্মা—এ সম্বন্ধে সঠিক বিচারবোধ। কখনই আমি আর নিত্য-অনিত্যকে গুলিয়ে ফেলছি না। এরকম বিবেকবুদ্ধি কখন হয় ? স্ফুটবোধজন্য'; যদি আমার ঠিক ঠিক জ্ঞান হয়। বোধ মানে জ্ঞান, নিঃসংশয় জ্ঞান। বোধ মানে শুধু চোখে দেখা বা কানে শোনা জ্ঞান নয়, অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান, realization। তা যদি হয় তখনই আমার কাছে আত্মা আর অনাত্মবস্তুর পার্থক্যটা সব সময় স্পষ্ট থাকবে। কখনও আমি মোহগ্রস্ত হব না। বলছেন, 'স্ফুটবোধজন্যঃ বিভজ্য দৃগ্‌দৃশ্যপদার্থতত্ত্বম্'; দৃগ্—দ্রষ্টা, আর দৃশ্য, যা দেখছি। 'দৃগ্‌দৃশ্যপদার্থতত্ত্বম্', দ্রষ্টা ও দৃশ্যপদার্থের 'তত্ত্ব' অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান আমার হয়ে গেছে। আত্মা আর অনাত্মাকে, ব্রহ্ম আর জগৎকে আলাদাভাবে বুঝে নিয়েছি। জগৎ যে মিথ্যা, ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য এই জ্ঞান হয়ে গেছে। তার ফলে কি হয়েছে ? বলছেন, 'ছিনত্তি', আমার মনের যে অজ্ঞান তাকে যেন ছুরি দিয়ে কেটে দিচ্ছে। জ্ঞানখড়গ দিয়ে অজ্ঞানকে কেটে ফেলছে। মা কালীর হাতে যে অসি থাকে, সে আসলে জ্ঞান অসি; মা কালী যেন বলছেন, ভয় কি, এই জ্ঞান অসি দিয়ে অজ্ঞান আমি কেটে ফেলব। এও ঠিক তাই। 'মায়াকৃত মোহবন্ধং'—মায়া যে মোহবন্ধনের সৃষ্টি করেছে জ্ঞান অসি তা কেটে ফেলছে, দূর করে দিচ্ছে। 'যস্মাদ্'—এর ফলে কি হবে? 'বিমুক্তস্য পুনর্ন সংসৃতিঃ'; এইভাবে অজ্ঞান যখন চলে যাবে তখন মুক্ত হয়ে যাবে, যে মুক্ত তার আর সংসার নেই। অজ্ঞান নেই তাই সংসার নেই। আর আমাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ফিরে আসতে হবে না।

পরাবরৈকত্ববিবেকবহ্নির্দহত্যবিদ্যাগহনং হ্যশেষম্।
কিং স্যাৎ পুনঃ সংসরণস্য বীজমদ্বৈতভাবম্ সমুপেয়ুষোঽস্য॥ ৩৪৬

অন্বয়: পর-অবর-একত্ব-বিবেক-বহ্নিঃ (আত্মা ও অনাত্মার একত্ববোধরূপ অগ্নি) হি (নিশ্চয়ই) অবিদ্যাগহনং (অবিদ্যার অরণ্যকে) অশেষং (নিঃশেষে) দহতি (দগ্ধ করে ফেলে) অদ্বৈতভাবং (অদ্বৈতভাব) সমুপেয়ুষঃ অস্য (প্রাপ্ত সেই জীবের) পুনঃ (আবার) সংসরণস্য বীজম্ (সংসার যাতায়াতের বীজ) কিং স্যাৎ (আর কি করে থাকবে) ?

সরলার্থ: পরমাত্মা ও জীবাত্মার একজ্ঞানরূপ অগ্নি অবিদ্যার যে গহন অরণ্য তাকে নিশ্চয়ই নিঃশেষে দগ্ধ করে ফেলে। অদ্বৈতজ্ঞান যে লাভ করেছে তার কি আর সংসার যাতায়াতের বীজ থাকে ?

ব্যাখ্যা: অবিদ্যার গভীর বন, পথ পাচ্ছি না। কে পথ দেখাবে? আমরা সবাই তো অন্ধ, কে কাকে পথ দেখাবে ! গুরু পথ করে দেবেন। তিনি 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া' আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেবেন আর সেই জ্ঞানাগ্নিতে অবিদ্যার ভয়ানক জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বলছেন, 'পর-অবর-একত্ববিবেকবহ্নিঃ দহতি-অবিদ্যাগহনং অশেষম্'; 'পর-অবর', 'পর' মানে পরমাত্মা। আর 'অবর' হচ্ছে হেয়। অর্থাৎ যা পরমাত্মার চেয়ে হেয়—জীবাত্মা। দেহ-মন-বুদ্ধি নিয়ে আমি এখন যেটা তা-ই হচ্ছে জীবাত্মা। নিজেকে আমি এখন পরমাত্মা থেকে পৃথক ভাবছি। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের জন্যে আমার এই ভেদ জ্ঞান হচ্ছে। নিজেকে তাঁর থেকে আলাদা ভাবছি, সবাইকে পৃথক পৃথক ভাবছি, বহু দেখছি। কিন্তু আসলে আমিই সকলের মধ্যে, সবকিছুর মধ্যে বিরাজ করছি। এই এক জ্ঞান যদি হয় তাহলে সেই জ্ঞান 'সংসরণস্য বীজম্'—সংসারের বীজ—আগুনের মতো পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। 'অদ্বৈতভাবং সমুপেয়ুষঃ অস্য'; যার এই একজ্ঞান হয়েছে, অদ্বৈতভাব লাভ হয়েছে, তার সেই জ্ঞানাগ্নিতে সংসারের বীজ সব নষ্ট হয়ে যায়, পুড়ে যায়। যখন 'আমি আত্মা' আর অন্য একজন আত্মার থেকে আলাদা, এরকম ভাবছি, তখন আমার মধ্যে অবিদ্যা। 'একত্ববিবেকবহ্নিঃ' সেই অবিদ্যাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এক জ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান হলে আর অবিদ্যা থাকে না। সেই অদ্বৈতজ্ঞান, 'দহতি-অবিদ্যাগহনং হি অশেষম্'—অবিদ্যার জঙ্গল নিঃশেষে পুড়িয়ে দেয়। তাহলে 'কিং স্যাৎ পুনঃ সংসরণস্য বীজম্'—সংসারের বীজ আর কি করে থাকবে? সব পুড়ে তো নষ্ট হয়ে গেলো। এই অদ্বৈতভাব যার এসেছে, যে আর দুই দেখছে না তার আর সংসার কি করে থাকবে?

আবরণস্য নিবৃত্তির্ভবতি হি সম্যক্‌পদার্থদর্শনতঃ।
মিথ্যাজ্ঞানবিনাশস্তদ্‌বিক্ষেপজনিতদুঃখনিবৃত্তিঃ॥ ৩৪৭

অন্বয়: সম্যক্-পদার্থ-দর্শনতঃ (পদার্থের যথাযথ জ্ঞান থেকে) হি (অবশ্যই) আবরণস্য (আবরণের) নিবৃত্তিঃ-ভবতি (নিবৃত্তি হয়) মিথ্যাজ্ঞানবিনাশঃ (মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয়) তৎ-বিক্ষেপজনিত দুঃখনিবৃত্তিঃ (তা থেকে উৎপন্ন বিক্ষেপজনিত দুঃখের নিবৃত্তি হয়)।

সরলার্থ: পদার্থের যথাযথ জ্ঞান হলে আবরণের তো নিশ্চয় নিবৃত্তি হয়। আবরণের নিবৃত্তি হলে মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয় ও মিথ্যাজ্ঞানের থেকে যে বিক্ষেপের সৃষ্টি হয় সেই বিক্ষেপ-জনিত দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

ব্যাখ্যা: বলছেন, এই যে দড়িটাকে ভুল করে তোমার সাপ বলে মনে হচ্ছে এটা দূর হবে কি করে? হবে যদি তোমার সম্যক্ পদার্থজ্ঞান হয়, যদি দড়ির জ্ঞানটা ঠিক ঠিক হয়, সাপ না দেখে দড়িটাকে দড়ি বলেই দেখতে পাও। তেমনি যদি সর্বভূতে সেই এক আত্মাকেই দেখো তাহলেই তোমার সম্যক্ পদার্থজ্ঞান হবে। 'আবরণস্য নিবৃত্তিঃ ভবতি সম্যক্ পদার্থদর্শনতঃ'; 'আবরণস্য নিবৃত্তিঃ'—যা সত্য তাকে আবরণ করে রেখেছে। তার ফলে আমরা ভুল করে যেটা যা নয় তাই দেখছি। দড়িকে সাপ দেখছি, ব্রহ্মকে জগৎ দেখছি। এই ভুল দেখাটা আবরণী শক্তির জন্যে। তাই বলছেন, এই মিথ্যা দর্শন কি করে যায়, 'আবরণস্য নিবৃত্তিঃ' হয় কি করে? 'সম্যক্ পদার্থদর্শনতঃ'। 'সম্যক্' মানে ঠিক ঠিক। 'পদার্থদর্শনতঃ'—এখানে দর্শন মানে জ্ঞান, 'পদার্থ' মানে ব্রহ্ম। আমরা বলি ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। জগৎটাকে মিথ্যা বলি এই অর্থে যে, জগৎ চলছে, পরিবর্তনশীল, এই দেখছি এই নেই। সত্য হচ্ছেন ব্রহ্ম। তাঁর ওপর জগৎটাকে কে যেন বসিয়ে দিয়েছে। যেমন দড়িটাকে সাপ বলে যখন ভুল করছি তখন সাপটাকে দড়ির ওপর কে যেন বসিয়ে দিয়েছে। এই মিথ্যা সর্পজ্ঞান থেকেই আমার চিত্তবিক্ষেপ। কিন্তু যদি দড়িটাকে দড়ি বলেই জানি তাহলে আমার আর ভয় নেই, চিত্তবিক্ষেপ হবে না। সেইজন্যে বারবার জোর দিচ্ছেন, দড়িটা যেমন সত্য তেমনি ব্রহ্ম সত্য, আর সাপটা যেমন মিথ্যা তেমনি জগৎ মিথ্যা। 'সম্যক্ দর্শনঃ' মানে ঠিক ঠিক দর্শন, যেটা কোনও কালেই বেঠিক হবে না। আমাদের যে দেখা সেটা আপেক্ষিক দেখা, আজ একরকম দেখছি কাল সেটা আর সেরকম দেখছি না। এরকম নয়। ঠিক ঠিক দর্শন। যেমন একবার দেখেছি, সব সময় সেরকম থাকবে। দর্শন মানে চোখ দিয়ে দেখা শুধু নয়। একটা অনুভূতি, একটা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। কি করে যে হয় সেটা মানুষকে বুঝিয়ে বলা যায় না। যার হয়েছে সেই জানে এ কি করে হয়। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সম্যক্ পদার্থদর্শনঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলে জানা, দড়িটাকে দড়ি বলে জানা। 'আবরণস্য নিবৃত্তিঃ ভবতি সম্যকপদার্থদর্শনতঃ', এই যে ভুল দেখা এর নিবৃত্তি হবে যদি ঠিক ঠিক ঐ পদার্থদর্শন হয়। দড়িটাকে দড়ি বলে চিনতে পারলে সাপ দেখার ভ্রমটা আর থাকবে না। 'মিথ্যাজ্ঞানবিনাশঃ তৎ-বিক্ষেপজনিত দুঃখনিবৃত্তিঃ'; ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলে উপলব্ধি করলে মিথ্যাজ্ঞান দূর হয়। সেই সঙ্গে মিথ্যার থেকে বিক্ষেপ উৎপন্ন হয়ে আমার জীবনে যত দুঃখ সৃষ্টি করেছিল, তা-ও নষ্ট করে দেয়। তাই বলছেন : যো সো করে সম্যক্ পদার্থদর্শন করতে হবে। তাহলেই আমার বন্ধনের নাশ, দুঃখের নিবৃত্তি।

এতৎ ত্রিতয়ং দৃষ্টং সম্যগ্‌রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ।
তস্মাদ্‌বস্তুসতত্ত্বং জ্ঞাতব্যংবন্ধমুক্তয়ে বিদুষা॥ ৩৪৮

অন্বয়: সম্যক্-রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ (রজ্জুর যথার্থ স্বরূপজ্ঞান থেকে) এতৎ ত্রিতয়ং (এই তিনটি) দৃষ্টং (দেখা যায়) তস্মাৎ (অতএব) বিদুষা (বিদ্বান ব্যক্তির দ্বারা) বন্ধমুক্তয়ে (সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির জন্যে) বস্তুসতত্ত্বং (বস্তুর যথার্থ স্বরূপ) জ্ঞাতব্যং (জানা কর্তব্য)।

সরলার্থ: রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান যথাযথভাবে হলে এই তিনটি (আবরণ, বিক্ষেপ ও বিক্ষেপজনিত দুঃখ) দেখা যায়। অতএব সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির জন্যে বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে বস্তুর স্বরূপতত্ত্ব জানা কর্তব্য।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'এতৎ ত্রিতয়ং দৃষ্টং রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ'; 'ত্রিতয়' মানে কি? প্রথম আবরণী, মিথ্যা দেখা। দ্বিতীয় হচ্ছে এই মিথ্যা দেখা থেকে চিত্ত-বিক্ষেপ। আর তৃতীয় হলো, চিত্তবিক্ষেপ হচ্ছে বলে দুঃখ ভোগ করছি। আবরণী থেকে ভুল দেখা, তার থেকে চিত্তবিক্ষেপ আর চিত্তবিক্ষেপ থেকে দুঃখ। 'এতৎ ত্রিতয়ং দৃষ্টং', এই তিনটি দেখতে পাওয়া যায় 'রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ'; রজ্জুকে রজ্জু বলে দেখতে পারলে। আমাদের দুঃখের মূলে এই তিনটি কারণ। কিন্তু সাধারণ মানুষ এটা বোঝে না। বিচারশীল যারা, তারা এই তিনটি সম্বন্ধে সচেতন। কারণ, তাদের ঐ রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞান হয়েছে। আমরা রজ্জুকে রজ্জু বলে দেখছি না। সংসারকে ব্রহ্ম বলে দেখছি না। ভুল করে অন্য সব বস্তু দেখছি। যে মুহূর্তে আমি জানতে পারব এ জগৎটা নামরূপাত্মক বলে আমরা দুই দেখি, আসলে সবই সেই এক আর আমিই সেই এক, তৎক্ষণাৎ আমার বিক্ষেপ চলে যাবে। যে আমি 'সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ' (শ্বে, ৬।১১) তাকে জানছি না, তাই কাউকে আমার শত্রু ভাবছি আবার কাউকে ভাবছি মিত্র। নাম-রূপের ভেদে বহু দেখছি কিন্তু সবার ভেতরে এক বস্তু, এক সত্তা। 'তস্মাৎ বস্তুসতত্ত্বং জ্ঞাতব্যং বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা'—সেইজন্যে যাঁরা বিদ্বান, জ্ঞান লাভ করতে চান, বন্ধনমুক্তির জন্যে তাঁদের 'বস্তুসতত্ত্ব' জানতে হবে। বস্তু হচ্ছে তাঁর স্বরূপ। যাকে বস্তু বলছি তাকেই পদার্থ বলছি, আত্মা বলছি, ব্রহ্ম বলছি, আবার কিছুই না বলতে পেরে কখনও 'তৎ' বলছি। সেই আত্মাকেই জানতে হবে। 'সতত্ত্বং'—সমান, অখণ্ড, টুকরো টুকরো নয়, একরসঃ। সমান কেন? তিনি একরসঃ, সবাইকার মধ্যে সমানভাবে আছেন। তাঁকেই জানতে হবে। যিনি বিদ্বান তিনি সেই আত্মাকে জেনে মুক্ত হয়ে যান। এই সংসারবন্ধন, হাসি, কান্না, ভালোবাসা, বিদ্বেষ, এর মধ্যে দিয়ে বারবার জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরে ঘুরে আসা—এসব থেকে তিনি মুক্ত হয়ে যান।

অয়োঽগ্নিযোগাদিব সৎসমন্বয়ান্মাত্রাদিরূপেণ বিজৃম্ভতে ধীঃ।
তৎকার্যমেতৎ ত্রিতয়ং যতো মৃষা দৃষ্টং ভ্রমস্বপ্নমনোরথেষু॥ ৩৪৯

অন্বয়: অগ্নিযোগাৎ (অগ্নি সংযোগ থেকে) অয়ঃ ইব (লোহা যেমন হয়) সৎ-সমন্বয়াৎ (সৎস্বরূপ আত্মার সংস্পর্শ থেকে) ধীঃ (বুদ্ধি) মাতৃ-আদিরূপেণ (প্রমাতা ইত্যাদি রূপের সহায়) বিজৃম্ভতে (প্রকাশ পায়) তৎকার্যং (তার কাজ) এতৎ ত্রিতয়ং (এই তিনটি) ভ্রমস্বপ্নমনোরথেষু (ভ্রমে, স্বপ্নে ও মনের কল্পনায়) যতঃ (যার জন্যে) মৃষা (মিথ্যারূপে) দৃষ্টং (দৃষ্ট হয়)।

সরলার্থ: অগ্নির সংযোগে লোহা যেমন উত্তপ্ত হয় তেমনি সৎস্বরূপ আত্মার সংস্পর্শ থেকে বুদ্ধি প্রমাতা ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পায়। তার কাজ এই তিনটি অর্থাৎ প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণকে আলাদা করে দেখা, যে জন্যে ভ্রমে, স্বপ্নে ও মনের কল্পনাসমূহে সবকিছু মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়।

ব্যাখ্যা: হিন্দুমতে দেহ, মন, বুদ্ধি সবই জড়। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সান্নিধ্যের জন্যে এদের চৈতন্যময় দেখায়। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই চারটি নিয়ে আমাদের অন্তঃকরণ। এদের বিভিন্ন কার্যক্ষমতা, বিভিন্ন গুণ, বিভিন্ন ভূমিকা, সেইজন্যে আলাদা আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। সে সবকিছুতে আলো দিচ্ছে। নিজের আলো নয় কিন্তু, ধার করা আলো। সে আত্মার খুব কাছাকাছি। তাই আত্মার চৈতন্যে চৈতন্যময় হয়ে সবকিছু প্রকাশ করছে। বুদ্ধি ভালো-মন্দ বিচার করছে, কোনটায় ভালো হবে কোনটায় মন্দ হবে এসব ব্যাপারে আলোকপাত করছে। বুদ্ধি দিয়েই আমাদের সবকিছু। এই শক্তি কিন্তু বুদ্ধির নিজের নয়। সে সূক্ষ্ম কিন্তু জড়। তাই তার সবকিছু শক্তি আত্মার কাছ থেকে ধার করা। একটা উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন। বলছেন, 'অয়ঃ অগ্নিযোগাদ্-ইব সৎ-সমন্বয়াৎ'। 'অয়ঃ' মানে লোহা, লোহার সঙ্গে যদি অগ্নির যোগ হয় তাহলে লোহা যেমন অগ্নিময় হয়ে যায় তেমনি 'সৎ সমন্বয়াৎ', অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্যে 'মাত্রাদিরূপেণ বিজৃম্ভতে ধীঃ'—বুদ্ধিও মাত্রাদি-রূপে প্রকাশ পায়। 'বিজৃম্ভতে' মানে প্রকাশ পায়। আর 'মাত্রাদি'—'মাতৃ-আদি'। 'মাতা' মানে প্রমাতা। 'মাত্রাদি' অর্থাৎ প্রমাতা-প্রমেয়-প্রমাণ বা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান। এই তিনটে জিনিসেরই দরকার কোন কিছুর জ্ঞান হতে গেলে। প্রমাতা মানে জ্ঞাতা, মানে তিনি চিনে নিচ্ছেন, মেপে নিচ্ছেন, জানছেন। আর একটা হচ্ছে প্রমেয় বা জ্ঞেয়—যা জানার বস্তু। আর প্রমাণ হচ্ছে জ্ঞান। এই তিনটে এক। কিন্তু আমরা এই তিনটেকে পৃথক করে দেখছি। বুদ্ধি এইসব কাণ্ড করে, এই তিনটেকে আলাদা করে দেখায়। বলছেন, 'তৎকার্যং এতৎ ত্রিতয়ং', এই তিন দেখা বুদ্ধির কাজ, এ আমাদের ভুল করায়। 'যতঃ মৃষা দৃষ্টং'; এর থেকে সব ভুল দেখা হয়, মিথ্যা দেখা হয়। অনবরত

মিথ্যা দেখছি! যেমন অন্ধকার পথে যাচ্ছি, একটা গাছের গুঁড়ি আছে, বলছি, কে কে? সাড়া নেই, ভাবছি একটা ডাকাত বোধ হয়। আমরা এরকম ভুল করি। 'ভ্রমস্বপ্নমনোরথেষু'। ভুল করে মিথ্যা দেখি, স্বপ্নে মিথ্যা দেখি, আবার কল্পনায় মিথ্যা দেখি। স্বপ্নে দেখছি একটা বাঘ আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে—মিথ্যা। আবার মনের রথে চড়ে ঘুরছি—মন্ত্রী হব, প্রধানমন্ত্রী হব, কত কি হব কল্পনা করছি। সে-ও মিথ্যা। এসব কে ঘটাচ্ছে? ঐ বুদ্ধি। একটা জড় বস্তু কিন্তু যেহেতু চৈতন্যের সংযোগ আছে তাই চৈতন্যময় হয়েছে। কিন্তু তাহলে কি হবে? এই বুদ্ধি ভালো করতে পারে না মন্দ করছে। আমায় ভুল দেখাচ্ছে। লোহা যেমন আগুনের সংযোগে আগুনের মতো হয়, তেমনি আত্মার সান্নিধ্যে এসে বুদ্ধি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনটেকে আলাদা করে দেখাচ্ছে। তার ফলে কি হচ্ছে ? 'যতঃ মৃষা দৃষ্টং'—আমরা জেগে, ঘুমিয়ে ও কল্পনায় মিথ্যাই দেখছি। আত্মার চৈতন্যে চৈতন্যময় হয়ে বুদ্ধি আমাদের এইভাবে বিভ্রান্ত করছে।

ততো বিকারাঃ প্রকৃতেরহংমুখাঃ দেহাবসানা বিষয়াশ্চ সর্বে।
ক্ষণেঽন্যথাভাবিতয়া হ্যমীষামসত্ত্বমাত্মা তু কদাপি নান্যথা॥ ৩৫০

অন্বয়: ততঃ (সেইজন্য) অহংমুখাঃ (অহংকার থেকে শুরু করে) দেহাবসানাঃ (দেহ পর্যন্ত) সর্বে বিষয়াঃ চ (ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই) প্রকৃতেঃ বিকারাঃ (প্রকৃতির বিকার) ক্ষণে অন্যথা ভাবিতয়া (ক্ষণে ক্ষণে অন্য ভাব প্রাপ্তির কারণে) অমীষাম্ হি অসত্ত্বম্ (এইসবের কোনও সত্তা নেই) তু (কিন্তু) আত্মা কদাপি অন্যথা ন (আত্মা কখনও অন্য রকম হন না)।

সরলার্থ: সেইজন্যে অহংকার থেকে শুরু করে দেহ পর্যন্ত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় প্রকৃতির বিকার বলে ধরা হয়। ক্ষণে ক্ষণে অন্য রকম হয় বলে এসবের কোনও সত্তা নেই। কিন্তু আত্মা কখনও অন্য ভাব প্রাপ্ত হন না।

ব্যাখ্যা: এই যে নাম-রূপের বিভিন্নতার জন্যে আমরা জগতে কত বৈচিত্র্য দেখি, এ সব বিকার। আত্মা অবিকারী, তাঁর ওপর দিয়ে এই বিকারের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বলছেন, আমরা স্বরূপত নিত্য শুদ্ধ আত্মা। কিন্তু দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকারে সেই আত্মা যেন আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তার ফলে সে নিজেকে জীব বলে মনে করছে আর অবিরাম তার ওপর দিয়ে পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছে। ভেতরে পরিবর্তন আবার বাইরে পরিবর্তন। আমাদের অন্তর্জগতে সব সময় পরিবর্তন হচ্ছে—দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার বা 'আমি'-বোধ সবকিছু পালটে যায়, একরকম থাকে না। আবার বাইরের জগতেও সব সময় পরিবর্তন। কিন্তু আমার আত্মা অবিকারী। 'ততঃ বিকারাঃ প্রকৃতেঃ-অহংমুখাঃ দেহাবসানাঃ বিষয়াশ্চ সর্বে।' 'অহংমুখা'—অহংকার থেকে শুরু করে। আমাদের

জীববোধের সূচনা অহংকারে। ব্রহ্মের থেকে পৃথক একটা 'আমি' বোধ যেই জাগল সঙ্গে সঙ্গে আমি 'জীব' হয়ে গেলাম। সেই অহংকার থেকে শুরু করে 'দেহাবসানাঃ' অর্থাৎ দেহ পর্যন্ত সবকিছুই বিকারশীল। অহংকার দিয়ে শুরু, মাঝে রয়েছে মন-বুদ্ধি ইত্যাদি, আর সব শেষে স্থূল দেহ—এই সব নিয়েই তো জীব, এগুলির সবই পরিবর্তনশীল। আমাদের জীবনবোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই বিকারশীল। আবার 'বিষয়াশ্চ সর্বেঃ'—সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ও বিকারশীল। 'প্রকৃতেঃ বিকারাঃ'—এই পরিবর্তন হলো প্রকৃতির বিকার। মায়া বা অবিদ্যার জন্যে এইসব বিকার ঘটছে। 'ক্ষণেঽন্যথা ভাবিতয়া'—ক্ষণে ক্ষণে এগুলি অন্যরকম ভাব নিচ্ছে। এই এক রকম আছে, একটু পরেই অন্য রকম। chameleon, বহুরূপীর মতো বারবার রঙ পালটাচ্ছে। আর সেই কারণেই এ-সব অনিত্য। 'হি-অমীষাম্ অসত্ত্বম্'—এসবের কোন সত্তা নেই। এগুলি অনাত্মা। কিন্তু ব্রহ্ম বা আত্মা অপরিবর্তনীয়। 'আত্মা তু কদাপি ন অন্যথা'—আত্মা কখনো অন্য রকম হন না। সব সময় এক রকম। কখনও তাঁর কোন বিকার নেই। নিরাকার, নিরুপাধিক, নির্বিকল্প, নির্গুণ, নির্বিশেষ। অনিত্য নয় বোঝানোর জন্যে 'না' শব্দটা ব্যবহার করতে হচ্ছে। আমিই সেই আত্মা—সাক্ষী, উদাসীন।

নিত্যাদ্বয়াখণ্ডচিদেকরূপো বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী সদসদ্‌বিলক্ষণঃ।
অহংপদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ প্রত্যক্‌সদানন্দঘনঃ পরাত্মা॥ ৩৫১

অন্বয়: পর-আত্মা (পরমাত্মা) নিত্য-অদ্বয়-অখণ্ড-চিৎ-একরূপঃ (নিত্য, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, চৈতন্যস্বরূপ, একরূপ) বুদ্ধি-আদি-সাক্ষী (বুদ্ধি ইত্যাদির সাক্ষী) সদসদ্‌বিলক্ষণঃ (স্থূল সূক্ষ্ম বা কার্য কারণ থেকে ভিন্ন) অহংপদ-প্রত্যয়-লক্ষিতার্থঃ (আমিত্বের এই প্রত্যয় তাঁকে লক্ষ্য করে) প্রত্যক্-সৎ-আনন্দঘনঃ (প্রত্যেকের সত্তাস্বরূপ এবং আনন্দঘন)।

সরলার্থ: পরমাত্মা নিত্য, অদ্বয়, অখণ্ড, চৈতন্যস্বরূপ এবং একরূপ। তিনি মন বুদ্ধি ইত্যাদির সাক্ষী স্বরূপ। আমাদের দৃঢ়ভিত্তিক অহংবুদ্ধির তিনিই লক্ষ্য। তিনি প্রত্যেকের আনন্দঘন সত্তাস্বরূপ।

ব্যাখ্যা: আত্মা কিরকম? 'নিত্য-অদ্বয়-অখণ্ড-চিদ্-একরূপঃ'; এক আত্মা সবাইকার ভেতরে আছেন। প্রথমটা তা মানতে চাই না। একজন সাদা, একজন কালো, এক হয় কি করে? এই পার্থক্যটা আগন্তুক, চাপানো জিনিস, আসলে এক আত্মা সকলের ভেতরেই আছেন। তিনি নিত্য, তিনি অদ্বয়। চিরকাল আছেন তিনি। 'অদ্বয়'—দুই নয়। সব এক, এইটে তো বলতে চাইছেন, তাহলে এক বললেই তো হয়, 'অদ্বয়'—

দুই নয়, এরকম করে কেন বলছেন? সংস্কৃত ভাষায় জোর দিয়ে কিছু বলতে গেলে অনেক সময় নেতিবাচক করে বলা হয়। তাই বলছেন 'অদ্বয়'। আর 'অখণ্ড' বলতে কি বোঝাচ্ছেন? এই নয় যে কতকগুলো খণ্ড খণ্ড বস্তু নিয়ে আমাদের আত্মা হয়েছে, যেমন আমাদের দেহ হাত-পা এইসব দিয়ে তৈরী। কতগুলো বস্তুর সমাবেশে যা তৈরী সেই বস্তুর এক সত্তা দেখতে পাওয়া যায় না, তা নিত্যবস্তুও হতে পারে না। তারপর বলছেন, 'চিদ্'—চৈতন্য। হিন্দুশাস্ত্র মতে সবার মধ্যে এক চৈতন্য, শুধু প্রকাশের তারতম্য। আমাদের মতে সমস্ত জগৎ-সংসার যেন চৈতন্যের, জ্ঞানের সাগর। 'একরূপঃ'। সেই চৈতন্যের সমুদ্র সর্বদা এক রূপ। সে রূপ পালটাচ্ছে না। রূপই নেই তো রূপ পালটাবে কি করে? তবে রূপ দেখি যে? সাদা, কালো, কত কি? এগুলো সব আগন্তুক, চাপানো, অধ্যাস। কিন্তু আসলে তিনি নিরাকার, অদ্বয়, অখণ্ড, অরূপ। তারপর বলছেন, 'বুদ্ধি-আদি-সাক্ষী'। আমাদের এই যে দেহ মন এগুলো সব ইন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চারটেকে নিয়ে আমাদের অন্তঃকরণ, অন্তরিন্দ্রিয়। অনেক সময় আমরা অহঙ্কারকে ভাবি আত্মা। তা নয়, আত্মা সাক্ষী। তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু তিনি আছেন বলে আমার দেহ কাজ করছে, মন চিন্তা করছে, বুদ্ধি বিচার করছে, চিত্ত অনুভব করছে আর এই যে অহঙ্কার, একটা আমি বোধ, সেটাও আছে, তিনি আছেন বলে। বলছেন, 'বুদ্ধি-আদি-সাক্ষী' অর্থাৎ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার, তিনি এগুলোর সাক্ষিস্বরূপ। তারপর বলছেন, 'সদ্-অসদ্-বিলক্ষণঃ'; 'সৎ' মানে যা দেখতে পাচ্ছি, কার্য। 'অসৎ', যা দেখতে পাই না, কারণ। যেমন গাছটা দেখতে পাই, এটা কার্য আর যেটা বীজ, যেটার থেকে গাছটা হয়েছে সেটা কারণ, আমরা সেটা দেখতে পাই না, 'অসৎ'। তিনি 'সদসদ্ বিলক্ষণঃ'। তিনি কার্যও নন, কারণও নন, স্রষ্টাও নন সৃষ্টিও নন। স্থূলও নন, সূক্ষ্মও নন, কিন্তু তিনি আছেন বলে সবকিছু আছে, সবকিছু চলছে। তারপর বলছেন, 'অহংপদ-প্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ'; আমি, 'অহংপদ', এই আমি যাকে বলছি তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তিনি আছেন বলেই এই অহংবোধ আছে। 'লক্ষিতার্থঃ', তাঁকে লক্ষ্য করেই এই অহংবোধ। 'প্রত্যক্ সদানন্দঘনঃ পরাত্মা'; প্রত্যেকের মধ্যে সেই তিনি আছেন। আমি নিজের যে আমিকে অনুভব করছি তিনিই সবাইকার মধ্যে। 'সদানন্দঘনঃ'—সব সময় ঘন-আনন্দস্বরূপ। ঘন কেন বলছেন? এই আনন্দের মধ্যে কোনও ফাঁক নেই, ছেদ নেই। এখানে কম আনন্দ ওখানে বেশী আনন্দ এরকম নয়। 'একরসঃ'। আনন্দস্বরূপ তিনি সবাইকার মধ্যে সমানভাবে আছেন। এটাই সিদ্ধান্ত। বেদান্তের এই কথা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না। কিন্তু এটাই মূল কথা, এটাই বুঝতে হবে। আমাদের দেহ এত স্পষ্ট যে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন দেহধারী ব্যক্তির মধ্যে যে এক আত্মা এটা আমরা বুঝতে চাই না। কিন্তু এটাই সত্য। এক তিনি সর্বত্র আছেন, শুধু প্রকাশের তারতম্য।

ইত্থং বিপশ্চিৎ সদসদ্‌বিভজ্য নিশ্চিত্য তত্ত্বং নিজবোধদৃষ্ট্যা।
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডবোধং তেভ্যো বিমুক্তঃ স্বয়মেব শাম্যতি।। ৩৫২

অন্বয়: ইত্থং (এই ভাবে) বিপশ্চিৎ (বিচারশীল ব্যক্তি) সৎ-অসৎ বিভজ্য (নিত্য-অনিত্যের বিভাগ করে) নিজবোধদৃষ্ট্যা (নিজের অনুভবসিদ্ধ বোধদৃষ্টির সাহায্যে) তত্ত্বং নিশ্চিত্য (আত্মার স্বরূপ তত্ত্ব নিশ্চয় করে) অখণ্ডবোধং আত্মানং স্বং জ্ঞাত্বা (নিজের আত্মাকে অখণ্ড-জ্ঞানস্বরূপ বলে জেনে) তেভ্যঃ বিমুক্তঃ (তিনটির থেকে অর্থাৎ জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান এই তিনটিকে পৃথক করে ভাবার থেকে মুক্ত) স্বয়ম্ এব শাম্যতি (নিজে সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যান)।

সরলার্থ: বিচারশীল ব্যক্তি এইভাবে নিত্য-অনিত্যের বিভাগ করে ও নিজের অনুভবজাত বোধদৃষ্টির সাহায্যে আত্মার স্বরূপতত্ত্বকে নিশ্চয় করে অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ বলে জেনে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান, এই তিনটির পৃথকত্ব বোধ থেকে মুক্ত হন ও সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যান।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'ইত্থং বিপশ্চিৎ সদসদ্ বিভজ্য নিশ্চিত্য তত্ত্বং নিজবোধদৃষ্ট্যা'; 'বিপশ্চিৎ' মানে বিচার করেন যিনি, তিনি 'সৎ' আর 'অসৎ'কে বিচার করে বিভাগ করছেন। আগের শ্লোকে 'সৎ' আর 'অসৎ' বলতে আমরা কার্য আর কারণ বুঝেছি, এখন নিত্য আর অনিত্য এই অর্থে 'সদ্-অসদ্ বিভজ্য' বলছেন। যাঁরা বিচারশীল তাঁরা সৎ, অসৎ বিভাগ করে নেন। একটা উদাহরণ দেওয়া হয়। যেন হাঁসের মতো তাঁরা। হাঁস জলে-দুধে মিশে গেলে জলটাকে ফেলে দুধটাকে নিতে পারে। তেমনি এ সংসার নিত্যে আর অনিত্যে মিশে আছে। যাঁরা বিচারশীল তাঁরা অনিত্যকে ফেলে নিত্যটাকে বেছে নিতে পারেন। অনিত্যটা চলে গেলে নিত্যকে পাব। তাই সব সময় নিত্য-অনিত্যের বিচার করতে হয়। অনেকে হিন্দুদের সম্বন্ধে অভিযোগ করে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক। কিন্তু তা মোটেই নয়। আমরা অনিত্যকে অনিত্য বলে জেনেই গ্রহণ করছি। এখন রাজা হয়েছি বেশ, একদিন রাজা থাকব না সে-ও বেশ। এইরকম যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক সত্য দৃষ্টি। 'ইত্থং বিপশ্চিৎ সদ্-অসদ্ বিভজ্য'— বিচারশীল ব্যক্তি এমনি করে নিত্য-অনিত্যকে পৃথক করে নিয়ে 'নিশ্চিত্য তত্ত্বং নিজবোধদৃষ্ট্যা', যা তত্ত্ব, পরমাত্মার যে জ্ঞান তাকে নিশ্চিত করে জেনে বসে থাকেন। এ শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানা নয়, 'নিজবোধদৃষ্ট্যা', প্রত্যক্ষ জ্ঞান, নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে এই জ্ঞান লাভ হয়েছে। এই বোধদৃষ্টির সাহায্যে 'নিশ্চিত্য তত্ত্বং', তত্ত্বকে এখন সন্দেহাতীতভাবে পেয়েছি। এতক্ষণ হাতড়াচ্ছিলাম, এবার পেয়ে গেছি। আমার এই নিশ্চিত জ্ঞানটা হলো কি করে? 'নিজবোধদৃষ্ট্যা'। কারণ আমি নিজে জেনেছি, এ পরের মুখে ঝাল খাওয়া নয়, 'হস্তামলকবৎ' আমি জেনেছি। হাতের মুঠোয় এই জ্ঞান

আমার ধরা আছে। যে যাই বলুক, আমি জানি কি সত্যি। এই জ্ঞান আমার হয়েছে। 'বেদাহম্ এতম্ পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসো পরস্তাৎ' (শ্বে, ৩।৮)। আর ভুল হবার নেই, নিশ্চিত জ্ঞান, conviction। কি জেনেছি? 'স্বম্-আত্মানম্ অখণ্ডবোধং তেভ্যঃ বিমুক্তঃ'; সেই পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ নিজের আত্মাকে আমি জেনেছি। 'তেভ্যঃ বিমুক্তঃ', জ্ঞান, জ্ঞাতা আর জ্ঞেয়, এই তিনের পৃথক দর্শন থেকে আমি মুক্ত। আমি আর দুই দেখছি না, শুধু এক দেখছি। এই আমি থেকে আমার, আমার থেকে আমাদের, এইসব জঞ্জাল আমি নেতি নেতি করে ছেড়েছি। ব্যস্, এবার আমি 'স্বয়ম্-এব শাম্যতি'। আমি স্থির শান্ত হয়ে বসে গেছি। নিজের আত্মায় গিয়ে থেমে গেছি, শান্ত হয়ে গেছি, আত্মস্থ হয়ে আছি।

অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থের্নিঃশেষবিলয়স্তদা।
সমাধিনাঽবিকল্পেন যদাঽদ্বৈতাত্মদর্শনম্।। ৩৫৩

অন্বয়: যদা (যখন) অবিকল্পেন সমাধিনা (নির্বিকল্প সমাধির দ্বারা) অদ্বৈত-আত্মদর্শনম্ (অদ্বৈত আত্মদর্শন) তদা (তখন) অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থেঃ (অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থির) নিঃশেষবিলয়ঃ (নিঃশেষে লয়)।

সরলার্থ: যখন নির্বিকল্প সমাধিতে সেই অদ্বৈত আত্মদর্শন হয় তখন অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থির নিঃশেষে বিলয় হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: বলছেন, জন্মজন্মান্তরের সংস্কারের বশে আমাদের হৃদয়ে যেসব গ্রন্থির সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো নিঃশেষে চলে যাবে যদি নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। আমাদের মনটা সব জায়গায় ছড়ানো তাই দেহের যে কোনও জায়গায় স্পর্শ করলে আমরা টের পাই। কিন্তু সমাধি হলে মনটা কেন্দ্রীভূত হয়, যেমন সূর্য যখন অস্ত যান, তাঁর যেসব রশ্মি সর্বত্র ছড়ানো ছিল সেগুলোকে একসঙ্গে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে কেন্দ্রীভূত করে অস্ত যান। তেমনি আমাদের মনটা যদি হৃদয়পদ্মে কেন্দ্রীভূত হয় তাহলে দেহবোধ আর থাকে না। সমাধির আবার ভাগ আছে। সবিকল্প সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি। সবিকল্প মানে বিকল্প আছে। আমি ঈশ্বরের চিন্তা করছি, আমি একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গেছি। কিন্তু আমার আমিত্ব বোধ আছে আর ঈশ্বরের বোধ আছে। দুটো সত্তা আছে। আমি তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছি কিন্তু তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি এটা টের পাচ্ছি। বলছেন, 'তৈলধারাবৎ'। দুটো আধার তেলের ধারায় যুক্ত হয়েছে। ভগবান আর আমি যেন দুটো পাত্র, একটা থেকে আর একটায় তেল ঢালছি। দুটো পাত্র যুক্ত হয়ে গেছে কিন্তু আমি ভক্ত আমার আমিত্ব আর তিনি ভগবান তাঁর তিনিত্ব, এই দুটো থেকে যাচ্ছে। আর নির্বিকল্প সমাধি কিরকম? একটা পাত্রে জল আছে, আর কিছুটা লবণ আছে।

লবণটা জলে ফেলে দিলাম। তখন সেই লবণ জলের মধ্যে মিশে গেলো। আগে জল আর লবণ দুটো পৃথক সত্তা ছিল, কিন্তু এখন জল আর লবণ এক হয়ে গেলো। এই নির্বিকল্প সমাধি। বলছেন, 'অজ্ঞান হৃদয়গ্রন্থেঃ নিঃশেষ বিলয়ঃ-তদা'; কোন্‌টা অজ্ঞান ? না দুই দেখা। এর থেকেই সব গ্রন্থি আসছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, অঙ্কট বঙ্কট, twists and turns। এই যে আমি পণ্ডিত, আমার এত ক্ষমতা, এইসব ধারণা নিজের ওপর চাপাচ্ছি, এইসব হৃদয়গ্রন্থি। 'গ্রন্থি' মানে গাঁট। অজ্ঞানের জন্যে এই হৃদয়গ্রন্থি। এই অজ্ঞানটাই গাঁট, আমাদের বেঁধে ফেলেছে। নিজের স্বরূপটা ভুলে গেছি। নিজেকে চিনি না, জানি না, অজ্ঞান থেকে কতকগুলো আবর্জনা, গ্রন্থি মনের মধ্যে এনে জড়ো করেছি। সেই আবর্জনা মাথায় করে চলেছি। ঘাড়ে যেন ভূত চেপেছে। কিন্তু জ্ঞান হলে এক মুহূর্তে সব চলে যাবে। 'অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থেঃ-নিঃশেষবিলয়ঃ তদা'; সব গ্রন্থি, সব বন্ধন নিঃশেষে লয় হয়ে যাবে। তখন 'অদ্বৈত-আত্মদর্শনম্'। 'আমি' 'আমি' সর্বত্র শুধু আমাকেই দেখছি। এই অদ্বৈত আত্মদর্শন কি করে হয়? 'সমাধিনা অবিকল্পেন', নির্বিকল্প সমাধি হলে। ওই যে লবণ জলে ফেলে দিয়েছি, জলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে, সেই ব্যাপার। তাই দেখছি 'এক দেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত' (অবি, ১২), ভূতে ভূতে আমি বিরাজ করছি। এ যে দেখছে তার হৃদয়গ্রন্থি সব চলে গেছে। 'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মনি এব অনুপশ্যতি সর্বভূতেষু চ আত্মানম্ ততঃ ন বিজুগুপ্সতে' (ঈ, ৬)। যার সর্বত্র আত্মদর্শন হচ্ছে, তার দ্বেষ বা ঘৃণা করার কিছু নেই। এক আত্মা। তিনি বহু হয়েছেন। কখনও রাজা সাজছেন, কখনও প্রজা, কখনও সুখী, কখনও দুঃখী। নির্বিকল্প সমাধি হলে এই অদ্বৈত আত্মদর্শন হয়। তখন হৃদয়ের কোনও আঁকবাঁক আর থাকে না। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'; হৃদয়ের গ্রন্থি খুলে যায়, সব সংশয় চলে যায়। সবাইকে নিজের বলে মনে হয়।

ত্বমহমিদমিতীয়ং কল্পনা বুদ্ধিদোষাৎ
প্রভবতি পরমাত্মন্যদ্বয়ে নির্বিশেষে।
প্রবিলসতি সমাধাবস্য সর্বো বিকল্পঃ
বিলয়নমুপগচ্ছেদ্ বস্তুতত্ত্বাবধৃত্যা।। ৩৫৪

অন্বয়: ত্বম্-অহম্-ইদম্-ইতি (তুমি-আমি-এ ইত্যাদি) ইয়ম্ কল্পনা (এই ভাবের কল্পনা) বুদ্ধিদোষাৎ (বুদ্ধির দোষ থেকে) প্রভবতি (উৎপন্ন হচ্ছে) সমাধৌ (সমাধি অবস্থায়) নির্বিশেষে অদ্বয়ে পরমাত্মনি প্রবিলসতি (নির্বিশেষ অদ্বয় পরমাত্মা প্রকাশিত হলে) বস্তুতত্ত্ব-অবধৃত্যা (বস্তুতত্ত্ব অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব অবধারণের ফলে) অস্য (সমাধিস্থ ব্যক্তির) সর্বঃ বিকল্পঃ (এক জ্ঞান থেকে পৃথক অন্য সমস্ত জ্ঞান) বিলয়নম্-উপগচ্ছেদ্ (লয়প্রাপ্ত হয়)।

সরলার্থ: তুমি-আমি-এ ইত্যাদি ধারণা বুদ্ধির দোষ থেকে জন্মায়। সমাধিতে নির্বিশেষ অদ্বয় পরমাত্মা প্রকাশিত হলে পরমাত্মতত্ত্ব যথাযথভাবে অবধারণের ফলে সমাধিবান পুরুষের একজ্ঞান থেকে পৃথক অন্য সমস্ত প্রকার জ্ঞান লয়প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা: এক আমি, তাকে কত রকমে ভাগ করছি। এক আত্মা কিন্তু বহু দেখছি। এক বহু বলে প্রতিভাত হচ্ছেন। কিন্তু সবই যে সেই এক চৈতন্যস্বরূপ সত্তামাত্র, এই আত্মদর্শন কি করে হয়? বারবার চিন্তা করতে হয়, ধ্যান করতে হয়, তারপর সমাধি হলে তবে হয়। বলছেন, 'ত্বম্-অহম্-ইদম্-ইতি-ইয়ং কল্পনা বুদ্ধি দোষাৎ প্রভবতি'; তুমি, আমি, এই, সেই—এই বোধগুলো সব কল্পনায় জন্মাচ্ছে, বাস্তবে নেই। সেই এক 'তৎ'—তাঁকে 'ত্বম্' বলছি, 'অহং' বলছি আবার 'ইদম্' বলছি, এসব কল্পনা 'বুদ্ধিদোষাৎ', বুদ্ধির দোষ থেকে আসছে। আমরা ভুল করে বলছি। বুদ্ধির দোষে এরকম সব কল্পনার সৃষ্টি হচ্ছে। 'পরমাত্মনি অদ্বয়ে নির্বিশেষে প্রবিলসতি সমাধৌ'; পরমাত্মা যখন সমাধিতে প্রকাশ হচ্ছেন, তখন তাঁর মধ্যে কোন বিকল্প নেই। এক পরমাত্মা। অদ্বয়, নির্বিশেষ কোনও বিশেষত্ব বা বিকল্প নেই। 'অস্য সর্বঃ বিকল্পঃ বিলয়নম্-উপগচ্ছেৎ'—সমাধিতে তাঁর সব বিকল্প লয় হয়ে যাবে। এই যে দুই দেখা, বহু দেখা—এ সব বিকল্প সমাধিতে চলে যায়। কেন যায় ? 'বস্তুতত্ত্ব-অবধৃত্যা'—বস্তুতত্ত্ব অবধারণের ফলে। পরমাত্মতত্ত্ব ঠিক ঠিক উপলব্ধি করার ফলে সব রকম বিকল্প লয় হয়ে যায়। সব দুই দেখা চলে যায়। কারণ সেই বস্তুতত্ত্ব আমি জেনেছি, মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছি, আর ভুল হবে না। আত্মদর্শন হলে সব বৈচিত্র, সব বিভিন্নতা মুছে যাবে। যেন অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না, তাই কল্পনা করছি কত কি আছে। কিন্তু যখন আলো আসবে, জ্ঞান হবে, তখন আমরা দেখতে পাব বহু নেই—সেই এক আত্মা।

শান্তো দান্তঃ পরমুপরতঃ ক্ষান্তিযুক্তঃ সমাধিং
কুর্বন্ নিত্যং কলয়তি যতিঃ স্বস্য সর্বাত্মভাবম্।
তেনাবিদ্যা-তিমিরজনিতান্ সাধু দগ্ধ্বা বিকল্পান্
ব্রহ্মাকৃত্যা নিবসতি সুখং নিষ্ক্রিয়ো নির্বিকল্পঃ।। ৩৫৫

অন্বয়: শান্তঃ দান্তঃ (শম ও দম সম্পন্ন) পরম্-উপরতঃ (সর্বতোভাবে বাহ্যবিষয় থেকে বিরত) ক্ষান্তিযুক্তঃ (ক্ষমাশীল সহিষ্ণু) যতিঃ (সন্ন্যাসী) সমাধিং কুর্বন্ (সমাধি লাভ করে) স্বস্য সর্বাত্মভাবং (নিজের সর্বাত্মভাব) নিত্যং কলয়তি (সর্বদা চিন্তা করেন) তেন (এর দ্বারা) অবিদ্যা-তিমিরজনিতান্ (অবিদ্যার অন্ধকারজনিত) বিকল্পান্ (সমস্ত বিকল্প) সাধু (অনায়াসে) দগ্ধ্বা (দগ্ধ করে) ব্রহ্মাকৃত্যা (ব্রহ্ম-আকারে অর্থাৎ ব্রহ্ম হয়ে) নিষ্ক্রিয়ঃ নির্বিকল্পঃ (নিষ্ক্রিয় নির্বিকল্প অবস্থায়) সুখং নিবসতি (সুখে অবস্থান করেন)।

সরলার্থ: অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের পূর্ণ সংযম যাঁর হয়েছে, যিনি সমস্ত বাহ্যবিষয় থেকে মনকে অন্তরে টেনে নিয়েছেন, সেই ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু সন্ন্যাসী সমাধি লাভ করে নিজের সর্বাত্মভাব সব সময় অনুভব করেন। আর এইরকম ভাবনার দ্বারা অবিদ্যার অন্ধকারজনিত সমস্ত বিকল্প অনায়াসে দগ্ধ করে ব্রহ্মাকারে নিষ্ক্রিয় নির্বিকল্প অবস্থায় সুখে অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যা: বলছেন : আত্মদর্শন যখন আমার হবে, তখন আমার অবস্থাটা কিরকম ? আত্মদর্শন কিরকম ? 'শান্তঃ দান্তঃ পরম্-উপরতঃ'। 'শান্ত' কথাটা শম্ ধাতু থেকে এসেছে। মনের ভেতর আর চাঞ্চল্য নেই, আমার অন্তরিন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বশে এসে গেছে। 'দান্তঃ', দম্ ধাতু থেকে এসেছে। আমার ইন্দ্রিয়গুলো অর্থাৎ চোখ কান সব দমন করে রেখেছি। 'পরম্-উপরতঃ', বাইরের জগৎ থেকে আমি ভেতরে চলে গেছি। যখন আমরা দুই দেখি তখন কি হয়, অন্য একজনকে হয় আমি বন্ধু ভাবছি নয় শত্রু ভাবছি। ঠিক করতে পারছি না। বন্ধুই তো? ক্ষতি কিছু করবে না তো? আবার শত্রু ভাবলে মনে করছি, কি জানি কি মতলব আছে ! মন চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন আর দুই দেখছি না তখন শান্ত। এক আমিই সব, তাই আর চঞ্চলতা নেই। আমি শান্তঃ, দান্তঃ। ইন্দ্রিয়গুলো আর বাইরের দিকে ছুটতে পারছে না, সব দমন করেছি। 'পরম্-উপরতঃ'; যখন দুই দেখি তখন বাইরের দিকে মন টানে বা মনটা ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে আসে। কিন্তু আমি তো শুধু এক দেখছি তাই মন সর্বতোভাবে উপরত। 'ক্ষান্তিযুক্তঃ সমাধিং কুর্বন্ যতিঃ'; 'ক্ষান্তিযুক্তঃ'—ক্ষমাযুক্ত, সহিষ্ণুতাযুক্ত। উদাসীন হয়ে আছি। যে যা বলে বলুক গে না। 'সমাধিং কুর্বন্ নিত্যম্ কলয়তি যতিঃ'। 'কলয়তি' মানে চিন্তা করে। 'যতি' মানে যোগী, ত্যাগী সন্ন্যাসী। সমাধি লাভ করে যোগী সব সময় চিন্তা করছেন। কি চিন্তা করছেন ? 'স্বস্য সর্বাত্মভাবম্'; 'স্বস্য' মানে নিজের। নিজের 'সর্বাত্মভাব' সর্বদা চিন্তা করছেন। তাঁর ভাবটা হচ্ছে : সকলের মধ্যে আমি, আমার আত্মাই সকলের আত্মা, 'সর্বাত্মভাবম্'। সব আমি, দুই নেই। দ্রষ্টা আর দৃশ্য এক হয়ে গেছে। কে কাকে দেখবে ! তিনি যে সব এক দেখছেন এটা কি করে সম্ভব হয়েছে? সম্ভব হয়েছে কারণ 'তেন-অবিদ্যা তিমিরজনিতান্', অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে তাঁর যত বৈচিত্র দেখা, দুই দেখা, তা 'সাধু দগ্ধ্বা', খুব দ্রুত একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর বিকল্প দেখছেন না। সব আমি, এর বিকল্প আর নেই। এখন 'ব্রহ্ম-আকৃত্যা নিবসতি'—ব্রহ্মাকারে অর্থাৎ ব্রহ্ম হয়ে বসে আছেন। 'সুখং নিষ্ক্রিয়ঃ নির্বিকল্পঃ', সুখে আনন্দে ডুবে আছেন। 'আমি ব্রহ্ম', এই আনন্দে ডুবে আছেন। আমরা সুখ সুখ করি, স্থায়ী, নিরবচ্ছিন্ন সুখ 'এক' দেখলেই। দুই দেখলে সুখ নেই। থাকলেও সে সাময়িক, তার পরেই দুঃখ। অদ্বৈতভাবে আছি, তাই সুখে আছি, আনন্দে আছি। নিষ্ক্রিয় নির্বিকল্প হয়ে আত্মনিমগ্ন হয়ে বসে আছি।

সমাহিতা যে প্রবিলাপ্য বাহ্যং
শ্রোত্রাদি চেতঃ স্বমহং চিদাত্মনি।
ত এব মুক্তা ভবপাশবন্ধৈ-
র্নান্যে তু পারোক্ষ্যকথাভিধায়িনঃ ॥ ৩৫৬

অন্বয়: যে (যাঁরা) স্বম্ (স্বীয়) শ্রোত্রাদি বাহ্যং (বহির্মুখী শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে) চেতঃ (অন্তঃকরণকে) অহং (অহংবোধকে) চিদাত্মনি (চৈতন্যস্বরূপ আত্মায়) প্রবিলাপ্য (লয় করে) সমাহিতাঃ (সমাধিস্থ থাকেন) তে এব (কেবল তাঁরাই) ভবপাশবন্ধৈঃ মুক্তাঃ (ভববন্ধন থেকে মুক্ত হন) অন্যে পারোক্ষ্যকথা-অভিধায়িনঃ (অন্য যাঁরা শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা উপলব্ধি ছাড়াই আওড়াতে থাকেন তাঁরা) ন তু (কখনই মুক্ত হন না)।

সরলার্থ: যাঁরা নিজেদের বহির্মুখী শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ, অন্তঃকরণ ও অহংবোধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় লয় করে দিয়ে সমাধিস্থ হয়ে থাকেন, তাঁরা ভববন্ধনের পাশ থেকে মুক্ত হয়ে যান। অন্য যাঁরা শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা উপলব্ধি না করেই আওড়াতে থাকেন তাঁদের কখনই মুক্তি হয় না।

ব্যাখ্যা: বলছেন : আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সব বহির্মুখী। এগুলোকে ভেতরে টেনে নিয়ে, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার সব সমেত চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় সমর্পণ করে সমাধিস্থ হয়ে থাকতে হবে। তবে তো এই ভববন্ধন পাশ থেকে মুক্তি হবে। শাস্ত্র পড়ে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শুধু মুখে আওড়ালে হবে না। অপরোক্ষ অনুভূতি চাই, তা না হলে মুক্তি হয় না। 'সমাহিতা যে প্রবিলাপ্য বাহ্যং'—এসব বাহ্য ত্যাগ করে যাঁরা সমাহিত। কি বাহ্য? 'শ্রোত্রাদি চেতঃ স্বম্-অহং চিদাত্মনি'; আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার সব যেন আত্মার মধ্যে এসে একেবারে ডুবে গেছে। আমার মধ্যে সব ডুবে গেছে। আমি সবকিছুকে এইভাবে গ্রাস করে ফেলেছি। এই যে আমরা চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, হাত পা চালিয়ে কাজ করি, এই জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় সব আমার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর কোথায় যাবে? বাইরে তো আর যাবার নেই। সব আমার মধ্যে এসে গেছে। 'চিদ্-আত্মনি', এই জ্ঞানস্বরূপ যে আত্মা সব এসে তার মধ্যে লোপ পেয়ে গেছে। আমি সমাহিত হয়ে আছি। তখন কি হয়? 'তে এব মুক্তাঃ ভবপাশবন্ধৈঃ'—এরকম যাঁরা তাঁরা ভবপাশ থেকে মুক্ত হয়ে যান। তারপর কি বলছেন ? 'নান্যে তু পারোক্ষ্য কথাভিধায়িনঃ', শাস্ত্রের কথা, আত্মা-সম্পর্কীয় কথা যারা শুধু পরোক্ষে শুনেছে, তাদের মুক্তিলাভ হয় না। পরোক্ষ আর অপরোক্ষ দুটো শব্দ। পরোক্ষ জ্ঞান—এই যে আমি চোখ দিয়ে দেখছি, কান দিয়ে শুনছি, এগুলো পরোক্ষ জ্ঞান। কারণ এই জ্ঞান যে-জিনিসটাকে জানছি তা ছাড়াও অন্য জিনিসের উপর নির্ভরশীল। যেমন, আমার চোখের দোষ থাকতে পারে, আমার দেখার ভুল

হতে পারে, আমার হয়তো সব কথা শোনা হয়নি। তাই বলছেন, 'পারোক্ষ্য কথাভিধায়িনঃ'—কতকগুলো কথা আমি শুধু শুনে উচ্চারণ করে যাচ্ছি, শুধু শব্দ, বাক্‌বৈখরী শব্দঝরী—এ হলে হবে না। অপরোক্ষ অনুভূতি চাই। 'সমাহিতা যে প্রবিলাপ্য বাহ্যং শ্রোত্রাদি চেতঃ স্বম্-অহং চিদাত্মনি তে এব মুক্তাঃ ভবপাশবন্ধৈঃ'; যাঁরা সমস্ত বাহ্য ইন্দ্রিয়, চিত্ত, অহংকার চিদাত্মায় টেনে নিয়ে সমাহিত হয়ে আছেন, তাঁদেরই ভববন্ধন নাশ হবে। যারা কতকগুলো কথা আওড়ায় তাদের হবে না। আমাদের অপরোক্ষ উপলব্ধি চাই। এই যে চোখ-কানের সাহায্যে যা দেখছি শুনছি, সেগুলো পরোক্ষ উপলব্ধি, চোখ-কান ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। অপরোক্ষ অনুভূতি ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান। এ যে কি করে হয় তা বলা যায় না। তবে এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে এমন মানুষ দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে এই সন্দেহের যুগে জন্মেছিলেন এই রক্ষে। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট এঁরা বহু আগের, এঁদের সম্বন্ধে আমরা যা জানি তা হয়তো কিছুটা অনুমান নির্ভর। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ? তিনি তো আমাদের চোখের ওপর লীলা করে গেলেন। এই আনন্দের অনুভূতি আমাদের পাইয়ে দেবেন বলে এঁরা কত কষ্ট করেছেন!

উপাধিভেদাৎ স্বয়মেব ভিদ্যতে
চোপাধ্যপোহে স্বয়মেব কেবলঃ।
তস্মাদুপাধের্বিলয়ায় বিদ্বান্
বসেৎ সদাঽকল্পসমাধিনিষ্ঠয়া॥ ৩৫৭

অন্বয়: উপাধিভেদাৎ (দেহ-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধির ভেদ থেকে) স্বয়ম্-এব (আত্মস্বরূপ আমি স্বয়ং) ভিদ্যতে (বহুরূপে বিভিন্ন হচ্ছেন) উপাধি-অপোহে (উপাধির অপসারণ হলে) স্বয়ম্-এব কেবলঃ (আমি স্বয়ং শুদ্ধ অদ্বিতীয় সত্তামাত্র) তস্মাৎ (সেইজন্যে) বিদ্বান্ (বিদ্বান ব্যক্তি) উপাধেঃ বিলয়ায় (উপাধিলয়ের জন্যে) সদা-অকল্পসমাধিনিষ্ঠয়া (সর্বদা নির্বিকল্প সমাধিমগ্নতাসহ) বসেৎ (অবস্থান করেন)।

সরলার্থ: উপাধির ভেদ থেকে আত্মস্বরূপ 'স্বয়ং আমি' বহুরূপে বিভিন্ন হচ্ছেন। উপাধি সরে গেলে 'আমি' স্বয়ং শুদ্ধ অদ্বিতীয় সত্তামাত্র। সেইজন্য বিদ্বান ব্যক্তি উপাধিলয়ের জন্যে সর্বদা নির্বিকল্প সমাধিনিষ্ঠা সহ অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যা: যিনি আমার আত্মা তিনিই সকলের আত্মা। তাহলে বহু দেখি কেন? উপাধির জন্যে। আত্মা নিরুপাধিক। আমাদের হৃদয়গুহায় তিনি আছেন। তাঁর ওপর কতকগুলো কোশ চাপানো হয়েছে বলে তিনি আবৃত হয়ে আছেন। অন্নময়কোশ, প্রাণময়কোশ, মনোময়কোশ, বিজ্ঞানময়কোশ, আনন্দময়কোশ—এই কোশগুলি সব উপাধি। আবার সুরূপ, কুরূপ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ—এইসব গুণগুলোও

উপাধি। বলছেন, 'উপাধি ভেদাৎ স্বয়ম্-এব ভিদ্যতে'; এই উপাধির জন্যে আত্মা নিজেই বিভিন্ন হন, নানা রূপ ধারণ করেন। এক আত্মা বহুরূপে প্রতিভাত হন। আবার উপাধিগুলি যদি উপেক্ষা করতে পারি তাহলে 'স্বয়ম্-এব কেবলঃ'; তাহলে সেই এক আত্মা, নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ। এই 'কেবলঃ' শব্দটা আমাদের ভালো করে বুঝে নিতে হবে। দুই নেই, তাই 'কেবলঃ', নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ। আমিই এক কিন্তু বহু হয়েছি এই উপাধির জন্যে। 'তস্মাৎ উপাধেঃ বিলয়ায় বিদ্বান্'; যিনি বিদ্বান ব্যক্তি, বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তিনি সেইজন্যে এই উপাধিবিলয়ের চেষ্টা করবেন। কিভাবে করবেন ? 'সদা-অকল্প সমাধি নিষ্ঠয়া বসেৎ'; 'অকল্প' অর্থাৎ নির্বিকল্প, 'অকল্প সমাধিনিষ্ঠয়া' অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে বসে থাকবেন। নির্বিকল্প সমাধি মানে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, তাঁর সঙ্গে একেবারে মিশে যাওয়া। এই সমাধি লাভ করার পদ্ধতিটা কি? ইন্দ্রিয়গুলোকে মনের মধ্যে গুটিয়ে নিতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলোকে তো মন চালায়, তাদের মনের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে। তারপর মনকে আত্মায় ডুবিয়ে দিতে হবে, মিশিয়ে দিতে হবে। ব্যস্, এই হচ্ছে নির্বিকল্প সমাধি। উপাধি-টুপাধি আর নেই, সব আত্মায় চলে গেছে। এক আত্মা তাঁর ওপর অনেক উপাধি চাপানো ছিল, তাই তাঁকে বহু বলে মনে হচ্ছিল। যিনি বিদ্বান তিনি সব উপাধি নেতি নেতি করে বর্জন করে, আত্মায় লয় করে দিয়ে 'বসেৎ'—চুপ করে বসে থাকেন। 'সদা-অকল্প সমাধিনিষ্ঠয়া'; নিজের স্বরূপচিন্তাতে মগ্ন হয়ে থাকেন। দেহবোধ নেই। নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ, নিরুপাধিক ব্রহ্ম, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে তিনি 'কেবলঃ' হয়ে অবস্থান করেন।

সতি সক্তো নরো যাতি সদ্ভাবং হ্যেকনিষ্ঠয়া।
কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে॥ ৩৫৮

অন্বয়: সতি সক্তঃ নরঃ (সৎস্বরূপ ব্রহ্মে আসক্ত মানব) হি (অবশ্যই) একনিষ্ঠয়া (একনিষ্ঠার দ্বারা) সৎ ভাবং যাতি (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন) [যেমন] কীটকঃ ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ([ভ্রমরের দ্বারা গৃহীত হবার আশঙ্কায়] কীট ভ্রমরের চিন্তা করতে করতে) ভ্রমরত্বায় কল্পতে (ভ্রমর হয়ে যায়)।

সরলার্থ: সৎস্বরূপ ব্রহ্মে আসক্ত মানব একনিষ্ঠার সহায়ে অবশ্যই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। যেমন তেলাপোকা [কাঁচপোকা তাকে ধরবে এই ভয়ে] কাঁচপোকার চিন্তা করতে করতে কাঁচপোকা হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: বলছেন, একনিষ্ঠ হয়ে মানুষ যখন সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মের চিন্তা প্রতিনিয়ত করতে থাকে তখন সে ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে গিয়ে ব্রহ্মই হয়ে যায়। এটা বোঝাতে

গিয়ে তেলাপোকা আর কাঁচপোকার উদাহরণ দিচ্ছেন। তেলাপোকা যদিও আকারে বড় কিন্তু দুর্বল। আর কাঁচপোকা আকারে ছোট হলেও খুব দ্রুতগতিতে চলে আর হিংস্র। তেলাপোকা কাঁচপোকাকে তাই ভয় করে। এই আমাকে ধরল বুঝি, এই বুঝি আমাকে মেরে ফেলল, এইরকম চিন্তা করতে করতে—ভক্তিতে নয় ভয়ে—তেলাপোকা কাঁচপোকা হয়ে যায়। বলছেন, 'সতি সক্তো নরো', সতি মানে ব্রহ্মে—সৎ-চিৎ-আনন্দ—তার যে সৎ, সেই সৎ-এ। 'সক্তঃ' মানে আসক্ত। আমার মন যদি সৎ-এ লিপ্ত হয়, যদি সৎ-এ আসক্ত হয় তাহলে কি হবে? 'যাতি সদ্ভাবং হি একনিষ্ঠয়া'। সৎভাব হবে। সৎ মানে তো ব্রহ্ম, ব্রহ্মের ভাবে একনিষ্ঠ হয়ে যাবে। আমাদের একটা চলিত কথা আছে, 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিঃ ভবতি তাদৃশী'—আপনি যেরকম ভাববেন সেইরকমই হয়ে যাবেন। ভালো চিন্তা করতে করতে মানুষ ভালো হয়ে যায়। আমি যদি ভালো হতে চাই তাহলে একটা আদর্শ ধরে চলতে হবে, নিজেকে একটা ছাঁচে ফেলতে হবে। ধরলাম, সেই আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ। সব সময় তাঁর কথা ভাবছি, তাঁর লীলার কথা ভাবছি। কিভাবে তাঁর মনটা সব সময় তৈলধারাবৎ ঈশ্বরে যুক্ত থাকত, ভাবছি। নিরন্তর যদি এসব কথা ভাবি, আমিও তাঁর মতো হয়ে যাব। তাঁর মতো অনুক্ষণ ঈশ্বরচিন্তা করতে পারব। তাই বলছেন : সব সময় 'সৎ'-এ যদি আমার মন থাকে, তাহলে সেই মন 'যাতি সদ্ভাবং হি একনিষ্ঠয়া'—সৎভাবে একনিষ্ঠ হয়ে যায়, ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে যায়। একটা মৌমাছি ফুলে বসেছে, আগে ভন্‌ভন্ করছিল, তারপর একটা ফুল পেয়ে বসেছে, স্থির নিশ্চুপ হয়ে গেছে। সেইরকম মনটা যদি ঈশ্বরে আসক্ত হয়, যুক্ত হয়, তাহলে স্থির হয়ে বসে যাবে। তারপর বলছেন, 'কীটকঃ ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে', তেলাপোকা যেমন ভ্রমরের চিন্তা করতে করতে ভ্রমর হয়ে যায়। আমাদের শাস্ত্রে এইরকম বলে, যার চিন্তা করতে থাকব তাই হয়ে যাব। সর্বদা যদি ব্রহ্মচিন্তা করতে পারি, তাহলে তিনি তো নিত্য-শুদ্ধ, তাঁর চিন্তায় মনের সব মলিনতা চলে যাবে, মন শুদ্ধ হয়ে যাবে। শুদ্ধ মনে ব্রহ্মের প্রকাশ হবে। ব্রহ্ম হয়ে যাব আমি।

ক্রিয়ান্তরাসক্তিমপাস্য কীটকো
ধ্যায়ন্নলিত্বং হ্যলিভাবমৃচ্ছতি।
তথৈব যোগী পরমাত্মতত্ত্বং
ধ্যাত্বা সমায়াতি তদেকনিষ্ঠয়া॥ ৩৫৯

অন্বয়: কীটকঃ (কীট) ক্রিয়ান্তর-আসক্তিম্-অপাস্য (অন্য সকল কর্মে আসক্তি ত্যাগ করে) অলিত্বং ধ্যায়ন্ (ভ্রমরের চিন্তা করতে করতে) হি (অবশ্যই) অলিভাবং ঋচ্ছতি (অলিভাব প্রাপ্ত হয়) তথা এব যোগী (সেই প্রকারে যোগী) পরমাত্মতত্ত্বং

একনিষ্ঠয়া ধ্যাত্বা (সেই ব্রহ্মের স্বরূপ একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যান করে) তৎ সমায়াতি (তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যান)।

সরলার্থ: কীট (তেলাপোকা) অন্য সব কর্ম বর্জন করে শুধু ভ্রমরের (কাঁচপোকার) চিন্তা করার ফলে ভ্রমরভাব প্রাপ্ত হয়। সেইরকম ভাবে সাধক একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরমাত্মার স্বরূপ ধ্যান করতে করতে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যান।

ব্যাখ্যা: এখানে আবার সেই কীটের ভ্রমর হয়ে যাওয়ার উপমা দিচ্ছেন। বলছেন, কীট যেমন অন্য সবকিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু ভ্রমরের চিন্তা করতে করতে ভ্রমর হয়ে যায় সেইরকম সর্বদা পরমাত্মার চিন্তা করতে থাকলে সাধকও তাঁর ভাবে পূর্ণ হয়ে তাঁর সঙ্গে মিশে যায়। বলছেন, 'ক্রিয়ান্তর-আসক্তিম্-অপাস্য'; অন্য কোনও কাজে আমার মন নেই, কোনও আসক্তি নেই, অন্য কিছু করতে চাইছি না, 'অপাস্য'—বর্জন করে, অন্য কিছু করার প্রতি যে আকর্ষণ সেটা বর্জন করেছি। 'কীটকঃ ধ্যায়ন্-অলিত্বং', কীট মানে তেলাপোকা। সে ধ্যান করছে। কার ধ্যান করছে? অলির, সেই ভ্রমরের—এই আমায় ধরবে বোধ হয়—এই ধ্যান করছে। করতে করতে কি হচ্ছে? সে 'অলিভাবম্ ঋচ্ছতি', অলি হয়ে যাচ্ছে। এটা তো একটা উপমা দিলেন। কি বলার জন্যে? 'তথা-এব-যোগী পরমাত্মতত্ত্বং ধ্যাত্বা সমায়াতি'—যিনি যোগী তিনি এইভাবে পরমাত্মার ধ্যান করতে করতে 'সমায়াতি'—তাই হয়ে যান, নিজেকে পরমাত্মা বলে জানতে পারেন, আত্মজ্ঞান লাভ করেন। কিসের দ্বারা লাভ করেন ? 'তদ্-একনিষ্ঠয়া', তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে। কোনও বড় কিছু করতে গেলেই এই নিষ্ঠার দরকার। এক দিনে হয়তো হয় না, কিন্তু ধীরে ধীরে অভ্যাস করতে করতে এই নিষ্ঠা আসে। তখন 'যোগী পরমাত্মতত্ত্বং ধ্যাত্বা সমায়াতি তদেকনিষ্ঠয়া'—একান্ত নিষ্ঠায় পরমাত্মতত্ত্ব ধ্যান করতে করতে সাধক সেই পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যান।

অতীব সূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তুমর্হতি।
সমাধিনাঽত্যন্তসুসূক্ষ্মবৃত্ত্যা জ্ঞাতব্যমার্যৈরতি শুদ্ধবুদ্ধিভিঃ॥ ৩৬০

অন্বয়: পরমাত্মতত্ত্বং (পরমাত্মতত্ত্ব) অতি-ইব-সূক্ষ্মং (অত্যন্ত সূক্ষ্ম) স্থূলদৃষ্ট্যা (স্থূলদৃষ্টি দ্বারা) প্রতিপত্তুং ন অর্হতি ([এই তত্ত্বের] প্রতিপাদন করা সম্ভব হয় না) সমাধিনা (চিত্তের একাগ্রতার সহায়ে) অত্যন্ত-সুসূক্ষ্মবৃত্ত্যা (অত্যন্ত সূক্ষ্মবৃত্তির দ্বারা) অতিশুদ্ধবুদ্ধিভিঃ আর্যৈঃ (অত্যন্ত শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন উত্তমব্যক্তিগণের দ্বারা) জ্ঞাতব্যং ([পরমাত্মতত্ত্ব] জ্ঞানগোচর হয়)।

সরলার্থ: আত্মার যথার্থ স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। যাঁরা স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁরা আত্মতত্ত্ব

ধারণা করতে পারেন না। চিত্তের একাগ্রতা সাধনের ফলে যাঁদের বুদ্ধি বিষয়চিন্তা-বর্জিত হয়েছে, অতি-সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ হয়েছে, সেইসব উত্তম ব্যক্তিদের কাছে শুভবুদ্ধির সহায়তায় পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞানগোচর হয়।

ব্যাখ্যা: বলছেন, এই পরমাত্মতত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্ম, 'অতীব সূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং'। তাঁকে দেখতে পাই না। জানি যে, তিনি আছেন বলেই সব চলছে, তবু তাঁকে বুঝতে পারি না। তিনি যদি দেহ ছেড়ে চলে যান তাহলে আমার সব থেকেও কিছু করার নেই, কারণ আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেছেন। সেই আত্মা কখন গেলো, কোথায় গেলো, কোন্ পথ দিয়ে গেলো—সেও বিরাট প্রশ্ন। এই নিয়েই তো নচিকেতা যমকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলেন কঠোপনিষদে। আচ্ছা, এই আত্মা তো আছে—কোথায়? কিরকম দেখতে, কি করে বুঝব? একটা কিন্তু উপায় আছে এটা বোঝার। আমাদের সুষুপ্তি অবস্থা থেকে বোঝা যায়, আত্মা আছেন। গাঢ় ঘুমের মধ্যে আছি। আমাদের দেহ-মন এ সবের কোনও বোধই আর নেই। তারা যেন কোথায় তলিয়ে গেছে। যাঁর কাছে তারা আশ্রয় নিয়েছে তিনি-ই আমাদের সেই আত্মা। জেগে উঠে আবার যে-কে-সেই ! আবার আমাদের দেহ-মন নিয়ে যে ব্যক্তিসত্তা তাতে ফিরে আসছি। চিন্তা করছি, নড়াচড়া করছি, সব কাজ করছি কিন্তু তিনি আছেন বলেই এ-সব করতে পারছি। তারপর আবার বলছেন—'ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তুম্ অর্হতি'; অনেকে আছে যাদের ব্যবহার স্থূল, রুচি স্থূল, মনটাই স্থূল, এরকম যারা—'ন প্রতিপত্তুম্ অর্হতি'—তারা আত্মাকে ধরতে পারে না। যেমন শিল্পকলা, এর যে একটা সাংকেতিক দিক আছে সেটা অনেকে ধরতে পারে না। কোনও কোনও জাপানী ছবি দেখতে পাওয়া যায়, শুধু একটা আঁচড় দিয়েছে। অর্থবহ, কিন্তু কি যে বলতে চাওয়া হচ্ছে সেটা অনেকে ধরতে পারে না। তারপর ধীরে ধীরে, চর্চা করতে করতে বুঝতে পারে। আত্মা সূক্ষ্ম তো, তাঁকে বুঝতে গেলে ধীরে ধীরে এগোতে হবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি স্থূল, বহির্মুখী, এ দিয়ে হবে না। কঠোপনিষদে আছে 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ' (ক,২।১।১)—তিনি যেন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃণবৎ তুচ্ছ করে মেরে রেখে দিয়েছেন। মন আমাদের বহির্মুখী; যাদের মন অন্তর্মুখী তারা কত কি ধরতে পারে, বহির্মুখী মন তা পারে না। তাই বলছেন, স্থূলদৃষ্টি না, সূক্ষ্মদৃষ্টি হতে হবে, তবেই ধরতে পারবে আত্মা কোথায় আছেন। 'সমাধিনা-অত্যন্ত-সুসূক্ষ্মবৃত্ত্যা', এই সূক্ষ্ম মনটা হবে কি করে? না, 'সমাধিনা'—একাগ্রতার দ্বারা আমরা সূক্ষ্মবৃত্তি পাব। আমাদের মনে সূক্ষ্মবৃত্তিগুলি আছে, ধরতে পারছি না, সেটা একাগ্রতার দ্বারা ধরতে হবে। আমরা স্থূলদৃষ্টি, সূক্ষ্মভাব ধরতে পারি না। পারি না কারণ বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সব সময় যুক্ত হয়ে রয়েছে। মনকে একাগ্র করে তাদের যদি ভিতরে টেনে আনি, তখন কি হবে? বাইরের সঙ্গে সংঘাত আমার মনে

যে তরঙ্গ তুলেছিল সেগুলি আস্তে আস্তে থেমে যাবে, আর মনের যেটা সূক্ষ্মতর অংশ সেটাই কাজ করবে। তখন সব সূক্ষ্মভাব, সূক্ষ্মচিন্তা মনে উঠবে। এই সূক্ষ্ম মন বা সূক্ষ্ম বুদ্ধির কাছে বিষয়সুখ স্থূল বলে মনে হয়, এর আকর্ষণ চলে যায়, মন আর বিষয়মুখী হতে পারে না, ঈশ্বর অনুরাগে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে যায়। বলছেন, 'জ্ঞাতব্যম্ আর্যৈঃ অতিশুদ্ধবুদ্ধিভিঃ'। আর্য কাকে বলছেন? আর্য হচ্ছে—উত্তম, ভদ্র, সংস্কৃত। 'অতিশুদ্ধবুদ্ধিভিঃ'; অত্যন্ত শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা। যাদের বুদ্ধি নির্মল, শুদ্ধ, তারাই এইসব জিনিস ধরতে পারে।

যথা সুবর্ণং পটুপাকশোধিতং
ত্যক্ত্বা মলং স্বাত্মগুণং সমৃচ্ছতি।
তথা মনঃ সত্ত্বরজস্তমোমলং
ধ্যানেন সংত্যজ্য সমেতি তত্ত্বম্॥ ৩৬১

অন্বয়: যথা (যেমন) পটু পাক শোধিতং (অগ্নি ও ক্ষারের সাহায্যে শোধিত) সুবর্ণং (সুবর্ণ) মলং ত্যক্ত্বা (মলজনিত মলিনতা ত্যাগ করে) স্বাত্মগুণং সম্-ঋচ্ছতি (নিজের গুণ যে ঔজ্জ্বল্য তাই প্রাপ্ত হয়) তথা (সেই প্রকারে) মনঃ (মন) ধ্যানেন (ধ্যানের সহায়) সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ মলং (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণরূপ মলিনতা) সংত্যজ্য (ত্যাগ করে) তত্ত্বং সম্-এতি (তত্ত্বের সঙ্গে এক হয়ে যায়)।

সরলার্থ: সোনাকে যেমন অগ্নি ও ক্ষারের সাহায্যে শোধন করা হলে তার মলিনতা চলে যায় ও সোনার যে স্বাভাবিক গুণ উজ্জ্বলতা তার প্রকাশ হয়, তেমনি মন ধ্যানের সহায়তায় সত্ত্ব , রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণরূপ মলিনতা ত্যাগ করে সৎস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁর জ্ঞান লাভ করে ও তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: মনকে কি করে শুদ্ধ করা যাবে সেই কথা বলছেন। সোনা পরিষ্কার করতে গেলে স্বর্ণশিল্পী কি করে? পাত্রে সোনার টুকরোটা রেখে তাতে একটু ক্ষার দেয়, তারপর তাপ দেয়। তাতে কি হয়? ক্ষারের জন্যে সোনার ওপরকার ময়লা সব পরিষ্কার হয়ে যায়। আমাদের মনকেও এরকমভাবে শুদ্ধ করতে হবে। বলছেন, 'যথা সুবর্ণং পটুপাক শোধিতং' যেমন সোনাকে ক্ষার আর তাপ দিয়ে শুদ্ধ করতে হয়, তেমনি মনটাকে শুদ্ধ করতে গেলেও প্রথমে বিচার করতে হয়। বিচার হচ্ছে ঐ ক্ষার। সৎ-অসৎ বিচার, নিত্য-অনিত্য বিচার, আত্মা-অনাত্মা বিচার। বিচারের পর অনাত্ম-বস্তু ত্যাগ করে আত্মায় মনোনিবেশ করতে হয়, আত্মার ধ্যান করতে হয়। এই ধ্যান হলো তাপ। ধ্যান মানে আর কি ? গভীর চিন্তা, অনুক্ষণ স্মরণ। বিচার করে মনের কামনা-বাসনা, স্বার্থচিন্তা, ঈর্ষা, এইসব যা-কিছু অবাঞ্ছিত তা দূর করে

দিয়েছি, আর ব্রহ্মচিন্তা করছি, ঈশ্বরচিন্তা করছি। আমার মন তাঁর ভাবে গলে যাচ্ছে। স্বামীজী বলছেন—এই যে ঈশ্বরচিন্তা, এটা যেন একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া। কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ এক জায়গায় রাখলে সেগুলি পালটে গিয়ে অন্য একটা পদার্থ হয়ে যায়। সেইরকম ঈশ্বরের ধ্যান করলে, গভীরভাবে তাঁর চিন্তা করলে মানুষ আপনা-আপনি পালটে যায়। তাঁর কথা ভাবার একটা বিশেষ ফলপ্রাপ্তি আছে, মনটা পালটে যায়। বলছেন, 'পটুপাক শোধিতং', সোনা যেমন ময়লাগুলোকে ফেলে দিয়ে তার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে পেয়ে যায় তেমনি মনও ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের চিন্তা করার ফলে মলিনতা ত্যাগ করে 'স্বাত্মগুণং সমৃচ্ছতি'—আত্মার স্বভাবসিদ্ধ যে গুণ তাই পেয়ে যায়। আমাদের ঈশ্বরলাভ করতে হবে মানে কি? তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আমি তাঁকে পেয়ে যাব? তা নয়। আমার মধ্যেই রয়েছেন তিনি, যেন লুকিয়ে আছেন। 'ত্যক্ত্বা মলং', মনের ময়লা পরিষ্কার করে ফেললে আমার মধ্যে তিনি 'স্বাত্মগুণম্', তাঁর নিজস্ব গুণ-সহ, উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবেন। আমরা যে জ্ঞানের কথা বলি, ঈশ্বরলাভের কথা বলি, এসব আমাদের ভেতরেই রয়েছে, তবে চাপা আছে, ঢাকা পড়ে আছে। ঢাকনিটা একবার সরিয়ে দিলেই তাঁর প্রকাশ হবে। 'তথা মনঃ সত্ত্বরজঃ তমঃ মলং', মন থেকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটে গুণ সরিয়ে ফেলতে হবে। গুণগুলি মনের ময়লা কেন? কারণ এগুলির জন্যেই আমাদের বন্ধন, ভববন্ধন। এইসব গুণের এক একটা প্রবল হলে আমাদের মনে এক এক রকম ভাব হয়। তমঃ গুণের জন্যে আমরা জড়বুদ্ধি হই, একটা আলস্য আসে যেটা সূক্ষ্ম জিনিস ধরতে পারার যে প্রয়াস তাকে দানা বাঁধতে দেয় না। অজ্ঞতা, মূঢ়তা, এইসব গুণ আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে। আর রজঃ গুণের প্রভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অহঙ্কার এইসব বৃত্তি আসে, মন অস্থির, চঞ্চল হয়ে থাকে। তমঃ গুণ মনের ওপর আবরণ ফেলেছে, ভালো-মন্দর বিচার করতে পারছি না তাই রজঃ গুণ কামনা, বাসনা, ক্রোধ, অহঙ্কার ইত্যাদি দিয়ে সংসারের সঙ্গে আমাকে বেঁধে ফেলেছে। আর সত্ত্বগুণ যদিও তমঃ আর রজঃ-র চেয়ে ভাল, তবুও বন্ধন। দয়া, পরোপকার—এগুলি সত্ত্বগুণের লক্ষণ। কিন্তু আমার লক্ষ্য আত্মজ্ঞান। তাই এসব যতই মহৎ গুণ হোক না কেন, বন্ধন। স্বামীজী বলছেন—সোনার শেকলও শেকল, এ দিয়ে বেঁধে ফেললেও বাঁধা পড়ে যাবে। আত্মজ্ঞান লাভ করতে গেলে ত্রিগুণাতীত হতে হবে। আমরা তা-ই হতে চাচ্ছি। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? 'ধ্যানেন সংত্যজ্য'। ধ্যানের দ্বারা এই গুণগুলোকে, মনের এই ময়লাগুলোকে 'সংত্যজ্য', ত্যাগ করে, 'সমেতি তত্ত্বম্'—আত্মতত্ত্বে একাকার হয়ে যেতে হবে। 'তৎ' মানে তিনি, তাঁর জ্ঞান—তত্ত্ব। বলছেন, 'সমেতি তত্ত্বম্'—মন তত্ত্বতে মিলে যাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ

বুদ্ধিও তা—শুদ্ধ আত্মাও তা। মন তত্ত্বতে মিলে গেল মানে 'শুদ্ধ আত্মা' হয়ে গেল। তাঁর কৃপা না হলে এই তত্ত্ব লাভ হয় না। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলছেন—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' (ক, ১।২।২৩), তিনি যাকে বরণ করেন, কৃপা করেন, সেই তাঁকে পেতে পারে। তাই বলে এই নয় যে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব তিনি কবে কৃপা করবেন সেই আশায়। আমাদের সর্বস্ব পণ করে চেষ্টা করতে হবে, তারপর তাঁর কৃপায় তাঁর জ্ঞান একদিন অন্তরে ফুটে উঠবে।

নিরন্তরাভ্যাসবশাৎ তদিত্থং পক্বং মনো ব্রহ্মণি লীয়তে যদা।
তদা সমাধিঃ সবিকল্পবর্জিতঃ স্বতোঽদ্বয়ানন্দরসানুভাবকঃ।।৩৬২

অন্বয়: যদা (যখন) তৎ মনঃ (সেই মন) ইত্থং (এই [আগে যা বলা হয়েছে] প্রকারে) নিরন্তর-অভ্যাসবশাৎ (নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তার ফলে) পক্বং (পরিণত, শুদ্ধ, তাঁর ভাবে রসস্থ [হয়ে]) ব্রহ্মণি লীয়তে (ব্রহ্মে লয় পায়) তদা (তখন) স্বতঃ (সহজেই) সবিকল্পবর্জিতঃ (নির্বিকল্প) অদ্বয়-আনন্দ-রস-অনুভাবকঃ (অদ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ রস অনুভব যুক্ত) সমাধিঃ (সমাধি [হয়])।

সরলার্থ: পূর্বোক্ত প্রকারে মন যখন সর্বদা ব্রহ্মচিন্তা অভ্যাস করার ফলে ব্রহ্মে লয় হয়ে যায়, তখন অদ্বিতীয় আনন্দরসের অনুভূতি-যুক্ত নির্বিকল্প সমাধি আপনিই হয়।

ব্যাখ্যা: সদা সর্বদা ব্রহ্মের চিন্তা করতে থাকলে সাধকের কিরকম অবস্থা হয় সেই কথা বলছেন। বলছেন : 'নিরন্তর-অভ্যাসবশাৎ'। নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা করছে। একবারে তো হয় না, বারবার চেষ্টা করতে হয়। মনটা ছুটে ছুটে পালিয়ে যায়, তাকে ধরে এনে ব্রহ্মে লাগাতে হয়। এই হলো অভ্যাস। অভ্যাসকে একটা যোগ বলছে গীতাতে—'অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা' (গী, ৮/৮)। নিরন্তর অভ্যাস করলে মন আর নড়বে না, ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে স্থির হয়ে থাকবে। 'নিরন্তর-অভ্যাসবশাৎ তদিত্থং পক্বং মনঃ'—সারাক্ষণ অভ্যাস করার ফলে মনটা পরিপক্ব হয়েছে, শুদ্ধ হয়েছে। সে তখন 'ব্রহ্মণি লীয়তে'—ব্রহ্মে লীন হয়ে আছে। ব্রহ্ম চিন্তাটাই মনের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এরকম যখন মনের স্বাভাবিক অবস্থা, 'তদা সমাধিঃ সবিকল্পবর্জিতঃ'—তখন সাধকের নির্বিকল্প সমাধি হয়। 'স্বতঃ'—সহজেই হয়। 'অদ্বয়-আনন্দরস-অনুভাবকঃ'—সমাধিতে সে অদ্বয় আনন্দরস অনুভব করে। আনন্দরস ভেতর থেকে উথলে উঠছে। সেই আনন্দের কোন দ্বিতীয় নেই।

সমাধিনাঽনেন সমস্ত বাসনাগ্রন্থের্বিনাশোঽখিলকর্মনাশঃ।
অন্তর্বহিঃ সর্বত এব সর্বদা স্বরূপবিস্ফূর্তিরযত্নতঃ স্যাৎ।। ৩৬৩

অন্বয়: অনেন সমাধিনা (এই নির্বিকল্প সমাধিদ্বারা) সমস্ত বাসনাগ্রন্থেঃ (সমস্ত বাসনাগ্রন্থির) বিনাশঃ (বিনাশ) অখিলকর্মনাশঃ (সমস্ত কর্মক্ষয়) সর্বতঃ এব (সর্বভাবে) সর্বদা (সব সময়ে) অন্তঃ বহিঃ (ভিতরে ও বাহিরে) স্বরূপবিস্ফূর্তিঃ (স্বরূপের প্রকাশ) অযত্নতঃ (বিনা যত্নে) স্যাৎ (ঘটে যায়)।

সরলার্থ: এই নির্বিকল্প সমাধির দ্বারা সমস্ত বাসনাগ্রন্থির বিনাশ ও সব রকম কর্মের নাশ হয়। তখন সর্বভাবে ও সর্বসময়ে ভিতরে ও বাহিরে স্বরূপের প্রকাশ বিনা প্রযত্নে ঘটে যায়।

ব্যাখ্যা: নির্বিকল্প সমাধি হলে কিরকম অবস্থা হয় সেটাই বলছেন। আমি ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হয়ে আছি। আস্তে আস্তে মনটা কেন্দ্রীভূত হয়ে এলো, দেহবোধ, বাহ্য অনুভূতি সব কোথায় চলে গেল। শুধু তিনি আছেন আর আমি আছি, আর আমার মন যেন একটা নিরন্তর নিশ্ছিদ্র ধারায় এই দুই সত্তাকে যুক্ত করে রেখেছে। তারপর সেই ধারাটাও লোপ পেয়ে গেল, মনই হারিয়ে গেল। তিনি আর আমি আর নেই। সব এক, আমিই তিনি, একাকার হয়ে গেছে। এই নির্বিকল্প সমাধি। 'সমাধিনা-অনেন-সমস্ত বাসনাগ্রন্থেঃ বিনাশঃ'—এই নির্বিকল্প সমাধির দ্বারা সমস্ত বাসনাগ্রন্থির বিনাশ হয়। আমার বাসনা কখন থাকে? যখন একটা অভাববোধ থাকে। ওর এটা আছে, আমার নেই, এটা পেতে হবে—এই বাসনার শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আমার যদি দুই দেখাটাই চলে যায়, তখন আর আমার পাওয়ার কি থাকতে পারে? সব এক দেখছি, কোনও বিকল্প নেই, তাই আমার বাসনা নেই। বলছেন, 'বাসনাগ্রন্থেঃ বিনাশঃ'; এই বাসনা যেন আমার মনের গাঁট, আমাকে সংসারে বেঁধে রাখে। আমার সব বিকল্প অনুভব চলে গেছে তাই বাসনাগ্রন্থিরও বিনাশ হয়ে গেছে। আর কিসের বিনাশ হয়েছে ? 'অখিলকর্মনাশঃ'—আমার সমস্ত কর্মের নাশ হয়েছে। আমার জন্মজন্মান্তরের যেসব কর্ম সঞ্চিত হয়ে ছিল সেগুলো সব বিনষ্ট হয়ে গেছে, আর ফল দিতে পারবে না। আর, আমার তো কোনও বাসনা নেই তাই কর্মের কোনও প্রয়াসও নেই, তাই নতুন কোন কর্মও হবে না। প্রারব্ধ কর্ম, সে ফল দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কারণ আমি তো সর্বত্র নিজেকে দেখছি। শুধু এক আমি, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, সমস্ত বৈচিত্রের মধ্যে সেই এক আমি। কাজেই, আমার আবার ভালো-মন্দ কি, সুখ-দুঃখ কি ! তাই প্রারব্ধও আমাকে বিচলিত করতে পারে না। 'অন্তর্বহিঃ সর্বত এব সর্বদা স্বরূপবিস্ফূর্তিরযত্নতঃ স্যাৎ'; অন্তরেও আমি বাইরেও আমি। আমি সর্বগত আবার সর্বাতীত। 'বিস্ফূর্তিঃ-অযত্নতঃ'—আমার কোন চেষ্টা ছাড়াই সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সর্বত্র, সর্বদা, সর্ব অবস্থায় প্রকাশিত হয়ে আছেন। এই অনুভবে ডুবে আছি, বিভোর হয়ে বসে আছি। আমার আর কিছু চাইবারও নেই পাওয়ারও নেই, করারও নেই। আত্মস্থ হয়ে বসে আছি।

শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি।
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্বিকল্পকম্॥ ৩৬৪

অন্বয়: শ্রুতেঃ (শ্রবণের থেকে) মননং (মননকে) শতগুণং (শতগুণ) মননাৎ অপি (মনন অপেক্ষা) নিদিধ্যাসং (ধ্যানকে) লক্ষগুণং (লক্ষগুণ) নির্বিকল্পকম্ (অন্তঃকরণের সঙ্কল্প বিকল্প রহিত অবস্থাকে) অনন্তং (অনন্তগুণ) বিদ্যাৎ ([বলে] জানতে হবে)।

সরলার্থ: ব্রহ্মবিষয় শ্রবণের থেকে সেইসব শ্রুতবাক্যের মনন অর্থাৎ মনে মনে বুঝে নেওয়া শতগুণে শ্রেয়। মননের থেকে ধ্যান লক্ষগুণ শ্রেয়। আর অন্তঃকরণের নির্বিকল্প অবস্থা অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি এসবের থেকে অনন্তগুণ শ্রেয় বলে জানতে হবে।

ব্যাখ্যা: বেদান্তের সাধনা বলতে এই তিনটি—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, চিত্ত নই, অহংকার নই। আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। বেদান্তের এই তত্ত্ব প্রথমে শাস্ত্র পড়ে বা গুরুর মুখ থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে হবে। তারপর তাঁরা যা বলেছেন সেই কথাগুলো মনের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে বিচার করে বুঝে নিতে হবে। এটা হচ্ছে মনন। তারপর সেগুলি ধ্যান করতে হবে—নিদিধ্যাসন। আমি যে স্বরূপত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব সচ্চিদানন্দ এই চিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে যেতে হবে। তারপর এই চিন্তায় মন যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে—আমি যে ধ্যান করছি, একটা যে ধ্যেয় বস্তু আছে আর এই যে ধ্যান চলছে—এসব একাকার হয়ে যাবে, মনের মধ্যে বিকল্পের আভাসমাত্রও থাকবে না, তখনকার সেই অবস্থাকে বলছেন 'নির্বিকল্পকম্'। বলছেন 'শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যাৎ-মননং'; গুরুর কাছে যা শ্রদ্ধাভরে শুনেছি মননের দ্বারা সেটা ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই বলছেন, শ্রবণের থেকে মনন শতগুণে শ্রেয় বলে বুঝতে হবে। 'মননাৎ-অপি নিদিধ্যাসং লক্ষগুণং'; যখন ধ্যান করছি তখন আমার মনে মননের দ্বারা যে ধারণা হয়েছিল তা দৃঢ়মূল হচ্ছে। তাই মননের থেকে নিদিধ্যাসন লক্ষগুণে শ্রেয়। কিন্তু 'অনন্তম্ নির্বিকল্পকম্'; যখন আমার কাছে ধ্যাতা ধ্যেয় ধ্যান এক হয়ে গেছে, সমস্ত বিকল্প চলে গিয়ে নির্বিকল্প সমাধি হচ্ছে তখন যে অবস্থা তা এসবের থেকে অনন্তগুণ শ্রেয়। সেটাই নিঃশ্রেয়স্—যার থেকে শ্রেয় আর কিছু নেই। বলছেন : এইটাই 'বিদ্যাৎ'—জানতে হবে। সেটাই জীবনের লক্ষ্য।

নির্বিকল্পকসমাধিনা স্ফুটং ব্রহ্মতত্ত্বমবগম্যতে ধ্রুবম্।
নান্যথা চলতয়া মনোগতেঃ প্রত্যয়ান্তরবিমিশ্রিতং ভবেৎ॥৩৬৫

অন্বয়: নির্বিকল্পকসমাধিনা (নির্বিকল্প সমাধির দ্বারা) স্ফুটং (স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠা) ব্রহ্মতত্ত্বম্ (ব্রহ্মতত্ত্ব) অবগম্যতে ধ্রুবম্ (নিশ্চয় অনুভবগম্য হয়) অন্যথা ন (অন্যভাবে

হয় না) মনোগতেঃ চলতয়া (মনের গতির চাঞ্চল্য হেতু) প্রত্যয়ান্তর বিমিশ্রিতং (অন্যবিষয়ে নিষ্ঠা স্বরূপনিষ্ঠায় মিশ্রিত) ভবেৎ (হয়ে থাকে)।

সরলার্থ: নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব নিশ্চয় অনুভবগম্য হয়। অন্য ভাবে হয় না। কারণ মনের চঞ্চল গতির জন্যে অন্য বিষয়ের চিন্তা স্বরূপচিন্তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা: বলছেন, নির্বিকল্প সমাধি হলে ব্রহ্মতত্ত্ব স্পষ্টভাবে অনুভব হয়। কারণ অন্তঃকরণ বিকল্পশূন্য হয়ে যায়। তা না হলে চঞ্চল মন অন্য সব বিষয়ের দিকে চলে যায়, মনে বৃত্তির সৃষ্টি হয়, স্বরূপচিন্তা আর অবিমিশ্র থাকে না। বলছেন, 'নির্বিকল্পক সমাধিনা স্ফুটং ব্রহ্মতত্ত্বম্ অবগম্যতে ধ্রুবম্'; নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব 'অবগম্যতে ধ্রুবম্', সন্দেহাতীতভাবে অনুভূত হয়। এই অনুভূতির মধ্যে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান এক হয়ে গেছে। এ জানা যে কিরকম জানা সেটা বুঝিয়ে বলা যায় না। যে জানছে, যা জানার বস্তু আর যা জানা হলো সব এক হয়ে গেছে। যে বুদ্ধি দিয়ে জানতে গেছি, সেটাই যা জানলাম তার মধ্যে হারিয়ে গেলো। ব্রহ্মকে জানতে গিয়ে ব্রহ্মই হয়ে গেছি। এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান। 'স্ফুটম্ ব্রহ্ম-তত্ত্বম্'—নির্বিকল্প সমাধিতে এই ব্রহ্মতত্ত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। 'ধ্রুবম্'—কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। 'করামলকবৎ' এই বোধ যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমি ব্রহ্ম। বলছেন, এই স্বরূপজ্ঞান 'ন অন্যথা'—অন্য কোনও ভাবে হয় না, নির্বিকল্প সমাধি ছাড়া হয় না। কেন হয় না? কারণ মন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তার স্বভাব যে চঞ্চলতা তাও আছে। 'চলতয়া মনোগতেঃ', মনের গতি বা চঞ্চলতার জন্যে। 'প্রত্যয়ান্তর বিমিশ্রিতং ভবেৎ'; অন্য বিষয়ের 'প্রত্যয়' বা চিন্তা আত্মচিন্তার সঙ্গে মিশে যায়। আত্মচিন্তা আর অবিমিশ্র থাকে না। মনকে একটা দীঘির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যে যে বিষয়ে আমার আকর্ষণ সেগুলো যেন দীঘির জলে এক একটা তরঙ্গ তুলছে। ফলে সেই তরঙ্গায়িত জলের তলাটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। সেখানে আমার আত্মা আছেন। ব্রহ্ম যিনি সর্বব্যাপী তিনিই অন্তঃস্থ হয়ে আমার মধ্যে আছেন। মন বৃত্তিশূন্য হলে নিস্তরঙ্গ জলরাশির তলাটা আমার গোচরে আসবে, তখন তাঁকে দেখতে পাব। নির্বিকল্প সমাধি হলে মন সম্পূর্ণরূপে বৃত্তিশূন্য হয়। দীঘির জলটা যেন তরঙ্গশূন্য হলো। আর শুধু তখনই 'ব্রহ্মতত্ত্বম্ অবগম্যতে ধ্রুবম্'। যতক্ষণ এ না হচ্ছে ততক্ষণ মনে চাঞ্চল্য আছে, তরঙ্গ আছে, পরমাত্মার দর্শন তখন আর অবিমিশ্র হয় না। অন্য বিষয় আমার বোধকে একমুখী থাকতে দেয় না। তাই বলছেন, 'চলতয়া মনোগতেঃ প্রত্যয়ান্তরবিমিশ্রিতং ভবেৎ'। চঞ্চল মন অন্য বিষয়ে চলে যায়, আমার আত্মচিন্তার সঙ্গে অন্য চিন্তা মিশে যায়। পরমাত্মার সংশয়াতীত দর্শন হতে পারে না।

অত: সমাধৎস্ব যতেন্দ্রিয়ঃ সন্ নিরন্তরং শান্তমনাঃ প্রতীচি।
বিধবংসয় ধ্বান্তমনাদ্যবিদ্যয়া কৃতং সদেকত্ববিলোকনেন॥৩৬৬

অন্বয় : অতঃ (অতএব) যতেন্দ্রিয়ঃ সন্ (ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে) শান্তমনাঃ (অচঞ্চল, শান্ত মনে) প্রতীচি (প্রত্যগাত্মায়) নিরন্তরং (সর্বদা) সমাধৎস্ব (সমাধিস্থ হও) সৎ-একত্ব বিলোকনেন (ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ,এই দর্শন দ্বারা) অনাদি-অবিদ্যয়াকৃতং (অনাদি-অবিদ্যাজাত) ধ্বান্তং (অজ্ঞানান্ধকার) বিধবংসয় (নাশ করো)।

সরলার্থ : অতএব জিতেন্দ্রিয় হয়ে মনকে অচঞ্চল ও শান্ত রেখে অন্তরাত্মায় সমাহিত হও। ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ এই দর্শন দ্বারা অনাদি অবিদ্যাজাত অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ করো।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'সমাধৎস্ব', সমাধিস্থ হও। সমাধি লাভ করতে গেলে কি করতে হবে? 'যতেন্দ্রিয়ঃ সন্ নিরন্তরং শান্তমনাঃ প্রতীচি'। ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে। শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই নয়, যে কোনও বিষয়ে যদি প্রতিষ্ঠা চাই,প্রথম সারির একজন হতে চাই তাহলে সংযম অভ্যাস করতে হয়। আর কি ? 'শান্তমনা' হতে হবে। মন অচঞ্চল, শান্ত থাকবে। আর তার জন্যে ইন্দ্রিয়দের আগে শান্ত করতে হবে। আমরা যে নির্জন জায়গায় বসে চোখ বুজে ধ্যান করি, বাইরের কোনও কিছু দেখব না বলে, কানে কোনও শব্দ এসে পাছে মনটাকে সেই দিকে টেনে নিয়ে যায়, সেইজন্যে। একটাই উপায়—কোনও রকমে ঠেলে ঠুলে জোর করে, দরকার হলে ভয় দেখিয়ে, মনটাকে ঈশ্বরমুখী করা। মনটাকে 'প্রতীচি' অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার মধ্যে টেনে নেওয়া। আমার মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন, যেটা আমার প্রত্যগাত্মা,আমার সাক্ষাৎ আমি, তার ওপর মনটাকে স্থাপন করতে পারলে আমি শান্ত। সংযম একদিনে হয় না, ধীরে ধীরে করতে হয়। কঠোপনিষদে আছে 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ'(ক,২।১।১), তিনি যেন আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী করে রেখেছেন। এই বহির্মুখী ইন্দ্রিয়দের অন্তর্মুখী করতে হবে, এদের জয় করতে হবে। তা যদি করতে পারি তাহলে আমার মন আপনিই শান্ত হয়ে যাবে। মন তখন যে প্রত্যগাত্মা, 'প্রতীচি', সেইখানে চুপ করে পড়ে থাকবে। প্রত্যগাত্মা মানে আমার যে 'আমি', ভুল করে যাকে আমি সকলের থেকে পৃথক ভাবছি। কিন্তু আসলে সে পরমাত্মা, ব্রহ্ম, সবার মধ্যে বিরাজ করছেন। বলছেন : 'সমাধৎস্ব যতেন্দ্রিয়ঃ সন্ নিরন্তরং শান্তমনাঃ প্রতীচি'—ইন্দ্রিয়কে সংযত করে, মনকে শান্ত করে নিরন্তর সেই পরমাত্মায় মনকে সমাহিত করে রাখতে হবে, যে পরমাত্মা আমার অন্তরে আছেন। তারপর বলছেন, 'বিধবংসয় ধ্বান্তমনাদি অবিদ্যয়া কৃতং'। 'ধ্বান্তং' মানে অন্ধকার, অজ্ঞানের অন্ধকার, অবিদ্যাকৃত অন্ধকার। বলছেন, একে 'বিধবংসয়'—ধ্বংস করো। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি 'তমসো

মা জ্যোতির্গময়' (বৃ, ১।৩।২৮), অন্ধকার থেকে আমায় আলোয় নিয়ে যাও। অন্ধকার মানে অজ্ঞান, অবিদ্যা। এর জন্যে আমরা ভুল করি, আমাদের স্বভাববিরোধী কাজ করি, নিজের ক্ষতি করি। এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে ধ্বংস করব কি করে ? আলো দিয়ে, জ্ঞানের আলো দিয়ে। আমিই পরমাত্মা—এই হলো জ্ঞান। বলছেন : 'সৎ-একত্ব-বিলোকনেন'। সৎ মানে সত্য, ব্রহ্ম, পরমাত্মা। সেই সৎ-এর সঙ্গে একত্ব, পরমাত্মার সঙ্গে তোমার আত্মার একত্ব, সেটা 'বিলোকনেন' অর্থাৎ দেখে, অনুভব করে অজ্ঞান দূর করো। এই যে আমাদের পৃথক পৃথক আমিত্ব বোধ সেই আমিই সর্বত্র আছে। এক একটি পৃথক সত্তা যেন এক একটি ফুল, আত্মা যেন সেই ফুলগুলি সূত্র আকারে গেঁথে দিয়েছেন—সূত্রাত্মা। এক আমি সবার মধ্যে আছি, যখন আলাদা মনে করছি তখন প্রত্যগাত্মা আর যখন সবাইকার মধ্যে নিজেকে দেখছি তখন পরমাত্মা। আমার দেহ মন বুদ্ধি এসব কিছু নয়। এ যেন আত্মার ওপর একটা আবরণ। আমার প্রকৃত স্বরূপ ঐ আত্মা, তিনি গুহাহিত, আমার হৃদয়গুহায় নিহিত হয়ে আছেন। আমার আমিত্বরূপ অভিমান আমায় খণ্ডিত করেছে, সেটা চলে গেলে সব এক হয়ে যাবে, অখণ্ড। এই খণ্ডিত 'আমি'-ই অবিদ্যা, অন্ধকারস্বরূপ, মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একে ধ্বংস করতে হবে। তাঁকে এক বলে জেনে তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে হবে—'সৎ-একত্ব-বিলোকনেন'।

যোগস্য প্রথমং দ্বারং বাঙ্নিরোধোঽপরিগ্রহঃ।
নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা॥ ৩৬৭

অন্বয় : বাঙ্নিরোধঃ (বাক্‌সংযম) যোগস্য (চিত্তবৃত্তি নিরোধের) প্রথমং দ্বারং (প্রথম সাধন) [অন্যান্য সাধন] অপরিগ্রহঃ (বিষয়ের অগ্রহণ, অসঞ্চয়) নিরাশা (আশা ত্যাগ) চ নিরীহা (ও চেষ্টা ত্যাগ) চ (এবং) নিত্যম্ একান্তশীলতা (সর্বদা নির্জনতা প্রিয়তা)।

সরলার্থ : যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রথম সোপান বাক্‌সংযম। অন্যান্য সংযম হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর অগ্রহণ ও অসঞ্চয়, আশা ত্যাগ, চেষ্টা ত্যাগ ও নির্জনবাস।

ব্যাখ্যা : এখানে যোগের কথা হচ্ছে। বলছেন, 'যোগস্য প্রথমং দ্বারং বাঙ্নিরোধঃ'; যোগের পথে প্রথম পদক্ষেপ হলো বাক্‌সংযম। এর মানে একদিন মৌন হয়ে রইলাম তারপর শুধু কথা বলে যাচ্ছি, তা নয়। বাক্‌সংযম মানে অনর্থক কথা বলব না। অকারণে কথা বললেই অবান্তর কথা এসে যাবে আবার তার মধ্যে মিথ্যাও এসে যাবে, সচেতনভাবে হোক বা অচেতনভাবে হোক। বাক্‌নিরোধ করব, যা বলব চিন্তা করে ওজন করে বলব। তার গুরুত্ব থাকবে, লোকে অবজ্ঞা করতে পারবে না। আবার

একটা সংযম হলে অন্য সংযমও সহজ হয়ে যায়। কেউ হয়তো খাওয়ার ব্যাপারে সংযম করতে পারছেন না, বেশী খেয়ে ফেলেন। তিনি যদি বাক্‌সংযম করতে পারেন তাহলে ইচ্ছে করলে আহারেরও সংযম করতে পারবেন। তাই বলা হচ্ছে, 'যোগস্য প্রথমং দ্বারং বাঙ্নিরোধঃ'। তারপর বলছেন—'অপরিগ্রহঃ'। তার মানে যা আমার প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করব, বেশী নেবো না। প্রয়োজনের বেশী নিয়ে সঞ্চয় করছি, এরকম নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা দেখি, একটা ফতুয়ার দরকার হয়েছে, মাস্টারমশায়কে বলেছেন একটা দিতে। মাস্টারমশায় ভেবেছেন একটায় কি হবে, দুটো এনেছেন। ঠাকুর নিলেন না, একটা ফিরিয়ে দিলেন। পাখীর মতো, পাখী কখনও সঞ্চয় করে না, যা খাবে সেটা খেয়ে নেয় কিন্তু সঞ্চয় করে না। শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরকম ছিলেন। নহবতখানায় শ্রীমা সারদাদেবীর কাছ থেকে একটু মুখশুদ্ধি নিয়ে মুখে দিয়েছেন। শ্রীমা আর একটু মুখশুদ্ধি মোড়ক করে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ যে ঐটুকু সঞ্চয় হয়ে গেছে—ঘরে আসবার পথ ঠিক করতে পারছেন না। নহবতখানা থেকে তাঁর ঘর কতটুকু পথ—কিন্তু ভুল করে গঙ্গার দিকে চলে যাচ্ছেন। জগদম্বার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতেন তো, তাই তিনি তাঁকে একটুও বেচাল হতে দেবেন না। শ্রীমা সব দেখে হৃদয়কে পাঠালেন। হৃদয় গিয়ে ঐ মুখশুদ্ধির মোড়কটা হাত থেকে ফেলে দিল, তবে শান্তি। তখন তিনি নিজের ঘরে ঠিক ঠিক ফিরে গেলেন। এ হচ্ছে অপরিগ্রহের একেবারে সর্বোচ্চ উদাহরণ। আমার যতটুকু দরকার ততটুকুই গ্রহণ করব, সঞ্চয় করব না, কেউ দিচ্ছে বলেই আমি কেন নেব ? তারপর 'নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যম্ একান্তশীলতা'। 'নিরাশা', আশা করো না। কাজ করে যাও, যা হবে তা হবে, কিছু আশা করো না। আমরা তো সব সময় আশা করছি, কত কি হবে ভাবছি, জেগে স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু হয় না তো, তাই নিরাশা। একটা কথা আছে : আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং হি পরমং সুখং। গীতায় বলা হচ্ছে, কাজ করে যাও, ফলের কথা ভেব না। কাজ করার কথা কাজ করতে পারি, ফলের কথা জানি না। কত ওলট-পালট হয়ে যায়, মায়া অঘটনঘটনপটীয়সী—যা ঘটবার নয় তাই ঘটে যায়। তারপর 'নিরীহা'—কোনও ঈহা নেই, চেষ্টা নেই। আমাদের সব সময় ইচ্ছে এটা চাই ওটা চাই, আর তার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছি, একবারও স্থির হতে পারি না। এরকম নয়। যোগী অজগরবৃত্তি অবলম্বন করবেন। অজগরবৃত্তি কি রকম ? অজগর সাপ চুপ করে পড়ে আছে, কাঠের মতো—হরিণ হয়তো একটা কাঠ ভেবে কাছে এসেছে, অমনি জাপটে ধরেছে। ছুটে গিয়ে যে তাকে ধরবে তা নয়, নিজের থেকে কোনও চেষ্টা নেই, যেমন আসে—'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ'। তারপর বলছেন, 'নিত্যম্ একান্তশীলতা'—নির্জনতা-প্রিয়তা। সব সময় যদি লোকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে থাকি তাহলে অকারণে কত কথা হয়, মন চঞ্চল হয়। তাই একান্ত-প্রিয়তা চাই, মনটাকে এমনভাবে তৈরী করেছি যে, একা

থাকতে ভালো লাগে। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, বহুর মধ্যে আছি কিন্তু মনটাকে ভেতরে টেনে নিয়েছি—যা কিছু হচ্ছে আমাকে স্পর্শ করছে না। এটাই উদ্দেশ্য। সমাজে থাকলে কি সব সময় একা থাকা যায় ? তা হয় না। কিন্তু নির্জনবাসের দরকার আছে। নির্জন জায়গায় একা থাকলে মনটা ঈশ্বরের দিকে দেওয়া সহজ হয়। লোক থাকলে তখন কথা হবে, আবার নিজেরও কথা বলার ঝোঁক হবে, এমনি করে মনটা ছড়িয়ে যায়। তাই বলছেন, যোগ অভ্যাস করতে হলে প্রথমে দরকার 'বাঙ্‌নিরোধঃ'—বাক্‌সংযম; দ্বিতীয় 'অপরিগ্রহঃ'—অনর্থক সঞ্চয় নয়, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ; তারপর 'নিরাশা'—কিছু আশা করি না; 'নিরীহা'—চেষ্টা করি না, যা সহজলভ্য তাই নিচ্ছি; তারপর 'নিত্যম্‌-একান্তশীলতা'—সর্বদা একান্তে থাকার ইচ্ছা। এইগুলি হচ্ছে যোগ-অভ্যাসের প্রয়োজনীয় সোপান।

একান্তস্থিতিরিন্দ্রিয়োপরমণে হেতুর্দমশ্চেতসঃ
সংরোধে করণং শমেন বিলয়ং যায়াদহংবাসনা।
তেনানন্দরসানুভূতিরচলা ব্রাহ্মী সদা যোগিনঃ
তস্মাচ্চিত্তনিরোধ এব সততং কার্যঃ প্রযত্নো মুনেঃ ॥৩৬৮

অন্বয় : ইন্দ্রিয়-উপরমণে (ইন্দ্রিয় সংযমে) একান্তস্থিতিঃ (নির্জনবাস) হেতুঃ (উপায়) দমঃ (বহিরিন্দ্রিয় সংযম) চেতসঃ সংরোধে (চিত্তসংযমের) করণম্‌ (সাধন) শমেন (অন্তরিন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা) অহংবাসনা বিলয়ং যায়াৎ (অহংবাসনা নাশপ্রাপ্ত হয়) তেন (বাসনার বিলয়ের হেতু) যোগিনঃ (যোগীর) সদা (সর্বদা) অচলা ব্রাহ্মী আনন্দরসানুভূতিঃ (নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ রসের অনুভূতি হয়) তস্মাৎ (এই কারণে) মুনেঃ (যিনি মননশীল তাঁর পক্ষে) চিত্তনিরোধ সততং এব প্রযত্নঃ কার্যঃ (চিত্তনিরোধের জন্যে সর্বদা প্রযত্ন করা কর্তব্য)।

সরলার্থ : একান্তবাস ইন্দ্রিয়-সংযমের সহায়ক। দম অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় সংযম চিত্তদমনের উপায়। শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা অহংবাসনার লয় হয়। বাসনা বিনষ্ট হলে সাধকের সর্বদা ব্রহ্মানন্দরস অনুভূতিতে অচলা স্থিতি লাভ হয়। এইজন্যে যিনি মননশীল তাঁর পক্ষে সর্বদা চিত্তনিরোধের জন্য যত্নশীল হওয়া কর্তব্য।

ব্যাখ্যা : আগের কথার জের টেনে বলছেন, যদি নির্জনে থাক আর যদি তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে শান্ত হয়ে যাও তাহলে তুমি যোগী। এই যে 'সংরোধ' করা, নিরোধ করা, এই হচ্ছে যোগ। আমিকে কেন্দ্র করে কত সাম্রাজ্য গড়ছি আমরা। শাস্ত্র বলছেন, সাম্রাজ্য গড়ছ না গুটিপোকার লালার মতো নিজের বাসনা দিয়ে গুটি তৈরী করে তাতে বদ্ধ হয়ে আছ ? এখানে বলছেন, নির্জনবাস

করলে ধাপে ধাপে তোমার সব সংযম সহজ হয়ে আসবে। আর সংযম হলে ওই বাসনার গুটি কেটে তুমি বেরিয়ে আসতে পারবে। 'একান্তস্থিতিঃ ইন্দ্রিয়-উপরমণে হেতুঃ'—একান্তে বাস, নির্জনে বাস করলে সেটা ইন্দ্রিয়-দমনের হেতু হয়। 'উপরমণ'—উপরতি, ভিতরে টেনে নেওয়া। আমাদের চোখ কান সব ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখী, তারা ছুটে বেড়াচ্ছে, এদের থামানো মানে সব মনের ভিতরে ঢুকিয়ে নেওয়া। এই হচ্ছে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম, যেটাকে 'দম' বলা হয়। নির্জনবাস করলে বাহ্য ইন্দ্রিয় দমন সহজ হয়। তারপর বলছেন : 'দমঃ চেতসঃ সংরোধে করণম্‌'। 'চেতসঃ সংরোধ' মানে অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম, 'দম' অন্তরিন্দ্রিয় সংযমের 'করণ' অর্থাৎ সাধন। নির্জনবাস করলে 'দম' আয়ত্তে আসে আর 'দম' সাধনা করার ফলে অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম হয়, 'শম' আয়ত্তে আসে। আর অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম যখন পুরোপুরি হয় তখন কি হয় ? 'শমেন বিলয়ং যায়াৎ অহংবাসনা'—শমের দ্বারা অহংবাসনার বিলয় হয়ে যায়। আমার ক্ষুদ্র 'আমি'র জন্যে আমার যে অজস্র বাসনা, সেই বাসনা চলে যায়। সন্তোষ লাভ হয়। তখন কি হয় ? ব্রাহ্মীস্থিতি। ব্রহ্মে অবস্থান, স্বরূপে অবস্থান। 'তেন আনন্দরসানুভূতি অচলা ব্রাহ্মী সদা যোগিনঃ'—যোগী তখন নিরন্তর ব্রহ্মানন্দরসের অনুভূতি লাভ করেন। যোগী অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে যিনি যুক্ত, যিনি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেছেন। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে আনন্দ সে আনন্দ ক্ষণিক। কিন্তু এই আনন্দরসের অনুভূতি 'অচলা'—নিরন্তর, সব সময় আছে, কোনও ছেদ নেই। যোগী ব্রহ্মে স্থিত, তাই তিনি আনন্দরসের অনুভূতিতে সর্বদা অচল হয়ে থাকেন। 'তস্মাৎ চিত্তনিরোধে এব সততং কার্যঃ প্রযত্নো মুনেঃ'। তাই যিনি 'মুনি' অর্থাৎ মননশীল, জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে যাঁর স্পষ্ট ধারণা রয়েছে, তাঁর সব সময় কি কর্তব্য হবে ? 'চিত্তনিরোধ এব সততং কার্যঃ'—চিত্ত নিরোধ করাই সব সময়ের কর্তব্য হবে। মনকে নিরুদ্ধ করতে হবে। আমাদের তো মনের সঙ্গেই যত বিবাদ, একে বশে আনতে পারি না। সেই চেষ্টা করতে বলছেন। তা যদি করি, সব বাসনার নাশ হবে। বাসনার নাশ হলে ভেতরে যে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা আছেন, তিনি প্রকাশিত হবেন। তখন নিত্য আনন্দরসে আমি ডুবে থাকব।

বাচং নিযচ্ছাত্মনি তং নিযচ্ছ বুদ্ধৌ ধিয়ং যচ্ছ চ বুদ্ধিসাক্ষিণি।
তং চাপি পূর্ণাত্মনি নির্বিকল্পে বিলাপ্য শান্তিং পরমাং ভজস্ব ॥৩৬৯

অন্বয় : বাচং (বাক্যকে অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে) আত্মনি (মনে) নিযচ্ছ (সমর্পণ করো) তং (মনকে) বুদ্ধৌ (বুদ্ধিতে) নিযচ্ছ (অর্পণ করো) ধিয়ং চ (বুদ্ধিকেও) বুদ্ধিসাক্ষিণি (প্রত্যগাত্মায়) যচ্ছ (লয় করো) তং চ অপি (প্রত্যগাত্মভাবকেও) নির্বিকল্পে পূর্ণাত্মনি বিলাপ্য (নির্বিকল্প পরমাত্মায় বিলীন করে) পরমাং শান্তিং ভজস্ব (পরম শান্তি লাভ করো)।

সরলার্থ : সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তাদের নিয়ন্তা মনে সমর্পণ করো। মনকে তার চালক বুদ্ধিতে অর্পণ করো। বুদ্ধিকে সাক্ষিস্বরূপ প্রত্যগাত্মায় লয় করো। সেই প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মাকে নির্বিকল্প পূর্ণ-আত্মা বা পরমাত্মায় বিলীন করে পরম শান্তি লাভ করো।

ব্যাখ্যা : বলছেন , 'বাচং-নিযচ্ছ-আত্মনি'—এখানে 'আত্মনি' মানে মনে, আত্মায় নয় আর 'বাচং' মানে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়। বলছেন, সব ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মায় অর্থাৎ মনে 'নিযচ্ছ'—সমর্পণ করো। মানে ভিতরে টেনে নেওয়া। চোখ আছে দেখবে না, কান আছে শুনবে না, বাক্ আছে কথা বলবে না, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি গুটিয়ে আনো, 'আত্মনি নিযচ্ছ'—আত্মায় অর্থাৎ মনে রেখে দাও। মন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে চালাচ্ছে—কথা বলাচ্ছে, চোখ দিয়ে দেখাচ্ছে, কান দিয়ে শোনাচ্ছে। মনকে বলা হয় অন্তরিন্দ্রিয়। আর চোখ, কান এইসব বহিরিন্দ্রিয়। আমাদের দশটা ইন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু—এইগুলি কর্মেন্দ্রিয়, যা দিয়ে কাজ করি। আর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়, যা দিয়ে বাইরের জগতের জ্ঞান হয়। মন এদের সব চালাচ্ছে। আবার বুদ্ধি মনকে চালাচ্ছে। বলছেন, 'তং নিযচ্ছ বুদ্ধৌ'—'তং' মানে তাকে অর্থাৎ মনকে। মনকে বুদ্ধিতে দিয়ে দাও। স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাচ্ছেন। আমরা তো মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত। মন মত্ত করী—পাগলা হাতি, সব সময় ছটফট করছে। মাহুত হাতিকে চালায়, কিন্তু পাগলা হাতি হয়তো মাহুতকেই মেরে বসল। মন এইরকম। আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়। মনকে আবার বলা হয়, মর্কটবৎ—বাঁদরের মতো ছটফট করছে, এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, কোনও কারণ নেই। বলছেন, মনকে বুদ্ধিতে দিয়ে দাও। কেন বলছেন? কারণ বুদ্ধি মনকে শাসন করে, তাকে চালায়। তারপর বলছেন : 'ধিয়ং যচ্ছ চ বুদ্ধিসাক্ষিণি', সেই বুদ্ধিকে আবার প্রত্যগাত্মা, জীবাত্মাতে দিয়ে দাও। আত্মাই তো মূল, তিনি সাক্ষিস্বরূপ রয়েছেন, তিনি আছেন বলেই তাঁর আলোকে বুদ্ধি আলোকিত হচ্ছে। আত্মা হচ্ছেন সাক্ষী। তাঁকে দেখতে পাই না। চুপ করে আছেন। আত্মা আছেন বলেই সবকিছু চলছে। সবার ওপরে আত্মা, বুদ্ধি তাঁর অধীন, মন বুদ্ধির অধীন আর ইন্দ্রিয়রা মনের অধীন। বলছেন, সব দিয়ে দাও। যেন হোম করছি, ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সব যেন এক এক করে আহুতি দিয়ে যাচ্ছি। ইন্দ্রিয়কে মনে আহুতি দিচ্ছি, মনকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মায়, তারপর জীবাত্মাকেও পরমাত্মায় আহুতি দিয়ে দিলাম। আমিটা মুছে গেলো একেবারে, আর আমিত্বের কোনও বোধ নেই, এই হচ্ছে নির্বিকল্প সমাধি। কিরকম বলছেন, 'তং চাপি পূর্ণ-আত্মনি' ! আমার যে একটা প্রত্যগাত্মা আছে, আমি 'জীব' বলে আমার যে একটা আলাদা অহংবোধ আছে, তাকেও দিয়ে দাও; কোথায় ? 'পূর্ণ আত্মনি'—যিনি সকলের আত্মা তাঁকে দিয়ে দাও। একটা ঘট ছিল, ঘটের মধ্যে আকাশ আছে, ঘটটাকে ভেঙে ফেললে, ঘটের মধ্যে যে আকাশ সেটা বাইরের আকাশে মিশে

গেলো—ঘটাকাশ মহাকাশ হয়ে গেলো। একটা জলবিন্দু তার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, সমুদ্রে যখন মিশে গেলো তখন তার স্বাতন্ত্র্য চলে গেলো, পৃথক সত্তা আর থাকলো না। এই হলো সমাধি। আমার 'আমি' বড় আমিতে ডুবে গেলো। বিন্দু সিন্ধুতে মিশে গেলো। 'পূর্ণ-আত্মনি নির্বিকল্পে বিলাপ্য', আমি এক হয়ে গেলাম। পূর্ণ-আত্মায়, পরমাত্মায় মিশে গেলাম। আর বিকল্প নেই, নির্বিকল্প। 'বিলাপ্য' মানে লয় করে দিয়ে; আমার আমিত্বের লয় হয়ে গেলো। তখন 'ভজস্ব পরমাং শান্তিং'—পরম শান্তি লাভ কর। আলাদা হলেই তো অশান্তি, দ্বন্দ্ব। এক হয়ে গেলে শান্তি। দুই থাকলেই যেমন ভালোবাসা আছে, ঘৃণাও আছে। কিন্তু যেখানে নির্বিকল্প, যেখানে কোনও বিকল্প নেই, শুধু এক, সেখানে পরম শান্তি। তাই বলছেন, 'ভজস্ব পরমাং শান্তিং'।

দেহপ্রাণেন্দ্রিয়মনো-বুদ্ধ্যাদিভিরুপাধিভিঃ।
যৈর্যৈর্বৃত্তেঃ সমাযোগস্তৎতদ্ ভাবোঽস্য যোগিনঃ ॥ ৩৭০
তন্নিবৃত্ত্যা মুনেঃ সম্যক্ সর্বোপরমণং সুখম্।
সংদৃশ্যতে সদানন্দরসানুভববিপ্লবঃ ॥ ৩৭১

অন্বয় : দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধি-আদিভিঃ-উপাধিভিঃ (দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধিসমূহের) যৈঃ-যৈঃ (যেটির যেটির সঙ্গে) যোগিনঃ বৃত্তেঃ সমাযোগঃ (যোগীর চিত্তবৃত্তির সংযোগ হয়) অস্য (এই সাধকের) তৎ-তৎ ভাবঃ (সেই সেই ভাব হয়) তৎ-নিবৃত্ত্যা (সেই দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সংযোগের নিবৃত্তির দ্বারা) মুনেঃ (সাধকের) সম্যক্-সর্ব-উপরমণম্ (সর্বপ্রকার বাহ্যবিষয় থেকে সম্যক্ উপরতি) সুখং সংদৃশ্যতে (সুখপ্রাপ্তি ঘটায়) [আর] সদা-আনন্দরস-অনুভববিপ্লবঃ (সদা আনন্দরস অনুভূতির প্লাবন [হতে থাকে])।

সরলার্থ : দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি যে-যে উপাধিগুলির সঙ্গে যোগীর চিত্তবৃত্তির সংযোগ হয়, সাধকের সেই-সেই ভাব হয়। এই দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সংযোগের নিবৃত্তি হলে সাধকের বাহ্যবিষয় থেকে সর্বপ্রকারে উপরতি হয় ও সুখ লাভ হয়। তখন তাঁর মধ্যে সর্বদা আনন্দরসের প্লাবন অনুভূত হতে থাকে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, এই দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এগুলি আমাদের উপাধি। কিন্তু আমি আত্মা আর সেই আত্মা নিরুপাধিক, অর্থাৎ কোনও উপাধি নেই তাঁর। দেহ, মন, বুদ্ধি, এইসব উপাধি আত্মাকে আচ্ছন্ন করেছে বলে আমি সেই আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। যতই উপাধি বাড়ছে ততই আমি পৃথক হয়ে যাচ্ছি। এই উপাধিগুলি একটা আর একটা থেকে এসেছে, যেটাকে কারণ বলছি সেটাই কার্য হয়ে যাচ্ছে। এদের 'নেতি নেতি' করে ত্যাগ করে যাব শেষ পর্যন্ত, যখন শুধু আত্মাই থাকবেন।

এখানে বলছেন, 'দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধি-আদিভিঃ-উপাধিভিঃ-যৈঃ-যৈঃ-বৃত্তেঃ সমাযোগঃ-তৎ-তৎ-ভাবঃ-অস্য যোগিনঃ'; প্রতিটি উপাধির আলাদা ধর্ম আছে। একেকটা উপাধির সঙ্গে সংযোগ হচ্ছে আর যোগীর চিত্তবৃত্তি সেই উপাধির ধর্ম নিয়ে নিচ্ছে। তাই দেহকে কেন্দ্র করে, মনকে কেন্দ্র করে, বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে যোগীর চিত্তবৃত্তি পালটে পালটে যাচ্ছে। আমার কিরকম স্বাস্থ্য, আমি কিরকম বড়লোক, কি রকম বিদ্বান, আমার কত মান-মর্যাদা, এইসব ভাব সব সময় আমাদের মধ্যে জাগে। মনকে কেন্দ্র করে, বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে, এক-একটা গুণকে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে এইসব নানা ভাব ওঠে। কিন্তু আমি দেহ-মন-বুদ্ধি থেকে আলাদা। এগুলি সব জড়, কি করে যেন আমার গায়ে এসে পড়েছে। এই উপাধিগুলোর 'যৈঃ-যৈঃ-বৃত্তেঃ সমাযোগঃ'—যে যেগুলির সঙ্গে চিত্তবৃত্তির সংযোগ হচ্ছে, সেই-সেই ভাব আমাদের মনে বিক্ষেপ আনছে। বলছেন, 'তৎ-তৎ-ভাবঃ-অস্য যোগিনঃ'—সেই সেই উপাধির ভাব সাধকের মধ্যে এসে যাচ্ছে। সাধক তখন কি করেন ? এই উপাধি থেকে আসা ভাবগুলো নিবৃত্তি করেন। বলছেন, 'তৎ নিবৃত্ত্যা'। যে কারণে সাধকের মনে নানারকম বৃত্তি দেখা দেয়, সেই কারণটাকে তিনি নিবৃত্ত করেন, নিবারণ করেন। কোন্ কারণটা ? দেহ-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধির সঙ্গে জড়ানোর জন্যেই সাধকের মনে নানা বৃত্তি ওঠে। তিনি আর ওগুলির সঙ্গে নিজেকে জড়ান না। দেহ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখেন। এই মন বুদ্ধি আমাকে যা প্রেয় তার দিকে টানছে, তাই এদের বিদায় দিয়েছি, বিসর্জন দিয়েছি, আত্মায় ডুবিয়ে দিয়েছি—এই নিবৃত্তি। যোগী তাই করেন। তার ফলে বাইরের আপাতমধুর জিনিস তাঁকে আর বিচলিত করতে পারে না। 'তৎ-নিবৃত্ত্যা মুনেঃ সম্যক্-সর্ব-উপরমণম্'—সাধক তখন বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ উপরত করে নিয়েছেন, গুটিয়ে নিয়েছেন। আর এই যে নিজের আর বাইরের জগতের মধ্যে তিনি একেবারে একটা দেয়াল তুলে দিয়েছেন, তার ফলে তাঁর কি হয় ? 'সুখং সংদৃশ্যতে'—সুখ লাভ হয়। সে সুখের কোন শেষ নেই। 'সদা-আনন্দরস-অনুভব-বিপ্লবঃ'—সর্বদা আনন্দরসের অনুভূতি হতে থাকে তাঁর। তিনি অনুভব করেন, সব সময় যেন তাঁর মধ্যে আনন্দরসের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে।

অন্তস্ত্যাগো বহিস্ত্যাগো বিরক্তস্যৈব যুজ্যতে।
ত্যজত্যন্তর্বহিঃ সঙ্গং বিরক্তস্তু মুমুক্ষয়া।। ৩৭২

অন্বয় : বিরক্তস্য-এব (বৈরাগ্যবান ব্যক্তির পক্ষেই) অন্তঃ-ত্যাগঃ (মনের বাসনা ত্যাগ) বহিঃ-ত্যাগঃ (বাহ্যিকভাবে ভোগের সামগ্রী ত্যাগ) যুজ্যতে (সম্ভব হয়) বিরক্তঃ-তু (বৈরাগ্যবান ব্যক্তি অবশ্যই) মুমুক্ষয়া (মুক্তিকামী হয়ে) অন্তঃ-বহিঃ-সঙ্গং (অন্তরে ও বাহিরে ভোগ্যবস্তুর সংস্রব) ত্যজতি (ত্যাগ করেন)।

সরলার্থ : যিনি বৈরাগ্যবান তাঁর পক্ষেই মনের বাসনা ত্যাগ ও বাহ্যিকভাবে ভোগ্যবস্তু ত্যাগ সম্ভব হয়। বিষয়ে যাঁর বিরাগ, তিনি মুক্তিকামনার জন্যেই অন্তরে ও বাইরে ভোগের সামগ্রীর সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অন্তঃ-ত্যাগঃ'—অন্তরে ত্যাগ, মানে মনের বাসনা ত্যাগ। আর 'বহিঃ ত্যাগঃ'—বাইরের ভোগ্যবস্তু ত্যাগ, যেসব ভোগের সামগ্রী আমায় আকর্ষণ করে সেগুলি ত্যাগ। আসলে মনের ত্যাগই ত্যাগ, বাইরের ত্যাগ করলে ভালো, কিন্তু মনের ত্যাগ না হলে হবে না। তারপর বলছেন, 'বিরক্তস্যৈব যুজ্যতে'। 'বিরক্তঃ'—বৈরাগ্যবান; 'রাগ' মানে অনুরাগ, 'বি' মানে বিনা। সব জিনিসের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ, এ যাঁর হয়েছে তিনি 'বিরক্ত'। 'বিরক্তস্যৈব যুজ্যতে'—যিনি বৈরাগ্যবান, বিরক্ত, তিনিই এই মনের ত্যাগ ও বাইরের ত্যাগ করতে পারেন। তারপর, 'ত্যজতি অন্তর্বহিঃ সঙ্গং'—'সঙ্গং' মানে সংযোগ বা সংস্রব। বিষয় সংস্রব, বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা, এটা মন থেকে ত্যাগ আর বাইরে থেকে ত্যাগ, এ দুটোই কে করেন ? না 'বিরক্তস্তু মুমুক্ষয়া', যিনি বৈরাগ্যবান তিনি মুক্তিলাভের জন্যে এ দুটো ত্যাগ করেন। তাই জন্যে বলে 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশু' (কৈ, ২)। মনের ত্যাগই ত্যাগ, মন থেকে আসক্তি না গেলে বাইরের ত্যাগে কিছু এসে যায় না। এমন অনেক সাধু আছেন যাঁরা শুধু কৌপীন পরে থাকেন, যা কিছু দান, করতলে গ্রহণ করেন, হাত পেতে করতলে ভিক্ষা নেন। শঙ্করাচার্য বলছেন 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ'। কিন্তু মনের ত্যাগই হচ্ছে আসল। তবে, ভোগ্যবস্তুর থেকে দূরে থাকলে ধীরে ধীরে মনের আসক্তি কমে আসে। যিনি এই জন্মেই মুক্তিলাভ করতে চান তাঁকে দুটোই করতে হবে। মনের আসক্তি দূর করতে হবে, বাইরেও ভোগ্যবস্তু থেকে দূরে থাকতে হবে। ভারতবর্ষ ত্যাগের দেশ, ঋষির দেশ, সন্ন্যাসীর দেশ। সন্ন্যাসীরা অনেক সময় ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ভিক্ষান্ন শুদ্ধ অন্ন। ত্যাগ এদেশের আদর্শ—সব সময় ত্যাগ, ঈশ্বরের জন্যে, পরের জন্যে, সকলের জন্যে। শঙ্করাচার্য বলছেন, ঈশ্বরার্থে মানেই পরার্থে, সকলের অর্থে। 'বিরক্তস্তু মুমুক্ষয়া', যিনি বৈরাগ্যবান, যিনি মুক্তি চান, তাঁকে ত্যাগ করতেই হবে।

বহিস্তু বিষয়ৈঃ সঙ্গং তথান্তরহমাদিভিঃ।
বিরক্ত এব শক্নোতি ত্যক্তুং ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ।।৩৭৩

অন্বয় : ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ বিরক্তঃ এব (ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈরাগ্যবান ব্যক্তিই কেবল) বহিঃ-তু বিষয়ৈঃ (বাহ্যবিষয়গুলির সঙ্গে) তথা (আর) অন্তঃ-অহম্-আদিভিঃ (অহঙ্কার ইত্যাদি অন্তরধর্মের সঙ্গে) সঙ্গং ত্যক্তুং শক্নোতি (সংস্রব ত্যাগ করতে সমর্থ হন)।

সরলার্থ : কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈরাগ্যবান ব্যক্তিই বাহ্যবিষয় ও অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি মনের সব ধর্মের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করতে সমর্থ হন।

ব্যাখ্যা : এখানে বোঝাতে চাইছেন, বাইরের জিনিসের প্রতি আসক্তি এবং অহঙ্কার রাগ-দ্বেষ-অভিমান, এ সব মনের ধর্ম কি করে ত্যাগ হবে। বলছেন, 'বহিস্তু বিষয়ৈঃ সঙ্গং তথা-অন্তঃ-অহম্-আদিভিঃ'। 'অহম্-আদিভিঃ', সব সময় আমরা 'আমি আমি' করছি। শুধু 'আমি' আর 'আমার'। সব দ্বন্দ্ব তো আমার 'আমি' আর অন্য কারোর 'আমি' নিয়ে। এই 'আমি-আমার' থেকেই আসে রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি মনের সব বিকার। এগুলো ত্যাগ করতে হবে। আবার 'বহিস্তু বিষয়ৈঃ সঙ্গং'—বাইরের বিষয়ের প্রতি সঙ্গ বা আকর্ষণ, তা-ও ত্যাগ করতে হবে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দিকে মনটা যাবে না, আবার 'আমি-আমার' করেও মনটাকে অশান্ত করব না। কিন্তু এ করা সহজ নয়। সকলে পারে না। কারা পারেন ? 'বিরক্ত এব শক্নোতি ত্যক্তুং ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ'—যাঁরা 'বিরক্ত' মানে বৈরাগ্য যাঁদের আছে, এবং 'ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ', ব্রহ্মে যাঁরা নিষ্ঠাবান—বৈরাগ্যবান ও ব্রহ্মনিষ্ঠ—তাঁরাই এরকম ত্যাগ করতে পারেন। বাইরের জগতের আকর্ষণ এবং অহংকার থেকে সৃষ্টি মনের যাবতীয় ধর্ম—এই দুই-ই তাঁরা ত্যাগ করেন। জোর করে ত্যাগ নয়। ব্রহ্মের প্রতি নিষ্ঠা আছে তো, তাই অন্য কিছু তাঁদের আর ভালোই লাগে না আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যত পূর্বের দিকে এগোবে পশ্চিম তত পিছনে পড়ে যাবে। জোর করে ত্যাগ হয় না। বৃহত্তর একটা আদর্শের দিকে এগোচ্ছি, এ না হলে ত্যাগ স্থায়ী হয় না। 'আদর্শ পরম সুখদা', তার থেকে সুখের আর কিছু নেই। বলছেন, ব্রহ্মের প্রতি যদি তোমার নিষ্ঠা হয়, তাহলে তোমার আর কিছু ভালো লাগবে না। যার ব্রহ্মের প্রতি নিষ্ঠা আছে—'ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ', সে-ই 'বিরক্ত', বৈরাগ্যবান হতে পারে—সে-ই ত্যাগ করতে পারে অন্য কেউ পারে না। তার আর কিছু ভালো লাগে না। ভিতরে ত্যাগ, বাইরে ত্যাগ, সব ত্যাগ। ত্যাগ, বৈরাগ্য কোনও নেতিবাচক জিনিস নয়, এটা ইতিবাচক। বড়-র জন্যে ছোট-কে ত্যাগ। যা নিত্য যা বৃহৎ তার জন্যে যা অনিত্য যা ক্ষণিক তাকে ত্যাগ করছি। ব্রহ্মে আমার নিষ্ঠা, তাই আর কিছুতে মন যায় না, অন্য সমস্ত বিষয় মন থেকে আপনি খসে পড়েছে। যে মধুর স্বাদ পেয়েছে তার কি চিটে গুড় ভালো লাগে ? তিনি রসস্বরূপ, 'রসঃ বৈ সঃ', (তৈ, ২/৭) তাঁর ওপর মন পড়েছে আর কিছু কি ভালো লাগতে পারে ? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—আলুনী লাগে।

বৈরাগ্যবোধৌ পুরুষস্য পক্ষিবৎ পক্ষৌ বিজানীহি বিচক্ষণ ত্বম্।
বিমুক্তি-সৌধাগ্রতলাধিরোহণং তাভ্যাং বিনা নান্যতরেণ সিধ্যতি॥৩৭৪

অন্বয় : বিচক্ষণ ত্বম্ বিজানীহি (তুমি বিচারশীল, জেনে রাখো) বৈরাগ্যবোধৌ (বৈরাগ্য [অর্থাৎ বিষয়ে বিরাগ] আর ব্রহ্মনিষ্ঠা) পুরুষস্য (পুরুষের) পক্ষিবৎ পক্ষৌ (পাখীর দুই পাখার মতো) তাভ্যাং বিনা (এই দুটি ছাড়া) বিমুক্তি- সৌধাগ্রতল- অধিরোহণং (মুক্তিরূপ সৌধের সর্বোচ্চ তলে আরোহণ) অন্যতরেণ ন সিধ্যতি (একটির দ্বারা সম্ভব হয় না)।

সরলার্থ : হে বিচারশীল শিষ্য, জেনে রেখো, পাখীর যেমন উঁচুতে ওঠার জন্যে দুটো পাখার প্রয়োজন,পুরুষের সেইরকম মুক্তিরূপ সৌধের সর্বোচ্চ তলায় ওঠার জন্যে বৈরাগ্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠা, এই দুইটিই চাই। পাখী যেমন শুধু একটা পাখায় উঁচুতে উঠতে পারে না তেমনি বৈরাগ্য ও বোধ, এই দুটি না হলে পুরুষের পক্ষেও কেবল একটি নিয়ে মুক্তিসৌধের সর্বোচ্চ তলে আরোহণ সম্ভব হয় না।

ব্যাখ্যা : মুক্তিকে একটা বিরাট অট্টালিকার সঙ্গে তুলনা করে বলছেন, এই অট্টালিকার যদি একেবারে ছাদে উঠতে চাও তাহলে তোমার দুটো জিনিস লাগবে—একটা বৈরাগ্য আর একটা ব্রহ্মনিষ্ঠা বা ঈশ্বর অনুরাগ। বলছেন, পাখীর দুটো ডানা আছে বলেই সে উড়তে পারে। তেমনি, কেউ যদি মুক্তিরূপ অট্টালিকার ছাদে উঠতে চায় তাহলে তারও পাখীর দুটো ডানার মতো, দুটো জিনিস লাগবে, ঈশ্বরের বোধ ও বৈরাগ্য। 'বিমুক্তি-সৌধ-অগ্রতল-অধিরোহণং'—মুক্তি যেন একটা বিরাট বাড়ীর ছাদ, সেখানে উঠতে চাইছি—সেই অগ্রতলায় উঠতে গেলে আমার কি চাই? দুটো জিনিস চাই। কি সে দুটি ? 'বৈরাগ্যবোধৌ', একটা বৈরাগ্য আর একটা বোধ অর্থাৎ জ্ঞান। জ্ঞান মানে কি এখানে ? না, ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ , যার ফলশ্রুতি হচ্ছে বোধ। 'বৈরাগ্যবোধৌ পুরুষস্য পক্ষিবৎ পক্ষৌ'; বলছেন বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠা, এ-দুটো পুরুষের অর্থাৎ সাধকের পক্ষে পাখীর দুটো ডানার মতো। 'তাভ্যাং বিনা নান্যতরেণ সিধ্যতি', দুটোই চাই, নাহলে সিদ্ধি হবে না। দুটোর একটা দিয়ে হবে না। তবে এটাও ঠিক, একটা থাকলে অন্যটাও এসে যায়। আনন্দস্বরূপ তিনি, তাঁর দিকে যদি এগোতে পারি তাহলে তার যে আনন্দ সে-আনন্দে বিষয়সুখ তুচ্ছ হয়ে যায়, সংসার আর মনকে টানতে পারে না। শিষ্যকে উৎসাহ দিয়ে বলছেন : 'বিজানীহি বিচক্ষণ ত্বম্'—তুমি বিচক্ষণ, বিচারশীল। তুমি এটা জেনে রাখো, এই দুটো জিনিসই দরকার—বৈরাগ্য আর ব্রহ্মনিষ্ঠা। ওই দুটো থাকলে, পাখী যেমন দু-ডানায় ভর দিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যায়, তুমিও তেমনি ধর্মজীবনে সর্বোচ্চ শিখরে উঠে যাবে, মুক্তি লাভ করবে।

অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ সমাহিতস্যৈব দৃঢ়প্রবোধঃ।
প্রবুদ্ধতত্ত্বস্য হি বন্ধমুক্তির্মুক্তাত্মনো নিত্যসুখানুভূতিঃ ॥ ৩৭৫

অন্বয়: অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ (অত্যন্ত বৈরাগ্যবান সাধকের সমাধি হয়) সমাহিতস্য

এব (সমাহিত ব্যক্তিরই কেবল) দৃঢ় প্রবোধঃ (তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হয়) প্রবুদ্ধ-তত্ত্বস্য (তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছে যাঁর তাঁরই) বন্ধমুক্তিঃ (ভববন্ধন থেকে মুক্তি হয়) মুক্তাত্মনঃ (মুক্ত ব্যক্তির) নিত্যসুখানুভূতিঃ (নিত্য সুখের অনুভব হয়)।

সরলার্থ: তীব্র বৈরাগ্যবান সাধকই সমাধি লাভ করেন। সমাধি হলে তবে তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হয়। তত্ত্বজ্ঞ যিনি তাঁরই ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। মুক্ত ব্যক্তি নিত্য আত্মসুখ অনুভব করতে থাকেন।

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে বলেছেন বৈরাগ্য ও বোধ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠা থেকে আমাদের স্বরূপজ্ঞান হয়, সেটাই আমাদের সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি এনে দেয়। এখানে বলছেন, বৈরাগ্য যখন খুব তীব্র হয় তখনই সমাধি হয়। 'অত্যন্ত-বৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ'; অত্যন্ত বৈরাগ্যবানের সমাধি লাভ হয়। বৈরাগ্য যখন তীব্র, বিষয়ে যখন অত্যন্ত বিরাগ তখন মনটা সহজেই বাইরের থেকে গুটিয়ে আসে। অত্যন্ত বৈরাগ্য কখন হয় ? যখন ব্রহ্মচিন্তায়, ঈশ্বরচিন্তায় জগৎ ভুল হয়ে যায়। তাঁর পাদপদ্মেই মনটা পড়ে আছে আর কোনও হুঁস নেই। 'মন তুমি দেখো আর আমি দেখি, আর যেন কেউ না দেখে'। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো তো বহির্মুখী, তারা সব সময় বাইরের দিকে ছুটছে, তাদের অন্তরের মধ্যে টেনে আনব কি করে ? ঈশ্বরচিন্তার দ্বারা। আমি যদি সব সময় তাঁর চিন্তা করতে থাকি তাহলে তাঁকে ভালোবাসাটাই আমার স্বভাব হয়ে যাবে। তিনি তো রসস্বরূপ, সেই রসের আস্বাদ একবার পেলে মন সেখানেই পড়ে থাকতে চায়। কিন্তু বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ আর সংসারের নানা ঘটনার প্রবাহ আমাদের মনকে ঈশ্বরমুখী হতে দেয় না। তাই ঈশ্বরচিন্তা, তাঁর নাম করা, এসব অভ্যাস করতে হয়। নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকতে হয়। এইরকমভাবে অভ্যাস করতে করতে একদিন আসে যখন শুধু তাঁর প্রসঙ্গই ভালো লাগে, তাঁর চিন্তাই স্বভাব হয়ে যায়। তখন বিষয়ের প্রতি বিরাগও আপনা-আপনি এসে যায়। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু সেগুলো আর মনকে তেমন করে টানতেই পারে না। এই যাঁর অবস্থা তিনিই অত্যন্ত বৈরাগ্যবান। তিনি তখন তদ্গত হয়ে যান, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান, সমাধি লাভ করেন। যতক্ষণ ঈশ্বর আছেন আর আমি তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছি ততক্ষণ সবিকল্প সমাধি। তারপর ক্রমান্বয়ে সব একাকার, 'আমি' মুছে গেলো, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গেছি। এ যখন হলো তখন 'নির্বিকল্প সমাধি'। তখন 'সমাহিতস্য-এব দৃঢ়প্রবোধঃ'। 'প্রবোধঃ'—প্রকৃষ্ট বোধ, প্রকৃষ্ট জ্ঞান, আত্মজ্ঞান, স্বরূপজ্ঞান। নির্বিকল্প সমাধি হলে তবে আত্মজ্ঞান দৃঢ় হয়, প্রতিষ্ঠিত হয়। 'প্রবুদ্ধতত্ত্বস্য হি বন্ধমুক্তিঃ'; তত্ত্বজ্ঞান যাঁর হয়েছে তাঁর সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি হয়ে যায়। সংসারবন্ধন আর কি করে থাকবে ? কোনও কিছুতে আকর্ষণ নেই, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গেছি. সংসার আর নেই। 'মুক্ত-আত্মনঃ নিত্যসুখানুভূতিঃ'—মুক্ত পুরুষের সর্বদা

সুখের অনুভূতি। সচ্চিদানন্দ আমার স্বরূপ, সেই স্বরূপকে আমি জেনেছি, আমি তো আনন্দস্বরূপ হয়ে আছি! তাই আমার 'নিত্যসুখানুভূতিঃ', নিরন্তর আনন্দ, কোনও ছেদ নেই।

বৈরাগ্যান্ন পরং সুখস্য জনকং পশ্যামি বশ্যাত্মনঃ
তচ্চেচ্ছুদ্ধতরাত্মবোধসহিতং স্বারাজ্যসাম্রাজ্যধুক্।
এতদ্ দ্বারমজস্রমুক্তিযুবতের্যস্মাৎ ত্বমস্মাৎ পরং
সর্বত্রাস্পৃহয়া সদাত্মনি সদা প্রজ্ঞাং কুরু শ্রেয়সে।।৩৭৬

অন্বয়: বশ্যাত্মনঃ (আত্মসংযম যার হয়েছে তার) বৈরাগ্যাৎ পরং (বৈরাগ্যের থেকে অধিক) সুখস্য জনকং ন পশ্যামি (সুখজনক কিছু দেখছি না) তৎ (এই বৈরাগ্য) চেৎ (যদি) শুদ্ধতর-আত্মবোধসহিতং (অতি শুদ্ধ আত্মবোধ যুক্ত হয় [তাহলে]) স্বারাজ্য-সাম্রাজ্যধুক্ (আত্মানুভূতির আনন্দরূপ স্বরাজ ও অখণ্ড আত্মসাক্ষাৎকার-জনিত পরমানন্দরূপ সাম্রাজ্য প্রদান করে) যস্মাৎ (যেহেতু) অজস্র-মুক্তি-যুবতেঃ (অজস্র মুক্তিরূপা যুবতীর) এতৎ পরং দ্বারম্ (এই শ্রেষ্ঠ দ্বার) অস্মাৎ (এই কারণে) ত্বম্ (তুমি) সর্বত্র অস্পৃহয়া (সর্ব অবস্থায় নিস্পৃহতার সহায়ে) সদা শ্রেয়সে (সব সময় শ্রেয় অর্থাৎ মুক্তি লাভের জন্যে) সদা-আত্মনি প্রজ্ঞাং কুরু (সর্বদা আত্মায় প্রজ্ঞা স্থাপন করো)।

সরলার্থ: যে আত্মসংযমে সমর্থ হয়েছে তার পক্ষে বৈরাগ্যের থেকে সুখদায়ক আর কিছু দেখছি না। এই বৈরাগ্য যদি অতি শুদ্ধ আত্মবোধের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তাহলে নিরপেক্ষ স্বাধীন আত্মসমাহিত স্বরাজ লাভ হয় ও অখণ্ড আত্মসাক্ষাৎকারজনিত পরমানন্দের সাম্রাজ্য প্রাপ্তি ঘটে। যেহেতু অজস্র মুক্তিরূপা যুবতী-প্রাপ্তির এটিই শ্রেষ্ঠদ্বার তাই সর্ব অবস্থায় নিস্পৃহ থেকে সর্বদা শ্রেয় অর্থাৎ মুক্তি লাভের জন্যে সব সময় আত্মায় প্রজ্ঞা স্থাপন করো।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'বৈরাগ্যাৎ ন সুখস্য জনকং পশ্যামি'—বৈরাগ্যের থেকে বেশী সুখদায়ক কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সুখ বৈরাগ্যের মধ্যেই আছে, আর কিছুতেই নেই। 'বশ্যাত্মনঃ তৎ চেৎ শুদ্ধতর-আত্মবোধসহিতং'; চিত্ত যদি নিজের বশে থাকে আর এই বৈরাগ্য যদি শুদ্ধচিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে তার থেকে বড় সুখ আর নেই। শুদ্ধ চিন্তা মানে ঈশ্বর-চিন্তা। যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত তাঁর চিন্তা। আগে বলেছেন, মুক্তি লাভ করতে হলে পাখীর দুটো ডানার মতো বৈরাগ্য আর ঈশ্বরের বোধ দরকার। ঈশ্বরের বোধ মানে তিনি যে আছেন এই বোধ আর এই বোধ থেকে তাঁর প্রতি অনুরাগ, ভালোবাসা, সর্বক্ষণ তাঁর চিন্তা। বৈরাগ্য মানে বিষয়ে বিরাগ।

আমার যখন ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হয়েছে তখন বিষয়ে বিরাগ আপনিই হবে—তিনি তো আনন্দস্বরূপ, তাঁর দিকে যদি এগোতে পারি তো যে আনন্দের সন্ধান পাব তাতে বিষয়ভোগের আনন্দ তুচ্ছ হয়ে যাবে। এরকম যদি হয় তাহলে 'স্বারাজ্য-সাম্রাজ্যধুক্'—স্বারাজ্য, আমি আমার রাজা। কিন্তু তাই কি? আমি তো দাস হয়ে আছি। কিসের দাস? অহং জ্ঞান। অহং কর্তা, অহং ভোক্তা, এই অহং এর দাস হয়ে আছি। ভাবছি কত কি করছি। এইটা ঠিক করে ফেলব, ওটার ব্যবস্থা করতে হবে, এইভাবে সব সময় যেন ছুটছি। কিন্তু আমি তো কিছু করছি না, যা কিছু ঘটছে তা তিনি করাচ্ছেন। রামপ্রসাদ বলছেন, 'সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি'। বলছেন, 'বশ্যাত্মনঃ'—আত্মা বশে যার সেই সবচেয়ে সুখী। নিজেকে বশে আনো, সংযত হও, অহং-বুদ্ধি ত্যাগ করো। আর বৈরাগ্য আর ঈশ্বর-চিন্তা এই দুটিকে সঙ্গে করে যদি চলতে পারো তাহলে তুমি স্বারাজ্য লাভ করবে, তুমি সম্রাট হবে। তোমার সাম্রাজ্যটা কি? না অখণ্ড আনন্দ, আত্মচিন্তা। নিজের স্বরূপচিন্তা আর তার থেকে সমস্ত সত্তা জুড়ে আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন বোধ, এই তোমার সাম্রাজ্য। এর থেকে কি পাওয়া যাবে? তুমি মুক্তি লাভ করবে। 'এতদ্-দ্বারম্-অজস্রমুক্তি-যুবতেঃ যস্মাৎ ত্বম্ অস্মাৎ পরং'; এই শ্রেষ্ঠ উপায়, 'এতদ্ পরম্ দ্বারম্'—এই দ্বারই পরম দ্বার, শ্রেষ্ঠ দ্বার, যা দিয়ে তুমি অজস্র-মুক্তিরূপা যুবতী লাভ করবে। 'ত্বম্ অস্মাৎ-সর্বত্র-অস্পৃহয়া সদা আত্মনি সদা প্রজ্ঞাং কুরু শ্রেয়সে'। 'সর্বত্র অস্পৃহয়া', কোন কিছুতে স্পৃহা রেখো না; কিছু চেও না, ছোট কিছু চেও না, যা শ্রেয় তাই চাও। 'সদা আত্মনি প্রজ্ঞাং কুরু সদা শ্রেয়সে'; সর্বদা আত্মাতেই 'প্রজ্ঞাং কুরু'—পরমের জ্ঞান দৃঢ় কর, 'সদা শ্রেয়সে'—সব সময় শ্রেয় লাভের জন্যে, মুক্তি লাভের জন্যে আত্মায় প্রজ্ঞা অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করো। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলছেন ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীকে, আপনাকে তো তিনি সবই দিয়ে গেছেন আপনি আর কেন ধ্যানজপ এসব করছেন? ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী বলছেন, বাবা তো দিয়ে গেছেন, তাঁর জিনিস একটু নাড়াচাড়া করব না? যা তিনি দিয়ে গেছেন, একটু বুঝে নেব না ? এই নাড়াচাড়া করাই প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠা করা। ঈশ্বরের কাছে আমরা কি চাইব? ত্যাগ, বৈরাগ্য, শুভবুদ্ধি, ঈশ্বর অনুরাগ—এগুলি চাইব। এগুলি যদি হৃদয়ে ধারণ করতে পারি তাহলে মুক্তির 'পরম্ দ্বারম্' আমার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

আশাং ছিন্ধি বিষোপমেষু বিষয়েষ্বেষৈব মৃত্যোঃ কৃতি-
স্ত্যক্ত্বা জাতিকুলাশ্রমেষ্বভিমতিং মুঞ্চাতিদূরাৎ ক্রিয়াঃ।
দেহাদাবসতি ত্যজাত্মধিষণাং প্রজ্ঞাং কুরুষ্বাত্মনি
ত্বং দ্রষ্টাস্যমনোঽসি নির্দ্বয়পরং ব্রহ্মাসি যদ্বস্তুতঃ॥ ৩৭৭

অন্বয়: বিষ-উপমেষু বিষয়েষু (বিষ যার উপমা এইসব বিষয়ে) আশাং ছিন্ধি (আশা ছিন্ন করো) এষঃ এব (এ ঠিক) মৃত্যোঃ কৃতিঃ (মৃত্যুর আকৃতি) জাতি-কুল-আশ্রমেষু (জাতি, কুল ও আশ্রমে) অভিমতিং ত্যক্ত্বা (অভিমান ত্যাগ করে) ক্রিয়াঃ (সকাম কর্মসমূহ) অতি দূরাৎ মুঞ্চ (অতি দূর থেকে ত্যাগ করো) অসতি দেহাদৌ (মিথ্যা দেহ ইত্যাদিতে) আত্মধিষণাং ত্যজ ('আমি-আমার' ভাব ত্যাগ করো) আত্মনি (আত্মায়) প্রজ্ঞাং কুরুষ্ব (স্বরূপজ্ঞান করো) যৎ (যেহেতু) ত্বম্ (তুমি) বস্তুতঃ (স্বরূপত) দ্রষ্টা অসি (দ্রষ্টা হও) অমনঃ অসি (মনের অতীত হও) নির্দ্বয়পরং ব্রহ্ম অসি (অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম হও)।

সরলার্থ: বিষ যার উপমা সেইসব বিষয়ভোগের আশা ছিন্ন করো। জাতি, কুল ও আশ্রমের অভিমান ত্যাগ করে সকাম কর্ম থেকে অনেক দূরে থাকো। অনিত্য দেহাদিতে 'আমি-আমার' ভাব ত্যাগ করে আত্মায় স্বরূপজ্ঞান স্থাপন করো। তুমি দ্রষ্টা হয়ে থাকো, মনাতীত হয়ে থাকো, অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম হয়ে থাকো। কারণ, স্বরূপতঃ তুমি তা-ই।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'আশাং ছিন্ধি'—আশাকে ছিঁড়ে ফেলো। বহির্মুখী মন আমাদের বিষয়ভোগের বাসনায় কত আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়ো করেছে। এগুলোই কিন্তু আমাদের সমস্ত দুঃখের কারণ। 'আশা হি পরমং দুঃখং' এই বিষয় নিয়ে থাকলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। এর থেকেই আমাদের পতন হয়। বলছেন, সমস্ত বৈষয়িক আশাকে 'বিষ-উপমেষু', বিষের মতো ত্যাগ করো। 'বিষ-উপমেষু বিষয়েষু-এষ-এব মৃত্যোঃ কৃতিঃ'; বিষের সঙ্গে তুলনীয় এই বিষয়, এ যেন ঠিক মৃত্যুর আকার, 'মৃত্যোঃ কৃতিঃ'। এর প্রতি যে আকর্ষণ সেটাই তো বন্ধন। মানুষ ছাড়তে পারে না। এর প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করে দাও। 'ত্যক্ত্বা জাতি-কুল-আশ্রমেষু-অভিমতিং মুঞ্চ-অতি দূরাৎ ক্রিয়াঃ'; আমরা জাতির অভিমান করি, কুলের অভিমান করি, আশ্রমের অভিমান করি—এসব বহু দূর থেকে ত্যাগ করতে হবে। 'আশ্রমেষু' মানে আমাদের তো বর্ণাশ্রম অনুযায়ী নানা ভেদ আছে। আমি ক্ষত্রিয়, আমি ব্রাহ্মণ, এই সব অভিমান। তারপর আবার ব্রহ্মচর্যাশ্রম, সন্ন্যাসাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম—এইসব আশ্রম। সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসাশ্রমে আছেন বলে অভিমান হতে পারে। হয়ও তো, ভয়ানক অভিমান হতে পারে গেরুয়া পরে আছি বলে। তাই বলা হয়, সাধু সাবধান। সর্বব্যাপারে প্রতিষ্ঠার জন্যে মানুষের অত্যন্ত বাসনা। প্রতিষ্ঠা শুকরীবিষ্ঠা। নাম, যশ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, এগুলো সব বিষ, মৃত্যুর কারণ, পতনের কারণ। 'জাতি-কুল-আশ্রমেষু-অভিমতিং মুঞ্চ-অতি দূরাৎ ক্রিয়াঃ'; জাতি, কুল ইত্যাদির জন্যে অভিমান ত্যাগ করো 'মুঞ্চ-অতি দূরাৎ ক্রিয়াঃ', আর সকাম কর্ম থেকে দূরে থাকো। নিষ্কাম কর্মে বন্ধন নেই কিন্তু সকাম কর্ম বন্ধনের কারণ। এখানে কর্ম মানে সকাম কর্ম। তার থেকে দূরে থাকতে হবে। অহং কর্তা, অহং ভোক্তা, অহং বোদ্ধা—এই

'আমি'টাকে মারতে হবে। তাই সকাম কর্ম করা চলবে না। ঈশ্বরার্থে কাজ করো। কাজ না করে তো থাকা যায় না। তাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কাজ করো, লোককল্যাণের জন্যে কাজ করো। 'দেহাদৌ-অসতি', আমাদের দেহ-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়, এগুলো 'অসৎ', নেই যেন। অসৎ মানে অনিত্য, মিথ্যা। দেহ ইত্যাদি অসৎ বিষয়গুলিতে 'ত্যজ আত্মধিষণাং'—আমিত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করো। দেহাভিমান রেখো না। দেহাত্মবোধ দূর করে দাও। 'প্রজ্ঞাং কুরুষ্ব আত্মনি'—আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি করো। স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও। মনটাকে আত্মাতেই রেখে দাও। 'ত্বং দ্রষ্টা অসি'; তুমি দ্রষ্টা হও। তুমি আত্মা, তাই সাক্ষী, নিরপেক্ষ। 'অমনঃ-অসি'—'অমন' হও, মনকে অতিক্রম করে যাও। মন আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়, কিন্তু মন আসলে জড়। বুদ্ধিও জড়। তাহলে মন-বুদ্ধি এদের চৈতন্যময় মনে হয় কেন ? আত্মার সান্নিধ্যের জন্যে। চৈতন্যের সংস্পর্শে আছে বলে এদের চিন্ময় দেখায়। 'ত্বং দ্রষ্টা-অসি-অমনঃ-অসি'; মনে রেখো তুমি দ্রষ্টা, তুমি মন নও, দেহ নও, বুদ্ধি নও, শুধু আত্মা। 'নির্দ্বয় পরম্ ব্রহ্মাসি যদ্ বস্তুতঃ'; তোমার কোন দুই নেই, তুমি পরম ব্রহ্ম, এইটাই তোমার পরিচয়, এইটাই বাস্তব। তুমি ব্রহ্ম, বস্তুত, তত্ত্বত, স্বরূপত। দেহ-মন-বুদ্ধি সব তোমার স্বরূপের ওপর চাপানো জিনিস, উপাধি। তাই বলছেন, 'প্রজ্ঞাং কুরুষ্ব-আত্মনি', মনটাকে আত্মায় স্থাপন করো। আত্মার চিন্তা করো।

লক্ষ্যে ব্রহ্মণি মানসং দৃঢ়তরং সংস্থাপ্য বাহ্যেন্দ্রিয়ং
স্বস্থানে বিনিবেশ্য নিশ্চলতনুশ্চোপেক্ষ্য দেহস্থিতিম্।
ব্রহ্মাত্মৈক্যমুপেত্য তন্ময়তয়া চাখণ্ডবৃত্ত্যানিশং
ব্রহ্মানন্দরসং পিবাত্মনি মুদা শূন্যৈঃ কিমন্যৈর্ভৃশম্॥ ৩৭৮

অন্বয়: লক্ষ্যে ব্রহ্মণি (লক্ষ্য ব্রহ্মে) মানসং দৃঢ়তরং সংস্থাপ্য (মনকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে) বাহ্যেন্দ্রিয়ং স্বস্থানে বিনিবেশ্য (কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে নিজের নিজের জায়গায় রেখে দিয়ে) চ নিশ্চলতনুঃ (আর শরীর স্থির নিশ্চল) দেহস্থিতিম্ উপেক্ষ্য (দেহ আছে কি নেই তা উপেক্ষা করে) ব্রহ্ম-আত্মা-ঐক্যম্ উপেত্য (ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার অভেদভাব উপলব্ধি করে) তন্ময়তয়া (তন্ময়তার সঙ্গে) অখণ্ডবৃত্ত্যা চ (একাকার বৃত্তিসহ) অনিশং (সর্বদা) আত্মনি মুদা ব্রহ্মানন্দরসং পিব (আত্মায় অবস্থান করে সুখে ব্রহ্মানন্দরস পান করো) অন্যৈঃ শূন্যৈঃ (অন্য সব বৃথা কর্মের) ভৃশম্ কিম্ (বারবার অনুষ্ঠানের কি ফল) ?

সরলার্থ: ব্রহ্মে লক্ষ্য স্থির রেখে মনকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে সমস্ত বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে স্বস্থানে স্থির রেখে নিশ্চল দেহে, শরীর রক্ষা সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন থেকে ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার একত্ব উপলব্ধি করো। তন্ময়ভাবে এক অখণ্ডবৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে সর্বদা আত্মায় অবস্থান করো ও সুখে ব্রহ্মানন্দরস পান করো। অন্য সব বৃথা কর্মের বারবার অনুষ্ঠানের কি ফল ?

ব্যাখ্যা: এখানে বলে দিচ্ছেন কিভাবে ধ্যান করতে হবে, কার ধ্যান করতে হবে। গভীর চিন্তা, সেটাই তো ধ্যান। বলছেন, আমাদের লক্ষ্য ব্রহ্ম। সেই তিনিই 'এক' সর্বভূতে আছেন। তাঁরই ধ্যান করতে হবে। 'লক্ষ্যে ব্রহ্মণি মানসং দৃঢ়তরং সংস্থাপ্য'—ব্রহ্মই লক্ষ্য, তাঁর চিন্তায় মনটাকে খুব শক্ত করে বসিয়ে দিয়ে 'বাহ্য-ইন্দ্রিয়ং স্বস্থানে বিনিবেশ্য'—আমাদের যত বাহ্য ইন্দ্রিয়, চোখ-কান-হাত-পা ইত্যাদি, তাদের নিজেদের জায়গায় রেখে দিয়ে; 'নিশ্চলতনুঃ চ উপেক্ষ্য দেহস্থিতিম্'—স্থির নিশ্চল দেহে, আমার দেহ থাকবে কি থাকবে না তা উপেক্ষা করে আমি বসে আছি। স্থাণুবৎ। স্থাণু মানে একটা গাছের গুঁড়ি কাটা রয়েছে, নড়ছে না চড়ছে না, দেখলে মনে হয় যেন একজন লোক নিশ্চল, স্থির হয়ে আছে। ধ্যানে সেইভাবে থাকতে হবে। তারপর বলছেন, 'ব্রহ্ম-আত্মা-ঐক্যম্-উপেত্য'; 'উপেত্য'—উপস্থিত হয়ে। ব্রহ্ম আর আত্মা যে এক, সেই যে লক্ষ্য, সেইখানে পৌঁছে, সেই একত্ব উপলব্ধি করে, 'তন্ময়তয়া চ অখণ্ডবৃত্ত্যা-অনিশং', তন্ময় হয়ে যাব। 'তন্ময়তয়া'—তন্ময়তার সঙ্গে; তন্ময় হয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাব, এক হয়ে যাব। 'অখণ্ডবৃত্ত্যা-অনিশং'—মনে সব সময় একটা বৃত্তি, ব্রহ্মচিন্তার বৃত্তি উঠছে। এক পাত্র থেকে আর এক পাত্রে তেল ঢালছি। ফোঁটা ফোঁটা করে ছেড়ে ছেড়ে পড়ছে না, একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা। তেমনিভাবে মনটা একটা অখণ্ড বৃত্তি হয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে। 'ব্রহ্মানন্দরসং পিব আত্মনি মুদা শূন্যৈঃ কিম্-অন্যৈঃ ভৃশম্'; এই ব্রহ্মানন্দরস পান করো, 'মুদা'—আনন্দ করে, মন ভরে। আর সব তো শূন্য বস্তু বলে মনে হয়। 'কিম্-অন্যৈঃ ভৃশম্'—অন্য সব বৃথা কর্মে আর কি হবে? শুধু আত্মায় ব্রহ্মানন্দরসের ধারা পান করো। এ বাইরের কোনও বস্তু নয় যে কেউ একজন দিলে তবে আমি পান করছি, 'আত্মনি', এ আমার নিজের মধ্যেই আছে, আমি সেই রস পান করব, 'মুদা'—আনন্দে, পান করব আর আনন্দ করব। 'শূন্যৈঃ কিম্ অন্যৈঃ ভৃশম্'; আর যা কিছু তা বৃথা। সেসব জিনিসের তো কোনও অস্তিত্ব নেই, সেগুলো শূন্য। তুমি সেসব দিকে মন দিও না। অন্য নানাবিধ অনুষ্ঠানের কি ফল? তুমি কূটস্থ হয়ে থাকো। একটা পর্বতের কূট, শীর্ষ, সেখানে স্থির হয়ে বসে আছি, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি না। আমার আত্মায় আমি সেইভাবে অবস্থান করছি, স্বস্থানে বসে আছি, অন্য দিকে আর চাইছি না।

অনাত্মচিন্তনং ত্যক্ত্বা কশ্মলং দুঃখকারণম্।
চিন্তয়াত্মানমানন্দরূপং যন্মুক্তিকারণম্॥ ৩৭৯

অন্বয়: দুঃখকারণং (দুঃখের কারণ) কশ্মলং (মোহরূপ) অনাত্মচিন্তনং (অনাত্মবিষয়ের

চিন্তা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) যৎ-মুক্তি কারণম্ (যা মুক্তির কারণ) আনন্দরূপম্-আত্মানম্ চিন্তয় ([সেই] আনন্দরূপ আত্মাকে চিন্তা করো)।

সরলার্থ: সব দুঃখের কারণ মোহস্বরূপ অনাত্মবিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করে যা মুক্তির কারণ সেই আনন্দরূপ আত্মাকে চিন্তা করো।

ব্যাখ্যা: হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিঃ ভবতি তাদৃশী। যে-রকম ভাবব সে-রকম হব। স্বামীজী বলছেন, নিজেকে পাপী ভাবাই পাপ। কারণ পাপী ভাবলে পাপীই হয়ে যাব। বেদান্তের বাণীই হচ্ছে, তুমি ঠিক করে নাও কি তুমি হবে, সেইভাবে নিজেকে গড়ো। অভ্যাসের দ্বারা এটা সম্ভব। সব শাস্ত্রই একথা বলে যে অভ্যাস করতে হয়, কোনও কাজই অমনি-অমনি হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, একজন তরতর করে ইংরেজী লিখে যাচ্ছে, বিদেশী ভাষা, এর জন্যে অনেক অভ্যাস করতে হয়েছে। বিবেকচূড়ামণিতে বারবার বলা হচ্ছে, তুমি মনটাকে বাইরের দিকে যেতে দিও না, ভেতরে টেনে আনো। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলতে গেলে, মনটার মোড় ফিরিয়ে দিতে বলছেন। বলছেন, যা অনাত্মবস্তু সেসব চিন্তা থেকে বিরত থাকো। 'অনাত্মচিন্তনং ত্যক্ত্বা'; যা আত্মা নয় সেসব বস্তুর চিন্তা ত্যাগ করে আত্মচিন্তা করো। মনটা ওই ময়লা জিনিসটার দিকে যাবে কেন? রাশ টেনে নিয়ে এসো, বিপথে যাতে না যায়। 'অনাত্ম' বলতে কি বোঝাচ্ছেন? আত্মা ছাড়া সবকিছু। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা-কিছু বিষয়। আমরা তো সব সময় দেহের চিন্তা করছি, নিজেকে ছোট করছি, অনিত্য বিষয়ে মগ্ন হয়ে আছি। এই ভাব বর্জন করতে হবে। যিনি নিত্য তিনি পরম সুখের স্থল, তাঁর চিন্তা করতে হবে। 'ত্যক্ত্বা কশ্মলং দুঃখকারণম্'; 'কশ্মলং'—মোহ। এই দেহের প্রতি আমাদের একটা মোহ আছে। এগুলো দুঃখের কারণ। এসব ত্যাগ করো। যা অনিত্য তা আমি চাইব কেন? যা নিত্য, যা অল্প নয়, অনন্ত সুখের কারণ, সেই সদানন্দস্বরূপ ভূমাকে চাইব। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ, এটা মোহ, এ ক্ষণিক সুখের কারণ হতে পারে কিন্তু দুঃখ আনবেই। তুমি এটা বর্জন করো। কি করে সেটা করবে? 'চিন্তয়-আত্মানম্-আনন্দরূপম্'; আত্মার চিন্তা করো। আমি কে? দেহ নই, মন, বুদ্ধি এসব নই, আমি আনন্দস্বরূপ। দুঃখ আমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। 'চিন্তয়-আত্মানম্-আনন্দরূপম্ যৎ-মুক্তিকারণম্'; এই আনন্দস্বরূপ আত্মা আমার মধ্যেই আছেন, তাঁর চিন্তায় ডুবে গেলে আমার মুক্তি হবে। নিজের স্বরূপ যদি চিন্তা করো, যদি আত্ম-চিন্তা করো তাহলে তুমি জানতে পারবে, তুমি দেহ-মন-বুদ্ধি এসব নও। তুমি মুক্ত, তুমি আনন্দস্বরূপ।

এষ স্বয়ংজ্যোতিরশেষসাক্ষী বিজ্ঞানকোশো বিলসত্যজস্রম্।
লক্ষ্যং বিধায়ৈনমসদ্‌বিলক্ষণমখণ্ডবৃত্ত্যাত্মতয়ানুভাবয়॥ ৩৮০

অন্বয়: স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বয়ং প্রকাশ) অশেষসাক্ষী (সবকিছুর সাক্ষী) বিজ্ঞানকোশঃ (বিজ্ঞানময়কোশ অর্থাৎ বুদ্ধিতে প্রকাশিত) এষঃ (এই আত্মা) অজস্রং বিলসতি (নিরন্তর অসংখ্যভাবে প্রকাশ হচ্ছেন) অসৎ বিলক্ষণম্ এবম্ (অসৎ থেকে ভিন্ন এই শুদ্ধ আত্মাকে) লক্ষ্যং বিধায় (লক্ষ্যরূপে স্থির করে) অখণ্ডবৃত্ত্যা (একাকার বৃত্তির দ্বারা) আত্মতয়া অনুভাবয় (নিজের সঙ্গে অভেদভাবে অনুভব করো)।

সরলার্থ: জ্যোতিঃস্বরূপ তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, সবকিছুর সাক্ষী। বিজ্ঞানময়কোশরূপ বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে তিনি নিরন্তর অসংখ্যভাবে প্রকাশিত হচ্ছেন। অনিত্যবস্তু থেকে ভিন্ন এই আত্মাকে লক্ষ্যরূপে রেখে অখণ্ডবৃত্তির দ্বারা একে নিজের সঙ্গে অভেদভাবে অনুভব করো।

ব্যাখ্যা: আত্মা কিরকম সেইটা এখানে বলছেন। 'এষ স্বয়ংজ্যোতিঃ'—এই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ। কঠোপনিষদে আছে 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' (ক ২।২।১৫)। তাঁর আলোকেই সবকিছু আলোকিত। তিনি 'অশেষসাক্ষী', সবকিছুর সাক্ষিরূপে সদা বর্তমান। তিনি আছেন বলেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে। কঠোপনিষদ বলছেন, তিনি হাতে বজ্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, চন্দ্র, সূর্য উঠছে, সবকিছু ঘটছে তাঁর ভয়ে, তিনি আছেন বলে। তিনি 'বিজ্ঞানকোশঃ'—অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রকাশিত হচ্ছেন। পঞ্চকোশের কথা আমরা আগে বলেছি—অন্নময়কোশ, প্রাণময়কোশ, মনোময়কোশ, বিজ্ঞানময়কোশ আর আনন্দময়কোশ। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম। সবচেয়ে স্থূল ঐ অন্নময়কোশ, দেহ। দেহ যেন একটা কৌটো, তার মধ্যে প্রাণ-মন-বুদ্ধি এরা সব একটার ভেতরে আর একটা কৌটো পরপর বসানো আছে। সব শেষ কৌটো আনন্দময়কোশ—তার ভেতরে আত্মা আছেন। আত্মা আছেন বলেই এইসব কোশ কাজ করছে। বুদ্ধিকে নিয়ে যে কোশ সেটা বিজ্ঞানময়কোশ। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধি দিয়ে সৎ-অসৎ বিচার করে আমরা সিদ্ধান্ত নিই। তাই বুদ্ধির খুব গুরুত্ব। কিন্তু বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময়কোশরূপেও তিনিই প্রকাশিত হচ্ছেন। বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে তিনি 'বিলসতি-অজস্রম্'—অজস্রভাবে প্রকাশ পাচ্ছেন। আত্মা বুদ্ধিকে চালাচ্ছেন, তাই বলছেন আত্মা বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন। বুদ্ধি আবার মনকে চালাচ্ছে। মন আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ইত্যাদিকে চালাচ্ছে। তাই বলছেন, বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে আত্মা এইভাবে নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করছেন। 'লক্ষ্যং বিধায়' আমাদের একটা লক্ষ্য থাকা দরকার। সেই লক্ষ্যটা কি হবে ? 'লক্ষ্যম্-বিধায়-এনম্-অসদ্ বিলক্ষণম্'—এই আত্মাকেই লক্ষ্য করতে হবে, যা কিনা 'অসৎ-বিলক্ষণম্'। 'অসৎ-বিলক্ষণম্'—মানে 'অসৎ' থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অর্থাৎ সৎস্বরূপ। সব সময় সেই আত্মার চিন্তা করো, যিনি সৎস্বরূপ। নিরন্তর তৈলধারার মতো অখণ্ড ধারায় মনটা

ঐদিকে চলবে, কোন ছেদ নেই, ফাঁক নেই। 'অখণ্ডবৃত্ত্যা', অখণ্ডবৃত্তির দ্বারা তাঁর অনুভব করো। তোমার মনটা একটা অখণ্ডধারার মতো ওই দিকে চলবে। 'আত্মতয়া অনুভাবয়'; 'আত্মতয়া', যে আত্মা মনকে চালাচ্ছেন বুদ্ধিকে চালাচ্ছেন, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে চালাচ্ছেন তুমি তাঁর সঙ্গে এক, এইটা অনুভব করো। তুমিই আত্মা এই অনভূতিতে তোমার মনটাকে ডুবিয়ে দাও। মুণ্ডক উপনিষদে আছে মনটা যেন তীর আর পরমাত্মা হলো লক্ষ্য। তীরের মতো করে মনটা আত্মায় ছুঁড়ে দিলাম, সেটা সেখানেই বিঁধে থাকল। তোমার মনটাও আত্মায় ওই ভাবে রেখে দাও।

এতমচ্ছিন্নয়া বৃত্ত্যা প্রত্যয়ান্তরশূন্যয়া।
উল্লেখয়ন্ বিজানীয়াৎ স্বস্বরূপতয়া স্ফুটম্ ॥ ৩৮১

অন্বয় : অচ্ছিন্নয়া প্রত্যয়ান্তরশূন্যয়া বৃত্ত্যা (অবিচ্ছিন্ন অনন্য প্রত্যয় বৃত্তি সহকারে) এতম্ (এই আত্মাকে) উল্লেখয়ন্ (চিন্তা করে) স্বস্বরূপতয়া (নিজ-স্বরূপরূপে) স্ফুটং (স্পষ্টভাবে) বিজানীয়াৎ (জানবে)।

সরলার্থ : অবিচ্ছিন্ন অনন্য প্রত্যয় বৃত্তি সহকারে এই আত্মার চিন্তা করে এঁকে (পরমাত্মাকে) নিজের স্বরূপ বলে স্পষ্টভাবে জানবে।

ব্যাখ্যা : এখানে বলছেন, আত্মা, যিনি দেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি সব উপাধিবর্জিত, তিনিই আমার স্বরূপ এইটা স্পষ্ট করে জানতে হবে। কি করে সেটা জানব ? 'এতম্-অচ্ছিন্নয়া বৃত্ত্যা প্রত্যয়ান্তরশূন্যয়া'। 'অচ্ছিন্নয়া', নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে—'প্রত্যয়-অন্তর-শূন্যয়া'—অন্য ধারণা, অন্য প্রত্যয় আসতে না দিয়ে। একটা ভাব, একটা বৃত্তি নিয়ে চিন্তা করছি—আমি আত্মা, আমি দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই। এগুলি সব জড়। কিন্তু দেখতে তো পাচ্ছি জড় মন কত কি করছে, চিন্তা করছে, কত বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে! এসব কি করে হচ্ছে? বলছেন, মন জড়, কিন্তু আত্মার আলোকে আলোকিত, আত্মা পিছনে আছেন বলে মন কাজ করছে। মন আবার সব ইন্দ্রিয়দের চালাচ্ছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্মেন্দ্রিয়, আমাদের বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান, হাত-পা নেড়ে কাজ, সব মনের সাহায্যে হচ্ছে। আর মনকে চালাচ্ছেন আত্মা। এই আত্মাই আমার স্বরূপ। বলছেন, নিরবচ্ছিন্নভাবে এঁর চিন্তা করতে হবে। 'আমি আত্মা' এই ভাবটাকে শক্ত করে ধরে থাকতে হবে, স্থির বিশ্বাস নিয়ে। যেমন ছোট ছেলেরা খুঁটি ধরে ঘুরপাক খায়, পড়ে যাবার ভয় নেই, সেই-রকম ঐ একটা ভাবকে ধরে থাকতে হবে যে আমি আত্মা, এটাই আমার স্বরূপ, আর কিছু নেই। এই দেহ-টেহ আছে, কিন্তু এগুলি অনিত্য, পরিবর্তনশীল, চলে যাবে। তাই বলছেন, 'এতম্-অচ্ছিন্নয়া বৃত্ত্যা প্রত্যয়-অন্তর-শূন্যয়া'—অন্য প্রত্যয়,

অন্য ভাব, অন্য ধারণা, এসব থাকবে না। আমি আত্মা এই বৃত্তিই ধরে রাখতে হবে, এটাই অচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করতে হবে। আমি যা ভাবব তাই হয়ে যাব। নিজেকে বদ্ধ ভাবলে বদ্ধ হয়েই থাকব আর মুক্ত ভাবলে মুক্ত হয়ে যাব। সব সময় যদি ভাবি যে, আমি আত্মা, তাহলে আমার স্বরূপের জ্ঞান হবে, আমি মুক্ত হয়ে যাব। বলছেন, 'উল্লেখয়ন্'—চিন্তা করা, মনের মধ্যে এই স্বরূপচিন্তা নিয়ে আলোড়ন করা। বেদান্তে কোনও প্রার্থনা নেই, মনটাই সব, মনকে বলতে হবে, তুমি সরে দাঁড়াও, আমি জানি আমি আত্মা, আমি মুক্ত, তুমি আমার কিছু করতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, বালিশ নানা আকারের, কিন্তু ভেতরে এক উপাদান তুলো—আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহে সেই এক তিনি রয়েছেন। দেহ, মন ইত্যাদি উপাধির জন্যে সেটা বুঝতে পারছি না। এটা জানতে গেলে মনের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে, নেতি-নেতি করে সব উপাধি ফেলে দিয়ে, আসল যে স্বরূপ তাঁর কাছে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে—এই 'উল্লেখয়ন্'। তখন 'বিজানীয়াৎ স্বস্বরূপতয়া স্ফুটম্', এমনি করে আত্মাকে নিজের স্বরূপ বলে স্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে। একটা দরজা যেন আটকে ছিল, দরজাটা খুলে গেছে, এবার জানতে পারছি। 'স্বস্বরূপতয়া স্ফুটম্', মনের মধ্যে এইভাবে আলোড়ন করতে থাকলে, এই এক চিন্তা সব সময় লালন করতে থাকলে নিজের স্বরূপটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে। আমিই আমার ভাগ্যবিধাতা, আর কেউ নয়। মুক্তি আমারই হাতে।

অত্রাত্মত্বং দৃঢ়ীকুর্বন্ অহমাদিষু সংত্যজন্।
উদাসীনতয়া তেষু তিষ্ঠেৎ স্ফুটঘটাদিবৎ ॥ ৩৮২

অন্বয় : অত্র (এইখানে, [স্বরূপে, পরমাত্মায়]) আত্মত্বং দৃঢ়ীকুর্বন্ (আত্মবোধ দৃঢ় করে) অহম্-আদিষু সংত্যজন্ (সর্ব বিষয়ে আমি ও আমার বোধ ত্যাগ করে) স্ফুট ঘটাদিবৎ (ভাঙা ঘটের তুল্য জ্ঞানে) তেষু (সেই সবে [যা সব আমি ও আমার বলে পরিচিত]) উদাসীনতয়া তিষ্ঠেৎ (উদাসীনভাবে থাকবে)।

সরলার্থ : পরমাত্মায় আত্মবোধ দৃঢ় করে সর্ববিষয়ে আমি ও আমার বুদ্ধি ত্যাগ করে সেই সব বস্তু ভাঙা কলসীর মতো তুচ্ছ জ্ঞান করে উদাসীন হয়ে থাকবে।

ব্যাখ্যা: বলছেন, আমি ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মা এই বোধ দৃঢ় করো। আর যেসব অনিত্য বিষয়ে 'আমি-আমার' করে আত্মবুদ্ধি আরোপ করেছ সেগুলি মন থেকে নিঃশেষে ত্যাগ করো। এসব ভাঙা কলসীর মতো অকিঞ্চিৎকর এই ভেবে উদাসীন হয়ে থাকো। 'অত্র আত্মত্বং দৃঢ়ীকুর্বন্'—আত্মাই আমার স্বরূপ এটা দৃঢ়ভাবে জেনে নিতে হবে। 'দৃঢ়ীকুর্বন্', খুব শক্তভাবে এই ধারণাটা ধরে রেখে। আমি আত্মা এই ভাব নিয়ে চিন্তা করব, এই চিন্তাটা খুঁটির মতো শক্ত করে ধরে থাকব। 'অহমাদিষু

সংত্যজন্'—আমি-আমার এই বোধটা দূর করে দিয়ে। অর্থাৎ দেহ, মন এসবে আমি-আমার বোধ বর্জন করতে হবে, কাঁচা আমিটা ফেলে দিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলতেন—কাঁচা আমি আর পাকা আমি। সবার থেকে নিজেকে যখন পৃথক করে ভাবি, তখন সেটা আমার কাঁচা আমি। কিন্তু আমি যদি ভাবি আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, আমার যে আমি তিনিই আত্মা, তিনিই সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন, তাহলে সেটা আমার পাকা আমি। আমার একটা পরিবার আছে, আমি একটা বড় চাকরি করি, আমার এত মান সম্মান, এগুলো হচ্ছে 'কাঁচা আমি'। একেই বলছে 'অহমাদি'। আমরা যাকে মায়া বলি তার প্রকাশ এই 'কাঁচা আমি'—অহংতা আর মমতা, এই আমি আর আমার বোধ। আমরা সব সময় আমি-আমি করে যাচ্ছি, নিজের প্রশংসা করছি, মনে ভাবছি কত কি করেছি। বলছেন, এই ভাবটা ত্যাগ করতে হবে। 'সংত্যজন'—সম্যকভাবে, পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ। এগুলো সব ত্যাগ করে, 'উদাসীনতয়া তিষ্ঠেৎ স্ফুটঘটাদিবৎ'—এগুলো ভাঙা কলসীর মতো তুচ্ছ বোধে ছুঁড়ে ফেলে দাও, দিয়ে উদাসীন হয়ে নিরপেক্ষভাবে থাকো। এই উদাসীন একটা ভয়ানক শব্দ। উদাসীন—আমি অগ্রাহ্য করি, আমি নিরপেক্ষ, কিছুর অপেক্ষা করি না। ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ আমি অগ্রাহ্য করি, কোন কিছু আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। এরকম কত লোক দেখা যায় যাঁরা যতই যা কিছু হোক, স্থির অচঞ্চল, বীরের মতন। যেমন জনকরাজা বলছেন, আমি মিথিলার অধিপতি, আমার অগাধ ধন সম্পদ্ কিন্তু মিথিলা যদি পুড়ে যায় আমার কিছু এসে যায় না। এই ভাব—কোনও কিছু ভ্রূক্ষেপ করি না, সব সময় শুধু আত্ম-চিন্তা করছি আর কোনও চিন্তা করছি না। 'সংত্যজন্', সবকিছু ত্যাগ করে বসে আছি। ভালোকেও ত্যাগ করছি, মন্দকেও ত্যাগ করছি, যা কিছু অনিত্য সব ত্যাগ করে উদাসীন হয়ে আছি। এই যে সম্পূর্ণ ত্যাগ, একেই সন্ন্যাস বলা হয়। নিন্দা, প্রশংসা, কিছুতে আমার কিছু এসে যায় না। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, (গী, ২।৩৮) সুখ-দুঃখ সমান করেছি, মান-অপমান উপেক্ষা করে যাচ্ছি। এইরকম যে একটা ভাব, এ বীরের আয়ত্তে আসে, দুর্বলের নয়। বেদান্ত তাই বলছেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'।

বিশুদ্ধমন্তঃকরণং স্বরূপে নিবেশ্য সাক্ষিণ্যববোধমাত্রে।
শনৈঃ শনৈর্নিশ্চলতামুপানয়ন্ পূর্ণং স্বমেবানুবিলোকয়েৎ ততঃ ॥৩৮৩

অন্বয় : বিশুদ্ধম্-অন্তঃকরণং (শুদ্ধ মনকে) সাক্ষিণি অববোধমাত্রে স্বরূপে (সাক্ষিস্বরূপ বোধমাত্র চিদাত্মায়) নিবেশ্য (নিবিষ্ট করে) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) নিশ্চলতাম্ উপানয়ন্ ততঃ ([চিদাত্মায়] অচঞ্চল স্থিতি অর্জন করলে তখন) পূর্ণং স্বম্ এব অনুবিলোকয়েৎ (পূর্ণ স্বরূপকেই সাক্ষাৎ করবে)।

সরলার্থ : শুদ্ধ মনকে সাক্ষিস্বরূপ বোধমাত্র চিদাত্মায় নিবিষ্ট করে ধীরে ধীরে আত্ম-স্থিতি অর্জন করতে পারলে পূর্ণ স্বরূপকে সাক্ষাৎ করবে।

ব্যাখ্যা : এখানে বলছেন, চিত্তশুদ্ধি হওয়ার পর সেই শুদ্ধ মনকে যদি সাক্ষিস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ চিদাত্মায় নিশ্চলভাবে ধরে রাখা যায় তাহলে পূর্ণ স্বরূপের সাক্ষাৎ হয়। 'বিশুদ্ধম্-অন্তঃকরণম্'—শুদ্ধ মনকে। শুদ্ধ মন মানে কি? শুদ্ধ মন হচ্ছে, যে মন থেকে অজ্ঞানের কালিমা সব চলে গেছে। বেদান্তে আর কোন পাপ নেই, এই অজ্ঞানকেই পাপ বলা হয়। অজ্ঞান মানে যেটা যা নয় সেটাকে তাই ভাবা। এই অজ্ঞানের জন্যেই আমরা দোষ করি, ভুল করি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান লাভ করা, অজ্ঞানকে দূর করা। এই অজ্ঞানের জন্যেই আমি দেহসর্বস্ব হয়ে গেছি। দেহের সুখই আমার কাছে সুখ। দেখছি যে, এই দেহ যা ছিল তা থাকছে না, জীর্ণ হচ্ছে শীর্ণ হচ্ছে, তবু আমি এই দেহের পিছনে ছুটে চলেছি, এরই সেবা করে যাচ্ছি। কিন্তু বেদান্ত বলছেন, না, এ কিছু না, এ একটা উপাধি। যেমন গীতাতে বলছেন, এ একটা ছিন্ন বস্ত্র, একে ত্যাগ করে একটা নতুন নিতে পারো। তাই বলছেন, 'বিশুদ্ধম্-অন্তঃকরণং স্বরূপে নিবেশ্য', তোমার যে বিশুদ্ধ মন—অর্থাৎ দেহকে কেন্দ্র করে যেসব অভিমান, কামনা-বাসনা ইত্যাদি কালিমা মনকে আবৃত করে রাখে, যেগুলো সব উপাধি, সেগুলো যে-মন থেকে সরে গেছে—সেই মনকে নিজের স্বরূপে নিবিষ্ট করতে হবে। স্বরূপটা কি? আত্মা, সাক্ষিস্বরূপ চিদাত্মা। তাতে শুদ্ধ মনকে লাগিয়ে রাখতে হবে। বলছেন : 'সাক্ষিণি অববোধমাত্রে'—আমি সাক্ষী, দ্রষ্টা; এ জীবনটা চলছে, যেন নাটক দেখছি। কত হাসি, কত কান্না—আমাকে কিছু স্পর্শ করছে না। একটা তরোয়াল খাপের মধ্যে রয়েছে, লোকে খাপটাকেই তরোয়াল মনে করছে। তা নয়, খাপটা উপাধি, তরোয়ালটা আত্মা। নদীর ধারে বসে আছি, নদীতে কত কি ভেসে যাচ্ছে, আমাকে কিছু স্পর্শ করছে না। ঐরকম আমার স্বরূপটা—সাক্ষী, দ্রষ্টা। আর কি ? 'অববোধমাত্র'—বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ আমার আত্মা। 'শনৈঃ শনৈঃ'—ধীরে ধীরে—মনকে ঐ স্বরূপে স্থির করতে হবে। একদিনে হবে না, ভুল হবে , আবার মনটাকে ধরতে হবে, কিন্তু হবে, ধীরে ধীরে এগোবে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন; শ্রবণ করতে হয়, মনন করতে হয়, তারপর ধ্যান করতে হয়—নিরবচ্ছিন্ন, নিরন্তর, তৈলধারাবৎ ধ্যান। বলছেন, 'নিশ্চলতাম্ উপানয়ন্', এই নিশ্চল হয়ে থাকাটা অর্জন করতে হবে। একদিনে হবে না, লেগে থাকতে হয়। অনেকে পেরেছে, তুমিও পারবে, ধীরে ধীরে হবে। তখন 'পূর্ণং স্বম্-এব অনুবিলোকয়েৎ ততঃ'। 'স্বম্'—নিজেকে; 'পূর্ণং স্বম্-এব' মানে পূর্ণতাস্বরূপ নিজেকেই; 'অনুবিলোকয়েৎ'—দেখতে পাবে। এখন তো আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না, দেহটা দেখছি, কিন্তু আত্ম-চিন্তা যদি

করি তাহলে নিজেকে জানতে পারব। 'ততঃ'—এইসব থেকে। এইভাবে আমার শুদ্ধ মন যখন নিশ্চল হয়ে আত্মায় অবস্থান করবে তখন আমার স্বরূপটা আমি বুঝতে পারব। শুদ্ধ মনে আমার স্বরূপ জ্বলজ্বল করবে। নির্মল, নিশ্চল মনে আমার আত্মা স্বমহিমায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ হবেন।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদিভিঃ স্বাজ্ঞানক্লৃপ্তৈরখিলৈরুপাধিভিঃ।
বিমুক্তমাত্মানমখণ্ডরূপমং পূর্ণং মহাকাশমিবাবলোকয়েৎ॥ ৩৮৪

অন্বয় : স্ব-অজ্ঞান-ক্লৃপ্তৈঃ (নিজের অজ্ঞানদ্বারা প্রতিষ্ঠিত) দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনঃ-অহম্-আদিভিঃ-অখিলৈঃ-উপাধিভিঃ (দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহঙ্কার ইত্যাদি অজস্র উপাধি) বিমুক্তম্-আত্মানম্ (বিমুক্ত আত্মাকে) অখণ্ডরূপম্ পূর্ণং-মহাকাশম্-ইব-অবলোকয়েৎ (অখণ্ডরূপ, পূর্ণ, মহাকাশের মতো দর্শন করবে)।

সরলার্থ : স্বীয় অজ্ঞতাদ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন অহঙ্কার ইত্যাদি অজস্র উপাধিমুক্ত আত্মাকে অখণ্ডরূপে পূর্ণ মহাকাশের মতো দেখবে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহঙ্কার ইত্যাদি যে অজস্র উপাধি, এরা আমাদের অজ্ঞতার সুযোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এদের জন্যেই এক আত্মা বহু বলে প্রতিভাত হচ্ছেন, আমরা এক হয়েও পরস্পর থেকে নিজেদের আলাদা ভাবছি। এই উপাধি দিয়ে নিজের স্বরূপকে যদি ঢেকে না রাখতাম তো দেখতে পেতাম উপাধিমুক্ত আত্মা অখণ্ডরূপে পূর্ণরূপে মহাকাশের মতো বিদ্যমান। বলছেন : 'দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনঃ-অহম্-আদিভিঃ স্ব-অজ্ঞান ক্লৃপ্তৈঃ-অখিলৈঃ-উপাধিভিঃ'। এই যে অসংখ্য, অগুনতি, অখিল উপাধি এগুলি অজ্ঞতা থেকে আসছে, কারণ আমরা তো জানি নাম, রূপ নিত্য নয়। নাম নিয়ে আমরা জন্মাইনি, রূপ মানে দেহ, সেটাও থাকবে না। এগুলি উপাধি, চাপানো জিনিস। একটা অধিষ্ঠান আছে তার ওপর এদের আরোপ করা হয়েছে। সেই অধিষ্ঠান আত্মা। আত্মাই সত্য, উপাধি মিথ্যা। ঐ আত্মাই আমার স্বরূপ—নির্গুণ, নিরাকার, ব্যাধি নেই, বার্ধক্য নেই, জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না, নির্বিশেষ, নিরুপাধিক, সর্বব্যাপী। আত্মার নাম নেই, রূপ নেই, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য কিছু নেই, একাকার। কিন্তু উপাধির জন্যে এই আত্মাকে বহু বলে মনে হয়, পৃথক পৃথক মনে হয়। অসংখ্য উপাধি। 'দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনঃ-অহম্-আদিভিঃ-অখিলৈঃ উপাধিভিঃ'—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহঙ্কার প্রভৃতির জন্যে এইসব অসংখ্য উপাধির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই অসংখ্য উপাধিগুলির একটাই কারণ—অজ্ঞান। 'স্ব-অজ্ঞান-ক্লৃপ্তৈঃ'—আমার নিজের অজ্ঞান থেকেই এই উপাধিগুলো এসেছে। কাজেই আমাদের অজ্ঞান দূর করতে হবে। অজ্ঞান যাবে কি করে ? সব সময় স্বরূপের চিন্তা করতে

করতে অজ্ঞান চলে যাবে। তখন 'বিমুক্তম্-আত্মানম্-অখণ্ডরূপম্ পূর্ণং মহাকাশম্-ইব-অবলোকয়েৎ'। পরমাত্মাই জীবাত্মা কিন্তু অজ্ঞানের জন্যে, উপাধির জন্যে পরমাত্মা থেকে নিজেকে আলাদা মনে করছিলাম। অজ্ঞানটা চলে গেলেই এই উপাধিমুক্ত আত্মা পূর্ণ, অখণ্ডরূপে মহাকাশের মতো প্রতীয়মান হবেন।

ঘট-কলশ-কুসূল-সূচিমুখ্যৈর্গগনমুপাধিশতৈর্বিমুক্তমেকম্।
ভবতি ন বিবিধং তথৈব শুদ্ধং পরমহমাদিবিমুক্তমেকমেব॥৩৮৫

অন্বয় : ঘট-কলশ-কুসূল-সূচিমুখ্যৈঃ উপাধিশতৈঃ বিমুক্তম্ (ঘট, কলশ, জালা, সূচ ইত্যাদি শত শত উপাধিমুক্ত) গগনম্ (আকাশ) একম্ ভবতি ন বিবিধং (একই থাকে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে থাকে না) তথা এব (সেইরকমই) অহম্-আদি বিমুক্তম্ শুদ্ধং পরম্ (অহঙ্কার ইত্যাদি বিমুক্ত শুদ্ধ পরমাত্মা) একম্ এব (এক, অদ্বিতীয়ই থাকেন)।

সরলার্থ : ঘট, কলস, জালা, সূচ ইত্যাদি শত শত উপাধিমুক্ত আকাশ যেমন বিবিধ ভাবে না থেকে এক হয়ে যায়, সেইরকমই অহংবুদ্ধি বিবর্জিত শুদ্ধ পরমাত্মা এক অদ্বিতীয়রূপে প্রতিভাত হন।

ব্যাখ্যা: আগের শ্লোকে যে উপাধির কথা বলেছেন সেই কথাই আকাশ ও ঘট ইত্যাদির উপমা দিয়ে আরও বিশদ করে বলছেন। 'ঘট-কলশ-কুসূল-সূচিমুখ্যৈঃ-গগনম্-উপাধি শতৈঃ-বিমুক্তম্'। কুসূল মানে জালা। ঘট, কলস, জালা, ছুঁচ, এসবের মধ্যে সেই সর্বব্যাপী আকাশই বিরাজ করছে। এইসব ঘট, কলস, ইত্যাদি নাম-রূপ দিয়ে চিহ্নিত করে আকাশকে ঘটাকাশ পটাকাশ এসব বলছি, কিন্তু আকাশ তো সর্বব্যাপী তাই এসবের বাইরেও আছে, তাকে বলি মহাকাশ। অন্তঃ পূর্ণ, বহিঃ পূর্ণ, অন্তরেও আছে, বাইরেও আছে। 'উপাধিশতৈঃ-বিমুক্তম্ গগনম্ একম্ ভবতি ন বিবিধং'—এই শত শত উপাধি থেকে মুক্ত আকাশ সেই একই রয়েছে, 'ন বিবিধং'—ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়নি। 'তথা-এব-শুদ্ধং-পরম্-অহম্-আদি বিমুক্তম্-একম্-এব'; পরমাত্মাও সেই রকম—এক, অখণ্ড। 'শুদ্ধম্ পরম্'—শুদ্ধ কাকে বলা হচ্ছে? যা নিরুপাধিক, উপাধি বর্জিত, আমাদের স্বরূপ। 'পরম্'—পরম-আত্মা, 'পরম' মানে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ কে? না আত্মা, তিনি সত্যস্বরূপ তাই পরমাত্মা। 'অহম্-আদি' অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি অজস্র উপাধিতে যে অহংবুদ্ধি। কিন্তু আমার যে 'আমি', শুদ্ধ, পরম, সেই আমি এসব থেকে বিমুক্ত, তার কোনও উপাধি নেই, 'অহমাদি-বিমুক্তম্-একম্-এব'। স্বরূপত সবাই এক, বিভিন্ন হয়েছি শুধু নাম-রূপ প্রভৃতি উপাধির জন্যে। উপাধিমুক্ত আত্মা একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তা মৃষামাত্রা উপাধয়ঃ।
ততঃ পূর্ণং স্বমাত্মানং পশ্যেদেকাত্মনা স্থিতম্ ॥৩৮৬

অন্বয়: ব্রহ্মা-আদি-স্তম্ব পর্যন্তাঃ উপাধয়ঃ মৃষামাত্রাঃ (ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত কিছু উপাধি, তাই এগুলি সব মিথ্যা) ততঃ (সেইজন্যে) স্বম্-আত্মানং (নিজের আত্মাকে) এক-আত্মনা স্থিতং পূর্ণং পশ্যেৎ (এক অদ্বিতীয় আত্মারূপে পূর্ণভাবে বিরাজমান, এইভাবে দেখতে হয়)।

সরলার্থ: ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত স্থাবর জঙ্গম সবকিছুই উপাধি, তাই এগুলো মিথ্যা। সেইজন্যে নিজের আত্মাকে, এক অদ্বিতীয় আত্মা পূর্ণরূপে বিরাজ করছেন, এইভাবে দেখতে হয়।

ব্যাখ্যা: আবার সেই উপাধির কথা বলছেন। 'ব্রহ্মা-আদি স্তম্ব পর্যন্তাঃ মৃষামাত্রাঃ উপাধয়ঃ'। ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত এই যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, এসবগুলিই 'উপাধয়ঃ'—উপাধি; তাই 'মৃষামাত্রাঃ'—মিথ্যা। ব্রহ্মা আর ব্রহ্ম কিন্তু এক নয়। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, সর্বব্যাপী; আর ব্রহ্মা যখন বলি সেটা হচ্ছে, মায়া-উপহিত-চৈতন্য। মায়া একটা উপাধি, এই নিয়ে তিনি ব্রহ্মা হয়েছেন, স্রষ্টা হয়েছেন। আর ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, তাঁকে আমরা ধরতে পারি না, বুঝতে পারি না, তিনি যে কি তা বলতেই পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হননি। মায়াকে আশ্রয় করে তিনি সৃষ্টি করতে প্রস্তুত হয়েছেন, তিনি ঈশ্বর, ভগবান, হিরণ্যগর্ভ, কিন্তু মায়াও তো উপাধি, মূল উপাধি, তাই বলছেন, 'ব্রহ্মা-আদি-স্তম্ব-পর্যন্তাঃ'; স্তম্ব মানে তৃণ, ঘাস। ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে তৃণ পর্যন্ত আমরা এক, কিন্তু উপাধির জন্যে বিভিন্ন হয়েছি। কত উপাধি ! জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, ঘাসপাতা এসব তো এক, সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম, ভিন্ন দেখছি কেন? নাম-রূপের জন্যে, উপাধির জন্যে। বলছেন, 'মৃষা-মাত্রাঃ-উপাধয়ঃ', মৃষা বলছেন, মিথ্যা বলছেন। যিনি সৃষ্টিকর্তা ভগবান তিনিও মিথ্যা? হ্যাঁ, পরম সত্যের তুলনায় তিনিও মিথ্যা, উপাধির জন্যে। তাঁর স্বরূপটা হচ্ছে নির্গুণ, নিরাকার, নিরুপাধিক। কিন্তু ব্রহ্ম যখন মায়ার সঙ্গে যুক্ত হন তখন তিনি ব্রহ্মা। তিনি নির্গুণ ছিলেন, একটা উপাধি গ্রহণ করলেন, মায়া সেই উপাধি, সেই উপাধি নিয়ে তিনি একটা ব্যক্তিসত্তা হলেন। যিনি existence absolute, সৎস্বরূপ, শুধু সত্তা আর কিছু নয়, তিনি ধীরে ধীরে ব্যক্তি-সত্তা হয়ে যাচ্ছেন, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল হচ্ছেন—যিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন, তিনি একটা ব্যক্তি-সত্তায় এসে ঈশ্বর হয়েছেন, সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন আবার ধ্বংস করছেন। তিনি স্রষ্টা, পালনকারী, ধ্বংসকারী, তিনি ব্রহ্মা, তিনি যেন মস্ত বড় একটা ঢেউ, ভবসমুদ্রে সবচেয়ে বড় ঢেউ। ভব মানে তো যা

হয়েছে, যা আছে, সেই অস্তিত্বের বিরাট বড় ঢেউ; আবার ছোট ছোট যেসব প্রকাশ, স্তম্ব ইত্যাদি, সেগুলি ছোট ছোট ঢেউ। কিন্তু সবার পেছনে সেই এক ব্রহ্ম-সমুদ্র, সেখান থেকে সব ঢেউ উঠছে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে বলছেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সবকিছুই ব্রহ্ম। স্বামীজী মানতে চাইছেন না, নানা রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করছেন, বলছেন, ঝাঁটাটাও ব্রহ্ম ? ভাবে টলমল করছেন ঠাকুর, স্বামীজীকে ছুঁয়ে দিয়েছেন। অমনি স্বামীজী দেখছেন সব চৈতন্যময়, 'ব্রহ্মময়ং জগৎ'। ব্রহ্মা হতে কীটপতঙ্গ, তৃণগুল্ম পর্যন্ত সবকিছুর মধ্যে সেই 'একো রসঃ', এক তিনি রয়েছেন, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বগত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন, সবকিছুর অন্তরেও তিনি বাইরেও তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার এর ব্যবহারিক দিকের কথাও তুলছেন। বলছেন, বাঘও তো ব্রহ্ম তাই বলে বাঘের সঙ্গে কোলাকুলি করতে যেও না। ব্যবহারিক জগতে তফাত রাখতে হবে, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, স্বরূপত সবাই ব্রহ্ম। 'বহু'-টাকে ব্যবহারিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু তার পেছনে যে 'এক' আছে সেটাও মনে রাখতে হবে। তাহলে জীবনে ভারসাম্য আসবে। স্বামীজী বলছেন, এ্যামিবা থেকে বুদ্ধ পর্যন্ত সবার ভেতরে এক চৈতন্য, শুধু প্রকাশের তারতম্য। 'ততঃ পূর্ণং স্বম্-আত্মানং পশ্যেৎ-এক-আত্মনা-স্থিতম্'; 'পশ্যেৎ'—দেখতে হয়, 'স্বম্-আত্মানং'—আমার নিজের আত্মাকে, 'এক-আত্মনা স্থিতম্ পূর্ণম্'—এক, অদ্বিতীয় আত্মারূপে তিনি অবস্থিত এবং তিনি পূর্ণ। পূর্ণভাবে সবাইকার মধ্যে বিরাজ করছেন। এই দৃষ্টি লাভ করতে হবে। তোমার যে আত্মা তিনিই এক, অদ্বিতীয় আত্মা। তিনি পূর্ণরূপে ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত, সর্বত্র বিরাজমান। এখানে একটু ওখানে একটু নয়, সমগ্রভাবে সর্বত্র তিনি আছেন।

যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং তদ্‌বিবেকে তৎ তন্মাত্রং নৈব তস্মাদ্‌বিভিন্নম্।
ভ্রান্তের্নাশে ভাতি দৃষ্টাহিতত্ত্বং রজ্জুস্তদ্‌বদ্‌বিশ্বমাত্মস্বরূপম্॥ ৩৮৭

অন্বয়: যত্র (যেখানে, যে অধিষ্ঠানে) ভ্রান্ত্যা কল্পিতং (ভ্রান্তিবশত [কোনও বস্তু] কল্পিত হয়) তৎ (সেই বস্তু) তৎ-বিবেকে (সেই বস্তুবিচারে) তৎ-মাত্রং (সেই অধিষ্ঠানই থাকে) তস্মাৎ (সেই অধিষ্ঠান থেকে) বিভিন্নম্ ন এব (ভিন্ন কিছু থাকে না) ভ্রান্তেঃ নাশে (ভ্রান্তির নাশ হলে) দৃষ্ট-অহিতত্ত্বং (রজ্জুকে যে সর্পের মতো দেখা গিয়েছিল) রজ্জুঃ ভাতি (সেটা রজ্জুরূপেই প্রকাশ পায়) তৎ-বৎ (সেই রকম) বিশ্বম্ (এই বিশ্ব) আত্মস্বরূপম্ (আত্মস্বরূপেই প্রকাশ পায়)।

সরলার্থ: ভ্রান্তিবশত যদি একটা কোনও বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে কল্পনা করা হয় তাহলে বস্তুবিচারের দ্বারা জ্ঞান হলে সেই অধিষ্ঠানরূপ বস্তুটিই থাকে, অন্য কিছু

থাকে না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়েছিল, সেই ভ্রান্তি নাশ হলে রজ্জু স্বরূপেই প্রকাশ পায়। সেইরকম এই বিশ্ব আত্মস্বরূপেই প্রকাশ পায়।

ব্যাখ্যা: এই জগৎটা কি? কোথা থেকে এলো? কি করে এলো? বলছেন : জগৎটা একটা ভুল, কল্পিত জিনিস। অজ্ঞতা বা অজ্ঞান থেকে এই ভুলটা আসছে। অন্ধকারে দড়িকে সাপ কল্পনা করে আমাদের যেমন ভুল হয়, এ-ও ঠিক তাই। 'যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং'—কোন জিনিসকে দেখতে যদি আমাদের ভুল হয়, ভুলবশত যদি কোন জিনিসের জায়গায় আরেকটা জিনিসের কল্পনা করি, তাহলে ভুল ভাঙার উপায় কি ? আসলে যে জিনিসটা সেই জিনিসটাকে জানা। দড়িকে অন্ধকারে সাপ ভেবে ভয় পাচ্ছি। এই ভুলটা যাবে কি করে ? দড়িটাকে দেখলে। রজ্জুর জ্ঞান হলে, সর্পের ভ্রমজ্ঞানটা চলে যাবে। যে বস্তুকে নিয়ে আমার ভুল হয়েছে, 'তৎ'—সেই বস্তু, 'তৎ বিবেকে'—সেই বস্তুকে নিয়ে বিচার করে যখন সেই বস্তু সম্বন্ধে ঠিক জ্ঞান হয়, তখন 'তৎ-মাত্রম্'—সেই বস্তুতেই পর্যবসিত হয়, কল্পিত বস্তুটি আর থাকে না। 'তৎ তন্মাত্রম্ নৈব তস্মাৎ বিভিন্নম্'—সেটা যে বস্তু ছিল সেই বস্তুই থাকে, তার থেকে আলাদা কিছু আর থাকে না। দড়িটা আছে সাপটা নেই। সাপটা গেলো কোথায়? ওই দড়ির মধ্যে গেলো। দড়ি আর সাপ আর ভিন্ন রইল না। 'ভ্রান্তেঃ নাশে'—ভুলটা ভেঙে গেলে 'দৃষ্ট-অহিতত্ত্বং রজ্জুঃ ভাতি'। 'ভাতি'—আমার কাছে স্পষ্ট হয়। কি স্পষ্ট হয়? 'অহিতত্ত্বং'; অহি-তত্ত্ব বুঝতে পারি। অহি-তত্ত্বটা কি? না, দড়িটাকে যে ভুল করে সাপ ভেবেছিলাম সেইটা। দড়িটাকে সাপ ভাবার ভুলটা চলে গেলে যেমন দড়িটাকে দড়িই দেখি, 'তৎবৎ বিশ্বম্-আত্মস্বরূপম্', সেইরকম এই বিশ্বকে, এই যে এত বৈচিত্রপূর্ণ বিশ্ব, একেও আমরা ভুল দেখছি। সেই ভুলটা ভেঙে গেলে একে 'আত্মস্বরূপম্' দেখব। আমি ছাড়া আর কিছু নেই, এইটা দেখব। প্রথমে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। নেতি নেতি করে বিচার করে সব তখন ত্যাগ করছি। তখন দেখি একমাত্র 'সৎ' ব্রহ্ম, তিনিই শুধু আছেন। তারপর দেখি সবই তিনি, যেটা উপাধি বলছিলাম সেও ব্রহ্ম। সমুদ্রের তরঙ্গ দেখছি কিন্তু সেও তো জল, সমুদ্র থেকে আলাদা কিছু তো নয়। শেষে সব ব্রহ্ম—ব্রহ্মময়ং জগৎ।

স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।
স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন॥ ৩৮৮

অন্বয়: স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়ম্-ইন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ (আমিই ব্রহ্মা, আমিই বিষ্ণু, আমিই ইন্দ্র আমিই শিব) স্বয়ং ইদং সর্বং বিশ্বম্ (আমিই এই সমগ্র বিশ্ব) স্বস্মাৎ অন্যৎ ন কিঞ্চন (আমার থেকে ভিন্ন আর কিছুই নেই)।

সরলার্থ: আমিই আত্মারূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও শিব। এই সমগ্র বিশ্ব এও আমি। আমার থেকে ভিন্ন আর কিছুই নেই।

ব্যাখ্যা: বলছেন, এই বিশ্বচরাচরের সবকিছু আমি, আমি ছাড়া কিছু নেই। কীটপতঙ্গ আমি, আবার ব্রহ্মা-বিষ্ণুও আমি। এক আত্মা। আমরা যে এ-জগতে বহু দেখি সে অজ্ঞানের জন্যে। জ্ঞান হলে বুঝতে পারি, এ সবই স্বয়ং আমি, আমার আত্মা, যে আত্মা 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' (ক, ২।২।৯)। স্বামীজী বলছেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'? আবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, চোখ বুঝলে ভগবানকে দেখতে পাও আর চোখ খুলে দেখতে পাও না? ভগবান অর্থাৎ ব্রহ্ম তিনি সর্বত্র আছেন। যা দেখি তাই তো তিনি! এইরকম যখন বোধ হয় তখন দেখি, 'স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ'—যিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তিনি আমি, পালনকারী বিষ্ণুও আমি, প্রলয়কারী মহেশ্বর শিব আমি, আবার স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রও আমি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র এই যে সব বিরাট ব্যক্তিসত্তার ধারণা, এসবও উপাধি, পরম সত্যের তুলনায় এঁরাও মিথ্যা। পরম সত্য শুধু সৎস্বরূপ স্বয়ং আত্মা যিনি সর্বভূতে বিরাজ করছেন। বলছেন, 'স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বং স্বস্মাৎ-অন্যৎ-ন কিঞ্চন', আত্মস্বরূপ আমিই এই সমস্ত বিশ্বচরাচর জুড়ে আছি, আমি ছাড়া অন্য কিছু আর নেই।

অন্তঃ স্বয়ং চাপি বহিঃ স্বয়ং চ স্বয়ং পুরস্তাৎ স্বয়মেব পশ্চাৎ।
স্বয়ং হ্যবাচ্যাং স্বয়মপ্যুদীচ্যাং তথোপরিষ্টাৎ স্বয়মপ্যধস্তাৎ॥ ৩৮৯

অন্বয়: অন্তঃ স্বয়ং (আত্মা স্বয়ং অন্তরে) চ-অপি বহিঃ স্বয়ং (আবার স্বয়ং বাইরে) চ স্বয়ং পুরস্তাৎ (নিজেই সম্মুখে) স্বয়ম্-এব পশ্চাৎ (নিজেই আবার পশ্চাতে) স্বয়ং হি অবাচ্যাং (দক্ষিণেও নিজে) স্বয়ম্-অপি উদীচ্যাং (উত্তরেও নিজে) তথা স্বয়ং উপরিষ্টাৎ (তেমনি স্বয়ং উপরে) অপি অধস্তাৎ (আবার নীচে)।

সরলার্থ: আত্মা স্বয়ং অন্তরে আছেন বাইরে আছেন সম্মুখে আছেন পশ্চাতে আছেন। আত্মাই স্বয়ং দক্ষিণে আছেন, উত্তরে আছেন আবার ঊর্ধ্বেও আছেন নিম্নেও আছেন।

ব্যাখ্যা: বলছেন, এই আত্মা, তিনি ভিতরেও আছেন বাইরেও আছেন। 'অন্তঃ স্বয়ং চ-অপি বহিঃ স্বয়ং'—আমি ভিতরে আছি, বাইরেও আছি। 'অন্তঃ স্বয়ং'—অন্তর্জগৎ পূর্ণ করে তিনি স্বয়ং আছেন আর আছেন বলেই আমার ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সব কাজ করছে। আবার 'চ অপি বহিঃ স্বয়ং', আবার এই বহির্জগতের সবকিছুর মধ্যে, সূর্য চন্দ্র থেকে আরম্ভ করে কীটপতঙ্গ লতাগুল্ম সবকিছু জুড়ে তিনি স্বয়ং

আছেন। 'তদ্ অন্তরস্য সর্বস্য তদ্ উ সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ' (ঈ, ৫)। ভিতরেও তিনি বাইরেও তিনি। অন্তঃ পূর্ণ, বহিঃ পূর্ণ। একটা কলসী জলে ডুবে গেলো, তার ভেতরেও জল বাইরেও জল। সেইরকম ব্রহ্ম বা আত্মা আমাদের বাইরেও আছেন ভেতরেও আছেন। 'স্বয়ং পুরস্তাৎ'—তিনি সামনে আছেন আবার 'স্বয়ং এব পশ্চাৎ'—তিনি পিছনেও আছেন। ওই যে কলসী যেটা জলে ভরে আছে, জলের মধ্যে ডুবে আছে, তার ভেতরে জল, বাইরে জল, ওপরে জল, নীচে জল। সেইরকম আমরা ব্রহ্মের মধ্যে ডুবে আছি—তিনি বাইরে আছেন, ভেতরে আছেন, সম্মুখে আছেন, পশ্চাতে আছেন। 'স্বয়ং হি অবাচ্যাং স্বয়ম্-অপি-উদীচ্যাং তথা উপরিষ্টাৎ স্বয়ম্ অপি অধস্তাৎ'। স্বয়ং তিনি দক্ষিণে আছেন, উত্তরে আছেন, ওপরে আছেন, নীচে আছেন। তিনি সর্বব্যাপী, 'সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ', আবার সর্বগত, 'অন্তরস্য সর্বস্য'।

তরঙ্গ-ফেন-ভ্রম-বুদ্‌বুদাদি সর্বং স্বরূপেণ জলং যথা তথা।
চিদেবদেহাদ্যহমন্তমেতৎ সর্বং চিদেবৈকরসম্ বিশুদ্ধম্॥ ৩৯০

অন্বয়: যথা (যেমন) তরঙ্গ-ফেন-ভ্রম-বুদ্‌বুদাদি সর্বং (তরঙ্গ, ফেনা, আবর্ত, বুদ্বুদ ইত্যাদি সবকিছু) স্বরূপেণ জলং (স্বরূপত জলমাত্র) তথা (সেইরকম) দেহ-আদি-অহম্-অন্তম্-এতৎ সর্বং চিদ্-এব (দেহ থেকে অহং পর্যন্ত এ সবকিছুই চৈতন্যমাত্র) সর্বং বিশুদ্ধং একরসং চিদ্-এব (সবকিছুই বিশুদ্ধ একরস চৈতন্য)।

সরলার্থ: যেমন তরঙ্গ-ফেনা-আবর্ত-বুদ্বুদ ইত্যাদি স্বরূপত শুধু জল, তেমনি দেহ থেকে অহং পর্যন্ত এ সবই শুধু চৈতন্য, সবই বিশুদ্ধ একরস চৈতন্যমাত্র।

ব্যাখ্যা: এখানে সমুদ্রের উপমা দিয়ে বলছেন, অনন্ত জলরাশি, তার মধ্যে অনেক তরঙ্গ, তুমি একটা তরঙ্গ, আমি একটা তরঙ্গ, আরও কত তরঙ্গ। শুধু কি তরঙ্গ! বলছেন, 'তরঙ্গ-ফেন-ভ্রম-বুদ্‌বুদাদি'; সমুদ্রে তরঙ্গ আছে আবার ফেনা আছে, 'ভ্রম' বা আবর্ত আছে আবার বুদ্বুদ আছে। এসব সমুদ্র থেকে হচ্ছে, সমুদ্রেই আছে আবার সমুদ্রেই মিশে যাচ্ছে। তেমনি ব্রহ্ম-সমুদ্রে সবাই যেন তরঙ্গ, বুদ্বুদ, ফেনা ইত্যাদি। এই ব্রহ্ম-সমুদ্রে আমরা সবাই উঠছি, মিশে যাচ্ছি—ছোট-বড় সবাই, গ্রহ-নক্ষত্র, কীটপতঙ্গ সবকিছু। স্বামীজী বলছেন, existence absolute—এই ব্রহ্ম-সমুদ্র হলো তাই। আর আমরা সব তরঙ্গ—existence relative। আমরা যখন নাম-রূপ নিয়ে বহু দেখি তখন সেই ব্রহ্ম-সমুদ্রের তরঙ্গাদি, আর যখন এক দেখি তখন সেই সমুদ্রে মিশে গেছি। ব্রহ্মকে বলি 'সৎ'—existence, অস্তিত্ব, অস্ ধাতু থেকে এসেছে, আছে শুধু এইটুকু জানি। Absolute truth, absolute existence, আত্যন্তিক সত্য, আত্যন্তিক সত্তা। যখন

নাম-রূপ হচ্ছে, বহু হচ্ছে, তখন relative existence, আপেক্ষিক অস্তিত্ব। সমুদ্র আত্যন্তিক অস্তিত্ব; তরঙ্গ বুদ্বুদ ইত্যাদি, আপেক্ষিক অস্তিত্ব। কিন্তু সমুদ্রেরই এক-এক রকমের প্রকাশ, সমুদ্র থেকে উঠছে আবার সমুদ্রেই মিশছে। 'চিদ্-এব', 'চিদ্' মানে চৈতন্য, ব্রহ্ম। 'দেহাদি-অহম্-অন্তম্' অর্থাৎ দেহ থেকে শুরু করে অহং পর্যন্ত যা-কিছু আছে সব ঐ ব্রহ্ম-সমুদ্রের ঢেউ। আমার একটা দেহ আছে বলেই তো আমি অন্য আর একজনের থেকে আলাদা। স্থূল দেহ আছে, আবার সূক্ষ্ম দেহ আছে, কত সব কোশ আছে, অন্নময়কোশ, প্রাণময়কোশ ইত্যাদি, আর 'অহম্' একটা আছে, যিনি দেহ-মন-বুদ্ধি এসবকে ধরে রেখেছেন। কিন্তু এ সবই হচ্ছে 'চিদ্-এব', চৈতন্যই, ব্রহ্মই। 'দেহাদি-অহম্-অন্তম্-এতৎ সর্বং চিদ্-এব-একরসম্ বিশুদ্ধম্'; 'একরসঃ'—homogeneous, এ নয় যে কতকগুলো টুকরোকে জুড়ে এক করা হয়েছে। চৈতন্যের সমষ্টি নয়, চৈতন্যঘন, চৈতন্যস্বরূপ। 'বিশুদ্ধঃ', বিশুদ্ধ মানে তার মধ্যে শুধু একই আছে, কোনও দুই নেই, নির্ভেজাল এক, বিশুদ্ধ চৈতন্য—শুধু চৈতন্য, সব একাকার। আমরা দুই দেখি সেটা অজ্ঞান, এক দেখাই জ্ঞান। বারবার করে একই কথা বলছেন, কারণ আমরা বুঝতে পারি না। এই নাম-রূপের যে বহুত্ব এটাই আমরা দেখি, এর অন্তঃস্থ হয়ে যে ব্রহ্ম রয়েছেন তাঁকে ধরতে পারি না। তাই শাস্ত্র বারবার করে একই কথা নানাভাবে বলছেন আমাদের বোঝানোর জন্যে। সব এক, দুই নেই। শুধু প্রকাশের তারতম্য। এই হচ্ছে বেদান্ত।

সদেবেদং সর্বং জগদবগতং বাঙ্‌মনসয়োঃ
সতোঽন্যন্নাস্ত্যেব প্রকৃতিপরসীম্নি স্থিতবতঃ।
পৃথক্ কিং মৃৎস্নায়াঃ কলসঘটকুম্ভাদ্যবগতং
বদত্যেষ ভ্রান্তস্ত্বমহমিতি মায়ামদিরয়া॥৩৯১

অন্বয়: বাক্-মনসয়োঃ অবগতং (বাক্য ও মনের সাহায্যে অবগত) ইদং সর্বং জগৎ (এই সমগ্র জগৎ) সৎ এব (সৎ-মাত্র) প্রকৃতি পরসীম্নি স্থিতবতঃ (এই বিশ্বজগতের সীমার বাইরে মায়ার পরপারে তিনি অবস্থান করছেন) সতঃ-অন্যৎ-ন-অস্তি-এব (সৎ থেকে অন্য আর কিছু নেই) মৃৎস্নায়াঃ (ভালো মাটির থেকে) পৃথক্ কিং অবগতং কলস-ঘট-কুম্ভাদি (আলাদা করে কি কলস-ঘট-কুম্ভ ইত্যাদিকে জানা যায়) এষঃ ভ্রান্তঃ (এ ভ্রান্ত ব্যক্তি) মায়া-মদিরয়া (মায়া-মদিরার দ্বারা প্রভাবিত) ত্বম্-অহম্-ইতি বদতি (তুমি, আমি এইরকম সব বলছে)।

সরলার্থ: বাক্য ও মনের সাহায্যে অবগত এই সমগ্র জগৎ সৎ-বস্তুই। প্রকৃতির পরিসীমার বাইরেও ইনি আছেন। 'সৎ' থেকে পৃথক আর কিছু নেই। উৎকৃষ্ট মাটি দিয়ে তৈরী কলস-ঘট-কুম্ভ ইত্যাদিকে কি মাটির থেকে আলাদা করে জানা যায়? ভ্রান্ত ব্যক্তিই মায়া-মদিরার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'তুমি-আমি' এরকম (ভেদ-সূচক) কথা বলে থাকে।

ব্যাখ্যা: বলছেন, আমরা তো সবাই এক কিন্তু ভাষা দিয়ে আর চিন্তা দিয়ে নিজেদের আলাদা করে ফেলেছি। এটা আমাদের অজ্ঞতা। 'সদ্-এব-ইদং সর্বং জগদ্-অবগতং বাঙ্-মনসয়োঃ'; বাক্য ও মনের সাহায্যে যে সমগ্র জগৎ আমাদের কাছে অবগত হচ্ছে তা 'সৎ-মাত্র'। আমরা যে দুই দেখছি সেটা ভাষা আর চিন্তার সৃষ্টি। আসলে 'সৎ' অর্থাৎ ব্রহ্মই সব হয়েছেন। এই যে বিচিত্র জগৎ, একে আমরা জানছি আমাদের বাক্য, মন ইত্যাদি ইন্দ্রিয় দিয়ে। এই জানাটা ভুল জানা। 'সতঃ অন্যৎ ন অস্তি এব'; 'সত্তা মাত্র' তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। 'প্রকৃতি-পরসীম্নি স্থিতবতঃ'; প্রকৃতি মানে মায়া। মায়ার সীমানার বাইরে তিনি বিরাজ করছেন। মায়ার জগতেও তিনিই আছেন, মায়ার বাইরেও তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই, 'সৎ' ছাড়া আর কিছু নেই। এই এক জ্ঞানই জ্ঞান, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। 'পৃথক্ কিং মৃৎস্নায়াঃ কলসঘটকুম্ভ-আদি অবগতং'; 'মৃৎস্নায়াঃ' মানে ভালো মাটি থেকে। বলছেন, খুব ভালো মাটি থেকে হয়তো অনেক কলস, ঘট এসব তৈরী হয়েছে। কিন্তু সেগুলো তো আসলে মাটি। নাম-রূপের জন্যে কোনটা কলসী, কোনটা ঘট বলে মনে হচ্ছে। বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন নাম, কিন্তু উপাদান তো এক মাটি। তাই বলছেন : 'পৃথক্ কিং'—মাটি থেকে পৃথক করে কি কলস, ঘট এদের জানা যায় ? সবই মাটির তৈরী। তেমনি জীবজগৎ সব ব্রহ্ম, শুধু নাম-রূপের জন্যে আলাদা আলাদা মনে হচ্ছে। 'বদতি এষ ভ্রান্তঃ ত্বম্ অহং'—যে ভ্রান্ত ব্যক্তি সে-ই বলে ত্বম্, অহং—'তুমি', 'আমি', আসলে সব এক। যে এরকম ভেদ জ্ঞান করে, সে অজ্ঞ, ভুল করছে। কেন ভুল করছে? 'মায়ামদিরয়া'। যেন মায়ায় নেশাগ্রস্ত হয়েছে। পানাসক্ত ব্যক্তির মতো সব ভুল কাজ করছে, ভুল দেখছে। 'মায়া-মদিরয়া'— মায়ারূপ মদের দ্বারা। যেন মদ খেয়ে সব উলটোপালটা বুঝছে আর বলছে। আসলে আমি ছাড়া আর কিছু নেই। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তো আমি। আমি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, মায়ার জালে পড়ে মোহমুগ্ধ হয়ে 'আমি-তুমি' করছি, পৃথকত্ব দেখছি। আসলে সর্বত্র শুধু আমিই আছি, আর কিছু নেই।

ক্রিয়াসমভিহারেণ যত্র নান্যদিতি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি দ্বৈতরাহিত্যং মিথ্যাধ্যাসনিবৃত্তয়ে॥ ৩৯২

অন্বয়: ক্রিয়া-সমভিহারেণ (ক্রিয়াপদের বহু ব্যবহারের দ্বারা) যত্র ন-অন্যদ্-ইতি শ্রুতিঃ ('যত্র ন-অন্যৎ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য) মিথ্যা-অধ্যাস নিবৃত্তয়ে (মিথ্যা অধ্যাস নিবৃত্তির জন্যে) দ্বৈতরাহিত্যং ব্রবীতি (দ্বৈতরাহিত্যের কথা বলছেন)।

সরলার্থ: মিথ্যা অধ্যাস নিরসনের জন্যে 'যত্র ন-অন্যৎ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ক্রিয়াপদের বহু ব্যবহারের দ্বারা দ্বৈতভাবের অভাবের কথা বলছেন।

ব্যাখ্যা: এখানে বলছেন, একই কথা বারবার বলে কি লাভ? আসল কথাটা হচ্ছে তুমিই ব্রহ্ম। জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ। বেদান্তের মূল কথাটা হচ্ছে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম সবকিছুর আধার। ব্রহ্ম সত্য, নিত্য সত্য, তাঁর ওপরেই সবকিছু দাঁড়িয়ে আছে। শ্রুতি বারবার করে কি বলছেন ? বহু শব্দ শ্রুতি ব্যবহার করছেন, অনেক সময় একই শব্দ পুনরাবৃত্তি করছেন, কিন্তু সবকিছুর প্রতিপাদ্য ঐ একটাই—এক ছাড়া দুই নেই। একমেবাদ্বিতীয়ম্। ব্রহ্মই শুধু আছেন, দ্বিতীয় আর কিছু নেই। 'ক্রিয়া সমভিহারেণ যত্র ন-অন্যৎ-ইতি শ্রুতিঃ'—'যত্র ন-অন্যৎ' এই শ্রুতিবাক্যেও বহু ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ থেকে ঐ শ্রুতিবাক্যটি নেওয়া হয়েছে। শ্রুতিবাক্যটি এই : 'যত্র ন-অন্যৎ পশ্যতি ন-অন্যৎ শৃণোতি ন-অন্যৎ বিজানাতি স ভূমা' (৭।২৪।১)। যে অবস্থায় পৌঁছলে মানুষ অন্য কিছু দেখে না, অন্য কিছু শোনে না, অন্য কিছু জানে না, তা-ই ভূমা। এখানে অনেক ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু এই 'ক্রিয়াসমভিহারেণ', বহু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে দ্বৈতরাহিত্য বোঝাতে চাইছেন, 'ব্রবীতি দ্বৈতরাহিত্যং'—দুই-এর অভাব, দুই- নেই—এটাই বলতে চাইছেন। 'মিথ্যা-অধ্যাস নিবৃত্তয়ে'—মিথ্যা অধ্যাসের নিবৃত্তির জন্যে বলছেন। এই অধ্যাস মিথ্যা, কারণ থাকে না, চলে যায়। যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণই অধ্যাস, জ্ঞান হলে অধ্যাস চলে যায়। যেই জ্ঞান হয়েছে, দেখছি—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, তখন অধ্যাস চলে গেছে। এই মিথ্যা অধ্যাস নিবৃত্তির জন্যে শাস্ত্র চেষ্টা করছেন। বারবার একই কথা হয়তো বলে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য ঃ অধ্যাস দূর করা, দুই বলে যে কিছু নেই, সবই এক—সেটা বুঝিয়ে দেওয়া। এই জগৎ কী বৈচিত্রময়, কিন্তু মিথ্যা অর্থাৎ অনিত্য, পরিবর্তনশীল। কিন্তু একটা কিছু নিত্যবস্তুকে আশ্রয় করে তো একে থাকতে হবে, সেই আশ্রয় বা অধিষ্ঠান হচ্ছেন ব্রহ্ম, তাঁর ওপরে অধ্যাসরূপে এই জগৎ আছে। আবার জগৎকে যদি জগৎ বলে মনে করি তাহলে সেটা মিথ্যা কিন্তু যদি ব্রহ্ম বলে মনে করি তাহলে আর মিথ্যা নয়। এই জগৎ, আমরা সবাই, যেন তাঁর প্রকাশ। ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করছেন। তিনি আছেন বলেই সবকিছু আছে। শঙ্করাচার্য যেন বিরক্ত হয়ে বলছেন, কত ভাবে আর বলা হবে? কথা তো এক, ব্রহ্মই সব হয়েছেন। 'ক্রিয়াসমভিহারেণ যত্র নান্যদ্-ইতি শ্রুতিঃ'।

আকাশবন্নির্মল নির্বিকল্প-নিঃসীম-নিস্পন্দন-নির্বিকারম্।
অন্তর্বহিঃ শূন্যমনন্যমদ্বয়ং স্বয়ং পরং ব্রহ্ম কিমস্তি বোধ্যম্॥৩৯৩

অন্বয়: আকাশবৎ-নির্মল-নির্বিকল্প-নিঃসীম-নিস্পন্দন-নির্বিকারম্ (আকাশের মতো মলিনতাহীন, কোনও বিকল্প নেই, কোনও সীমা নেই, কোনও স্পন্দন নেই, কোনও বিকার নেই) অন্তঃবহিঃ শূন্যম্ অনন্যম্-অদ্বয়ম্ (ভিতর বাহির নেই, অনন্য, অতুলনীয়, দুই নয়) পরং ব্রহ্ম (পরম ব্রহ্ম) স্বয়ং (আমিই) বোধ্যং কিম্ অস্তি (আর কি বোঝার থাকতে পারে)।

সরলার্থ: আকাশের মতো অমলিন, বিকল্পহীন, অসীম, নিস্পন্দন, নির্বিকার, অন্তর্বহিঃশূন্য, অতুলনীয়, অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম আমি স্বয়ং। আর কি বোঝার থাকতে পারে?

ব্যাখ্যা: ব্রহ্ম যে কিরকম সেটা আবার বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছেন। বলছেন, 'আকাশবৎ নির্মল', ব্রহ্ম যেন আকাশের মতো নির্মল। কখনও কালো মেঘ এলে কালো দেখায়, এরকম আকাশের গায়ে কত কি রঙ দেখা যায়, সেগুলি কিন্তু অধ্যাস। আকাশ নির্মল, অন্য কিছু আকাশের মধ্যে আসতে পারে না। 'আকাশবৎ-নির্মল-নির্বিকল্প'; কিরকম শব্দগুলো চয়ন করা হয়েছে! 'নির্মল-নির্বিকল্প', কোনও মলিনতা নেই, কোনও বিকল্প নেই। 'নিঃসীম-নিস্পন্দন-নির্বিকারম্'; তিনি অসীম, তাঁর কোনও স্পন্দন নেই, কোনও নড়াচড়া নেই। তাঁর কোনও বিকার নেই, যেমন আছেন তেমনিই আছেন, কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে সব বিশেষণগুলি নেতিবাচক। তারপর বলছেন : 'অন্তঃ বহিঃ শূন্যম্-অনন্যম্-অদ্বয়ং'; তাঁর অন্তরও নেই বাহিরও নেই। কারণ তিনি একরসঃ। ভিতর বাহির বলে তাই তাঁর কিছু নেই, সবই একরকম। 'অদ্বয়ং স্বয়ং পরম্ ব্রহ্ম'; সেই অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম আমি স্বয়ং। 'পর' শব্দটা আমাদের মনে রাখতে হবে। 'পর' মানে শ্রেষ্ঠ আর 'অপর' তার থেকে একটু নীচে। 'স্বয়ং পরং ব্রহ্ম'; সেই পরম ব্রহ্ম আমি। এক আমি বহু হয়েছি। বহু হয়েছি নাম আর রূপ দিয়ে। 'কিমস্তি বোধ্যম্'—আর কি বোঝার আছে ? আমিই স্বয়ং ব্রহ্ম,—জীবনে এছাড়া আর কিছু বোঝার নেই।

বক্তব্যং কিমু বিদ্যতেঽত্র বহুধা ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং
ব্রহ্মৈতজ্জগদাততং নু সকলং ব্রহ্মাদ্বিতীয়ং শ্রুতিঃ।
ব্রহ্মৈবাহমিতি প্রবুদ্ধমতয়ঃ সংত্যক্তবাহ্যাঃ স্ফুটং
ব্রহ্মীভূয় বসন্তি সন্ততচিদানন্দাত্মনৈতদ্ধ্রুবম্ ॥৩৯৪

অন্বয়: অত্র (এখানে, এই বিষয়ে, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে) বহুধা বক্তব্যং (বহু ভাবে বলার) কিম্ বিদ্যতে (কি আর আছে) জীবঃ স্বয়ং ব্রহ্ম এব (জীবই স্বয়ং ব্রহ্ম) এতৎ-জগৎ-আততং ব্রহ্ম নু সকলং (ব্রহ্মই এই জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সকলই ব্রহ্ম) ব্রহ্ম-অদ্বিতীয়ং শ্রুতিঃ (ব্রহ্ম দ্বিতীয় রহিত, এ শ্রুতিবাক্য) সংত্যক্ত-বাহ্যাঃ (বাহ্য-বিষয় ত্যাগ হয়ে গেছে) ব্রহ্ম-এব-অহম্-ইতি (আমিই ব্রহ্ম এই ভাবে) প্রবুদ্ধ মতয়ঃ (পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত সাধকগণ) ব্রহ্মীভূয় (ব্রহ্ম হয়ে) সন্তত চিদ্-আনন্দ আত্মনা (নিরন্তর চিদানন্দ আত্মাসহ) স্ফুটং বসন্তি (সুস্পষ্টরূপে অবস্থান করেন) এতৎ ধ্রুবম্ (এ অবিসংবাদিত সত্য)।

সরলার্থ: একটাই কথা, 'জীবই ব্রহ্ম' এ আর বেশী কথায় বলার কি আছে? ব্রহ্মই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে আছেন, সবকিছুই তো ব্রহ্ম। শ্রুতি বলেছেন, তিনি অদ্বিতীয়। সমস্ত বাহ্য-বিষয় যাঁদের ত্যাগ হয়ে গেছে, যাঁরা 'আমিই ব্রহ্ম' এই ভাব নিয়ে আছেন, এরকম পূর্ণজ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্রহ্মই হয়ে যান আর নিরন্তর চিদানন্দ আত্মার সংযোগে সুস্পষ্ট ভাবে অবস্থান করেন। এ অবিসংবাদিত সত্য।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'বক্তব্যং কিমু বিদ্যতে-অত্র বহুধা ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং'—বিস্তার করে বলার আর কি আছে, একটাই তো কথা 'ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং', ব্রহ্মই জীব। আমরা সবাই ব্রহ্ম। কিন্তু ব্রহ্ম কি অংশে? এই নাম-রূপটা বাদ দিলে। আবার শেষকালে মনে হয়, নাম-রূপ, এ কোথা থেকে এলো? এ তো ব্রহ্ম থেকেই এসেছে, আর একটা ব্রহ্ম তো আর নেই। কিন্তু এগুলো যদিও নিত্য নয় তাহলেও ব্রহ্মই এসবের আশ্রয়। আধার না থাকলে আধেয় থাকে না। যেমন মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, খুব জল পিপাসা, দেখছি সামনে জল, কিন্তু ছুটে গিয়ে দেখছি জল নেই। মরীচিকা। কিন্তু যদি মরুভূমি না থাকত তাহলে মরীচিকাও হতো না। রজ্জু-সর্প, মরীচিকা, এগুলো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মিথ্যা হলেও এদের এক একটা আশ্রয় আছে। তেমনি, জগৎও মিথ্যা, কিন্তু তারও একটা আশ্রয় আছে, সেটা ব্রহ্ম। 'ব্রহ্ম এতৎ-জগৎ-আততং'; ব্রহ্মই এই জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সবকিছু আবরণ করে রেখেছেন। ব্রহ্ম সর্বভূতে বিরাজ করছেন। জগৎ তাঁর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তিনি সবকিছুর মধ্যে ছড়িয়ে আছেন। 'নু সকলং ব্রহ্ম', সবকিছুই ব্রহ্ম। 'অদ্বিতীয়ং শ্রুতিঃ'— ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই, শ্রুতি থেকে এটা আমরা জেনেছি। 'ব্রহ্ম-এব-অহম্-ইতি'—আমিই সেই ব্রহ্ম। 'ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত' (অবি, ১২)। সকলের মধ্যে, সর্বভূতে আমি ওতপ্রোত হয়ে আছি। এটা যাঁরা বুঝেছেন, তাঁরা 'প্রবুদ্ধ মতয়ঃ' —তাঁদের প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞান হয়েছে; পুরোপুরি জ্ঞান হয়েছে; আর তাঁরা 'সংত্যক্তবাহ্যাঃ'—সমস্ত বাহ্য-বিষয় ত্যাগ করেছেন। বাহ্য মানে বাইরে। বাইরে আর ভেতরে। বিষয় ত্যাগ করে ব্রহ্মকে অনুভব করব ভেতরে। আমার মন যখন বাইরে গেছে তখন ভেতরটা নেই। তাই ভেতরে যখন অনুভব করতে চাইছি তখন বাইরেটা ত্যাগ করতে হবে। বহির্মুখী মন ভেতরে চলে এসেছে, বাহ্য-বিষয় ত্যাগ হয়েছে। 'স্ফুটং'—তিনি ভেতরে প্রকাশ হয়েছেন, আমার হৃদয়-কন্দরে প্রকাশ হয়েছেন। আমরা যখন ধ্যান করি তখন মন দিয়েই তো আমরা দেখি, মন যখন ভেতরে চলে এসেছে তখন চোখ আর বাইরেটা দেখে না, কান আর শোনে না। 'স্ফুটং'—স্পষ্ট, মানে আর কোনও সন্দেহ নেই। ভেতরে আমি কত কি কাণ্ডকারখানা দেখছি ! 'হৃদিকমলে বড় ধুম লেগেছে'। অন্তরের মধ্যে কত কি চলছে, এ তো দেখানো যায় না, বোঝানো যায় না—কিন্তু যার হয় তার তো হয়-ই। তারপর বলছেন : এরকম যেসব সাধক তাঁরা ব্রহ্মই হয়ে যান। তাঁরা 'ব্রহ্মীভূয়

বসন্তি'—ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে—চুপ করে বসে থাকেন, বুঁদ হয়ে থাকেন। 'স্ফুটং'—স্পষ্ট। কোন সন্দেহ নেই। তিনি যে ব্রহ্মই হয়ে গেছেন, এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। মুণ্ডক উপনিষদে একটা কথা আছে, 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মু, ৩।২।৯), ব্রহ্মকে জানলে ব্রহ্মই হয়ে যায়। জানা মানে হওয়া। 'সন্তত চিদানন্দ-আত্মনা এতৎ ধ্রুবম্'। 'সন্তত' মানে সবসময় চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সঙ্গে তিনি অবস্থান করছেন। আনন্দে ডুবে আছেন, আত্মার মধ্যে ব্রহ্ম হয়ে বসে আছেন; 'এতৎ ধ্রুবম্'—এটাই সত্য, অবিসংবাদিত সত্য। আমিই সত্য, এটা বুঝে চুপ করে বসে আছি। আর কোথাও দৌড়াদৌড়ি করার নেই। কোথায় যাব? কেন যাব? 'কূটস্থ', একটা বিন্দুতে আমি স্থির হয়ে বসে আছি। কি আনন্দ ! আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে, আর কিছু পাবার নেই। আত্মস্থ, আত্মক্রীড়, আত্মরতি। নিজের মধ্যে নিজে আছি, নিজেকে নিয়ে খেলছি।

জহি মলময়কোশেঽহংধিয়োত্থাপিতাশাং
প্রসভমনিলকল্পে লিঙ্গদেহেঽপি পশ্চাৎ।
নিগমগদিতকীর্তিং নিত্যমানন্দমূর্তিং
স্বয়মিতি পরিচীয় ব্রহ্মরূপেণ তিষ্ঠ॥ ৩৯৫

অন্বয়: মলময়কোশে (মলমূত্র যুক্ত মলিন দেহে) অহংধিয়া ('আমি' বুদ্ধিদ্বারা) উত্থাপিত আশাং জহি (উত্থিত আশা-আকাঙ্ক্ষা নষ্ট কর) পশ্চাৎ (পরে) প্রসভং (বলপূর্বক) অনিলকল্পে লিঙ্গদেহে অপি (বায়ুভূত সূক্ষ্ম শরীরেও) নিগম-গদিত কীর্তিং (বেদান্ত প্রতিপাদিত) নিত্যম্ আনন্দমূর্তিং (নিত্য আনন্দরূপ) স্বয়ম্ ইতি পরিচীয় (স্বয়ং আমি এই পরিচয় নিয়ে) ব্রহ্মরূপেণ তিষ্ঠ (ব্রহ্মরূপে অবস্থান কর)।

সরলার্থ: মল-মূত্র যুক্ত মলিন এই দেহে অহংবুদ্ধির জন্যে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা উৎসারিত হয় তার বিনাশ কর। আর জোরের সঙ্গে বায়ুভূত সূক্ষ্ম শরীরকেও একই ভাবে নাও। বেদান্তে যাঁকে নিত্য আনন্দরূপ বলা হয়েছে, তিনিই যে স্বয়ং আমি এই পরিচয় নিয়ে ব্রহ্মরূপে অবস্থান কর।

ব্যাখ্যা: দেহটাকে এখানে মলময়কোশ বলছেন। মল-মূত্র-কফ ইত্যাদি দিয়ে এই শরীরটা। মলময় বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের সম্বন্ধে আকর্ষণ একটু কমানো। দেহটাকে একটা কোশ বলা হয়। তরোয়ালের যেমন খাপ থাকে সেইরকম যেন একটা খাপ। এই দেহটা 'আমি' নই, দেহের মধ্যে 'আমি' আছি। এইটা মনে রাখতে হবে। বলছেন, 'জহি মলময়কোশে-অহং ধিয়া উত্থাপিত-আশাং'; এই মলময় দেহে অহংবুদ্ধি করেছ বলে কত সব আশা-আকাঙ্ক্ষা উঠছে। এই দেহাত্মবুদ্ধি ছাড়, একে বিনষ্ট কর।

মল-মূত্র-কফ দিয়ে গড়া তোমার যে-দেহ সেটা তুমি নও। দেহটাকে অন্নময়কোশও বলা হয়। অন্ন কথাটা অদ্ ধাতু থেকে এসেছে, যা আমরা খাই। মায়ের শরীর থেকে তো এই দেহ এসেছে, মা যা খেয়েছেন তার থেকে এই শরীর হয়েছে। বলছেন, এটা মলময়, মলিন। এটাকে অত মূল্য দিও না। শুধু এটাই নয়, তোমার একটা আলাদা অংশ আছে, সেটা 'অনিলকল্প', বাতাসের মতো, বায়ুভূত—তোমার সূক্ষ্ম শরীর। বলছেন, সেটাকেও তুমি 'প্রসভং'—জোর করে সরিয়ে দাও। আমাদের এই দেহের প্রতি আকর্ষণটা ছাড়তে হবে। আমি দেহ নই দেহী, আমি ঘর নই ঘরনী। আমি আলাদা, আমি মুক্ত। আমি কি? বলছেন, 'নিগমগদিত কীর্তিং নিত্যম্ আনন্দমূর্তিং'—'নিগম' মানে শাস্ত্র, 'গদিত' মানে কথিত। বেদান্তে তাঁকে 'নিত্যম্-আনন্দমূর্তি' বলা হয়েছে। কাকে বলা হয়েছে ? ব্রহ্মকে। সেই ব্রহ্মই আমি। 'নিত্যম্- আনন্দমূর্তিং'—চির আনন্দস্বরূপ। কোনও দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আমাদের দেহকেন্দ্রিক আমি, তারও আনন্দ আছে কিন্তু সে আনন্দ নিত্য নয়। কিন্তু আত্মা স্বভাবতই আনন্দ, তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ। সৎ তাঁর স্বরূপ, চৈতন্য তাঁর স্বরূপ, আনন্দ তাঁর স্বরূপ। 'নিত্যম্-আনন্দমূর্তিং'; তুমি দেহ কোন্ দুঃখে হবে? দেহ তো অনিত্য, যে কোনও দিন যাবে। তুমি নিত্য, আনন্দমূর্তি। 'স্বয়ম্-ইতি পরিচীয় ব্রহ্মরূপেণ তিষ্ঠ'; তুমি ব্রহ্মরূপে নিজের পরিচয় দাও। নিজেকে বল : আমি কে? না আমি ব্রহ্ম। 'ব্রহ্মরূপেণ তিষ্ঠ', ব্রহ্মরূপে থাক, প্রতিষ্ঠিত হও। ঐখানে তোমার খুঁটি পোঁতো। বেদান্তের এই এক কথা। তুমি নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্ম, এইটা জানো।

শবাকারং যাবদ্‌ভজতি মনুজস্তাবদশুচিঃ
পরেভ্যঃ স্যাৎ ক্লেশো জননমরণব্যাধিনিলয়ঃ।
যদাত্মানং শুদ্ধং কলয়তি শিবাকারমচলং
তদা তেভ্যো মুক্তোভবতি হি তদাহ শ্রুতিরপি ॥৩৯৬

অন্বয়: মনুজঃ (মনুর সন্তান, মানব) যাবৎ (যতকাল) শবাকারং ভজতি (শবের আকার এই দেহকে ভজনা করে) তাবৎ অশুচিঃ (ততকাল অশুচি থাকে) জনন-মরণ-ব্যাধি-নিলয়ঃ (জন্ম মৃত্যু ব্যাধি ইত্যাদির ভাগী) পরেভ্যঃ ক্লেশঃ (পরের থেকে ক্লেশ) স্যাৎ (হতে থাকে) যদা (যখন) শিবাকারম্-অচলং শুদ্ধং আত্মানং কলয়তি (মঙ্গলকর অচল শুদ্ধ আত্মাকে নিজের সঙ্গে এক বলে চিন্তা করে) তদা হি (তখনই) তেভ্যঃ (এইসব দুঃখকষ্ট থেকে) মুক্তঃ ভবতি (মুক্ত হয়) শ্রুতিঃ-অপি তদ্ আহ (শ্রুতিও এই কথাই বলেন)।

সরলার্থ: মানুষ যতদিন শবের মতো এই দেহের ভজনা করে ততদিন সে অশুচি। ততদিন সে জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি ইত্যাদি দুঃখের ভাগী হয় ও অপরের কাছ থেকে পাওয়া দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ এসব ভোগ করতে থাকে। যখন মঙ্গলকর নিশ্চল শুদ্ধ

আত্মাকে নিজের সঙ্গে এক করে চিন্তা করে তখন সে এইসব দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে যায়। শ্রুতিও এই কথাই বলেন।

ব্যাখ্যা: বলছেন, তুমি যদি নিজেকে দেহের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলো তাহলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। এটা তো শবাকার। দেহকে শব বলছেন। আগে বলেছেন মলময় দেহ, এখন বলছেন, এটা তো শব একটা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ। এই দেহ 'শবাকারং যাবদ্ ভজতি', শবের মতো এই দেহ, এর পুজো মানুষ যতদিন করে, দেহসর্বস্ব হয়ে যতদিন থাকে 'মনুজঃ তাবদ্-অশুচিঃ'—ততদিন মানুষ অশুচি থাকে। 'মনুজঃ' মানে মনুর সন্তান অর্থাৎ মানুষ বা মানব। আমরা জানি, মৃতদেহ স্পর্শ করলে অশুচি হয়ে যেতে হয়। কেন? আত্মা ছেড়ে চলে গেছেন বলে। যতক্ষণ আত্মা আছেন আমার পা যদি কারো গায়ে লেগে যায় তাহলে নমস্কার করব। আর আত্মা যখন দেহ ছেড়ে গেছেন তখন সেই দেহটা ছুঁলে মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধ হব। আত্মা শুদ্ধ, দেহ অশুদ্ধ। তাই বলছেন, তুমি দেহটাকে যদি সর্বস্ব কর, আত্মা যে আছেন এটা যদি না জানো তাহলে শব স্পর্শ করলে যেমন অশুচি হতে হয় তুমি তাই হবে। আমি যদি মনে করি আমি দেহ তাহলে আমি অশুচি। আর যদি মনে করি আমি আত্মা, তাহলেই আমি শুদ্ধ। তখন বাহ্যিক শুচি-অশুচিরও আমি উর্ধ্বে। রামপ্রসাদ গানে বলছেন : শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি? দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মাকে পাবি। শুচি-অশুচি তো বিপরীত, তাই দুই সতীন। আত্মজ্ঞান হলে এই ভালো-মন্দ, শুচি-অশুচির ভেদ থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হচ্ছে, 'পরেভ্যঃ স্যাৎ ক্লেশঃ', কত কষ্ট পেতে হয় পরের কাছ থেকে। মানুষ যখন দুই দেখে তখনই কষ্ট। অপর কেউ আমায় খারাপ কথা বলল আবার হয়তো ভালো কথা বলল, তাই নিয়ে আমার ভালো লাগা মন্দ লাগা অর্থাৎ পরনির্ভর হয়ে আছি। 'জনন-মরণ ব্যাধিনিলয়ঃ'; আবার জন্ম-মৃত্যু ব্যাধি এসব আছে। এই হলো সংসার—জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, ব্যাধি আছে, দেহকে আশ্রয় করে কত কষ্ট আছে। কিন্তু অপরদিকে 'যদা-আত্মানং শুদ্ধং কলয়তি শিবাকারম্-অচলং'—যখন শুদ্ধ মঙ্গলকর নিশ্চল আত্মাকে মানুষ নিজের সঙ্গে এক করে ভাবে, তখন সে এসবের থেকে মুক্ত। আমি যদি নিজেকে আত্মা বলে বুঝতে পারি, শুদ্ধ শিবাকার অচল, তাহলে কোনও পরিবর্তন আমাকে স্পর্শ করবে না। 'তদা তেভ্যঃ মুক্তঃ ভবতি'—আগে যেসব অশুচি বা দুঃখের কথা বলা হলো, তার থেকে তখন মানুষ মুক্ত হয়। 'তদ্-আহ শ্রুতিঃ-অপি'—শ্রুতিতেও এরকমই বলা আছে। শুদ্ধ শিবস্বরূপ আত্মা নিজেকে ভাবতে পারলে, আমিও শুদ্ধ হয়ে যাব, আমার সব দুঃখের নিবৃত্তি হবে। 'শিব' কথাটা বৈদিক। শিব মানে শুভ, মঙ্গলকর। বলছেন, শিবাকারং অর্থাৎ তুমি তো আত্মস্থ তাই তুমি 'কল্যাণকৃৎ', তুমি সর্বভূতহিতেরতঃ, সুখ-দুঃখের, ভালো-মন্দের ওঠা-নামার উর্ধ্বে তুমি বসে আছ।

স্বাত্মন্যারোপিতাশেষাভাসবস্তুনিরাসতঃ।
স্বয়মেব পরং ব্রহ্ম পূর্ণমদ্বয়মক্রিয়ম্॥ ৩৯৭

অন্বয়: স্বাত্মনি (নিজের আত্মায়) আরোপিত-অশেষ-আভাসবস্তু (আরোপিত অসংখ্য কল্পিত বস্তু) নিরাসতঃ (নিরাস হলে) পূর্ণম্-অদ্বয়ম্-অক্রিয়ম্ পরং ব্রহ্ম স্বয়ম্-এব (জীব স্বয়ং পূর্ণ, অদ্বয়, অক্রিয় পরম ব্রহ্ম রূপে প্রকাশ হয়)।

সরলার্থ: সাক্ষিস্বরূপ নিজের আত্মায় আরোপিত অসংখ্য কল্পিত বস্তুর নিরসন হলে জীব স্বয়ং পূর্ণ, অদ্বয়, অক্রিয় পরমব্রহ্মরূপে প্রকাশ হয়।

ব্যাখ্যা: আবার সেই কথাই বলছেন যে, এক আত্মাই আছেন। তবুও যে এই জগতে 'বহু' দেখি, তার কারণ সেই আত্মার ওপর আমরা অনেক 'অধ্যাস' বা কল্পিত বস্তু আরোপ করেছি। দৃষ্টান্ত হচ্ছে রজ্জুসর্প। রজ্জুর ওপর সাপটা চাপানো হয়েছিল, অধ্যাস। মায়ার জন্যে অধ্যাস হয়, যে জিনিসের অধ্যাস হয়, তাকে সত্যি বলে মনে হয়। রজ্জুর ওপর সাপের অধ্যাস হয়েছে। কিন্তু সাপটা সত্যি নয় দড়িটাই সত্যি। সাপটা কাল্পনিক, অধ্যাস। তেমনি সৎস্বরূপ আত্মার ওপরে এই নামরূপাত্মক জগৎ চাপানো আছে। তাই এই বৈচিত্রময় জগৎ দেখছি। কত কি কাণ্ডকারখানা এখানে ঘটে চলেছে। 'অশেষ'—এর শেষ নেই, প্রবাহের মতো বয়ে চলেছে। এগুলো সব আভাস, ছবির মতো। এ যদি আমরা নিরাস করে দিতে পারি তাহলেই হলো। 'স্বাত্মনি-আরোপিত-অশেষ-আভাসবস্তু নিরাসতঃ'; নিজের আত্মার ওপর আরোপ করা এই অশেষ আভাসবস্তু নিরাস করতে পারলে, আমার স্বরূপটা প্রকাশ হয়ে পড়বে। জ্ঞান আমার মধ্যেই রয়েছে কিন্তু মায়ার আবরণে চাপা পড়ে আছে। যেই এই আবরণ সরে যাবে, দড়িটাকে সাপ বলে যে ভুলটা করেছিলাম সেটা যেই চলে যাবে, অমনি জানতে পারব, আমিই স্বয়ং ব্রহ্ম। বলছেন : 'স্বয়ম্ এব পরং ব্রহ্ম পূর্ণম্-অদ্বয়ম্-অক্রিয়ম্'। 'পরং ব্রহ্ম'— শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা। তিনি 'পূর্ণ'—কোন হ্রাসবৃদ্ধি নেই। 'পূর্ণস্য পূর্ণম্-আদায় পূর্ণম্-এব-অবশিষ্যতে'— ঈশোপনিষদে আছে। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। সর্বদা পূর্ণ তিনি। সেই পরম ব্রহ্মই আমি—পূর্ণ, অদ্বিতীয়, ক্রিয়াহীন। বেদান্ত বলে সব সময় এইসব চিন্তা করতে : অহং ব্রহ্মাস্মি; জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ, অয়ম্-আত্মা ব্রহ্ম—জীব আর ব্রহ্ম দুই নয়, এক। আমি দেহ নই, মন নই, আমি ব্রহ্ম।

সমাহিতায়াং সতি চিত্তবৃত্তৌ পরাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে।
ন দৃশ্যতে কশ্চিদয়ং বিকল্পঃ প্রজল্পমাত্রঃ পরিশিষ্যতে ততঃ॥ ৩৯৮

অন্বয় : সতি নির্বিকল্পে পরাত্মনি ব্রহ্মণি (সৎস্বরূপ নির্বিকল্প পরমাত্মা ব্রহ্মে) চিত্তবৃত্তৌ সমাহিতায়াং (চিত্তবৃত্তি সমাহিত হলে) অয়ং বিকল্পঃ (ব্রহ্মের থেকে পৃথক, এই জগৎ-

সংসার) কশ্চিৎ ন দৃশ্যতে (আর কিছুই দেখা যায় না) ততঃ (তখন) প্রজল্পমাত্রঃ পরিশিষ্যতে (শুধু কথার মতো এগুলোর অবশেষ থাকে)।

সরলার্থ : সৎস্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মে চিত্তবৃত্তি সমাহিত হলে ব্রহ্ম থেকে অন্যরূপে এই জগৎ-সংসারকে আর কোনও ভাবেই দেখা যায় না। তখন অর্থহীন কথার মতো এগুলোর অবশেষ পড়ে থাকে।

ব্যাখ্যা : সমাধি হলে কি হয় এখানে সেই কথা বলছেন। বলছেন, আমাদের চিত্তবৃত্তি যখন পরমাত্মায় সমাহিত হয়ে যায় তখন আর বহু থাকে না, বৈচিত্র থাকে না। সমাধির অর্থটা কি? আমরা বলি সলিল সমাধি, মানে জলে ডুবে যাওয়া। তেমনি, আমাদের চিত্তবৃত্তি আত্মায় ডুবে যাচ্ছে সেটাই সমাধি। চিত্তবৃত্তি মানে হচ্ছে মনের চাঞ্চল্য। মন একবার উঠছে একবার নামছে। কখনও মনটা খুব প্রসন্ন, আবার কখনও বিষাদে একেবারে ডুবে গেছে। এই ওঠা-নামা, তরঙ্গ, এগুলোকে চিত্তবৃত্তি বলা হয়। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ ওঠে সেইরকম। কখনও উত্তেজনা, কখনও ভয়, কখনও খুব আনন্দ, এইসব চিত্তবৃত্তি। যদি এমন হয়, ঢেউগুলো সব চলে গেছে, যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, স্থির, শান্ত, সমস্ত মন নিস্তরঙ্গ, তাহলে এই অবস্থা সমাধি। বলছেন, 'সমাহিতায়াং সতি'; সমাহিত হয়ে আছে, 'সতি'—সৎ বস্তুতে, আত্মায়। 'পরাত্মনি'—পরমাত্মায়; 'ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে'—নির্বিকল্প ব্রহ্মে। নানা শব্দ ব্যবহার করছেন, কিন্তু একই অর্থ। সমস্ত চিত্তবৃত্তি ডুবে গেছে কোথায় ? সৎস্বরূপ পরমাত্মায়, নির্বিকল্প ব্রহ্মে সমস্ত চিত্তবৃত্তি লীন হয়ে গেছে। এইভাবে মনের সমস্ত চাঞ্চল্য যদি দূর করে ফেলা যায়, তাহলে 'ন দৃশ্যতে কশ্চিদ্-অয়ং বিকল্পঃ'—তাহলে আর 'বিকল্পঃ' দেখতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু দেখি না তখন। এমনিতে সব সময় আমরা বিকল্প দেখি, দুই দেখি, বহু দেখি। এই আমি ভালো আছি পরমুহূর্তে কেঁদে ফেলছি, এই বিকল্প। এসব চলে যাবে। গীতায় বলছেন, কচ্ছপ যেমন একটু কিছু হলেই সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়, সেইরকম আমাদের সব চিত্তবৃত্তি, মনের সব তরঙ্গ যদি মনের মধ্যেই ডুবিয়ে দিই, মনের মধ্যেই মনকে ঘুম পাড়াই—যত রকমের বৃত্তি সব যদি আত্মায় টেনে নিতে পারি, আত্মায় সমর্পণ করতে পারি, তাহলেই সব হয়ে যায়। মনটাকে বলছেন মত্ত করী, পাগলা হাতি। তাকে কি করে ঠাণ্ডা করতে হয়? ডাঙশ মেরে। সেইরকম মনটাকে নিগ্রহ করে বশে আনতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ একটা সহজ উপায় বলছেন—তোমার মনটা একদিকে যাচ্ছে, তার মোড়টা ভগবানের দিকে ফিরিয়ে দাও। 'পরাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে' মানে সমস্ত মনটা ব্রহ্মে দিয়ে দাও। শান্ত সমুদ্রে সব তরঙ্গ স্থির হয়ে গেলো। দুষ্টু ছেলে দাপাদাপি করছিল, হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। আত্মা, আত্মার মধ্যেই ডুবে গেলো, 'নির্বিকল্পে', আর বিকল্প নেই, শুধু এক। তখন কি? 'ন দৃশ্যতে কশ্চিদ্-অয়ং

বিকল্পঃ'—জগৎ-সংসারে এইসব বিকল্প আর নেই। আমি আমার মধ্যে ডুবে গেছি, সেখানে আর কিছু নেই, জগৎ নেই। তখন যদি কিছু থাকে সেটা কি? 'প্রজল্পমাত্রঃ'—শুধু কথা, তার মধ্যে কোনও বস্তু নেই। 'জল্প' মানে কথা। 'প্রজল্পমাত্রঃ', শুধু নাম এগুলো। এই সুখ একটা নাম, দুঃখ একটা নাম, এগুলো আমাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। যেন একটা পোড়া দড়ি, আকারটা আছে কিন্তু তা দিয়ে আর কোনও কাজ হয় না। জগৎটা আমার কাছে জগৎ নয়, শুধু শব্দ মাত্র। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।

অসৎকল্পো বিকল্পোঽয়ং বিশ্বমিত্যেকবস্তুনি।
নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৩৯৯

অন্বয়: এক বস্তুনি (এক ব্রহ্মবস্তুতে) বিশ্বম্-ইতি অয়ং বিকল্পঃ (বৈচিত্রময় বিশ্বরূপ এই বিকল্প) অসৎ কল্পঃ (মিথ্যার সৃষ্টি) নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ (নির্বিকার নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্মে ভেদ কোথা থেকে আসবে) ?

সরলার্থ: এক ব্রহ্মবস্তুতে বৈচিত্রময় বিশ্বরূপ এই যে বিকল্প এ মিথ্যাজ্ঞানের সৃষ্টি। যে-ব্রহ্মের কোনও বিকার নেই, আকার নেই, বৈশিষ্ট্য নেই, সেই ব্রহ্মে ভেদ কোথায়?

ব্যাখ্যা: আমি যখন এই বিশ্ব দেখি তখন বৈচিত্র দেখি, নামরূপাত্মক জগৎ দেখি, বহু দেখি। কিন্তু আসলে এক ব্রহ্মই আছেন, দুই কিছু নেই। 'বিশ্বম্-ইতি-এক বস্তুনি'—এক বস্তু ব্রহ্মের উপর আমরা যে এই বিশ্ব দেখছি, 'বিকল্পোঽয়ং'—এ হলো বিকল্প। এই বিকল্প 'অসৎ-কল্পঃ'—মিথ্যাজ্ঞানের সৃষ্টি। বিশ্বের যে বৈচিত্র, তা আসলে মিথ্যা। একই বহু হয়েছেন, আমি যে বৈচিত্র দেখছি সেসব একই ব্রহ্মের বহু প্রকাশ। এক সত্তা, সেটাকে কখনও মানুষ বলছি, কখনও কীটপতঙ্গ বলছি। এই বিকল্প, ভেদ। বিকল্পটা কোথায়? নাম আর রূপে। আমরা নামরূপের জন্যে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। এগুলো তো আরোপিত। এগুলো যদি না ধরি তাহলে আর ভেদ নেই। নাম-রূপেই ভেদ। মাটির কতরকম জিনিস হয়, ঘট, কলসী এইসব, কিন্তু সবই তো এক মাটি। এই জগৎটাও তাই। বহু দেখছি, বৈচিত্র দেখছি, কিন্তু সবকিছুরই এক সত্তা। তাহলে ভেদ কোথায়? 'নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ'? আমাদের যে স্বরূপ তা তো নির্বিকার, নিরাকার, নির্বিশেষ পরমাত্মা। সেখানে ভেদ কোথায়? কোন ভেদ নেই।

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিভাবশূন্যৈকবস্তুনি।
নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০০

অন্বয়: দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্য-আদি ভাব শূন্য-একবস্তুনি (দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য ইত্যাদির ভিন্নতার

ভাবশূন্য এক ব্রহ্মবস্তুতে) নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ (বিকারহীন, আকারহীন, বৈশিষ্ট্যহীন যা সেখানে ভেদ কোথায়)?

সরলার্থ: দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য ইত্যাদির ভিন্নতার ভাব যেখানে নেই সেই বিকারহীন, আকারহীন, বৈশিষ্ট্যহীন এক ব্রহ্মবস্তুতে ভেদ কোথা থেকে আসবে ?

ব্যাখ্যা: বলছেন : আমাদের সব চিত্তবৃত্তিকে যদি শান্ত করতে পারি, পরমাত্মায় সমাহিত করতে পারি, তাহলে কি হবে ? জগৎ-সংসার থাকবে না, কোন বিকল্প বা ভেদ থাকবে না। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই তিনটি তখন আমার কাছে এক হয়ে যাবে। তখন 'দ্রষ্টৃ-দর্শন দৃশ্যাদি-ভাব শূন্য-এক বস্তুনি'; তখন দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন এই তিনটি আলাদা থাকে না। 'দ্রষ্টৃ'—দ্রষ্টা, যে দেখছে, 'দৃশ্য'—যা দেখছি, আর 'দর্শন'— এই দেখাটা, এই তিনটেই এক হয়ে যাচ্ছে। আমি দ্রষ্টা, আমি দেখছি, আর দেখার যে ক্রিয়া সেটা দর্শন ও যেটা দেখছি সেটা দৃশ্য। আসলে এই তিনটির মধ্যে কোনও ভেদ নেই। জগতে সব সময় এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য থাকে। কিন্তু 'একবস্তুনি' অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে এই তিনটির পার্থক্য থাকে না। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এক হয়ে যায়। বলছেন : স্বরূপত তুমি নির্বিকার, নির্বিশেষ, নিরাকার, তুমি ব্রহ্ম। বাইরের কোনও বস্তু তোমায় স্পর্শ করতে পারে না। তোমার কাছে দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, এসব কিছু নেই। শুধু এক, এক, এক। এই যদি হয় তাহলে ভেদ কোথা থেকে আসবে ?

কল্পার্ণব ইবাত্যন্তপরিপূর্ণৈকবস্তুনি।
নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ।। ৪০১

অন্বয়: কল্পার্ণবঃ ইব (মহাপ্রলয়কালীন সমুদ্রের মতো) অত্যন্ত পরিপূর্ণ-একবস্তুনি (অত্যন্ত পরিপূর্ণ এক ব্রহ্মবস্তুতে) নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ (বিকারহীন, আকারহীন, বৈশিষ্ট্যহীন যা সেখানে ভেদ কোথায়)?

সরলার্থ: নির্বিকার, নিরাকার, নির্বিশেষ ও মহাপ্রলয়কালীন সমুদ্রের মতো অত্যন্ত পরিপূর্ণ এক ব্রহ্মবস্তুতে ভেদ কোথায়?

ব্যাখ্যা: হিন্দুদের সৃষ্টিতত্ত্বে কল্পের কথা আছে। বারো যুগ নিয়ে এক কল্প। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। কল্পের শেষে যখন সৃষ্টি ধ্বংস হয়, তখন মহাপ্লাবন হয়। সেই প্লাবনের পরে আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি মানে শূন্য থেকে সৃষ্টি নয়। সৃষ্টি বলতে আমরা আসলে বুঝি manifestation, প্রকাশ, প্রকট। আমরা বিশ্বাস করি সংসার ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু সব বীজাকারে থাকে। যেমন, একটা ছোট বটগাছের বীচির মধ্যে অতবড় বট গাছটা থাকে, একদিন সেটা প্রকাশ হয়। স্বামীজী বলছেন,

evolution আর involution, গাছ থেকে বীজ আবার বীজ থেকে গাছ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, গ্রহনক্ষত্রগুলো যেন ছুটছে, expanding universe, সব ধ্বংস হয়ে গিয়ে বীজাকারে পরিণত হবে। 'কল্পার্ণব', একটা কল্প শেষ হয়েছে, একটা যুগ শেষ হয়েছে, প্লাবনে সব ভেসে যাচ্ছে। বাইবেলের সঙ্গে মিল আছে, সেখানেও আছে 'deluge'-এর কথা। বলছেন : 'কল্পার্ণব ইব অত্যন্ত পরিপূর্ণ একবস্তুনি'; জল, জল, জল, শুধু জল, সব ডুবিয়ে ফেলেছে। কল্পের শেষে প্লাবনে যেমন গোটা জগৎ ভেসে যায়—জল ছাড়া আর কিছু থাকে না—ব্রহ্ম সেই প্রলয়ের সময়কার সমুদ্রের মতো পরিপূর্ণ। এক বস্তু, এক সত্তা, এক চৈতন্য সর্বত্র। সমরস—সর্বত্র সমানভাবে পরিপূর্ণ, কোথাও কম-বেশী নেই। বলছেন : 'কল্পার্ণব ইব অত্যন্ত পরিপূর্ণ এক বস্তুনি নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ'? সেই এক-অদ্বিতীয় বস্তু যাঁর কোনও বিকার নেই, আকার নেই, বিশেষত্ব নেই, কোনও বৈচিত্র নেই, তাঁর মধ্যে ভেদ কোথা থেকে আসবে ?

তেজসীব তমো যত্র প্রলীনং ভ্রান্তিকারণম্।
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ।। ৪০২

অন্বয়: যত্র (যেখানে) তেজসি তমঃ ইব (আলোর মধ্যে অন্ধকারের মতো) ভ্রান্তি কারণং (ভ্রান্তির কারণ) প্রলীনং (একেবারে লয় পায়) অদ্বিতীয়ে নির্বিশেষে পরে তত্ত্বে ভিদা কুতঃ ([সেইরকম] অদ্বিতীয়ে নির্বিশেষে পরমতত্ত্বে ভেদ কোথা থেকে আসবে)?

সরলার্থ: আলোর মধ্যে অন্ধকারের মতন যেখানে ভ্রান্তির কারণ অজ্ঞান একেবারে বিলীন হয়ে যায় সেই অদ্বিতীয় নির্বিশেষ পরমতত্ত্বে ভেদ কোথা থেকে আসবে?

ব্যাখ্যা: অজ্ঞান কি করে দূর হবে? জ্ঞান দিয়ে। অন্ধকার কি করে দূর হয়? আলো দিয়ে। অন্ধকার কোন বস্তু নয়, অন্ধকার হলো আলোর অভাব। তেমনি অজ্ঞান কোন বস্তু নয়, জ্ঞানের অভাব। জ্ঞান হলেই অজ্ঞান চলে যাবে। 'তেজসি-ইব তমঃ যত্র প্রলীনং'; 'তেজসি'—আগুনে অর্থাৎ, আগুনের যে আলো তাতে 'তমঃ' বা অন্ধকার 'প্রলীনং'—লোপ পেয়ে যায়। অন্ধকারকে বলছে 'ভ্রান্তিকারণম্'— অন্ধকারের জন্যে ভুল হয়। দড়ি পড়ে আছে, অন্ধকারে সাপ ভেবে চেঁচিয়ে উঠি। আলো আনলে ভ্রান্তির কারণ অন্ধকার দূরে চলে যায়। সব ভ্রান্তির অবসান হয়। যাকে সাপ ভেবেছিলাম, বুঝতে পারি সেটা দড়ি। তেমনি জ্ঞান হলে অজ্ঞান মুহূর্তে চলে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : হাজার বছরের অন্ধকার, আলো আনলে এক মুহূর্তে চলে যায়। বলছেন, 'অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে'; thatness, সেই যে তত্ত্ব, তত্ত্ব মানে বস্তু, সত্তা। সত্তা মানে যা আছে, existence। 'পরে তত্ত্বে'—যে তত্ত্ব

absolute, আত্যন্তিক। যা relative, আপেক্ষিক সেটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু যা absolute মানে সর্বাতীত, সকলের পারে, সবকিছুর ঊর্ধ্বে, যেন এক বিস্তীর্ণ সমুদ্রের পারে—সেটা এই ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দিয়ে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়। আবার তাঁকে 'সর্বগত'ও বলা হয়—সকলের মধ্যে আছেন। আবার সর্বাতীত, সকলের বাইরেও আছেন। পূর্ণ, অন্তঃপূর্ণ বহিঃপূর্ণ। 'অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ'? কোথা থেকে ভেদ আসবে? শুধু তো এক। দ্রষ্টা দৃশ্য এই দুই থাকলে তাকে বর্ণনা করতে পারি কিন্তু শুধু এক হলে কি করে কিছু বলব? বলা যায় না। সেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা সব এক হয়ে গেছে, কাজেই আর তাকে বর্ণনা করা যায় না। 'অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ'? 'নির্বিশেষে'—কোনও বৈশিষ্ট্য যাঁর নেই, কি করে বলব তিনি কি ! যতক্ষণ দুই দেখব ততক্ষণ কিছু বলতে পারি, কিন্তু যেই 'অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে', জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞান দূর হয়ে গেলো, অদ্বিতীয় তত্ত্বের জ্ঞান হলো, তখন সেই 'তৎ' বা ব্রহ্মে সব 'দুই' মিশে গেলো। তখন সব একাকার। অদ্বিতীয় সত্তামাত্র যে আত্মা সকলের মধ্যে দেখছি, সেখানে আর ভেদ কোথায়?

একাত্মকে পরে তত্ত্বে ভেদবার্তা কথং বসেৎ।
সুষুপ্তৌ সুখমাত্রায়াং ভেদঃ কেনাবলোকিতঃ॥ ৪০৩

অন্বয়: এক-আত্মকে পরে তত্ত্বে (একাত্মভাবের পরম তত্ত্বে) ভেদবার্তা কথং বসেৎ (ভেদের কথা কি করে থাকতে পারে) সুখ মাত্রায়াং সুষুপ্তৌ (সুখস্বরূপ সুষুপ্তিতে) কেন (কার দ্বারা) ভেদঃ অবলোকিতঃ (ভেদ দর্শন হয়)?

সরলার্থ: একাত্মতার পরমতত্ত্বে ভেদের প্রসঙ্গের স্থান কোথায়? সুখরূপা সুষুপ্তিতে কে আর ভেদ দর্শন করে।

ব্যাখ্যা: বলছেন, যেই আমার জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান চলে গেলো অমনি আমার দুই দেখা চলে গেলো। তখন সব এক দেখছি, সব দুই দেখা আত্মায় মিলিয়ে গেলো, সব তরঙ্গ সমুদ্রে মিশে গেলো। সেই যে অবস্থা, শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্, সেটা কিরকম? শান্তম্—স্থির, শিবম্—মঙ্গলময়, অদ্বৈতম্—দুই নেই। এ যে কি অবস্থা সেটা মুখে বলা যায় না। যার হয়েছে সেই জানে। 'একাত্মকে পরে তত্ত্বে ভেদবার্তা কথং বসেৎ'? একাত্মা, সেটাই আমাদের পরমাত্মা। প্রত্যেকেই আমরা আমি, সেই এক আমি সকলের মধ্যে। Aldous Huxley বলছেন, highest common factor. এই common factor যে 'আমি' সেটা সকলের মধ্যেই এক। মানুষ, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ, সবের মধ্যেই এক সত্তা এক আত্মা। তাহলে 'ভেদবার্তা কথং

বসেৎ'? ভেদের কথা ওঠে কি করে? 'একাত্মকে পরে তত্ত্বে ভেদবার্তা কথং বসেৎ'? 'একাত্মকে', যখন একাত্ম হয়ে গেছি, জীবাত্মা পরমাত্মা এক হয়ে গেছে। সব ওই 'পরে তত্ত্বে' এসে যেন ঢুকে গেছে। তখন আর 'ভেদবার্তা' কি করে থাকতে পারে? সেখানে দুই কোথায়? দুই তো আর নেই। ভেদ বোঝার জন্যে তো একটা পৃথক দ্বিতীয় বস্তু দরকার আর সেই দ্বিতীয় বস্তুকে দেখার একজন দ্রষ্টা দরকার। কিন্তু যেখানে দ্বিতীয় কিছু নেই, দ্রষ্টা নেই, দৃশ্য নেই—সেখানে ভেদের কথা কি করে আসবে ? উদাহরণ দিচ্ছেন, সুষুপ্তি হলে যে আনন্দে থাকি তখন দ্রষ্টা দৃশ্য মিশে গেছে, জীবাত্মা পরমাত্মা মিশে গেছে কিন্তু একটু অজ্ঞানের পর্দা রয়ে গেছে। যখন সমাধি হয় তখন আর ওই অজ্ঞানের পর্দাটা থাকে না। এখানে বলছেন, সুষুপ্তিতে আত্মার সঙ্গে জীবাত্মা যখন প্রায় মিশে আছে, শুধু পাতলা একটু অজ্ঞানের পর্দা সামান্য তফাত রেখেছে, সেই অবস্থায়ও দুই দেখা যায় না। কে দেখবে ? 'সুষুপ্তৌ সুখমাত্রায়াং ভেদঃ কেন-অবলোকিতঃ' ? সুষুপ্তিতে আমরা আত্মার খুব কাছাকাছি চলে যাই, শরীর মন সব লোপ পেয়ে যায়, শুধু অজ্ঞানের একটা পর্দা আত্মাকে একটু আলাদা করে রাখে তাই জেগে উঠলেই যে কে সেই। কিন্তু আত্মার খুব কাছাকাছি এসেছি বলে খুব আনন্দ। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন সব লোপ পেয়ে গেছে, শুধু আমার অহংবুদ্ধি, যেটা অজ্ঞানজনিত সেটা যায়নি। কিন্তু দ্রষ্টা দৃশ্য মিশে গেছে বলে আর দুই দেখা নেই। তাই বলছেন, 'ভেদঃ কেন অবলোকিতঃ'? কে আর ভেদ দেখবে ? সুষুপ্তিতেই যখন এমন, তখন সমাধিতে যে ভেদ থাকবে না, তা বলাই বাহুল্য।

নহ্যস্তি বিশ্বং পরতত্ত্ববোধাৎ সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে।
কালত্রয়ে নাপ্যহিরীক্ষিতো গুণে নহ্যম্বুবিন্দুর্মৃগতৃষ্ণিকায়াম্॥ ৪০৪

অন্বয়: পরতত্ত্ববোধাৎ (পরতত্ত্ববোধ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের বোধের পূর্বেও) সদাত্মনি নির্বিকল্পে ব্রহ্মণি (সৎস্বরূপ নির্বিকল্প ব্রহ্মে) বিশ্বং ন হি অস্তি (বিশ্ব কখনই থাকে না) কালত্রয়ে অপি (তিনকালের কোনও কালেই) গুণে ঈক্ষিতঃ অহিঃ (রজ্জুতে দেখা সর্প) ন (নেই) মৃগতৃষ্ণিকায়াং (মরীচিকায়) অম্বুবিন্দুঃ (জলের ফোঁটা) ন হি (মোটেই থাকে না)।

সরলার্থ: পরতত্ত্ববোধ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হওয়ার আগেও সৎস্বরূপ নির্বিকল্প ব্রহ্মে বিশ্ব কখনই থাকে না। যেমন রজ্জুতে দেখা সর্প তিনকালের কোনও কালেই ছিল না, যেমন মরীচিকায় জলের ফোঁটাও কোনও কালে ছিল না।

ব্যাখ্যা: বলছেন, এই যে আমরা দড়িটাকে দেখছি না সাপ দেখছি, তারপর আলো

এলে অন্ধকার চলে গেলে দেখলাম, সেটা দড়িই সাপ নয়—এই ভুলটা কিন্তু হলো দড়িটা ছিল বলেই। দড়িটা অধিষ্ঠান। আমি সাপ দেখেছি বটে কিন্তু সাপ কোনও কালেই ছিল না। সাপ দেখাটা আমার ভ্রান্তি ছিল। তেমনি এই যে বিশ্ব দেখছি, কত বৈচিত্র দেখছি, এ সব ভ্রান্তি। ব্রহ্মই অধিষ্ঠান, তাঁর ওপর এসব দাঁড়িয়ে আছে। 'কালত্রয়ে ন-অপি-অহি-ঈক্ষিতঃ-গুণে'; 'কালত্রয়ে'—তিনকালে, 'ন-অপি-অহি-ঈক্ষিতঃ গুণে'—দড়িতে দেখা সাপটা তিনকালেই কখনও ছিল না। 'নহি অম্বুবিন্দু মৃগতৃষ্ণিকায়াম্'; মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকা দেখছ, কিন্তু একবিন্দু জলও মরীচিকাতে কোনও দিনই ছিল না। সেইরকম এই যে বৈচিত্রময় বিশ্ব, এ কোনও কালেই ছিল না। আগে ছিল, তোমার জ্ঞান হয়েছে বলে চলে গেলো, তা নয়। এ তোমার ভ্রান্তি। মায়ার জন্যে তুমি ভুল দেখেছ। যেমন দড়িটাকে ভুল করে সাপ দেখেছিলে। সাপটা কোনও কালেই ছিল না।

মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।
ইতি ব্রূতে শ্রুতিঃ সাক্ষাৎ সুষুপ্তাবনুভূয়তে।। ৪০৫

অন্বয়: ইদং দ্বৈতং মায়ামাত্রম্ (এই দৃশ্যমান জগৎকে দেখা, দুই দেখা মায়ামাত্র, মিথ্যা) পরমার্থতঃ অদ্বৈতং (পরমার্থত দুই নেই, অদ্বৈতভাবই সত্য) ইতি সাক্ষাৎ শ্রুতিঃ ব্রূতে (স্বয়ং শ্রুতি এই কথা বলেন) সুষুপ্তৌ (সুষুপ্তিতে) অনুভূয়তে (অনুভব হয়)।

সরলার্থ: এই দৃশ্যমান জগৎকে আলাদা করে দেখা, দুই দেখা, এ মায়া, মিথ্যা। এক ব্রহ্মবস্তু পরমার্থই সত্য, অদ্বৈতভাবই সত্য। স্বয়ং শ্রুতি এই কথা বলেন আর সুষুপ্তিতে এটা অনুভূত হয়।

ব্যাখ্যা: আগে অনেক বিচার করা হয়েছে এখন সিদ্ধান্তের কথা হচ্ছে। পথ দিয়ে যাচ্ছি মনে হলো কি একটা দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ? কাছে এসে বুঝলাম মানুষ নয় একটা গাছের গুঁড়ি। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। এখন আর নড়চড় হবে না। কেউ আমাকে বোঝাতে পারবে না যে, ওটা গুঁড়ি নয়, মানুষ। এখানে বলছেন, এই যে জগৎ দেখছি, এ 'মায়ামাত্রম্'। কি করে মায়া? মায়া শব্দটা আমরা ব্যবহার করি কিন্তু তার ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। এটা সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। 'মায়ামাত্রম্-ইদং', এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে দেখছি, এটা মায়া। তার মানে কি আপনাকে দেখছি না? তা নয়। তবে ঠিক দেখছি না, ভুল দেখছি। আপনাকে আমি যা মনে করছি আপনি তা নন। এই মায়া। মায়া বলতে বোঝাচ্ছে যে আমি যা মনে করছি, যেভাবে দেখছি সেটা ভুল। গাছের গুঁড়িটাকে আমি সব সময়ই দেখছিলাম, তবে ভুল করে মানুষ

দেখছিলাম। বলছেন, 'দ্বৈতং', দুই দেখছি। এই যে দুই দেখছি, ভেদ দেখছি, এটা ভুল। বলছেন, 'মায়ামাত্রম্-ইদং দ্বৈতম্', 'ইদং'—দৃশ্য, এই জিনিসটা। এই দুই দেখা, ভেদ দেখা এটাই মায়া—'মায়ামাত্রম্'। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, দুই দেখা অজ্ঞান, এক দেখাই জ্ঞান। বলছেন, 'অদ্বৈতং পরমার্থতঃ'—পরমার্থতঃ অর্থাৎ আত্যন্তিক অর্থে সব এক। দুই দেখছি, বহু দেখছি, বৈচিত্র দেখছি—এটা ভুল। ভুল মানে একেবারে ভুল নয় কিন্তু। মায়া অনির্বচনীয়। শঙ্করাচার্য বলছেন, 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য', অনৃত মানে যা সত্য নয়, মিথ্যা। এই যে জগৎ, এটা সত্য আর মিথ্যা মিশিয়ে। এক অংশে সত্য, যদি ব্রহ্ম বলে দেখি, যদি 'আমি' বলে দেখি। আমি সর্বভূতে আছি এটা যদি দেখি তাহলে সত্য। আর যদি মানুষ, পাখী, গাছপালা এসব আলাদা আলাদা করে দেখি, দুই দেখি, বহু দেখি, তাহলে সেটা অজ্ঞান, মিথ্যা। মায়া আমাদের এই ভুলটা দেখায়। গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, আমি ভাবছি একটা মানুষ। দড়িটা পড়ে আছে, ভাবছি সাপ। এই ভুলটাকে ভাঙতে হবে। প্রথমে নেতি, নেতি করে বিচার করে দেখব ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। মিথ্যা অর্থাৎ অনিত্য, পরিবর্তনশীল। প্রথমে অনিত্য বলে জগৎটাকে উড়িয়ে দিচ্ছি শেষকালে দেখব, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। সব ব্রহ্ম। জীব ব্রহ্ম, জগৎও ব্রহ্ম—এই সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মই সব। ব্রহ্মময়ং জগৎ। তাই বলছেন, 'মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতম্-অদ্বৈতং পরমার্থতঃ'। একই বহু হয়েছেন। দুই দেখাটা মায়া। 'ইতি ব্রূতে শ্রুতিঃ সাক্ষাৎ', শ্রুতি এই কথা বলছেন। শ্রুতি অপৌরুষেয়, নৈর্ব্যক্তিক। শ্রুতিকে আমরা সবচেয়ে প্রামাণিক মনে করি। সেই শ্রুতি বলছেন, পরমার্থত সব এক, দুই বলে কিছু নেই। 'সুষুপ্তৌ-অনুভূয়তে'; সুষুপ্তিতে এটা আমরা অনুভব করি। এই অনুভব ঠিক ঠিক হয় সমাধিতে, কিন্তু সুষুপ্তিতেও আমরা এই একত্বের আভাস পাই।

অনন্যত্বমধিষ্ঠানাদারোপ্যস্য নিরীক্ষিতম্।
পণ্ডিতৈ রজ্জুসর্পাদৌ বিকল্পো ভ্রান্তিজীবনঃ।। ৪০৬

অন্বয়: আরোপ্যস্য (আরোপিত বস্তুর) অধিষ্ঠানাৎ অনন্যত্বং (অধিষ্ঠানের থেকে অন্যত্বের অভাব) পণ্ডিতৈঃ (বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের দ্বারা) রজ্জু-সর্পাদৌ (রজ্জু-সর্প ইত্যাদিতে) নিরীক্ষিতম্ (নিরীক্ষিত হয়) বিকল্পঃ (এক বস্তুতে অন্য জ্ঞান) ভ্রান্তি-জীবনঃ (ভ্রমের আশ্রয়ে বিদ্যমান থাকে)।

সরলার্থ: অধিষ্ঠানের থেকে আরোপিত বস্তুর অভিন্নতা পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রজ্জুসর্পাদিতে দর্শন করে থাকেন। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান ভ্রান্তির আশ্রয়েই হয়।

ব্যাখ্যা: বলছেন, আমাদের যে দুই দেখা, যেমন দড়িটাকে অধিষ্ঠান বলে দেখছি

আবার অধ্যাসরূপে সাপ দেখছি, এটা অজ্ঞানের জন্যে হচ্ছে। যখন জ্ঞান হবে তখন আর দুই দেখব না, তখন সব এক। বলছেন : 'অনন্যত্বম্-অধিষ্ঠানাদ্-আরোপ্যস্য নিরীক্ষিতম্'; অধিষ্ঠানের থেকে 'আরোপ্যে'র অনন্যত্ব, এটা দেখা গেছে। 'আরোপ্য' মানে আরোপিত বস্তু। ঐ যে রজ্জু-সর্পের উদাহরণ, তাতে ঐ দড়িটা অধিষ্ঠান, আর সাপ হলো 'আরোপ্য'। আলো নেই বলে দড়ির ওপর সাপের রূপটা আরোপিত হয়েছে। কিন্তু দড়ি আর ঐ কল্পিত 'সাপ' আসলে একই। অধিষ্ঠান দড়ি আর 'আরোপ্য' সাপ অনন্য, অভেদ। 'নিরীক্ষিতম্ পণ্ডিতৈঃ'—যাঁরা পণ্ডিত, তাঁরা অধিষ্ঠান আর আরোপিত বস্তুর এই অনন্যত্ব বুঝতে পারেন, অনুভব করেন। বস্তু তো এক, অভেদ, নাম-রূপে শুধু ভেদ। যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা দেখেন, অধিষ্ঠান আর আরোপ্য এক। 'রজ্জুসর্পাদৌ বিকল্পঃ ভ্রান্তিজীবনঃ'; দড়ি আর সাপ দেখা, এই 'বিকল্পঃ' বা দুই দেখাটা ভ্রান্তির জন্যে হয়। কোনও কালেই সাপ ছিল না, দড়িটাই আছে। ব্রহ্মই আছেন। সবই ব্রহ্ম, সবই এক। আমি ভুল করে দুই দেখছি, জীবজগৎ আর ব্রহ্মকে আলাদা ভাবছি।

চিত্তমূলো বিকল্পোঽয়ং চিত্তাভাবে ন কশ্চন।
অতশ্চিত্তং সমাধেহি প্রত্যগ্রূপে পরাত্মনি॥ ৪০৭

অন্বয়: অয়ং বিকল্পঃ (এই বিকল্প) চিত্তমূলঃ (চিত্তেই এর মূল) চিত্তাভাবে (চিত্তের অভাবে) কশ্চন ন (এর কিছুমাত্র থাকে না) অতঃ (অতএব) প্রত্যক্-রূপে (প্রত্যগাত্মায়) পরাত্মনি (যা স্বরূপত পরমাত্মা তাতে) চিত্তং সমাধেহি (চিত্তকে সমাহিত কর)।

সরলার্থ: এই বৈচিত্রময় দৃশ্যমান জগৎ, এই বিকল্প, এর আশ্রয় চিত্ত। চিত্ত না থাকলে এসব কিছুই থাকে না। অতএব চিত্তকে সমাহিত করে দাও প্রত্যগাত্মায় যা স্বরূপত পরমাত্মা।

ব্যাখ্যা: আমরা যে দুই দেখি, বহু দেখি, এর আশ্রয় আমাদের চিত্ত। চিত্তটা কি? চিত্ত একটা generic term, মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার সবগুলোকে জড়িয়ে চিত্ত বলা হচ্ছে। আমাদের ভালোবাসা, দ্বেষ, স্মৃতি—সবকিছুর স্থান এই চিত্তে। এ যেন একটা বিরাট হ্রদ। সব সময় সেখানে নানা তরঙ্গ উঠছে। মনের স্বভাব হলো সঙ্কল্প বিকল্প, দোদুল্যমান। বুদ্ধি হলো নিশ্চয়াত্মিকা। সে বিচার করে বলে দেবে, হ্যাঁ কর, বা কোরো না। তারপর চিত্ত; ভালো লাগা মন্দ লাগা। তারপর অহঙ্কার, আমি-বুদ্ধি। বলছেন, 'চিত্তমূলঃ বিকল্পঃ-অয়ং'; এই যে আমরা ভেদ দেখছি এটা চিত্তের জন্যে। 'চিত্ত-অভাবে ন কশ্চন'; চিত্ত যদি না থাকে তাহলে আর ভেদ, বিকল্প, সব

ভিন্ন ভিন্ন দেখার প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই 'অতঃ চিত্তং সমাধেহি'—অতএব এই চিত্তকে সমাহিত কর। এটা না থাকলেই তো সব ভেদবুদ্ধি ঘুচে যাবে অতএব এটাকে সমাধি দাও। কোথায় সমাধি দেব? 'প্রত্যগ্রূপে পরাত্মনি'; তোমার মধ্যে যে পরমাত্মা আছেন তাঁতে সমর্পণ করে দাও। 'প্রত্যগ্-রূপে', এই যে আমি নিজেকে জীব মনে করছি, আমার একটা আমিত্ব আছে সেটা পরমাত্মা আছেন বলেই আছে। তুমি এটাকে পরমাত্মার মধ্যে সমাধি দাও, ডুবিয়ে দাও, বিসর্জন দাও। অর্থাৎ তুমি সমাধি লাভ করে পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাও। কচ্ছপ যেমন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয় তেমনি তুমি তোমার সব ইন্দ্রিয়গুলোকে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে নাও তারপর মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার সব সমেত পরমাত্মায় বিসর্জন দাও। তাহলেই সমাধি হলো। 'চিত্তমূলঃ বিকল্পঃ অয়ং'—সব বিকল্পের মূলে চিত্ত। 'চিত্তাভাবে ন কশ্চন'; তাই চিত্তকে পরমাত্মায় লয় করে দিতে হবে। তোমার মন, বুদ্ধি, আমি-বোধ সবকিছু পরমাত্মায় অর্পণ করে দাও, সমাধিস্থ হও। তাহলেই দেখবে, সব একাকার। দুই নেই, শুধু এক।

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধিগগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥ ৪০৮

অন্বয়: কিম্-অপি (কি যেন একটা) সততবোধং (সব সময় আমি বোধ) কেবলানন্দ রূপং (বস্তুত সেটা আনন্দরূপ) নিরুপমম্ (উপমারহিত) অতিবেলং (সীমাহীন) নিত্যমুক্তং (তিনকালে বন্ধন রহিত) নিরীহম্ (ক্রিয়াহীন) নিরবধিগগনাভং (সীমাহীন আকাশ সদৃশ) নিষ্কলং (ক্ষয়বৃদ্ধি রহিত, অখণ্ড) নির্বিকল্পং (বিকল্পশূন্য) পূর্ণং ব্রহ্ম (পূর্ণ ব্রহ্ম) বিদ্বান্ (বিদ্বান ব্যক্তি) সমাধৌ হৃদি কলয়তি (সমাধিতে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন)।

সরলার্থ: কি যেন একটা আনন্দরূপ আমি বোধ, যা সব সময় আছে, বিদ্বান ব্যক্তি সমাধিতে অনুভব করেন, যার কোনও উপমা হয় না, অসীম, ক্রিয়াহীন আকাশের মতো সর্বব্যাপী অখণ্ড, নির্বিকল্প ক্ষয়বৃদ্ধিহীন, সেই পূর্ণব্রহ্ম।

ব্যাখ্যা: সমাধিতে সাধক কি অনুভব করেন সেটা বলছেন। 'কিম্-অপি সততবোধং'। 'বোধ' মানে জ্ঞান বা চৈতন্য। 'সততবোধং'—সর্বদা জ্ঞানস্বরূপ, নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ। নিত্যচৈতন্যস্বরূপ একটা-কিছুকে তিনি অনুভব করেন। তাঁকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাই বলছেন, 'কিম-অপি'—কি যেন একটা। 'কেবল-

আনন্দরূপম্'—আনন্দস্বরূপ, কেবল আনন্দস্বরূপ। দুঃখের লেশমাত্রও নেই সেখানে। সমাধিস্থ সাধক নিজেকে সেইভাবে অনুভব করেন। 'নিরুপমম্-অতিবেলং'; 'নিরুপমম্'—কোনও উপমা নেই, তাঁর কোনও দ্বিতীয় নেই, one single existence. 'অতিবেলং'; 'বেলা' মানে তট। 'অতিবেলং' অর্থাৎ সীমা নেই তাঁর, অসীম, সর্বব্যাপী। 'নিত্যমুক্তং নিরীহম্'; সে নিত্যমুক্ত, কোনও বন্ধন নেই। যে অসীম, তার বন্ধন থাকে কি করে? 'নিরীহম্', তিনি কোনও কাজ করছেন না, তাঁর কোন চলাফেরা নেই। যিনি অসীম, সর্বব্যাপী তাঁর আবার চলাফেরা কি করে থাকবে? আর, কোন বাসনা থাকলে তবে তো কাজ করার কথা ওঠে, তাঁর তো কোনও বাসনা নেই, তাই কোনও চেষ্টা নেই, কাজও নেই। তারপর বলছেন, 'নিরবধি গগনাভং'; আকাশ যেমন সব সময় সবকিছুর মধ্যে রয়েছে তিনি তেমনি সব সময় সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন। 'নিষ্কলং'—তাঁর কোনও কলা নেই, খণ্ড নেই। আর চন্দ্র যেমন এক কলা, এক কলা করে বাড়ে বা কমে তাঁর সেরকম কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। 'নির্বিকল্পং'—তাঁর বিকল্প নেই, পরিবর্তন নেই। সিদ্ধ সাধক সমাধিতে হৃদয়ের মধ্যে পূর্ণ ব্রহ্মকে অনুভব করেন। 'বিদ্বান' মানে এখানে বই পড়া বিদ্বান নয়, বা শাস্ত্র পড়া পণ্ডিত নয়। যিনি জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনিই বিদ্বান। তিনি সমাধিতে ব্রহ্মকে হৃদয়ে কিভাবে অনুভব করেন, তা-ই এখানে বলছেন।

প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং
সমরসমসমানং মানসম্বন্ধদূরম্।
নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥ ৪০৯

অন্বয়: প্রকৃতিবিকৃতি শূন্যং (কার্যকারণের অতীত) ভাবনাতীত ভাবং (বাক্যমনাতীত এক অনুভব) সমরসম্ (একরস, অবিমিশ্র) অসমানম্ (অনুপম) মান-সম্বন্ধ-দূরম্ (কোনও বিশেষ অবস্থানুগ নয়) নিগমবচনসিদ্ধং (শাস্ত্রবচনের দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ) নিত্যম্-অস্মৎ-প্রসিদ্ধং (সর্বদা অহংবোধের সঙ্গে ওতপ্রোত) পূর্ণং ব্রহ্ম সমাধৌ বিদ্বান্ হৃদি কলয়তি (ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষ সমাধিতে সেই পূর্ণ ব্রহ্মানুভূতিতে ডুবে থাকেন)।

সরলার্থ: বিদ্বান ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সমাধিতে কার্যকারণের অতীত, অবিষয়রূপে জ্ঞেয়, নির্বিকার, নিরুপম, অবিশেষ, বেদপ্রমাণসিদ্ধ, সর্বদা অহংবোধের মধ্যে প্রকাশিত পূর্ণব্রহ্মকে অন্তরে অনুভব করেন।

ব্যাখ্যা: এখানে আবার বলছেন, সমাধিতে সাধক ব্রহ্মকে কিভাবে অনুভব করেন।

'প্রকৃতিবিকৃতি-শূন্যং ভাবনাতীত ভাবং'; প্রকৃতি হচ্ছে কারণ আর বিকৃতি হচ্ছে কার্য। বলছেন, তিনি কার্যকারণশূন্য। জগতের সবকিছু কার্যকারণের মধ্যে পড়ছে। প্রতিটি বস্তুই কোন কিছুর ফল বা কার্য, আবার প্রতিটি বস্তুই অন্য কোন কিছুর কারণ। একমাত্র ব্রহ্মই কার্যকারণশূন্য। বলছেন, 'ভাবনাতীতভাবং'; বাক্য-মনাতীত, ভাবনায় তাঁকে ধরতে পারা যায় না। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈ, ২।৪)। যাঁর থেকে সমস্ত বাক্য ফিরে আসে, 'অপ্রাপ্য মনসা সহ'—তাঁকে ধরতে না পেরে মনকে নিয়ে বাক্য ফিরে আসে। অর্থাৎ বাক্য ও মন দিয়ে তাঁকে ধরা যায় না। তিনিই তো সব হয়েছেন। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এক হয়ে গেছে। তাহলে কি করে তাঁর কথা বলা যাবে? কে বলবে? কি বলবে? তারপর বলছেন, 'সমরস', একরস, homogeneous, তিনি এক, অখণ্ড, অবিমিশ্র। 'অসমান', তাঁর জুড়ি নেই, তাঁর উপমা নেই। 'মান-সম্বন্ধ-দূরম'; 'মান' অর্থাৎ একটা category, একটা অবস্থা, একটা বৈশিষ্ট্য দিয়ে নির্দেশ করা, এসবের থেকে তিনি দূরে। তিনিই তো সব হয়েছেন। 'মান-সম্বন্ধ-দূরম্', এগুলো ন্যায়ের কথা। তর্কবিচার করে অবস্থা নির্দেশ করে তাঁকে ধরা যায় না। 'নিগমবচনসিদ্ধং'; নিগম মানে শাস্ত্র, এখানে শ্রুতি বুঝতে হবে। শ্রুতিবাক্যই তাঁর প্রমাণ। আর তো কোনও প্রমাণ নেই, শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ। 'নিত্যম্-অস্মৎ-প্রসিদ্ধম্'; সর্বদা আমাদের অহংবোধের মধ্যে তিনি প্রকাশিত হচ্ছেন। প্রত্যেকের মধ্যে একটা 'অহং'বোধ আছে—যার জন্যে সে নিজেকে একটা আলাদা সত্তা মনে করছে। এই 'অহং' আসলে তাঁরই প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণ অহংকার কথাটা ভেঙে বলতেন : এই 'অহং' কার ? তাঁরই। 'হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ'—বিদ্বান ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ সমাধিতে পরিপূর্ণ ব্রহ্মানুভূতিতে লীন হয়ে যান। দেশ, কাল, কার্য, কারণ সবকিছু সীমার বাইরে এক অচিন্ত্য অনুভূতিতে তলিয়ে যান। সমাধির মধ্যে ব্রহ্মকে তিনি এইভাবে অনুভব করেন।

অজরমমরমস্তাভাববস্তুস্বরূপং
স্তিমিতসলিলরাশি-প্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥ ৪১০

অন্বয়: অজরম্-অমরম্ (অজর অমর) অস্ত-অভাববস্তু-স্বরূপং (সমস্ত অভাববোধের অন্ত হয়েছে এইরকম বস্তুস্বরূপ) স্তিমিত-সলিলরাশি-প্রখ্যম্ (অচঞ্চল সমুদ্রতুল্য) আখ্যাবিহীনম্ (অবর্ণনীয়) শমিত-গুণবিকারং (দোষগুণরহিত) শাশ্বতং শান্তম্ একম্ (শাশ্বত শান্ত অদ্বিতীয়) পূর্ণং ব্রহ্ম সমাধৌ বিদ্বান্ হৃদি কলয়তি (পূর্ণ ব্রহ্মকে বিদ্বান অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি সমাধিতে হৃদয়ে অনুভব করে ভরপুর হয়ে থাকেন)।

সরলার্থ: অজর অমর, অভাববোধবর্জিত, অচঞ্চল সমুদ্রতুল্য, অবর্ণনীয়, গুণ-দোষ রহিত, শাশ্বত শান্ত অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্মকে বিদ্বান ব্যক্তি সমাধির মধ্যে হৃদয়ে অনুভব করেন।

ব্যাখ্যা: এখানেও আবার সমাধিস্থ সাধকের ব্রহ্মানুভূতি বর্ণনা করছেন। নিজের হৃদয়ে ব্রহ্মকে তিনি কিরকম অনুভব করছেন ? 'অজরম্-অমরম্ অস্ত-অভাববস্তুস্বরূপং'—অজর, অমর, অস্ত নেই, অন্ত নেই, মৃত্যু নেই, শেষ নেই, এইরকম একটা বস্তু অর্থাৎ অখণ্ড, শাশ্বত। 'স্তিমিত সলিলরাশি-প্রখ্যম্'—একটা সমুদ্রের মতো, কিন্তু জলটা স্থির, কোনও চাঞ্চল্য নেই। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো। 'আখ্যাবিহীনম্'—তাঁর কোনও আখ্যা নেই, অর্থাৎ কোনও বিশেষণ দিয়ে তাঁকে বিশেষিত করা যায় না। 'শমিত গুণবিকারং'; 'শমিত' মানে শান্ত। গুণের কোনও বিকার আর নেই, সব শান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁর দোষ-গুণ নেই, ভালো-মন্দ নেই। এই রকম একটা জিনিস কি আমরা ভাবতে পারি? যার দোষ-গুণ নেই, ভালো-মন্দ নেই? 'শাশ্বতং শান্তম্-একম্'; 'শাশ্বত' মানে চিরকালীন। তিনি নিত্য বিরাজমান, শান্ত, এক। একটা বিরাট জলরাশির মতো তিনি। তরঙ্গ নেই সেখানে। তিনি এমন যাকে বর্ণনা করা যায় না। কোনও বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত করা যায় না। 'হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ'; 'বিদ্বান্' মানে যিনি স্থির হয়েছেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। তিনি যখন সমাধিস্থ হয়ে থাকেন, তখন হৃদয়ের মধ্যে পূর্ণব্রহ্মকে এইভাবে অনুভব করেন।

সমাহিতান্তঃকরণঃ স্বরূপে বিলোক্যাত্মানমখণ্ডবৈভবম্।
বিচ্ছিন্ধি বন্ধং ভব-গন্ধ-গন্ধিতং যত্নেন পুংস্ত্বং সফলীকুরুষ্ব॥ ৪১১

অন্বয়: সমাহিত-অন্তঃকরণঃ (একাগ্রচিত্ত হয়ে) স্বরূপে (নিজের আত্মায়) অখণ্ড বৈভবম্ আত্মানম্ বিলোক্য (অখণ্ড আনন্দরূপ ঐশ্বর্যসম্পন্ন আত্মাকে অবলোকন করে) ভব-গন্ধ-গন্ধিতং (জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররূপ দুর্গন্ধযুক্ত) বন্ধং বিচ্ছিন্ধি (অহঙ্কারজনিত বন্ধন ছিন্ন কর) যত্নেন (যত্নের সঙ্গে) পুংস্ত্বং সফলীকুরুষ্ব (পুরুষ-জন্ম সফল কর)।

সরলার্থ: সমাহিত চিত্তে নিজের আত্মায় অখণ্ড-আনন্দরূপ ঐশ্বর্যযুক্ত পরমাত্মাকে অবলোকন করে জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররূপ-দুর্গন্ধযুক্ত অহঙ্কারজনিত ভববন্ধন ছিন্ন কর। যত্নের সঙ্গে সাধন করে মানবজন্ম সফল কর।

ব্যাখ্যা: 'সমাহিত-অন্তঃকরণঃ'; মনটাকে সমাহিত করে রাখ। অন্য কোনও চিন্তার স্থান দিও না। সেই এক ব্রহ্মচিন্তায় সমাধি লাভ করে বসে থাক। 'স্বরূপে বিলোক্য-

আত্মানম্-অখণ্ড বৈভবম্'; নিজের স্বরূপে আত্মার অখণ্ড ঐশ্বর্য দেখতে থাক। বাইরে কি আর মণিমুক্তা আছে ? ভেতরে যা আছে তার কাছে সেসব কিছু নয়। সেই ঐশ্বর্য দেখে ভববন্ধন ছিন্ন করে ফেল। 'বিচ্ছিন্ধি বন্ধং ভব-গন্ধ-গন্ধিতং'। জন্মজন্মান্তরের নানা দুর্গন্ধ, আমার এই জীবনে রয়ে গেছে। অর্থাৎ সংস্কার রয়ে গেছে। আবার সংস্কার এসেছে অহংকার থেকে। অহংকার না থাকলে সংস্কারও থাকত না। অহংকার আর সংস্কারের জন্যেই আমার বন্ধন। বলছেন : 'বন্ধং বিচ্ছিন্ধি'—এই সমস্ত বন্ধন কেটে ফেল। কিভাবে কাটব ? নিজেকে যদি আত্মা বলে জানি তাহলেই বন্ধন কেটে যাবে। আত্মার ঐশ্বর্য দেখলে সব দুর্গন্ধ চলে যাবে। বলছেন, বিচার কর যে, তুমি এই দেহ নও। তোমার জন্মজন্মান্তর তো ঘটতে পারে না, আত্মার তো জন্ম-মৃত্যু নেই। এটা বোঝ। এটা বোঝার জন্যে চেষ্টা কর, যত্ন কর। 'যত্নেন পুংস্ত্বম্ সফলীকুরুষ্ব', চেষ্টার দ্বারা তোমার মানবজন্ম সফল কর। নিজেকে আত্মা বলে জানলে তোমার মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে।

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
ভাবয়াত্মানমাত্মস্থং ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে॥ ৪১২

অন্বয়: সর্ব-উপাধি-বিনির্মুক্তং (স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ উপাধিশূন্য) সচ্চিদানন্দম্-অদ্বয়ম্ (সচ্চিদানন্দ, অদ্বয়) আত্মস্থং (হৃদয়গুহাস্থিত) আত্মানম্ ভাবয় (আত্মাকে চিন্তা কর) ভূয়ঃ (পুনরায়) অধ্বনে (সংসার পথে) ন কল্পসে (আসার কথাই থাকবে না)।

সরলার্থ: সমস্ত উপাধিশূন্য হৃদয়গুহাস্থিত সচ্চিদানন্দ অদ্বয় আত্মার চিন্তা কর। আর সংসার পথে যাতায়াতের প্রশ্নই থাকবে না।

ব্যাখ্যা: এখানে বলে দিচ্ছেন, আমাদের মনটা কিভাবে একটা সুরে বেঁধে রাখতে হবে, সব সময় কি ভাবতে হবে। 'সর্ব-উপাধি বিনির্মুক্তং'; উপাধি কোন্‌গুলোকে বলে? আমি নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম। সেটাই আমার একমাত্র পরিচয়। কিন্তু কোথা থেকে আমার একটা আলাদা 'আমি'বোধ এসে গেছে—শ্রীরামকৃষ্ণ যেটাকে 'কাঁচা আমি' বলছেন। সেইজন্যে আমি দেহ-মন-বুদ্ধি এগুলোকে 'আমি-আমার' ভাবছি, আর এগুলোকে কেন্দ্র করে কত কি তৈরী করছি। আমি পুরুষ, আমি ধনী, আমি ভালো, আমি বাংলায় কথা বলি, আমি এই পরিবারে জন্মেছি—এরকম কত কি ! ঐ 'কাঁচা আমি' আর তার এসব ডালপালা—এগুলিই উপাধি। কিন্তু আমার স্বরূপটা হচ্ছে ঐ নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম। তিনি নিরুপাধিক। তাই বলছেন : 'সর্ব-উপাধি-বিনির্মুক্তং'—সব উপাধি ছেড়ে বেরিয়ে এসো, সাপ যেভাবে খোলস ছেড়ে দেয়।

তখন দেখবে, তুমি 'সচ্চিদানন্দম্-অদ্বয়ম্'। তাঁর কোনও তুলনা নেই? দুই নেই, বিকল্প নেই, অসাধারণ, অতুলনীয়, তাই 'অদ্বয়ম্।' 'কেবলঃ', শুধু এক। তাঁকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তিনি সচ্চিদানন্দ— এটাই শুধু বলা যায়। তিনি আছেন, তিনি সর্বভূতে বিরাজ করছেন, তাই সবকিছু আছে। চৈতন্যরূপে তিনি আছেন, তাই সেই চৈতন্যের অংশরূপে আমরা প্রতিভাত হচ্ছি। তিনি আনন্দস্বরূপ, সেই আনন্দের ছিটেফোঁটা নিয়ে আমাদের সমস্ত জাগতিক আনন্দ। সৎ-চিৎ-আনন্দ— এগুলো আলাদা আলাদা নয়, তিনটেই তিনি। তিনিই সৎ, তিনিই চৈতন্য, তিনিই আনন্দ। 'ভাবয় আত্মানং আত্মস্থং', এইটা চিন্তা কর। এই হচ্ছে বাস্তব উপায়, 'ভাবয়'—চিন্তা কর। 'আত্মানং আত্মস্থং'—তোমার আত্মার ভেতরেই তিনি বাইরে নন, এই চিন্তা কর। এইরকম যদি করতে পার তাহলে 'ন ভূয়ঃ কল্পসে অধবনে'; 'অধবন্' মানে পথ। একবার তাঁকে জানতে পারলে আর বারবার সংসারের পথে যেতে হবে না। অর্থাৎ তোমার আর পুনর্জন্ম হবে না। তোমার ভেতরেই সেই পরমাত্মা যাকে তুমি খুঁজছ। তুমি তোমাকেই খুঁজছ। একবার যদি সেটা বুঝতে পার, তাহলেই তুমি মুক্ত। যে একবার বুঝে নিয়েছে 'আমিই পরমাত্মা' সে জানে সে অজ, অমর। তার আর জন্ম হয় না, তাই আর সংসারের পথে বারবার যেতে হয় না।

ছায়েব পুংসঃ পরিদৃশ্যমানমাভাসরূপেণ ফলানুভূত্যা।
শরীরমারাচ্ছববন্নিরস্তং পুনর্ন সংধত্ত ইদং মহাত্মা।। ৪১৩

অন্বয়: ফলানুভূত্যা (কর্মফলের অনুভববশত) পুংসঃ ছায়া ইব (পুরুষের ছায়ার মতো এই দেহ) আভাসরূপেণ পরিদৃশ্যমানম্ (আভাসরূপে পরিদৃষ্ট) শববৎ আরাৎ নিরস্তং (শবের মতো দূরে পরিত্যক্ত) ইদং শরীরং (এই শরীরকে) মহাত্মা (ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি) পুনঃ (পুনরায়) ন সংধত্ত (গ্রহণ করেন না)।

সরলার্থ: কর্মফল অনুভব করার জন্যে দেহকে ছায়ার মতো আভাস বলে মনে হয়। সেইজন্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দেহকে শবের মতো দূরে পরিত্যাগ করেন এবং পুনর্বার শরীর গ্রহণ করেন না।

ব্যাখ্যা: বলছেন, এই দেহটা ছায়ার মতো অনিত্য ; 'ছায়া-ইব-পুংসঃ পরিদৃশ্যমানম্-আভাসরূপেণ ফলানুভূত্যা'। কেন, এরকম দেখছি ? 'ফলানুভূত্যা', কর্মফলের জন্যে। কর্মফলের জন্যে আমার জন্ম হয়েছে, কর্মফলের জন্যেই শরীর ধারণ, কর্মফলের জন্যেই এইসব নিয়ে আছি। এরকম দেখছি। তাই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কাছে এই দেহটা ছায়ার মতো, অনিত্য, আভাসের মতো দেহটা একটা কোশ। একে বলা হয় অন্নময়কোশ। অন্ন থেকেই তো আমাদের দেহের পুষ্টি হয় তাই দেহটাকে

বলা হয় অন্নময়কোশ। পঞ্চকোশের ভেতরে আমাদের আত্মা আছেন। অন্নময়কোশ, প্রাণময়কোশ, মনোময়কোশ, বিজ্ঞানময়কোশ, আনন্দময়কোশ। এই কোশগুলির মধ্যে তিনি লুকিয়ে আছেন। যিনি আত্মাকে জানেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তিনি এই দেহটাকে 'শববৎ-নিরস্তং', শবের মতো ফেলে দেন। শ্রীশ্রীমা বলছেন, একদিন দেখি আমি শরীরটার বাইরে চলে এসেছি, আর ওটার মধ্যে ঢুকতে ইচ্ছে হচ্ছে না। 'পুনর্ন সংধত্ত ইদং মহাত্মা'। মহাত্মা যাঁরা তাঁরা আর এটা গ্রহণ করেন না। কিরকমভাবে বলছেন এখানে—'শরীরম্-আরাৎ-শববৎ-নিরস্তং'। এই শরীর দূরে যেন একটা শবের মতো পড়ে আছে। যাঁদের জ্ঞান হয়েছে তাঁদের এই দেহটাকে আর গ্রহণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। দেহে তাঁদের কোনও মন থাকে না। আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, এই বোধ নিয়ে তাঁরা থাকেন। কিন্তু যাঁরা অবতার তাঁদের ব্যাপার আলাদা। তাঁরা লোককল্যাণের জন্যে ব্যাধি, দারিদ্র সব ভোগ করেও দেহধারণ করে থাকেন।

সততবিমলবোধানন্দরূপং সমেত্য
ত্যজ জড়মলরূপোপাধিমেতং সুদূরে।
অথ পুনরপি নৈষ স্মর্যতাং বান্তবস্তু
স্মরণবিষয়ভূতং কল্পতে কুৎসনায়।। ৪১৪

অন্বয়: সতত-বিমলবোধ-আনন্দরূপং (শাশ্বত-নির্মল-জ্ঞান ও আনন্দরূপ আত্মাকে) সমেত্য (লাভ করে) এতং (এই) জড়-মলরূপ-উপাধিম্ (জড় ও মলিন দেহরূপ-উপাধিকে) সুদূরে ত্যজ (দূরে ত্যাগ কর) অথ (অতঃপর, সমাধি থেকে ব্যুত্থানের পর) পুনঃ অপি (পুনরায়) এষঃ ন স্মর্যতাং (এ আর স্মরণযোগ্য নয়) বান্তবস্তু (বমি করা বস্তু) স্মরণবিষয়-ভূতং (স্মরণের বিষয় হলে) কুৎসনায় কল্পতে (ঘৃণার উদ্রেক হয়)।

সরলার্থ: শাশ্বত নির্মলজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ আত্মাকে লাভ করে এই জড় ও মলিন দেহ, যেটা একটা উপাধি, তার ওপর থেকে অহংবুদ্ধি ত্যাগ কর, দূরে সরিয়ে দাও। সমাধিতে নিজের শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপকে জেনে আবার ব্যুত্থানের পর এই দেহকে স্মরণের যোগ্য মনে করো না। বমি করে ফেলে দেওয়া বস্তু স্মরণ করলে শুধু ঘৃণারই উদ্রেক হয়।

ব্যাখ্যা: আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে এই শরীরটা জড়, মলিন, একটা শবের মতো। 'সততবিমলবোধানন্দরূপং সমেত্য ত্যজ জড়-মলরূপম্ উপাধিম্-এতৎ সুদূরে'—নিত্য জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ আত্মাকে জেনে এই দেহটাকে দূরে ছুঁড়ে দাও। 'ত্যজ'—দূর করে দাও, ছুঁড়ে ফেলে দাও দূরে। কাকে ? দেহটাকে।

দেহটাকে বলা হচ্ছে 'জড়-মল-রূপ', মলিন, ময়লা। বাইরে খুব চাকচিক্য, কিন্তু ভেতরে? মলিন, ময়লা। দূর করে দাও 'উপাধিম্-এতং'; এ তো একটা উপাধি, আরোপিত হয়েছে। এ অনিত্য, একে দূর করে দাও, দেহ ও দেহকেন্দ্রিক যা কিছু তার থেকে অহংবুদ্ধি তুলে নাও। 'অথ পুনরপি নৈষ স্মর্যতাং'। 'অথ'—অনন্তর। বলছেন, একবার যদি তোমার স্বরূপজ্ঞান হয় তারপর আর দেহের চিন্তা করো না। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপলব্ধি করা যে আমি শুদ্ধচৈতন্য। এই উপলব্ধি আমাদের হয়তো হয়েছে, সমাধি হয়েছে; কিন্তু সমাধিতে তো সব সময় থাকতে পারি না, এর থেকে নেমে আসতে হয়, ব্যুত্থান হয়। সমাধিতে আমরা ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাই, তখন দেহবুদ্ধি আর থাকে না। তাহলে সমাধি থেকে নেমে এসে আবার দেহটাকে 'আমি' ভাবব কেন ? 'পুনরপি'—আবার, ফেলে দেওয়া জিনিসগুলোকে আমি গ্রহণ করব কেন? একটা অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করছেন। বলছেন, 'বান্তবস্তু'—যেন এই দেহবুদ্ধিটা বমি করে দিয়েছি, আবার সেটা নেব কি করে? সেটা তো ভাবলেই ঘেন্না হয়। সমাধি লাভের পর আবার দেহাত্মবুদ্ধি আসা বমি করে বমিকে গ্রহণ করার মতোই ঘৃণ্য। বলছেন, তোমার সমাধি হয়েছে, তুমি বুঝে নিয়েছ এই দেহ অনিত্য কাজেই এই দেহ নিয়ে থাকবে কেন? আমার যদি একবার এই বোধ হয় যে আমি 'সততবিমলবোধ-আনন্দরূপং' তাহলে অনাবিল আনন্দরূপ যিনি তাঁকে লাভ করে, আমি আবার কেন মলিন দেহটাকে 'আমি' ভাবব? 'ত্যজ জড়-মলরূপ-উপাধিম্-এতং সুদূরে', এই জড়-মলিন উপাধিকে ত্যাগ কর, একে দূরে সরিয়ে দাও। এগুলোর কথা আর কেন মনে করবে? একবার যখন ত্যাগ করেছ তখন 'পুনরপি ন স্মর্যতাম্', আবার স্মরণ করার যোগ্য এগুলো নয়, স্মর্তব্য নয়। 'বান্তবস্তু স্মরণবিষয়ভূতং কল্পতে কুৎসনায়'; বমি করা জিনিস; সেটা কি আবার মুখে তোলা যায় ? জ্ঞানলাভের পর দেহাদি অনিত্য জিনিসও সেরকম ঘৃণ্য মনে হয়।

সমূলমেতৎ পরিদাহ্য বহ্নৌ সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে।
ততঃ স্বয়ং নিত্যবিশুদ্ধবোধানন্দাত্মনা তিষ্ঠতি বিদ্বদ্বরিষ্ঠঃ।। ৪১৫

অন্বয়: এতৎ (এই দেহাদি জড়বস্তু) সমূলং (অবিদ্যার মূলসহ) সদাত্মনি নির্বিকল্পে ব্রহ্মণি বহ্নৌ (সৎস্বরূপ নির্বিকল্প ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) পরিদাহ্য (দগ্ধ করে) ততঃ (তার পর) বিদ্বদ্বরিষ্ঠঃ (জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ) নিত্য-বিশুদ্ধ-আনন্দ-আত্মনা (নিত্য-বিশুদ্ধ-আনন্দস্বরূপ আত্মাসহ) স্বয়ং তিষ্ঠতি (স্বয়ং অবস্থান করেন)।

সরলার্থ: যিনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ তিনি সৎস্বরূপ নির্বিকল্প ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নিতে দেহাদি অনাত্মবস্তু অবিদ্যার মূলসহ দগ্ধ করে নিত্য-শুদ্ধ-আনন্দস্বরূপ আত্মাসহ স্বয়ং অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যা: যদি একবার আত্মজ্ঞান লাভ হয় তাহলে দেহাদিতে যে অহংবুদ্ধি সেটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই অহংবুদ্ধিই আমাদের সংসারে বেঁধে রাখে, জ্ঞানাগ্নিতে তা পুড়ে যায়। 'সমূলম্-এতৎ পরিদাহ্য'। 'এতৎ' মানে বাহ্য বিষয়, দেহ ইত্যাদি উপাধি—ভুল করে যাতে আমরা আত্মবুদ্ধি করি। অজ্ঞানের জন্যে, অবিদ্যার জন্যে, যা অধ্যাস, অনিত্য, মিথ্যা তাকেই আঁকড়ে ধরি, অধিষ্ঠানকে ধরতে পারি না। কিন্তু যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে, তিনি আর আরোপিত বস্তুতে মন দিতে পারেন না, যিনি অধিষ্ঠান তাঁতেই নিবিষ্ট হয়ে যান। বলছেন, 'সমূলম্-এতৎ পরিদাহ্য বহ্নৌ সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে'; এই যে অবিদ্যা তাকে ব্রহ্মাগ্নিতে সমূলে দগ্ধ করে ফেলে তিনি আত্মস্থ হয়ে থাকেন। 'সমূলম্', এই অবিদ্যার শিকড় পর্যন্ত দগ্ধ করে তিনি নির্বিকল্প সৎস্বরূপ ব্রহ্মে সমস্ত দেহবুদ্ধি যেন আহুতি দিয়ে দেন। 'ততঃ স্বয়ং নিত্য বিশুদ্ধ বোধ-আনন্দ-আত্মনা তিষ্ঠতি বিদ্বদ্বরিষ্ঠঃ'। তখন কি হয়? সেই 'বিদ্বদ্বরিষ্ঠঃ'—জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, স্বয়ং নিত্য-বিশুদ্ধ-বোধ-স্বরূপ আনন্দরূপ 'আত্মনা'—আত্মার সঙ্গে, একাত্ম হয়ে 'তিষ্ঠতি'—অবস্থান করেন। 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'। যিনি 'বিদ্বদ্বরিষ্ঠঃ' তিনি ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্মই হয়ে যান। পরম আনন্দে স্বরূপে অবস্থান করেন।

প্রারব্ধসূত্রগ্রথিতং শরীরং প্রযাতু বা তিষ্ঠতু গোরিব স্রক্।
ন তৎ পুনঃ পশ্যতি তত্ত্ববেত্তানন্দাত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ।। ৪১৬

অন্বয়: আনন্দ-আত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ তত্ত্ববেত্তা (আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে যাঁর সব বৃত্তি লীন হয়ে গেছে এইরকম তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি) প্রারব্ধ-সূত্র-গ্রথিতং শরীরং (প্রারব্ধ কর্মের ফলে উৎপন্ন শরীর) প্রযাতু বা তিষ্ঠতু (যাক বা থাকুক) তৎ পুনঃ ন পশ্যতি (তার দিকে আর ফিরেও তাকান না) গোঃ স্রক্ ইব (গাভীর গলদেশে অর্পিত মালার মতো [সেটা আছে কি নেই গাভীর যেমন ভ্রূক্ষেপ থাকে না])।

সরলার্থ: আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে যাঁর সমস্ত বৃত্তি লীন হয়ে গেছে সেই তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি প্রারব্ধ কর্মের ফলপ্রসূত তাঁর যে শরীর তা থাক বা যাক, সেদিকে আর দৃষ্টিপাত করেন না। গাভীর গলায় মালা দিলে যেমন মালাটি আছে কি নেই সে-সম্বন্ধে গাভীর কোনও ভ্রূক্ষেপ থাকে না, তেমনি।

ব্যাখ্যা: বলছেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তিনি আর এই দেহটা থাক বা যাক, সেদিকে দৃষ্টিপাতও করেন না। 'প্রারব্ধ-সূত্র-গ্রথিতং শরীরং প্রযাতু বা তিষ্ঠতু গোঃ-ইব স্রক্'। প্রারব্ধ কর্মের ফলস্বরূপ এই দেহের উৎপত্তি। প্রারব্ধকর্ম মানে যে কর্ম ফল দিতে শুরু করেছে। তিন রকম কর্ম। প্রারব্ধ, সঞ্চিত আর আগামী। আগামী আর সঞ্চিত কর্ম ব্রহ্মজ্ঞান হলে নষ্ট হয়ে যায়। সেগুলো

আর ফল দেয় না। কিন্তু প্রারব্ধকর্ম হচ্ছে যে সব কর্ম ফল দিতে শুরু করেছে। সেটা থেকে যায়। এ যেন নিক্ষিপ্ত তীরের মতো। যে তীর একবার ছোঁড়া হয়ে গেছে তাকে তো আর ফেরানো যাবে না। সেইরকম প্রারব্ধ কর্মের ফল আত্মজ্ঞান হলেও পেতে হবে, প্রারব্ধ ক্ষয় হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি জানেন যে, তিনি স্বরূপত আত্মা—দেহ নন; দেহটা প্রারব্ধ কর্মের ফলস্বরূপ চলছে এবং এই জীবনের সমস্ত উত্থানপতনও প্রারব্ধের জন্যে। তাই তাঁর তাতে কিছু যায় আসে না, দেহটা থাকুক বা যাক তিনি দৃক্‌পাত করেন না। বলছেন 'গোঃ ইব স্রক্'; গরুর গলায় মালা পরালে গরুর যেমন কিছু যায় আসে না তেমনি। এরকম অবস্থা কি করে হয়? কারণ 'তত্ত্ববেত্তা' যিনি তাঁর পক্ষে সব সমভাব। তাঁর সমস্ত বৃত্তি নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মসাগরে লীন হয়ে গেছে। আমাদের মনে যেসব ভিন্ন-ভিন্ন ভাবের সঞ্চার হয় সেগুলো আমাদের বৃত্তি, আমাদের মনের তরঙ্গ। তিনি 'তত্ত্ববেত্তা'—ব্রহ্মকে জেনেছেন, সেই পরম সত্যকে জেনেছেন। তার ফলে 'আনন্দ-আত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তি'—সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে তাঁর সমস্ত বৃত্তি লীন হয়ে গেছে। শুধু ব্রহ্ম আছেন—তিনি সেই নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মসমুদ্র। যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি, ততক্ষণ আমার মনে সুখ-দুঃখ আছে, ভালো-মন্দের তরঙ্গ আছে। ঐ তরঙ্গগুলিই বৃত্তি। কিন্তু আমি যখন ব্রহ্মকে জেনেছি, তখন আর আমার মনে কোনও তরঙ্গ নেই, সব ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে। কাজেই যদিও প্রারব্ধের ক্ষয় পর্যন্ত এই দেহ-কেন্দ্রিক জীবনে সুখ-দুঃখ থাকে, ওঠা-নামা থাকে, কিন্তু সেগুলো আমায় স্পর্শ করতে পারে না। যিনি তত্ত্বজ্ঞ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে যাঁর সমস্ত বৃত্তি লীন হয়ে গেছে তিনি এই প্রারব্ধ কর্মের ফলস্বরূপ যে দেহ তা যাক বা থাকুক সেদিকে আর ফিরেও তাকান না। যেমন গাভীর গলায় মালা দিলে সে মালা থাকুক বা যাক, তাতে গাভীর কিছু যায় আসে না।

অখণ্ডানন্দমাত্মানং বিজ্ঞায় স্বস্বরূপতঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি তত্ত্ববিদ্।। ৪১৭

অন্বয়: তত্ত্ববিৎ (আত্মজ্ঞ ব্যক্তি) অখণ্ড-আনন্দম্-আত্মানং (অখণ্ড আনন্দস্বরূপ আত্মাকে) স্ব-স্বরূপতঃ বিজ্ঞায় (নিজের সঙ্গে অভেদ বলে জেনে) কিম্-ইচ্ছন্ (কি পাবার ইচ্ছে করে) কস্য হেতোঃ বা (বা কার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে) দেহং পুষ্ণাতি (দেহ পোষণে রত থাকতে পারেন)?

সরলার্থ: আত্মজ্ঞ ব্যক্তি অখণ্ড-আনন্দস্বরূপ আত্মাকে নিজের সঙ্গে অভিন্নরূপে জেনে আর কিসের কামনায় বা কার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে দেহের পোষণে রত থাকতে পারেন?

ব্যাখ্যা: একবার আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে দেহের পোষণের জন্যে কোনও চেষ্টাই আর থাকে না। সেই কথাটাই আবার বলছেন। 'অখণ্ড-আনন্দম্-আত্মানং বিজ্ঞায় স্বস্বরূপতঃ'—আনন্দঘন অখণ্ড আত্মা যে আমার স্বরূপ এটা জেনে; 'কিম্-ইচ্ছন্ কস্য বা হেতোঃ দেহং পুষ্ণাতি তত্ত্ববিদ্'—কি ইচ্ছে করে, কার প্রয়োজনে আত্মজ্ঞ পুরুষ দেহকে পোষণ করতে চাইবেন? অখণ্ড-আনন্দরূপ আত্মাই আমার স্বরূপ, এই দেহ অনিত্য, একটা উপাধিমাত্র, এই জ্ঞান যখন আমার হয়েছে তখন আর আমি দেহের দাসত্ব কেন করব? একে পোষণ করতেই বা চাইব কেন? এ থাকুক বা পড়ে যাক আমার তাতে কিছু এসে যায় না। এই দেহ তো আমরা পোষণ করি ভোগের জন্যে—যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়, তাঁকে আমি পেয়ে গেছি, আমার সব ভোগবাসনা চলে গেছে, তাহলে আর আমার দেহের প্রতি মনোযোগ থাকবে কি করে? আমি তো সকলের মধ্যেই নিজেকে দেখছি, তাহলে কার প্রয়োজন সাধনের জন্যে আমার এই দেহের দরকার হবে? যিনি তত্ত্ববিদ্ তিনি তাই দেহপোষণের কোনও চেষ্টাই করেন না। আছে থাক, পড়ে যায় যদি তো যাক।

সংসিদ্ধস্য ফলং ত্বেতজ্জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ।
বহিরন্তঃ সদানন্দরসাস্বাদনমাত্মনি।। ৪১৮

অন্বয়: সংসিদ্ধস্য জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ (সিদ্ধ আত্মজ্ঞ জীবন্মুক্ত সাধকের) সদা (সর্বদা) বহিঃ-অন্তঃ (বাইরে ও ভিতরে) আত্মনি (আত্মায়) আনন্দরসাস্বাদনম্ (আনন্দরসের আস্বাদন) তু এতৎ ফলং (এই ফল লাভ হয়)।

সরলার্থ: সমাধি লাভ করেছেন এরকম সিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষের এই ফল লাভ হয় যে, তিনি সর্বদা আত্মস্থ অবস্থায় অন্তরে বাইরে আনন্দরস আস্বাদন করেন।

ব্যাখ্যা: বলছেন, যাঁর সমাধি লাভ হয়েছে, যিনি জীবন্মুক্ত যোগিপুরুষ, তিনি সব সময় আনন্দরস আস্বাদ করেন। 'সংসিদ্ধস্য ফলং তু-এতৎ-জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ', সেই যোগীই জীবন্মুক্ত যার আর দেহের প্রতি কোনও আমিবোধ, মমত্ববুদ্ধি নেই। 'জীবন্মুক্ত' যে সে বুঝে নিয়েছে আমি দেহ থেকে আলাদা, আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। দেহে আর মমত্ববুদ্ধি নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'খোড়ো নারকোল', খোলাটা আর শাঁসটা আলাদা হয়ে গেছে, তাই খড়খড় করছে। সে সব সময় 'বহিরন্তঃ সদানন্দরস-আস্বাদনম্-আত্মনি'; বাইরে ভিতরে সে সর্বদা নিজের আনন্দ নিজে আস্বাদন করছে। সে সব সময় নিজেকে দেখছে, আত্মাকে দেখছে। আনন্দস্বরূপ হয়ে গেছে সে, তাই আনন্দে মশগুল হয়ে আছে। যেমন একটা মৌমাছি ফুলে বসেছে, ফুলের মধু খাচ্ছে, আর গুন্‌গুন্ করছে না। 'আত্মা-আত্মনি'—আমি

আমাতে আছি। 'আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারও ঘরে।' তাই বলছেন, 'সদানন্দরস-আস্বাদনম্-আত্মনি'; বাইরের আনন্দ নয়, নিজের মধ্যে নিজের আনন্দ। আমি আনন্দস্বরূপ, আমার সেই স্বরূপকে বুঝে গেছি তাই আনন্দে আছি। জীবন্মুক্ত পুরুষ যিনি তাঁর 'তু এতৎ ফলং', এই ফল লাভ হয়—তিনি আত্মায় থেকে সেই আনন্দরস সর্বদা আস্বাদন করেন।

বৈরাগ্যস্য ফলং বোধঃ বোধস্যোপরতিঃ ফলম্।
স্বানন্দানুভবাচ্ছান্তিরেষৈবোপরতেঃ ফলম্॥ ৪১৯

অন্বয়: বৈরাগ্যস্য ফলং বোধঃ (বৈরাগ্যের ফল নিজের স্বরূপের বোধ) বোধস্য ফলম্ উপরতিঃ (স্বরূপবোধের ফল বিষয়চিন্তা পরিহার) স্ব-আনন্দ-অনুভবাৎ-শান্তিঃ (আত্মানন্দ অনুভব থেকে বিষয়বাসনা নিবৃত্তিজনিত শান্তি) এষা এব উপরতেঃ ফলম্ (এই উপরতির অর্থাৎ বিষয়বাসনা পরিহারের ফল)।

সরলার্থ: বৈরাগ্যের ফল নিজের স্বরূপের বোধ। স্বরূপবোধের ফল উপরতি অর্থাৎ বিষয় সংক্রান্ত সবকিছু থেকে মনের নিবৃত্তি আর উপরতির ফল নিজের আনন্দস্বরূপ আত্মার অনুভব থেকে পরমা শান্তি লাভ।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে বৈরাগ্যের কথা বলছেন। বৈরাগ্য মানে কি ? কোন্‌টা শ্রেয়, কোন্‌টা প্রেয় এই বিচার করে প্রেয়কে ত্যাগ করে শ্রেয়কে গ্রহণ করা। মন্দকে ত্যাগ করে ভালোকে গ্রহণ করা। মন্দ বলতে বোঝাচ্ছে যা অনিত্য বস্তু। যা নিত্য নয়, তা-ই মন্দ, তা-ই প্রেয়। নিত্য কি? যা শাশ্বত সত্য তাকে আমরা নিত্য বলি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় moral values, moral perfections, moral developments এগুলোই নিত্যবস্তু, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। একমাত্র নিত্যবস্তু হচ্ছেন সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম। তবে কি moral values ইত্যাদির প্রয়োজন নেই ? এগুলির অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই নিত্যবস্তু লাভের জন্যেই এগুলির প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধির জন্যে চরিত্র গঠনের জন্যে, এগুলি অপরিহার্য। আবার যতক্ষণ শরীর আছে, কিছু কিছু অনিত্যবস্তুরও ব্যবহারিক প্রয়োজন থাকে। যেমন খাওয়া-পরা, এগুলোর প্রয়োজন আছে কিন্তু এগুলো অনিত্য। এগুলোর চিন্তা জীবন থেকে বাদ দিলে চলে না, শুধু অত্যধিক প্রাধান্য দিতে নেই। আমরা বলি আমাদের জীবনের প্রয়োজন হচ্ছে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ। ধর্ম আমাদের সব সময় চাই। ধর্মেন বিহীনা পশুভিঃ সমানাঃ—ধর্ম ছাড়া তুমি পশুর সমান। ধর্ম আমাদের সব সময় চালাচ্ছে, ভালো-মন্দ বিচার করে ভালোটা নিতে বলছে। তারপর 'অর্থ'। 'অর্থ' মানে বিষয়বস্তু। খাওয়া, পরা, জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু। আর কাম হচ্ছে legitimate desires। আমার বাসনা যেন সঙ্গত হয়। যা চাইছি সেগুলো যদি আপাতমধুর হয় তাহলে সেগুলো ত্যাগ করে যা স্থায়ী সুখ আনে তাই আমায় নিতে হবে। ছোট কামনা বৃহত্তর কামনার জন্যে ত্যাগ করতে হবে। তারপর মোক্ষ , সেটা লক্ষ্য। আর ধর্ম হলো সূত্র—সব অবস্থায় ধর্মটা থাকবে। ধর্ম আমাদের সব সময় বৈরাগ্যের দিকে ঠেলছে। বলছেন, 'বৈরাগ্যস্য ফলম্ বোধঃ'; যেটা প্রেয় সেটা চাই না, যেটা শ্রেয় সেটা চাই—এই হলো বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের ফলে কি হয় ? বোধ হয়, আত্মজ্ঞান হয়, স্বস্বরূপের উপলব্ধি হয়। 'বোধস্য উপরতিঃ ফলম্'—বোধ বা জ্ঞানের ফল উপরতি। ঠিক ঠিক উপরতি আত্মজ্ঞান লাভের পরে হয়। বিষয়ের থেকে মনটা দূরে সরে এসেছে, withdrawal। আমাকে আর চেষ্টা করতে হচ্ছে না, আমার ইন্দ্রিয়-মন আপনিই ভেতরে গুটিয়ে এসেছে। ভেতরে আনন্দ পেয়ে গেছি, তাই ইন্দ্রিয়-মন এগুলো আর বাইরে ছোটে না। স্বস্থ হয়ে আছি, নিজের মধ্যে স্থির হয়ে আছি। 'স্বানন্দ-অনুভবাৎ-শান্তিঃ-এষা-এব-উপরতেঃ ফলম্'। উপরতির ফল হল স্বানন্দ-অনুভব; নিজের মধ্যে যে আনন্দ সেই আনন্দ অনুভব করছি, আর এর ফল পরম শান্তি যা আমার নিজের মধ্যে থেকেই এসেছে। আত্মজ্ঞান লাভ করলে সব অপূর্ণতা চলে যায়, সব অভাববোধ দূর হয়ে যায়। যতক্ষণ অভাববোধ আছে ততক্ষণ শান্তি নেই। যখন আমি নিজেকে জেনেছি, যখন আত্মারাম হয়ে আছি তখন আমার শান্তি। এই হচ্ছে উপরতির ফল। বৈরাগ্য হলে তার থেকে বোধ জন্মায়, বোধ থেকে উপরতি হয়। উপরতি হলে আমাদের মন নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসে, তখন নিজের মধ্যেই আনন্দ আর প্রশান্তি। আমাদের বাসনাগুলি সব সময় মনে তরঙ্গ তোলে, সেই বাসনার নিবৃত্তি হলে মন শান্ত হয়। সেই শুদ্ধ-শান্ত মনে স্বরূপজ্ঞান প্রকাশ হয়। এই স্বরূপজ্ঞান হলেই আমাদের শান্তি।

যদ্যুত্তরোত্তরাভাবঃ পূর্বপূর্বস্তু নিষ্ফলম্।
নিবৃত্তিঃ পরমা তৃপ্তিরানন্দোঽনুপমঃ স্বতঃ॥ ৪২০

অন্বয়: যদি-উত্তর-উত্তর-অভাবঃ (যদি পরপর অবস্থাগুলির অভাব হয়) পূর্ব-পূর্বঃ তু নিষ্ফলম্ ([তার মানে] আগের আগের অবস্থাগুলি নিষ্ফল হয়েছে) [কিন্তু আগের শ্লোকে বলা বৈরাগ্যাদি ঠিক ঠিক হলে] নিবৃত্তিঃ (বিষয় থেকে নিবৃত্তি) পরমা তৃপ্তিঃ (পরম তৃপ্তি) স্বতঃ অনুপমঃ আনন্দঃ (নিজের মধ্যে থেকেই অতুলনীয় আনন্দ আসে)।

সরলার্থ: যদি বৈরাগ্য-বোধ-উপরতি-শান্তি ইত্যাদি পরপর যে ফল হওয়ার কথা তা না হয় তাহলে আগের আগের বৈরাগ্যাদি সাধনা নিষ্ফল হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

বৈরাগ্যাদির সাধনা ঠিক ঠিক হলে বিষয়চিন্তার নিবৃত্তিজনিত পরম তৃপ্তি ও স্বীয় আত্মার আনন্দের স্ফুরণে অনুপম আনন্দ অনুভব হবেই।

ব্যাখ্যা: বলছেন, সাধনার এই পর্যায়গুলো যদি তোমার না এসে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তোমার সাধনায় কোন ভুল থেকে গেছে। 'যদি-উত্তর-উত্তর-অভাবঃ পূর্ব-পূর্বঃ-তু নিষ্ফলম্'; এই যে বৈরাগ্য তারপর বোধ-উপরতি-আনন্দ ও শান্তি এ যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে কোথাও একটা ভুল হচ্ছে, একটা কোনও link missing। তুমি ধাপে ধাপে এগোচ্ছ, তোমার starting point, প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে বৈরাগ্য। 'নেতি নেতি' করে, 'চাই না চাই না' করে তোমার চিত্তশুদ্ধি হতে হবে। তখন তোমার নিজের স্বরূপের বোধ হবে, স্বরূপ জ্ঞান হবে। তারপর তোমার উপরতি হবে—আর বাইরের দিকে তাকানো নয়, সুখটা বাইরের নয়, তোমার মধ্যেই আনন্দ। তখন তোমার শান্তি। বলছেন, যদি এরকম তোমার না হয় তাহলে তোমার 'পূর্ব-পূর্বঃ-তু নিষ্ফলম্', আগে যা করেছ তা ভুল হয়েছে। হয়তো বৈরাগ্য হয়নি তাহলে বোধ কি করে হবে? উপরতিও হবে না, আনন্দও হবে না। ধাপে ধাপে এগোতে হবে, একটা ধাপ ছেড়ে গেলেই সব গোলমাল হয়ে যাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিবৃত্তি। তোমার নিবৃত্তি চাই। বাইরের মনোমুগ্ধকর বস্তু থেকে মন সরিয়ে নিয়ে এলে মন শান্ত হবে, মনে শান্তি আসবে, তখন পরমা তৃপ্তি। তাই বলছেন, সবগুলি যদি পরপর আসে তাহলে 'নিবৃত্তিঃ পরমা তৃপ্তিঃ-আনন্দঃ অনুপমঃ স্বতঃ'। প্রবৃত্তির বিপরীত হলো নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি হচ্ছে আমায় নিতেই হবে, আমার চাই; ভালো-মন্দ বিচার নেই। কিন্তু নিবৃত্তি হচ্ছে, আমার চাই না, আমার মন এসব থেকে সরিয়ে নিয়েছি। এই 'চাই না' বলার জন্যে বিচারবুদ্ধি চাই, সাহস চাই, মনোবল চাই। আমি যত 'চাই না' বলতে পারব আমার তত আনন্দ। সেই আনন্দ 'স্বতঃ'—স্বতস্ফূর্ত। সে আনন্দ অনুপম। হঠাৎ যেন আনন্দের মুখ খুলে গেলো, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। কোথা থেকে আনন্দ আসছে জানি না, কিন্তু আসছে। যখন আমি কিছুই চাইব না তখন আমি নিজের স্বরূপেই অবস্থান করছি। তখন আনন্দের ধারা বা নির্ঝর স্বতই আমার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে। তখন আমার আনন্দ 'অনুপমঃ'।

দৃষ্টদুঃখেষ্বনুদ্বেগো বিদ্যায়াঃ প্রস্তুতং ফলম্।
যৎ কৃতং ভ্রান্তিবেলায়াং নানা কর্ম জুগুপ্সিতম্।
পশ্চান্নরো বিবেকেন তৎ কথং কর্তুমর্হতি॥ ৪২১

অন্বয়: দৃষ্টদুঃখেষু-অনুদ্বেগঃ (উপস্থিত দুঃখে অনুদ্বেগ) বিদ্যায়াঃ প্রস্তুতং ফলম্ (আত্মজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল) ভ্রান্তিবেলায়াং (অজ্ঞান অবস্থায়) যৎ নানা (যে-সব) জুগুপ্সিতম্ কর্ম (নিন্দনীয় কাজ) কৃতং (করা হয়) বিবেকেন পশ্চাৎ (বিবেকলাভ হওয়ার পর) নরঃ (মানুষ) তৎ কথং কর্তুম্ অর্হতি (তা কি করে করতে পারে)?

সরলার্থ: দুঃখ এলে তাতে অনুদ্বেগ আত্মজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল। অজ্ঞান অবস্থায় যেসব নিন্দার্হ কাজ করা হয় বিবেক জাগলে মানুষ সেসব আর কি করে করতে পারে ?

ব্যাখ্যা: 'দৃষ্টদুঃখেষু-অনুদ্বেগঃ'; যে দুঃখ সামনে এসে হাজির হয়েছে, তাতে অনুদ্বেগ। সত্যিই দুঃখজনক ব্যাপার, কিন্তু তবুও দেখা যাচ্ছে, কেউ হয়তো নিরুদ্বিগ্ন রয়েছেন। এটা কি করে হয় ? বলছেন : এ হলো 'বিদ্যায়াঃ প্রস্তুতং ফলম্', বিদ্যার অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের হাতে হাতে ফল। সংসার-সমুদ্রে কত ঝড়-ঝাপটা ! বলা হয়, 'ব্রহ্মপ্লব'-এ, ব্রহ্মরূপ ভেলায় সেসব পার হয়ে যাবে। সংসারে থাকলে দুঃখ তো আছেই কিন্তু তাতে বিচলিত হতে নেই। কত সব দুঃখ ! প্রিয়জনের বিয়োগব্যথা, অপমান, দারিদ্র, অন্যের শত্রুতা, কত কি ! কিন্তু সবেতেই অনুদ্বিগ্ন থাকা—সেটাই আদর্শ। যেমন দুঃখ আছে তেমনি সুখও তো আছে। কিন্তু কোনও কিছুতেই চাঞ্চল্য নেই। স্থির অচঞ্চল। এরকম অবস্থা কি করে হয় ? কিসের থেকে আসে ? 'বিদ্যায়াঃ প্রস্তুতং ফলম্'। 'প্রস্তুতং'—তৈরী ফল। একটা process-এর মাধ্যমে এটা আসে। অভ্যাস করতে করতে বৈরাগ্য আসে তারপর তার থেকে জ্ঞান, যার ফল 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা'—সুখ-দুঃখ, দুটোকে সমান করে দেখা। এটা জ্ঞানের ফল। তারপর বলছেন 'যৎ কৃতং ভ্রান্তিবেলায়াং নানা কর্ম জুগুপ্সিতম্'; অজ্ঞান অবস্থায় অনেক ভুল করেছি। তখন আমি ভেবে দেখিনি, আমার বিচারবুদ্ধি তখন পরিণত হয়নি তাই অনেক ভুল করেছি। তাতে দোষ খুব নেই। মানুষই তো ভুল করে। আমরা দেখে শিখি, আবার ঠেকে শিখি। এমন সব লোক দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা ধীর-স্থির, তাঁদের দেখে শিখি। আবার ঠেকেও শিখি। যেমন হঠাৎ রাগের মাথায় কত অসঙ্গত আচরণ করে ফেলি তার জন্যে খারাপ লাগে। এইরকম আমরা কত ভুল করি। কিন্তু 'পশ্চাৎ-নরঃ বিবেকেন তৎ কথং কর্তুম্-অর্হতি'? পরে যখন জ্ঞান হবে, বিচারবুদ্ধি পরিণত হবে তখন আর মানুষ অন্যায় কাজ কি করে করবে ? যখন আমার জ্ঞান হয়েছে, বিবেকবুদ্ধি জেগেছে তখন আর এসব ভুল আমি কি করে করব ? 'বিবেকেন', আমি বিচার করতে শিখেছি, আমার উপরতি হয়েছে, লাগাম দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলোকে টেনে রেখেছি, আর ভুল হবে কি করে ? যার এরকম হয়েছে সে আর অন্যায় করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তার আর বেচালে পা পড়বে না। এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, চেষ্টা করেও আর অন্যায় করতে পারা যাবে না। একমাত্র তখনই আমরা বলতে পারি যে, আমাদের চরিত্র ঠিক ঠিক তৈরী হয়েছে।

বিদ্যাফলং স্যাদসতো নিবৃত্তিঃ প্রবৃত্তিরজ্ঞানফলং তদীক্ষিতম্।
তজ্জ্ঞাজ্ঞয়োর্যন্ মৃগতৃষ্ণিকাদৌ নোচেদ্‌বিদাং দৃষ্টফলং কিমস্মাৎ ?৪২২

অন্বয়: অসতঃ নিবৃত্তিঃ (অনিত্য বস্তু থেকে নিবৃত্তি) বিদ্যাফলং স্যাৎ (ব্রহ্মবিদ্যার ফলস্বরূপ) প্রবৃত্তিঃ-অজ্ঞানফলং (প্রবৃত্তি অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে আসক্তি অজ্ঞানের ফল) যৎ (যেজন্যে) মৃগতৃষ্ণিকাদৌ (মরীচিকা ইত্যাদিতে) তৎ-জ্ঞ-অজ্ঞয়োঃ (মরীচিকা ইত্যাদির স্বরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ঐ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির) তৎ (তা অর্থাৎ মরীচিকাদিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি) ঈক্ষিতম্ (দেখতে পাওয়া যায়) চেৎ নো (এ যদি না হতো) বিদাং (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদের) অস্মাৎ (এই ব্রহ্মজ্ঞান থেকে) দৃষ্টফলং কিম্ (কি ফল প্রত্যক্ষ হতো)?

সরলার্থ: ব্রহ্মবিদ্যার ফল অনিত্যবস্তু থেকে নিবৃত্তি। অজ্ঞানের ফল প্রবৃত্তি অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে আসক্তি। যে জন্যে মরীচিকা ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে ঐ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি দেখা যায়। তা যদি না হতো, তাহলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদের ব্রহ্মজ্ঞানের কি ফল প্রত্যক্ষ হতো ?

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'বিদ্যাফলং স্যাৎ-অসতঃ নিবৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ-অজ্ঞান-ফলং'; নিবৃত্তি হচ্ছে জ্ঞানের ফল, প্রবৃত্তি অজ্ঞানের ফল। যাদের জ্ঞান হয়নি, যারা বিচার করে চলে না, তাদের প্রবৃত্তিই প্রবল হয়। যা ভালো লাগে তাই যেন একটা ঝোঁকের মতো চায়, এইরকম দেখতে পাওয়া যায়। বিদ্যার ফল কি? যা অনিত্য, মিথ্যা তাকে নেতি নেতি করে বর্জন করা। আমার জ্ঞান হয়েছে, বিচার-বুদ্ধি জেগেছে তাই অনিত্যকে বর্জন করছি। কিন্তু যার জ্ঞান হয়নি, যে অজ্ঞান সে বিষয়ের পেছনে ছুটছে, প্রবৃত্তি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা শুরু করছি নেতিবাচক ভাবে। আগে না-না করে অনিত্যকে বর্জন করতে হবে তারপর নিত্যকে পাব। 'তৎ জ্ঞ-অজ্ঞয়োঃ যৎ মৃগতৃষ্ণিকাদৌ নোচেদ্ বিদাং দৃষ্টফলং কিম্-অস্মাৎ' ? 'মৃগতৃষ্ণিকা' মানে মরীচিকা। মরীচিকা সম্বন্ধে যার জ্ঞান হয়নি সে তার পেছনে যাচ্ছে, এটা যে দৃষ্টিভ্রম সেটা বুঝছে না। আর যে একবার মৃগতৃষ্ণিকা দেখে বুঝে নিয়েছে ওটা জল নয়, সে আর তার দিকে যায় না। সেইরকম যে একবার বুঝে নিয়েছে এই সংসার অনিত্য, চিরদিন থাকবে না, সে আবার ভুল করে কি করে ? 'নোচেদ্ বিদাং দৃষ্টফলং কিম্-অস্মাৎ'? এ যদি না হতো তাহলে যার জ্ঞান হয়েছে তার বিদ্যার ফলটা যে কি সেটা কি করে বোঝা যেত ? জ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞান যার হয়েছে তার ব্যবহারে দেখা যাবে যে সে আর অনিত্য চাইছে না। কে জ্ঞানী আর কে অজ্ঞান সেটা তাদের ব্যবহারেই বোঝা যাবে। ফলেন পরিচীয়তে।

অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থের্বিনাশো যদ্যশেষতঃ।
অনিচ্ছোর্বিষয়ঃ কিংনু প্রবৃত্তেঃ কারণং স্বতঃ ॥ ৪২৩

অন্বয়: যদি অজ্ঞান-হৃদয়গ্রন্থেঃ (যদি অজ্ঞানজনিত হৃদয়গ্রন্থির) অশেষতঃ বিনাশঃ (নিঃশেষে বিনাশ হয় তাহলে) অনিচ্ছোঃ (কোন কিছু পাবার ইচ্ছারহিত ব্যক্তির) প্রবৃত্তেঃ কারণং (প্রবৃত্তির কারণ) বিষয়ঃ স্বতঃ কিং নু (বিষয় নিজেই কি আর হতে পারে)?

সরলার্থ: যদি অজ্ঞানজনিত হৃদয়গ্রন্থির নিঃশেষে বিনাশ হয়ে যায় তাহলে বিষয়গ্রহণে একান্ত অনিচ্ছুক সেই ব্যক্তির প্রবৃত্তির কারণ বিষয় নিজেই কি আর হতে পারে ?

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থেঃ বিনাশো যদি-অশেষতঃ।' 'অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থিঃ', মানে মনের সব আঁক-বাঁক, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, লোভ এইসব। এগুলো সব মনের গাঁট, গ্রন্থি, বন্ধন। এগুলো অজ্ঞানের জন্যে হয়। এগুলো নষ্ট না হলে ধর্মপথে এগোনো যায় না। তার জন্যে সব ধর্ম বলে সরলতা চাই, শিশুর মতো সহজ-সরল হওয়া চাই, আঁকাবাঁকা নয়। জ্ঞানের আগুনে অজ্ঞানের বীজ পর্যন্ত পুড়িয়ে দিতে হবে। 'অজ্ঞানহৃদয়গন্থেঃ বিনাশো যদি-অশেষতঃ', অজ্ঞানের জন্যে হৃদয়ে যত গ্রন্থি আছে, যত বন্ধন আছে, সব যদি নিঃশেষে নষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ অজ্ঞান যদি একেবারে নির্মূল হয়ে যায় তাহলে 'অনিচ্ছোঃ-বিষয়ঃ কিং নু প্রবৃত্তেঃ কারণং স্বতঃ'; সে তাহলে আর কিছুই পেতে ইচ্ছে করে না, তার প্রবৃত্তি বা তার কামনাবাসনা আর কিছু থাকে না। সংসারে আছে কিন্তু কিছুর ওপর মমত্ব নেই। 'অনিচ্ছোঃ', তার মধ্যে আর ইচ্ছা বলে কোনও জিনিস নেই। কারণ সে পূর্ণকাম। আমাকে কি দেবে ? জমিদারি ? মন্ত্রীত্ব ? কিছুই আমার চাই না। ঈশ্বর লাভ করলে আর কিছু চাইবার থাকে না। সে আপ্তকাম। ভগবানকে পেয়ে তার সব কামনা দূর হয়ে গেছে। তখন বিষয়ের মধ্যে থাকলেও তার আর বিষয় ভোগ করবার প্রবৃত্তি হয় না। 'বিষয়ঃ কিং নু প্রবৃত্তেঃ কারণং স্বতঃ'—বিষয় নিজে কি করে প্রবৃত্তির কারণ হবে ? বিষয় একা একা প্রবৃত্তির কারণ হতে পারে না। বাসনা থাকলে তাহলেই বিষয় প্রবৃত্তির কারণ হয়। বাসনা নেই তাই বিষয় আর তাঁর মধ্যে প্রবৃত্তি জাগাতে পারে না। বিষয়ের মধ্যে থাকলেও তাঁর মন চঞ্চল হয় না। জ্ঞানের লক্ষণ হচ্ছে নিবৃত্তি আর অজ্ঞানের লক্ষণ প্রবৃত্তি। ভোগের ইচ্ছাটা অজ্ঞান থেকে আসে, অজ্ঞান চলে গেলে বাসনাও চলে যায়। হৃদয়ের যেসব গ্রন্থি অজ্ঞান থেকে আসে সেগুলো চলে গেলে আমি জানছি আমিই সব। আমার তখন আর কোনও অপূর্ণতা নেই, যদি অপূর্ণতা না থাকে তাহলেই আমি পূর্ণকাম, আমার আর কিছু চাইবার নেই। তখন সংসারের কোন কিছুর ওপর আমার অনুরাগ নেই, বিরাগও নেই। সবের মধ্যে

থেকেও যেন কিছুতেই নেই। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমার জীবনে দেখি—সংসারে আছেন কিন্তু যেন সংসারের নন, in the world, but not of the world।

বাসনানুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য তদাবধিঃ।
অহংভাবোদয়াভাবো বোধস্য পরমাবধিঃ॥
লীনবৃত্তেরনুৎপত্তির্মর্যাদোপরতেস্তু সা॥ ৪২৪

অন্বয়: ভোগ্যে বাসনা-অনুদয়ঃ (ভোগের বস্তুতে বাসনার উদয় হচ্ছে না) বৈরাগ্যস্য তদা-অবধিঃ (তখন বৈরাগ্যের শেষ সীমা) অহংভাব-উদয়-অভাবঃ (আমি কর্তা, আমি ভোক্তা এই ভাব ওঠার অভাব) বোধস্য পরম-অবধিঃ (বোধের শেষ সীমা) লীনবৃত্তেঃ অনুৎপত্তিঃ (লীন হয়ে যাওয়া বৃত্তির আর উৎপত্তি নেই) সা তু (সেই অবস্থাই) উপরতেঃ মর্যাদা (উপরতির পূর্ণতা)।

সরলার্থ: ভোগ্যবস্তুতে আর যখন কোনও বাসনার উদয় হচ্ছে না তখনই বৈরাগ্যের চরম অবস্থা। কোনও কিছুতেই যখন আর 'আমি আমার' ভাব উঠছে না তখনই আত্মজ্ঞান পূর্ণ হয়েছে বলে বুঝতে হবে। সমস্ত চিত্তবৃত্তি যখন ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে, এবং আর কোন বৃত্তি যখন উৎপন্ন হচ্ছে না, তখনই বুঝতে হবে উপরতি পূর্ণ হয়েছে।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'বাসনা-অনুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য তদাবধিঃ'; 'বাসনা-অনুদয়ঃ', বাসনার উদয় হচ্ছে না। যা ভোগের বস্তু তার জন্যে কোনও বাসনা নেই। এইটাই ঠিক ঠিক বৈরাগ্যের ফল। 'বৈরাগ্যস্য তদাবধিঃ'—বৈরাগ্যের শেষ সীমা। বাসনা-শূন্যতা হলো বৈরাগ্যের চরম অবস্থা। শ্রীশ্রীমা বলছেন : নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। নির্বাসনাই হলো বৈরাগ্যের প্রমাণ। আর একটা জিনিস হচ্ছে অনিত্য বস্তুতে 'আমি আমার' ভাবের অভাব। 'অহংভাব-উদয়-অভাব বোধস্য পরমাবধিঃ'; অবধি মানে সীমা। কিসের সীমা ? 'বোধস্য'। বোধ মানে জ্ঞান, অহংভাবের অভাব, এটাই হলো আত্মজ্ঞানের সীমা অর্থাৎ চরম প্রকাশ। অহঙ্কার চলে গেছে, সে আর বিরক্ত করতে পারবে না—এই ভাবটাই বোধের প্রকৃষ্ট প্রকাশ। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। আমাদের শুধু আমি, আমি। অহং কর্তা, অহং ভোক্তা। আমি এটা করছি আর আমি এটা ভোগ করছি। এটাই অজ্ঞানের লক্ষণ। এই দেহটাকে আমি মনে করছি, এটা অজ্ঞানের জন্যে হয়, এটা কাঁচা আমি। বলছেন, 'অহংভাব-উদয়-অভাবঃ' অহংভাবের উদয় যদি না হয় তাহলে 'বোধস্য পরমাবধিঃ', বুঝতে হবে তোমার পুরোপুরি জ্ঞান হয়েছে। তারপর বলছেন, আমার উপরতি হয়েছে, সব বাহ্য বিষয় থেকে আমি উপরত অর্থাৎ সেগুলিতে আমার

আর রতি নেই, ভালোবাসা নেই, সেই উপরতির মর্যাদা কি, পূর্ণতা কি ? 'লীনবৃত্তেঃ অনুদয়ঃ'—যেসব বৃত্তি লীন হয়ে গেছে তার আর উদয় হবে না। 'লীনবৃত্তেঃ', আমার বৃত্তি মানে মনের যে বাসনার তরঙ্গ সব ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে। আমার মনটাই ডুবে গেছে। আমি ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছি। আমার সব বৃত্তি লয় হয়ে গেছে, আর কোন বৃত্তি উঠছে না। যোগে যাগে মনটাকে ঘুম পাড়িয়েছি। এই যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে আমার উপরতি পুরোপুরি হয়েছে। 'লীনবৃত্তেঃ-অনুৎপত্তিঃ মর্যাদা উপরতেঃ তু সা'; সব বৃত্তি ব্রহ্মে নিঃশেষে লীন হয়ে গেছে, আর উঠতে পারছে না। এই যদি হয় তাহলে এ হচ্ছে উপরতির মর্যাদা বা পূর্ণতা।

ব্রহ্মাকারতয়া সদা স্থিততয়া নির্মুক্তবাহ্যার্থধী-
রন্যাবেদিত-ভোগ্যভোগকলনো নিদ্রালুবদ্‌বালবৎ।
স্বপ্নালোকিতলোকবজ্জগদিদং পশ্যন্ ক্বচিল্লব্ধধীরাস্তে
কশ্চিদনন্ত পুণ্যফলভুগ্ ধন্যঃ স মান্যো ভুবি॥ ৪২৫

অন্বয়: কশ্চিৎ (কোনও) অনন্তপুণ্যফলভুক্ (অনন্তকালের পুণ্যের ফলে ভাগ্যবান ব্যক্তি) ব্রহ্ম-আকারতয়া (ব্রহ্মস্বরূপে) সদা স্থিততয়া (সদা স্থিতির হেতু) নির্মুক্ত বাহ্য-অর্থ-ধীঃ (বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায়) অন্য-আবেদিত ভোগ্য-ভোগ-কলনঃ (অন্যের এনে দেওয়া অন্নবস্ত্র ইত্যাদি ভোগবস্তু) নিদ্রালুবৎ-বালবৎ (নিদ্রাচ্ছন্নের মতো, বালকের মতো বিনা মনোযোগে গ্রহণ করেন) ক্বচিৎ (কখনও) লব্ধধীঃ (সমাধি থেকে ব্যুত্থানের দরুন বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান হলে) স্বপ্ন-আলোকিত-লোকবৎ (স্বপ্নে দেখা জগতের মতো) ইদং জগৎ পশ্যন্ (এই জগৎকে দেখে) আস্তে (বর্তমান থাকেন) ভুবি (পৃথিবীতে) সঃ ধন্যঃ মান্যঃ (তিনিই ধন্য ও মান্য)।

সরলার্থ: অনন্ত পুণ্যফল-ভোক্তা কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে সদাস্থিতির ফলে বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যান। অন্যের এনে দেওয়া অন্নাদি ভোগ্যবস্তু তিনি নিদ্রাচ্ছন্নের মতো, বালকের মতো অমনোযোগে গ্রহণ করেন। কখনও যদি সমাধি থেকে ব্যুত্থান হয়ে বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান হয় তাহলে এ জগৎকে তিনি স্বপ্নে দেখা জগতের মতো দেখে বিদ্যমান থাকেন। পৃথিবীতে তিনিই ধন্য ও মান্য।

ব্যাখ্যা: এখানে বলছেন, ঈশ্বরলাভ হলে মানুষের অবস্থাটা কিরকম হয়। 'ব্রহ্ম-আকারতয়া', ব্রহ্ম-আকার পেয়েছে সে, ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে গেছে। ব্রহ্ম ছাড়া সে আর কিছু নয়। উপনিষদে আছে, ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি (মু, ৩।২।৯)। সে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ব্রহ্মাকার হয়ে গেছে। 'ব্রহ্ম-আকারতয়া সদা স্থিততয়া'; ব্রহ্মের সঙ্গে এক

হয়ে আছে। 'সদা স্থিততয়া'—সর্বদা স্থিত হয়ে আছে, সব সময় তাঁর মধ্যে ডুবে আছে। 'নির্মুক্ত বাহ্য-অর্থ ধীঃ'; 'নির্মুক্ত'—মুক্ত, পরিপূর্ণ মুক্ত ; 'বাহ্য-অর্থ ধীঃ'; অর্থ মানে বিষয়, বাহ্যবিষয় থেকে মুক্ত অর্থাৎ আর বাহ্যবিষয়ে কোনও আকর্ষণ নেই। 'অন্য-আবেদিত'—অন্য লোকে নিবেদন করছে অর্থাৎ এনে দিচ্ছে। কি এনে দিচ্ছে ? 'ভোগ্যভোগকলনঃ'—ভোগ্যবস্তুসমূহ। খাবার এনে দিয়েছে, সে হয়তো সেটা খেলো কিন্তু 'নিদ্রালুবদ্‌বালবৎ'—ঘুমের মধ্যে যেন খাচ্ছে, কি যে খাচ্ছে সেটা বুঝতেই পারছে না। আমাদের সকলের অভিজ্ঞতা আছে, ছোটবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছি, তার মধ্যে খাইয়ে দিয়েছে কেউ, কি যে খেয়েছি কিছুই জানি না। 'বালবৎ', বালকের মতো, কি একটা সামনে পেলো সেটাই মুখে দিল। কোনও স্পৃহা নেই। খেয়েছে কি না খেয়েছে খেয়ালই নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ কিরকম ? খেয়েদেয়ে শুয়েছেন, মাঝ রাত্তিরে উঠে বলছেন, কই গো তোমরা সব শুয়ে পড়লে ? আমাকে খেতে দিলে না ? সবাই বলছে, সে কি ! তুমি তো খেয়েছ। তিনি বলছেন, না, কোথায় খেলুম ? কোনও খেয়াল নেই খেয়েছেন বলে। এই হচ্ছে 'নিদ্রালুবদ্‌বালবৎ'। 'স্বপ্নালোকিতলোকবৎ-জগদ্-ইদং পশ্যন্-ক্বচিৎ-লব্ধধীঃ-আস্তে'; স্বপ্নে দেখা জগতের মতো এই জগৎটাকে দেখছে। 'ক্বচিৎ-লব্ধধীঃ-আস্তে'—'ক্বচিৎ', কখনও কখনও একটু জ্ঞান হয়েছে, সমাধি থেকে ব্যুত্থান হয়েছে তখন জগৎটাকে স্বপ্নের মতো দেখছে। 'কশ্চিদ্-অনন্তপুণ্যফলভুগ্-ধন্যঃ স মান্যঃ ভুবি'; 'অনন্ত-পুণ্যফলভুক্'—অনন্ত পুণ্যের ফলে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা হয়। কত ভাগ্যবান, কদাচিৎ এরকম মানুষ দেখা যায়। 'ভুবি ধন্যঃ স মান্যঃ'; পৃথিবীতে এরকম মানুষ ধন্য, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে। এই নির্লিপ্ততা লাভ করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

স্থিতপ্রজ্ঞো যতিরয়ং যঃ সদানন্দমশ্নুতে।
ব্রহ্মণ্যেব বিলীনাত্মা নির্বিকারো বিনিষ্ক্রিয়ঃ ॥৪২৬

অন্বয়: যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি এব বিলীন-আত্মা (শুধু ব্রহ্মে লীনচিত্ত) নির্বিকারঃ (কোনও কিছুতে বিকার নেই) বিনিষ্ক্রিয়ঃ (ক্রিয়াহীন) সদা আনন্দম্ অশ্নুতে (সব সময় ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করছেন) অয়ং যতিঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ (এইরকম যোগী সন্ন্যাসী স্থিতপ্রজ্ঞ)।

সরলার্থ: ব্রহ্মে লীনচিত্ত, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, সর্বদা ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করছেন—এইরকম যোগী সন্ন্যাসীই স্থিতপ্রজ্ঞ।

ব্যাখ্যা: স্থিতপ্রজ্ঞ কাকে বলা হয় ? যার প্রজ্ঞা স্থির হয়ে আছে সে স্থিতপ্রজ্ঞ। প্রজ্ঞা

হচ্ছে প্রকৃষ্টজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান যার হয়, সে আর সেই জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হয় না। তার সুখে-দুঃখে সমভাব। সংসারে তো সুখ-দুঃখ আছেই, ভালো-মন্দ আছে। কখনও একটার পর একটা শুধু ভালো ঘটনা ঘটে, যেন ভালোর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আবার মন্দ যখন আসে তখন একটার পর একটা শুধু বিপদ আসছে, যেন মন্দের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি এসবে বিচলিত নন। তিনি সব সময় আত্মস্থ হয়ে আছেন, ব্রহ্মে লীন হয়ে আছেন। বলছেন, 'স্থিতপ্রজ্ঞঃ যতিঃ অয়ং যঃ সদানন্দম্-অশ্নুতে'। ত্যাগী সন্ন্যাসী যিনি সর্বদা আনন্দ আস্বাদ করছেন, আনন্দে বুঁদ হয়ে আছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। আনন্দঘন অবস্থা তাঁর, এ আনন্দে নিরানন্দের লেশমাত্র নেই। এত আনন্দ তাঁর কোথা থেকে আসছে ? আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে তিনি লীন হয়ে গেছেন, তাই আনন্দের ধারা তাঁর মধ্যে থেকে স্বতই উৎসারিত হচ্ছে। 'ব্রহ্মণি-এব বিলীনাত্মা নির্বিকারঃ বিনিষ্ক্রিয়ঃ'; ব্রহ্মে তাঁর আত্মা বিলীন হয়ে গেছে, তিনি ব্রহ্ম হয়ে গেছেন। তাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে। ব্রহ্ম নির্বিকার নিষ্ক্রিয়, তিনিও নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় আনন্দস্বরূপ হয়ে বসে আছেন।

ব্রহ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োরেকভাবাবগাহিনী।
নির্বিকল্পা চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ প্রজ্ঞেতি কথ্যতে ॥
সুস্থিতাঽসৌ ভবেদ্‌যস্য স্থিতপ্রজ্ঞঃ স উচ্যতে ॥ ৪২৭

অন্বয়: শোধিতয়োঃ ব্রহ্ম-আত্মনোঃ (শোধিত চিত্তের অর্থাৎ চিত্তের চৈতন্য-অংশে শুদ্ধব্রহ্ম ও প্রত্যগাত্মার) একভাব-অবগাহিনী (অভিন্ন ভাবরূপে প্রবাহিত) নির্বিকল্পা চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ (বিকল্পরহিত চৈতন্যমাত্রবৃত্তি) প্রজ্ঞা ইতি কথ্যতে (প্রজ্ঞা বলে কথিত হয়) যস্য (যাঁর) অসৌ সুস্থিতা (এই প্রজ্ঞা অনায়াসে স্থিত) সঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে (তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলে উক্ত হন)।

সরলার্থ: শোধিত চিত্তের অর্থাৎ চিত্তের চৈতন্য অংশে শুদ্ধব্রহ্ম ও প্রত্যগাত্মার একীভূত ভাবস্বরূপ যে বিকল্পরহিত ও চৈতন্যমাত্র বৃত্তি, তাকেই প্রজ্ঞা বলা হয়। যাঁর এই প্রজ্ঞা আনায়াসে স্থিতি লাভ করেছে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে কথিত হন।

ব্যাখ্যা: কিরকম মানুষকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয় সেটাই আরও একটু বিশদ করে বলছেন। 'ব্রহ্ম-আত্মনোঃ শোধিতয়োঃ-একভাব-অবগাহিনী'; 'শোধিতয়োঃ'—চিত্তের শোধন হয়েছে, মানে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে। তখন কি হলো ? 'ব্রহ্ম-আত্মনোঃ শোধিতয়োঃ একভাব-অবগাহিনী', এই শুদ্ধমনে চিত্তের চৈতন্য অংশই শুধু বর্তমান, তাই প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে গেলো। এরকম যার

হয়েছে সে ব্রহ্মই হয়ে গেছে। আমরা উপনিষদে দেখি শিষ্যের যখন চিত্তশুদ্ধি হয়েছে বলে গুরু বুঝতে পারেন তখন বলেন, 'তৎ-ত্বম-অসি'; তৎ—তিনি, ত্বম্—তুমি, তৎ-ত্বম্-অসি—তুমিই তিনি। তুমিই যে তিনি সেটা কোন্ অংশে ? না চৈতন্য অংশে। তাই 'ব্রহ্ম-আত্মনোঃ শোধিতয়োঃ একভাব-অবগাহিনী'; জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এই যে এক হয়ে যাওয়া, এই অভেদ ভাবে যখন অবগাহন হচ্ছে তখন 'নির্বিকল্পা চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ', বিকল্পহীন ও চৈতন্যমাত্র একটা বৃত্তিই শুধু আমার মধ্যে রয়েছে। একটা অভেদ ভাবের প্রবাহ চলেছে। এই যে ভাব, একে 'প্রজ্ঞেতি কথ্যতে'—প্রজ্ঞা বলা হয়। আমার প্রজ্ঞা লাভ হয়েছে মানে আমি জীবাত্মা আর পরমাত্মার একত্ব অনুভব করেছি আর তার ফলে ঐ অভেদভাবের একটা চৈতন্যমাত্র বৃত্তি অবিরাম আমার মধ্যে জেগে আছে। বলছেন, 'সুস্থিতা-অসৌ ভবেদ্ যস্য স্থিতপ্রজ্ঞঃ স উচ্যতে'; 'অসৌ'—এই ভাব, এই প্রজ্ঞা যাঁর 'সুস্থিতা ভবেদ্'—বিনা আয়াসে স্থিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 'সঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে'—তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে অভিহিত। আমরা গীতায় দেখেছি অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন, 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিং আসীত ব্রজেত কিম্' (গী, ২।৫৪) ? যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি সমাধিমান পুরুষ। তিনি স্থিতধী—তাঁর ধী বা বুদ্ধি কখনো টলে না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কোথায় ? কি তাঁর লক্ষণ ? তিনি কিভাবে চলাফেরা করেন ? কিভাবে বসেন ? কিভাবে কথা বলেন ? অর্জুন জানতে চাইছেন। শ্রীভগবান উত্তর দিচ্ছেন, 'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্' (গী, ২।৫৫), 'প্রজহাতি'—পুরোপুরি ত্যাগ করেছেন। কত রকমের বাসনা মনের আনাচে-কানাচেতে লুকিয়ে আছে, ঘাপটি মেরে আছে, আবার কিছু বাসনা প্রকাশ্যে আছে—তিনি সব ঝেড়ে মুছে সাফ করে ফেলেছেন। 'আত্মনি-এব-আত্মনা তুষ্টঃ' (গী, ২।৫৫)—তিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মকাম। 'স্থিতপ্রজ্ঞ তদা-উচ্যতে'—তাঁকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। আমাদের সবাইকার জীবনের লক্ষ্য এই স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া। সংসারে যা আসছে তা আসছে, যা এলো না তা এলো না। তার জন্যে আমার কোনও বৈলক্ষণ্য নেই। আমি তদাত্ম হয়ে বসে আছি।

যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ।
প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪২৮

অন্বয়: যস্য প্রজ্ঞা স্থিতা ভবেৎ (যাঁর প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে) যস্য নিরন্তরঃ আনন্দঃ (যাঁর সর্বদা আনন্দের অনুভূতি হচ্ছে) প্রপঞ্চঃ বিস্মৃতপ্রায়ঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ-প্রপঞ্চ প্রায় বিস্মৃত) সঃ জীবন্মুক্ত ইষ্যতে (তিনি জীবন্মুক্ত বলে অভিহিত)।

সরলার্থ: যাঁর প্রজ্ঞা স্থির, যাঁর আনন্দ নিরন্তর, যাঁর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎপ্রপঞ্চ বিস্মৃতপ্রায় তিনিই জীবন্মুক্ত বলে অভিহিত।

ব্যাখ্যা: এখানে জীবন্মুক্ত পুরুষ কিরকম হন বলছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে জীবিত অবস্থাতেই মুক্তি হতে পারে। মুক্তি দু-রকমের হয়। আমি জীবিত, সেই অবস্থাতেই আমার মুক্তি হয়েছে। আবার বিদেহ মুক্তি। আমার দেহ চলে যাচ্ছে, তখন ইষ্টদর্শন হলো বা ব্রহ্মজ্ঞান হলো। কিন্তু যে চলে যাচ্ছে সে কি পেলো আর কি পেলো না সেটা আমরা বুঝতে পারি না। জীবন্মুক্ত পুরুষরা থাকেন বলেই শাস্ত্র আছে। শাস্ত্রে তাঁদের উপলব্ধিই লিপিবদ্ধ আছে। তাঁরা আছেন বলেই গুরু-শিষ্য পরম্পরায় আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্ভব হয়ে আসছে। যত সিদ্ধপুরুষ সবাই জীবন্মুক্ত। কিন্তু যিনি জীবন্মুক্ত তাঁকে যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে সেটা একটা মস্ত লাভ হয়। জীবন্মুক্ত—আমাদেরই মতো মানুষ, তবুও তাঁর মধ্যে অনেক স্বাতন্ত্র্য থাকে, যেটা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। তিনি কিরকম হন সেটা এখানে পরপর বলে যাচ্ছেন। গীতাতে বলছেন, 'কা ভাষা' ? কি তাঁর লক্ষণ ? কিরকম তাঁর চালচলন ? এখানে সেটাই বর্ণনা করছেন। বলছেন, 'যস্য-আনন্দঃ নিরন্তরঃ', এই একটা লক্ষণ, সব সময় আনন্দ, full of joy, full of bliss, প্রফুল্ল সব সময়। 'যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা'; 'প্রজ্ঞা' মানে আত্মজ্ঞান। যার আত্মজ্ঞান স্থিত হয়েছে। এই নয় যে আমি একবার আকাশে সূর্যকে দেখলাম তারপরই মেঘে ঢেকে গেলো। আমি সব সময় দেখব আমি আত্মা, ব্রহ্ম। 'স্থিতা প্রজ্ঞা'—মনটা, বুদ্ধিটা স্থিত, fixed, firm conviction, আমিই ব্রহ্ম। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' একবার চিন্তা করলাম, একটা ঝিলিকের মতো মনে হলো আমিই ব্রহ্ম—তা নয়, সব সময় একভাব। এরকম হলে তার কি হয় ? 'আনন্দঃ নিরন্তরঃ', সব সময় আনন্দ, কারণ আমাদের স্বরূপটাই হচ্ছে আনন্দ। সব পার্থিব আনন্দ বস্তুনির্ভর আনন্দ। আর স্বরূপজ্ঞানের যে আনন্দ সেটা স্বভাবসিদ্ধ, নিরন্তর। আগুন যেমন, তার স্বভাবেই সে গরম। সেইরকম আনন্দই আমাদের স্বভাব, সব সময় আনন্দ, কোনও ছেদ নেই। কারণ আমার স্বরূপটাই 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'। 'সৎ'—আমি সব সময় আছি, নিত্য; 'চিৎ'—আমি চৈতন্যস্বরূপ, 'আনন্দ' অর্থাৎ আনন্দই আমার স্বরূপ। আমি নিত্য, আমি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, এই প্রজ্ঞায় স্থিতি হচ্ছে জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। সব সময় তিনি আনন্দে ভরপুর। 'প্রপঞ্চঃ বিস্মৃতপ্রায়ঃ'। প্রপঞ্চ কাকে বলা হচ্ছে ? ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম্, এই নিয়ে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, phenomenal world এই হচ্ছে 'প্রপঞ্চ'। এ 'বিস্মৃতপ্রায়ঃ', আছে কি নেই—এই জগৎ-প্রপঞ্চ তাঁর কাছে মুছে গেছে যেন। আমরা যেমন সব সময় এই প্রপঞ্চ নিয়েই আছি। আমাদের মনটা এই বাহ্য জগতেই পড়ে আছে কিন্তু তাঁর কাছে এই জগৎ

'বিস্মৃতপ্রায়ঃ', যেন নেই-ই। আছে তো আছে, তাতে আর মন নেই। এইরকম যাঁর অবস্থা 'সঃ জীবন্মুক্তঃ ইষ্যতে', তিনি জীবন্মুক্ত বলে অভিহিত।

লীনধীরপি জাগর্তি যো জাগ্রদ্ধর্মবিবর্জিতঃ।
বোধো নির্বাসনো যস্য স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪২৯

অন্বয়: যঃ (যিনি) লীনধীঃ অপি (ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া বুদ্ধিসম্পন্ন হয়েও) জাগর্তি (জেগে আছেন) জাগ্রৎ-ধর্ম-বিবর্জিতঃ (জাগ্রত ব্যক্তির বিষয়-অনুগামী স্বভাব রহিত) যস্য (যাঁর) বোধঃ (জ্ঞান) নির্বাসনঃ (বাসনাশূন্য) সঃ জীবন্মুক্তঃ ইষ্যতে (তিনি জীবন্মুক্ত বলে কথিত)।

সরলার্থ: যিনি ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া বুদ্ধিবৃত্তি নিয়েও জাগ্রত অবস্থায় থাকেন কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তির মতো যাঁর বিষয়-অনুগামী স্বভাব থাকে না এবং যাঁর বোধ বাসনাশূন্য তিনিই জীবন্মুক্ত বলে কথিত হন।

ব্যাখ্যা: পরপর জীবন্মুক্তের লক্ষণগুলি বলে যাচ্ছেন। বলছেন, 'লীনধীঃ-অপি'; 'ধীঃ' মানে বুদ্ধি, লীন মানে মিশে গেছে। কিসে মিশে গেছে ? ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে। ব্রহ্মে ডুবে আছে। এ জগৎটা যেন স্বপ্নের মতো ভাসা-ভাসা, বাস্তব নয়। তারপর বলছেন 'জাগর্তি যঃ জাগ্রদ্ধর্ম বিবর্জিতঃ'। 'জাগর্তি' অর্থাৎ জেগে আছেন, কিন্তু জাগ্রতের ধর্ম তাঁর নেই। সেটা কিরকম ? আমরা তো সব সময় জগতের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করছি, সংগ্রাম করছি। এত দায়-দায়িত্ব, এত দুঃখদারিদ্র, ব্যাধি, সমাজ, সব নিয়ে আমাদের মল্লযুদ্ধ চলছে। জগৎকে একবারও ভুলতে পারছি না। কিন্তু যিনি জীবন্মুক্ত তিনি এ সব কিছুতেই উদাসীন। এসব তাঁকে বিচলিত করে না। তিনি জেগে আছেন কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তির ধর্ম তাঁর মধ্যে নেই। আমরা যখন জেগে থাকি তখন হয় কিছু করি নাহলে চিন্তা করে ঠিক করি এবার কি করব। মন সব সময় সক্রিয়, সে ছুটে বেড়াচ্ছে। চুপ করে শুয়ে আছি কিন্তু নানা ভাবনায় মনটা আছে। আমাদের জেগে থাকার এইটাই ধর্ম। কিন্তু যিনি জীবন্মুক্ত তিনি উদাসীন। কোথায় কি হলো সেসব চিন্তা তাঁর নেই। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এই জগৎই সব, কে কি করল এইসব চিন্তা নিয়েই আছে। কিন্তু যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, জীবন্মুক্ত, তাঁর সেরকম নয়। 'বোধঃ নির্বাসনঃ যস্য সঃ জীবন্মুক্তঃ ইষ্যতে'; 'নির্বাসনঃ'—কোনও বাসনা নেই যাঁর, নির্বাসনা। আমাদের তো একটার পর একটা বাসনা। বাসনাই আমাদের সমস্যা। কিন্তু জীবন্মুক্ত যিনি তিনি 'নির্বাসনঃ', কোনও বাসনা তাঁর নেই। আমাদের বন্ধন হচ্ছে বাসনা। স্বামীজী বলছেন, we are beggars, খালি চাই চাই। এসব যাঁর নেই তাঁকেই বলি জীবন্মুক্ত । 'যস্য বোধঃ নির্বাসনঃ স জীবন্মুক্তঃ ইষ্যতে'। যাঁর বোধ বাসনাশূন্য তিনি জীবন্মুক্ত বলে পরিচিত।

শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যস্য চিত্তং বিনিশ্চিন্তং স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে।। ৪৩০

অন্বয়: শান্ত-সংসার-কলনঃ (সংসারের হাসি-কান্নার আবর্ত শান্ত হয়ে গেছে) কলাবান্-অপি নিষ্কলঃ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-যুক্ত দেহবান হয়েও দেহাত্মবোধ নেই) যস্য চিত্তং বিনিশ্চিন্তং (যাঁর চিত্ত জীবনের বা মরণের সব চিন্তারহিত) সঃ জীবন্মুক্তঃ ইষ্যতে (তিনিই জীবন্মুক্ত বলে অভিহিত)।

সরলার্থ: সংসারের হাসি-কান্নার আবর্ত শান্ত হয়ে গেছে, দেহাত্মবোধ চলে গেছে, জীবনের বা মরণের কোনও কিছুরই চিন্তা নেই—এইরকম যিনি তিনিই জীবন্মুক্ত বলে পরিচিত ।

ব্যাখ্যা: জীবন্মুক্ত পুরুষের আর একটা লক্ষণ বলছেন। 'শান্তসংসারকলনঃ কলা-বান্-অপি নিষ্কলঃ'; আমাদের কত রকমের সব বন্ধন সংসারে। সংসার মানেই বন্ধন। কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত, পাঁকাল মাছ। 'সংসারকলনঃ', সংসারের কত রকমের আকর্ষণ, কত ছলাকলা, কিন্তু তাঁকে সেসব স্পর্শ করে না। সংসারের সব ছলাকলা তাঁর কাছে শান্ত হয়ে গেছে। এসব আর তাঁর মনকে স্পর্শ করছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন সবই করছেন কিন্তু কিছুতেই যেন আঁট নেই, নির্লিপ্ত। কোনও বাসনা নেই তো তাই উদাসীন অবস্থা। 'শান্ত-সংসারকলনঃ কলাবান্-অপি নিষ্কলঃ'; 'কলাবান' অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত। কলা মানে অংশ—যেমন ষোলকলা, ষোলটা অংশ। বলছেন, 'কলাবান্-অপি নিষ্কলঃ'; দেহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব রয়েছে কিন্তু যেন দেহ নেই, অর্থাৎ দেহের সঙ্গে তাঁর কোনও আপনার বোধ নেই। 'আমার দেহ'—এই 'আমি আমার' ভাবটাই তো বন্ধন, সেটা তাঁর নেই। 'যস্য চিত্তং বিনিশ্চিন্তং', মনে তাঁর কোনও চিন্তা নেই। চিন্তা কখন থাকে ? যদি বাসনা থাকে তাহলে চিন্তা হয়। বাসনা না থাকলে চিন্তাও নেই। 'যস্য চিত্তং বিনিশ্চিন্তং সঃ জীবন্মুক্তঃ ইষ্যতে'; যাঁর সব চিন্তা থেমে গেছে তিনিই জীবন্মুক্ত।

বর্তমানেঽপি দেহেঽস্মিংশ্ছায়াবদনুবর্তিনি।
অহংতামমতাভাবো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্।। ৪৩১

অন্বয়: ছায়াবৎ-অনুবর্তিনি (ছায়ার মতো অনুবর্তী) অস্মিন্ দেহে বর্তমানে-অপি (এই দেহ বর্তমান থাকলেও তাতে) অহংতা-মমতা-অভাবঃ ('আমি আমার' ভাবের অভাব) জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ (জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ) ।

সরলার্থ: ছায়ার মতো অনুবর্তী এই দেহ বর্তমান থাকলেও তাতে 'আমি আমার' ভাব না থাকাটা জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ ।

ব্যাখ্যা: বলছেন, এই শরীরটা যেন ছায়ার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে। 'ছায়াবদ্-অনুবর্তিনি'। আকাশে সূর্য আছে, আমার শরীরের একটা ছায়া পড়েছে, আমি চলছি আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার ছায়াটাও চলছে। কিন্তু আমি কি ভাবি যে ছায়াটাও আমি ? বা ছায়াটা নিয়ে চিন্তা করি ? তাহলে ছায়ার মতো এই দেহটা নিয়ে কেন চিন্তা করব ? দেহটাকে 'আমি' ভাবব কেন ? 'বর্তমানে-অপি দেহে-অস্মিন্-ছায়াবদ্-অনুবর্তিনি'; ছায়ার মতো এই দেহটা সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে। এ অনিত্য। ছায়ার মতোই একে জীবন্মুক্ত পুরুষরা গুরুত্ব দেন না। দেহতে 'আমি'বোধ রাখেন না। 'অহংতা-মমতা-অভাবঃ জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্'। 'অহংতা'—আমি-বোধ; 'মমতা'—আমার বোধ। এই 'আমি-আমার' বোধই মায়া। জীবন্মুক্ত পুরুষদের এই বোধ থাকে না। 'আমি আমার' ভাবটা না থাকাই জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্।
ঔদাসীন্যমপি প্রাপ্তে জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩২

অন্বয়: অতীত-অন্-অনুসন্ধানং (জীবনের অতীতের ঘটনাবলী নিয়ে বিশ্লেষণ না করা) ভবিষ্যদ্-অবিচারণম্ (ভবিষ্যতে কি হবে তা নিয়ে চিন্তা না করা) প্রাপ্তে অপি ঔদাসীন্যম্ (বর্তমানে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য) জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ (জীবন্মুক্তের লক্ষণ)।

সরলার্থ: এই জীবনের অতীতের ঘটনাবলী নিয়ে বিশ্লেষণ না করা, ভবিষ্যতে কি হবে তা নিয়ে কোনও ভাবনা না রাখা আর বর্তমানে যে সুখ-দুঃখ আসছে সে-সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ।

ব্যাখ্যা: আবার জীবন্মুক্ত পুরুষের আর একটা লক্ষণের কথা বলছেন। 'অতীত-অননুসন্ধানং'; অতীতের ঘটনা, তার স্মৃতি এসবের 'অন্-অনুসন্ধানং'—সেগুলো নিয়ে কোন বিশ্লেষণ না করা। অতীতের সব স্মৃতি ভুলে যাও। 'ভবিষ্যদ্-অবিচারণম্'; ভবিষৎ নিয়েও বিচার না করা। ভবিষ্যতে কিরকম কি হবে, এটা হলে ভালো হবে আবার অন্যরকম হলে মন্দ হবে, এই সব নিয়ে মাথা ঘামাবো না। যা হবার তা হবে। যেমন অতীত নিয়েও কোনও অনুসন্ধান নেই, তেমনি ভবিষ্যৎ নিয়েও বলছেন ভালো-মন্দ যা আসছে তা মেনে নিচ্ছি, 'অবিচারণম্'—কোনও বিচার করা নেই। 'ঔদাসীন্যম্-অপি প্রাপ্তে'; 'প্রাপ্তে' মানে বর্তমানে পেয়েছি, বর্তমানকালে ভালো-মন্দ যা কিছু জীবনে ঘটছে সেগুলো সম্বন্ধেও ঔদাসীন্য। কিছুতেই মনে কোনও বৈলক্ষণ্য নেই, স্থির অচঞ্চল অবস্থা। ভালো-মন্দ এ তো আমার হাতে নয়, কিন্তু এসব আমাকে উদ্বিগ্ন করবে না, এইরকম একটা অবস্থা আমি আয়ত্ত করতে

পারি। তাই বলছেন, অতীত নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসো না, ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তা করো না আর বর্তমান সম্বন্ধে উদাসীন থেকো। যা ঘটবার তা ঘটছে, তুমি দেখে যাও। এই ভাবে যিনি থাকতে পারেন তিনি জীবন্মুক্ত, এই সব ভাব জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

গুণদোষবিশিষ্টেঽস্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে।
সর্বত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৩

অন্বয়: গুণ-দোষ-বিশিষ্টে (দোষ-গুণ মিশ্রিত) স্বভাবেন বিলক্ষণে (স্বভাবত বৈচিত্রপূর্ণ) অস্মিন্ (এই জগতে) সর্বত্র (সমস্ত কিছুতে) সমদর্শিত্বং (সমদৃষ্টি, ব্রহ্ম বলে দেখা) জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ (জীবন্মুক্তের লক্ষণ)।

সরলার্থ: এ জগতের সবকিছুই দোষগুণ-বিশিষ্ট। এই জীবজগৎ প্রকৃতির নিয়মেই বৈচিত্রপূর্ণ। এই বিচিত্র জগতের সবকিছুতে সমদৃষ্টি, সবকিছুকেই ব্রহ্ম বলে দেখা জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ।

ব্যাখ্যা: জীবন্মুক্তের আরেকটি লক্ষণ সমদর্শিত্ব। 'গুণদোষবিশিষ্টে-অস্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে'; আমরা এই জগতে ভালোও দেখছি মন্দও দেখছি, গুণ দেখছি আবার দোষ দেখছি। 'স্বভাবেন বিলক্ষণে'; এই বৈচিত্র বা বিভিন্নতা এই জগতের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কত রকমের ঘটনা, মানুষের বিচিত্র ব্যবহার, কি যে ঘটবে কিছু জানি না, ঘটে যাচ্ছে। একটা যে ছকে বাঁধা কিছু, তা নয়। এসব অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার খেলা। 'স্বভাবেন বিলক্ষণে', একরকম নয়, নানা রকম—'বিলক্ষণ' এই সংসারটা। 'স্বভাবেন'—প্রকৃতির কারণে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণ প্রকৃতির। এই তিনটির বিভিন্ন ভাগে মিশ্রণের ফলে, permutation-combination করে এই জগতের সৃষ্টি। বলছেন, এ জগতে যত বৈচিত্র আছে সবকিছুতেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণ আছে। এসব জড়। আমাদের শরীর-মনও কিছুটা জড় কিছুটা চৈতন্য, এই নিয়ে তৈরী। বলছেন, জগতের এই বিভিন্নতা 'স্বভাবেন বিলক্ষণে'—স্বভাবের জন্যে, প্রকৃতির জন্যে হয়েছে। যিনি জীবন্মুক্ত তাঁর 'সর্বত্র সমদর্শিত্বং'—ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সবেতে সমভাব। শুভ-অশুভ, জয়-পরাজয়, সবেতেই তিনি নির্বিকার। কতটা মনের জোর থাকলে তবে এটা সম্ভব হয় ! আমাদের হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ভালো-মন্দ দুটোকেই সমান ভাবে উপেক্ষা করা। সুখ এসেছে বলে আনন্দে লাফাতে লাগলাম, আবার দুঃখ এলো বলে একেবারে শুয়ে পড়েছি, এরকম নয়। উদাসীন, নির্বিকার, শান্ত। কিছুই আমাকে বিচলিত করতে পারে না। তাই বলছেন, 'গুণ-দোষ বিশিষ্টে-অস্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে'; এই জগৎটা বড় অদ্ভুত ! এখানে দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ

মিশে আছে। বিপরীত স্বভাবের মানুষ পাশাপাশি আছে। বিপরীতধর্মী ঘটনা পরপর ঘটছে। নিত্যে-অনিত্যে এই জগৎ মিশে আছে। 'সর্বত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্', এ সবকিছুতে সমদৃষ্টি জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ।

ইষ্টানিষ্টার্থসম্প্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াত্মনি।
উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্। ৪৩৪

অন্বয়: ইষ্ট-অনিষ্ট-অর্থ সম্প্রাপ্তৌ (বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রাপ্তি ঘটলে) সমদর্শিতয়া (সমদর্শিতাবশত) উভয়ত্র (উভয় বিষয়ে, সুখে বা দুঃখে) আত্মনি (মনে) অবিকারিত্বং (বিকারের অভাব) জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ (জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ)।

সরলার্থ: বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রাপ্তি ঘটলে সমদর্শিতাবশত উভয় বিষয়েই মনে নির্বিকার ভাব জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

ব্যাখ্যা: পরপর জীবন্মুক্তির লক্ষণ বলে যাচ্ছেন। যেন এক একটা ছাঁচ চোখের সামনে তুলে ধরছেন। এইরকম হতে হবে। বলছেন, 'ইষ্ট-অনিষ্ট-অর্থ-সম্প্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়া আত্মনি'; 'ইষ্ট'—যা কামনা করা হয়েছিল, 'অনিষ্ট'—যা চাই না, অবাঞ্ছিত। 'ইষ্ট-অনিষ্ট-অর্থ', অর্থ মানে জিনিস, 'সম্প্রাপ্তৌ' মানে প্রাপ্তি ঘটেছে। বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত যাই আসুক না কেন, এক ভাব। যে জিনিস চেয়েছেন তা পেলেন না, যা চাননি তাই পেলেন। কি করা যাবে ? এ তো ভাগ্যের খেলা। 'সমদর্শিতয়া', যিনি জীবন্মুক্ত তিনি দুটোই সমানভাবে নেন, সমদর্শী তিনি। 'আত্মনি উভয়ত্র-অবিকারিত্বং'—এখানে 'আত্মনি' মানে মনে। দু-অবস্থাতেই তাঁর মনটা নির্বিকার থাকে। ভালো-মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নির্বিকার। এই হচ্ছে 'জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্'—জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ।

ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদাসক্তচিত্ততয়া যতেঃ।
অন্তর্বহিরবিজ্ঞানং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥৪৩৫

অন্বয়: যতেঃ (ত্যাগী সন্ন্যাসীর) ব্রহ্মানন্দরস-আস্বাদ-আসক্ত-চিত্ততয়া (ব্রহ্মানন্দরসের আস্বাদনে আসক্ত চিত্ত হওয়ার ফলে) অন্তঃ-বহিঃ-অবিজ্ঞানং (অন্তর-বাহির কিছুরই আর জ্ঞান থাকে না, এই অবস্থা) জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ (জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ)।

সরলার্থ: ত্যাগী সন্ন্যাসীর চিত্ত ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদনে আসক্ত হওয়ায় তাঁর অন্তর বাহির কিছুরই আর জ্ঞান থাকে না। এইরকম অবস্থা জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ।

ব্যাখ্যা: জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণের কথাই বলে যাচ্ছেন। তাঁরা কিরকম হন ? দেহাত্মবুদ্ধি-বর্জিত, সর্ব অবস্থায় স্থির অবিচলিতচিত্ত, সমদর্শী। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ সব একভাবে দেখেন। এই যে একটা অবস্থা, সেটা কি হলে হয় ? 'ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদ-আসক্ত-চিত্ততয়া'; ব্রহ্মানন্দরসে চিত্ত আসক্ত হলে এরকম হয়। ব্রহ্মানন্দরস যেন মদিরা, এর আস্বাদনে নেশা হয়। সেই রসের আস্বাদন করে মন আসক্ত হয়েছে, আর সেই রস ছাড়তে পারছে না। এরকম কার হয় ? 'যতেঃ'—ত্যাগী সন্ন্যাসীর। ব্রহ্মানন্দরসে অভ্যস্ত হয়ে গেলে অন্য কোনও প্রসঙ্গ আর ভালো লাগে না। বলছেন, এই ব্রহ্মানন্দরসে আসক্তি হওয়া চাই। এই রস আস্বাদ না করে আমি থাকতেই পারি না। এই যে ব্রহ্মানন্দ সব সময় আস্বাদ করছি, মনটা সেইখানেই পড়ে আছে, এইরকম যিনি যোগী তাঁর অবস্থাটা কিরকম ? 'অন্তঃ-বহিঃ-অবিজ্ঞানং'; অন্তর বাহির কিছুই দেখেন না, সব তিনি, শুধু তাঁকেই দেখেন। আর সবকিছুতে 'অবিজ্ঞানং'—অন্য কিছুর আর জ্ঞান নেই। জ্ঞান নেই মানে আর সবকিছুই ভাসা-ভাসা, আমাকে স্পর্শ করছে না, একমাত্র তিনিই শুধু অন্তর জুড়ে আছেন। অভ্যাস করতে করতে এরকম হয়। মনটা যেন তৈলধারার মতো সব সময় তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। একটা পাত্র থেকে আর একটা পাত্রে তেল ঢালছি। একটা পাত্র হচ্ছে জীববুদ্ধি আর একটা পাত্র হচ্ছে ঈশ্বরবুদ্ধি আর মনটা হচ্ছে তৈলধারা, জীবভাব ঈশ্বরভাবে সব সময় যুক্ত হয়ে আছে। অভ্যাস করতে করতে এরকম অবস্থা হয়। আর তখনই 'ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদ-আসক্তচিত্ততয়া', ব্রহ্মানন্দে বুঁদ হয়ে থাকা। এই অবস্থাই জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

দেহেন্দ্রিয়াদৌ কর্তব্যে মমাহংভাববর্জিতঃ।
ঔদাসীন্যেন যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥৪৩৬

অন্বয়: যঃ (যিনি) দেহ-ইন্দ্রিয়-আদৌ (দেহ-ইন্দ্রিয় ইত্যাদিতে) কর্তব্যে (করণীয় কর্মে) মম-অহংভাববর্জিতঃ (আমি-আমার ভাবশূন্য) ঔদাসীন্যেন তিষ্ঠেৎ (উদাসীনতার সঙ্গে অবস্থান করেন) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তলক্ষণঃ (জীবন্মুক্তের লক্ষণযুক্ত)।

সরলার্থ: যিনি দেহ-ইন্দ্রিয় ইত্যাদিতে ও কর্তব্য কর্মে 'আমি আমার' ভাব বর্জন করেছেন ও উদাসীন হয়ে অবস্থান করছেন তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণযুক্ত।

ব্যাখ্যা: যিনি জীবন্মুক্ত তাঁর অহংভাব থাকে না। 'দেহ-ইন্দ্রিয়-আদৌ কর্তব্যে মম-অহং ভাববর্জিতঃ'; এটা যে আমার দেহ এই ভাবটাই নেই। 'মম' মানে আমার, 'অহং' মানে আমি, এই আমিত্ব আর মমত্ব, আমি-আমার ভাবটাই তাঁর থাকে না।

'দেহ-ইন্দ্রিয়-আদৌ কর্তব্যে মম-অহং-ভাববর্জিতঃ'; নিজের দেহ এবং ইন্দ্রিয়ে তাঁর আমিবুদ্ধি নেই; আর যেসব কাজ তিনি করেন, তাতেও তাঁর অহংবোধ নেই। তিনি নিজেকে কোন কাজের কর্তা বা ভোক্তা মনে করেন না। সবকিছুর মধ্যে তিনি উদাসীন, নির্লিপ্তভাবে থাকেন। তারপর বলছেন, 'ঔদাসীন্যেন যঃ তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ'। এই উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা জীবন্মুক্তের লক্ষণ। আমাদের সব দুঃখের কারণ এই আমি-আমার ভাবটা। এই দেহকেন্দ্রিক আমি নিয়ে যদি থাকি তাহলে গুটিপোকার মতো নিজের গুটির মধ্যে নিজে বদ্ধ হয়ে আছি। আর যদি ভাবি আমিই ব্রহ্মাণ্ড, সব আমি হয়েছি, দুই নেই, তাহলেই আর দ্বন্দ্ব নেই, বিদ্বেষ নেই, দুঃখ নেই। স্বামীজী বলছেন, আমার এই দেহকেন্দ্রিক আমি বা জীববুদ্ধি, তার কেন্দ্রটা আমার মধ্যে আর পরিধি অনন্ত বিস্তৃত। আর আমি যখন পরমাত্মা বলে নিজেকে জানছি তখন আমার কেন্দ্র সর্বত্র আর পরিধি কোথাও নেই। সবকিছুই তো আমি, কাজেই কোথায় আমার গণ্ডী কাটব ? এই বড় আমিই আমার চাই। তাতেই আমার সুখ। অহংতা আর মমতা এই দুটোকে বর্জন করতে হবে। দেহ-ইন্দ্রিয় এবং আমার কর্তব্য কর্মে যেন আমি-আমার ভাব না থাকে। 'ঔদাসীন্যেন যঃ তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ'। এরকম সব কিছুতে অহংবুদ্ধি বর্জন করে উদাসীন হয়ে যিনি অবস্থান করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণস্বরূপ। তিনিই জীবন্মুক্ত। এমন নয় যে দেহের দিকে দৃষ্টি নেই বলে খাওয়া-দাওয়া করব না। সবই করব কিন্তু উদাসীন, কি হবে না হবে সে-বিষয়ে কোনও চিন্তা নেই। যা হবে তা হবে। শরীরটা একদিন পড়ে যাবে এ তো জানা কথা কিন্তু তার জন্যে কোনও চিন্তা নেই। এইরকম যিনি, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ।

বিজ্ঞাত আত্মনো যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতের্বলাৎ।
ভববন্ধ বিনির্মুক্তঃ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৩৭

অন্বয়: যস্য (যাঁর) আত্মনঃ (নিজের) ব্রহ্মভাবঃ (ব্রহ্মস্বরূপতা) শ্রুতেঃ-বলাৎ (শ্রুতি প্রমাণের সাহায্যে) বিজ্ঞাতঃ (বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়েছে অর্থাৎ উপলব্ধি হয়েছে) ভববন্ধ-বিনির্মুক্তঃ সঃ (জন্মাদি-সংসারবন্ধন মুক্ত সেই ব্যক্তি) জীবন্মুক্ত-লক্ষণঃ (জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণস্বরূপ)।

সরলার্থ: যাঁর শ্রুতির প্রামাণ্য বাক্যের সাহায্যে স্বয়ং আত্মাই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জন্ম-মৃত্যুর চক্র এই সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্তের লক্ষণস্বরূপ।

ব্যাখ্যা: 'বিজ্ঞাতঃ আত্মনঃ যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতেঃ-বলাৎ'; শ্রুতি মানে শাস্ত্র। সব শাস্ত্রই শ্রুতি নয়। উপনিষদ্ আর ব্রহ্মসূত্রকে শ্রুতি বলে। বাকী সব স্মৃতি। শ্রুতিতে সনাতন সত্যের কথা বলা হয়েছে। গুরু পরম্পরায় যে সনাতন সত্য ঋষিরা উপলব্ধি করেছেন, তা শ্রুতিতে বিধৃত আছে। আর শ্রুতির সত্যকে কিভাবে যুগোপযোগী-ভাবে আচরণ করা যায়, তা রয়েছে স্মৃতিতে। শ্রুতিই সবচেয়ে প্রামাণিক। শ্রুতি আর স্মৃতির বাণীর মধ্যে তফাত হলে শ্রুতিকেই প্রামাণ্য বলে ধরা হয়, স্মৃতিকে নয়। স্মৃতিতে পরিবর্তনশীল অনেক ব্যবস্থার কথা পাওয়া যায়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে স্মৃতির উপযোগিতা পালটে যায়, কিন্তু শ্রুতি শাশ্বত, সে শুধু যা সনাতন সত্য আমাদের শোনাচ্ছে। 'বিজ্ঞাতঃ আত্মনঃ যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতেঃ-বলাৎ'; 'শ্রুতেঃ-বলাৎ' অর্থাৎ শ্রুতি থেকে এই সত্যটা আমি পেয়েছি। শ্রুতি আমায় এই শিক্ষা দিয়েছেন। সেটা কি ? 'আত্মনঃ ব্রহ্মভাবঃ'। আমার আত্মাই ব্রহ্ম। শ্রুতি বলছেন, অয়ম্-আত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, ইত্যাদি। এইসব কথা শ্রুতির কথা। শ্রুতির শক্তি থেকে আমি এগুলি জেনেছি। 'বিজ্ঞাতঃ আত্মনঃ যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতেঃ-বলাৎ'—যে শ্রুতি থেকে আত্মাই ব্রহ্ম এটা জেনেছে, সে কি ? সে-ই জীবন্মুক্ত। 'ভববন্ধ বিনির্মুক্তঃ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ'। ভব মানে সংসার, জন্ম-মৃত্যু। এটাকে সংসার বলা হয় কেন ? কারণ জন্ম-মৃত্যুর একটা চক্রের মধ্যে আমরা ঘুরছি। 'ভববন্ধবিনির্মুক্তঃ', আমি বন্ধন-মুক্ত হয়ে গেছি, আমার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। আমি ব্রহ্ম, আমি নিত্য, আমার জন্মও হয়নি মৃত্যুও নেই, আমি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত । এইরকম যাঁর অবস্থা তিনি জীবন্মুক্ত।

দেহেন্দ্রিয়েষ্বহংভাব ইদংভাবস্তদন্যকে।
যস্য নো ভবতঃ ক্বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৪৩৮

অন্বয়: দেহ-ইন্দ্রিয়েষু (দেহে ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ে) অহংভাবঃ (আমি বোধ) তৎ-অন্যকে (দেহ-ইন্দ্রিয় থেকে আলাদা বাহ্যবস্তুতে) ইদংভাবঃ (এইসব বস্তু আলাদা, এইরকম ভাব) যস্য (যাঁর) ক্ব-অপি (কখনও) ন ভবতঃ (হয় না) সঃ জীবন্মুক্তঃ উচ্যতে (তিনি জীবন্মুক্ত বলে উক্ত হন)।

সরলার্থ: দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিতে যাঁর আমি বোধ নেই আর দেহ-ইন্দ্রিয় থেকে আলাদা অন্য সব বাহ্যবস্তুতে, এসব আলাদা জিনিস, এরকম ভাব যাঁর কখনও হয় না, তিনিই জীবন্মুক্ত বলে উক্ত হন।

ব্যাখ্যা: 'অহং' অর্থাৎ আমি, 'ইদম্' অর্থাৎ এই জগৎ-সংসার। আমরা এ দুটোকে তফাত করে দেখি। যেন একটা দেওয়াল তুলে দিয়েছি। বলছেন, এটা ভুল। জ্ঞান হলে আর দুই দেখবে না, সব এক দেখবে। 'দেহ-ইন্দ্রিয়েষু-অহংভাবঃ ইদং ভাবঃ-

তদ্-অন্যকে'। আমার এই দেহ আর সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সব ইন্দ্রিয়গুলি, এসবকে 'আমি' ভাবছি, আর ঘরবাড়ী, স্বজন-পরিজন সব 'আমার' ভাবছি। এই একটা 'আমি-আমার' ভাব আছে। আবার 'ইদং' ভাব আছে। 'ইদং' ভাব মানে যা আমার নয় মনে করছি সেই জগৎকে অন্য বলে দেখছি। 'যস্য ন ভবতঃ ক্বাপি সঃ জীবন্মুক্ত উচ্যতে'; যাঁর এরকম ভাব 'ক্ব-অপি'—কখনও হয় না, যিনি দুই দেখেন না শুধু এক দেখেন, তাঁকেই জীবন্মুক্ত বলা হয়। আমি আর এই জগৎ সব এক। জীবন্মুক্তের লক্ষণগুলো বলে দিচ্ছেন। আসলে বলতে চাইছেন : তুমি জীবন্মুক্ত হতে চাও তো ? তাহলে এইগুলো সব অভ্যাস কর। এইভাবে চিন্তা করবে, এইভাবে চলবে।

ন প্রত্যগ্ ব্রহ্মণোর্ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৩৯

অন্বয়: যঃ (যিনি) প্রত্যক্-ব্রহ্মণোঃ (প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের) ব্রহ্ম-সর্গয়োঃ (ব্রহ্মের ও জগতের) ভেদং (ভেদ) প্রজ্ঞয়া (প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞান হওয়ার ফলে) কদা-অপি (কখনও) ন বিজানাতি (জানেন না) সঃ জীবন্মুক্তলক্ষণঃ (তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ)।

সরলার্থ: পরম জ্ঞান লাভ হয়েছে বলে যিনি প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে কখনও আর ভেদজ্ঞান করতেই পারেন না তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণস্বরূপ।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'ন প্রত্যগ্ ব্রহ্মণোঃ ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ'; 'প্রত্যগ্' মানে জীবাত্মা, আমাদের জীবাত্মাকে প্রত্যগাত্মা বলা হয়। প্রত্যগাত্মা মানে দেহকেন্দ্রিক একটা আমি বোধ থেকে আমি 'আমার আত্মা' বলে ভাবছি। আমার স্বরূপ যে পরমাত্মা, ব্রহ্ম, সেটা বুঝছি না। এটা ভুল। যিনি জীবন্মুক্ত, তিনি 'প্রত্যক্-ব্রহ্মণোঃ', 'ভেদং ন বিজানাতি'—জীবাত্মা আর পরমাত্মার ভেদ জানেন না। তিনি এই দুয়ের একত্ব উপলব্ধি করেছেন। জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। জীবই যে ব্রহ্ম এটা তিনি বুঝে গেছেন। আর 'ব্রহ্ম-সর্গয়োঃ'—ব্রহ্ম আর এই জগৎ, এ যে আলাদা নয়, 'ভেদং কদাপি ন'—এ দুয়ের মধ্যে যে কখনও কোনও ভেদ নেই এটাও তিনি জেনে গেছেন। এটাই তো বেদান্তের মূল কথা। দুই নেই, সব এক। সর্গ কথাটার মানে হচ্ছে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্ম এবং এই সৃষ্টি—অভেদ। এটা জানতে হবে। কিরকম জানতে হবে ? 'প্রজ্ঞয়া', প্রকৃষ্টরূপে জানতে হবে, উপলব্ধির মধ্যে জানতে হবে। 'প্রজ্ঞয়া যঃ বিজানাতি'—যিনি উপলব্ধির মধ্যে এই অভেদজ্ঞান লাভ করেছেন, নিশ্চিতভাবে জেনেছেন, তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ। এরকম বোধ যখন হয় তখন শুধুই আনন্দ।

সাধুভিঃ পূজ্যমানেঽস্মিন্ পীড্যমানেঽপি দুর্জনৈঃ।
সমভাবো ভবেদ্ যস্য স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৪০

অন্বয়: অস্মিন্ (এই দেহ) সাধুভিঃ পূজ্যমানে (সাধুদের দ্বারা পূজিত হলে) অপি (আবার) দুর্জনৈঃ পীড্যমানে (দুর্জন ব্যক্তিদের দ্বারা পীড়িত হলে) যস্য (যাঁর) সমভাবঃ ভবেৎ (সমদৃষ্টি থাকে) সঃ জীবন্মুক্তলক্ষণঃ (তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণস্বরূপ)।

সরলার্থ: এই দেহ-মন সাধু-ব্যক্তিদের দ্বারা সম্মানিত আবার দুর্জন-ব্যক্তিদের দ্বারা নিপীড়িত হলে, উভয় ক্ষেত্রেই যাঁর সমভাব থাকে তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণস্বরূপ।

ব্যাখ্যা: 'সাধুভিঃ পূজ্যমানে-অস্মিন্'—এই দেহ সাধুদের দ্বারা যদি পূজিত হয়, 'পীড্যমানে-অপি দুর্জনৈঃ'—আবার দুর্জন-ব্যক্তিদের দ্বারা যদি নিপীড়িত হয়। সাধুরা পুজো করছেন, সম্মান করছেন। সাধারণ মানুষরা নন, মহৎ ব্যক্তিরা সম্মান করছেন। আবার যারা দুষ্টু লোক, দুর্জন ব্যক্তি তারা 'পীড্যমান', কষ্ট দিচ্ছে, পীড়ন করছে, দেহে ও মনে। কিন্তু এই দুই দলের প্রতিই সমভাব। যে আমার প্রশংসা করছে তার প্রশংসা শুনে একেবারে উল্লসিত আবার যে আমার নিন্দে করছে তার নিন্দে শুনে একেবারে ভেঙে পড়ছি—এরকম নয়। প্রশংসাতেও কিছু এসে যায় না, নিন্দাতেও নয়, নির্লিপ্ত ভাব। 'সমভাবঃ যস্য ভবেৎ সঃ জীবন্মুক্তলক্ষণঃ'; এই শ্রদ্ধার ভাব আর নিপীড়ন যিনি সমানভাবে নিতে পারেন তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণযুক্ত। তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। শ্রীশ্রীমাকে 'পাগলী মামী' সব সময় গালাগালি দিচ্ছে। মা বলছেন, দিক না, শুধু তো কতগুলো কথা। এই সমভাব জীবন্মুক্ত পুরুষের বৈশিষ্ট্য। কেউ ভালো বললেও মনে হবে এ তো কতগুলো কথা, মন্দ বললেও তাই। কে কি বলল তাতে আর কিছু এসে যায় না। তাঁর পায়ে সব নিবেদন করছি। ভালোটাও দিচ্ছি মন্দটাও দিচ্ছি।

যত্র প্রবিষ্টা বিষয়াঃ পরেরিতা নদীপ্রবাহা ইব বারিরাশৌ।
লীয়ন্তি সন্মাত্রতয়া ন বিক্রিয়ামুৎপাদয়ন্ত্যেষ যতির্বিমুক্তঃ ॥ ৪৪১

অন্বয়: বারিরাশৌ (সমুদ্রে) নদীপ্রবাহঃ ইব (নদীপ্রবাহসমূহের মতো) পর-ঈরিতাঃ (পরের আনা) বিষয়াঃ (ভোগ্যবস্তুসমূহ) যত্র প্রবিষ্টাঃ (যাঁর কাছে এসে) সৎ-মাত্রতয়া লীয়ন্তি (সৎস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুতে লীন হয়ে যায়) বিক্রিয়াম্ ন উৎপাদয়ন্তি (বিকার অর্থাৎ হর্ষ বিষাদ কিছুই উৎপাদন করে না) এষঃ যতিঃ বিমুক্তঃ (এইরকম যোগী মুক্তপুরুষ)।

সরলার্থ: বহু নদীর প্রবাহের সমুদ্রে এসে মিলিত হওয়ার মতো পরের আনা সমস্ত ভোগ্যবস্তু যাঁর কাছে এলে যেন সৎস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুতেই লীন হয়ে যায়, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির জন্যে কোনও রকম হর্ষ-বিষাদ উৎপাদন করে না, সেই যোগী মুক্তপুরুষ।

ব্যাখ্যা: এখানে একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। এই দৃষ্টান্ত গীতাতেও আছে। বলছেন, সব নদী থেকে জল সমুদ্রে এসে পড়ছে। এত জল যে এসে পড়ছে তার জন্যে কি সমুদ্র ফেঁপে যাচ্ছে ? তা তো নয়, সমুদ্র যেমন ছিল তেমনি থাকছে। তেমনি এরকম মানুষ যদি কেউ হন যাঁর কাছে অনেকে অনেক কিছু উপহার এনে দিচ্ছে কিন্তু তাতে তাঁর হর্ষ বা বিষাদ কিছুই হচ্ছে না, তাহলে তিনি ওই সমুদ্রের মতো। বলছেন, 'যত্র প্রবিষ্টাঃ বিষয়াঃ পরেরিতা'; 'পর' মানে অন্য লোক। 'পর-ঈরিতাঃ'—অন্যে যা এনে দিচ্ছে। 'নদীপ্রবাহাঃ ইব বারিরাশৌ', 'বারিরাশৌ' মানে সমুদ্রে। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে, পড়ে লীন হয়ে যাচ্ছে, 'লীয়ন্তি সৎ-মাত্রতয়া'; 'লীয়ন্তি'—লীন হয়ে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে, 'সৎ-মাত্রতয়া'—সৎস্বরূপ ব্রহ্মে। তেমনি অন্যের আনা সমস্ত ভোগ্যবিষয় জীবন্মুক্ত পুরুষের মধ্যে লীন হয়ে যায়। যেমন সমুদ্রে কত নদী এসে পড়ে কিন্তু সমুদ্রের তাতে কোনও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে এই জগতের ভোগ্যবস্তু একটুও বিচলিত করতে পারে না। তাঁকে লোকে অনেক জিনিস দিতে পারে, কিন্তু তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। 'ন বিক্রিয়াম্-উৎপাদয়ন্তি'; তাঁর কোনও বিকার নেই, পরিবর্তন নেই। সাধারণ মানুষের কি হয় ? একটা কিছু পেলে ভয়ানক প্রসন্ন আবার নেই বলে দুঃখ। কিন্তু তাঁর কোনও বিকার নেই, তিনি নির্বিকার। 'এষঃ যতিঃ-বিমুক্তঃ', এইরকম যোগিপুরুষ যিনি, তিনি 'বিমুক্তঃ'—বিশেষভাবে মুক্ত। ঠিক এই ভাবের শ্লোক গীতায় আছে। ভগবান বলছেন, 'আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী' (গী, ২।৭০)। 'আপূর্যমাণম্', মানে পূর্ণ হচ্ছে। 'অচল'—স্থির সমুদ্র, তাতে জল এসে পড়ছে, নদী বা আরও কত সব জল এসে পড়ছে কিন্তু সমুদ্র, 'অচলপ্রতিষ্ঠং'—যেমন ছিল তেমনি থাকছে। 'সমুদ্রম্-আপঃ প্রবিশন্তি যৎবৎ', সমুদ্রে জল যেমন প্রবেশ করে তেমনি কত রকমের কামনার বস্তু আসছে কিন্তু তাতে তাঁর কিছু হচ্ছে না। এইরকম যে 'স শান্তিম্-আপ্নোতি ন কামকামী'। সে-ই শান্তি লাভ করে; 'ন কামকামী', কামনার বস্তুতে যার আকর্ষণ, যে কামী, সে নয়। আমাদের তো যত অশান্তি কামনার জন্যে, যত পাই তত চাই। যার বাসনা নেই, যে কিছু চায় না সেই 'শান্তিম্-আপ্নোতি ন কামকামী'।

বিজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বস্য যথাপূর্বং ন সংসৃতিঃ।
অস্তি চেন্ন স বিজ্ঞাতব্রহ্মভাবো বহির্মুখঃ ॥ ৪৪২

অন্বয়: বিজ্ঞাত-ব্রহ্ম তত্ত্বস্য (ব্রহ্মতত্ত্ব যিনি জেনেছেন তাঁর) যথাপূর্বং (আগের মতো অর্থাৎ জ্ঞান হবার পূর্বের অবস্থার মতো) ন সংসৃতিঃ (সংসারীর মতো বিষয়ে প্রবৃত্তি আর থাকে না) চেৎ অস্তি (যদি থাকে) সঃ (সে) ন বিজ্ঞাতব্রহ্মভাবঃ (ব্রহ্মের ভাব জানতে পারেনি) বহির্মুখঃ (বাহ্যজগতের প্রতি আসক্ত)।

সরলার্থ: যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জেনেছেন তাঁর আর তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার পূর্বের অবস্থার সংসারিত্ব বা সংসারে লিপ্ততা থাকে না। যদি থাকে, তাহলে বুঝতে হবে ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর হয়নি। সে বাহ্যজগতের প্রতি আসক্ত।

ব্যাখ্যা: এখানে কতকগুলো সূক্ষ্ম কথা বলছেন। বলছেন, যিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁকে তো আমরা বিচার করব তাঁর আচরণ থেকে, চালচলন থেকে। একটা গাছকে আমরা বিচার করি তার ফল দেখে। ফলেন পরিচীয়তে। তেমনি জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ হলো তার আর আগের মতো 'সংসৃতিঃ' থাকে না, সংসার থাকে না। 'বিজ্ঞাত-ব্রহ্মতত্ত্বস্য'—যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছেন তাঁর 'যথাপূর্বং ন সংসৃতিঃ'—আগের মতো সংসারে ব্যবহার, সংসারিত্ব আর দেখতে পাওয়া যাবে না। বিষয়ের প্রতি মনোযোগ তাঁর আর থাকবে না। এ তাঁর দ্বারা আর সম্ভবই হবে না। 'অস্তি চেৎ'—যদি থাকে, তাহলে বুঝতে হবে 'ন স বিজ্ঞাতব্রহ্মভাবঃ'— ব্রহ্মজ্ঞান তিনি লাভ করেননি। তাঁর মধ্যে যদি একটুও সংসারীর ভাব থাকে তাহলে বুঝতে হবে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি। 'বহির্মুখঃ', বহির্মুখী সে, বিষয়াসক্তি রয়ে গেছে। জ্ঞানের ভাবটা তাঁর একটা বাইরের ঢং, যেন দেখাচ্ছেন। আমরা বলি, 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মু, ৩।২।৯), যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান। ব্রহ্মের যেসব ভাব, নির্বিকার, নিরুপাধিক ইত্যাদি, তাঁরও সেইসব ভাব এসে যাবে। একটা পরিবর্তন আসবে, আগের মতো আর থাকবেন না। 'বিজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বস্য যথাপূর্বং ন সংসৃতিঃ'; যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তাঁর আর আগের মতো সংসারের প্রতি একটা আকর্ষণ, সংসারীর মতো ব্যবহার থাকবে না। ওই তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙা। সংসারের আঠা তাঁর গায়ে আর লাগছে না। 'অস্তি চেৎ-ন সঃ বিজ্ঞাতব্রহ্মভাবো বহির্মুখঃ'। আর যদি এমন একজনকে দেখা যায়, যাকে সবাই বলছে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অথচ তাঁর মধ্যে আমরা সংসারের প্রতি টান দেখছি, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান শুধু একটা বাইরের জিনিস, লোকদেখানো, সে 'ন বিজ্ঞাতব্রহ্মভাবঃ'—তাঁর ব্রহ্মকে জানা হয়নি। ব্রহ্মজ্ঞান হলে মানুষটা সোনা হয়ে যায়, তাঁর ভেতরটা পালটে যায়। স্বামীজী বলছেন, এ যেন একটা রাসায়নিক পরিবর্তন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তাঁর আর কখনও ভুল হবে না, বেচালে পা পড়বে না।

প্রাচীনবাসনাবেগাদসৌ সংসরতীতি চেৎ।
ন সদেকত্ববিজ্ঞানাৎ মন্দীভবতি বাসনা।। ৪৪৩

অন্বয়: প্রাচীনবাসনাবেগাদ্ (অতীতের সব জমে থাকা বাসনার প্রভাবে) অসৌ (এই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি) সংসরতি (সংসারের টান নিয়ে আছেন) ইতি চেৎ (এরকম যদি বলা হয়) ন (না, তা হতে পারে না) সদ্-একত্ব বিজ্ঞানাৎ (সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব ভাব হলে) বাসনা মন্দী ভবতি (বাসনা দুর্বল হয়ে যায়, আসক্তি আনতে পারে না)।

সরলার্থ: অতীতের বাসনার প্রভাবে যিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তিনি সংসারে জড়িয়ে সংসারীর মতো ব্যবহার করছেন, এরকম যদি বলা হয় তাহলে বলতে হবে, না তা হতে পারে না। সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মভাব হলে বাসনা দুর্বল হয়ে যায়, তার থেকে আর আসক্তির উদ্রেক হয় না।

ব্যাখ্যা: একজন মানুষ, যাঁকে সবাই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, মুক্ত পুরুষ বলে জানে তিনি হয়তো সংসারীর মতো ব্যবহার করছেন। যদি কেউ এরকম যুক্তি দেয় যে ইনি হয়তো সত্যি সত্যি মুক্ত পুরুষ, কিন্তু এই যে সংসারের দিকে একটু টান এটা একটা অভ্যাসের ব্যাপার, আর কিছু নয়, তাহলে বলতে হবে সে ঠিক বলছে না। 'প্রচিন বাসনা বেগাদ্-অসৌ সংসরতি-ইতি চেৎ'। 'প্রচিন বাসনা বেগাদ্'—অনেক দিনের জমা হয়ে থাকা বাসনার বেগে, তার চাপে সংসারের প্রতি একটু টান আছে। 'অসৌ সংসরতি'—তাই ইনি সংসারীর মতো আচরণ করছেন, এরকম যদি কেউ বলে তো সেটা ভুল, তা হতে পারে না। কারণ 'সদ্-একত্ব বিজ্ঞানাদ্-মন্দী ভবতি বাসনা'। জ্ঞান হলে বাসনা 'মন্দীভবতি'। মন্দী মানে দুর্বল, মন্দ নয়। জ্ঞান হলে বাসনা দুর্বল হয়ে যায়। 'সদ্-একত্ব বিজ্ঞানাৎ', একজ্ঞান যদি হয় তাহলে কি হয়? কিরকম এক জ্ঞান ? 'অহং ব্রহ্মাস্মি', আমি উপলব্ধি করছি, আমিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু দেখছি না। সর্বত্র শুধু আমাকেই দেখছি। সব এক দেখছি। আমার থেকে ভিন্ন একটা যদি কিছু দেখি তাহলে সেটা চাইতে পারি কিন্তু যখন সব এক দেখছি, ভালো-মন্দ সব এক, তখন আর বাসনা কি করে থাকে ? তখন বাসনা 'মন্দীভবতি'— দুর্বল হয়ে যায়, তা দিয়ে আর বন্ধন হয় না। তাই বলছেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ বলে পরিচিত তাঁকে যদি সংসারীর মতো আচরণ করতে দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে, তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি। একথা বলা যাবে না যে ইনি অনেক দিনের পুরোনো বাসনার তাগিদে এইরকম ব্যবহার করছেন। ব্রহ্মজ্ঞান হলে বাসনা দুর্বল হয়ে যায়। যেদিন থেকে তাঁর জ্ঞান হয়েছে সেদিন থেকে তাঁর বাসনা লোপ পেয়েছে। তাঁর আর সংসার করা সম্ভব হবে না।

অত্যন্তকামুকস্যাপি বৃত্তিঃ কুণ্ঠতি মাতরি।
তথৈব ব্রহ্মণি জ্ঞাতে পূর্ণানন্দে মনীষিণঃ।। ৪৪৪

অন্বয়: অত্যন্ত-কামুকস্য-অপি (অত্যন্ত কামুক ব্যক্তিরও) বৃত্তিঃ (কাম প্রবৃত্তি) মাতরি (নিজের জননী সমীপে) কুণ্ঠতি (কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে) তথা-এব (সেইরকম) পূর্ণ-আনন্দে ব্রহ্মণি জ্ঞাতে (পূর্ণ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হলে) মনীষিণঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির [বিষয় বাসনার নিবৃত্তি হয়]) ।

সরলার্থ: অত্যন্ত কামুক ব্যক্তিরও যেমন কামপ্রবৃত্তি মাতৃসমীপে কুণ্ঠিত হয় তেমনি পূর্ণ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানলে বিষয় বাসনা নিবৃত্ত হয় ।

ব্যাখ্যা: কিরকম বলছেন ! খুব কামুক ব্যক্তিও যখন নিজের মাকে দেখে তখন তার কামনা চলে যায়। 'অত্যন্ত কামুকস্য-অপি বৃত্তিঃ কুণ্ঠতি মাতরি'; অত্যন্ত কামুক ব্যক্তিরও কামপ্রবৃত্তি মাতৃসমীপে কুণ্ঠিত হয়।'তথা-এব', তেমনি, 'ব্রহ্মণি জ্ঞাতে পূর্ণানন্দে মনীষিণঃ'—ব্রহ্মকে জানলে সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির, সেই মনীষীর পরিপূর্ণ আনন্দের অনুভূতিতে বাসনা লোপ পায়। যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি মনীষী, তিনি শুধু ব্রহ্মকেই দেখছেন আর কিছু দেখছেন না। তিনি 'পূর্ণানন্দ', পূর্ণ-আনন্দে আছেন, পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। সেই আনন্দের প্লাবনে সব বাসনা চলে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, অমৃতের আস্বাদ যে পেয়েছে তার কি আর চিটে গুড় ভালো লাগে ?

নিদিধ্যাসনশীলস্য বাহ্যপ্রত্যয় ঈক্ষ্যতে।
ব্রবীতি শ্রুতিরেতস্য প্রারব্ধং ফলদর্শনাৎ ।। ৪৪৫

অন্বয়: নিদিধ্যাসনশীলস্য (নিয়ত ধ্যানশীল ব্যক্তিরও) বাহ্যপ্রত্যয়ঃ (বাহ্যবিষয়ের অনুভব হতে) ঈক্ষ্যতে (দেখা যায়) শ্রুতিঃ ব্রবীতি (শ্রুতি বলেন) এতস্য (এইরকম মানুষের [বাহ্য-প্রত্যয়ের কারণ]) প্রারব্ধং (প্রারব্ধ কর্ম) ফলদর্শনাৎ (ফল দেখার থেকে)।

সরলার্থ: নিয়ত ধ্যানশীল ব্যক্তিরও বাহ্যবিষয়ের অনুভব হচ্ছে বলে দেখা যায়। এইরকম লোকের বাহ্যবিষয়ে জ্ঞান দেখে শ্রুতি বলেন এসব হচ্ছে প্রারব্ধ কর্মের ফল।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'নিদিধ্যাসনশীলস্য বাহ্যপ্রত্যয়ঃ ঈক্ষ্যতে'; 'নিদিধ্যাসনশীল'—খুব ধ্যান করেন। শীল মানে অভ্যাস। সব সময় ঈশ্বরের ধ্যান করছেন, এটা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর 'বাহ্যপ্রত্যয়ঃ ঈক্ষ্যতে'; বাহ্যবিষয়ে তাঁর খেয়াল আছে এরকম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, হয় তো বলে দিচ্ছেন, দেখো ওদিকে যেও না ওখানে একটা সাপ বেরিয়েছিল। তাহলে ? 'ব্রবীতি শ্রুতিঃ-এতস্য প্রারব্ধং ফলদর্শনাৎ'; শ্রুতি

মানে শাস্ত্র। শ্রুতি আমাদের পথ দেখিয়ে দেন। আমাদের মনে একটা খটকা লাগছে— জ্ঞান হয়েছে তবু বাহ্যবিষয়ে দৃষ্টি আছে কেন ? দেখা যাক শ্রুতি কি বলছেন। 'ব্রবীতি শ্রুতিঃ-এতস্য প্রারব্ধং ফলদর্শনাৎ'। শ্রুতি বলছেন, প্রারব্ধের জন্যে এরকম হয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরে যেসব কর্ম আমরা করি তার কিছু সঞ্চিত থাকে আর কিছু ফল দিতে আরম্ভ করে। যেসব কর্ম ফল দিতে আরম্ভ করেছে সেগুলো প্রারব্ধ কর্ম। এর জন্যেই আমাদের জন্ম, আচার-ব্যবহার, এইসব হয়। জ্ঞান হয়েছে অথচ 'বাহ্যপ্রত্যয়ঃ' সব আছে, এটা করো না, সেটা করো না এইসব বলছেন, এগুলো 'প্রারব্ধং ফলদর্শনাৎ'— প্রারব্ধের ফল। এই নয় যে তিনি বাহ্যকে স্বীকার করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলে দিচ্ছেন, ছুরিটা যে নিয়েছ কাজ হয়ে গেলে আবার কুলুঙ্গীর ভেতর রেখে দেবে। এই যে সব বাহ্যপ্রত্যয়, বাইরের বিষয় সম্বন্ধে খেয়াল এগুলো প্রারব্ধের ফলে হয়। তা না হলে তো আর কোনও কাজই হতো না। সোনার ছুরি, সোনার কাঁচি দিয়ে কি কাজ হয় ? জ্ঞান হলেও যে একটা ব্যবহারিক আচার-আচরণ বজায় থাকে সেটা প্রারব্ধের জন্যে হয়। 'নিদিধ্যাসনশীলস্য'; সব সময় ধ্যান করছেন, তাহলে তিনি আর বাইরের জগৎ সম্বন্ধে মনোযোগী হচ্ছেন কেন ? শ্রুতি বলছেন, এরকম দেখা যায় কারণ প্রারব্ধ আছে, এ তার ফল। প্রারব্ধের জন্যেই দেখা যায়, জ্ঞান হয়েছে, তবুও তাঁদের খিদে পায়, ঘুম পায়, একটু রাগ, একটু অভিমান, এ সমস্ত থাকে। এইরকম একটু-আধটু বিপরীত ব্যবহারও হয়তো থাকে, এইসবগুলো প্রারব্ধের জন্যে হয়। কিন্তু এগুলো সব পোড়া দড়ির মতো। দড়ির মতো দেখতে, কিন্তু বাঁধবার শক্তি নেই। যাঁর ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তাঁর আর সংসারে কোনও আসক্তি থাকবে না। তাঁর আর সংসারীর মতো ব্যবহারই থাকবে না। যতদিন না প্রারব্ধ ক্ষয় হয় ততদিন শরীরটা থাকবে তারপর পড়ে যাবে।

সুখাদ্যনুভবো যাবৎ তাবৎ প্রারব্ধমিষ্যতে।
ফলোদয়ঃ ক্রিয়াপূর্বো নিষ্ক্রিয়ো নহি কুত্রচিৎ ॥৪৪৬

অন্বয়: যাবৎ (যতকাল) সুখ-আদি-অনুভবঃ (সুখদুঃখাদির অনুভব হয়) তাবৎ (ততকাল) প্রারব্ধম্-ইষ্যতে (প্রারব্ধ ফল দিচ্ছে বলে মনে করা হয়) ফল-উদয়ঃ (ফল উৎপন্ন হয়) ক্রিয়াপূর্বঃ (পূর্ব কর্ম থাকলে) নিষ্ক্রিয়ঃ কুত্রচিৎ নহি (ক্রিয়া না থাকলে কখনও ফলোদয় হয় না)।

সরলার্থ: যতদিন সুখদুঃখের অনুভব হয় ততদিন প্রারব্ধকর্ম ফল দিচ্ছে বলে মনে করা হয়। কারণ আগেকার কর্ম থাকলে তবে তার ফলের উৎপত্তি সম্ভব। ক্রিয়া নেই অথচ ফল আছে এ কখনও হয় না।

ব্যাখ্যা: বলছেন, জ্ঞান হয়েছে কিন্তু সুখ-দুঃখের বোধটা আছে এটা প্রারব্ধের জন্যে

হয়। 'সুখাদি-অনুভবঃ যাবৎ তাবৎ প্রারব্ধম্-ইষ্যতে'; যতদিন এইসব সুখ-দুঃখের অনুভব হচ্ছে ততদিন বুঝতে হবে এগুলো প্রারব্ধের জন্যে হচ্ছে। কারোর দুঃখ দেখলে কষ্ট হয়, লোকে আনন্দ করছে দেখলে ভালো লাগে, আনন্দ হয়, এসব থাকে। প্রারব্ধ কিরকম ? হাত থেকে একটা তীর ছোঁড়া হয়ে গেছে, তখন তো আর সেটাকে ফেরানো যাবে না, সে লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে তবে থামবে। দেখা যায় একজন লোক এমনিতে হয়তো বেশ ভালো কিন্তু একটা বিষয়ে দুর্বলতা রয়েছে। এ তার প্রারব্ধ। আগের আগের জন্মে যেসব কাজ করেছে তার ফল হচ্ছে। 'ফল-উদয়ঃ ক্রিয়াপূর্বঃ নিষ্ক্রিয়ঃ ন হি কুত্রচিৎ'; ফলের উদয় হচ্ছে, ফল দেখতে পাচ্ছি। তার মানে আগের কর্মগুলি এখন ফল দিচ্ছে। আমি ভালো কাজও করেছি আবার মন্দ কাজও করেছি। আমরা দেখতে পাই খুব ভালো লোক হয়তো কষ্ট পাচ্ছে। কেন ? 'ক্রিয়াপূর্বঃ'— আগেকার কর্ম, সেগুলো ফল দিচ্ছে। কিছুটা কাটাকুটি হয়। যেমন একটা খারাপ কর্মের ফল হিসেবে হয়তো মৃত্যু ঘটত কিন্তু অনেক সাধন-ভজন করার ফলে সেই কর্মের অনেকটা ক্ষয় হয়ে গিয়ে হয়তো শুধু একটা আঘাত পেতে হলো। শ্রীশ্রীমা এরকম বলেছেন। 'নিষ্ক্রিয়ঃ ন হি কুত্রচিৎ'; কোনও কাজ না হলে কোনও ফলও হয় না। ক্রিয়া নেই অথচ ফল আছে এ কখনও হতে পারে না।

অহং ব্রহ্মেতিবিজ্ঞানাৎ কল্পকোটিশতার্জিতম্।
সঞ্চিতং বিলয়ং যাতি প্রবোধাৎ স্বপ্নকর্মবৎ ॥ ৪৪৭

অন্বয়: অহং ব্রহ্ম-ইতি বিজ্ঞানাৎ ('আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানের ফলে) কল্প-কোটি-শত-অর্জিতম্ (শত শত কোটি যুগ ধরে অনুষ্ঠিত) সঞ্চিতং (সঞ্চিত কর্মের ফল) প্রবোধাৎ (বোধের বিকাশরূপ জাগরণের ফলে) স্বপ্নকর্মবৎ (স্বপ্নে অনুষ্ঠিত কর্মের মতো) বিলয়ং যাতি (বিনষ্ট হয়ে যায়)।

সরলার্থ: 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান হলে শত শত কোটি যুগ ধরে অনুষ্ঠিত সঞ্চিত কর্মের ফল, জেগে উঠলে যেমন স্বপ্নের মধ্যে করা কাজের আর কোনও বাস্তব অস্তিত্ব থাকে না, তেমনিভাবে বিলয় হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা: বলছেন যে, জ্ঞান যদি হয় তাহলে তোমার জন্ম-জন্মান্তরের যত কর্ম সব চলে যাবে। হয়তো অনেক পাপ করেছিলে, সেসব আর থাকবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তুলোর পাহাড়ে একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বাললেই সব দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বলছেন, 'অহং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাৎ কল্পকোটি শত-অর্জিতম্ সঞ্চিতম্'। 'কল্পকোটি শত-অর্জিতম্ সঞ্চিতম্', শত শত কোটি যুগ ধরে আমি যত কর্মফল সঞ্চয় করেছি, 'অহং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাৎ', আমি ব্রহ্ম, এটা জানলেই সেসব মুহূর্তের মধ্যে

চলে যাবে। ব্রহ্মজ্ঞান হলেই শতকোটি যুগের পাপ বা পুণ্যের ফল আমার চলে যাবে। আত্মজ্ঞানের জন্যে কেন আমরা ব্যস্ত হই ? এই কারণে। হ্যাঁ, পাপ ছিল, ভুল করেছি, অন্যায় করেছি, মানুষই তো ভুল করে। একবার যদি জানতে পারি আমিই ব্রহ্ম তাহলে 'কল্পকোটিশতার্জিতম্', শত কোটি যুগ ধরে যে পাপ করে এসেছি, সেইসব সঞ্চিত কর্ম 'বিলয়ং যাতি'—মুহূর্তের মধ্যে বিলয় হয়ে যায়। কিরকমভাবে বিলয় হয় ? 'প্রবোধাৎ স্বপ্নকর্মবৎ'; যেমন স্বপ্নে যদি আমি নরহত্যা করি তার জন্যে তো কোনও শাস্তি হয় না। একবার জ্ঞান হলে সেইরকম আমার শতকোটি যুগের পাপ-পুণ্য ইত্যাদি যেসব সঞ্চিত কর্ম সেগুলি 'বিলয়ং যাতি', একেবারে মুছে যায়। স্বপ্নে যদি কোনও কাজ করি তার জন্যে বাস্তবে যেমন কোনও ফল ভোগ করতে হয় না, সেইরকম।

যৎ কৃতং স্বপ্নবেলায়াং পুণ্যং বা পাপমুল্বণম্।
সুপ্তোত্থিতস্য কিং তৎ স্যাৎ স্বর্গায় নরকায় বা॥ ৪৪৮

অন্বয়: স্বপ্নবেলায়াং (স্বপ্নদর্শনের সময়) যৎ (যে) পুণ্যং (পুণ্যকর্ম) বা উল্বণং (বা ভয়ঙ্কর) পাপং (পাপকর্ম) কৃতং (করা হয়েছে) সুপ্ত-উত্থিতস্য (ঘুম থেকে জেগে উঠেছে যে তার) তৎ কিং (তা কি) স্বর্গায় নরকায় বা স্যাৎ (স্বর্গ বা নরক ভোগের কারণ হবে)?

সরলার্থ: স্বপ্নের মধ্যে যেসব পুণ্যকর্ম বা ভয়ঙ্কর পাপকর্ম করা হয়েছে ঘুম ভাঙার পর সেগুলো কি স্বর্গভোগ বা নরকভোগের কারণ হবে ?

ব্যাখ্যা: 'যৎ কৃতং স্বপ্নবেলায়াং'—স্বপ্নে যা করা হয়েছে, 'পুণ্যং বা পাপম্-উল্বণম্'—পুণ্যকর্ম বা কোন ভয়ঙ্কর পাপকাজ, 'সুপ্তোত্থিতস্য'—জেগে ওঠার পর, সেই জাগ্রত ব্যক্তির কি হবে ? 'কিং তৎ স্যাৎ স্বর্গায় নরকায় বা'; সেই কর্ম তার কি স্বর্গ বা নরক ভোগের কারণ হবে ? স্বপ্নের মধ্যে আমি ভালো কাজও করতে পারি আবার জঘন্য কোন পাপও করতে পারি। স্বপ্নে যদি ভালো কাজ করি জেগে ওঠার পর তাতে কি আমার স্বর্গবাস হবে ? আর যদি জঘন্য কোনও পাপ করি তার জন্যে কি আমার নরকবাস হবে ? হবে না। ঘুমের মধ্যে যা কিছু করা হয় সেসবের কোনও ফলই হয় না। তেমনি জ্ঞান হলে আমার সঞ্চিত পুণ্যকর্ম বা পাপকাজের কোন ফল থাকে না। পুণ্যকর্মের জন্যে কোনও পুরস্কারও থাকে না, পাপকাজের জন্যে কোনও শাস্তিও থাকে না। যেমন স্বপ্নে ভালো-মন্দ যাই করি না কেন জেগে উঠে তার ফল আমায় ভোগ করতে হয় না তেমনি জ্ঞান হবার আগে, অজ্ঞান অবস্থায়, যা কিছু করেছি সেই সঞ্চিত কর্মের ফল জ্ঞান হলে আর আমায় ভোগ করতে হয় না। জ্ঞান হলে সঞ্চিত কর্ম নষ্ট হয়ে যায়।

স্বমসঙ্গমুদাসীনং পরিজ্ঞায় নভো যথা।
ন শ্লিষ্যতি চ যৎকিঞ্চিৎ কদাচিদ্‌ভাবিকর্মভিঃ॥ ৪৪৯

অন্বয়: [বিদ্বান ব্যক্তি] স্বম্ (আত্মাকে) যথা নভঃ (আকাশের মতো) অসঙ্গম্ (আসক্তিশূন্য) উদাসীনং (নির্লিপ্ত) পরিজ্ঞায় (জানার পর) কদাচিৎ (কখনও) ভাবি-কর্মভিঃ (ভাবী অর্থাৎ আগামী কর্মসমূহের দ্বারা) যৎকিঞ্চিৎ চ (কিছুমাত্রও) ন শ্লিষ্যতি (লিপ্ত হন না)।

সরলার্থ: আত্মজ্ঞ পুরুষ আত্মাকে আকাশের মতো আসক্তিশূন্য, নির্লিপ্ত বলে জেনে আগামী কর্মসমূহের দ্বারা কখনও কিছুমাত্র লিপ্ত হন না।

ব্যাখ্যা: আগে বলেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তির সঞ্চিত কর্ম থাকে না। এখন বলছেন, তিনি ভাবী বা আগামী কর্মের দ্বারাও লিপ্ত হন না। যিনি জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি নিজেকে কিভাবে দেখেন ? 'স্বম্-অসঙ্গম্-উদাসীনম্'; জ্ঞান হলে কিরকম হবে ? আমি অসঙ্গ, আমি কোন কিছুর কর্তা নই। আমি উদাসীন, আমি কোনও বাসনার জন্যে কিছু করি না, আমার কোনও বাসনা নেই। কোন কিছুতে আমি লিপ্ত নই, আমি উদাসীন। 'নভঃ যথা', আমি আকাশের মতো, আকাশ যেমন কিছুতে লিপ্ত নয় আমিও সেইরকম। আমি যদি কিছু ভুল করে ফেলি তাহলেও সেটা আমায় স্পর্শ করবে না, আমি অসঙ্গ, উদাসীন। যাঁর জ্ঞান হয়েছে, তিনি এই রকম। তিনি তখন 'ন শ্লিষ্যতি ভাবিকর্মভিঃ'—জ্ঞান হওয়ার পরে তিনি যা কর্ম করবেন সেই কর্মের ফল তাঁর ওপর আসবে না, তার সঙ্গে তিনি আর সংশ্লিষ্ট থাকবেন না। তাঁর তো কোনও বাসনা নেই তাই তিনি সংশ্লিষ্ট নন। যদি কোনও অঘটনে তাঁর দ্বারা কারোর কোনও অনিষ্ট হয়ে যায় তাহলেও সে দায় তাঁর ওপর বর্তাবে না। কারণ তাঁর আর 'আমি কর্তা' 'আমি ভোক্তা' এই অহংবুদ্ধি নেই। অবশ্য যাঁর জ্ঞান হয়েছে তাঁর দ্বারা কারোরই কোনও ক্ষতি না হওয়ারই কথা, কিন্তু যদি এরকম হয় তাহলেও তার জন্যে তাঁর কোনও দায়িত্ব বর্তাবে না। কারণ তিনি উদাসীন, আকাশের মতো নির্লিপ্ত, কিছুতেই সংশ্লিষ্ট নন। কাজেই তিনি 'ন শ্লিষ্যতি চ যৎ কিঞ্চিৎ কদাচিৎ ভাবিকর্মভিঃ'। আগে সঞ্চিত কর্মের কথা বলেছেন, এখন বলছেন ভাবী কর্ম বা আগামী কর্মের কথা। অর্থাৎ ভবিষ্যতের কর্মও তাঁর আর থাকবে না। ভবিষ্যতের কর্মের সঙ্গেও তাঁর আর কোন লিপ্ততা থাকবে না।

ন নভো ঘটযোগেন সুরাগন্ধেন লিপ্যতে।
তথাত্মোপাধিযোগেন তদ্ধর্মৈর্নৈব লিপ্যতে॥ ৪৫০

অন্বয়: নভঃ (আকাশ) ঘটযোগেন (ঘটের সংস্রবের দ্বারা) সুরাগন্ধেন (ঘটে রাখা মদের গন্ধে) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না অর্থাৎ সেই গন্ধযুক্ত হয় না) তথা (সেইরকম)

আত্মা (আত্মা) উপাধিযোগেন (দেহ মন অহঙ্কার ইত্যাদি উপাধির সংস্রবের হেতু) তৎ-ধর্মঃ (কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি উপাধিসমূহের ধর্মের সঙ্গে) ন এব লিপ্যতে (কখনও লিপ্ত হন না)।

সরলার্থ: সুরাপূর্ণ ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ যেমন সুরার গন্ধযুক্ত হয় না সেইরকম আত্মা দেহ-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার ইত্যাদি উপাধির সংস্রবে থেকেও উপাধিগুলির ধর্ম কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন না।

ব্যাখ্যা: একটা মাটির পাত্রে কিছুটা মদ রেখেছিলাম, সেই মদ অন্য পাত্রে ঢেলে দিয়েছি, কিন্তু এই পাত্রে মদের গন্ধ কিছুটা রয়ে গেছে। কিন্তু এই পাত্রের মধ্যে যে আকাশ আছে তাতেও কি মদের গন্ধ থাকবে ? তা থাকবে না। বলছেন : 'ন নভঃ ঘট-যোগেন সুরাগন্ধেন লিপ্যতে'। ঘটাকাশ, ঘটের মধ্যে যে আকাশ। আকাশে কোনও গন্ধ কখনও থাকে না। একটার সঙ্গে আর একটার সংস্পর্শে গন্ধ আসে। মাটির ঘটের মাটিতে সুরার সংস্পর্শে গন্ধ আসতে পারে কিন্তু ঘটের মধ্যেকার আকাশে কোনও গন্ধ থাকে না। বলছেন, আমি যেন আকাশ, উদাসীন, অসঙ্গ, কিছুতেই লিপ্ত নই। সুরা ঘটের মধ্যে ছিল বলে ঘটের মধ্যেকার আকাশে যেমন মদের গন্ধ হয়ে যায় না তেমনি উপাধির সংযোগে থাকলেও আত্মায় উপাধির ধর্ম এসে যায় না। 'তথা-আত্মা-উপাধিযোগেন তদ্ধর্মৈঃ-ন-এব লিপ্যতে'। আত্মা নিরুপাধিক, আত্মার কোনও উপাধি নেই। আত্মা উদাসীন, সাক্ষী, নির্গুণ, নিরাকার, নিরুপাধিক। উপাধির ধর্ম অর্থাৎ অহং কর্তা, অহং ভোক্তা ভাব, সুখ-দুঃখের অনুভূতিতে ভালো লাগা মন্দ লাগা, এসবের থেকে আত্মা বিশ্লিষ্ট। উপাধির ধর্ম আত্মাকে স্পর্শ করে না।

জ্ঞানোদয়াৎ পুরারব্ধং কর্ম জ্ঞানান্ন নশ্যতি।
অদত্ত্বা স্বফলং লক্ষ্যমুদ্দিশ্যোৎসৃষ্টবাণবৎ॥ ৪৫১

অন্বয়: জ্ঞান-উদয়াৎ পুরা (জ্ঞানের উদয় হবার আগে) আরব্ধং কর্ম (আরব্ধ কর্ম) স্বফলং অদত্ত্বা (নিজের ফল না দিয়ে) জ্ঞানাৎ ন নশ্যতি (জ্ঞান হওয়ার ফলে নষ্ট হয় না) লক্ষ্যম্ উদ্দিশ্য (লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করে) উৎসৃষ্ট বাণবৎ (নিক্ষিপ্ত বাণের মতো)।

সরলার্থ: কোনও লক্ষ্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন লক্ষ্যকে বিদ্ধ না করে থামে না সেই রকম জ্ঞান হওয়ার পূর্বের আরব্ধ কর্ম জ্ঞান হলেও নিজের ফল না দিয়ে নষ্ট হয় না।

ব্যাখ্যা: এখানে আবার প্রারব্ধ কর্মের কথা বলেছেন। জ্ঞান হলে মুক্তি হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফল জ্ঞানীকেও ভোগ করতে হয়। উদাহরণ দিচ্ছেন : একটা তীর ছুঁড়েছি কোন কিছু লক্ষ্য করে, তীরটা ছুটে যাচ্ছে, এখন কি তাকে আর মাঝপথে থামানো যাবে ?

লক্ষ্যে গিয়ে সে বিঁধবেই। তেমনি 'জ্ঞান-উদয়াৎ পুরা আরব্ধং কর্ম'—জ্ঞান হওয়ার আগেই যেসব কর্ম ফল দিতে শুরু করেছে, সেগুলো 'জ্ঞানাৎ ন নশ্যতি'—জ্ঞান হলেও নষ্ট হয় না। 'অদত্ত্বা স্বফলং'—ফল না দিয়ে সেই কর্মগুলি নষ্ট হয় না। জ্ঞান হলে সঞ্চিত ও আগামী কর্ম নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট হয় না। প্রারব্ধ কর্ম ফল প্রসব করবেই। সে ঐ লক্ষ্যের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া তীরের মতো—'লক্ষ্যম্-উদ্দিশ্য-উৎসৃষ্ট-বাণবৎ'। কিন্তু, জ্ঞানী যদিও প্রারব্ধের ফল ভোগ করেন, কিন্তু তার জন্যে তাঁর কোন বিকার হয় না।

ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা বিনির্মুক্তো বাণঃ পশ্চাৎ তু গোমতৌ।
ন তিষ্ঠতি ছিনত্ত্যেব লক্ষ্যং বেগেন নির্ভরম্॥ ৪৫২

অন্বয়: ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা (বাঘ মনে করে) বিনির্মুক্তঃ বাণঃ (ধনু থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া বাণ) পশ্চাৎ তু (পরে আর) গোমতৌ (গরু বলে মনে হলেও) ন তিষ্ঠতি (থামে না) নির্ভরং বেগেন (অত্যন্ত বেগের সঙ্গে) লক্ষ্যং ছিনত্তি-এব (লক্ষ্যকে ছিন্ন করে ফেলে)।

সরলার্থ: সম্মুখে একটা জন্তু দেখে বাঘ মনে করে বাণ ত্যাগ করার পরে যদি বোঝা যায় সেটা বাঘ নয় গরু তাহলেও সেই নিক্ষিপ্ত বাণ আর মাঝপথে থামে না, সে তীব্র গতিতে লক্ষ্য প্রাণীকে ছিন্ন করে ফেলে।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা বিনির্মুক্তঃ বাণঃ পশ্চাৎ তু গোমতৌ'—ব্যাঘ্রবুদ্ধিতে অর্থাৎ বাঘ মনে করে হাত থেকে বাণটা ছোঁড়া হয়ে গেছে, কিন্তু পরে বোঝা গেলো ওটা গরু। বুঝলেও তখন কিন্তু আর তীরটাকে ফেরানো যাবে না। 'ন তিষ্ঠতি ছিনত্তি এব লক্ষ্যং বেগেন নির্ভরম্'—সেই বাণটা আর থামে না, সে অত্যন্ত বেগের সঙ্গে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে ছিন্ন করে। 'বেগেন নির্ভরম্', জোরে গিয়ে আঘাত করবে সে তার লক্ষ্যকে, গরুটাকে মেরে ফেলবে। প্রারব্ধ কর্ম এইভাবে কাজ করে। অনেক সময় আমরা দেখি অত্যন্ত ভালো একজন মানুষ সে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে। এটা হয় প্রারব্ধের জন্যে। আমাদের কত রকমের কষ্ট আছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক। আধ্যাত্মিক কষ্ট হচ্ছে দেহ-মনের কষ্ট। এই দেহ-মনের কষ্ট প্রারব্ধের জন্যে হয়। বলছেন, একটা জন্তু, মনে হলো বাঘ, তীর ছুঁড়ে ফেলেছি, দেখছি একটু পরে, না ওটা বাঘ নয় তো, গরু। কিন্তু তখন তো আর তীরকে ফেরানো যাবে না, সেটা গরুর গায়েই বিঁধবে। প্রারব্ধের জন্যে জ্ঞানীরও এরকম ভুল হতে পারে। কিন্তু তাঁদের এর জন্যে কষ্ট আর অত বেশী হয় না, কারণ তাঁরা দেহের থেকে নিজেদের আলাদা করে ফেলেছেন।

প্রারব্ধং বলবত্তরং খলু বিদাং ভোগেন তস্য ক্ষয়ঃ
সম্যগ্‌জ্ঞানহুতাশনেন বিলয়ঃ প্রাক্‌সংচিতাগামিনাম্।

ব্রহ্মাত্মৈক্যমবেক্ষ্য তন্ময়তয়া যে সর্বদা সংস্থিতা-
স্তেষাং তৎ ত্রিতয়ং নহি ক্বচিদপি ব্রহ্মৈব তে নির্গুণম্॥ ৪৫৩

অন্বয়: বিদাং (জ্ঞানীদের পক্ষে) খলু (অবশ্য) প্রারব্ধং (প্রারব্ধ কর্ম) বলবৎতরং (অবধারিতভাবে ফলপ্রদ) তস্য (তার) ভোগেন ক্ষয়ঃ (ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়) সম্যক্-জ্ঞান-হুতাশনেন (শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানাগ্নির দ্বারা) প্রাক্সংচিত-আগামিনাম্ (পূর্বে সঞ্চিত ও আগামী সব কর্মের) বিলয়ঃ (লোপ হয়ে যায়) ব্রহ্ম-আত্মা-ঐক্যম্ (ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব) অবেক্ষ্য (দর্শন করে) যে সর্বদা (যাঁরা নিরন্তর) তন্ময়তয়া (তন্ময়তার সঙ্গে) সংস্থিতাঃ (অবস্থান করেন) তেষাং (তাঁদের) ক্বচিৎ-অপি (কোনও কালেই) তৎ-ত্রিতয়ং নহি (সেই তিনটি থাকে না) তে ব্রহ্মৈব নির্গুণম্ (তাঁরা ব্রহ্মই তাই নির্গুণ)।

সরলার্থ : আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষেও প্রারব্ধ কর্ম নিশ্চিতভাবেই ফলপ্রদ হয়। ভোগেই তার ক্ষয়। পূর্ণজ্ঞান হলে সেই জ্ঞানাগ্নিতে পূর্বের সঞ্চিত কর্ম ও আগামী কর্ম সমস্ত নাশ হয়ে যায়। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব দর্শন করে যাঁরা নিরন্তর তন্ময় হয়ে অবস্থান করেন তাঁদের কোনও কালেই এই তিনটি অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম প্রারব্ধ কর্ম ও আগামী কর্ম স্পর্শ করতে পারে না। তাঁরা ব্রহ্মই তাই নির্গুণ।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'বিদাং খলু বলবৎতরং প্রারব্ধং'; যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রারব্ধ কর্ম অবধারিতভাবে ফলপ্রদ হয়। 'তস্য ভোগেন ক্ষয়ঃ'—ভোগেই এর ক্ষয়। ভোগ না করলে প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না। আর সব কর্ম জ্ঞান হলে নষ্ট হয়ে যায়, প্রারব্ধ নষ্ট হয় না। বলছেন, 'প্রাক্সঞ্চিত-আগামিনাম্'—পূর্বের সঞ্চিত কর্ম আর ভবিষ্যতের যে কর্ম হতে পারে সেগুলো সব 'সম্যগ্ জ্ঞানহুতাশনেন বিলয়ঃ'—জ্ঞানাগ্নিতে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু প্রারব্ধ যায় না। প্রারব্ধ না গেলেও জ্ঞানীকে প্রারব্ধের ফল সাধারণ মানুষের মতো স্পর্শ করতে পারে না। কারণ ব্রহ্মকে জেনে তিনি ব্রহ্মই হয়ে গেছেন। বলছেন : 'সম্যগ্ জ্ঞানঃ', মানে 'আমি পরমাত্মা' এই জ্ঞান, ব্রহ্ম ও আত্মা এক, এই জ্ঞান। এ যদি হয় তাহলে আমার সঞ্চিত ও আগামী কর্ম নষ্ট হয়ে যায়। 'ব্রহ্ম-আত্মা-ঐক্যম্ অবেক্ষ্য', 'অবেক্ষ্য', ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য দর্শন করে অর্থাৎ অনুভব করে, উপলব্ধি করে—'তন্ময়তয়া যে সর্বদা সংস্থিতাঃ'—'তৎময়' অর্থাৎ ব্রহ্মময় হয়ে যাঁরা সর্বদা অবস্থিত, 'তেষাং'—সেইসব জ্ঞানী ব্যক্তিদের 'তৎ ত্রিতয়ং নহি ক্বচিদ্-অপি ব্রহ্মৈব নির্গুণম্'; ঐ ত্রিতয় তাঁদের 'ক্বচিদ্-অপি', কখনও স্পর্শ করে না। 'ত্রিতয়ং' অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম, প্রারব্ধ কর্ম আর আগামী কর্ম। এই তিনটিই তাঁদের স্পর্শ করে না। সঞ্চিত কর্ম জ্ঞান হলে নষ্ট হয়ে যায়। আগামী কর্ম উৎপন্নই হতে পারে না, কারণ তাঁদের 'আমি কর্তা' এই ভাব থাকে না। আর প্রারব্ধ যদিও ফল প্রসব করে, তার ফল তাঁদের দেহ-মনের ওপর দিয়েই ভোগ হয়। তাঁরা সর্বদা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন

বলে এ-সব তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। 'ব্রহ্মৈব তে নির্গুণম্'—ব্রহ্মকে জেনে তাঁরাও ব্রহ্মেরই মতো নির্গুণ হয়ে গেছেন। কোনও বিশেষণ দিয়ে তাঁদের বিশেষিত করা যায় না। তাঁদের অহংতা মমতা দূর হয়ে গেছে। তাই দেহের কষ্ট মনের কষ্ট তাঁরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। প্রারব্ধের ভোগ তাঁদের ঐ দেহ-মনের ওপর দিয়েই হয়ে যায়, তাঁদের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য আনতে পারে না।

উপাধিতাদাত্ম্যবিহীন-কেবল-
ব্রহ্মাত্মনৈবাত্মনি তিষ্ঠতো মুনেঃ।
প্রারব্ধসদ্ভাবকথা ন যুক্তা
স্বপ্নার্থসংবন্ধকথেব জাগ্রতঃ॥ ৪৫৪

অন্বয়: উপাধি-তাদাত্ম্যবিহীন-কেবল-আত্মনা এব (উপাধিগুলির সঙ্গে তাদাত্ম্যতা বিহীন এবং শুধু ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতায়) আত্মনি তিষ্ঠতঃ (স্বীয় আত্মায় অবস্থিত) মুনেঃ (মননশীল সাধকের) জাগ্রতঃ (জাগ্রত ব্যক্তির) স্বপ্ন-অর্থ-সংবন্ধ-কথা-ইব (স্বপ্নে দেখা বস্তু ও ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধের মতো) প্রারব্ধ-সৎ-ভাব কথা (প্রারব্ধ কর্মের অস্তিত্বের কথা) ন যুক্তা (সঙ্গত নয়)।

সরলার্থ: যেমন জাগ্রত ব্যক্তির স্বপ্নে দেখা বস্তু ও ঘটনাবলীর সঙ্গে কোনও বাস্তব সম্বন্ধ থাকে না, তেমনি দেহ-মন-অহঙ্কার ইত্যাদি উপাধির সঙ্গে যাঁর তাদাত্ম্যতা নেই, শুদ্ধ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজের আত্মায় যিনি অবস্থান করছেন, সেই মননশীল বিদ্বান ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্মের সঙ্গে সংস্রবের সম্ভাবনাও যুক্তিযুক্ত নয়।

ব্যাখ্যা: জীবন্মুক্ত পুরুষ কিরকম হন সে আলোচনা আগেও হয়েছে। এখন আরও গভীরে যাচ্ছেন। উপাধির কথা বলছেন। উপাধি হচ্ছে যা সহজাত নয়, অর্জন করা জিনিস। আমাদের দেহটা একটা উপাধি। এটাকে যেন আত্মার ওপর আরোপ করা হয়েছে, যেমন দেহের ওপর আমরা জামা চাপাই। বলছেন, 'উপাধিতাদাত্ম্যবিহীন'। উপাধি মানে দেহ-মন-অহঙ্কার সংক্রান্ত যা কিছু। সেসবের সঙ্গে যিনি 'তাদাত্ম্যবিহীন', মানে নিজেকে জড়াচ্ছেন না। 'কেবল ব্রহ্ম-আত্মনা-এব-আত্মনি তিষ্ঠতঃ মুনেঃ'; এই 'কেবল' শব্দটা খুব অর্থবহ, 'কেবল' মানে শুদ্ধ আত্মা, আর কিছু নেই। এই দেহ ইত্যাদির সঙ্গে তাদাত্ম্যতা চলে গেছে, আমি কেবল ব্রহ্ম এটা বুঝে নিয়েছি। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এটা আমি বেশ ভালোভাবে জেনেছি। এরকম যাঁর অনুভব তিনি কি করছেন? 'আত্মনি তিষ্ঠতঃ', আত্মায় বসে গেছেন, নিজের স্বরূপে নিজে বসে আছেন, সুখে অবস্থান করছেন। এ যদি হয় তাহলে আর বাইরের কিছু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। কার এরকম হয়? 'মুনেঃ', যিনি মননশীল, জ্ঞানী, তাঁর এইরকম হয়। তারপর

বলছেন, 'জাগ্রতঃ স্বপ্ন-অর্থ-সংবন্ধ কথা ইব।' 'জাগ্রতঃ' অর্থাৎ যিনি জেগে আছেন এমন ব্যক্তির। তিনিও যখন ঘুমোন কত কি স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু স্বপ্নের সেইসব বিষয়ের সঙ্গে জাগ্রত ব্যক্তির কি কোন বাস্তব সম্বন্ধ আছে ? 'স্বপ্ন-অর্থ-সংবন্ধ-কথা-ইব'— স্বপ্নে দেখা বস্তুর সঙ্গে জাগ্রত ব্যক্তির যেমন সম্বন্ধ, সেই রকমই সম্বন্ধ জ্ঞানীর সঙ্গে প্রারব্ধের অর্থাৎ কোন সম্বন্ধই নেই। 'প্রারব্ধ সদ্ভাবকথা ন যুক্তা'; স্বপ্নে যা দেখছেন তা যেমন জেগে বুঝতে পারছেন বাস্তব নয় তেমনি প্রারব্ধের কোনও অস্তিত্ব আছে বলে জ্ঞানীর আর বোধ হয় না। মানে প্রারব্ধ তাঁকে আর স্পর্শ করে না। প্রারব্ধের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্বন্ধ নেই। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যেন একটা লোহার বর্ম পরে বসে থাকেন। ছোঁড়া তীরটা তাঁর গায়ে লাগে ঠিকই কিন্তু লোহার বর্মে লেগে সেটা আর তাঁকে কষ্ট দিতে পারে না। জেগে উঠে স্বপ্নে দেখা জিনিস যেমন আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না তেমনি প্রারব্ধের ফলকেও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না।

ন হি প্রবুদ্ধঃ প্রতিভাসদেহে দেহোপযোগিন্যপি চ প্রপঞ্চে।
করোত্যহংতাং মমতামিদংতাং কিংতু স্বয়ং তিষ্ঠতি জাগরেণ॥ ৪৫৫

অন্বয়: প্রবুদ্ধঃ (ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন যিনি) প্রতিভাসদেহে (স্বপ্নে দেখা ছায়াশরীরে) দেহ-উপযোগিনি-অপি প্রপঞ্চে (প্রতিভাস-দেহের ভোগের উপকরণ ও তার সব আনুষঙ্গিক যা-কিছু তাতে) অহংতাং (আমি বোধ) মমতাং (আমার বলে বোধ) ইদংতাং (এটা এই বলে বোধ) ন করোতি (করেন না) কিংতু (কিন্তু) জাগরেণ (জাগ্রত হয়ে) স্বয়ং তিষ্ঠতি (নিজের মতো নিজে থাকেন)।

সরলার্থ: ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন যিনি, তিনি স্বপ্নে দেখা ছায়াশরীরে ও সেই শরীরের ভোগের উপযোগী যেসব আনুষঙ্গিক বস্তু তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন সেগুলি 'আমি-আমার-এই' এরকম মনে করেন না। জেগে উঠে তিনি স্বপ্নের বিষয়গুলি থেকে স্বতন্ত্রভাবে নিজের মতো থাকেন।

ব্যাখ্যা: এবার বলছেন, 'ন হি প্রবুদ্ধঃ প্রতিভাসদেহে দেহ-উপযোগিনি-অপি চ প্রপঞ্চে করোতি অহংতাং মমতাম্-ইদংতাং কিংতু স্বয়ং তিষ্ঠতি জাগরেণ'। 'প্রবুদ্ধঃ' অর্থাৎ যিনি ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে তিনি যা দেখেছেন, জেগে উঠে তিনি সেগুলোকে আর বাস্তব বলে মনে করেন না। করলে তাঁকে পাগল বলতে হবে। 'প্রতিভাসদেহে'—স্বপ্নে নিজের যে দেহ দেখি আমরা, সেটা যেন এই দেহের একটা আভাস বা ছায়া। 'দেহোপযোগিনি প্রপঞ্চে'—যেসব বিষয় বা বস্তুকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন দেখি। জেগে উঠেও কি আমি স্বপ্নের ছায়া-শরীরকে আমি বলে মনে করব ? বা স্বপ্নে যা-যা নিজের বলে ভেবেছি সেগুলোকে 'আমার' মনে করব ? না কি সেগুলো এখন

যোগাড় করতে যাবো ? স্বপ্নে যা-যা দেখেছি, সেগুলোকে কেন্দ্র করে যে 'অহংতা', 'মমতা' আর 'ইদংতা' স্বপ্নে ছিল, সেগুলি কি জেগে উঠেও আমার থাকবে ? থাকবে না। যেমন স্বপ্নে হয়তো আমি মরে যাচ্ছিলাম, বাঁচার একটা ওষুধ ছিল, আমি জেগে উঠেও সেই ওষুধটা কি খুঁজব ? না। আমার স্বপ্নের মরাটাও মিথ্যা, ওষুধটাও মিথ্যা। 'স্বয়ং তিষ্ঠতি জাগরেণ', জেগে উঠলে আমি স্বয়ংই শুধু থাকি আর কিছু থাকে না। প্রারব্ধ যা-কিছু করছে সেগুলো যেন স্বপ্নের জিনিস বলে দেখছি। আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, তাই মোহনিদ্রা, অজ্ঞাননিদ্রা সব চলে গেছে। তাই আমি দেখতে পাচ্ছি এসব মিথ্যা। অবশ্য বেদান্ত যখন জগৎ মিথ্যা বলেন সেটা অনিত্য অর্থে মিথ্যা বলেন, এর ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করেন। শঙ্করাচার্যও ব্যবহারিক অর্থে জগৎকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, আমার দাঁতে ব্যথা হয়েছে, সেটা মিথ্যা ? মিথ্যা বলি কি করে ? বলতে পারি না তো। দারিদ্র আছে, ব্যাধি আছে, অন্যায় আছে এসব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবো কি করে ? তবে এগুলো অনিত্য, পরিবর্তনশীল এ-কথা ঠিক। জগতের অনিত্যতার বোধটা যেন আমার থাকে। আমার মধ্যে যেন একটা অন্তঃস্রোত চলে যে, এসব অনিত্য। যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তাঁর এই অনিত্য বোধটা এত পাকা হয়ে গেছে যে দেহ-সংক্রান্ত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও কিছুতেই তিনি আর বিচলিত হন না। তিনি জানেন নিত্য সত্য একমাত্র পরমাত্মা। সেই পরমাত্মার চিন্তাতেই তিনি নিমগ্ন হয়ে থাকেন। প্রারব্ধ তাঁকে আর কষ্ট দিতে পারে না।

ন তস্য মিথ্যার্থ-সমর্থনেচ্ছা ন সংগ্রহস্তজ্জগতোঽপি দৃষ্টঃ।
তত্রানুবৃত্তির্যদি চেন্মৃষার্থে ন নিদ্রয়া মুক্ত ইতীষ্যতে ধ্রুবম্॥ ৪৫৬

অন্বয়: তস্য (জাগ্রত ব্যক্তির) মিথ্যা-অর্থ-সমর্থন-ইচ্ছা ন (স্বপ্নে দেখা মিথ্যা বিষয়কে সত্য বলে মনে করার প্রবৃত্তি থাকে না) তৎ জগতঃ (স্বপ্নে যে জগৎ দেখেছে তার) সংগ্রহঃ অপি ন দৃষ্টঃ (সন্ধান করতেও দেখা যায় না) যদি চেৎ (যদি) তত্র (স্বপ্নরাজ্যের) মৃষা-অর্থে (মিথ্যা বস্তুতে) অনুবৃত্তিঃ (অনুবর্তনের প্রবৃত্তি হয়) [তাহলে] নিদ্রয়া ন মুক্তঃ (সে নিদ্রা থেকে মুক্ত হয়নি) ইতি-ধ্রুবং ঈষ্যতে (এটা নিশ্চয় করে বলা যায়)।

সরলার্থ: জাগ্রত ব্যক্তির মধ্যে স্বপ্নে দেখা মিথ্যা বিষয়কে সত্য মনে করে সেসব পাবার ইচ্ছা দেখা যায় না। স্বপ্নে দেখা জগৎ-কে পাবার জন্যে সন্ধান করতেও তাকে দেখা যায় না। যদি তাকে স্বপ্নরাজ্যের মিথ্যা বস্তু খুঁজতে দেখা যায়, তাহলে সে যে নিদ্রামুক্ত হয়নি, এটা নিশ্চয় করে বলা যায়।

ব্যাখ্যা: যদি আমার জ্ঞান হয়ে যায় তাহলে প্রারব্ধ কর্ম আমার কাছে কিরকম মনে হবে ? বলছেন, তখন সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হবে। স্বপ্নে আমরা কত কি দেখি,

কত জায়গায় যাই, কত কিছু ভোগ করি, জেগে উঠে আবার যদি সেসব জিনিস খুঁজতে থাকি তাহলে বুঝতে হবে আমার ঘুম এখনও ভাঙেনি। তেমনি আমার জ্ঞান হলে এ জগতের সবটাই যেন স্বপ্নের মতো মিথ্যা বলে মনে হয়। জ্ঞান হলে আমরা বুঝি ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, আমিই ব্রহ্ম। তখন এই দেহ, আর দেহ-সংক্রান্ত যা-কিছু, সবই মিথ্যা বলে মনে হয়। তখন প্রারব্ধের জন্যে রোগ-ব্যাধি সুখ-দুঃখ যা- কিছু আসুক না কেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে তা আর স্পর্শ করবে না। কারণ তিনি জেনে গেছেন তিনি নিত্য শুদ্ধ আত্মা। তা যদি না হয়, তিনি যদি দেহ-মনের ব্যাপার নিয়ে বিচলিত হন, যদি বিষয়ের দিকে ঝোঁকেন তাহলে বুঝতে হবে তাঁর মোহনিদ্রা, অজ্ঞাননিদ্রা এখনও কাটেনি, জ্ঞান তাঁর হয়নি। বলছেন, 'তস্য মিথ্যা-অর্থ-সমর্থন-ইচ্ছা ন'; সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল, জেগে উঠে কি সেই স্বপ্নে দেখা জিনিস সত্যি বলে মনে করবে ? বলছেন, 'মিথ্যা-অর্থ', অর্থ মানে বিষয়। হয়তো স্বপ্নে দেখেছিল সে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছে, ওই ঘোড়াটা 'মিথ্যা-অর্থ'। তার যখন ঘুম ভেঙে গেলো তখনও কি তার মনে হবে ওই ঘোড়াটাতে আবার চড়ি ? না, এরকম ভুল তার হবে না। 'ন সংগ্রহঃ-তৎ-জগতঃ-অপি দৃষ্টঃ'—তাকে আর স্বপ্নের সেই জগতের সন্ধান করতে দেখা যায় না। 'যদি চেৎ তত্র মৃষা-অর্থে অনুবৃত্তিঃ'; যদি সে তা করে, জাগার পরেও স্বপ্নের জগৎকে সত্যি ভাবতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার ঘুমটা ভাঙেনি। জেগে উঠেও তার যদি স্বপ্নের মিথ্যা বস্তুতে 'অনুবৃত্তিঃ' হয়, স্বপ্নের জিনিসগুলো পাবার ইচ্ছা হয়, তাহলে বুঝতে হবে সে 'নিদ্রয়া ন মুক্তঃ'—তার ঘুম এখনও ভাঙেনি। তেমনি কেউ যদি মনে করেন, আমার আত্মজ্ঞান হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি যদি জগতের ভোগসুখের দিকে ছোটেন, জগৎকে সত্যি মনে করে এর দিকে আকৃষ্ট হন, 'মিথ্যা-অর্থ সংগ্রহ' করেন, তাহলে বুঝতে হবে জ্ঞান তাঁর হয়নি, তাঁর অজ্ঞান-নিদ্রা কাটেনি। যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে, তিনি বিষয়ের দিকে আর ঝোঁকেন না।

তদ্বৎ পরে ব্রহ্মণি বর্তমানঃ সদাত্মনা তিষ্ঠতি নান্যদীক্ষতে।
স্মৃতির্যথা স্বপ্নবিলোকিতার্থে তথা বিদঃ প্রাশনমোচনাদৌ ॥ ৪৫৭

অন্বয়: তৎ-বৎ(ঘুম থেকে উঠেছেন এইরকম ব্যক্তির মতো) পরে ব্রহ্মণি বর্তমানঃ (পরব্রহ্মে বিদ্যমান ব্যক্তি) সৎ-আত্মনা তিষ্ঠতি (সৎস্বরূপ আত্মারূপে অবস্থান করেন) অন্যৎ ন ঈক্ষতে (অন্য বাহ্যবস্তু দেখেন না) যথা (যেমন [জাগ্রত ব্যক্তির]) স্বপ্ন-বিলোকিত-অর্থে (স্বপ্নে দেখা বিষয়ে) স্মৃতিঃ (স্মৃতি) তথা (সেই রকম) বিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির) প্র-অশন-মোচন-আদৌ (ভোজন, মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি)।

সরলার্থ: ঘুম থেকে জেগে ওঠা ব্যক্তির মতো পরব্রহ্মে বিদ্যমান ব্যক্তি সৎস্বরূপ আত্মা-

রূপে অবস্থান করেন। অন্য কিছু আর দেখেন না। যেমন ঘুম-ভাঙা মানুষের স্বপ্নের জগতের স্মৃতি থাকে, সেইরকম ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের খাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি স্বভাবগত ভাবে যেন অতীতের স্মৃতি থেকে হয়ে যেতে থাকে।

ব্যাখ্যা : যাঁর জ্ঞান হয়েছে তিনি বুঝে গেছেন এই দেহ থেকে তিনি আলাদা। এই দেহটা অনিত্য, মিথ্যা, তিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। তাই মিথ্যা বিষয়ের দিকে, যা দেহকেন্দ্রিক সেসবের দিকে তিনি আর ছোটেন না। এখন প্রশ্ন হলো, শরীরটা চলার জন্যে যা-যা দরকার তা-ও কি তিনি করবেন না ? খাওয়া-শোওয়া-ঘুমোনো এসব তিনি করবেন না ? যদি করেন, কিভাবে তাঁর পক্ষে সেটা করা সম্ভব ? তিনি তো পরমাত্মা ছাড়া সবই মিথ্যা দেখছেন। তার উত্তরে বলছেন : 'তৎবৎ'—অর্থাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠা ব্যক্তির মতো তাঁর ব্যাপারটা। জেগে ওঠা ব্যক্তির যেমন স্বপ্নের স্মৃতি থাকে, তেমনি জ্ঞানীর মনেও জ্ঞানলাভের আগে জগৎটাকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, এই জগতে যেভাবে তিনি চলেছেন, তার স্মৃতিটা থেকে যায়। সেই স্মৃতি-অনুযায়ী তিনি শরীর ধারণের প্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলি করে যান। বলছেন : 'পরে ব্রহ্মণি বর্তমানঃ', নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 'সৎ-আত্মনা তিষ্ঠতি'— শুদ্ধ আত্মায় তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। 'অন্যৎ ন ঈক্ষতে'—ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোনও বস্তু তিনি দেখছেন না। শুধু এক দেখছেন। এত দিন যেন আমার থেকে আমি সরে ছিলাম, এখন আবার আমাতে আমি ফিরে এসেছি। আমার যে নিত্য অস্তিত্বস্বরূপ আত্মা তাতে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। এতকাল আমি যেন একটা ছায়াকে মনে করেছিলাম আমি, এখন আমি আমার নিত্য যে আত্মা তাতে ফিরে এসেছি। এইরকম যাঁর অবস্থা তিনি কিরকমভাবে জগৎটাকে দেখবেন ? 'যথা স্বপ্নবিলোকিত স্মৃতিঃ', স্বপ্নে যা-যা দেখেছিলেন সেইসব মিথ্যা বস্তুর স্মৃতির মতো জগৎটাকে দেখবেন। 'তথা বিদঃ', 'বিদঃ' মানে যাঁর ব্রহ্ম জ্ঞান হয়েছে। স্বপ্নে দেখা বস্তুর যেমন স্মৃতি থাকে তেমনি তিনি জ্ঞান হওয়ার আগে জগৎটাকে যেরকম দেখেছিলেন, সেই স্মৃতি থেকে সবকিছু করেন। তাঁর ব্যবহারটা কিরকম ? 'প্রাশন মোচনাদৌ', তাঁর খাওয়া-দাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ, সবই চলছে কিন্তু একটা স্বভাবগতভাবে। খেতে হয় খাচ্ছেন, ঘুম পেলে ঘুমোচ্ছেন, কোনও বিশেষ ইচ্ছে নিয়ে কিছুই করছেন না। নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের যা-কিছু করণীয় সব করে যাচ্ছেন যেন যন্ত্র চালিতের মতো। কোন কিছুতেই তাঁর আঁট নেই, আসক্তি নেই। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কিভাবে চলাফেরা করেন সেটা আমরা বুঝতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন থেকে। তাঁর জীবনটা যেন শাস্ত্রের বিবরণ। খাচ্ছেন, শুচ্ছেন, সব করছেন, কিন্তু যেন শরীরটা এসব করছে, তিনি করছেন না।

কর্মণা নির্মিতো দেহঃ প্রারব্ধং তস্য কল্প্যতাম্।
নানাদেরাত্মনো যুক্তং নৈবাত্মা কর্মনির্মিতঃ।। ৪৫৮

অন্বয়: দেহঃ কর্মণা নির্মিতঃ (দেহ কর্মের দ্বারা নির্মিত) তস্য (তার) প্রারব্ধং কল্প্যতাম্ (প্রারব্ধ কল্পনা করতে পারা যায়) অনাদেঃ আত্মনঃ (অনাদি আত্মার) ন যুক্তং ([প্রারব্ধের সঙ্গে] কোনও যোগ নেই) আত্মা কর্মনির্মিতঃ ন এব (আত্মা কখনই কর্মনির্মিত নন)।

সরলার্থ: দেহ কর্মনির্মিত, তার প্রারব্ধের কল্পনা করতে পারা যায়। কিন্তু অনাদি আত্মার প্রারব্ধের সঙ্গে কোনও যোগ নেই কারণ আত্মা কর্মের দ্বারা সৃষ্ট হননি।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'কর্মণা নির্মিতঃ দেহঃ প্রারব্ধং তস্য কল্প্যতাম্'; আমার কর্মের ফলেই এই দেহটা হয়েছে। আমার জন্ম হয়েছে একটা বিশেষ পরিবারে, বিশেষ দেশে, একটা বিশেষ সমাজে। আমার নিজের কর্মই এর মূলে। ভালো-মন্দ যা-কিছু ঘটছে তার দায়িত্ব আমার। 'প্রারব্ধং তস্য কল্প্যতাম্'। দেহ কর্মের দ্বারা তৈরী, কাজেই তার প্রারব্ধ হতে পারে। শরীরের সঙ্গেই প্রারব্ধের সম্পর্ক হতে পারে। কিন্তু আত্মা ? আত্মা তো অনাদি-অনন্ত, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। 'ন অনাদেঃ আত্মনঃ যুক্তং'—অনাদি আত্মার সঙ্গে প্রারব্ধের কোনও যোগ নেই। যে নিত্যবস্তু, যার জন্মই হয়নি তার আবার প্রারব্ধ কি ? তার প্রারব্ধ নেই। 'নৈব-আত্মা কর্মনির্মিতঃ', আত্মা কখনোই কর্মের দ্বারা সৃষ্ট নন। কাজেই, তাঁর সঙ্গে প্রারব্ধ কর্মের কোন যোগ থাকতে পারে না। যিনি জ্ঞানী, তিনি আত্মস্বরূপ। তিনি জানেন, তিনি দেহ নন, আত্মা। প্রারব্ধ তাঁর দেহকে স্পর্শ করে, তাঁকে কিছু করতে পারে না।

অজো নিত্যঃ শাশ্বত ইতি ব্রূতে শ্রুতিরমোঘবাক্।
তদাত্মনা তিষ্ঠতোঽস্য কুতঃ প্রারব্ধকল্পনা।। ৪৫৯

অন্বয়: অমোঘবাক্ শ্রুতিঃব্রূতে (সত্যভাষিণী শ্রুতি বলেন) [আত্মা] অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ ইতি (অজ, নিত্য, শাশ্বত ইত্যাদি) তৎ আত্মনা তিষ্ঠতঃ অস্য (সেই শুদ্ধ আত্মস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের) প্রারব্ধকল্পনা কুতঃ (প্রারব্ধ কর্মের কল্পনা কি করে হতে পারে)?

সরলার্থ: সত্যভাষিণী শ্রুতি বলেন, আত্মা 'অজ, নিত্য, শাশ্বত' ইত্যাদি। সেই শুদ্ধ আত্মস্বরূপে স্থিত পুরুষের প্রারব্ধের কল্পনা কি করে হয় ?

ব্যাখ্যা: আত্মা কিরকম ? 'অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ ইতি ব্রূতে শ্রুতিঃ-অমোঘবাক্'। 'অজঃ'—যার জন্ম নেই। যার জন্ম নেই তার মৃত্যুও নেই। 'নিত্যঃ'—চিরকালীন, পুরাণ, সনাতন, শাশ্বত। যা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকবে, তা-ই নিত্য, শাশ্বত। 'ইতি ব্রূতে শ্রুতিঃ-অমোঘবাক্', শ্রুতি একথা বলেন। শ্রুতি 'অমোঘবাক্', শ্রুতির কথা মিথ্যে হয় না। কারণ শ্রুতি যে-সত্য বলছেন তা অপৌরুষেয়, নিত্য সত্য। সেই শ্রুতি আত্মাকে অজ, নিত্য ও শাশ্বত বলেছেন। 'তদাত্মনা তিষ্ঠতঃ', যিনি আত্মায় অবস্থান করছেন তিনি আত্মাই হয়ে গেছেন। তিনিও অজ, নিত্য, শাশ্বত। আমার পরিচয় আমি জেনে গেছি, বুঝে নিয়েছি। আমি সম্রাট, আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, আমি কিছুর তোয়াক্কা করি না। 'অস্য কুতঃ প্রারব্ধকল্পনা'; এরকম যিনি তাঁর আবার প্রারব্ধ কোথায় ? যিনি জেনেছেন, তিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা তাঁর সম্বন্ধে প্রারব্ধের কল্পনাও করা সম্ভব নয়। তিনি চিৎস্বরূপে স্থিত হয়ে বসে আছেন। তাঁর আর প্রারব্ধ কোথায় ?

প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ।
দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারব্ধং ত্যজতামতঃ।। ৪৬০

অন্বয়: যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ (যখন দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে) তদা (তখন) প্রারব্ধং সিধ্যতি (প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ হয়) দেহ-আত্মভাবঃ (দেহে 'আমি' বোধ) ন ইষ্টঃ এব (অবশ্যই কাম্য নয়) অতঃ প্রারব্ধং ত্যজতাম্ (অতএব [দেহাত্ম বোধ বর্জন করে] প্রারব্ধ ত্যাগ করতে হয়)।

সরলার্থ: যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধি থাকে ততক্ষণ প্রারব্ধের ফল ভোগ করতে হয়। দেহাত্মভাব কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে প্রারব্ধ ভোগের নিবৃত্তি করতে হয়।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ'; প্রারব্ধ কার পক্ষে প্রযোজ্য ? যার দেহাত্মবুদ্ধি আছে, দেহকেই যে আত্মা মনে করে বসে আছে। আমি যদি দেহটাকে 'আমি' মনে করি সেটা আমার অজ্ঞতা। তখন প্রারব্ধের ফল আমায় ভোগ করতেই হবে। কাজেই, 'দেহ-আত্মভাবঃ' দেহকে 'আমি' মনে করাটা 'ন-এব-ইষ্টঃ'—বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের সব কষ্টের মূল হচ্ছে এই দেহের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলা। কিন্তু যদি আমি এই সিদ্ধান্তে আসি যে 'আমি আত্মা', আমার পাপ নেই, পুণ্য নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, আমার দেহই নেই তো প্রারব্ধ আর কিসে হবে, তাহলে অবস্থাটা কিরকম হবে ? জালে আটক সিংহ যেমন গর্জন করতে করতে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে, তেমনি আমি দেহাত্মবুদ্ধির জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসব। আমার প্রারব্ধ ত্যাগ হয়ে যাবে। যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধি, ততক্ষণ প্রারব্ধের ভোগ। জ্ঞানীর দেহাত্মবুদ্ধি নেই, তাই তাঁর প্রারব্ধও নেই।

শরীরস্যাপি প্রারব্ধকল্পনা ভ্রান্তিরেব হি।
অধ্যস্তস্য কুতঃ সত্ত্বমসত্যস্য কুতো জনিঃ।
অজাতস্য কুতো নাশঃ প্রারব্ধমসতঃ কুতঃ ॥৪৬১

অন্বয়: শরীরস্য প্রারব্ধকল্পনা অপি (শরীরের প্রারব্ধ কল্পনাও) হি ভ্রান্তিঃ এব (অবশ্যই ভ্রান্তিমাত্র) অধ্যস্তস্য সত্ত্বম্ কুতঃ (অধ্যস্ত বস্তুর সত্তা কোথায়) অসত্যস্য কুতঃ জনিঃ (মিথ্যা বস্তুর জন্ম কোথা থেকে হয়) অজাতস্য নাশঃ কুতঃ (যা জন্মায়নি তার নাশ কি করে হয়) অসতঃ প্রারব্ধম্ কুতঃ (অস্তিত্বহীন যা তার প্রারব্ধ কি করে থাকে) ?

সরলার্থ: শরীরের প্রারব্ধ কল্পনাও ভ্রান্তিমাত্র। একটা অধ্যস্ত বস্তুর সত্তা কোথায় ? যা অসত্য তার জন্ম কোথা থেকে হবে ? আর যা জন্মায়নি তার নাশই বা কি করে হয় ? যার কোনও অস্তিত্বই নেই তার আবার প্রারব্ধ কি করে থাকে ?

ব্যাখ্যা: আগে বলেছেন শরীরের প্রারব্ধ হতে পারে আত্মার নয়। এখন আবার সেটাকে কাটছেন। বলছেন, 'শরীরস্য-অপি প্রারব্ধ-কল্পনা ভ্রান্তিঃ-এব হি'; শরীরের প্রারব্ধকল্পনাও ভুল। শরীর কি নিজে কিছু করতে পারে যে এটা শরীরের ওপর চাপিয়ে দেবে ? একি স্বাধীন যে কিছু করতে পারবে ? 'অধ্যস্তস্য কুতঃ সত্ত্বম্', এ তো একটা অধ্যস্ত বস্তু, চাপানো জিনিস, এর সত্তা কোথায় ? ওই যে মরুভূমিতে জল দেখলাম, তাতে আমার পিপাসা দূর হবে ? ওই যে দড়িটার জায়গায় সাপ দেখেছিলাম সেই সাপের মধ্যে বস্তু কোথায় ? সত্তা তো নেই। সেটা তো একটা মায়া। 'অসত্যস্য কুতঃ জনিঃ'; একটা অসত্য, মিথ্যা, যা নেই, তার জন্ম আবার কি ? দেহটা অসত্য, মিথ্যা, সে নিজে কিছুই করতে পারে না। কঠোপনিষদে যে রথের কথা বলছেন সেটা মনে রাখতে হবে। দেহটা একটা রথ, আত্মা রথী, তাঁর নির্দেশেই রথ চলছে। দেহটা তো স্বাধীন নয়! তাই বলছেন, 'শরীরস্য প্রারব্ধকল্পনা ভ্রান্তিঃ এব হি', শরীরের প্রারব্ধ ভোগ হচ্ছে, এই ধারণাটাও ভুল। 'প্রারব্ধং অসতঃ কুতঃ'; শরীরটা তো মিথ্যা, একটা চাপানো জিনিস, অস্তিত্বহীন, তার ওপর প্রারব্ধ চাপাবো কি করে ? আগে বলেছেন, এই যে হাত দিয়ে খাচ্ছি, চলছি, এইসব প্রারব্ধ দেহের। এখন বলছেন, এই শরীরটার তো কোনও স্বাধীন সত্তাই নেই তাহলে এর আবার প্রারব্ধ কি করে হবে ? যাঁর জ্ঞান হয়েছে, যিনি দেহটার অস্তিত্বই আর টের পাচ্ছেন না, পরমাত্মায় ডুবে আছেন, তাঁকে আর প্রারব্ধ কষ্ট দিতে পারবে না। ব্রহ্মের উপলব্ধিতে তিনি বুঁদ হয়ে বসে আছেন, নেশায় মশগুল হয়ে আছেন, প্রারব্ধ আর কষ্ট দিতে পারছে না।

জ্ঞানেনাজ্ঞানকার্যস্য সমূলস্য লয়ো যদি।
তিষ্ঠত্যয়ং কথং দেহ ইতি শংকাবতো জড়ান্ ॥৪৬২

সমাধাতুং বাহ্যদৃষ্ট্যা প্রারব্ধং বদতি শ্রুতিঃ।
ন তু দেহাদিসত্যত্ববোধনায় বিপশ্চিতাম্॥ ৪৬৩

অন্বয়: জ্ঞানেন সমূলস্য অজ্ঞানকার্যস্য (জ্ঞানের দ্বারা সমূলে অজ্ঞান কার্যের) যদি লয়ঃ (যদি নাশ হয়) অয়ং দেহঃ কথং তিষ্ঠতি (এই দেহ তাহলে কি করে থাকে) ইতি শংকাবতঃ জড়ান্ (এইরকম আশঙ্কাগ্রস্ত জড়বুদ্ধি লোকেদের) সমাধাতুং (সমাধান দেবার জন্যে, বোঝাবার জন্যে) বাহ্যদৃষ্ট্যা (লৌকিক দৃষ্টি অবলম্বন করে) শ্রুতিঃ প্রারব্ধং বদতি (শ্রুতি প্রারব্ধের কথা বলেন) তু (কিন্তু) বিপশ্চিতাং (জ্ঞানীদের) দেহ-আদি সত্যত্ব বোধনায় ন (দেহ ইত্যাদির সত্যতা বোঝাবার জন্যে নয়)।

সরলার্থ: জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের কাজ সমূলে নষ্ট হয়ে গেলে এই স্থূলদেহ কি করে থাকে ? জড়বুদ্ধি লোকেদের এই আশঙ্কার সমাধান করার জন্যে শ্রুতি লৌকিক দৃষ্টি নিয়ে প্রারব্ধের কথা বলেন। যাঁরা জ্ঞানী, তাঁদের দেহ ইত্যাদির সত্যতা বোঝাবার জন্যে নয়।

ব্যাখ্যা: বলছেন : 'জ্ঞানেন-অজ্ঞানকার্যস্য সমূলস্য লয়ঃ যদি'; জ্ঞান মানে কি জ্ঞান ? আত্মজ্ঞান। আমাদের যেন চোখে কাজল মাখা রয়েছে, তাই ঠিকমতো সব দেখতে পাচ্ছি না, কাজলটা যখন সরে যাবে তখন ঠিক ঠিক দেখতে পাব। 'জ্ঞানেন অজ্ঞানকার্যস্য সমূলস্য লয়ঃ যদি'; জ্ঞান যেন অগ্নি, অজ্ঞানের শিকড়সুদ্ধ পুড়িয়ে দেয়। কর্মের বীজ পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়। কর্মকে জ্ঞান দিয়ে সমূলে পুড়িয়ে দিতে হবে। অজ্ঞানের ফলে আমি মনে করছি আমি হীন, পাপী, আমার বন্ধনদশা। দেহে 'আমি'-বুদ্ধি করেছি তাই ভাবছি আমি বদ্ধ। দেহ নিয়ে আমরা তো খুব বাড়াবাড়ি করি, দেহের সামান্য কষ্টেও কাতর হয়ে পড়ি। এগুলো অজ্ঞানের কাজ। এই অজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ যখন হয়ে যাবে জ্ঞানের দ্বারা, তখন অজ্ঞানের বীজটা 'ভর্জিত', ভাজা হয়ে যাবে, তা দিয়ে আর গাছ হবে না। জ্ঞান তো অগ্নি, সে পুড়িয়ে দেয়। জ্ঞান আলোর মতো, আলো এলে অন্ধকার একটুও থাকবে না। তখন আর দেহটাকে 'আমি' বলে ভুল হবে না। আমি আত্মা, আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, আমার বন্ধন হবে কি করে ? স্বামীজী বলছেন, যদি আমি সত্যি-সত্যি মুক্ত হই তাহলে আমি সব সময় মুক্ত। কোন কালেই আমার বন্ধন হয়নি। ভুল করে ভেবেছি শুধু আমার বন্ধন হয়েছে। যতক্ষণ আমার অজ্ঞান আছে, দেহাত্মবুদ্ধি আছে ততক্ষণ মনে করছি আমি বদ্ধ। আত্মজ্ঞান হলে তখন আর বন্ধন নেই। 'অয়ং দেহ কথং তিষ্ঠতি ইতি শংকাবতঃ জড়ান্'; তাহলে আমার দেহটার কি হলো ? একটা প্রশ্ন। যাঁরা এই প্রশ্ন করছেন তাঁরা যেন 'শংকাবতঃ জড়ান'। 'জড়ান্' মানে স্থূলবুদ্ধি, জড়বুদ্ধি, দেহটার কি হলো ভেবে ভয় পাচ্ছেন। 'সমাধাতুং বাহ্যদৃষ্ট্যা প্রারব্ধং বদতি শ্রুতিঃ'। জড়বুদ্ধি লোকেরা এই যে প্রশ্ন করছেন দেহটার কি হলো,

এটার সমাধান করার জন্যে শ্রুতি বলছেন, প্রারব্ধের কথা। 'বাহ্যদৃষ্ট্যা', এটা বাইরের দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, লৌকিক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে। প্রারব্ধের কথা শ্রুতি বলছেন ঠিকই কিন্তু শ্রুতি বলছেন, প্রারব্ধ তোমার ততক্ষণ আছে, যতক্ষণ তোমার দেহ আছে বলে মনে হচ্ছে। দেহ তো আছে, আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করছি, কিন্তু জ্ঞান হলে আমার কাছে আর দেহ নেই। 'ন তু দেহাদি সত্যত্ব বোধনায় বিপশ্চিতাম্'; 'বিপশ্চিতাং'—জ্ঞানী ব্যক্তিদের। এমন নয় যে শ্রুতি জ্ঞানী ব্যক্তিদের দেহাদির সত্যত্ব বোঝাতে চাইছেন। যাঁর জ্ঞান হয়েছে তিনি জানেন যে যদি এই দেহের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি তাহলেই দেহ-সংক্রান্ত কর্ম, তার ফল আমার থাকবে, কিন্তু দেহ সম্বন্ধে আমার যদি কোনও বোধই না থাকে তাহলে সে কবে কি করেছিল তার কোনও অস্তিত্বই আমার কাছে নেই। এই দেহ যে আমার দেহ, এই বোধটাই নেই। প্রারব্ধের প্রসঙ্গে এইসব কথা তো হচ্ছে তাই বলছেন, 'ন তু দেহাদিসত্যত্ব বোধনায় বিপশ্চিতাম্'; এখানে শুধু সাধারণ মানুষদের বোঝাবার জন্যে প্রারব্ধের কথা বলা হচ্ছে, 'ন তু বিপশ্চিতাম্'—যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের বোঝানোর জন্যে নয়।

পরিপূর্ণমনাদ্যনন্তমপ্রমেয়মবিক্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন॥ ৪৬৪

অন্বয়: পরিপূর্ণম্ (পরিপূর্ণ, অভাববোধ নেই) অনাদি-অনন্তম্ (আদি-অন্ত হীন) অপ্রমেয়ম্ (অসীম, পরিমাপ হয় না) অবিক্রিয়ম্ (বিকারহীন) একম্-এব-অদ্বয়ম্ ব্রহ্ম (এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম) ইহ (এখানে, এই ব্রহ্মে) নানা (বহুত্ব, বিভিন্নতা) কিংচন ন অস্তি (কিছুমাত্র নেই)।

সরলার্থ: পরিপূর্ণ, আদি-অন্ত হীন, অপ্রমেয়, নির্বিকার, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মে এক ছাড়া দুই বা বহুর লেশমাত্র অস্তিত্ব নেই।

ব্যাখ্যা: বলছেন, আত্মজ্ঞান হলে অবস্থাটা কিরকম হয় ? আমি তো জেনেছি অয়ম্-আত্মা ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম কিরকম ? 'পরিপূর্ণম্-অনাদি-অনন্তম্-অপ্রমেয়ম্-অবিক্রিয়ম্'; প্রতিটি বিশেষণ 'অ' দিয়ে শুরু। 'অ' হচ্ছে নেতিবাচক। তিনি কি বলা যায় না, তাই তিনি কি নন বলে তাঁর সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তিনি 'অনাদি-অনন্তম্'—তাঁর আদি নেই, অন্ত নেই। 'অপ্রমেয়ম্'—তাঁর পরিমাপ করা যায় না, তিনি অসীম। আত্মাকে আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আত্মাই তো বস্তু আর সব অধ্যাস। আত্মাকে সরিয়ে দিলে আর কিছু নেই। তারপর বলছেন, 'অবিক্রিয়ম্'—কোনও বিকার নেই। মানে কোনও পরিবর্তন নেই, সব সময় একরকম। সমুদ্র যেমন, 'আপূর্যমাণম্-অচল-প্রতিষ্ঠম্', সব নদীগুলি গিয়ে তার মধ্যে পড়ছে, কিন্তু তার জল

বাড়ছে না কমছেও না। 'একম্-এব-অদ্বয়ং ব্রহ্ম', এক, দুই নেই, অতুলনীয় ব্রহ্ম। কাকে আমরা ব্রহ্ম বলছি ? ব্রহ্ম কথাটার শব্দগত অর্থ হচ্ছে বৃহত্তম। বৃহত্তম কারণ তিনি সর্বব্যাপী। এখন এমনভাবে ব্রহ্ম বলছি যেন আমার থেকে একটা আলাদা বস্তু। কিন্তু আমিই সেই ব্রহ্ম—অহং ব্রহ্মাস্মি। আমাদের সেটা জানতে হবে, আমি পরিপূর্ণ, 'অনাদি-অনন্ত-অপ্রমেয়ম্-অবিক্রিয়ম্'। 'একমেবাদ্বয়ম্ ব্রহ্ম'—এক ব্রহ্ম। এবং আমিই সেই ব্রহ্ম। স্বামীজী বলছেন, দুটো infinity তো হতে পারে না, একটাই infinity। অতএব সব এক। 'ন-ইহ নানা-অস্তি কিংচন'। 'ইহ' মানে এখানে অর্থাৎ ব্রহ্মে। ব্রহ্মে নানা নেই, বহু নেই। 'নেহ নানাস্তি কিংচন'।

সদ্‌ঘনং চিদ্‌ঘনং নিত্যমানন্দঘনমক্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন ॥ ৪৬৫

অন্বয়: সৎ-ঘনং চিৎ-ঘনং নিত্যম্-আনন্দঘনম্-অক্রিয়ম্ (সৎ ও চিৎস্বরূপ নিত্য, আনন্দস্বরূপ ও ক্রিয়াহীন) একম্-এব-অদ্বয়ং ব্রহ্ম ইহ নানা কিংচন ন অস্তি (এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এখানে নানা বলতে কিছু নেই)।

সরলার্থ: ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ, নিত্য, নিষ্ক্রিয়, এক, অদ্বিতীয়। এই ব্রহ্মে নানা বলে কিছু নেই।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'সৎ-ঘনং', 'সৎ' হচ্ছে অস্তিত্ব, সত্তা, existence absolute। 'সৎ-ঘনং'—সত্তামাত্র। এ নয় যে এখানে এক টুকরো ওখানে এক টুকরো। ঘন—homogeneous, একটা অবিমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব। 'চিদ্‌ঘনং', 'চিৎ' মানে চৈতন্য, জ্ঞান। 'চিদ্‌ঘনং'—পূর্ণ অবিমিশ্র জ্ঞান। নিত্যম্—নিত্য, আনন্দঘনম্—আনন্দস্বরূপ। এই আমাদের ব্রহ্ম বা আত্মা। আনন্দ তাঁর স্বরূপ, সৎ-চিৎ-আনন্দ, এই তিনটি আলাদা আলাদা নয়—এক, একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ জিনিস। 'একমেব-অদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন'। এক অদ্বয় ব্রহ্ম, এখানে কোনও নানা নেই।

প্রত্যগেকরসং পূর্ণমনন্তং সর্বতোমুখম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন॥ ৪৬৬

অন্বয়: প্রত্যক্-একরসং (সর্বান্তর ও এক অখণ্ড রসস্বরূপ) পূর্ণম্-অনন্তং সর্বতোমুখম্ (পূর্ণ, অনন্ত ও সর্বব্যাপী) একম্-এব-অদ্বয়ং ব্রহ্ম ইহ নানা কিংচন ন অস্তি (এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এখানে নানার কিছুমাত্র অস্তিত্ব নেই)।

সরলার্থ: সর্বান্তর, এক অখণ্ড রসস্বরূপ, পূর্ণ, অনন্ত সর্বতোবিস্তৃত এক অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন। তাঁর মধ্যে নানাত্বের কোনও অস্তিত্ব নেই।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'প্রত্যক্‌-একরসং পূর্ণম্‌-অনন্তম্‌ সর্বতোমুখম্‌'। 'প্রত্যক্‌', আমার নিকটতম আত্মা, আমার ভেতরে আছেন, বাইরে নয়। 'একরসং', homogeneous, কোনও মিশ্রণ নেই, কতকগুলো টুকরো জুড়ে একটা জিনিস হয়েছে তা নয়; অখণ্ড, 'একরসং'। আমি এই যে দেহটা দেখছি, অনেকগুলো অংশ এক জায়গায় করে হয়েছে কিন্তু আত্মা এক অখণ্ড, কোনও বিভাগ নেই। 'পূর্ণম্‌-অনন্তং সর্বতোমুখম্‌'। তিনি পূর্ণ ও অনন্ত। সর্বব্যাপী তিনি, ওই আকাশের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়। তিনি 'সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ' (শ্বে, ৬।১১), সব প্রাণীর মধ্যে অন্তঃস্থ হয়ে আছেন, গুহাহিত হয়ে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সবাইকে প্রণাম করছেন। সকলের মধ্যে সেই এক আত্মাকে দেখছেন, নারায়ণকে দেখছেন। তিনি সকলের মধ্যে প্রবেশ করে বসে আছেন, হৃদয়গুহায় লুকিয়ে আছেন। প্রত্যক্‌-আত্মা তিনি, আমার নিকটতম। 'পূর্ণম্‌-অনন্তং সর্বতোমুখম্‌'; তিনি পরিপূর্ণ, তাঁর কোনও অভাববোধ নেই। অনন্ত—তাঁর শেষ নেই। 'সর্বতোমুখম্‌', সবার মুখ তাঁরই মুখ, অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপী। 'একম্‌-এব-অদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন', এক অদ্বয় ব্রহ্ম, সেখানে নানা নেই, দুই নেই, শুধু এক। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', সবকিছুই শুধু ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই।

অহেয়মনুপাদেয়মনাধেয়মনাশ্রয়ম্‌।
একমেবাদ্বয়ম্‌ ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন॥ ৪৬৭

অন্বয়: অহেয়ম্‌-অনুপাদেয়ম্‌ (ত্যাজ্য-গ্রাহ্য ভাবশূন্য) অনাধেয়ম্‌ (আধেয়- ভাবশূন্য) অনাশ্রয়ম্‌ (আশ্রয়রহিত) একম্‌-এব-অদ্বয়ং ব্রহ্ম ইহ নানা কিংচন ন অস্তি (এক অদ্বয় ব্রহ্ম, এখানে নানা বলে কিছু নেই)।

সরলার্থ: যাঁকে ত্যাগ করা যায় না, গ্রহণও করা যায় না, যিনি আধেয় নন কোনও কিছুকে আশ্রয় করেও নেই, সেই এক অদ্বয় ব্রহ্মে নানা বলতে কিছু নেই।

ব্যাখ্যা: বলছেন, তিনি 'অহেয়ং', হেয় মানে ত্যাজ্য; হা ধাতু, মানে ত্যাগ করা, তার থেকে হেয়। 'অহেয়ম্‌-অনুপাদেয়ম্‌'; 'উপাদেয়ম্‌' মানে গ্রহণীয়। 'অহেয়ম্‌-অনুপাদেয়ম্‌' মানে অত্যাজ্য ও অগ্রাহ্য। তিনি সকলের মধ্যে আছেন, সব সময় আছেন এবং একমাত্র তিনিই আছেন। তাই তিনি ত্যাজ্যও নন, গ্রাহ্যও নন, তাঁকে ত্যাগও করা যায় না, গ্রহণও করা যায় না। 'অনাধেয়ম্‌-অনাশ্রয়ম্‌'; তিনি আধেয় নন আবার কোন কিছুকে আশ্রয় করেও তিনি নেই। জগতে আমরা দুই দেখি, আধার আর আধেয়, আশ্রয় আর আশ্রিত। আধার হচ্ছে পাত্র আর আধেয় হচ্ছে, তাতে যা রাখা যায়। একটা পাত্রে জল আছে। পাত্রটা আধার বা আশ্রয়। আর জল হলো আঁধেয়। ব্রহ্ম আধারও নন, আধেয়ও নন। তাঁর কোন আশ্রয় নেই। তিনি স্বতন্ত্র, কেবল, এক তিনিই শুধু

আছেন। আধার আবার আধেয়, এই দ্বিত্ব তাঁর নেই। 'পূর্ণস্য পূর্ণম্‌ আদায় পূর্ণম্‌-এব-অবশিষ্যতে', একটার থেকে আর একটা নিচ্ছি, এটা কল্পিত। সবই এক, সব ব্রহ্ম। 'অনাধেয়ম্‌-অনাশ্রয়ম্‌', 'আশ্রয়ম্‌' মানে আধার। এটা আধার, এটা আধেয়, এসব মায়ার জগতের কল্পনা। আসলে আধারও নেই, আধেয়ও নেই, সব এক। কোথাও দুই নেই, বহু নেই, সব এক। তাই বারবার বলছেন, 'একম্‌-এব-অদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন'। এই যে বারবার করে 'অদ্বয়', 'অদ্বয়' বলছেন তার কারণ, এটাই মনের মধ্যে গেঁথে দিতে চাইছেন যে, দুই নেই, শুধু এক।

নির্গুণং নিষ্কলং সূক্ষ্মং নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্‌।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন॥ ৪৬৮

অন্বয়: নির্গুণং (কোনও গুণ নেই) নিষ্কলং (কলা নেই) সূক্ষ্মং (সূক্ষ্ম) নির্বিকল্পং (কোনও বিকল্প নেই) নিরঞ্জনম্‌ (কোনও কালিমা নেই) একম্‌-এব-অদ্বয়ং ব্রহ্ম ইহ নানা কিংচন ন অস্তি (এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এখানে কোনও নানাত্ব নেই)।

সরলার্থ: নির্গুণ, নিষ্কল, অতি সূক্ষ্ম, নির্বিকল্প, নিরঞ্জন, এক অদ্বয় ব্রহ্ম, তাঁর মধ্যে নানা ভাবের লেশমাত্রও নেই।

ব্যাখ্যা: এই যে নানাভাবে বলছেন ব্রহ্ম কিরকম সেটা বলছেন আমাদের স্বরূপটা বোঝাবার জন্যে। আমরা তো আমাদের শরীরটাকেই 'আমি' ভেবে বসে আছি তাই আমাদের এত কষ্ট। আমার স্বরূপটা কি ? 'নির্গুণম্‌'—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের কোনটাই নেই। 'নিষ্কলং'—কোনও কলা নেই, অংশ নেই, অবয়ব নেই, নিরাকার। 'সূক্ষ্মং'—অতি সূক্ষ্ম। 'নির্বিকল্পং'—কোনও বিকল্প নেই। 'নিরঞ্জনম্‌'—অঞ্জন নেই, কোনও মলিনতা নেই, শুদ্ধ। মলিনতা নেই মানে অজ্ঞতা নেই, সবচেয়ে বড় কালিমা তো অজ্ঞান, সেটা নেই। 'একম্‌-এব-অদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন'। এগুলোই কিন্তু আমাদের পরিচয়। ব্রহ্ম কিরকম, বর্ণনা করছেন। কিন্তু ব্রহ্মের পরিচয়ই আমাদের পরিচয়। আমরা আসলে কি, এই তার ছবি। এইভাবে ভাবতে হয়, নিজের এই পরিচয়টা সব সময় মনে রাখতে হয়। আমরা হিন্দুরা বলি 'যা মতি সা গতি'। যেমন ভাবি আমরা, তেমনই হয়ে যাই। তাই সব সময় চিন্তা করতে হয়, ওই যে নিরুপম ব্রহ্ম, আমি তাই। আমি মহান, বিরাট, সর্বভূতে আমি ছড়িয়ে আছি। আমি 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন'। এক আমিই আছি, দুই নেই, বহুত্ব নেই কোন।

অনিরূপ্যস্বরূপং যন্মনোবাচামগোচরম্‌।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন ॥ ৪৬৯

অন্বয়: অনিরূপ্যস্বরূপং (যাঁর স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না) যৎ (যিনি) মনোবাচাম্‌-

অগোচরম্ (বাক্য ও মনের অগোচর) একম্-এব-অদ্বয়ং ব্রহ্ম ইহ নানা কিংচন ন অস্তি (এক অদ্বয় ব্রহ্ম এখানে একটুও নানাত্ব নেই)।

সরলার্থ: যাঁর স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না, যিনি বাক্যমনাতীত, সেই এক অদ্বয় ব্রহ্মের মধ্যে নানা বলে কিছু নেই।

ব্যাখ্যা: তিনি 'অনিরূপ্য স্বরূপং'; তাঁর স্বরূপটা নিরূপণ করা যায় না। বলা যায় না, তিনি এই। তাঁর স্বরূপটা বুঝিয়ে বলা যায় না কারণ দুই নেই তো। দুই থাকলে একটা তুলনা করে বলা যেত তিনি এইরকম। কিন্তু তিনি নিরুপম, কোনও উপমা নেই তাঁর, তিনি অনুপম। 'যৎ-মনোবাচাম্-অগোচরম্'; মন ও বাক্যের অগোচর তিনি। যিনি বাক্য ও মনের অতীত, তাঁর স্বরূপ কি করে বর্ণনা করা যাবে ? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, বলতে তো চাই, বলতে পারি না। আবার বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, ঘি খেলে বোঝা যায় ঘি কেমন। যে ঘি খায়নি, তাকে কি বোঝানো যায় ঘি কেমন ? তাকে বড়জোর বলা যায় : কেমন ঘি ? না, যেমন ঘি। তিনি অনির্বচনীয়। এবং তিনিই আমি। সে-ই আমার স্বরূপ। মনে হয় এ যেন একটা অন্য জগৎ। কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, চলে এসো, নিজের স্বরূপকে চেনো। আমি এইরকম ? অনিরূপ্যস্বরূপং ? মনোবাচাম্-অগোচরম্ ? অবাঙ্-মনসঃ-গোচরম্? ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না, চিন্তা দিয়ে ধরতে পারা যায় না ? এক অদ্বয় ব্রহ্ম, যাঁর মধ্যে বিভিন্নতা একটুও নেই ? এই আমার স্বরূপ ? হ্যাঁ তাই।

সৎসমৃদ্ধং স্বতঃসিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন ॥ ৪৭০

অন্বয়: সৎ (সৎস্বরূপ) সমৃদ্ধং (সর্ব-ঐশ্বর্যসম্পন্ন) স্বতঃসিদ্ধং (নিজেই নিজের প্রমাণ, স্বয়ংপ্রকাশ) শুদ্ধং (নির্মল) বুদ্ধং (বোধস্বরূপ) ন-ঈদৃশম্ (উপমারহিত) একম্-এব-অদ্বয়ং ব্রহ্ম ইহ নানা কিংচন ন অস্তি (এক অদ্বয় এই ব্রহ্মে নানাত্বের লেশমাত্র নেই)।

সরলার্থ: সৎস্বরূপ সর্ব-ঐশ্বর্যবান স্বয়ংসিদ্ধ শুদ্ধ বোধস্বরূপ অনুপম এক অদ্বয় ব্রহ্মে নানাত্বের লেশমাত্র নেই।

ব্যাখ্যা: ব্রহ্মকে বলছেন : 'সৎ সমৃদ্ধং'। 'সৎ'—অর্থাৎ অস্তিত্ব, সত্তা। তিনি একমাত্র সত্তা, যা আছেন। সেই সত্তা সর্বব্যাপী, বহুতে ছড়িয়ে আছেন। উপনিষদে আছে, একো অহং বহুস্যাম্। এক তিনি বহু হয়ে সর্বত্র বিরাজ করছেন, এক সত্তা। 'সমৃদ্ধং'—সর্ব ঐশ্বর্যময়। এখানে ঐশ্বর্য বলতে 'চিৎ' আর 'আনন্দ' বোঝাচ্ছে। তিনি সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। 'স্বতঃসিদ্ধং', এই নয় যে তিনি কোন প্রমাণের অপেক্ষা

করেন। তিনি একাই আছেন। তিনি নিজেই তাঁর প্রমাণ। কেউ তাঁকে সৃষ্টি করেনি, তিনি নিজেই এইরকম হয়েছেন, আপনা-আপনি হয়েছেন। তিনি আছেন বলেই জীব-জগতের প্রকাশ হচ্ছে। তিনি যেন নিজেকে ছড়াচ্ছেন। সেই একই সত্য, নাম-রূপের জন্যে বহু মনে হচ্ছে। 'শুদ্ধং', তাঁর মধ্যে কোনও মলিনতা নেই, নিত্যশুদ্ধ, সব সময় শুদ্ধ। 'বুদ্ধম্'—জ্ঞানস্বরূপ। 'অন্-ঈদৃশম্'—মানে এইরকম আর নেই, নিরূপম। 'একম্-এব-অদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন'। এই কথাটা বারবার বলছেন কারণ মনে গেঁথে দিতে চাইছেন। এক ব্রহ্মই শুধু আছেন। এই ব্রহ্মে বহুত্বের সামান্যতম অস্তিত্বও নেই। এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আমাদের স্বরূপ।

নিরস্তরাগা বিনিরস্তভোগাঃ শান্তাঃ সুদান্তা যতয়ো মহান্তঃ।
বিজ্ঞায় তত্ত্বং পরমেতদন্তে প্রাপ্তাঃ পরাং নির্বৃতিমাত্মযোগাৎ॥ ৪৭১

অন্বয়: নিরস্তরাগাঃ (বিষয়-অনুরাগশূন্য) বিনিরস্তভোগাঃ (বিষয়ভোগবর্জিত) শান্তাঃ সুদান্তাঃ (শম ও দম সম্পন্ন) মহান্তঃ যতয়ঃ (মহান সন্ন্যাসিগণ) এতৎ পরং তত্ত্বং বিজ্ঞায় (এই পরম তত্ত্ব জেনে) অন্তে (শেষকালে) আত্মযোগাৎ (শুদ্ধ আত্মার সঙ্গে যুক্ত থেকে) পরাং নির্বৃতিং প্রাপ্তাঃ (পরমানন্দ প্রাপ্ত হন)।

সরলার্থ: বিষয়-অনুরাগশূন্য, বিষয়ভোগ থেকে উপরত মহান সন্ন্যাসিগণ, যাঁরা ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত করেছেন ও মনকে শান্ত করেছেন, তাঁরা এই পরমতত্ত্ব জেনে আত্মার সঙ্গে যুক্ত থাকেন ও অন্তকালে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

ব্যাখ্যা: এতক্ষণ বলেছেন, ব্রহ্মের স্বরূপ এই আর তুমিই সেই ব্রহ্ম। এখন বলছেন : আত্মজ্ঞান হলে কি কি লক্ষণ ফুটে উঠবে। বলছেন : 'নিরস্তরাগাঃ বিনিরস্তভোগাঃ শান্তাঃ সুদান্তা যতয়ো মহান্তঃ'। 'নিরস্তরাগাঃ', 'রাগ' নিরস্ত হয়ে গেছে। রাগ মানে ক্রোধ নয়, অনুরাগ। আর অনুরাগ থাকলে বিরাগও থাকবে। অনুরাগ আর বিরাগ এই নিয়েই তো জগৎ। কত লোককে ভালোবাসলাম আবার কত লোককে ঘৃণাও করলাম। আত্মজ্ঞান হলে এসব আর থাকবে না। কারণ আমি তো আর দুই দেখছি না, সব এক, তাই রাগ-বিরাগ কিছুই নেই। ভালো লাগা, মন্দ লাগা সব নিরস্ত হয়ে গেছে, সকলের প্রতি আমার সমদৃষ্টি। 'বিনিরস্তভোগাঃ', ভোগের বাসনা, কিছু পাবার জন্যে আকুলি-বিকুলি, তাও 'বিনিরস্ত'—পুরোপুরি থেমে গেছে। 'বি' মানে বিশেষ, 'নি' মানে নিঃশেষে, 'অস্ত' মানে নেই। আমার কিছুই চাই না। কি পেলাম না পেলাম গ্রাহ্য করি না। 'শান্তাঃ সুদান্তাঃ যতয়ঃ মহান্তঃ'; শম-দম সম্পন্ন মহান সন্ন্যাসীরা। শম-দম-কে সাধন-জীবনের সম্পদ বলা হয়। অন্তরের সম্পদ, বাইরের সম্পদ নয়। বাইরের সম্পদের প্রয়োজন আছে কিন্তু মনের সম্পদের আরও বেশী প্রয়োজন। শম, দম,

উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান—এই ষট্ সম্পদ। শম মানে অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মনের দমন আর দম হচ্ছে বহিরিন্দ্রিয় দমন। হিন্দুশাস্ত্র বলে এই চঞ্চল মনকে দমন করব কি করে ? ভালো চিন্তা করে। চিন্তা না করে থাকতে পারি না আমরা, তাই ভালো চিন্তা দিয়ে মনকে ভরিয়ে রাখতে হয়। ঈশ্বর অনুরাগ, ভালো কাজ, ভালো কথা এইসব দিয়ে মনটাকে ভরিয়ে রাখা যাতে ওই ষট্ সম্পদ লাভ করা যায়। এই ছটা সম্পদ যাঁর লাভ হয়েছে তিনি যতি, যোগী তিনি। 'যতয়ঃ মহান্তঃ'—মহান যোগী-সন্ন্যাসীরা। 'বিজ্ঞায় তত্ত্বং'—তত্ত্বকে জেনে। 'তৎ' মানে ব্রহ্ম, সেই 'তৎ' এর জ্ঞান তত্ত্ব। তাঁকে বর্ণনা করা যায় না। তিনি নির্গুণ, নিরাকার, অনির্বচনীয়, বাক্যমনাতীত, তাই তাঁকে 'তৎ' বলা হয়। 'বিজ্ঞায় তত্ত্বং'—তাঁকে জেনে। তাঁকে জানা মানেই তা-ই হওয়া। আমি তো তা-ই। ঢাকা ছিল, ঢাকাটা সরে গেলো, আমি দেখছি, এই আমার স্বরূপ ! এত মহান্ ! এত নির্মল ! 'বিজ্ঞায় তত্ত্বং পরম্-এতৎ'—এই পরম তত্ত্বকে জেনে। 'পরম্' মানে শ্রেষ্ঠ। আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জিনিস, পরমার্থ—যা পেলে আর কিছু পাবার থাকে না। আত্মজ্ঞান লাভ করলে যোগীদের কি হয় ? 'অন্তে প্রাপ্তাঃ পরাং নির্বৃতিম্ আত্মযোগাৎ'—তাঁরা অবশেষে পরম আনন্দ লাভ করেন। 'আত্মযোগাৎ'—জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ হয়ে গেছে বলে তাঁরা এই আনন্দ লাভ করেন। 'প্রাপ্তাঃ পরাং নির্বৃতিম্'—সে আনন্দের তুলনা হয় না, বুঝিয়ে বলা যায় না। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, শ্রেষ্ঠ আনন্দ।

ভবানপীদং পরতত্ত্বমাত্মনঃ স্বরূপমানন্দঘনং বিচার্য।
বিধূয় মোহং স্বমনঃপ্রকল্পিতং মুক্তঃ কৃতার্থো ভবতু প্রবুদ্ধঃ ॥ ৪৭২

অন্বয়: ভবান্-অপি (তুমিও) আত্মনঃ (আত্মার) ইদং পরতত্ত্বং (এই পরম তত্ত্ব) আনন্দঘনং স্বরূপং (আনন্দঘনস্বরূপ) বিচার্য (যুক্তির দ্বারা নিরূপণ করে) স্বমনঃ প্রকল্পিতং মোহং (নিজের মনের কল্পিত মোহ) বিধূয় (ধুয়ে ফেলে) প্রবুদ্ধঃ (আত্মতত্ত্বজ্ঞ) মুক্তঃ (জীবন্মুক্ত) কৃতার্থঃ ভবতু (কৃতার্থ হও)।

সরলার্থ: তুমিও আত্মার এই পরম তত্ত্ব আনন্দঘনস্বরূপ যুক্তির সাহায্যে ধারণা করে আত্মতত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত হয়ে কৃতার্থ হও।

ব্যাখ্যা: আচার্য এবার শিষ্যকে বলছেন, এই আত্মজ্ঞান লাভ তো তুমিও করতে পার। পথ বলে দিয়েছেন, লক্ষ্য বলে দিয়েছেন, তারপর বলছেন : তুমিও তো এই পরমানন্দ পেতে পার। মনে করো না তোমার পক্ষে এ খুব কঠিন। তুমিও পার। এখানে বলছেন, 'ভবান্-অপি আত্মনঃ ইদং পরতত্ত্বং বিচার্য'; তুমিও আত্মার এই পরমতত্ত্ব বিচার করে এগিয়ে যেতে পার। বলছেন, আমি তো এতক্ষণ বললাম তোমাকে, তুমি শুনলে। কিন্তু শুনলে হবে না, তোমায় নিজে চেষ্টা করতে হবে। এটা জেনে রাখো, চেষ্টা

করলে তুমিও এই পরমতত্ত্ব লাভ করতে পার। বুদ্ধদেবও তাই বলতেন, তুমি নিজে বোঝ, আমি বললে হবে না। এ অতি দুর্গম পথ। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া। ক্ষুরধার বিচার অবলম্বন করে এই পথে এগুতে হবে। প্রতি মুহূর্তে নিত্য-অনিত্যের বিচার করতে হবে। বিচার করে বুঝতে হবে, আত্মা 'আনন্দঘন-স্বরূপং'—অবিমিশ্র আনন্দস্বরূপ। জগতের সব আনন্দের মধ্যে দুঃখ মেশানো থাকে। আনন্দের পরেই দুঃখ আসে। এ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। এ আনন্দের কোন ছেদ নেই। বিচার করে এই ধারণাটা দৃঢ় করে নিতে হবে যে, আমি যে লক্ষ্যের দিকে ছুটছি, সেটাই সবচেয়ে বড় আনন্দ। তারপর 'বিধূয় মোহং স্বমনঃ প্রকল্পিতং'। সমস্ত মোহ ধুয়ে ফেলতে হবে। মোহ মানে অজ্ঞান। এ মনের কল্পনা। সব মনের সৃষ্টি। মনের অবভাস (mental projection)। মানুষ মনেই বদ্ধ মনেই মুক্ত। ভালো-মন্দের ধারণা সব মনে। মনটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে শুদ্ধ করে সেই শুদ্ধ মনে জ্ঞান লাভ কর। 'প্রবুদ্ধঃ ভবতু'—প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞান লাভ কর। বলছেন, 'মুক্তঃ কৃতার্থঃ ভবতু প্রবুদ্ধঃ'; জীবন্মুক্ত হয়ে যাও, জ্ঞান লাভ কর, করে কৃতার্থ হও। এত করে তো বলা হলো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কত আনন্দে থাকেন, তুমিও তো পার ঐ আনন্দ পেতে, তুমিও চেষ্টা কর না কেন ? শাস্ত্র সব সময় এই কথা বলেন, এ কারো একচেটিয়া জিনিস নয়। তাঁরা পথ বলে দিচ্ছেন। সেই পথে এগোতে পারলে আত্মজ্ঞান সকলেরই হতে পারে।

সমাধিনা সাধু বিনিশ্চলাত্মনা পশ্যাত্মতত্ত্বং স্ফুটবোধচক্ষুষা।
নিঃসংশয়ং সম্যগবেক্ষিতশ্চেচ্ছ্রুতঃ পদার্থো ন পুনর্বিকল্প্যতে ॥ ৪৭৩

অন্বয়: সমাধিনা (সমাধি সহায়ে) সাধু বিনিশ্চল-আত্মনা (শুদ্ধ অচঞ্চল বুদ্ধি-সহযোগে) স্ফুটবোধচক্ষুষা (পরিস্ফুট জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা) আত্মতত্ত্বং পশ্য (স্বস্বরূপ দর্শন কর) শ্রুতঃ পদার্থঃ (গুরু ও শাস্ত্র মুখে শ্রুত তত্ত্ব) চেৎ (যদি) নিঃসংশয়ং সম্যক্-অবেক্ষিতঃ (নিঃসংশয়ে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি হয়) পুনঃ ন বিকল্প্যতে ([তাহলে] পুনরায় আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না)।

সরলার্থ: নির্বিকল্প সমাধির সহায়ে শুদ্ধ অচঞ্চল বুদ্ধি ও পরিস্ফুট জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা স্বস্বরূপ দর্শন কর। গুরু ও শাস্ত্র মুখে যে তত্ত্ব শুনেছ তার যদি নিঃসংশয়ে পূর্ণ উপলব্ধি হয় তাহলে আর কখনও সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ব্যাখ্যা: 'সমাধিনা সাধু বিনিশ্চল-আত্মনা পশ্য আত্মতত্ত্বং'। এখানে 'সমাধি' বলতে নির্বিকল্প সমাধির কথা বলছেন। 'সাধু' মানে সম্যক্ রূপে, 'বিনিশ্চল-আত্মনা'—মন আর চলছে না, মন আর নেই, এমন অবস্থা। 'পশ্য আত্মতত্ত্বং স্ফুটবোধ-চক্ষুষা'—নিজের আত্মাকে দেখো, আত্মতত্ত্ব বোঝো, জানো। তুমি আত্মস্থ হয়ে আছ, তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে, সেই চোখ দিয়ে এখন তোমার স্বরূপ তুমি দেখো। 'আত্মতত্ত্বং'—

আমার 'আমি'। আমার প্রকৃত আমি, সেটাই আত্মতত্ত্ব। সেই আমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, আয়নায় যেমন নিজের মুখ দেখি। আমি মুগ্ধ হয়ে আমাকে দেখছি, আমার মনটা নড়তে চাইছে না। আমি সমাধি লাভ করেছি, আত্মস্থ হয়ে আছি অর্থাৎ আমি আমাতে আছি। আমি যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম, কোথায় চলে গিয়েছিলাম, এখন আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসেছি। 'সাধু বিনিশ্চল আত্মনা', আমি আর আত্মা থেকে সরে যাচ্ছি না। একবার যদি জ্ঞান লাভ হয় তাহলে আমি আর আত্মা থেকে সরব না, নড়ব না, বিচলিত হব না, ভুল করব না। আগে যেমন এই দেহটাকে সব মনে করেছিলাম এখন আর তা মনে করছি না, এখন বুঝে নিয়েছি আমি কে। চোখে এতদিন ঠুলি বাঁধা ছিল, কি করে দেখব ? এখন ঠুলিটা খুলে পড়ে গেছে। 'স্ফুটবোধ-চক্ষুষা'; আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে। জ্ঞান তো আমার ভেতরে আছে। হঠাৎ চোখ খুলে গেলো গুরুর কৃপায়। আগে এখানে-ওখানে ছটফট করছিলাম, এখন আত্মস্থ হয়ে বসে গেছি। আত্মতত্ত্ব, আমার স্বরূপ আমি দেখতে পাচ্ছি। 'নিঃসংশয়ং'—দ্বিধা নেই, নিশ্চিত প্রত্যয়, হস্তামলকবৎ। 'সম্যক্-অবেক্ষিতঃ'। 'সম্যক্' মানে ঠিক ঠিক, পুরোপুরি। 'সম্যক্-অবেক্ষিত'—পূর্ণভাবে দেখা হয়েছে। নিঃসংশয়ে দেখেছি। এই দেখা আর জানার মধ্যে কোনও তফাত নেই। আমার সমস্ত মন দিয়ে, ইন্দ্রিয়াতীত দৃষ্টি দিয়ে আমি দেখেছি। 'সম্যক্-অবেক্ষিতঃ-চেৎ-শ্রুতঃ পদার্থঃ'। যা শুনেছি তা যদি 'সম্যক্-অবেক্ষিতঃ' হয়, জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে ভালোভাবে দেখা হয়, তাহলে আর কোন সন্দেহ থাকে না। সেই আত্মতত্ত্ব শ্রোতব্য-মন্তব্য-নিদিধ্যাসিতব্য, শুনতে হয়, মনন করতে হয়, তারপর ধ্যানের সাহায্যে জানতে হয়। এখানে যেমন বলছেন, নির্বিকল্প সমাধির সাহায্যে জানতে হয়। গুরু ও শাস্ত্র মুখে যা শুনেছি, তা যখন সমাধিতে উপলব্ধি করি, তখন 'ন পুনঃ বিকল্প্যতে', আর সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকে না।

স্বস্যাবিদ্যাবন্ধসম্বন্ধমোক্ষাৎ সত্যজ্ঞানানন্দরূপাত্মলব্ধৌ।
শাস্ত্রং যুক্তির্দেশিকোক্তিঃ প্রমাণং চান্তঃসিদ্ধা স্বানুভূতিঃ প্রমাণম্॥৪৭৪

অন্বয়: স্বস্য (নিজের) অবিদ্যাবন্ধ-সম্বন্ধমোক্ষাৎ (অবিদ্যাজনিত বন্ধনের সঙ্গে সম্বন্ধ নিবৃত্তির হেতু) সত্য-জ্ঞান-আনন্দরূপ-আত্মলব্ধৌ (সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মার উপলব্ধির জন্যে) শাস্ত্রং যুক্তিঃ দেশিক-উক্তিঃ প্রমাণং (শাস্ত্র, যুক্তি আর তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ প্রমাণ) চ অন্তঃসিদ্ধা স্ব-অনুভূতিঃ প্রমাণম্ (এবং শুদ্ধ অন্তঃকরণে সমাধিসিদ্ধ অনুভূতি প্রমাণ)।

সরলার্থ: নিজের অবিদ্যাজনিত বন্ধন থেকে মুক্তির জন্যে ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধির জন্যে শাস্ত্র, যুক্তি আর তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশকে প্রমাণ বলে ধরা হয়। আর এ-বিষয়ে অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে নিজের শুদ্ধ অন্তঃকরণে সমাধিসিদ্ধ অনুভূতি।

ব্যাখ্যা: আমার যে অবিদ্যার বন্ধন সে বন্ধন থেকে আমি মুক্ত হব কি করে ? আমার স্বরূপ যে সৎ-চিৎ-আনন্দ, সেই জ্ঞান হলেই আমার বন্ধন থেকে মুক্তি। 'স্বস্য-অবিদ্যাবন্ধ-সম্বন্ধমোক্ষাৎ'; অবিদ্যা মানে অজ্ঞান। অজ্ঞানই হচ্ছে বন্ধন অজ্ঞানই হচ্ছে পাপ। তাই বলছেন, 'অবিদ্যাবন্ধ সম্বন্ধ'; অবিদ্যা আমাকে বেঁধে রেখেছে। আমি যেন শিকল বাঁধা হয়ে আছি। এর থেকে আমায় মুক্তি পেতে হবে। আর নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। 'সত্য-জ্ঞান-আনন্দরূপ-আত্মলব্ধৌ'; আমার স্বরূপ হচ্ছে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। এই স্বরূপজ্ঞান যদি হয় তাহলেই আমার অবিদ্যার বন্ধন চলে যাবে। আলো এলেই অন্ধকার পালায়। জ্ঞান হলেই অজ্ঞান পালায়। এই যে জ্ঞান, এ নিত্য জ্ঞান। আমার স্বরূপ নিত্য-সত্য, নিত্য-জ্ঞান, নিত্য-আনন্দ। এগুলি সব নিত্য, পালটায় না। আত্মা তো আনন্দস্বরূপ তাই আত্মাকে জানলে আমার আনন্দের আর ছেদ থাকে না। অবিদ্যার বন্ধন দূর করার আর স্বরূপজ্ঞান লাভের পথ কারা বলে দেবেন ? শাস্ত্র, যুক্তি আর গুরু। আর সবশেষে নিজের অনুভূতির সাথে এঁদের নির্দেশ মিলিয়ে নেব। সব যদি ঠিক ঠিক মিলে যায়, তবে বুঝব, আমি ঠিক পথে চলেছি। বলছেন : 'শাস্ত্রং যুক্তিঃ-দেশিক-উক্তিঃ প্রমাণম্', এই তিনটে জিনিস প্রমাণ। এই তিনটেকে প্রামাণ্য ধরে এগুতে হবে। শাস্ত্র প্রথম। শাস্ত্র বলতে এখানে শ্রুতি বুঝতে হবে। শ্রুতি অপৌরুষেয়, নৈর্ব্যক্তিক। যুগ যুগ ধরে ঋষিরা তপস্যা করেছেন। তাঁদের উপলব্ধি-লব্ধ জ্ঞান তাঁরা দয়া করে রেখে গেছেন, অনাগত মানুষদের জন্যে। শাস্ত্র বলে দিচ্ছেন আত্মজ্ঞান হলে কি অবস্থা হয়। আমি সেটা নিজের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছি। তারপর যুক্তি। শাস্ত্র যা বলেছেন তা বিচার করে মানতে হবে। তারপর বলছেন, 'দেশিক-উক্তিঃ'। আমার গুরু তত্ত্বদর্শী, তাঁর কথা আমি শুনব। তারপর সেটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করব, মনন করব। আবার নিদিধ্যাসিতব্য, আমি সেই কথা নিয়ে ধ্যান করব। তারপরে 'অন্তঃসিদ্ধা স্বানুভূতিঃ প্রমাণম্'; 'স্বানুভূতিঃ'; নিজের অনুভূতি চাই, সেটাই প্রমাণ। 'অন্তঃসিদ্ধা', আমি অন্তরে অন্তরে তাঁকে জেনেছি। আমি আমার অন্তরে একটা রত্ন পেয়েছি, এর যে অনুভব সেটাই আমার প্রমাণ। অবিদ্যার জন্যে আমি এতদিন শিকল দিয়ে বাঁধা ছিলাম। হঠাৎ সেই শিকল খসে পড়ল। কাউকে বলে দিতে হবে কি আমার শৃঙ্খল-মোচন হয়েছে ? না। আমার নিজের অনুভূতিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। শাস্ত্র পড়ে, গুরুর মুখে শুনে আর নিজে বিচার করে যা বুঝেছিলাম, আমার অনুভূতির সঙ্গে তা মিলে গেছে। শ্রুতি, যুক্তি, দেশিকোক্তি আর স্বানুভূতি—সব মিলে গেছে। কাজেই আর সন্দেহ নেই—স্বরূপজ্ঞান হয়ে গেছে আমার। আমি এতদিন অপূর্ণ ছিলাম, এখন পূর্ণ হয়েছি। সব বন্ধন চলে গেছে, এখন আমি মুক্ত। আমি আনন্দে ডুবে আছি।

বন্ধো মোক্ষশ্চ তৃপ্তিশ্চ চিন্তারোগ্যক্ষুদাদয়ঃ।
স্বেনৈব বেদ্যা যজ্জ্ঞানং পরেষামানুমানিকম্॥ ৪৭৫

অন্বয়: বন্ধঃ মোক্ষঃ চ তৃপ্তিঃ চ চিন্তা-আরোগ্য-ক্ষুৎ-আদয়ঃ (বন্ধন, মুক্তি, তৃপ্তি, চিন্তা, রোগমুক্তি, ক্ষুধা ইত্যাদি) স্বেন এব (নিজের দ্বারাই) বেদ্যাঃ (জ্ঞেয়) পরেষাম্ (অন্য ব্যক্তিদের) যৎ জ্ঞানং (এইসব বিষয় যে জ্ঞান) আনুমানিকম্ (তা অনুমান নির্ভর)।

সরলার্থ: বন্ধন, মুক্তি, তৃপ্তি, চিন্তা, আরোগ্য, ক্ষুধা ইত্যাদি আমার নিজের বোঝার জিনিস। এসব বিষয়ে অন্য লোকেদের ধারণা অনুমানের থেকে হয়।

ব্যাখ্যা: বলছেন, কিছু কিছু ব্যাপার আছে, যা একান্তভাবেই আমার, সেটা আমিই শুধু জানি। অপরে সে-সম্বন্ধে যা বলে সে অনুমানকে ভিত্তি করে বলে। তেমনি আত্মজ্ঞান। লোকের মুখে শুনে বা শাস্ত্র পড়ে জ্ঞান লাভ হয় না, নিজে উপলব্ধি করতে হয়। বলছেন, 'বন্ধঃ মোক্ষঃ চ তৃপ্তিঃ চ চিন্তা-আরোগ্য-ক্ষুৎ-আদয়ঃ স্বেন-এব বেদ্যাঃ'; 'বন্ধঃ'—বন্ধন। অন্য কেউ হয়তো বুঝছে না, কিন্তু আমি অনুভব করছি আমি স্বাধীন নই, বদ্ধ। তেমনি মুক্তি, তৃপ্তি, চিন্তা সব আমার নিজের বোঝার ব্যাপার। 'আরোগ্য', রোগ হয়েছিল সেটা যে সেরে গেলো এও আমিই জানি। ক্ষুধা ইত্যাদিও আমার নিজের। খিদে, তেষ্টা এসব আছে কি নেই তা আমিই বুঝি। অন্যে কিছুটা অনুমান হয়তো করতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি বুঝতে পারে না। 'যৎ-জ্ঞানং পরেষাম্-আনুমানিকম্'; যে বন্ধন, মুক্তি, তৃপ্তি, চিন্তা, আরোগ্য বা ক্ষুধা আমার, সে সবের সম্বন্ধে 'পরেষাম্' অর্থাৎ অন্য লোকেদের যে জ্ঞান, তা শুধু 'আনুমানিকম্', অনুমান নির্ভর। এগুলি সম্বন্ধে আমার অনুভূতিই শেষ কথা। আত্মজ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা। আমার ভেতরে যদি একটা আনন্দের হিল্লোল চলে সেটা অন্য লোকে জানতেও পারে আবার নাও জানতে পারে। সেইজন্যে বলছেন, তোমার যে স্বরূপ- জ্ঞান হয়েছে তার প্রমাণ 'স্ব-অনুভূতিঃ'। 'অন্তঃসিদ্ধঃ', তোমার ভেতরে সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। তুমি যে নিত্যমুক্ত এটা কারোর কথার ওপর নির্ভর করছে না, এটা তোমার অন্তরের সিদ্ধান্ত।

তটস্থিতা বোধয়ন্তি গুরবঃ শ্রুতয়ো যথা।
প্রজ্ঞয়ৈব তরেদ্বিদ্বানীশ্বরানুগৃহীতয়া॥ ৪৭৬

অন্বয়: যথা (যেমন) শ্রুতয়ঃ (শ্রুতিবাক্যসমূহ) গুরবঃ (সেইরকম গুরুগণও) তটস্থিতাঃ (সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে) বোধয়ন্তি (বোধ উৎপাদন করেন) বিদ্বান্ (আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ জিজ্ঞাসু ব্যক্তি) ঈশ্বর-অনুগৃহীতয়া (ঈশ্বর-অনুগ্রহ সহায়ে) প্রজ্ঞয়া এব তরেৎ (পূর্ণজ্ঞানের দ্বারাই ভবসাগর পার হয়ে যান)।

সরলার্থ: শ্রুতিবাক্যসমূহ যেমন গুরুরাও তেমনি, পরোক্ষভাবে বোধ উৎপাদন করেন। যিনি জিজ্ঞাসু ও আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ, তিনি ঈশ্বর-অনুগ্রহে পরমজ্ঞান লাভ করেই ভবসাগর পার হয়ে যান।

ব্যাখ্যা: আমার স্বরূপ-জ্ঞান কিরকম জ্ঞান, আর এ জ্ঞান কি করে লাভ করা যায় সেসব কথা গুরু বলছেন, শাস্ত্রও বলছেন। তাঁরা পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন বটে, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারেন না। সেটা আমাকেই করতে হবে। তাঁরা 'তটস্থিতাঃ'। সমুদ্রের তীরে যেন দাঁড়িয়ে আছেন, দ্রষ্টা, সাক্ষী। বলছেন, জলে নেমে পড়। আর এইভাবে সাঁতার কাটো। তাতে আমি সাঁতার শিখতে পারব না, সমুদ্র পারও হতে পারব না। সমুদ্র পার হতে গেলে আমাকেই সাঁতার শিখে সাঁতার কাটতে হবে। গুরু শাস্ত্র এঁরা শুধু পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন। ভবসমুদ্র পার হতে গেলে আমার নিজের অনুভূতি দরকার। 'তটস্থিতাঃ বোধয়ন্তি গুরবঃ শ্রুতয়ঃ যথা'; তাঁরা দূর থেকে পথ দেখাচ্ছেন। গুরু, শাস্ত্র, সবাই পথপ্রদর্শক—দূর থেকে পথ বলে দিচ্ছেন। তাতে সব হবে না। ভবসমুদ্র পার হবার জন্যে দরকার প্রজ্ঞার। সেই প্রজ্ঞা আমাকেই অর্জন করতে হবে। 'প্রজ্ঞা', অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান, প্রকৃষ্ট জ্ঞান, আত্মজ্ঞান। সেই জ্ঞান লাভ করতে হবে। 'প্রজ্ঞয়া-এব তরেৎ-বিদ্বান্-ঈশ্বর-অনুগৃহীতয়া'। 'বিদ্বান্' মানে যিনি প্রকৃত জিজ্ঞাসু, যাঁর মধ্যে এই জন্মেই আত্মজ্ঞান লাভ করার মতো গুণাবলী রয়েছে। বিদ্বান্ প্রজ্ঞা লাভ করে ভবসমুদ্র পার হয়ে যান। 'ঈশ্বর-অনুগৃহীতয়া'— ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা। নিজের সাধনা এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ—এই দুয়ের সাহায্যে তিনি প্রজ্ঞা লাভ করেন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করেন। বলতে চাইছেন, শাস্ত্র পড়ে, গুরুবাক্য শুনে এই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা বৌদ্ধিক ধারণা হবে হয়তো, কিন্তু তাতে তোমার মুক্তি হবে না। তোমার যদি আত্মজ্ঞান হয়, অপরোক্ষ অনুভূতি হয়, তাহলেই তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।

স্বানুভূত্যা স্বয়ং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডিতম্।
সংসিদ্ধঃ সন্ সুখং তিষ্ঠেন্নির্বিকল্পাত্মনাত্মনি॥ ৪৭৭

অন্বয়: স্ব-অনুভূত্যা (নিজের অনুভূতির দ্বারা) অখণ্ডিতম্ (অখণ্ড সর্বব্যাপী) স্বম্-আত্মানম্ (নিজের আত্মাকে) স্বয়ং জ্ঞাত্বা (নিজে জেনে) সংসিদ্ধঃ সন্ (সম্যক্ ভাবে সিদ্ধ হয়ে) নির্বিকল্প-আত্মনা (বিকল্পশূন্য আত্মভাবসহ) আত্মনি সুখং তিষ্ঠেৎ (আত্মায় সুখে অবস্থান করবে)।

সরলার্থ: নিজের অনুভূতির দ্বারা অখণ্ড সর্বব্যাপী নিজ-আত্মাকে নিজে জেনে সম্যগ্‌ভাবে সিদ্ধ হয়ে নির্বিকল্প আত্মভাবে আত্মার মধ্যে সুখে অবস্থান করবে।

ব্যাখ্যা: গুরু এতক্ষণ কি করতে হবে, কিরকম অনুভূতি হয়, এইসব অনেক বলেছেন। এখন শুধু নিজের অনুভূতির কথা বলছেন। ভাবখানা যেন, আর কি বলব ? অনেক

তো বলা হলো। এবার নিজে কর। বলছেন 'স্বানুভূত্যা'—নিজের অনুভূতির দ্বারা। আমাদের শাস্ত্রকে দর্শন বলি আমরা। তার মানে অনুভূতি। এই হাত দিয়ে ধরছি, এরকম অনুভূতি নয়। অতীন্দ্রিয় বোধ। 'স্বানুভূত্যা স্বয়ং জ্ঞাত্বা'—নিজের অনুভূতির দ্বারা, 'স্বয়ং জ্ঞাত্বা', নিজে জেনে। এতদিন শাস্ত্র পড়েছি, গুরুর মুখে শুনেছি, সেগুলি সব করেছি। শাস্ত্র বলছেন, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন, আমি তা করেছি। যাঁরা এ পথের তাঁরা বলে দিয়েছেন এ পথে কিভাবে চলতে হয়। আমি যথাসম্ভব সেভাবে চলেছি। এর পরে আমি শাস্ত্রের কথা গুরুর কথা নিজে উপলব্ধি করেছি। 'স্বয়ং জ্ঞাত্বা', নিজে জেনেছি, নিজে দেখেছি দেখছি। কি দেখছি ? 'স্বম্-আত্মানম্-অখণ্ডিতম্'। কোনও ঝাঁকিদর্শন নয়, সব সময় পূর্ণভাবে তাঁকে দেখছি। দেখছি মানে অনুভব করছি। কাকে অনুভব করছি ? 'স্বম্-আত্মানম্', নিজেকেই অনুভব করছি। 'সংসিদ্ধঃ'—সম্যক্ সিদ্ধ, পরিপূর্ণ হয়ে গেছি। আমি আমার চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হয়েছি। 'আমিই ব্রহ্ম'—এটা বুঝেছি, সেখানে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। আমি ব্রহ্মকে জেনেছি, বুঝেছি, ব্রহ্ম হয়ে গেছি। 'সুখং তিষ্ঠেৎ', আমি সুখ খুঁজছিলাম, সেই সুখ আমি পেয়েছি। পূর্ণ-আনন্দে অবস্থান করছি। 'নির্বিকল্প আত্মনা আত্মনি'। 'নির্বিকল্প'—কোনও বিকল্প নেই। 'আত্মনা-আত্মনি', আমি নিজে নিজের মধ্যে বসে আছি। এতদিন আমার আমিত্ব থেকে সরে ছিলাম, এবার আমার নিজের জায়গায় নিজে এসে গেছি। নিজের মধ্যে আমি ডুবে আছি। এই উপলব্ধি হচ্ছে। এ তো বলা যায় না! শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঘি কিরকম ? না ঘিয়ের মতন। আর কি বলবেন ? যার ব্রহ্মজ্ঞান হয় সে আনন্দে পাগল হয়ে যায়। এত আনন্দ যে ধরে রাখতে পারে না। তাই সে উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, বালকবৎ আচরণ করে।

বেদান্তসিদ্ধান্তনিরুক্তিরেষা ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ।
অখণ্ডরূপস্থিতিরেব মোক্ষো ব্রহ্মাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্ ॥ ৪৭৮

অন্বয়: বেদান্তসিদ্ধান্তনিরুক্তিঃ (বেদান্তের সিদ্ধান্ত ও শেষকথা) এষা (এই) জীবঃ সকলং জগৎ-চ ব্রহ্ম-এব (জীব ও সমগ্র জগৎ ব্রহ্মমাত্র) অখণ্ড-রূপস্থিতিঃ এব মোক্ষঃ (অখণ্ডরূপে আত্মস্বরূপে স্থিতিই মুক্তি) ব্রহ্ম-অদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্ (ব্রহ্ম যে অদ্বিতীয় তার প্রমাণ শ্রুতিবাক্যসমূহ)।

সরলার্থ: বেদান্তের সিদ্ধান্ত ও শেষকথা এই যে জীব ও সকল জগৎ ব্রহ্মমাত্র। অখণ্ডরূপে আত্মস্বরূপে স্থিতিই মুক্তি। ব্রহ্ম যে অদ্বিতীয় তার প্রমাণ শ্রুতিবাক্যসমূহ।

ব্যাখ্যা: বলছেন, বেদান্তের শেষ সিদ্ধান্ত, শেষ কথা খুব সংক্ষেপে বলছি। 'বেদান্ত-সিদ্ধান্তনিরুক্তিঃ-এষা'—বেদান্তের যা সিদ্ধান্ত তা অল্প কথায় বলতে গেলে বলতে হয়

'ব্রহ্ম-এব জীবঃ সকলং জগৎ-চ'। আগে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বলেছেন এখন আবার বলছেন, 'ব্রহ্মৈব জীবঃ', জীব ব্রহ্মই, 'সকলং জগৎ-চ', সব জগৎটাই ব্রহ্ম। কীটপতঙ্গ, পশুপাখী, গাছপালা, মানুষ, দেবদেবী, সবাই ব্রহ্ম। আগে যে বলেছেন, জগৎ মিথ্যা, কোন অর্থে মিথ্যা ? না, এই আছে এই নেই। বেদান্ত ব্যবহারিক অর্থে জগৎ মিথ্যা বলেন না। যেমন, আমরা এখানে আছি, এটা সত্য কিন্তু আপেক্ষিক সত্য, সব সময় তো থাকব না, সেই অর্থে এটা মিথ্যা। ব্রহ্ম সত্য মানে তিনি নিত্যসত্য। তিনি সৎস্বরূপ, তিনি আছেন বলে আমরা আছি। প্রচলিত দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই রজ্জু-সর্প। অন্ধকার রাস্তায় একটা দড়িকে ভেবেছি সাপ। খুব চিৎকার চেঁচামেচি তারপর আলো এলে দেখা গেলো ওটা সাপ নয় দড়ি। সাপটা ততক্ষণ সত্যি, যতক্ষণ আলো আসেনি। জগৎ ততক্ষণ সত্যি বলে মনে হয়, যতক্ষণ জ্ঞান হয়নি। সাপের কল্পনাটা যেমন মিথ্যা এই জগৎটাও তেমনি মিথ্যা। কিন্তু অধিষ্ঠান যে দড়ি সেটা সত্য। তেমনি এই জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মই সত্য। এই জগতে আমরা কত কি দেখছি! কিন্তু সব পালটে পালটে যাচ্ছে। জগৎ চলছে। সংসার সরে সরে যাচ্ছে। দড়িটাকে যেমন অন্ধকারের জন্যে সাপ বলে ভুল হয়েছিল তেমনি জগৎটাকে সত্য ভাবি অজ্ঞানের জন্যে। জ্ঞান হলে তখন এই বৈচিত্রের মধ্যে এক দেখতে থাকি। ধ্যান-জপ করলাম, জ্ঞান হলো, তখন দেখছি জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ। সবাই আমরা ব্রহ্ম, কিন্তু দেহ অংশে নয়, সত্তা অংশে। ব্রহ্ম ছাড়া তো কিছু নেই, তাই জ্ঞান হলে মনে হবে ব্রহ্মময়ং জগৎ। তাই বলছেন, 'সকলং জগৎ-চ'। তখন 'অখণ্ডরূপস্থিতিঃ-এব'। 'অখণ্ড', অর্থাৎ এক সত্তা সর্বত্র বিরাজমান। কোনও ভাগ নেই, একরসঃ, কোনও কিছুর মিশেল নেই, অবিমিশ্র। 'অখণ্ডরূপ স্থিতিঃ-এব মোক্ষঃ'—এই অখণ্ড আত্মস্বরূপে স্থিতিই মুক্তি। 'ব্রহ্ম-অদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্'—ব্রহ্ম যে অদ্বিতীয়, শ্রুতি তার প্রমাণ। জ্ঞান হলে দেখব, আমারও তা-ই অনুভব হচ্ছে। ব্রহ্ম যেন এক বিরাট জলরাশি। আমরা জীব-জগৎ সেই ব্রহ্ম-সমুদ্রে তরঙ্গ, উঠছে নাবছে, কিন্তু সব নিয়ে এক বিশাল সমুদ্র। তরঙ্গগুলো সেই সমুদ্রে মিশে গেলে সব এক। যেমন রজ্জুতে সাপের কল্পনাটা অধ্যাস ছিল তেমনি সেই সমুদ্রে তরঙ্গগুলো অধ্যাস, সেগুলো চলে গেলেই এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। যখন আমরা দেখব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজ করছেন, সর্ব জীবে সর্ব বস্তুতে, তখন আর আমাদের কাছে ভালো-মন্দ, প্রিয়-অপ্রিয় এসব কিছু থাকবে না। তখন সমদৃষ্টি, সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, সুখ-দুঃখ সব সমান।

ইতি গুরুবচনাচ্ছ্রুতিপ্রমাণাৎ পরমবগম্য সতত্ত্বমাত্মযুক্ত্যা।
প্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্মা ক্বচিদচলাকৃতিরাত্মনিষ্ঠিতোঽভূৎ ॥৪৭৯

অন্বয়: প্রশমিতকরণঃ (ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত) সমাহিত-আত্মা (একাগ্রচিত্ত) [শিষ্য]

ইতি (এইভাবে) গুরুবচনাৎ-শ্রুতিপ্রমাণাৎ আত্মযুক্ত্যা (গুরুর উপদেশ, শ্রুতির প্রমাণ ও নিজের বিচারের সহায়ে) ক্বচিৎ (কোনও একান্তস্থানে বিশেষ এক শুভ-মুহূর্তে) সতত্ত্বম্ পরম্ (পরম শ্রেষ্ঠ আত্মস্বরূপ) অবগম্য (উপলব্ধি করে) অচলাকৃতিঃ (স্থির, নিশ্চল আকার) আত্মনিষ্ঠিতঃ (স্বস্বরূপে অবস্থিত) অভূৎ (হয়েছিলেন)।

সরলার্থ: সংযতেন্দ্রিয় একাগ্রচিত্ত শিষ্য এইভাবে গুরুর উপদেশ, শ্রুতিপ্রমাণ ও নিজের বিচারের সাহায্যে কোনও এক শুভ-মুহূর্তে স্বস্বরূপে প্রবিষ্ট হয়ে সমাধি লাভ করেছিলেন ও আত্মচিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে নিশ্চল হয়ে ছিলেন।

ব্যাখ্যা: এবার শিষ্য জ্ঞানলাভ করেছেন। 'গুরুবচনাৎ শ্রুতিপ্রমাণাৎ পরম্-অবগম্য সতত্ত্বম্-আত্মযুক্ত্যা'। গুরু কে হতে পারেন ? যিনি সিদ্ধপুরুষ, যাঁর কিছু পাবার নেই, যিনি শুধু ভালোবেসে শিষ্যের জ্ঞানলাভের উপায় বলে দেন। গুরু যা বললেন, সেই-সব কথা শ্রুতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ও তার সঙ্গে নিজের যুক্তি ও বিচারশক্তি প্রয়োগ করে শিষ্য সমাহিত-চিত্ত হলেন। 'পরম্ অবগম্য সতত্ত্বং'; 'অবগম্য' মানে উপলব্ধি করে। 'পরম্ সতত্ত্বং' মানে যথার্থ আত্মস্বরূপ। শিষ্য তাঁর যথার্থ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। তার আগে শিষ্যকে 'প্রশমিত-করণঃ' হতে হয়েছে। করণ কাকে বলে ? আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে। 'প্রশমিত-করণঃ' মানে যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে শান্ত করেছেন। শিষ্য আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করার আগে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছেন। ইন্দ্রিয় সংযম না হলে আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু লাভ করা যায় না। আর কি ? তিনি 'সমাহিত-আত্মা' হয়েছেন—চিত্তকে একাগ্র করেছেন। ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছেন, চিত্তকে একাগ্র করেছেন, তারপরে 'অচলাকৃতি' হয়ে নিজের স্বরূপের ধ্যান করছেন। পাহাড়কে আমরা অচল বলি। সেইরকম বসে আছেন, পাহাড়ের মতো নিশ্চল আকৃতি। বলছেন : 'আত্মনিষ্ঠিতঃ-অভূৎ'—আত্মচিন্তায় নিবিষ্ট হয়েছেন, স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেছেন। এইভাবে শিষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন। গুরুর কথা, শ্রুতির কথা মন দিয়ে শুনেছেন, সেগুলি নিয়ে মনে-মনে বিচার করেছেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে শান্ত করেছেন, মনকে একাগ্র করেছেন, তারপরে নিশ্চল হয়ে আত্মধ্যানে মগ্ন হয়েছেন। তারপরে কোন এক শুভ-মুহূর্তে, 'ক্বচিৎ', তাঁর উপলব্ধি হয়ে গেলো তিনি ব্রহ্ম। এরকমই হয়। চেষ্টা করে যেতে হয়, লেগে থাকতে হয়। তারপর যখন হয়, হঠাৎই অপরোক্ষ অনুভূতি হয়ে যায়।

কিংচিৎ কালং সমাধায় পরে ব্রহ্মণি মানসম্।
উত্থায় পরমানন্দাদিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৪৮০

অন্বয়: কিংচিৎ কালং (কিছুকাল) সমাধায় পরে ব্রহ্মণি মানসম্ (পরব্রহ্মে মনকে সমাহিত

করার পর) উত্থায় (সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে) পরম্-আনন্দাৎ (পরম-আনন্দ থেকে) ইদং বচনম্-অব্রবীৎ (এই কথা বলেছিলেন)।

সরলার্থ: কিছুকাল পরব্রহ্মে মনকে সমাহিত করার পর সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে পরমানন্দের অনুভব থেকে তিনি এই রকম কথা বলেছিলেন।

ব্যাখ্যা: শিষ্য সমাধি লাভ করেছেন। তারপর সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হচ্ছেন। কিন্তু এখনও যেন মনটাকে পরব্রহ্মে ধরে রেখেছেন। এখন সবিকল্প অবস্থা, সিঁড়ি দিয়ে যেন নামছেন। অদ্বৈত ভূমি থেকে দ্বৈত ভূমিতে নেমে আসছেন। 'কিংচিৎ কালং সমাধায় পরে ব্রহ্মণি মানসম্'—কিছুকাল মনটাকে তিনি পরব্রহ্মে সমাহিত করে রেখেছিলেন। তারপর 'উত্থায়'—সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে, উঠে এসে, 'পরমানন্দাৎ ইদম্ বচনম্ অব্রবীৎ'—পরমানন্দের অনুভব থেকে গুরুকে এইসব কথা বলেছিলেন। কি বলেছিলেন, পরের কয়েকটা শ্লোকে দেখতে পাব।

বুদ্ধির্বিনষ্টা গলিতা প্রবৃত্তির্ব্রহ্মাত্মনোরেকতয়াধিগত্যা।
ইদং ন জানেঽপ্যনিদং ন জানে কিং বা কিয়দ্বা সুখমস্ত্যপারম্॥ ৪৮১

অন্বয়: ব্রহ্ম-আত্মনোঃ (ব্রহ্ম ও জীবাত্মার) একতয়া অধিগত্যা (একত্ব বোধে প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে) বুদ্ধিঃ বিনষ্টা (মন-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে) প্রবৃত্তিঃ গলিতা (বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ-জনিত প্রবৃত্তি গলে গেছে) ইদং (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে) ন জানে (জানছি না) অপি অনিদং (ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়ও) কিংবা কিয়ৎ বা (কি বা কতটাই বা) ন জানে (জানছি না) অপারম্ সুখম্ অস্তি (শুধু অপার সুখ আছে)।

সরলার্থ: আত্মার সঙ্গে ব্রহ্মের একত্ব অনুভবের ফলে মন-বুদ্ধি সব নষ্ট হয়ে গেছে। বিষয়বাসনা-জনিত যে প্রবৃত্তি তা গলে গেছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎকে জানতে পারছি না। ইন্দ্রিয়ের অগোচর যা কিছু , তা-ই বা কি বা কতটা, কিছুই জানছি না। শুধু অপার সুখের অনুভূতি আছে।

ব্যাখ্যা: শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। সমাধিতে পরমানন্দে ছিলেন। সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে সেই পরমানন্দের অনুভূতি থেকে শিষ্য গুরুকে কয়েকটি কথা বলছেন। বলছেন : 'বুদ্ধিঃ-বিনষ্টা'—আমার মন-বুদ্ধি কিছুই আর নেই, নষ্ট হয়ে গেছে। মনের কাজ সঙ্কল্প-বিকল্প। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা, সে ঠিক করে দেয় কি করতে হবে। মন-বুদ্ধি সব নষ্ট হয়ে গেছে। 'গলিতা প্রবৃত্তিঃ'; আমার কত প্রবৃত্তি ! এ সব গলে গেছে। নেই আর। কি করে এরকম হলো ? 'ব্রহ্ম-আত্মনোঃ-একতয়া অধিগত্যা'—ব্রহ্ম আর আত্মার একত্ব 'অধিগত্যা', জেনে, জানার ফলে। এই একত্ব বোধের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আমার রাগ-অভিমান, হিংসা-ভালোবাসা, সবকিছু চলে গেছে। আগে মনে করতাম

ব্রহ্ম আর আত্মা আলাদা এখন আর তা মনে হচ্ছে না। এখন, 'ইদং ন জানে', যাকে 'ইদং' বলা হয় সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে আমি জানি না। আবার 'অনিদং'-কেও জানি না। ওই যে 'অনিদং', ইন্দ্রিয়ের অগোচর সব পরোক্ষ বস্তু, তাও জানি না। কি, কতটা, এসব কিছু জানি না। সব এক হয়ে গেছে। তাই এটা নেই, ওটা নেই, এটা কি, কতটা, এসব কিছু আমি আর বুঝতে পারছি না। সব অখণ্ড দেখছি, তাই কোনও ভাগ করতে পারছি না। আমার কাছে শুধু 'সুখম্-অস্তি-অপারম্'—অপার সুখ শুধু। শুধু আনন্দ, অসীম আনন্দ। এছাড়া আর কোন বোধ নেই। গুরুকে বলছেন, আমার এইরকম অনুভব হচ্ছে। কাকে বলবেন ? কে বুঝবে ? যিনি নিজে বুঝেছেন তিনিই শুধু বুঝবেন ! তাই গুরুকে বলছেন।

বাচা বক্তুমশক্যমেব মনসা মন্তুং ন বা শক্যতে
স্বানন্দামৃত-পূরপূরিত-পরব্রহ্মাম্বুধের্বৈভবম্।
অম্ভোরাশিবিশীর্ণবার্ষিকশিলাভাবং ভজন্ মে মনো
যস্যাংশাংশলবে বিলীনমধুনানন্দাত্মনা নির্বৃতম্॥ ৪৮২

অন্বয়: স্ব-আনন্দ-অমৃত-পূর-পূরিত-পরব্রহ্ম-অম্বুধেঃ (আত্মানন্দের অমৃতে পরিপূর্ণ পরব্রহ্ম-সমুদ্রের) বৈভবম্ (ঐশ্বর্য) বাচা বক্তুম্ অশক্যম্ এব (ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করতেই অক্ষম) বা মনসা মন্তুং ন শক্যতে (আর মন দিয়ে ধারণা করতেও অশক্ত) মে মনঃ (আমার মন) অম্ভোরাশি-বিশীর্ণ-বার্ষিক-শিলাভাবং ভজৎ (বর্ষাকালে শিলাবৃষ্টির শিলা যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে সমুদ্রের জলরাশিতে পড়ে মিশে যায় [সেইরকম]) যস্য অংশ-অংশ-লবে বিলীনম্ (ব্রহ্মসাগরের অংশের অংশের কণামাত্রে বিলীন হয়ে) অধুনা (এখন) আনন্দ-আত্মনা (আনন্দস্বরূপ আত্মাসহ) নির্বৃতম্ (পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়ে আছে)।

সরলার্থ: আত্মানন্দের অমৃতে পূর্ণ পরব্রহ্ম-সমুদ্রের ঐশ্বর্য আমি ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করতে অক্ষম, মন দিয়েও তা ধারণা করতে পারছি না। বর্ষাকালে শিলাবৃষ্টির বিচ্ছিন্ন শিলা যেমন সমুদ্রের জলে পড়ে তার সঙ্গে মিশে যায়, তেমনি আমার মন ব্রহ্মসাগরের অংশের অংশের কণামাত্রে লীন হয়ে গেছে। এখন আমি আনন্দস্বরূপ আত্মায় পূর্ণ, পরিতৃপ্ত হয়ে আছি।

ব্যাখ্যা: শিষ্য বলছেন, এই অনুভূতি যে কি তা আমি কথা দিয়ে বলতে পারি এমন ক্ষমতা নেই। 'বাচা বক্তুম্-অশক্যম্-এব মনসা মন্তুং ন বা শক্যতে'। ভাষা দিয়ে বলার শক্তি নেই, মন দিয়েও চিন্তা করতে পারছি না। ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি, এ তো বাক্যমনাতীত ! যতঃ বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। যতঃ—যার কাছ থেকে ভাষা ফিরে আসে কিছু না পেয়ে, মনও ফিরে আসে। বাক্য-মনের ক্ষমতার তো সীমা

আছে, কিন্তু ব্রহ্ম অসীম। সসীমবস্তু দিয়ে অসীমকে কি করে ধরব ? 'মনসা মন্তুং ন বা শক্যতে'—মন দিয়ে যে তাঁর ধারণা করব তাও পারছি না। 'স্ব-আনন্দ-অমৃত'; 'স্বানন্দ', আমার আনন্দ আর আমার স্বরূপ, এদুটো আলাদা নয় কিন্তু। 'স্বানন্দ-অমৃত পূরপূরিত পরব্রহ্ম অম্বুধেঃ', সেই আত্মানন্দে পরিপূর্ণ পরব্রহ্ম সমুদ্রের ঐশ্বর্যে আমি পূর্ণ হয়ে আছি। saturated হয়ে আছি, পরিপৃক্ত হয়ে আছি আনন্দে। এমন আনন্দ যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। আমি সেই পরব্রহ্ম হয়ে গেছি। আমি আর নেই, তাঁর সঙ্গে আমি এক হয়ে গেছি। 'অম্ভোরাশি বিশীর্ণ বার্ষিক শিলাভাবং', বর্ষাকালে শিলাবৃষ্টির সময় শিলার টুকরোগুলো যেমন সমুদ্রে ঝরে পড়ে মিশে যায়, তেমনি 'ভজৎ মে মনঃ', আমার মনও যেন ব্রহ্ম-সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে গেছে। 'যস্য-অংশাংশলবে বিলীনম্'; যাঁর অংশের অংশের একটা কণাতেও আমি যেন মিশে যাচ্ছি। তাতেই আমার পূর্ণতা, পরিতৃপ্তি। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মানন্দ-সাগরের একটুও যদি পাই তাহলেও খুব আনন্দ। যখন আমি তাঁর সঙ্গে মিশে যাই তখনকার আনন্দ আমি বলতেও পারছি না, মনের মধ্যে ধারণায়ও আনতে পারছি না। কিন্তু সেই ব্রহ্মানন্দ-সাগরের ছিটেফোঁটার দিকেও যখন যাচ্ছি তখন ওই শিলাবৃষ্টির শিলা যেমন সমুদ্রে পড়ে তার সঙ্গে মিশে যায় সেইরকম আমার মন ব্রহ্ম-সমুদ্রের জলে পড়ে বিলীন হয়ে যায়। তখন কি হয় ? 'আনন্দ-আত্মনা নির্বৃতম্'—আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই। তখন আমি পরিতৃপ্ত, 'নির্বৃতম্'। আমার আর কোনও অভাববোধ নেই। পরিপূর্ণ।

ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্ ॥ ৪৮৩

অন্বয়: ইদং জগৎ ক্ব গতং (এই জগৎ কোথায় চলে গেলো) কেন বা নীতং (কার দ্বারাই বা অন্যত্র নীত হলো) কুত্র লীনম্ (কোথায় লয় হয়ে গেলো) অধুনা এব (এখনই) ময়া দৃষ্টং (আমার দ্বারা দৃষ্ট ছিল) ন অস্তি (নেই) কিং মহৎ অদ্ভুতম্ (কী মহা আশ্চর্য ব্যাপার)।

সরলার্থ: এই জগৎ কোথায় চলে গেলো ? কে নিয়ে গেলো ? কোথায় লীন হয়ে গেলো ? একটু আগেই যে জগৎ দেখেছিলাম এখন তা আর নেই। কী মহা আশ্চর্য ব্যাপার !

ব্যাখ্যা: শিষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন। বলছেন : 'ক্ব গতং'—এই জগৎ কোথায় গেলো ? 'কেন বা নীতং'; কে একে নিয়ে গেলো ? আমার চোখের সামনে দিয়ে কে জগৎটাকে সরিয়ে নিয়ে গেলো ? তার মানে এই নয় যে জগৎটা নেই। আমি জগৎকে জগৎ বলে দেখছি না। জগৎকে 'আমি' বলে দেখছি। এই তফাত। দুই দেখছি না, এক দেখছি। মানে আমি ছাড়া আর কিছু নেই। আমি আমাকেই দেখছি, সবকিছু আমার মধ্যে ডুবে গেছে। ব্রহ্মানন্দ-লাভ যে করেছে সেই জানে এই অবস্থাটা কিরকম। বলতে

তো পারা যায় না, তবু আকারে-ইঙ্গিতে যতটুকু বোঝানো যায়। আমরা বহু দেখি কেন ? এক সত্তা, নাম-রূপের জন্যে বহু দেখছি। জলচন্দ্রবৎ। এক চাঁদ, জলে অনেক ছায়া পড়েছে বলে অনেক চাঁদ দেখছি। যতক্ষণ 'দুই' আছে, ততক্ষণ ভোক্তা আছে ভোগ্য আছে, দ্রষ্টা আছে দৃশ্য আছে, জ্ঞেয় আছে জ্ঞাতা আছে। সব যখন এক হয়ে গেছে তখন ভোগ্য আর ভোক্তা, দৃশ্য আর দ্রষ্টা এক হয়ে গেছে, জ্ঞেয় জ্ঞাতা এক হয়ে গেছে। আমি ক্ষুদ্র ছিলাম বৃহৎ হয়ে গেছি। জগৎকে আর আলাদা করে দেখছি না। সেই জগৎটা কোথায় গেলো যেটা নিয়ে এত মাতামাতি করেছি ? 'ক্ব গতং'—কোথায় গেলো ? 'কেন বা নীতং'—কার দ্বারা নীত হলো ? কে নিয়ে গেলো ? 'কুত্র লীনম্-ইদং জগৎ'—কোথায় লীন হয়ে গেলো এই জগৎ ? ব্রহ্ম ছাড়া কিছু দেখছি না তো ! এই যে বৈচিত্রময় জগৎ, এত আকর্ষণ, এত ঘটনাপ্রবাহ, যার পেছনে ছুটছিলাম, সেটা কোথায় লীন হয়ে গেলো ? 'অধুনা-এব ময়া দৃষ্টং'—একটু আগেও তো এই জগৎটাকে দেখেছি ! এর সঙ্গে কত বোঝাপড়া হয়েছে, কত সুখ-দুঃখের আদান-প্রদান হয়েছে, সেটা নেই তো এখন ! কি অদ্ভুত ব্যাপার !

কিং হেয়ং কিমুপাদেয়ং কিমন্যৎ কিং বিলক্ষণম্।
অখণ্ডানন্দ-পীযূষপূর্ণে ব্রহ্মমহার্ণবে।। ৪৮৪

অন্বয়: অখণ্ড-আনন্দ-পীযূষপূর্ণে ব্রহ্ম-মহা-অর্ণবে (অখণ্ড-আনন্দরূপ অমৃতপূর্ণ ব্রহ্ম-মহাসমুদ্রে) হেয়ং কিং (কীই বা ত্যাজ্য) উপাদেয়ং কিং (কীই বা গ্রাহ্য) কিম্-অন্যৎ (অন্যই বা কি আছে) বিলক্ষণম্ কিম্ (ভিন্নই বা কি থাকতে পারে) ?

সরলার্থ: অখণ্ড-আনন্দরূপ অমৃতপূর্ণ ব্রহ্ম-মহাসাগরে ত্যাজ্যই বা কী, গ্রাহ্যই বা কী ? আত্মা থেকে অন্য আর কি আছে ? আত্মার থেকে পৃথক বস্তু কীই বা থাকতে পারে ?

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'কিং হেয়ং কিমুপাদেয়ং কিম্-অন্যৎ কিং বিলক্ষণম্'। আমাদের এই জগতে কি হয় ? যেটা ভালো সেটা নিই, যেটা মন্দ সেটা ত্যাগ করি। ত্যাজ্য, গ্রাহ্য। যদি না চাই তাহলে সেটা হেয় বা ত্যাজ্য। আর যদি চাই তাহলে সেটা উপাদেয় বা গ্রাহ্য। যখন ব্রহ্মোপলব্ধি হলো, তখন আমি দেখছি সব ব্রহ্ম—ভালোটাও ব্রহ্ম, মন্দটাও ব্রহ্ম। তখন আর হেয়-উপাদেয় থাকে না, ত্যাজ্য-গ্রাহ্য থাকে না। সব ব্রহ্ম, সব আমি, কারণ আমিই ব্রহ্ম এটা আমি জেনে গেছি। তখন সুখ-দুঃখ নেই, রাগ-বিরাগ নেই, আকর্ষণ নেই, বিকর্ষণও নেই। আমি একা কিন্তু আমি সব, আমি অখণ্ড। 'কিম্-অন্যৎ কিং বিলক্ষণম্'; এটা একটু অন্যরকম, এটা আলাদা, এসব কিছু নেই। আমার কাছে দুই নেই, তাই অন্য বলে কেউ নেই। 'কিং বিলক্ষণম্', আলাদা কিছু নেই, বিকল্প কিছু নেই। আমার অবস্থাটা কিরকম ? 'অখণ্ড-আনন্দ-পীযূষপূর্ণে ব্রহ্মমহার্ণবে'; অখণ্ড আনন্দের অমৃত দ্বারা পূর্ণ ব্রহ্মরূপ মহাসাগরে আমি ডুবে আছি। আমি ব্রহ্মই হয়ে

গেছি। যে ব্রহ্মকে জেনেছে সে ব্রহ্মই হয়ে গেছে। আমি তো আগে ব্রহ্মকে দেখছিলাম না, বহু দেখছিলাম, নাম-রূপের বৈচিত্র দেখছিলাম, উপাধি দেখছিলাম। এখন উপাধি মুছে গেছে, শুধু ব্রহ্ম আছেন, ব্রহ্মসাগরে নিমজ্জিত হয়ে আছি। অখণ্ড আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে আছি, নিরন্তর আনন্দ, কোনও ছেদ নেই সেই আনন্দের।

ন কিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেদ্ম্যহম্।।
স্বাত্মনৈব সদানন্দরূপেণাস্মি বিলক্ষণঃ ।। ৪৮৫

অন্বয়: অহম্ (আমি) অত্র (এখানে) কিঞ্চিৎ ন পশ্যামি (কিছুই দেখছি না) ন শৃণোমি (শুনছি না) ন বেদ্মি (জানছি না) বিলক্ষণঃ (ভেদশূন্য) [আমি] স্ব-আত্মনা এব (স্বীয় আত্মায়) সদানন্দরূপেণ অস্মি (সদানন্দরূপে আছি) ।

সরলার্থ: আমি এখানে কিছুই দেখছি না, শুনছি না, জানছি না। ভেদশূন্য আমি সদানন্দরূপে নিজের আত্মায় বসে আছি।

ব্যাখ্যা: কিরকম একটা অবস্থার কথা বলছেন ! আমি একটা অখণ্ড আনন্দের সমুদ্রে আছি, আমি ছাড়া আর কেউ নেই, আমি সেই ব্রহ্মরূপ মহান সমুদ্রে ডুবে আছি। 'ন কিঞ্চিৎ-অত্র পশ্যামি'—কিছু দেখছি না। দুই থাকলে তো দেখব। দ্রষ্টা আর দৃশ্য এই দুটি বস্তু এক হয়ে গেছে। সব এক হয়ে গেলে কে কাকে দেখে ? 'ন শৃণোমি'—শুনতেও পাচ্ছি না। 'ন বেদ্মি অহং'—আমি জানতেও কিছু পারছি না। কি করে শুনব ? একটা শব্দ হবে, তার শ্রোতা থাকবে, দুই থাকবে, তবে তো শুনতে পাব। কিছু জানতেও পারছি না, জ্ঞাতা জ্ঞেয় দুই থাকলে তো জানব। সব এক হয়ে গেছে। কে কাকে দেখে, কে কি শোনে, কে কি জানে ? যদি দুই থাকে, তাহলে এগুলি সম্ভব হয়। কিন্তু দুই তো নেই, আমি এক, সব আমি; কাকে দেখব ? কোন শব্দ শুনব ? কি বুঝব ? 'স্বাত্মনা-এব সদানন্দরূপেণ-অস্মি বিলক্ষণঃ'। আমিই সদা-আনন্দ স্বরূপ, 'বিলক্ষণঃ', আমার বিকল্প নেই, ব্যতিক্রম নেই, নিরন্তর আনন্দ। সকালে আনন্দ করছি বিকেলে কাঁদছি, তা নয়। এত আনন্দ যেন ধারণ করতে পারছি না। বলছেন, 'আত্মনা-এব সদানন্দ'; আমার মধ্যেই আমি আনন্দে ভরপুর হয়ে আছি। আমার আনন্দের উৎস বাইরে নয়, ভেতরে। ভেতর থেকে আনন্দ সব সময় উথলে উঠছে। বাইরে কিছু নেই, সব ভেতরে। তাই আমরা চোখ বুজে ধ্যান করি। 'যা পাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।' এসব তো বোঝানো যায় না, যে বোঝে সে বোঝে। 'যঃ পশ্যতি স পশ্যতি' (গী, ১৩।২৮)।

নমো নমস্তে গুরবে মহাত্মনে বিমুক্তসঙ্গায় সদুত্তমায়।
নিত্যাদ্বয়ানন্দরসস্বরূপিণে ভূম্নে সদাপারদয়াম্বুধাম্নে।। ৪৮৬

অন্বয়: অপারদয়া-অম্বু-ধাম্নে (অপার দয়াসমুদ্রস্বরূপ) ভূম্নে (ভূমির মতো ব্যাপক) নিত্য-অদ্বয়-আনন্দ-রসস্বরূপিণে (নিত্য, অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ) বিমুক্তসঙ্গায় (আসক্তি-বর্জিত) সৎ-উত্তমায় (সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) মহাত্মনে গুরবে তে নমঃ নমঃ (হে মহাত্মা গুরু, তোমাকে বারবার নমস্কার করি)।

সরলার্থ: অপার দয়ার সাগর, ভূমির মতো ব্যাপক, নিত্য, অদ্বয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, হে গুরুদেব, তুমি সম্পূর্ণভাবে আসক্তিশূন্য, সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ, তুমি মহাত্মা, তোমাকে বারবার নমস্কার করি।

ব্যাখ্যা: এবার গুরুবন্দনা। গুরুকৃপায় তো সমাধিলাভ হয়েছে, তাই শিষ্য বারবার গুরুকে নমস্কার জানাচ্ছেন। বলছেন, 'নমঃ নমস্তে গুরবে মহাত্মনে'; তুমি মহাত্মা, সাধারণ মানুষ নও। হে গুরুদেব, তোমায় বারবার নমস্কার করছি। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন আর কেউ পারেন না। তাই বলছেন, তুমি মহাত্মা। 'বিমুক্ত- সঙ্গায় সৎ-উত্তমায়'; সঙ্গ মানে আসক্তি। তুমি কিরকম ? 'বিমুক্তসঙ্গায়', তোমার সব আসক্তি চলে গেছে, তুমি কিছুই চাও না। বলছেন, হে প্রভু, তুমি মহাত্মা, তুমি মুক্তপুরুষ, আসক্তিশূন্য। আর কি ? তুমি ভালোর মধ্যেও সবচেয়ে ভালো, 'সৎ-উত্তমায়'—সৎ ব্যক্তিদের মধ্যেও উত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষ বড় হয় কিসে ? বিদ্যায়, ঐশ্বর্যে, ক্ষমতায় ? না। চরিত্রে। ভারতবর্ষে আমরা তাঁদেরই পুজো করি, যাঁরা চরিত্রবলে মহৎ। গুরু তিনিই, যিনি চরিত্রবান, শ্রেষ্ঠ মানুষদের মধ্যে অগ্রগণ্য। 'নিত্য-অদ্বয়-আনন্দরসস্বরূপিণে'; 'অদ্বয়'—দুই নেই এক, 'আনন্দরসস্বরূপ' —নিরন্তর আনন্দ, যে আনন্দের কোনও ছেদ নেই। গুরুকে স্বয়ং ঈশ্বর মনে করা হয়। আমরা বলি 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবমহেশ্বর গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ'। বলছেন, তুমি তো ব্রহ্মকে জেনেছ, ব্রহ্ম হয়ে গেছ। তাহলে তুমি নিত্য, কারণ তুমি ব্রহ্ম। তাই তুমি অদ্বয়, তোমার জুড়ি নেই, তোমার দ্বিতীয় নেই। তুমি 'আনন্দরসস্বরূপিণে'— সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। 'ভূম্নে'—তুমি ভূমির মতো, পৃথিবীর মতো বিরাট, সর্বব্যাপী। 'সদা-অপারদয়া-অম্বুধাম্নে'—তুমি দয়ার সাগর, কৃপাসমুদ্র। গুরুই তো সব দেন। দরজা খুলে দেন। দরজায় শিকল লাগানো আছে, ছোট ছেলে বা মেয়ে হাত পাচ্ছে না তাই মা যেমন শিকলটা খুলে দেন, তেমনি গুরু আমাদের অন্তরের দরজাটা খুলে দেন। ভাবটা যেন, যা ভেতরে যা, নেবার যা তা নিয়ে নে। তিনি 'ভূরিদা জনাঃ'। স্বামীজী বলছেন, অন্নদান ভালো, বিদ্যাদান তার থেকে ভালো, কিন্তু জ্ঞানদান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান দানই শ্রেষ্ঠ দান। এ যিনি দেন তাঁকে বলা হয় 'ভূরিদা'—শ্রেষ্ঠ দাতা। সেই গুরুকে আর কি দিতে পারেন শিষ্য ? তাই পরম শ্রদ্ধায় বারবার প্রণাম জানাচ্ছেন।

যৎকটাক্ষ-শশি-সান্দ্রচন্দ্রিকা-পাতধূত-ভবতাপজশ্রমঃ।
প্রাপ্তবানহমখণ্ডবৈভবানন্দমাত্মপদমক্ষয়ং ক্ষণাৎ।। ৪৮৭

অন্বয়: যৎ-কটাক্ষ শশিসান্দ্রচন্দ্রিকাপাত-ধূত-ভবতাপজ-শ্রমঃ (যাঁর কৃপাদৃষ্টি চন্দ্রের ঘনীভূত কিরণের মতো সংসারের তাপজনিত সমস্ত কষ্ট ধুয়ে দিয়েছে) [আর] অহং (আমি) অখণ্ড-বৈভব-আনন্দম্-অক্ষয়ং-আত্মপদম্ (অখণ্ড ঐশ্বর্যরূপ আনন্দস্বরূপ আত্মপরিচয়) ক্ষণাৎ প্রাপ্তবান (ক্ষণেকের মধ্যেই পেয়ে গেছি) [তাঁকে বারবার প্রণাম করি]।

সরলার্থ: যাঁর কৃপাদৃষ্টি চন্দ্রের ঘনীভূত নির্মল, স্নিগ্ধকর কিরণের মতো সংসারের তাপজনিত আমার সমস্ত ক্লেশ ধুয়ে দিয়েছে আর আমি অখণ্ড ঐশ্বর্যরূপ আনন্দস্বরূপ আমার আত্মপরিচয় ক্ষণেকের মধ্যে পেয়ে গেছি সেই গুরুদেবকে বারবার প্রণাম করি।

ব্যাখ্যা: গুরুকৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, তাই শিষ্য বারবার গুরুকে প্রণাম জানাচ্ছেন, শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। বলছেন, তুমি একবার আমার দিকে তাকিয়েছ তাতেই আমার সব মলিনতা ধুয়ে গেছে, সংসারের সব তাপ জুড়িয়ে গেছে। 'যৎকটাক্ষশশিসান্দ্রচন্দ্রিকা'; 'সান্দ্র' মানে ঘন। বলছেন, যাঁর কটাক্ষ চাঁদের যে ঘনীভূত আলো সেইরকম। তিনি একবার আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, সেই কটাক্ষ 'ধূত'—ধুয়ে দিয়েছে। কি ধুয়ে দিয়েছে ? 'ভবতাপজশ্রমঃ'; সংসারের তাপ থেকে উদ্ভূত যত কষ্ট সব ধুয়ে দিয়েছে। বলছেন, গুরুর যে কটাক্ষ তা চন্দ্রের কিরণের মতো, সবকিছু স্নিগ্ধ করে দেয়। সেই কটাক্ষ আমার সংসারতাপজ্বালা ধুয়ে দিয়েছে। 'প্রাপ্তবান্-অহম্-অখণ্ড বৈভব'; গুরুর কৃপায় আমি 'অখণ্ড বৈভব' পেয়েছি। অনন্ত সম্পদ পেয়ে গেছি। এই সম্পদ কোন স্থূল জিনিস নয়। এ হলো 'আত্মপদম্'—আনন্দস্বরূপ আমার আত্মা। আমি নিজেকে জেনেছি, আত্মজ্ঞান লাভ করেছি। এই হলো পরম বৈভব যা গুরুকৃপায় পেয়েছি। এই জ্ঞান 'অক্ষয়ং'—এর কোনও ক্ষয় নেই। আমি পরমানন্দে নিজের মধ্যে নিজে শান্ত হয়ে বসে আছি। কি করে পেয়েছি এই জ্ঞান ? 'ক্ষণাৎ'—হঠাৎ পেয়েছি। গুরুকৃপায় এক মুহূর্তে এই জ্ঞান আমার হয়ে গেছে। হে গুরুদেব, তোমার কটাক্ষে আমার সংসারের সব দুঃখ-কষ্ট-মলিনতা ধুয়ে গেছে, আমি আত্মজ্ঞান লাভ করেছি, সেই আনন্দে আমি ডুবে আছি। নমঃ নমস্তে, তুমি মহাত্মা, তোমায় বারবার নমস্কার করি।

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং বিমুক্তোঽহং ভবগ্রহাৎ।
নিত্যানন্দস্বরূপোঽহং পূর্ণোঽহং ত্বদনুগ্রহাৎ।।৪৮৮

অন্বয়: ত্বৎ-অনুগ্রহাৎ (তোমার অনুগ্রহে) অহং ধন্যঃ (আমি ধন্য) অহং কৃতকৃত্যঃ

(আমি কৃতকৃত্য) অহং ভবগ্রহাৎ বিমুক্তঃ (আমি সংসাররূপ কুমীরের গ্রাস থেকে মুক্ত) অহং নিত্যানন্দস্বরূপঃ অহং পূর্ণঃ (আমি নিত্য-আনন্দস্বরূপ ও পূর্ণ হয়ে আছি)।

সরলার্থ: তোমার অনুগ্রহে আমি ধন্য আমি কৃতকৃত্য। সংসাররূপ কুমীরের গ্রাস থেকে আমি মুক্ত হয়েছি। আমি নিত্য-আনন্দস্বরূপ ও পূর্ণ হয়ে আছি।

ব্যাখ্যা: গুরুর কৃপায় শিষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন। জীবন্মুক্ত হয়ে পরমানন্দে পূর্ণস্বরূপে অবস্থান করছেন। গুরুকে বলছেন, 'ধন্যঃ-অহং কৃতকৃত্যঃ অহং বিমুক্তঃ অহং ভবগ্রহাৎ'; আমি ধন্য, আমি কৃতকৃত্য, আমার যা-কিছু করার ছিল সব করা হয়ে গেছে। 'বিমুক্তঃ অহং ভবগ্রহাৎ'; 'ভব' মানে সংসার, জন্ম-মৃত্যুর চক্র। 'গ্রহাৎ'—কুমীরের কাছ থেকে। বলছেন, আমি কুমীরের মুখে পড়েছিলাম। আমি জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে পড়েছিলাম, যেন কুমীরের মুখে পড়েছিলাম, এখন তার থেকে আমি মুক্ত হয়ে গেছি। একবার যখন জানতে পারা যায় আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত তখন আর জন্ম-মৃত্যুর টানাপোড়েনে বাঁধা পড়তে হয় না। সংসারের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আমায় আর স্পর্শ করতে পারে না। জীবন্মুক্ত নিজেকেই সকলের মধ্যে দেখেন, শুধু এক দেখেন, তাই তাঁর কোনও অভাববোধ থাকে না, চাইবার থাকে না। তিনি নিজের মধ্যে সর্বদা আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকেন। গুরুর কৃপায় শিষ্য জীবন্মুক্ত হয়েছেন। তাই তিনি বলছেন : 'নিত্যানন্দস্বরূপঃ অহং'; এখন আমি বুঝে নিয়েছি আমার স্বরূপটাই আনন্দ, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। অন্য সকলেরও আনন্দ নিশ্চয়ই হয় কিন্তু নিত্যানন্দ হয় না। যিনি জীবন্মুক্ত তাঁর আনন্দ নিরন্তর, কোনও ছেদ নেই। তারপর বলছেন, 'পূর্ণঃ অহং'—আমি পূর্ণ, কোনও অভাব নেই। 'ত্বৎ-অনুগ্রহাৎ'—তোমার অনুগ্রহে আমি এরকম হয়েছি। হে গুরুদেব, তোমার অনুগ্রহে আমার ব্রহ্মানুভূতি হয়েছে, আমি ধন্য হয়ে গেছি, কৃতার্থ হয়ে গেছি, আমি নিত্যানন্দস্বরূপ হয়ে অবস্থান করছি। তোমার কৃপাতেই এ সম্ভব হয়েছে, তোমাকে প্রণাম।

অসঙ্গোঽহমনঙ্গোঽহমলিঙ্গোঽহমভঙ্গুরঃ।
প্রশান্তোঽহমনন্তোঽহমমলোঽহং চিরন্তনঃ॥ ৪৮৯

অন্বয়: অহম্ অসঙ্গঃ (আমি আসক্তিশূন্য) অহম্ অনঙ্গঃ (আমি স্থূলদেহে অভিমানশূন্য) অহম্ অলিঙ্গঃ (আমি লিঙ্গশরীরে অভিমানশূন্য) অহম্ অভঙ্গুরঃ (আমি ভগ্ন হই না) অহম্-প্রশান্তঃ অহম্-অনন্তঃ অহম্-অমলঃ অহম্-চিরন্তনঃ (আমি প্রশান্ত, অসীম, নির্মল ও সনাতন)।

সরলার্থ: আমি আসক্তিশূন্য, আমার কোনও দেহবোধ নেই, লিঙ্গশরীরের বোধও

নেই, আমি ভঙ্গুর নই, আমার ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই। আমি প্রশান্ত, আদি-অন্তহীন, আমি নির্মল, আমি সনাতন।

ব্যাখ্যা: শিষ্যের ব্রহ্মানুভূতি হয়েছে। সেই অবস্থাটা কিরকম হয়েছে সেইকথাই তিনি বর্ণনা করছেন। বলছেন, 'অসঙ্গঃ অহং'—আমি অনাসক্ত। আমার কোনও কিছুতে আসক্তি নেই। গীতাতে যে বারবার বলছেন, অনাসক্তি, অনাসক্তি—ব্রহ্মজ্ঞান হলে মানুষ ঠিক ঠিক অনাসক্ত হয়। 'অনঙ্গঃ অহং'—আমার কোনও অঙ্গ নেই। বিদেহ হয়ে আছি। অর্থাৎ দেহাত্মবোধ নেই। স্বামীজীর যেমন হয়েছিল। সমাধি হয়েছে। পাশে একজন গুরুভাই রয়েছেন। সমাধি ভাঙার মুখে স্বামীজী বলছেন, আমার হাত কোথায় ? পা কোথায় ? শরীরবোধ নেই তো তাই দেহটাকে খুঁজে পাচ্ছেন না। 'অনঙ্গঃ' মানে এই নয় যে শরীর নেই। শরীর আছে কিন্তু শরীরবোধটা আর নেই। তারপর বলছেন, 'অলিঙ্গঃ অহং'। লিঙ্গ মানে চিহ্ন। লিঙ্গশরীর হচ্ছে সূক্ষ্মশরীর। আমাদের তিনটে শরীর। স্থূলশরীর, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর আর কারণশরীর। সূক্ষ্মশরীর মানে বায়ুভূত একটা অবয়ব, এটাও একটা জড়বস্তু কিন্তু ছায়ার মতো। বলছেন, আমার কোনও দেহবোধ নেই। মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার নিয়ে যে সূক্ষ্মশরীর সেটাও আমার নেই। আমি আত্মস্বরূপে অবস্থান করছি। 'অভঙ্গুরঃ অহং'—আমি ভঙ্গুর নই, ভেঙে যাই না। আমি আত্মা, অজ, অমর, স্বতন্ত্র, কোনও অবস্থাতেই আমার কোন পরিবর্তন নেই। 'প্রশান্তঃ অহং'—আমি প্রশান্ত, প্রকৃষ্টরূপে শান্ত। 'অনন্তঃ অহং'—আমার অন্ত নেই। অন্ত নেই আদিও নেই। অনন্ত মানে দেশ-কাল-পাত্র, এই গণ্ডীর মধ্যে আমি আবদ্ধ নই। 'অমলঃ অহং'; আমার মধ্যে কোনও মলিনতা নেই। কারণ আমি তো শুদ্ধচৈতন্য, আমার মধ্যে মলিনতা কি করে থাকবে ? 'চিরন্তনঃ'—আমি সব সময় আছি, শাশ্বত সনাতন। আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, ব্যাধি নেই, ভোগ নেই। গুরুর কৃপায় জেনে গেছি আমি আত্মা, আমি এই দেহ নই। তাই দেহের সুখ-দুঃখ আমাকে আর স্পর্শ করতে পারছে না। আমি শুদ্ধ, শান্ত হয়ে আছি।

অকর্তাহমভোক্তাহমবিকারোঽহমক্রিয়ঃ।
শুদ্ধবোধস্বরূপোঽহং কেবলোঽহং সদাশিবঃ॥ ৪৯০

অন্বয়: অহম্-অকর্তা অহম্-অভোক্তা অহম্-অবিকারঃ অহম্-অক্রিয়ঃ (আমি কর্তা নই, আমি ভোক্তা নই, আমি নির্বিকার, আমি নিষ্ক্রিয়) অহং শুদ্ধবোধস্বরূপঃ (আমি শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ) অহং কেবলঃ সদাশিবঃ (আমি নির্বিশেষ ও সদা মঙ্গলময়)।

সরলার্থ: আমি কর্তা নই, ভোক্তা নই, আমি নির্বিকার, আমি নিষ্ক্রিয়। আমি শুদ্ধ বোধস্বরূপ, আমি নির্বিশেষ ও সদামঙ্গলময়।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'অকর্তা-অহম্-অভোক্তা-অহম্-অবিকারঃ-অহম্-অক্রিয়ঃ'। আমি কর্তা নই, ভোক্তা নই। আমি 'অবিকারঃ'—নির্বিকার। আমি 'অক্রিয়ঃ'—কিছুই করি না। জগতে আছি, কিন্তু আমার সঙ্গে জগতের কোন সম্পর্ক নেই। আমি স্বতন্ত্র, আমি অস্পর্শ, কিছুই আমায় স্পর্শ করে না। 'শুদ্ধ বোধস্বরূপঃ-অহং'। শুদ্ধ মানে শুধু, তার সঙ্গে আর কোনও কিছু জড়ানো নেই। 'বোধ' হচ্ছে জ্ঞান, চৈতন্য; আমি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। 'কেবলঃ'—এ ছাড়া আর কিছু নয়, শুদ্ধ। 'সদাশিবঃ'—শিবঃ মানে মঙ্গল, শুভ; সদাশিব অর্থাৎ নিত্য মঙ্গলস্বরূপ আমি। এখানে যেন একটা ছবি ফুটে উঠছে। ব্রহ্মজ্ঞান যিনি লাভ করেছেন তাঁর জীবনটা কিরকম। সংসারের কত রকমের কষ্ট, সবের মধ্যে থেকেও তিনি কিছুর মধ্যে নেই, কিন্তু এরজন্যে তাঁকে কোনও চেষ্টা করতে হচ্ছে না। একটা যেন রাজকীয় অবস্থান। কিছুই আমায় স্পর্শ করছে না। কত কি কাণ্ড চলছে, কত রকমের মানুষ আসছে, তাদের কত রকমের অভিজ্ঞতা, আমি শুধু দ্রষ্টা হয়ে দেখছি। জন্ম-মৃত্যু চলছে। যে জন্ম দিচ্ছে সেই মারছে যিনি সৃষ্টি করছেন তিনিই ভাঙছেন, আমি শুধু দেখছি। আমি যেন খেলা দেখছি। সংসার চলছে, কত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছি। আমি সবের মধ্যে আছি কিন্তু যেন কিছুর মধ্যে নেই। জীবন্মুক্ত পুরুষ এইরকম হন। কোন অভাববোধ নেই। নির্বিকার, নিস্পৃহ, পরিপূর্ণ।

দ্রষ্টুঃ শ্রোতুর্বক্তুঃ কর্তুর্ভোক্তুর্বিভিন্ন এবাহম্।
নিত্যনিরন্তরনিষ্ক্রিয়নিঃসীমাসঙ্গপূর্ণবোধাত্মা॥ ৪৯১

অন্বয় : অহম্ দ্রষ্টুঃ শ্রোতুঃ বক্তুঃ কর্তুঃ ভোক্তুঃ বিভিন্নঃ এব (আমি দ্রষ্টা শ্রোতা বক্তা কর্তা ভোক্তা থেকে বিভিন্নই) নিত্য-নিরন্তর-নিষ্ক্রিয়-নিঃসীম-অসঙ্গ পূর্ণবোধ-আত্মা ([আমি] নিত্য-নিরন্তর-নিষ্ক্রিয়-নিঃসীম-অসঙ্গ পূর্ণবোধস্বরূপ আত্মা)।

সরলার্থ : দ্রষ্টা-শ্রোতা-বক্তা-কর্তা-ভোক্তা থেকে আমি ভিন্নই। আমি নিত্য, ভেদহীন ক্রিয়াহীন অসীম অনাসক্ত পূর্ণবোধস্বরূপ আত্মা।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'দ্রষ্টুঃ-শ্রোতুঃ-বক্তুঃ-কর্তুঃ-ভোক্তুঃ বিভিন্ন এব-অহম্'; আমি এসব নই। একটা কোনও গণ্ডীর মধ্যে আমাকে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সব রকমের ব্যবহার থেকে আমি ভিন্ন। দ্রষ্টা, শ্রোতা, ইত্যাদি একটা সংজ্ঞা দিয়ে আমাকে বিশেষিত করা যায় না। আমি 'নিত্য-নিরন্তর'। যে নিত্য সে মুক্ত। আমি 'নিরন্তর'—আমি যা সেইরকমই সর্বদা রয়েছি। কিছুর প্রভাবে আমার কখনও পরিবর্তন হয় না। আমি 'কেবলঃ'। আমি 'নিষ্ক্রিয়'—আমি কোনও কাজই করি না। কেন বলছেন কাজ করি না ? অহং-বুদ্ধি নিয়ে নিজের জন্যে কিছু করি না। কিন্তু হয়তো অনেক কাজ

করছি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তিনি কাজ করছেন, সব সময় কাজ করছেন, কিন্তু নিজের জন্যে কিছু করছেন না। বিবেকচূড়ামণিতেই আছে, সিদ্ধ মহাপুরুষরা বসন্ত-বাতাসের মতো সব সময় অপরের জন্যে কাজ করে যান। 'বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ'। কেউ চাইছে বলে নয়, নিজের স্বভাবে তাঁরা সকলের কল্যাণ করে যান। জীবন্মুক্ত পুরুষ 'নিষ্ক্রিয়' এই অর্থে যে অহং-বুদ্ধি নিয়ে তাঁরা কোন কাজ করেন না। কোন বাসনা নেই তাঁদের। এই জগৎ থেকে তাঁদের কিছু পাবার নেই। তাঁরা সদা পূর্ণ। তারপর বলছেন : 'নিঃসীম', আমার কোনও সীমা নেই, আমি অসীম। ব্রহ্ম অসীম। আমি তো ব্রহ্ম, তাই আমি অসীম। আবার বলছেন, 'অসঙ্গ', কোনও আসক্তি নেই, নির্লিপ্ত। কারণ আমি ছাড়া তো আর কিছু নেই। সব সময় আমি 'পূর্ণবোধ-আত্মা'। আমি নিত্য, আমি পূর্ণ, আমি বোধস্বরূপ আত্মা। জীবন্মুক্ত পুরুষকে কোনও কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তিনি আপ্তকাম, পূর্ণকাম। কারও কাছে তিনি কিছু প্রত্যাশা করেন না। রাজার মতো তিনি থাকেন। তিনিই প্রকৃত স্বাধীন। আর সবাই পরাধীন।

নাহমিদং নাহমদোঽপ্যুভয়োরবভাসকং পরং শুদ্ধম্।
বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং পূর্ণং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্॥ ৪৯২

অন্বয় : অহম্-ইদং ন (আমি 'এই' নই) অহম্ ন অদঃ-অপি (আমি 'ওই'ও নই) অহম্ উভয়োঃ অবভাসকং (আমি উভয়ের প্রকাশক) পরং শুদ্ধম্ (পরম শুদ্ধ) বাহ্য-অভ্যন্তর শূন্যং (ভিতর-বাহির শূন্য) পূর্ণং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম এব (পূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই)।

সরলার্থ : আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় 'এই' নই আবার পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় 'ওই'ও নই। আমি এদের উভয়েরই প্রকাশক। আমি পরম শুদ্ধ, বাহ্য-অভ্যন্তর শূন্য, পূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'ন-অহম্-ইদম্ ন অহম্-অদঃ'; আমি এই নই আমি ওইও নই। 'ইদম্' মানে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, যাকে আমি প্রত্যক্ষ করছি, এ আমি নই। আবার এমন কিছু যদি থাকে, এমন কোন জগৎ যদি থাকে, যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এভাবে সরাসরি জানা যায় না, যাকে পরোক্ষভাবে জানতে হয়—তাহলে তা-ও আমি নই। আমি এ-ও নই, ও-ও নই। কোনটাই নই। জগতের কিছু কিছু জিনিস প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়, আবার কিছু কিছু জিনিস পরোক্ষভাবে জানতে হয়। আমি কোনটাই নই। আমিই বরং প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞানের কারণ। আমার জন্যেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান সম্ভব হয়। বলছেন, 'অপি উভয়োঃ-অবভাসকং'—আমি তাদের উভয়েরই প্রকাশক। তারা আমার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যক্ষ জগৎ আর ওই পরোক্ষ জগৎ সব আমার ওপর ন্যস্ত হয়ে আছে। অধ্যস্ত হয়ে আছে। আমি না থাকলে এসব কিছুই

থাকে না। আমি কিরকম ? 'পরং শুদ্ধম্'; 'পরং' মানে পরম, শ্রেষ্ঠ, উত্তম। 'শুদ্ধ' মানে কি ? উপাধি নেই, কোনও বিকার নেই, কোনও গুণ নেই, নির্বিশেষ। কিছু দিয়ে আমায় বিশেষিত করা যায় না। আমি 'কেবলঃ', যেমন আকাশ। আমি 'বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং'—ভেতরেও নেই বাইরেও নেই। ভেতর-বার শূন্য। আমি অসীম, সর্বব্যাপী, তাই আমার ভেতর-বার কিছু নেই। 'পূর্ণং'—আমি পূর্ণ, আমি সর্বত্র আছি। 'ব্রহ্ম-অদ্বিতীয়ম্-এব অহং'। আমি সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যাঁর কোনও দুই নেই। ভাষা দিয়ে তাঁকে বোঝানো তো যায় না, তবুও কতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, শুধু একটা আভাস দেওয়ার জন্যে।

নিরুপমমনাদিতত্ত্বং ত্বমহমিদমদ ইতি কল্পনাদূরম্।
নিত্যানন্দৈকরসং সত্যং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্॥ ৪৯৩

অন্বয় : অহম্ (আমি) নিরুপমম্ (উপমাহীন) অনাদি-তত্ত্বং (আদিরহিত স্বরূপ) ত্বম্-অহম্-ইদম্-অদঃ ইতি কল্পনাদূরম্ (তুমি-আমি এই-ওই ইত্যাদি কল্পনার অতীত) নিত্য-আনন্দ-একরসং সত্যং অদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম এব (নিত্য আনন্দ ও একরসস্বরূপ সত্য অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মাত্র)।

সরলার্থ : আমি উপমারহিত, আদিরহিত আমার স্বরূপ। 'তুমি-আমি এই-ওই' এসব শব্দ দিয়ে আমায় কল্পনা করা যায় না। আমি নিত্য, আনন্দস্বরূপ, একরস, সত্য, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মাত্র।

ব্যাখ্যা : আত্মজ্ঞান শিষ্যের হয়ে গেছে। নিজের ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন তিনি। নিজেকে তাঁর কি মনে হচ্ছে তাই তিনি গুরুকে জানাচ্ছেন। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাকে ভাষা দিয়ে বলার চেষ্টা করছেন। বলছেন, আমি 'নিরুপমম্ অনাদিতত্ত্বং'; আমি নিরুপম, আমার কোনও উপমা হয় না। আমি 'অনাদিতত্ত্ব'। অনাদি মানে যার আদি নেই। যার আদি নেই তার অন্তও নেই। যিনি অনাদি অনন্ত, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, সর্বকালে আছেন, অর্থাৎ যিনি নিত্য তিনিই আমি। 'ত্বম্-অহম্-ইদম্-অদঃ ইতি কল্পনাদূরম্'; জগতের সবকিছু বোঝাতে আমরা যেসব শব্দ ব্যবহার করি, তুমি-আমি-এই-ওই, এসব দিয়ে আমাকে কল্পনা করা যায় না, আমি কল্পনাতীত। 'নিত্য-আনন্দ-একরসং'; এই যে শব্দগুলো, এগুলো আমরা ধারণা করতে পারি না। কতগুলো শব্দ শুধু, যে যা বোঝে। বোধে বোধ। জানলে তবে বুঝবে। 'নিত্য-আনন্দ-একরসং' মানে আনন্দের একটা অখণ্ড ধারা, homogeneous, নিত্য আনন্দ, অমিশ্র আনন্দ। 'সত্যং ব্রহ্ম-অদ্বিতীয়ম্-এব-অহং'। এটাই আসল কথা। আমি বুঝে নিয়েছি আমিই সব হয়েছি। সেই সত্যস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমিই, অন্য কিছু নই।

নারায়ণোঽহং নরকান্তকোঽহং
পুরান্তকোঽহং পুরুষোঽহমীশঃ।
অখণ্ডবোধোঽহমশেষসাক্ষী
নিরীশ্বরোঽহং নিরহং চ নির্মমঃ॥ ৪৯৪

অন্বয়: অহং নারায়ণঃ (আমি নারায়ণ) অহং নরক-অন্তকঃ (আমি নরকাসুর নাশক শ্রীকৃষ্ণ) অহং পুর-অন্তকঃ (আমি ত্রিপুরাসুর-বধকারী শিব) অহম্-ঈশঃ পুরুষঃ (আমি ঈশ্বর, আমি অন্তর্যামী পুরুষ) অহম্-অখণ্ডবোধঃ অশেষসাক্ষী (আমি অখণ্ড বোধস্বরূপ ও সকলের সাক্ষিস্বরূপ) অহং নিরীশ্বরঃ (আমার কোন নিয়ন্তা নেই) নিরহং চ নির্মমঃ (আমি অহংকার ও মমতাশূন্য)।

সরলার্থ: আমি নারায়ণ, আমি নরকাসুর নাশক বিষ্ণু, আমি ত্রিপুরাসুর নাশক শিব, আমি অন্তর্যামী পুরুষ, আমি ঈশ্বর। আমি অখণ্ডবোধস্বরূপ, সকল বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ। আমার কোনও নিয়ন্তা নেই। আমি অহংতা ও মমতা শূন্য।

ব্যাখ্যা: শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেছে। তিনি উপলব্ধি করেছেন, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁর এই উপলব্ধি হয়, তিনি দেখেন তিনিই সব হয়েছেন। তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই। শিষ্য তাঁর এই অনুভূতির কথা গুরুকে বলছেন। বলছেন, 'নারায়ণঃ অহং'; মনে হয় যেন ছোট-মুখে বড় কথা। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। কে একথা বলতে পারেন ? যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন। আমি ব্রহ্মই, একথা না বলে এখানে বলছেন 'নারায়ণঃ অহং নরকান্তকঃ অহং'; আমিই স্বয়ং নারায়ণ, আমিই নরকাসুরের নাশকারী শ্রীকৃষ্ণ। 'পুরান্তকঃ অহং'; ত্রিপুরাসুরকে মারলেন শিব, সেই পুরান্তক শিব আমি। 'পুরুষঃ অহম্-ঈশঃ'। 'পুরুষঃ', সকলের হৃদয়পুরে যিনি 'শেতে', শুয়ে আছেন সেই পুরুষ আমি। আমিই ঈশ্বর। 'অখণ্ডবোধঃ-অহং', আমি অখণ্ডবোধস্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য। 'অশেষ সাক্ষী'; আমি সবকিছুর সাক্ষী, দ্রষ্টা। শুধু দেখছি। কোন কিছুতে জড়িয়ে পড়ছি না। 'নিরীশ্বরঃ অহং নিরহং চ নির্মমঃ'; 'নিরীশ্বরঃ', আমার কোনও ঈশ্বর নেই, কেউ আমাকে চালাচ্ছে না, আমার কোনও নিয়ন্তা নেই। আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমি 'নিরহং'—আমার কোনও অহং নেই। যদি 'আমি' থাকে তাহলে 'তুমিও' থাকবে। আমি 'নির্মমঃ', আমার মমত্বও নেই। 'আমি আমার' কিচ্ছু নেই। আমি বলতে যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব বোঝায় সেটা আর নেই আমার। আমি স্বয়ং ব্রহ্ম। নিরাকার, নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম।

সর্বেষু ভূতেষ্বহমেব সংস্থিতো জ্ঞানাত্মনান্তর্বহিরাশ্রয় সন্।
ভোক্তা চ ভোগ্যং স্বয়মেব সর্বং যদ্যৎ পৃথগ্দৃষ্টমিদন্তয়া পুরা॥ ৪৯৫

অন্বয়: অহম্-এব (আমিই) জ্ঞান-আত্মনা (জ্ঞানস্বরূপে) অন্তঃ-বহিঃ-আশ্রয়ঃ সন্

(ভেতরের ও বাইরের আশ্রয় হয়ে) সর্বেষু ভূতেষু সংস্থিতঃ (সর্বভূতে বিরাজমান) পুরা (পূর্বে) যৎ যৎ (যে যে) ইদম্-তয়া পৃথক্ দৃষ্টম্ ('এই' বলে পৃথক বস্তুরূপে দেখেছিলাম) সর্বং ভোক্তা চ ভোগ্যং চ (সেইসব ভোক্তা ও ভোগ্য) স্বয়ম্-এব (আমি নিজেই)।

সরলার্থ: আমিই চৈতন্যরূপে ভেতরে ও বাইরে সর্বভূতে সবকিছুর অধিষ্ঠানরূপে বিরাজমান। জ্ঞান হওয়ার পূর্বে যে-যে বিষয়বস্তু আমার থেকে পৃথক বলে দেখতাম এখন জ্ঞান হয়ে দেখছি সেসব ভোক্তা ও ভোগ্য আমি নিজেই।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'সর্বেষু ভূতেষু অহম্-এব সংস্থিতঃ'; সর্বভূতে আমিই আছি। 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ'। সকলের হৃদয়গুহার মধ্যে ঢুকে বসে আছি আমি। 'জ্ঞানাত্মনা-অন্তঃ-বহিঃ আশ্রয়ঃ সন্'; আমি জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, সবকিছুর অন্তরের ও বাইরের আশ্রয়স্বরূপ হয়ে বিরাজ করছি। আমি সকলের মধ্যে আছি। সকলের ভেতরে আছি, বাইরে আছি। যেমন আকাশ (space)। আকাশ বাইরে আছে আবার একটা ঘটের মধ্যেও আছে। সকলের ভেতরে-বাইরে আমি আশ্রয়রূপে, অধিষ্ঠানরূপে আছি। 'ভোক্তা চ ভোগ্যং'—আমিই ভোক্তা আমিই ভোগ্য। গীতায় যেমন আছে, 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।' এই যে ক্রিয়াকলাপ সেসব হচ্ছে কোথায় ? ব্রহ্মে। কাজেই সব ব্রহ্ম। আমি ছাড়া তো আর বস্তু নেই তাই আমিই ভোক্তা, আমিই ভোগ্য, জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, তিনটেই আমি। আমিই জানার বিষয় আমিই জানছি আবার জানার যে পদ্ধতি সেটাও আমি। 'স্বয়মেব সর্বং'—আমিই সব হয়েছি। 'যৎ যৎ পৃথগ্ দৃষ্টম্-ইদন্তয়া পুরা'; 'পুরা'—আগে; জ্ঞানের আগে আমি বলতাম এটা আর ওটা। এই বলে তফাত করতাম দুটো বস্তুর মধ্যে। ভোগ্য আর ভোক্তার মধ্যে পার্থক্য করতাম, দৃশ্য আর দ্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য করতাম। জ্ঞানের পরে সব পার্থক্য আমার কাছে মুছে গেছে। আগে যেগুলোকে 'পৃথক্ দৃষ্টম্', পৃথক বলে আমি দেখতাম, সেগুলো সব এক হয়ে গেছে, একাকার। যা কিছু আছে সেগুলির আশ্রয়রূপে, আধাররূপে, অধিষ্ঠান-রূপে আমিই আছি, আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি আছি বলেই সবকিছু আছে।

ময্যখণ্ডসুখাম্ভোধৌ বহুধা বিশ্ববীচয়ঃ।
উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে মায়ামারুতবিভ্রমাৎ।। ৪৯৬

অন্বয়: অখণ্ড-সুখ-অম্ভোধৌ ময়ি (অখণ্ড সুখসাগরস্বরূপ আমাতে) মায়ামারুতবিভ্রমাৎ (মায়ারূপ বাতাসজনিত বিভ্রমের ফলে) বিশ্ববীচয়ঃ (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ তরঙ্গমালা) বহুধা (নানা ভাবে) উৎপদ্যন্তে (উৎপন্ন হচ্ছে) বিলীয়ন্তে (বিলীন হচ্ছে)।

সরলার্থ: অখণ্ড সুখসাগররূপ আমার মধ্যে মায়াবাতাসের বিভ্রম থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ তরঙ্গমালা নানা ভাবে উত্থিত হচ্ছে আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

ব্যাখ্যা: শিষ্যের আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। নিজের অবস্থার কথা তিনি এখন গুরুকে বলে যাচ্ছেন। বলছেন, আমি সুখসাগর। কিরকম একটা ভাব ! 'ময়ি-অখণ্ড সুখ-অম্ভোধৌ'; 'অম্ভোধি' মানে সমুদ্র। অখণ্ড কেন বলছেন ? কারণ এ সুখ নিরন্তর। আমি অখণ্ড সুখের সমুদ্র, আমার আনন্দের শেষ নেই, অতলস্পর্শ একটা সমুদ্রের মতো আমার আনন্দের কোনও তল নেই, শেষ নেই। আমরা যখন আত্মজ্ঞান লাভ করি তখন আনন্দের আর শেষ থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সে আনন্দ বুঝিয়ে বলা যায় না। এই আত্মজ্ঞান সকলেরই হওয়া সম্ভব, কোনও একজন বিশেষ ব্যক্তির হবে তা নয়। স্বামীজী বলছেন, এই জ্ঞান তোমার birthright। তাহলেও এর জন্যে তো প্রস্তুতি চাই, যাঁরা ভাগ্যবান তাঁদেরই সেই প্রস্তুতি হয়। আমাকে কেউ দয়া করে যে এটা দান করল তা নয়, এটাতে আমার জন্মগত অধিকার। এর থেকে আমাকে কে যেন সরিয়ে রেখেছে। মায়া আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে। ওই যে রূপকথায় আছে মরণকাঠি জীয়নকাঠি, সেই মরণকাঠি ছুঁইয়ে কে যেন আমাদের মেরে রেখে দিয়েছে। নিজের স্বরূপটা ভুল হয়ে গেছে। মায়ার জন্যে এইরকম হয়, কিন্তু কেন হয় তা কেউ বলতে পারে না। এটা একটা বাস্তব ঘটনা, এইরকম হয়। মায়া অতিক্রম করে শিষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন। ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। বলছেন, 'বহুধা বিশ্ববীচয়ঃ'; ব্রহ্ম-সমুদ্রের ওপর তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। বীচি মানে তরঙ্গ। 'বিশ্ববীচয়ঃ', এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ব্রহ্মসমুদ্রে তরঙ্গের মতো। 'উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে'; উঠছে, তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আমার ওপরে এইসব তরঙ্গ উঠছে আর পড়ছে। আমি আধার, এগুলো সব অধ্যাস, মিথ্যা। যেমন সিনেমা দেখি, একটা পর্দার ওপর কত রকমের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। ঘটনার স্রোত যেন বীচিমালা, সমুদ্রের তরঙ্গ উঠছে, পড়ছে। কত তরঙ্গ ! এ জগতে এইরকমই ঘটনার তরঙ্গ, উঠছে আর পড়ছে। 'মায়া-মারুতবিভ্রমাৎ'; তরঙ্গ উঠতে গেলে একটা বাতাস চাই। মায়া সেই বাতাস, সে এইসব তরঙ্গ তুলছে। মায়ারূপ মারুত যেন একটা ঝড় তুলেছে। তাই কত রকমের তরঙ্গ দেখছি। 'বহুধা বিশ্ববীচয়ঃ উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে'—বিশ্বজগৎ কত ভাবে তরঙ্গাকারে উঠছে আর পড়ছে। সমুদ্রে মিশে যাচ্ছে। কিন্তু আমি আমার স্বরূপটা খুঁজে পেয়েছি। আমি শান্তম্-শিবম্-অদ্বৈতম্, আমি কূটস্থ, আমি আত্মস্থ। আমি ঐ ব্রহ্মসমুদ্র। আমার ওপরে কত সব তরঙ্গ উঠছে আবার আমার মধ্যেই মিশে যাচ্ছে। আমার তাতে কি এসে যায় ? সমুদ্রে তরঙ্গ উঠলে সমুদ্রের কি এসে যায় ? আমি আনন্দে আছি। আনন্দের সাগর হয়ে রয়েছি।

স্থূলাদিভাবা ময়ি কল্পিতা ভ্রমাদারোপিতা নু স্ফুরণেন লোকৈঃ।
কালে যথা কল্পকবৎসরায়নঋত্বাদয়ো নিষ্কলনির্বিকল্পে॥ ৪৯৭

অন্বয়: নিষ্কল-নির্বিকল্পে ময়ি (নিষ্কল নির্বিকল্প আমাতে) স্থূলাদিভাবাঃ (স্থূল সূক্ষ্ম ইত্যাদি ভাব) ভ্রমাৎ (ভ্রান্তির থেকে) কল্পিতাঃ (কল্পনা করা হয়) যথা (যেমন) কালে (কলাহীন অনন্তকালে) কল্পক-বৎসর-অয়ন-ঋতু-আদয়ঃ (কল্প, বৎসর, অয়ন, ঋতু ইত্যাদি) লোকৈঃ (সাধারণ লোকেদের দ্বারা) নু স্ফুরণেন (ধারণার কারণে) আরোপিতাঃ (অরোপ করা হয়)।

সরলার্থ: অখণ্ড বিকল্পহীন শুদ্ধস্বরূপ আমাতে স্থূল-সূক্ষ্ম ইত্যাদি নানা ভাবের কল্পনা করা হয় ভ্রান্তিবশত। যেমন সাধারণ মানুষ, ধারণার সুবিধের জন্যে কলাহীন অনন্ত কালে কল্প, বৎসর, অয়ন, ঋতু ইত্যাদি বিভাগ আরোপ করে থাকে।

ব্যাখ্যা: এখানে বলছেন, আমি আধেয় নই, আমি আধার। আমিই অধিষ্ঠান, আমার ওপরেই সবকিছু আরোপিত। 'স্থূলাদিভাবাঃ'—স্থূল, সূক্ষ্ম ইত্যাদি ভাব আমার ওপর আরোপিত হয়েছে 'ভ্রমাৎ'—ভ্রান্তিবশত। রজ্জুতে যেমন সাপ দেখেছিলাম, অন্ধকারে ভুল করে, তারপর আলো আসতে বুঝতে পারলাম এটা সাপ নয় দড়ি। দড়ির ওপর সাপের কল্পনাটা যেমন মিথ্যা ছিল তেমনি নিজেকে যে নানা ভাবে দেখছি, এসব কল্পনা ভ্রান্তি থেকে আসছে। নিজের ওপর এইসব আরোপ করছি। এসব অধ্যাস। 'কালে যথা কল্পক-বৎসর-অয়ন-ঋতু-আদয়ঃ নিষ্কল-নির্বিকল্পে'; কলাহীন নিরন্তর কালে যেমন কল্প, বৎসর, অয়ন, ঋতু ইত্যাদি সব কল্পিত বিভাগ করা হয় তেমনি আমাদের অখণ্ড আত্মায় স্থূল, সূক্ষ্ম ইত্যাদি নানা উপাধি আরোপ করে তাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখছি। 'কল্প' মানে ব্রহ্মার অহোরাত্র—৮৬৪ কোটি বৎসর, 'অয়ন' মানে সূর্যের গতি। 'কাল' মানে সময়। সময় তো কলাহীন, অখণ্ড। তাকে আমরা কত ভাবে ভাগ করছি। অমুক সালে জন্ম, অমুক দিনে স্কুলে ভর্তি, এইভাবে সময়কে কাল্পনিকভাবে ভাগ করেছি। 'নু স্ফুরণেন লোকৈঃ'; সাধারণ লোকেরা এইরকম ভাগ করেছে, ব্যবহারিক জগতে সুবিধের জন্যে। কিন্তু আসলে কালে কোন ভাগ নেই। 'কালে যথা কল্পক-বৎসর-অয়ন-ঋতু-আদয়ঃ নিষ্কল-নির্বিকল্পে'; অখণ্ড সময়কে আমরা যেমন কাল্পনিকভাবে বিভাগ করি কল্প, বৎসর, অয়ন ঋতু, মাস, দিন ইত্যাদি আরোপ করে, তেমনি আমার নিষ্কল অখণ্ড সত্তাকে নানা আরোপিত গুণ দিয়ে ভুল করে বিভাগ করতে চেষ্টা করি। কলা মানে অংশ। 'নিষ্কল' মানে যার কোন অংশ নেই। যেমন, শরীরের কলা বা অংশ হলো হাত-পা ইত্যাদি। আত্মার কিন্তু এরকম কোন অংশ নেই। শিষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, নিজেকে আত্মা বলে উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি বলছেন, আমি নিষ্কল নির্বিকল্প। আমার স্বরূপটা শুদ্ধ চৈতন্য। আমি দেশ-কাল-পাত্র, বা অন্য কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ নই। আমি নিষ্কল ব্রহ্ম—আমার কোন কলা বা অংশ নেই।

আরোপিতং নাশ্রয়দূষকং ভবেৎ
কদাপি মূঢ়ৈরতিদোষদূষিতৈঃ।
নার্দ্রীকরোত্যূষরভূমিভাগং
মরীচিকাবারিমহাপ্রবাহঃ॥ ৪৯৮

অন্বয়: অতিদোষ-দূষিতৈঃ মূঢ়ৈঃ (অত্যন্ত দোষ আছে এইরকম মূঢ় ব্যক্তিদের দ্বারা) আরোপিতং (আরোপিত দোষ গুণ) কদাপি আশ্রয়দূষকং ন ভবেৎ (কখনও আশ্রয়কে দোষযুক্ত করতে পারে না) মরীচিকা-বারি-মহাপ্রবাহঃ (মরীচিকায় দেখা জলের প্রবল স্রোত) ঊষরভূমিভাগং ন আর্দ্রী করোতি (ঊষরভূমিকে আর্দ্র করতে পারে না)।

সরলার্থ: অত্যন্ত দোষযুক্ত বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের দ্বারা আরোপিত বস্তুর দোষ-গুণ কখনও সেসবের অধিষ্ঠানকে স্পর্শ করতে পারে না। যেমন মরীচিকায় দেখা জলপ্রবাহ কখনও ঊষর বালুভূমিকে সিক্ত করতে পারে না।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'আরোপিতং ন আশ্রয়দূষকং'; আরোপিত বস্তু আশ্রয়কে স্পর্শ করতে পারে না। 'কদাপি মূঢ়ৈঃ অতিদোষ-দূষিতৈঃ'; অত্যন্ত দোষ আছে এইরকম মূঢ়, বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরাই যা-কিছু আরোপিত বস্তু সেসবকে যথার্থ মনে করে, সেগুলিকে আধারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। কিন্তু আরোপিত বস্তু আধার বা আশ্রয়কে স্পর্শ করে না। যেমন দড়িটাকে যখন সাপ বলে মনে করি তখন সাপের কল্পনাটা দড়িকে স্পর্শ করে না। তারপর একটা সুন্দর উপমা দিচ্ছেন। বলছেন, মরুভূমিতে মরীচিকা দেখে আমরা ভাবতে পারি, যেন বিরাট এক জলধারা বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই 'মরীচিকাবারি মহাপ্রবাহঃ', মরুভূমির ঊষর মাটিকে ভিজিয়ে দিতে পারে না—'ঊষরভূমিভাগং ন আর্দ্রী করোতি'। কারণ, মরীচিকা তো মিথ্যা, ভুল। তেমনি আমার অজ্ঞতাবশত আমি ভালো-মন্দ দোষ-গুণ সব আত্মার ওপর আরোপ করছি কিন্তু সেগুলো আত্মাকে স্পর্শ করছে না। আমি দেহের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। দেহটাকেই 'আমি' ভাবছি তাই ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, এইসব আমার বলে মনে করছি। এ আমার ভুল। আমি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, চিদাত্মা। আমাকে কিছু স্পর্শ করতে পারে না। আমি মনে করছি আমার রোগ হয়েছে, আমার যন্ত্রণা হচ্ছে, এসব আমার দেহের। মরীচিকার মহাবারিপ্রবাহ যেমন মরুভূমিকে সিক্ত করতে পারে না তেমনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আমাকে দেহ-মন-বুদ্ধির কোন মলিনতা কখনও স্পর্শ করতে পারে না।

আকাশবল্লেপবিদূরগোঽহ-
মাদিত্যবদ্ভাস্যবিলক্ষণোঽহম্।
অহার্যবন্নিত্যবিনিশ্চলোঽহ-
মম্ভোধিবৎ পারবিবর্জিতোঽহম্॥ ৪৯৯

অন্বয়: অহম্ আকাশবৎ-লেপবিদূরগঃ (আমি আকাশের মতো সবকিছু অনুলেপন-বর্জিত) অহম্-আদিত্যবৎ-ভাস্যবিলক্ষণঃ (আমি আদিত্যের মতো উদ্ভাসিত বস্তু থেকে ভিন্ন) অহম্ অহার্যবৎ নিত্য-বিনিশ্চলঃ (আমি পর্বতের মতো সদানিশ্চল) অহম্ অম্ভোধিবৎ পারবিবর্জিতঃ (আমি সমুদ্রের মতো অপার)।

সরলার্থ: আকাশ যেমন মেঘ, ধূলি ইত্যাদির দ্বারা লিপ্ত হয় না আমিও তেমনি কোনও কিছুর দ্বারা মলিন হই না। আমি আদিত্যের মতো। সূর্যের কিরণে যা-কিছু ভাস্বর সেসবের থেকে ভিন্ন, আমি স্বয়ংপ্রকাশ। আমি পর্বতের মতো নিশ্চল, আমি সমুদ্রের মতো অপার।

ব্যাখ্যা: বলছেন : 'আকাশবৎ-লেপবিদূরগঃ-অহং'; আকাশের মতোই আমি সব রকম অনুলেপন-রহিত। দূরের আকাশ যেমন নির্মল, নির্লিপ্ত, আমার আত্মা তেমনি। ধুলো, জলীয় বাষ্প এই সবের থেকে মেঘের যে রঙ হয় আমরা সেই রঙ আকাশের রঙ মনে করি কিন্তু সেটা ভুল। আকাশের কোনও রঙ নেই। আকাশ নির্লিপ্ত। আমাদের আত্মাও ঐরকম। এই দেহ তাঁর ওপর চাপানো হয়েছে কিন্তু দেহের যা-কিছু পরিবর্তন তা দেহের মধ্যেই থাকে, আত্মাকে তা স্পর্শ করে না। 'আদিত্যবৎ-ভাস্যবিলক্ষণঃ-অহম্'। সূর্যের মতো আমি 'ভাস্যবিলক্ষণঃ'। 'ভাস্য' মানে যাকে প্রকাশ করা যায়। সূর্য আলো দিয়ে সবকিছু প্রকাশ করে, তাই আমরা সবকিছু দেখতে পাই। কিন্তু সূর্য স্বয়ংপ্রকাশ, তার প্রকাশ হওয়ার জন্যে কাউকে আলো দিতে হয় না। আমি ঐ সূর্যের মতো। তারপর বলছেন : 'অহার্যবৎ-নিত্যবিনিশ্চলঃ-অহম্'। 'অহার্য'—যা হরণ করা যায় না। 'হৃ' হচ্ছে হরণ করা। 'অহার্য' মানে তাকে কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে পারে না, তাকে নড়ানো যায় না, নিশ্চল, অর্থাৎ পাহাড়। আত্মার সম্বন্ধে সব সময় এই ধরনের কথা বলছেন। কূটস্থ, স্থির, নিশ্চল, স্তব্ধ। তিনি যে নিত্য, তাঁর কোন পরিবর্তন নেই সেইটা বোঝানোর জন্যে এইসব কথা বলা হয়। তাঁর ওপর একটা দেহ চাপিয়ে দিয়েছি, অথচ তাঁর কিছুই এসে যায় না, তিনি যেমন আছেন তেমনিই আছেন। 'অম্ভোধিবৎ পারবিবর্জিতঃ-অহম্'। 'অম্ভোধি' মানে সমুদ্র। আগে পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন, এখন সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করছেন। যা কিছু বিরাট তার সঙ্গে ব্রহ্মের তুলনা। আমি ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্ম হয়ে গেছি। তাই আমি 'অম্ভোধিবৎ'—সমুদ্রের মতো। 'পারবিবর্জিতঃ অহম্'—সমুদ্রের পার আছে, কিন্তু আমার কোন পার নেই। শিষ্য এইভাবে তাঁর নিজের অনুভূতি পরপর বলে যাচ্ছেন গুরুকে। নির্মল, নির্লিপ্ত আকাশে যেমন কোনও কিছুর দাগ লাগে না তেমনি আমার আত্মাকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। আদিত্যের মতো আমি। আমি পরনির্ভর নই। আমি স্বাধীন, আমি নিজেই নিজের সাক্ষী। আমি নিশ্চল পাহাড় আবার সমুদ্রের মত অপার। নানা উদাহরণ দিয়ে আমাদের

স্বরূপটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন। কত সভ্যতা এলো গেলো কিন্তু একটা বস্তু শুধু স্থির আছে—নিত্যসত্য, আমাদের আত্মা। আমার স্বরূপটা যদি বুদ্ধি দিয়েও বুঝতে পারি, মনেও যদি ভাবতে পারি যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' তাহলেও ভালো। তাই এত করে বোঝাচ্ছেন। শাস্ত্রকে তাই আদরবতী বলা হয়। মায়ের মতন বারবার করে শাস্ত্র আমাদের বোঝায়, তুমি দেহ নও, দেহে 'আমি বুদ্ধি' করে কেন কষ্ট পাচ্ছ ? নিজের স্বরূপকে জান। সেই চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় ডুবে গিয়ে জীবন সার্থক কর।

ন মে দেহেন সম্বন্ধো মেঘেনেব বিহায়সঃ।
অতঃ কুতো মে তদ্ধর্মা জাগ্রত্স্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ ॥ ৫০০

অন্বয়: মেঘেন-ইব বিহায়সঃ (মেঘের সঙ্গে যেমন আকাশের) দেহেন ন মে সম্বন্ধঃ ([তেমনি] দেহের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই) অতঃ (অতএব) জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তয়ঃ তৎ-ধর্মাঃ (জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ [দেহের] যেসব ধর্ম) মে কুতঃ (আমার কোথা থেকে আসবে) ?

সরলার্থ: মেঘের সঙ্গে আকাশের যেমন কোনও সম্বন্ধ নেই তেমনি আমারও দেহের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নেই। অতএব দেহের যেসব ধর্ম, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি ইত্যাদি, তা আমার কোথা থেকে আসবে ?

ব্যাখ্যা: বলছেন, এই দেহের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। এই দেহ তো একটা আরোপিত জিনিস, আমার ওপরে চাপানো হয়েছে। 'ন মে দেহেন সম্বন্ধঃ'—দেহের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। দেহ থেকে আমরা যে আলাদা, সেটা আমাদের কথার মধ্যেও ফুটে ওঠে। আমরা বলি, আমার দেহ, আমি দেহ তো বলি না। উপমা দিচ্ছেন, মেঘ আর আকাশের। এই তুলনাটা দিচ্ছেন শুধু একটা ধারণা দেওয়ার জন্যে। ব্রহ্ম আর আকাশ এক নয়। ব্রহ্ম নিরুপম, আকাশও তাঁর তুলনা হতে পারে না। তবুও একটা চেষ্টা করছেন এই উপমাটা দিয়ে ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটু আভাস দেওয়ার জন্যে। বলছেন, 'মেঘেনেব বিহায়সঃ'—মেঘের সঙ্গে যেমন আকাশের কোন সম্পর্ক নেই। অনেক জায়গায় তো মেঘ জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে, বাড়ীর ছাদে উঠে মেঘ ধরা যায়। কিন্তু আকাশ সর্বদাই দূরের বস্তু। সাধারণ চোখে মনে হয় মেঘ যেন আকাশের সঙ্গে লেগে আছে। কিন্তু আকাশ কখনই মেঘের সঙ্গে মেশে না। মেঘ কখনও আকাশকে স্পর্শ করতে পারে না। ব্রহ্ম ঐ আকাশের মতো। আর দেহ যেন মেঘ। মেঘের সঙ্গে যেমন আকাশের আসলে কোন যোগ নেই—শুধু দেখার ভুল—দেহের সঙ্গেও ব্রহ্ম বা আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। তাই দেহের ধর্ম দেহেরই থাকে, তা কখনও আত্মার ধর্ম হয় না। শিষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন। নিজেকে তিনি ব্রহ্ম দেখছেন। তাই গুরুকে

বলছেন : আমি দেহ নই। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এগুলো দেহের ধর্ম, আমার নয়। আমি আত্মা, সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। 'অতঃ কুতঃ মে তদ্ধর্মা জাগ্রত-স্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ'। প্রতিদিন দেহধারী প্রতিটি জীবকে এই তিনটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়—জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, জাগরণ, নিদ্রা আর গভীর স্বপ্নশূন্য নিদ্রা। দেহ থাকে বলেই এই অবস্থাগুলো আসে। দেহে 'আমি'-বোধ থাকে বলেই জীবের মনে হয় জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি তারই তিনটে অবস্থা। কিন্তু আসলে এগুলি দেহের। শিষ্য বলছেন : আমি তো জেনেছি, আমি দেহ নই, আমি আত্মা। তাহলে দেহের এসব ধর্ম আমার মধ্যে কোথা থেকে আসবে ? জাগ্রতস্বপ্নসুষুপ্তি—এ সব উপাধি। আমি নিরুপাধিক। আমার জাগাও নেই, স্বপ্নও নেই, ঘুমও নেই। আমি নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ, নিরুপাধিক ব্রহ্ম। তাই দেহের ধর্ম দেহেই থাকবে। 'কুতঃ মে তদ্ধর্মাঃ'—আমার মধ্যে সেসব কি করে আসবে ?

উপাধিরায়াতি স এব গচ্ছতি
স এব কর্মাণি করোতি ভুংক্তে।
স এব জীর্যন্ ম্রিয়তে সদাহং
কুলাদ্রিবন্নিশ্চল এব সংস্থিতঃ॥ ৫০১

অন্বয়: উপাধিঃ (স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীর) আয়াতি (আসে) সঃ এব গচ্ছতি (সেই দেহ প্রারব্ধ ক্ষয় হলে চলে যায়) সঃ এব (সেই দেহই) কর্মাণি করোতি ভুংক্তে (ধর্মাধর্ম সমস্ত কর্ম করে ও সেসবের ফল ভোগ করে) সঃ এব জীর্যন্ ম্রিয়তে (সেই দেহই জীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়) অহং (আমি) সদা (সর্বদা) কুলাদ্রিবৎ-নিশ্চলঃ এব সংস্থিতঃ (মেরু-পর্বতের মতো স্থির অচঞ্চল ভাবে অবস্থান করি)।

সরলার্থ: স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীর-রূপ উপাধি আসে আবার সেই দেহই প্রারব্ধ ক্ষয় হলে চলে যায়। সেই দেহই জীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি কিন্তু মেরু-পর্বতের মতো স্থির নিশ্চল ভাবে সর্বদা অবস্থান করি।

ব্যাখ্যা: এখানে উপাধি বলতে দেহকে বোঝাচ্ছেন। আমাদের তিন রকম শরীর আছে—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর। তারপর তুরীয় অবস্থা। তুরীয় অবস্থা হচ্ছে শুদ্ধ চৈতন্য। তার ঠিক আগে কারণ অবস্থা। এই অবস্থায় মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধটা খুব ক্ষীণ থাকে। সুষুপ্তির সময় আমরা ঐ কারণ শরীরে চলে যাই। তার আগে আছে সূক্ষ্মশরীর। যেমন আমাদের স্থূলশরীর সেইরকম একটা সূক্ষ্মশরীর আমাদের আছে, অস্পষ্ট, যেন রেখা-শরীর। আমাদের শাস্ত্রে বলে বায়ুভূত শরীর। সব ইন্দ্রিয়গুলি ও মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার নিয়ে আমাদের এই সূক্ষ্মশরীর বা রেখা-শরীর। এই শরীর চলতে পারে, কথা বলতে

পারে, কিন্তু অস্পষ্ট। বলছেন, 'উপাধি আয়াতি স এব গচ্ছতি'; উপাধি আসে আবার যায়। যে আসে সে যাবেই। জন্ম হলে মৃত্যু হবেই। আত্মার ওপর স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর এই উপাধিগুলো আসছে যাচ্ছে। যেমন, আত্মার ওপর সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর উপাধি হিসেবে আছে, এর ওপর স্থূলশরীর যোগ হলো মানে জীবের জন্ম হলো। আবার ঐ উপাধিটা চলে গেলো, স্থূলশরীর চলে গেলো—জীবের মৃত্যু হলো। ঘুমিয়ে আছি—স্থূলশরীরের উপাধি চলে গেছে। সুষুপ্তিতে আছি—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দুটো উপাধিই তখন নেই। জেগে উঠলাম, আবার সেই উপাধিগুলো এসে গেলো। এইভাবেই আত্মার ওপরে উপাধিগুলো আসে আর যায়—যেমন আকাশের ওপর দিয়ে মেঘ ভেসে যায়। কিন্তু আত্মা যেমন তেমনই থাকে। 'স এব কর্মাণি করোতি ভুংক্তে'—শরীরই কাজ করে, শরীরই কাজের ফল ভোগ করে। স্থূলশরীরের সাহায্যে সূক্ষ্মশরীর কাজ করে আর কাজের ফলও সে-ই ভোগ করে। যতক্ষণ বাসনা আছে, শরীরে 'অহং'-বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ কাজও আছে। কিন্তু আত্মজ্ঞান হলে আমার আর কোন কাজ নেই। আমি যদি বুঝি, আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, তখন আমার ভালো কাজও নেই মন্দ কাজও নেই। কিন্তু যিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁর উপস্থিতি থেকেই সকলের জন্যে কল্যাণ কামনা আশীর্বাদ এসব যেন বিচ্ছুরিত হতে থাকে। 'সর্বে সুখিনঃ ভবন্তু'। তাঁকে আর ত্রাণকার্য করে লোকের কল্যাণ করতে হয় না। 'মা কশ্চিৎ দুঃখম্ আপ্নুয়াৎ'। বসন্ত-বাতাস যেমন নিজেই বয়ে যায় সকলকে আরাম দেবার জন্যে তেমনি এঁদের কল্যাণ-ইচ্ছা সকলের হিতের জন্যে সর্বদা রয়েছে। 'স এব জীর্যন্ ম্রিয়তে সদা-অহং কুলাদ্রিবৎ নিশ্চলঃ এব সংস্থিতঃ'। শরীর জীর্ণ হয়ে মরে যায় আমি কিন্তু মেরু-পর্বতের মতো স্থির নিশ্চল হয়ে অবস্থান করি। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের শরীর আছে সে বোধও নেই শরীর যাচ্ছে সে বোধও থাকে না। শরীর যাচ্ছে তো যাক। শরীর সম্বন্ধে কোনও সচেতনতাই নেই। তাঁরা নিজেদের প্রকৃত স্বরূপটা জেনেছেন। সেটা কিরকম ? 'কুলাদ্রিবৎ নিশ্চলঃ', মেরু-পর্বতের মতো নিশ্চল। দক্ষিণমেরু, উত্তরমেরু এইরকম আটটি মেরু-পর্বত আছে, স্থির নিশ্চল হয়ে আছে, তাদের কোনও পরিবর্তন হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মেরু-পর্বতের মতো স্থির নিশ্চল হয়ে থাকেন। উপাধি আসবে, যাবে। দেহ আসবে, যাবে। যা আসে তা যায়, সে তো যাবেই, যাক। কিন্তু আমাদের আত্মা ? তাঁর কোনও পরিবর্তন নেই, তিনি একভাবে সব সময় স্থির হয়ে আছেন। কিরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গী। আমি যদি জানি, আমি আত্মা তাহলে আমার যাওয়াও নেই আসাও নেই। কোথায় যাব আমি ? আমি 'কুলাদ্রিবৎ' কূটস্থ হয়ে আছি পাহাড়ের চুড়োর মতো। কোন কিছুতেই আমার বিকার নেই, স্থির, নিশ্চল।

ন মে প্রবৃত্তির্ন চ মে নিবৃত্তিঃ
সদৈকরূপস্য নিরংশকস্য।

একাত্মকো যো নিবিড়ো নিরন্তরো
ব্যোমেব পূর্ণঃ স কথং নু চেষ্টতে॥ ৫০২

অন্বয়: সদা-একরূপস্য নিরংশকস্য মে (সর্বদা একরূপ, অখণ্ড আমার) প্রবৃত্তিঃ ন (প্রবৃত্তি নেই) নিবৃত্তিঃ চ ন মে (আমার নিবৃত্তিও নেই) যঃ ব্যোম-ইব একাত্মকঃ নিবিড়ঃ নিরন্তরঃ পূর্ণঃ (যে আকাশের মতো এক সত্তা, ঘন, ছেদহীন, পূর্ণ) সঃ কথং নু চেষ্টতে (সে কি করে আর কর্মের চেষ্টা করে)?

সরলার্থ: সর্বদা একরূপ নিষ্কল আমার প্রবৃত্তিও নেই নিবৃত্তিও নেই। যে আকাশের মতো এক সত্তামাত্র, ঘন, নিরন্তর, পূর্ণ, সে কি করে আর কর্মের চেষ্টা করে ?

ব্যাখ্যা: শিষ্য বলছেন, আমার আত্মজ্ঞান হয়েছে। কিরকম অবস্থা আমার ? 'ন মে প্রবৃত্তিঃ'—আমার কোনও ইচ্ছা নেই। এটা করব, সেটা করব, এরকম ইচ্ছে মানুষের থাকে, কিন্তু 'ন মে প্রবৃত্তিঃ'। আমি কিছু চাই না, আমার কিছু পাবার ইচ্ছে নেই। কোনও কিছুতেই আকর্ষণ নেই। আবার বলছেন, 'ন চ মে নিবৃত্তিঃ'; যেমন আমার কোনও কিছু করার ইচ্ছে নেই তেমনি কিছু করার অনিচ্ছাও নেই। যেমন কিছুতেই আকর্ষণ নেই তেমনি কোনও কিছুতে বিকর্ষণও নেই। এটা করব সেটা করব এরকম যেমন নেই, তেমনি এসব করব না এ ভাবও নেই। আমার কাছে সব সমান। গীতাতে যেমন আছে সমদৃষ্টির কথা। ভালো হোক, মন্দ হোক, আমার কিছু এসে যায় না। কোনও বিপরীত জিনিস আমার কাছে দুরকম বলে মনে হয় না। আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কিছুই আমার নেই। কেন নেই ? কারণ 'সদা-একরূপস্য নিরংশকস্য'—সর্বদা একরূপ আমার। সংসারের সব অনিত্য বস্তুর মধ্যে একমাত্র আমিই নিত্য। আমি নিরংশক—আমার কোন অংশ, কলা বা খণ্ড নেই। আমি অখণ্ডস্বরূপ, পূর্ণ। শিষ্য নিজেকে ব্রহ্ম হিসেবে উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি নিজেকে এইভাবে বর্ণনা করছেন। বলছেন : কি করে আমার কোন কিছু পাবার জন্যে ইচ্ছে হবে বা চেষ্টা হবে ? আমি তো আকাশের মতো সবকিছুকে ব্যাপ্ত করে আছি। সর্বত্র তো শুধু আমি। যেটা পেতে চাইব, সেটাও যে আমিই। 'একাত্মকঃ যঃ নিবিড়ঃ নিরন্তরঃ'; আমি 'একাত্মকঃ', একা, আমার কোনও জুড়ি নেই, তুলনা নেই। 'নিবিড়ঃ' অর্থাৎ ঘন, আমার মধ্যে অন্য কিছুর মিশেল নেই, আমি 'নিরন্তরঃ', আমার মধ্যে কোনও ফাঁক নেই, কোনও ছেদ নেই। 'ব্যোম্-এব পূর্ণঃ'—আমি ব্রহ্ম, আকাশের মতো সবকিছু আমি পূর্ণ করে আছি। ভালোর মধ্যেও আছি, মন্দের মধ্যেও আছি, সর্বত্র আছি। 'যঃ ব্যোম্-এব পূর্ণঃ সঃ কথং নু চেষ্টতে'; আকাশের মতো যিনি সর্বব্যাপী, সর্বত্র অনুস্যূত তাঁর আবার কর্ম চেষ্টা কি ? তিনি কিছু করেন না, তাঁর কোনও চেষ্টা নেই। জগতের কর্মপ্রবাহের মধ্যে তিনি সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন।

পুণ্যানি পাপানি নিরিন্দ্রিয়স্য
নিশ্চেতসো নির্বিকৃতেনির্রাকৃতেঃ।
কুতো মমাখণ্ডসুখানুভূতে-
র্ব্রূতে হ্যনন্বাগতমিত্যপি শ্রুতিঃ॥৫০৩

অন্বয় : নিরিন্দ্রিয়স্য নিশ্চেতসঃ নির্বিকৃতেঃ নিরাকৃতেঃ অখণ্ডসুখ অনুভূতেঃ মম (ইন্দ্রিয়রহিত, মনঃরহিত, নির্বিকার, নিরাকার, নিরন্তর সুখ-অনুভূতিস্বরূপ আমার) পুণ্যানি পাপানি কুতঃ (পুণ্য ও পাপ সমূহ কোথা থেকে আসবে) শ্রুতিঃ অপি হি ব্রূতে (শ্রুতিও বলেন) 'অনন্বাগতম্' ইতি (অস্পৃষ্ট ইত্যাদি)।

সরলার্থ : ইন্দ্রিয়হীন, মনঃরহিত, নির্বিকার, নিরাকার, অখণ্ডসুখ-অনুভূতিস্বরূপ আমার পুণ্য বা পাপ কোথা থেকে আসবে ? 'অনন্বাগতম্' ইত্যাদি শ্রুতিও এই বিষয়ে একই কথা বলেন।

ব্যাখ্যা : আমার শরীর আছে অথচ আত্মজ্ঞান হয়েছে, জীবন্মুক্ত অবস্থা, তাহলে সংসারে আমি কিভাবে থাকব? জীবনটা আমার কিরকম হবে? এই জীবনটা তখন একটা মজার জিনিস হয়ে দাঁড়াবে। ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন রান্নাবাটি খেলা করে, জীবনটা তখন সেই খেলার মতো হয়ে দাঁড়ায়। শিষ্যের তো আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, নিজের অবস্থা দিয়ে শিষ্য এটা বর্ণনা করছেন। বলছেন, আমার পাপও নেই পুণ্যও নেই। 'পুণ্যানি পাপানি কুতঃ'—পাপ-পুণ্য এসব কোথা থেকে আসবে ? পাপ, পুণ্য, এসব তো আপেক্ষিক কথা। একটা অবস্থায় যেটা ভালো আর একটা অবস্থায় সেটা ভালো নয়। এগুলো সব বিশেষ অবস্থা-নির্ভর। আমি কোনও কিছুর ওপর নির্ভর করে নেই, স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই ওসব আমার নেই। 'নিরিন্দ্রিয়স্য'—আমার কোনও ইন্দ্রিয় নেই। নাক, মুখ, চোখ, কান, এগুলো আমার নয়, দেহের। এগুলো আমার ওপর চাপানো হয়েছে, উপাধি। আমি এসবের থেকে আলাদা। 'নিশ্চেতসঃ'—আমার মনও নেই। বহিরিন্দ্রিয়গুলো আমার নয়, আবার অন্তরিন্দ্রিয় মনও আমার নয়। 'নির্বিকৃতে'—আমার কোনও বিকৃতি নেই, আমার কোনও পরিবর্তন নেই। যা পরিবর্তনশীল তা অনিত্য, কিন্তু আমি নিত্যসত্য, সব সময় আছি। 'নিরাকৃতে'—আমার কোনও আকার নেই, যেমন আকাশের কোনও আকার নেই। তারপর বলছেন, 'মম-অখণ্ড সুখ-অনুভূতেঃ'; আমার অখণ্ডসুখ; সুখটা আমার স্বরূপ। একটা বাইরে থেকে সুখ এলো তা নয়, অখণ্ডসুখ আমার ভেতরে, এই সুখ নিরন্তর। এই আমার স্বরূপ। আমি অখণ্ড আনন্দস্বরূপ আত্মা। আমার ইন্দ্রিয় নেই, মন নেই, আকার নেই, বিকার নেই। তাহলে পাপ-পুণ্য আমার মধ্যে কোত্থেকে আসবে। 'ব্রূতে শ্রুতিঃ'—শ্রুতিও এই ব্যাপারে একই কথা বলছেন। এখানে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন : 'অনন্বাগতং

পুণ্যেন অনন্বাগতং পাপেন' (বৃ. ৪।৩।২২)। পুণ্য আমাকে স্পর্শ করতে পারে না, পাপও আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। পাপ-পুণ্য কর্মের ফল হিসেবে মানুষের কাছে এসে থাকে। আমি সর্বদা আত্মস্বরূপে স্থিত আছি। আমার কর্ম নেই, তাই আমার পাপ-পুণ্যও নেই।

ছায়য়া স্পৃষ্টমুষ্ণং বা শীতং বা সুষ্ঠু দুঃষ্ঠু বা।
ন স্পৃশত্যেব যৎকিঞ্চিৎ পুরুষং তদ্‌বিলক্ষণম্॥ ৫০৪

অন্বয় : ছায়য়া স্পৃষ্টম্ (দেহের ছায়ার সঙ্গে স্পর্শযুক্ত) যৎকিঞ্চিৎ (যা কিছু) উষ্ণং বা শীতং বা (উষ্ণ পদার্থ বা শীতল পদার্থ) সুষ্ঠু বা দুঃষ্ঠু বা (ভালো বা মন্দ) তৎবিলক্ষণম্ পুরুষং (ছায়া থেকে ভিন্ন পুরুষকে) ন স্পৃশতি এব (কখনই স্পর্শ করে না)।

সরলার্থ : পুরুষের শরীরের যে ছায়া তাকে যা কিছুই স্পর্শ করুক না কেন—উষ্ণ পদার্থ বা শীতল পদার্থ—সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক বস্তু, সেসব ছায়া থেকে ভিন্ন পুরুষকে কখনই স্পর্শ করে না।

ব্যাখ্যা : জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থা বর্ণনা করছেন। আত্মজ্ঞান হয়েছে, দেহে আর 'আমি-বুদ্ধি' নেই। তখন জগৎ-সংসারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিরকম হবে ? একটা সুন্দর উপমা দিচ্ছেন : আমার সঙ্গে আমার ছায়ার যেমন সম্পর্ক, সেই রকম। রোদের মধ্যে আমি যদি হাঁটি তাহলে আমার একটা ছায়া পড়বে, সেই ছায়াটাকে কেউ যদি লাথি মারে তাহলে আমার কি লাগবে ? লাগবে না। বলছেন, 'ছায়য়া স্পৃষ্টম্-উষ্ণং বা শীতং'। ছায়ার ওপর কেউ আগুন ঢেলে দিয়েছে, আবার হয়তো কেউ বরফ ফেলে দিলে। এর জন্যে আমি কি পুড়ে যাব, বা আমার ঠাণ্ডা লাগবে ? কিছুই হবে না আমার। ভালো, মন্দ, সুখস্পর্শ বা দুঃখদায়ক যা কিছুই আমার ছায়ার ওপর পড়ুক না কেন 'ন স্পৃশতি'—সেসব আমাকে স্পর্শ করবে না। কেন ? কারণ আমি তো 'তদ্‌বিলক্ষণম্'; আমি ছায়ার থেকে আলাদা। ছায়া আর যার ছায়া, এ দুটো আলাদা, তাই ছায়াতে কিছু লাগলে তা আমায় স্পর্শ করছে না। জীবন্মুক্ত অবস্থা হলে আর 'আমি আমার' বোধ থাকে না, তাই এই জগৎ-সংসার সব ছায়ার মতো দেখি। জগতে কত রকমের কাণ্ড হচ্ছে, সব ছায়ার মতো আমার সামনে দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। কিছুর সঙ্গে আমার কোনও লিপ্ততা নেই, আমি আত্মস্থ হয়ে আছি।

ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্মাঃ সংস্পৃশন্তি বিলক্ষণম্।
অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্মাঃ প্রদীপবৎ॥ ৫০৫

অন্বয় : বিলক্ষণম্ অবিকারম্-উদাসীনং সাক্ষিণং (সবকিছু থেকে ভিন্ন, অবিকারী, উদাসীন সাক্ষীকে) সাক্ষ্যধর্মাঃ (যে সব বিষয়ের সাক্ষিত্ব সেইসব বিষয়ের দোষ-গুণ) ন সংস্পৃশন্তি (স্পর্শ করে না) গৃহধর্মাঃ প্রদীপবৎ (যেমন গৃহে যে প্রদীপ জ্বলে তাকে গৃহের মধ্যেকার ঘটনা কখনও স্পর্শ করে না)।

সরলার্থ : সবকিছু থেকে ভিন্ন, অবিকারী, উদাসীন সাক্ষিরূপে যিনি আছেন তাঁকে, যেসব বিষয়ের তিনি সাক্ষী, সেই সবের দোষ গুণ কখনও স্পর্শ করে না। যেমন গৃহে যে প্রদীপ জ্বলে তাকে, গৃহের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী কখনও স্পর্শ করে না।

ব্যাখ্যা : শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে একটা প্রদীপের আলোয় কেউ ভালো বই পড়ছে আবার কেউ দলিল জাল করছে, এইসব কাজের ভালো বা মন্দ ফল প্রদীপকে স্পর্শ করছে না। জীবন্মুক্ত পুরুষ ঐ প্রদীপের মতো সাক্ষিস্বরূপ সংসারে থাকেন। বলছেন, 'ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্মাঃ'; সাক্ষী আর সাক্ষ্য আলাদা। সাক্ষ্য তো দৃশ্য, আমি সাক্ষী, দ্রষ্টা। যা সাক্ষ্য তাতে আঘাত করলে আমার কি লাগবে ? একটা জিনিস দেখছি, সেটা যদি ভেঙে যায় তাতে আমার চোখের কি কিছু হলো ? যেটা দৃশ্য সেটার কিছু হলে দ্রষ্টা যে তার কিছু হয় না। সাক্ষ্যের ধর্ম সাক্ষীকে 'ন সংস্পৃশন্তি', স্পর্শ করে না। দৃশ্যের যা কিছুই হোক সেটা দ্রষ্টাকে স্পর্শ করে না। কারণ 'বিলক্ষণম্'—সাক্ষী আর সাক্ষ্য আলাদা। দ্রষ্টা আর দৃশ্য, দুটো ভিন্ন পদার্থ, একটা অন্যকে স্পর্শ করে না। আমি 'অবিকারম্-উদাসীনম্ গৃহধর্মাঃ প্রদীপবৎ'। আমি অবিকার, সনাতন, নির্বিকার, কিছুতেই আমার কোন পরিবর্তন হয় না। আমি উদাসীন, নির্লিপ্ত, কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে নেই, লিপ্ত নই। কিরকম উদাসীন ? না, 'গৃহধর্মাঃ প্রদীপবৎ'; একটা ঘরে প্রদীপ জ্বালা আছে। সেই ঘরে কত কি ঘটছে তা কি প্রদীপকে স্পর্শ করছে ? সেই ঘরে কেউ হয়তো একজনকে খুন করল, তা কি প্রদীপকে স্পর্শ করবে ? করবে না। ঘরে কত কাণ্ডকারখানা হচ্ছে, প্রদীপ শুধু সাক্ষী হয়ে আছে। তাকে কিছুই স্পর্শ করছে না। 'পদ্মপত্রম্-ইব-অম্ভসা', পদ্মপত্রে জল ঢাললে সেই জল যেমন পদ্মপাতাকে ভেজাতে পারে না আমি তেমনি নির্লিপ্ত হয়ে আছি, সংসারের কোনও কিছুই আমাকে স্পর্শ করছে না। আমি আত্মা। আমি উদাসীন, নির্লিপ্ত, স্বতন্ত্র।

রবের্যথা কর্মণি সাক্ষিভাবো বহ্নের্যথা দাহনিয়ামকত্বম্।
রজ্জোর্যথারোপিত-বস্তু-সঙ্গস্তথৈব কূটস্থচিদাত্মনো মে॥ ৫০৬

অন্বয় : যথা রবেঃ (যেমন সূর্যের) কর্মণি (জগতের সবকিছু কাজে) সাক্ষিভাবঃ (সাক্ষিভাব) যথা বহ্নেঃ (যেমন অগ্নির) দাহনিয়ামকত্বম্ (দহন কার্যে নিয়ামকত্ব) যথা রজ্জোঃ (যেমন রজ্জুর) আরোপিত-বস্তু-সঙ্গঃ (আরোপিত বস্তুর সঙ্গে লিপ্ততা) তথা এব (সেইরকমই) কূটস্থ চিদাত্মনঃ মে (আমার কূটস্থ চিদাত্মা [সাক্ষিস্বরূপ নির্লিপ্ত])।

সরলার্থ : যেমন সূর্যালোকে প্রকাশিত জগতে যেসব কাজ হতে থাকে সেসবে সূর্যের সাক্ষিভাব, যেমন দহনক্রিয়ায় পবিত্র-অপবিত্র নির্বিশেষে অগ্নির নিরপেক্ষ ভাব, এবং রজ্জুর সঙ্গে আরোপিত বস্তু মিথ্যা সর্পজ্ঞানের যেমন সম্বন্ধ তেমনি আমার কূটস্থ চিদাত্মার জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ।

ব্যাখ্যা : বলছেন, সূর্যের আলো ফুটলেই এ জগতে নানা রকমের কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। কিন্তু যে সূর্যের আলোয় এত সব কর্মের উদ্দীপনা তিনি নির্লিপ্ত সাক্ষিস্বরূপ হয়ে আছেন, কিছুই করছেন না। তাঁর আলোয় কি কি কাজ হচ্ছে, সে ব্যাপারে সূর্য নিস্পৃহ। 'রবেঃ-যথা কর্মণি সাক্ষিভাবঃ'—রবির যেমন এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে সাক্ষিভাব আমার আত্মাও তেমনি সব কর্মের মধ্যে সাক্ষিস্বরূপ হয়ে রয়েছেন। কোনও কর্মের সঙ্গেই তিনি লিপ্ত নন, কিন্তু তিনি আছেন বলেই সব কাজ চলছে। আবার বলছেন, 'বহ্নেঃ যথা দাহনিয়ামকত্বম্'—বহ্নির যেমন দহনক্রিয়াতে নিয়ন্ত্রণ। কি পোড়াবে তা আগুন ঠিক করে না, আগুন যে ব্যবহার করে সে ঠিক করে। আগুনের কাছে পবিত্র-অপবিত্র কিছু নেই। সে সব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, মৃতদেহ পোড়ায় আবার পবিত্র যজ্ঞের কাঠ পুড়িয়ে যজ্ঞাগ্নির সৃষ্টি করে। তার কাজ দাহ করা সে দাহ করছে, নির্লিপ্ত, নির্বিকার। আমাদের আত্মাও তাই। 'রজ্জোঃ-যথা-আরোপিত-বস্তু-সঙ্গঃ তথা-এব কূটস্থ চিদাত্মনঃ মে'। দড়ির সঙ্গে তার ওপর আরোপিত বস্তুর যে সম্পর্ক সেইরকম আমার কূটস্থ চিদাত্মার সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ। অন্ধকারে দড়িটাকে ভুল করে সাপ ভেবেছি। এই যে মিথ্যা সর্পজ্ঞান, যেটা দড়ির ওপর আরোপ করেছি, তার সঙ্গে দড়ির সম্পর্কটা কি ? সত্যিকারের কোন সম্পর্ক নেই। অন্ধকার আছে বলে সাময়িকভাবে কাল্পনিক একটা সম্পর্ক হয়েছে। দড়ি অধিষ্ঠান, সাপটা আরোপিত বস্তু। আরোপিত বস্তুর সঙ্গে অধিষ্ঠানের কোনও লিপ্ততা নেই। তেমনি এই জগৎ-সংসার আমার কূটস্থ চিদাত্মার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অধ্যস্ত হয়ে আছে। তিনি আছেন বলেই সবকিছু আছে, তিনিই অধিষ্ঠান। আর সব অধ্যাস, আরোপিত বস্তু। তিনি আশ্রয়। 'কূটস্থ চিদাত্মনঃ মে'—আমার কূটস্থ চিদাত্মার এই জগতের সঙ্গে কোনও লিপ্ততা নেই, যেমন রজ্জুর সঙ্গে অস্তিত্বহীন সাপের কল্পনার কোনও লিপ্ততা নেই।

কর্তাপি বা কারয়িতাপি নাহং
ভোক্তাপি বা ভোজয়িতাপি নাহম্।
দ্রষ্টাপি বা দর্শয়িতাপি নাহং
সোঽহং স্বয়ংজ্যোতিরনীদৃগাত্মা॥ ৫০৭

অন্বয়: অহং কর্তা-অপি বা কারয়িতা-অপি ন (আমি কর্তাও নই বা কারয়িতাও নই) অহং ভোক্তা-অপি বা ভোজয়িতা-অপি ন (আমি ভোক্তাও নই বা ভোজয়িতাও নই) অহং দ্রষ্টা-অপি বা দর্শয়িতা-অপি ন (আমি দ্রষ্টাও নই আবার দর্শয়িতাও নই) অহং অনীদৃক্ (আমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বয়ংপ্রকাশ) সঃ আত্মা (সেই আত্মা)।

সরলার্থ: আমি কর্তা নই কারয়িতাও নই, ভোক্তা নই ভোজয়িতাও নই, দ্রষ্টা নই দর্শয়িতাও নই। আমি স্বয়ংপ্রকাশ সেই আত্মা যিনি ইন্দ্রিয়ের গোচর নন।

ব্যাখ্যা: জীবন্মুক্তি অবস্থা প্রাপ্ত হলে কিরকম জীবন হয়, দৃষ্টিভঙ্গীটা কিরকম হয় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিষ্য সেটা পরপর বর্ণনা করছেন। যিনি জীবন্মুক্ত তাঁর অহংতা আর মমতা দুটোই চলে যায়। এই 'আমি আমার' নিয়েই তো যত গোলমাল, তাঁদের সেটা আর থাকে না। বলছেন, 'কর্তা-অপি বা কারয়িতা অপি ন অহং'—আমি কর্তা নই কারয়িতাও নই। আমি নিজে কিছু করি না, অপরকে দিয়েও কিছু করাই না। 'ভোক্তাপি বা ভোজয়িতাপি নাহম্'—আমি নিজে ভোগ করি না, খাই না। আবার আমি ভোজয়িতা নই, অপরকে দিয়েও ভোগ করাই না, বা কাকেও খাওয়াচ্ছিও না। 'অহং দ্রষ্টা-অপি বা দর্শয়িতা-অপি ন'—আমি দ্রষ্টা নই, দর্শয়িতাও নই, অপরকে কিছু দেখাচ্ছিও না, নিজেও দেখছি না। 'সোঽহং'—আমিই তিনি। এই পর্যন্তই বলতে পারি কারণ তাঁকে কি বলে উল্লেখ করব তা তো জানি না। আমিই সেই। সেই কি ? যাঁর পেছনে আমরা ছুটছি, আমিই সেই পরমাত্মা। 'স্বয়ংজ্যোতিঃ'; জ্যোতি বলছেন জ্ঞানকে বোঝাবার জন্যে। আলো যেমন স্বয়ংপ্রকাশ, সবকিছু দেখতে সাহায্য করছে, কিন্তু তাকে দেখবার জন্যে অন্য একটা আলো লাগে না, তেমনি আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি আমার ভেতরের মলিনতার জন্যে, আমার 'আমি আমার' ভাবের জন্যে ঢাকা আছেন। তিনি 'অনীদৃক্'; 'অন্' মানে নয় আর 'দৃক্' হচ্ছে দেখা, 'অনীদৃক্' হচ্ছে যাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না, যিনি ইন্দ্রিয়ের গোচর নন। 'সোঽহং স্বয়ংজ্যোতিঃ-অনীদৃক্-আত্মা'। আমি ওই নির্বিকল্প, নিরাকার, শুদ্ধ চৈতন্য। আমি স্বয়ংজ্যোতি, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বতন্ত্র, আমি স্বনির্ভর, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আমি 'অনীদৃক্-আত্মা'।

চলত্যুপাধৌ প্রতিবিম্বলৌল্যমৌপাধিকং মূঢ়ধিয়ো নয়ন্তি।
স্ববিম্বভূতং রবিবদ্বিনিষ্ক্রিয়ং কর্তাস্মি ভোক্তাস্মি হতোঽস্মি হেতি॥৫০৮

অন্বয়: মূঢ়ধিয়ঃ (বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা) উপাধৌ চলতি (উপাধি চঞ্চল হলো) ঔপাধিকম্ প্রতিবিম্বলৌল্যম্ (উপাধিতে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের চাঞ্চল্য) নয়ন্তি (বিম্বের চাঞ্চল্য বলে গ্রহণ করে) রবিবৎ-বিনিষ্ক্রিয়ং (সূর্যের মতো নিষ্ক্রিয়) স্ববিম্বভূতং (স্বীয় বিম্বস্বরূপ আত্মাতে

[দেহাদি উপাধির গুণ আরোপ করে মূঢ় ব্যক্তি]) কর্তা অস্মি (আমি কর্তা) ভোক্তা অস্মি (আমি ভোক্তা) হা হতঃ অস্মি (হায় আমি হত হলাম) ইতি (এই রকম মনে করে)।

সরলার্থ: জল ইত্যাদি উপাধি চঞ্চল হলে সেই উপাধিতে প্রতিফলিত সূর্যের প্রতিবিম্বকেও চঞ্চল দেখায়। যারা মূঢ়বুদ্ধি তারাই এই প্রতিবিম্বের চাঞ্চল্যকে নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় সূর্যের চঞ্চলতা বলে মনে করে। তেমনি যারা বুদ্ধিহীন তারাই স্বীয়বিম্বস্বরূপ নিষ্ক্রিয় আত্মাকে দেহ, বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধির সঙ্গে এক করে মনে করে 'আমি কর্তা', 'আমি ভোক্তা', 'হায় আমি হত হলাম'।

ব্যাখ্যা: বলছেন, জলে সূর্যের ছায়া পড়েছে। জলটা হাত দিয়ে নাড়িয়ে দিয়েছি। তাতে সূর্যের ছায়াটা ভেঙেচুরে গেলো কিন্তু এতে সূর্যের কি কিছু হলো? হলো না। তেমনি উপাধির পরিবর্তন আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। যারা 'মূঢ়ধিয়ঃ', যাদের বুদ্ধি নেই, বিচারশক্তি নেই, তারাই উপাধির চাঞ্চল্যকে আত্মার চাঞ্চল্য বলে মনে করে। 'চলতি-উপাধৌ প্রতিবিম্বলৌল্যম্-ঔপাধিকম্ মূঢ়ধিয়ঃ নয়ন্তি'। উপাধি একটা চাপানো জিনিস, পরিবর্তনশীল, অনিত্য। যারা নির্বোধ তারা অনিত্য জিনিসকে নিত্য মনে করে। 'চলতি-উপাধৌ', মানে উপাধি পালটে যাচ্ছে। 'প্রতিবিম্বলৌল্যম্-ঔপাধিকম্'; 'লৌল্য' মানে নড়ে যাচ্ছে। উপাধি পালটে গেলে, উপাধিতে যে প্রতিবিম্ব পড়েছে, সে-ও পালটে যায়। জলে সূর্যের ছায়া পড়েছে, জলটাকে হাত দিয়ে নাড়িয়ে দিয়েছি, তাতে সূর্যের ছায়া নড়েচড়ে গেলো, সূর্যের কিছু হলো না। কিন্তু যারা মূঢ়, বুদ্ধিহীন, তারা মনে করতে পারে এতে সূর্যের কিছু হলো। 'স্ববিম্বভূতং রবিবৎ বিনিষ্ক্রিয়ং'; আমার আত্মা ওই স্ববিম্বভূত সূর্যের মতো নিষ্ক্রিয়। যেমন সূর্য আর তার প্রতিবিম্ব আলাদা, তেমনি আমি দেহ-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধি থেকে আলাদা। আমার আত্মা আর আমার দেহ আলাদা। আমার দেহটা যেন প্রতিবিম্বর মতন, এই দেহের রোগব্যাধি যাই হোক সেটা আমার আত্মাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু বুদ্ধির দোষে আমরা সেটা ভুলে যাই। প্রতিবিম্বকে বিম্বভূত করে ফেলি, দেহ-মন-বুদ্ধিকে আত্মার সঙ্গে এক করে ফেলি। বুদ্ধির দোষে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, এসব আত্মার ওপর আরোপ করি। 'কর্তা-অস্মি ভোক্তা-অস্মি'—আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, এইসব মনে করি। 'হা হতঃ-অস্মি ইতি'—হায় আমি মরে গেলাম, এসব ভাবি। আমরা মূঢ়ধী, বিচারশক্তিহীন—তাই এসব ভাবি। আসলে আমি সর্বদাই মুক্ত, স্বাধীন। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব এসব আমার দেহ-মনের, আমার নয়। আমি আত্মা, আমার কোনও বিকার নেই, পরিবর্তন নেই।

জলে বাপি স্থলে বাপি লুঠত্বেষ জড়াত্মকঃ।
নাহং বিলিপ্যে তদ্ধর্মৈর্ঘটধর্মৈর্নভো যথা॥ ৫০৯

অন্বয়: এষঃ জড়-আত্মকঃ (এই স্থূল জড়দেহ) জলে বা অপি স্থলে বা অপি (জলে বা স্থলে যেখানেই হোক) লুঠতু (লুটিয়ে পড়ুক) অহং (আমি শুদ্ধ আত্মা) তৎ ধর্মৈঃ (দেহের বা বিশেষ স্থানের দোষ-গুণে) ন বিলিপ্যে (লিপ্ত হই না) যথা নভঃ ঘটধর্মৈঃ (যেমন ঘটস্থিত আকাশ ঘটের আকার ইত্যাদির দ্বারা লিপ্ত হয় না)।

সরলার্থ: এই জড়দেহ জলে বা স্থলে যেখানেই পড়ে থাক না কেন, সেইসব স্থানের দোষ-গুণে আমি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা লিপ্ত হই না। যেমন ঘটস্থিত আকাশ ঘটের দোষ-গুণ বা আকারের দ্বারা লিপ্ত হয় না।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'জলে বা-অপি স্থলে বা-অপি লুঠতু-এষঃ জড়াত্মকঃ'; জলে হোক বা স্থলে হোক, এই জড় শরীরটা যেখানে হোক 'লুঠতু', লুটিয়ে পড়ুক, আমার তাতে কি এসে যায় ? আমি মরে গেলাম, আমার শরীরটা জলেই ফেলে দিক বা স্থলেই পড়ে থাক, আমার তাতে কি এসে গেলো ? 'নাহং বিলিপ্যে তদ্ধর্মৈঃ', আমি দেহের দোষ-গুণ বা দেহটা যেখানে রইল সেই জায়গার দোষ-গুণের দ্বারা লিপ্ত হই না। আমি শুদ্ধ আত্মা—দেহের শুচি-অশুচি আমায় স্পর্শ করে না। 'ঘটধর্মৈঃ-নভঃ যথা'। ঘটাকাশ আর মহাকাশ, বেদান্তের খুব প্রচলিত উদাহরণ। আকাশ সর্বব্যাপী, সে যেমন বাইরে সর্বত্র রয়েছে তেমনি আবার একটা ঘটের মধ্যেও থাকতে পারে। ঘটের মধ্যের যে আকাশ আর বাইরের সর্বব্যাপী আকাশ—একই আকাশ, কোন তফাত নেই। ঘটের আকার বা দোষ-গুণ কি ঘটের ভেতরের আকাশকে লিপ্ত করতে পারে ? না, তা পারে না। আমার দেহ যেন একটা ঘট, আর আত্মা যেন আকাশ। আমার দেহের যা হয় হোক আত্মা এই দেহ থেকে স্বতন্ত্র। দেহের ধর্ম আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। যিনি জীবন্মুক্ত তিনি এটা নিশ্চিত জেনে গেছেন। তাই যেখানেই তাঁর দেহত্যাগ হোক না কেন, কাশীতে হোক, গঙ্গাতীরে হোক বা যেখানেই হোক, তাঁর কিছুই এসে যায় না। এক আকাশ যেমন ঘটের বাইরেও আছে ভেতরেও আছে তেমনি এক সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, আমার দেহের, তোমার দেহের, সকলের দেহের ভেতরেও আছেন বাইরেও আছেন। এটা আমি বুঝে নিয়েছি, তাই দেহটার কি হলো তা নিয়ে আর বিচলিত হই না। যেমন আকাশে মেঘ থাকলে তা আকাশকে স্পর্শ করে না তেমনি আমার দেহের যা-কিছু হোক তা আমার আত্মাকে স্পর্শ করছে না।

কর্তৃত্বভোক্তৃত্বখলত্বমত্ততা-জড়ত্ববদ্ধত্ববিমুক্ততাদয়ঃ।
বুদ্ধের্বিকল্পা নতু সন্তি বস্তুতঃ স্বস্মিন্ পরে ব্রহ্মণি কেবলেঽদ্বয়ে॥ ৫১০

অন্বয়: কেবলে অদ্বয়ে পরে ব্রহ্মণি স্বস্মিন্ (কেবল অদ্বয় পরব্রহ্মস্বরূপ আমাতে) কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-খলত্ব-মত্ততা-জড়ত্ব-বদ্ধত্ব-বিমুক্ততা-আদয়ঃ (কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, খলতা,

মত্ততা, জড়ত্ব, বদ্ধত্ব, বিমুক্ততা ইত্যাদি বোধ) বুদ্ধেঃ বিকল্পাঃ (বুদ্ধির সব কল্পনা) বস্তুতঃ ন তু সন্তি (বস্তুত এসবের কোনও অস্তিত্ব নেই)।

সরলার্থ: কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-খলত্ব-মত্ততা-জড়ত্ব-বদ্ধত্ব-বিমুক্ততা ইত্যাদি সবই বুদ্ধির কল্পনা। কেবল পরব্রহ্মস্বরূপ আমাতে এসবের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

ব্যাখ্যা: আমার আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জেনেছি, কিন্তু শরীর রয়েছে, শরীরের যেসব ধর্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা সেসব আছে। কিন্তু কিরকমভাবে আছে ? এই জগৎ-সংসার আগের মতো চলছে তবে আমাকে সেসব স্পর্শ করছে না, আমি নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ, দ্রষ্টা। আমার মধ্যে কোনও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব নেই। আমি এই সংসারে আছি কিন্তু সংসারে জড়িয়ে নেই। আমি করছি, আমার কাজ, আমার বিষয়, আমিই ভোক্তা, এই 'আমি-আমার' বোধ যা মায়ার সৃষ্টি সেটা আমার নেই। আমার খলত্ব নেই। মানে কোনও দুষ্টবুদ্ধি বা ছলচাতুরী নেই। মত্ততা অর্থাৎ পাগলামো নেই। জড়ত্ব নেই। আমার ইন্দ্রিয়গুলো সব কাজ করছে, মন-বুদ্ধি সব সজীব, সতেজ। আমি বদ্ধ বা বিমুক্ত নই। যদি বিমুক্ত বলি তাহলে বদ্ধতা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আমি তো কোনও দিনই বদ্ধ ছিলাম না। আত্মা তো নিত্যমুক্ত। এখন শুধু নিজের মুক্তস্বরূপটা জেনেছি, এই তফাত। আমি সব সময় একরকম। আমার ওপর নানা বিশেষণ চাপাতে পার কিন্তু আমি এক। সেই 'এক'-এর ওপর তুমি আরোপ করছ 'খলত্ব-মত্ততা-জড়ত্ব-বদ্ধত্ব-বিমুক্ততা-আদয়ঃ'। এগুলো উপাধি, আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো সব 'বুদ্ধেঃ বিকল্পাঃ ন তু সন্তি বস্তুতঃ'; এগুলি বুদ্ধির কল্পনা। এগুলোর প্রকৃত কোন অস্তিত্ব আমার মধ্যে নেই। এগুলির কোনও বাস্তব সত্তা নেই। এসব 'বুদ্ধেঃ বিকল্পাঃ'—বুদ্ধির ভ্রমাত্মক কল্পনা। আমি স্বরূপত কিরকম ? 'স্বস্মিন্ পরে ব্রহ্মণি কেবলে-অদ্বয়ে'; আমি হচ্ছি পরব্রহ্ম। আমি 'কেবলে-অদ্বয়ে'—কেবল, দ্বিতীয় আর কেউ নেই, আমি মাত্র আছি। আমি আমাতেই স্থিত। এই বোধেই আমি প্রতিষ্ঠিত।

সন্তু বিকারাঃ প্রকৃতের্দশধা শতধা সহস্রধা বাপি।
কিং মেঽসঙ্গচিতস্তৈর্ন ঘনঃ ক্বচিদম্বরং স্পৃশতি॥ ৫১১

অন্বয়: প্রকৃতেঃ বিকারাঃ (প্রকৃতির সমস্ত বিকার) দশধা, শতধা, সহস্রধা বা-অপি সন্তু (দশ প্রকার, শত প্রকার বা সহস্র প্রকার হোক না কেন) তৈঃ (তাদের দ্বারা) অসঙ্গ-চিতঃ মে কিং (অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ আমার কি হতে পারে) ঘনঃ ক্বচিৎ অম্বরং ন স্পৃশতি (মেঘ কখনও আকাশকে স্পর্শ করে না)।

সরলার্থ: প্রকৃতির যত সব বিকার, দশ রকমের, একশো রকমের বা সহস্র রকমের

হতে পারে কিন্তু সেসব দিয়ে অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ আমার কি হতে পারে ? মেঘ কখনও আকাশকে স্পর্শ করে না।

ব্যাখ্যা: বলছেন, 'বিকারাঃ প্রকৃতেঃ দশধা শতধা সহস্রধা বাপি'। মায়ার প্রভাবে পরিবর্তন হচ্ছে, বহু দেখছি, দশ ভাবে, শত ভাবে, সহস্র ভাবে। এক সমুদ্র, তরঙ্গ বহু, মায়ার প্রভাবে বহু দেখাচ্ছে। বলছেন, আমার তাতে কি এসে যায়? 'কিং মে' ? জগৎ পালটে পালটে যাচ্ছে, তাতে আমার কি ? আমি কিছুর সঙ্গে লিপ্ত নই। আমি 'অসঙ্গ-চিতঃ'—আমি অসঙ্গ, চৈতন্যস্বরূপ। আমি দ্রষ্টা, সাক্ষী। আমি স্বরাট, আমি আমার নিজের প্রভু। আমি সর্বব্যাপী, আমি আকাশের মতো। বলছেন, 'ন ঘনঃ ক্বচিৎ-অম্বরং স্পৃশতি'। ঘন কালো মেঘ আকাশের গায়ে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু আকাশকে তারা স্পর্শ করতে পারে না। ভালো-মন্দ, যাই আসুক আমাকে তা স্পর্শ করছে না। জীবন্মুক্ত পুরুষের এইরকম দৃষ্টিভঙ্গী। জগতের পরিস্থিতি বেশিরভাগ সময়ই আমি পালটাতে পারি না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলছেন, কুকুরের ল্যাজ সোজা করা যায় না। ভালে-মন্দ দুইই আসবে, কিন্তু আমার সমদৃষ্টি, আমার কাছে দুই-ই সমান। আমি নির্লিপ্ত, আমি এই জগতেই আছি কিন্তু জগতের নই। জগৎ আমায় স্পর্শ করছে না, যেমন মেঘ আকাশকে স্পর্শ করে না। আকাশের ওপর দিয়ে যেমন মেঘ ভেসে যাচ্ছে, তেমনি আমার ওপর দিয়ে সংসার সরে সরে যাচ্ছে, আমাকে কিছুই স্পর্শ করছে না। আমি অসঙ্গ, চৈতন্যস্বরূপ।

অব্যক্তাদি স্থূলপর্যন্তমেতদ্ বিশ্বং যত্রাভাসমাত্রং প্রতীতম্।
ব্যোমপ্রখ্যং সূক্ষ্মমাদ্যন্তহীনং ব্রহ্মাদ্বৈতং যৎ তদেবাহমস্মি॥ ৫১২

অন্বয়: যত্র (যাতে) অব্যক্তাদি স্থূলপর্যন্তম্ (অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে স্থূল দেহ পর্যন্ত) এতৎ বিশ্বং (এই জগৎ) আভাসমাত্রং প্রতীতম্ (ছায়ামাত্র রূপে প্রতীত হয়) যৎ ব্যোমপ্রখ্যং (যা আকাশ-সদৃশ) সূক্ষ্মম্-আদি-অন্তহীনং ব্রহ্ম (সূক্ষ্ম আদি-অন্তহীন ব্রহ্ম) অহম্ তৎ-এব-অস্মি (আমি তাই-ই)।

সরলার্থ: যাতে অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে স্থূল দেহ পর্যন্ত এই বিশ্ব শুধু আভাসের মতো প্রতীত হয়, যিনি আকাশ-সদৃশ, সূক্ষ্ম, আদি-অন্তহীন ব্রহ্ম আমি তিনিই।

ব্যাখ্যা: 'অব্যক্তাদি স্থূলপর্যন্তম্-এতৎ বিশ্বং যত্র-আভাসমাত্রং প্রতীতম্'। আগে সবকিছুর সত্তাস্বরূপ তিনি অব্যক্ত হয়ে ছিলেন। উপনিষদে আছে, সৎ-এব-ইদম্ অগ্রে আসীৎ (ছা. ৬।২।১)। বটগাছের বীজের মধ্যে বটগাছ যেমন অব্যক্ত হয়ে থাকে তিনি তেমনি বীজাকারে সত্তামাত্ররূপে অব্যক্ত হয়ে ছিলেন তারপর মায়াশক্তি অবলম্বন করে ব্যক্ত হলেন। এই জীবজগৎ, গাছপালা, কীটপতঙ্গ সব হলেন। আমরা হিন্দুরা সৃষ্টি বলি না।

আমরা বলি প্রকাশ। যা অব্যক্ত ছিল তা ব্যক্ত হলো, বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে বীজ। তিনি এক ছিলেন, বহু হতে চাইলেন, নিজেকে বিস্তার করলেন, স্ত্রী, পুরুষ, পশুপক্ষী, গাছপালা সব হলেন, তারপর আবার যখন মনে হলো নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। উপনিষদ্ মাকড়সার উপমা দিচ্ছেন। মাকড়সা নিজের মধ্যে থেকে জালের বিস্তার করে আবার প্রয়োজন হলে সেটা নিজের মধ্যে টেনে নেয়। আমাদের সৃষ্টির ধারণা এইরকম। তিনি নিজেকে বিস্তার করছেন আবার গুটিয়ে নিচ্ছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাকৃত হচ্ছে আবার প্রলয়ের সময়ে সবকিছু অব্যাকৃত হয়ে বীজাকারে থাকছে। 'সত্তাস্বরূপ' তিনি সব সময় আছেন, অব্যক্ত হয়ে আছেন আবার ব্যক্ত হচ্ছেন। বলছেন, 'অব্যক্তাদি স্থূল পর্যন্তম্-এতৎ বিশ্বং যত্র আভাসমাত্রং প্রতীতম্'; যাঁর মধ্যে সূক্ষ্মতম অব্যক্ত থেকে স্থূল জগৎ পর্যন্ত গোটা বিশ্ব আভাসমাত্র মনে হচ্ছে। কার মধ্যে বিশ্বসংসার আভাসের মতো প্রতীত হচ্ছে ? আমার মধ্যে। আমার উপরে এই বিশ্বসংসার দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ছায়ার মতো মনে হচ্ছে। আমি কে ? আমি ব্রহ্ম। নিজেকে ব্রহ্মরূপে চিনেছি বলেই মনে হচ্ছে সমগ্র বিশ্বসংসার আমাকে আশ্রয় করে আভাসরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'ব্যোমপ্রখ্যং সূক্ষ্মম্-আদি-অন্তহীনং ব্রহ্ম-অদ্বৈতং তদ্-এব-অহং অস্মি'। আকাশের মতো সূক্ষ্ম, আদি-অন্তহীন অদ্বৈত ব্রহ্ম যিনি তিনিই আমি। সর্বব্যাপী আকাশের যেমন আদি অন্ত নেই আমারও তাই। আমার জন্ম হয়নি মৃত্যুও নেই। আরম্ভ থাকলে শেষ থাকে। যার জন্ম নেই তার মৃত্যুও নেই। ব্রহ্ম অধিষ্ঠান, তাঁর ওপর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অধ্যস্ত হয়ে আছে। জগৎ যাচ্ছে, আসছে, কিন্তু যিনি অধিষ্ঠান তাঁর যাওয়া-আসা নেই। আমিই সেই অধিষ্ঠান। আমি ব্রহ্ম, বৃহত্তম, সর্বব্যাপী, আমি এক, দ্বিতীয় নেই আমার, আমি আকাশবৎ, আমি স্বরাট।

সর্বাধারং সর্ববস্তুপ্রকাশং সর্বাকারং সর্বগং সর্বশূন্যম্।
নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্বিকল্পং ব্রহ্মাদ্বৈতং যৎ তদেবাহমস্মি॥ ৫১৩

অন্বয়: যৎ (যা) সর্ব-আধারং (সবকিছুর আধার) সর্ববস্তুপ্রকাশং (সকল বস্তুর প্রকাশক) সর্ব-আকারং (সবকিছুর সব রকমের আকার) সর্বগং (সবকিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট) সর্বশূন্য (বহুত্বশূন্য, এক) নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্বিকল্পং (নিত্য, শুদ্ধ, নিশ্চল, নির্বিকল্প) অদ্বৈতং ব্রহ্ম (অদ্বিতীয় ব্রহ্ম) অহং তদ্-এব-অস্মি (আমি তাই)।

সরলার্থ: সর্ববস্তুর আধার ও প্রকাশক, সর্বাকৃতি, সর্বগত, সমস্ত বহুত্বশূন্য এক, নিত্য শুদ্ধ, নিশ্চল, নির্বিকল্প, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যিনি আমি তাই।

ব্যাখ্যা: বলছেন, ব্রহ্ম হচ্ছেন 'সর্বাধারং'। এ জগতের সবকিছুর আধার ব্রহ্ম, তাঁর ওপরেই জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুর ভাবটা কিরকম ! প্রথমে যেন মনে হচ্ছে ব্রহ্ম

বাইরে আছেন, নাম-রূপ নিয়ে এই যে জগৎ, যেটা মায়ার সৃষ্টি, ব্রহ্ম সেসবের অধিষ্ঠান-রূপে আছেন। আবার তিনি আমার ভেতরেও আছেন, তাই বলছি 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। বলছেন, ব্রহ্ম 'সর্বাধারং সর্ববস্তুপ্রকাশং'। 'সর্বাধারং', এ জগতে কত বৈচিত্র, কত কি কাণ্ডকারখানা চলছে। সবকিছু ব্রহ্মের ওপর অধ্যস্ত হয়ে আছে, ব্রহ্মই আধার। আমরা সিনেমায় দেখি কত কি সব ঘটছে কিন্তু একটা পর্দা আছে বলেই তো এসব দেখছি। তেমনি ব্রহ্ম আছেন বলেই সবকিছু আছে। 'সর্ববস্তুপ্রকাশং'—তিনি সব-কিছুকে প্রকাশ করছেন। তাঁর আলোতেই সবকিছু আলোকিত। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ কিন্তু তিনি আছেন বলেই সবকিছু প্রকাশ পাচ্ছে। 'সর্বাকারং'; এই যে সব রূপ দেখছি, ছোট-বড়, ভালো-মন্দ, সব তিনি হয়েছেন। এত যে আকার সে তিনি দিয়েছেন বলেই তো হয়েছে। আমরা প্রথমে বলি 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' তারপর বলি 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। জীবরূপে জীব মিথ্যা, কিন্তু ব্রহ্মই আধার তিনিই জীবের সত্তাস্বরূপ, এ যখন দেখি তখন 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। তারপর বলছেন, 'সর্বগং'—সকলের মধ্যে তিনি ঢুকে বসে আছেন। কিরকম ? উপনিষদ্ বলছেন, তিনি সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রবেশ করে বসে আছেন। বাতাস যেমন সর্বত্র আছে তিনি সেইরকম। আবার বলছেন, 'সর্বশূন্যং', মানে তিনি এক, দুই নেই কোথাও। 'সর্বশূন্যং', সর্ব বলতে বহু বোঝাচ্ছেন, সব বহুত্ব ফেলে দিয়েছেন, নাম-রূপের বিভিন্নতা চলে গেছে, শুধু এক তিনি আছেন, 'সর্বশূন্যং'। 'নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্বিকল্পং ব্রহ্ম-অদ্বিতীয়ং'। 'অদ্বৈতং'—তাঁর দ্বিতীয় নেই, জুড়ি নেই, তিনি এক। 'নিত্যং'—তিনি সব সময় আছেন। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ তিন কালে তিনি আছেন। 'শুদ্ধং'—তিনি একা, স্বতন্ত্র, স্বাধীন। 'নিশ্চলং'—শান্ত, স্থির, তাঁর কোনও পরিবর্তন নেই, কোনও যাতায়াত নেই, গতি নেই। 'নির্বিকল্পং'—তাঁর কোনও বিকল্প নেই, কারণ তিনিই সব হয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কিছু নেই। 'ব্রহ্ম অদ্বৈতং যৎ তদ্-এব-অহম্-অস্মি', সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যিনি তিনিই আমি। এ সবই কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষের উপলব্ধি। কিরকম একটা অবস্থা ! কল্পনা করতেও যেন কিরকম একটা লাগে। স্পষ্ট অনুভব করছি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, জীবজগৎ সব আমি, আমি ছাড়া আর কিছু নেই। আর যা-কিছু সব আমার ওপর অধ্যস্ত হয়ে আছে। আমি এটা জেনেছি, বুঝেছি, তাই আমি সব সময় আনন্দে ডুবে আছি।

যৎ প্রত্যস্তাশেষমায়াবিশেষং প্রত্যগ্রূপং প্রত্যয়াগম্যমানম্।
সত্যজ্ঞানানন্তমানন্দরূপং ব্রহ্মাদ্বৈতং যৎ তদেবাহমস্মি॥ ৫১৪

অন্বয়: যৎ (যা) প্রত্যস্ত-অশেষ-মায়াবিশেষং (সর্ববিধ মায়ার বিকার থেকে নির্মুক্ত) প্রত্যগ্রূপং (সকল জীবের প্রত্যগাত্মারূপে অধিষ্ঠিত) প্রত্যয়-অগম্যমানম্ (বুদ্ধিবৃত্তির

অগম্য) সত্য-জ্ঞান-অনন্তম্-আনন্দরূপং (সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ও আনন্দরূপ) যৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম (যা অদ্বৈত ব্রহ্ম) তদ্-এব-অহম্-অস্মি (আমি তাই)।

সরলার্থ: যিনি মায়ার সমস্ত বিকার থেকে মুক্ত, যিনি সকল জীবের প্রত্যগাত্মারূপে অধিষ্ঠিত, যিনি বুদ্ধির অগম্য, সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ও আনন্দরূপ যিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম, তিনিই আমি।

ব্যাখ্যা: জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থার কথা আর এক ভাবে বলছেন। তাঁর তো আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, তাই মায়া আর কিছু করতে পারছে না। তিনি ব্রহ্মই হয়ে গেছেন, মায়া আর তাঁর কি করবে ? বলছেন, 'যৎ প্রত্যস্ত-অশেষমায়াবিশেষং'; মায়া যাঁর কাছে 'প্রত্যস্ত' মানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেছে। জ্ঞান হয়ে গেছে, তাই মায়া আর কিছু করতে পারছে না। মায়ার অশেষ বিকার তার কাছে পরাস্ত হয়ে গেছে। বেদান্ত বলছেন, যা-কিছু দেখছ সব মায়ার বিকার। মায়া কখনও বন্ধু হয়ে আসছে আবার কখনও শত্রু হয়ে আসছে। রামপ্রসাদ বলছেন, মা তুমি পাপ তুমি পুণ্য। যখন আত্মজ্ঞান হয়, যখন আমি জানি যে আমিই সব হয়েছি, আমিই সর্বভূতে আছি, এক আমি ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত, তখন মায়া প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে, তখন আর মায়ার আমার মধ্যে প্রবেশ নেই। ওই যে রামপ্রসাদের গান আছে, শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি, ঘুড়ি কেটে গেলে মা হেসে হাততালি দেন। ঘুড়ি কেটে যাওয়া মানে একজনের জ্ঞান হয়ে গেছে, সে মায়ার আওতা থেকে বেরিয়ে গেছে। তারপর বলেছেন, 'প্রত্যগ্ রূপং'—সকল জীবের প্রত্যগাত্মারূপে যিনি অধিষ্ঠিত। 'প্রত্যয়-অগম্যমানম্'—বুদ্ধির অগম্য, মন-বুদ্ধির অগোচর। বুদ্ধির সীমা আছে তাই তিনি বুদ্ধির অগম্য। কারণ তিনি অসীম। 'যতোঃ বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। ভাষা দিয়ে তাঁকে ব্যক্ত করতে পারি না, মন দিয়ে তাঁকে ধরতে পারি না। তিনি বাক্যমনাতীত। 'সত্য-জ্ঞান-অনন্তম্-আনন্দরূপং ব্রহ্ম-অদ্বৈতং যৎ তদেব অহম্-অস্মি'। 'সত্য' মানে নিত্যসত্য, আমি সব সময় আছি। 'জ্ঞান'—আমার জ্ঞান সব সময় আছে, এ কোনও জন্য পদার্থ নয় যে বাইরে থেকে জন্মেছে, আমার ভেতরে জ্ঞান সব সময় আছে। আমি জ্ঞানস্বরূপ। 'অনন্তম্'—আমার অন্ত নেই, শেষ নেই, সীমা নেই। 'আনন্দরূপং'—আনন্দস্বরূপ, আনন্দঘন। 'আনন্দরূপং অদ্বৈতং ব্রহ্ম যৎ তদেব অহম্-অস্মি'। সেই আনন্দরূপ অদ্বৈত ব্রহ্ম যিনি, তিনিই আমি।

নিষ্ক্রিয়োঽস্ম্যবিকারোঽস্মি নিষ্কলোঽস্মি নিরাকৃতিঃ।
নির্বিকল্পোঽস্মি নিত্যোঽস্মি নিরালম্বোঽস্মি নির্দ্বয়ঃ।। ৫১৫

অন্বয় : নিষ্ক্রিয়ঃ অস্মি (আমি ক্রিয়াহীন) অবিকারঃ অস্মি (আমি নির্বিকার) নিষ্কলঃ নিরাকৃতিঃ অস্মি (আমি অংশবিহীন নিরাকার) নির্বিকল্পঃ অস্মি (আমি বিকল্পরহিত)

নিত্যঃ অস্মি (আমি নিত্য) নিরালম্বঃ নির্দ্বয়ঃ অস্মি (আমি অবলম্বন-শূন্য দ্বিতীয়রহিত)।

সরলার্থ : আমি কিছু করি না, আমার কোনও বিকার নেই, কোনও কলা নেই, আকার নেই। আমি নির্বিকল্প, আমার কোনও বিকল্প হয় না, আমি নিত্য, আমি কোনও কিছু অবলম্বন করে নেই, আমার কোনও দ্বিতীয় নেই।

ব্যাখ্যা : জীবন্মুক্ত পুরুষ যিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে অনুভূতিটা কিরকম ? বলছেন, 'নিষ্ক্রিয়ঃ অস্মি-অবিকারঃ-অস্মি'; আমি নিষ্ক্রিয়। আমার কোনও বাসনা নেই, আমি আপ্তকাম, পূর্ণকাম, তাহলে আর কিসের জন্যে আমি কাজ করব ? কোনও বাসনা থাকলে সেই বাসনা চরিতার্থ করতে লোকে কাজ করে। আমার বাসনা নেই, যা পাবার আমি সব পেয়ে গেছি, তাই আমি নিষ্ক্রিয়। আমার কোনও বিকার নেই, পরিবর্তন নেই। হাসি, কান্না এসবে আমার সমভাব, আমি নির্বিকার। 'নিষ্কলঃ অস্মি'; কলা মানে অংশ। একজন ব্যক্তি সে তো হাত, পা, মাথা ইত্যাদির সমষ্টি, একে নিষ্কল বলা যাবে না, কারণ অনেকগুলি অংশ জোড়াতালি দিয়ে তৈরী। কিন্তু আমি নিষ্কল। আমার কোনও অংশ নেই। আমি অখণ্ড আত্মা। আমার কোন বিকার নেই। আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিরাকার, নির্বিকল্প, নিত্য। আমি নিরালম্ব—কাউকে আশ্রয় করে আমি নেই। আমি নিজেই তো সবকিছুর আশ্রয়। আমি 'নির্দ্বয়ঃ'—দুই নেই আমার। এক অদ্বিতীয় আমিই ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত।

সর্বাত্মকোঽহং সর্বোঽহং সর্বাতীতোঽহমদ্বয়ঃ।
কেবলাখণ্ডবোধোঽহমানন্দোঽহং নিরন্তরঃ।। ৫১৬

অন্বয় : অহং সর্বাত্মকঃ (আমি সকলের আত্মা) সর্বঃ-অহং (আমি সব হয়েছি) সর্বাতীত-অহম্-অদ্বয়ঃ (আমি সবকিছুর ঊর্ধ্বে এবং আমার কোনও দ্বিতীয় নেই) অহং কেবল-অখণ্ডবোধঃ (আমি শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ) অহং আনন্দঃ নিরন্তরঃ (আমি আনন্দরূপ ও ভেদরহিত)।

সরলার্থ : আমি সকলের আত্মা, আমি সব হয়েছি, আমি সবকিছুর ঊর্ধ্বে, আমার কোন দ্বিতীয় নেই, আমি আনন্দরূপ ও ভেদরহিত ।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'সর্বাত্মকঃ-অহং'; আমি সকলের মধ্যে আছি। আমি সকলের আত্মা। 'সর্বঃ-অহং', আমিই সব হয়েছি। 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ'। লুকিয়ে আছেন, দেখতে পাচ্ছি না অজ্ঞানের জন্যে। ব্রহ্ম সব সময় আছেন, শুধু অজ্ঞানের আবরণ পড়েছে বলে আমরা জানতে পারছি না। 'সর্বাতীত-অহম্-অদ্বয়ঃ'; এই যে

জগৎ দেখছি, এসবকিছুর উর্ধ্বে আমি আছি। এসবের ভেতরেও আছি বাইরেও আছি। অন্তঃপূর্ণ বহিঃপূর্ণ। আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সব আমি, আমি ছোট ঘাস থেকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পর্যন্ত সব হয়েছি। আবার এসবের বাইরেও আমি। 'অহং অদ্বয়ঃ'—আমার কোনও দ্বিতীয় নেই, আমি এক। 'কেবল-অখণ্ডবোধঃ অহম্-আনন্দঃ-অহম্ নিরন্তরঃ'; 'কেবল', একা আমি, আমার জুড়ি নেই। 'অখণ্ড', আমার কোনও ভাগ নেই, আমি পূর্ণ, সর্বত্র ভরপুর হয়ে আছি। আমি স্বয়ংপূর্ণ, আমি নিরন্তর, আমি আনন্দস্বরূপ। ফাঁক নেই, ছেদ নেই। শিষ্যের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে। নিজেকে তিনি এইভাবে অনুভব করছেন।

স্বারাজ্যসাম্রাজ্যবিভূতিরেষা ভবৎকৃপাশ্রীমহিমপ্রসাদাৎ।
প্রাপ্তা ময়া শ্রীগুরবে মহাত্মনে নমো নমস্তেঽস্তু পুনর্নমোঽস্তু॥৫১৭

অন্বয় : এষা (এই) স্বারাজ্য সাম্রাজ্য বিভূতিঃ (স্বারাজ্য-সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ব্রহ্মানন্দ) ভবৎ কৃপা শ্রীমহিম-প্রসাদাৎ (আপনার কৃপায়, আপনার অনুগ্রহে) প্রাপ্ত ময়া (আমার প্রাপ্তি ঘটেছে) মহাত্মনে শ্রীগুরবে (হে মহাত্মা শ্রীগুরু) তে নমঃ নমঃ অস্তু (আপনাকে নমস্কার করি) পুনঃ নমঃ অস্তু (আবার, বারবার নমস্কার করি)।

সরলার্থ : ব্রহ্মানন্দরূপ এই স্বারাজ্য-সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য আপনার কৃপায়, আপনার অনুগ্রহে আমি লাভ করেছি। আপনি মহাত্মা, শ্রীগুরুদেব আপনাকে নমস্কার করি, বারবার নমস্কার করি।

ব্যাখ্যা : শিষ্যের তো আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, জীবন্মুক্ত হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর অনুভূতি তিনি এতক্ষণ গুরুকে বলেছেন। এখন বলছেন, হে গুরুদেব এ সমস্তই আপনার মহিমায়, আপনার অশেষ কৃপায় সম্ভব হয়েছে। বলছেন, 'স্বারাজ্যসাম্রাজ্য বিভূতিঃ-এষা ভবৎ কৃপা শ্রীমহিমপ্রসাদাৎ'। 'স্বরাট' থেকে সাম্রাজ্য। কে স্বরাট ? যিনি আত্মাকে জেনেছেন তিনিই স্বরাট। তিনি উপলব্ধি করেছেন, স্পষ্ট অনুভব করছেন—তিনিই শুধু আছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। আত্মজ্ঞ হয়ে অবস্থান করার নামই স্বারাজ্য। এ যেন এক সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যে আমিই সম্রাট, আমিই রাজ্য, আমি-ই সব। আমি ছাড়া আর কিছু নেই। 'স্বারাজ্য সাম্রাজ্যে'র বিভূতি হলো ব্রহ্মানন্দ। শিষ্য স্বরাট হয়ে গেছেন। কারও কাছে তাঁর মাথা নীচু করার কথা নয়। কিন্তু গুরু-ঋণ স্বীকার করতেই হয়। বলা হয়, 'নাদ্বৈতং গুরুণা সহ'। সকলের সঙ্গে অদ্বৈতবুদ্ধি করবে। কিন্তু আত্মজ্ঞান হয়ে গেলেও গুরুর সঙ্গে অদ্বৈতবুদ্ধি করতে নেই। তাই বলছেন, আপনার মহিমায়, আপনার কৃপায় আমার এসব হয়েছে। আপনি আমার গুরু, মহাত্মা। অনেক ভাগ্যগুণে আপনার পায়ে এসে পড়েছি। 'প্রাপ্তা ময়া শ্রীগুরবে মহাত্মনে নমো

নমস্তেঽস্তু'—আমি স্বরাট হয়েছি, আত্মজ্ঞ হয়েছি, এই সাম্রাজ্যের সম্পদ ব্রহ্মানন্দ লাভ করেছি আপনারই অনুগ্রহে। হে গুরুদেব, আপনাকে নমস্কার করি। 'পুনঃ নমঃ অস্তু'—আবার নমস্কার করি, বারবার নমস্কার করি। আপনার কৃপাতেই এই জীবন্মুক্ত অবস্থা আমার লাভ হয়েছে। বারবার আপনাকে প্রণাম। এখানে ভগবানের কথা নেই। গুরুই ভগবান। গুরু ভূরিদা, যা সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, তা-ই তিনি দান করেছেন। আমার চোখ খুলে দিয়েছেন, আমায় আত্মজ্ঞান দিয়েছেন।

মহাস্বপ্নে মায়াকৃতজনিজরামৃত্যুগহনে
ভ্রমন্তং ক্লিশ্যন্তং বহুলতরতাপৈরনুদিনম্।
অহংকারব্যাঘ্রব্যথিতমিমমত্যন্তকৃপয়া
প্রবোধ্য প্রস্বাপাৎ পরমবিতবান্ মামসি গুরো॥ ৫১৮

অন্বয় : গুরো (হে গুরুদেব) মায়াকৃত-জনি-জরা-মৃত্যু গহনে (মায়ার সৃষ্টি জন্ম-জরা ও মৃত্যুরূপ অরণ্যে) মহাস্বপ্নে ভ্রমন্তং (মহাস্বপ্নের মধ্যে ভ্রমণশীল) অনুদিনং (দিনের পর দিন) বহুলতরতাপৈঃ (বহু দুঃখের দ্বারা) ক্লিশ্যন্তং (ক্লিষ্ট) অহংকারব্যাঘ্রব্যথিতং (অহংকাররূপ ব্যাঘ্রের কবলে পড়ে পীড়িত) ইমম্ মাম্ (এই আমাকে) অত্যন্তকৃপয়া (অত্যন্ত কৃপার বশে) পরম্ প্রস্বাপাৎ (গাঢ় ঘুম থেকে) প্রবোধ্য (জাগিয়ে) অবিতবান্-অসি (রক্ষা করেছ)।

সরলার্থ : হে গুরুদেব, আমি মায়ার সৃষ্টি জন্ম-জরা ও মৃত্যুরূপ অরণ্যে মহাস্বপ্নের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দিনের পর দিন বহু দুঃখের মধ্যে ক্লিষ্ট হয়ে ছিলাম। অহংকাররূপ ব্যাঘ্রের কবলে পড়ে অনেক যন্ত্রণা পাচ্ছিলাম। এই আমাকে আপনি অত্যন্ত কৃপায় গাঢ় ঘুম থেকে জাগিয়ে রক্ষা করেছেন।

ব্যাখ্যা : শিষ্য গুরুকে বলছেন, আমার কি অবস্থা ছিল আমি ভুলব না। মায়ার কবলে পড়েছিলাম, আপনি কৃপা করে আমায় রক্ষা করেছেন। বলছেন, 'মহাস্বপ্নে মায়াকৃতজনিজরামৃত্যুগহনে ভ্রমন্তং'। 'মহাস্বপ্নে'—একটা দীর্ঘ স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম। সেই স্বপ্ন ভাঙছিলই না। মায়ার ঘোরে স্বপ্নকেই সত্যি বলে মনে করছিলাম। একটা যাদুর মধ্যে পড়েছিলাম যেন। নিজের স্বরূপ জানতাম না, তাই মরীচিকার পেছনে ছুটে চলেছিলাম। 'মায়াকৃতজনিজরামৃত্যুগহনে ভ্রমন্তং'—সংসার-অরণ্যে ঘুরে মরছিলাম। এই সংসারটা মায়ার সৃষ্টি। এখানে শুধু জন্ম জরা আর মৃত্যু পরপর আসে। এ যেন গভীর অরণ্য একটা, বেরোনোর পথ নেই। সেই অরণ্যে আমি দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। 'অহঙ্কারব্যাঘ্রব্যথিতং', অহংকার মানে আমিত্ব। এই আমিত্ব একটা বাঘের মতো আমায় কামড়ে ধরেছিল। এই অহংকারের তাড়নায়

আমি এমন সব কাজ করছিলাম যে, নিজেই অনেক আঘাত পাচ্ছিলাম। তবুও এই অহংকার দূর করতে পারছিলাম না। বাঘের মতো এ আমার ঘাড়ে চেপে বসেছিল। 'ইমম্ মাম্'—এই আমাকে, যার এইরকম অবস্থা ছিল, যেন চোখবাঁধা কলুর বলদের মতো সংসারে ঘুরপাক খাচ্ছিল, তাকে আপনি অত্যন্ত কৃপা করে রক্ষা করেছেন। 'অত্যন্ত কৃপয়া'—অনেক কৃপা করে আপনি আমাকে 'পরম্ প্রস্বাপাৎ'—গভীর ঘুমঘোর থেকে জাগিয়েছেন। গুরু তো তা-ই বলেন, ওঠো, জাগো, দিন চলে যাচ্ছে, সময় নষ্ট করো না। 'প্রবোধ্য অবিতবান্ অসি গুরো'—হে গুরুদেব, এইভাবে অজ্ঞাননিদ্রা থেকে জাগিয়ে আপনি আমায় রক্ষা করেছেন। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বলে, পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, গুরুঋণ এসব স্বীকার করতে হয়। আমাদের বিশ্বাস গুরুকৃপা সব সময় থাকে। গুরুর শরীর না থাকলেও গুরুশক্তি কাজ করে যায়, আমাদের সব অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে।

নমস্তস্মৈ সদৈকস্মৈ কস্মৈচিন্মহসে নমঃ।
যদেতদ্ বিশ্বরূপেণ রাজতে গুরুরাজ তে॥ ৫১৯

অন্বয় : গুরুরাজ (হে গুরুরাজ) যৎ-এতৎ-বিশ্বরূপেণ রাজতে (যা এই বিশ্বরূপে প্রকাশ পাচ্ছে) কস্মৈচিৎ মহসে (সেই এক অনির্বচনীয় তেজঃস্বরূপ) সদা-একস্মৈ (সর্বদা একরূপ) তস্মৈ তে নমঃ (সেই তোমায় নমস্কার)।

সরলার্থ : হে গুরুরাজ, যে ব্রহ্ম এই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়েছেন সেই এক অনির্বচনীয় তেজঃস্বরূপ সর্বদা-একরূপ তোমাকে নমস্কার করি।

ব্যাখ্যা : শিষ্য গুরুকে এবার সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে নমস্কার জানাচ্ছেন। বলছেন, 'নমস্তস্মৈ সদৈকস্মৈ কস্মৈচিৎ মহসে নমঃ'। বেদান্ত শাস্ত্রে 'সৎ' কথাটার মানে নিত্য। বলছেন, হে গুরুদেব ! তোমায় প্রণাম করছি কেন ? কারণ যিনি সৎস্বরূপ, সর্বব্যাপী, সকলের সত্তারূপে আছেন, তিনি যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছেন তোমার মধ্যে। 'নমস্তস্মৈ সদৈকস্মৈ'—সবকিছুর সত্তাস্বরূপ এক তুমি, তোমাকে নমস্কার। 'কস্মৈচিৎ মহসে নমঃ'; তুমি চৈতন্যস্বরূপ মহান, তোমায় নমস্কার। 'যদেতদ্‌বিশ্বরূপেণ রাজতে গুরুরাজ তে'—তুমি সমস্ত বিশ্বরূপে রয়েছ, সর্বত্র ছড়িয়ে আছ, তুমি সর্বগত ঈশ্বর। 'রাজতে গুরুরাজ তে'—তুমি গুরুরাজ, শ্রেষ্ঠ আচার্য, সর্বত্র বিরাজ করছ তুমি। তুমি শ্রেষ্ঠ, কারণ আমার অজ্ঞানের অন্ধকার তুমিই নষ্ট করেছ, তুমিই আমার চোখ খুলে দিয়েছ।

ইতি নতমবলোক্য শিষ্যবর্যং সমধিগতাত্মসুখং প্রবুদ্ধতত্ত্বম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং স দেশিকেন্দ্রঃ পুনরিদমাহ বচঃ পরং মহাত্মা॥ ৫২০

অন্বয় : সমধিগত-আত্মসুখং (পরিপূর্ণ আত্মানন্দপ্রাপ্ত) প্রবুদ্ধতত্ত্বম্ (ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবুদ্ধ) প্রমুদিত-হৃদয়ং (প্রসন্নচিত্ত) শিষ্যবর্যং (শিষ্য-শ্রেষ্ঠকে) ইতি নতম্-অবলোক্য (এই প্রকারে প্রণত দেখে) সঃ দেশিকেন্দ্রঃ মহাত্মা (সেই মহাত্মা দেশিকেন্দ্র) পুনঃ ইদং পরং বচঃ আহ (আবার এইসব উৎকৃষ্ট বাক্য বললেন)।

সরলার্থ : পরিপূর্ণভাবে আত্মসুখপ্রাপ্ত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ প্রসন্নচিত্ত শিষ্য-শ্রেষ্ঠকে এইভাবে প্রণত দেখে সেই মহাত্মা দেশিকেন্দ্র আবার এইসব উৎকৃষ্ট বাক্য বললেন।

ব্যাখ্যা : যেমন গুরু তেমনিই শিষ্য। শিষ্য গুরুর কৃপা স্বীকার করেছেন, গুরু খুশি হয়েছেন শিষ্যের বিনয় দেখে। বলছেন : 'ইতি নতম্ অবলোক্য শিষ্যবর্যং'। 'শিষ্যবর্যং' মানে শ্রেষ্ঠ শিষ্য। গুরু যেমন গুরুদের মধ্যে গুরুরাজ, শিষ্য তেমনি শিষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই শিষ্য তাঁর কাছে এরকম প্রণত হয়েছেন দেখে গুরু খুশি হলেন। 'সমধিগত-আত্মসুখং', সমাধিস্থ হয়ে আত্মসুখ লাভ করেছেন শিষ্য, আত্মজ্ঞান লাভের যে আনন্দ সেই আনন্দ লাভ করেছেন তিনি। এতে গুরুরও আনন্দ। 'প্রবুদ্ধতত্ত্বম্'—তত্ত্বজ্ঞানে তিনি প্রবুদ্ধ হয়েছেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। 'প্রমুদিত-হৃদয়ং'—প্রসন্নচিত্ত। আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তাই শিষ্য প্রসন্নচিত্ত। 'স দেশিকেন্দ্রঃ পুনঃ-ইদম্ আহ বচঃ পরং মহাত্মা'। 'দেশিক' মানে আচার্য, গুরু। 'দেশিকেন্দ্রঃ'—শ্রেষ্ঠ আচার্য। সেই আচার্যশ্রেষ্ঠ মহাত্মা শিষ্যের প্রতি কৃপা করে আরও কয়েকটি মূল্যবান কথা বললেন।

ব্রহ্মপ্রত্যয়সন্ততির্জগদতো ব্রহ্মৈব তৎ সর্বতঃ
পশ্যাধ্যাত্মদৃশা প্রশান্তমনসা সর্বাস্ববস্থাস্বপি।
রূপাদন্যদবেক্ষিতং কিমভিতশ্চক্ষুষ্মতাং দৃশ্যতে
তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদঃ সতঃ কিমপরং বুদ্ধের্বিহারাস্পদম্॥ ৫২১

অন্বয় : সর্বাসু-অবস্থাসু-অপি (জাগ্রত-ইত্যাদি সকল অবস্থাতেই) জগৎ ব্রহ্ম-প্রত্যয়সন্ততিঃ (জগৎ ব্রহ্মপ্রতীতির প্রবাহ) অতঃ (অতএব) সর্বতঃ (সর্বভাবে) তৎ (জগৎ) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) অধ্যাত্মদৃশা (অধ্যাত্মদৃষ্টিসহায়ে) প্রশান্তমনসা (প্রশান্ত মনের দ্বারা) পশ্য (দেখো) অভিতঃ অবেক্ষিতং (সর্বপ্রকারে যা দেখা যায়) রূপাৎ অন্যৎ কিং ([তার মধ্যে] রূপ ছাড়া অন্য কি আর) চক্ষুষ্মতাং দৃশ্যতে (চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখেন) তৎবৎ (সেইরকম) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির কাছে) সতঃ অপরং কিং (সৎস্বরূপ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য আর কি) বুদ্ধেঃ বিহার-আস্পদম্ (বুদ্ধির বিহারস্থল হতে পারে) ?

সরলার্থ : জাগ্রৎ-ইত্যাদি সর্ব অবস্থাতেই এ জগৎ ব্রহ্ম-প্রতীতির প্রবাহ। কাজেই সর্বতোভাবে জগৎ ব্রহ্মই। অধ্যাত্মদৃষ্টিসহায়ে প্রশান্তচিত্তে দেখো। সর্বরকমে যা চোখ

দিয়ে দেখা যায় তা চক্ষুষ্মান ব্যক্তির কাছে রূপ ছাড়া আর কি ? সেইরকম যিনি ব্রহ্মবিদ্ তাঁর কাছে সৎস্বরূপ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য আর কি বুদ্ধির বিহারস্থল হতে পরে ?

ব্যাখ্যা : শিষ্যের জ্ঞান হয়েছে দেখে গুরু খুশি হয়ে শিষ্যকে আরও কয়েকটি মহামূল্যবান উপদেশ দিচ্ছেন। বলছেন, 'সর্বাসু-অবস্থাসু-অপি জগৎ ব্রহ্মপ্রত্যয় সন্ততিঃ'; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই জগৎ হলো ব্রহ্মপ্রত্যয়ের ধারা। জাগরণে, স্বপ্নে, গভীর নিদ্রায়—সব সময়ই আমরা ব্রহ্মকে অনুভব করি নানাভাবে। 'ব্রহ্মপ্রত্যয়' মানে ব্রহ্মকে অনুভব, আর 'সন্ততিঃ' মানে একটা ধারা, প্রবাহ। চৈতন্যের একটা প্রবাহ চলেছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি সব অবস্থায়। আমার আত্মজ্ঞানটা, যখন জেগে থাকি তখনই আছে তা নয়, সব অবস্থাতেই আছে। একটা নির্ঝরের মতো সব সময়ে উৎসারিত হয়ে চলেছে। আর আমার আত্মাই ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মপ্রত্যয়ের ধারা সব সময় আমার ভেতরে চলছে, সর্ব-অবস্থায়। কোনও দ্বিতীয় বস্তু আমি আর দেখছি না। তাঁকে ছাড়া তো আর কিছুই দেখছি না। জেগেও তাঁকে দেখছি, স্বপ্ন দেখছি তাও তাঁকে দেখছি আবার গভীর ঘুমেও সেই আত্মাকেই দেখছি। আত্মা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। 'অতঃ সর্বতঃ ব্রহ্ম-এব তৎ'। কাজেই সর্বতোভাবে এই জগৎ 'ব্রহ্ম-এব'—ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে 'তৎ' বলতে জগৎকে বোঝাচ্ছে। জ্ঞানলাভের আগে 'ব্রহ্ম সত্যং জগৎ-মিথ্যা', এই জগৎ-কে অস্বীকার করছি কিন্তু জ্ঞানের পরে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—জীব ব্রহ্মই আর কিছু নয়। 'ব্রহ্মময়ং জগৎ'। যখন মানুষ, জন্তু, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, এসবের রূপটাই শুধু দেখছি তখন এগুলো মিথ্যা কারণ অনিত্য। কিন্তু যখন রূপ দেখছি না, এসবের মধ্যে ব্রহ্মকেই দেখছি তখন ব্রহ্মময়ং জগৎ, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। শ্রীরামকৃষ্ণ সবাইকে নমস্কার করছেন। তাদের অস্বস্তি হচ্ছে, আমরাই তো আপনাকে নমস্কার করব। তিনি বলছেন, তোমাদের মধ্যে নারায়ণকে দেখছি। কাচের আলমারির মধ্যে যেমন পুতুল সাজানো দেখা যায় তেমনি তোমাদের মধ্যে নারায়ণকে দেখছি। রূপটা তো উপাধি। আমার পরিচয় তো উপাধি দিয়ে নয়, আমার পরিচয় আমার স্বরূপ। তারপর বলছেন, 'পশ্য-অধ্যাত্ম দৃশা প্রশান্ত মনসা'—আত্মদৃষ্টি দিয়ে প্রশান্ত মনে দেখলে দেখবে, তুমিই সর্বত্র বিরাজ করছ। 'রূপাৎ-অন্যৎ-অবেক্ষিতং কিম্-অভিতঃ চক্ষুষ্মতাং দৃশ্যতে'। 'অভিতঃ' মানে সবরকমভাবে। 'চক্ষুষ্মতাম্' মানে যাদের চোখ আছে। যাদের চোখ আছে, এই জগৎটা তাদের কাছে রূপ ছাড়া আর কি ? যা কিছু তারা দেখে, একেকটা রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। তেমনি যাদের জ্ঞানচক্ষু আছে, তাদের কাছে এই জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়। 'তদ্বদ্'—তেমনি। 'ব্রহ্মবিদঃ সতঃ কিমপরং বুদ্ধের্বিহারাস্পদম্'—যাঁরা ব্রহ্মবিদ্, তাঁদের বুদ্ধির বিহার-স্থল 'সৎ' ছাড়া আর কি হতে পারে ? ব্রহ্মেই তাঁদের বুদ্ধি বিচরণ করে। তাঁরা ব্রহ্মই দেখেন শুধু। আমিই তো আছি দ্বিতীয় তো কেউ নেই, নিজের মধ্যেই নিজে আনন্দ করছি। 'আত্মক্রীড়' হয়ে আছি।

কস্তাং পরানন্দরসানুভূতিমুৎসৃজ্য শূন্যেষু রমেত বিদ্বান্।
চন্দ্রে মহাহ্লাদিনি দীপ্যমানে চিত্রেন্দুমালোকয়িতুং ক ইচ্ছেৎ॥ ৫২২

অন্বয় : তাং পর-আনন্দরস-অনুভূতিম্ (সেই পরমাত্মার আনন্দরসের অনুভূতি) উৎসৃজ্য (ত্যাগ করে) কঃ বিদ্বান্ (কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি) শূন্যেষু (মিথ্যা বিষয়ে) রমেত (আসক্ত হয়) মহাহ্লাদিনি চন্দ্রে দীপ্যমানে (মহানন্দ উদ্রেককারী চন্দ্র দীপ্যমান হলে) চিত্র-ইন্দুম্ আলোকয়িতুম্ (চিত্রে অঙ্কিত চন্দ্র দেখতে) কঃ ইচ্ছেৎ (কে আর ইচ্ছা করে) ?

সরলার্থ : কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আত্মার পরমানন্দরস-অনুভূতি ছেড়ে অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হয় ? মহা-আনন্দসঞ্চারী চন্দ্র আকাশে দীপ্যমান হলে চিত্রে অঙ্কিত চন্দ্রকে কে আর দেখতে চায় ?

ব্যাখ্যা : এখানে একটা সুন্দর উপমা দিয়ে বোঝাতে চাইছেন কেন আমরা ব্রহ্মানন্দের জন্যে ব্যাকুল হব। বিষয়ানন্দেও আনন্দ হয় কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণিক, আমরা এমন আনন্দ চাই যা নিত্য, যে আনন্দের শেষ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যে অমৃতের স্বাদ পেয়েছে তার কি আর চিটেগুড় ভালো লাগে ? এখানে বলছেন 'কস্তাং পরানন্দরসানুভূতিম্-উৎসৃজ্য শূন্যেষু রমেত বিদ্বান্' ? 'উৎসৃজ্য' মানে ত্যাগ করে, 'পরানন্দ' মানে শ্রেষ্ঠ আনন্দ, অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ। বলছেন, 'কঃ বিদ্বান্'—কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই পরাজ্ঞান ত্যাগ করে 'শূন্যেষু রমেত'—শূন্যে ঘুরে বেড়ায় ? অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হয় ? এই জগৎ মিথ্যা, অন্তঃসারশূন্য, এখানে ঘুরে কি হবে ? ব্রহ্মানন্দ যে একবার লাভ করেছে, সে কি আর বিষয়সুখের জন্যে ঘুরবে, শূন্যে ঘোরার মতো ? একটা উপমা দিয়ে বলছেন, 'চন্দ্রে মহাহ্লাদিনি দীপ্যমানে চিত্র-ইন্দুম্-আলোকয়িতুম্ কঃ ইচ্ছেৎ' ? চাঁদ আকাশে দীপ্যমান হয়ে জ্বলজ্বল করছে, সকলকে আনন্দ দিচ্ছে। সেই 'মহাহ্লাদিনি দীপ্যমান চন্দ্র'-কে ত্যাগ করে 'চিত্রেন্দু আলোকয়িতুম্ কঃ ইচ্ছেৎ'? চিত্রে যে চাঁদ আঁকা আছে তার আলোর সন্ধান কে করে? মূর্খ ছাড়া কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরকম করে না। তেমনি বুদ্ধিমান বিচারশীল ব্যক্তি কখনও ব্রহ্মানন্দ-রসের নিত্য-আনন্দ-অনুভূতি ছেড়ে অনিত্য, আপাত-মধুর, ক্ষণিক বিষয়ানন্দের পেছনে ছোটে না।

অসৎ পদার্থানুভবেন কিঞ্চিন্নহ্যস্তি তৃপ্তির্ন চ দুঃখহানিঃ
তদদ্বয়ানন্দরসানুভূত্যা তৃপ্তঃ সুখং তিষ্ঠ সদাত্মনিষ্ঠয়া॥ ৫২৩

অন্বয় : অসৎ পদার্থ-অনুভবেন (অনিত্য বিষয়ের অনুভবের দ্বারা) কিঞ্চিৎ তৃপ্তিঃ (কিছুমাত্র তৃপ্তি) ন হি-অস্তি (কখনই হয় না) দুঃখহানিঃ চ ন (দুঃখের হ্রাসও হয় না) তৎ (অতএব) অদ্বয়-আনন্দরস-অনুভূত্যা (অদ্বয় ব্রহ্মানন্দরসের অনুভূতির দ্বারা) তৃপ্তঃ (তৃপ্ত) সৎ-আত্মনিষ্ঠয়া (সৎস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন আত্মায় নিবিষ্ট হয়ে) সুখং তিষ্ঠ (সুখে অবস্থান কর)।

সরলার্থ : যা অনিত্য, মিথ্যা সেইসব বিষয়ের অনুভব বা ভোগের দ্বারা কখনও কিছুমাত্র তৃপ্তি হয় না বা দুঃখের হ্রাস হয় না। অতএব অদ্বয়-ব্রহ্মানন্দরসের অনুভূতির দ্বারা তৃপ্ত হয়ে সৎ-স্বরূপব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন নিজের আত্মায় নিবিষ্ট থেকে সুখে অবস্থান কর।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অসৎ পদার্থ-অনুভবেন কিঞ্চিৎ-ন হি-অস্তি তৃপ্তিঃ ন চ দুঃখহানিঃ'। 'অসৎ' মানে যা অনিত্য, মিথ্যা। 'সৎ' হচ্ছে যা নিত্যসত্য। ব্রহ্ম 'সৎ', জগৎ অসৎ। বলছেন, 'অসৎ পদার্থ-অনুভবেন কিঞ্চিৎ ন হি অস্তি তৃপ্তিঃ'; 'অসৎ পদার্থ' বা মিথ্যাবস্তুর উপভোগে কোনও তৃপ্তি নেই। যেমন স্বপ্নে যদি মিষ্টি খাই তার আস্বাদ ঘুম ভেঙে গেলেই চলে যায়। বেদান্ত বলছেন এ জগৎটা ওই স্বপ্নের মতোই মিথ্যা কিন্তু একটা আপাত-বাস্তব ভাব এর আছে। তাহলেও এ মিথ্যা, এই আছে, এই নেই। যা অনিত্য, সেসব উপভোগে কোনও তৃপ্তি নেই। 'ন চ দুঃখহানিঃ'—তাতে আমাদের দুঃখও কমে না। আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন অভাববোধ সব সময় আছে। ভাবি যে, যেটার অভাব সেটা পেলেই সুখ আসবে। কিন্তু আসে না। নতুন অভাববোধ দেখা দেয়। এর কোন শেষ নেই। আসলে অনিত্য বস্তু কখনও আমাদের অভাববোধ চিরতরে দূর করতে পারে না। তাহলে অভাববোধ যায় কিসে ? সব দুঃখ কিসে দূর হয় ? বেদান্ত বলছেন : 'তদ্-অদ্বয়-আনন্দরস-অনুভূত্যা', অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ-অনুভূতির দ্বারা। দুই থাকলে হবে না। এক অখণ্ড আনন্দের অনুভূতি যদি লাভ করা যায়, তবে তৃপ্তি, তবে সুখ। এ আনন্দ অখণ্ড আনন্দের ধারা, নিরবচ্ছিন্ন, অফুরন্ত, এর কোনও ছেদ নেই, শেষ নেই। 'সৎ-আত্মনিষ্ঠয়া'; বাইরের কোনও বস্তুতে নয়, তোমার মধ্যেই তুমি ডুবে যাবে। আত্মনিষ্ঠ হতে হবে, আত্মারাম হতে হবে। আনন্দ বাইরে নেই, তোমার মধ্যেই আনন্দ। তাই নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে আত্মনিষ্ঠ হয়ে, আত্মতৃপ্ত হয়ে 'সুখং তিষ্ঠ'—সুখে অবস্থান কর। খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে। বাইরের যে বিরাট জগৎ তার পেছনে ছুটলে হবে না। আমার একটা অন্তর্জগৎ আছে, সেই জগতে যদি আমি ঢুকে যেতে পারি, যদি আত্মনিষ্ঠ হতে পারি তাহলেই আমার নিত্যানন্দ। আমার আত্মাই নিত্য আর সব অনিত্য। নিজের মধ্যে নিজে যদি নিবিষ্ট হয়ে থাকতে পার তাহলেই সুখ আর যদি পরনিষ্ঠ হও তাহলে দুঃখ।

স্বমেব সর্বথা পশ্যন্ মন্যমানঃ স্বমদ্বয়ম্।
স্বানন্দমনুভুঞ্জানঃ কালং নয় মহামতে।। ৫২৪

অন্বয় : মহামতে (হে বুদ্ধিমান শিষ্য) স্বম্-অদ্বয়ম্ মন্যমানঃ (নিজের আত্মা অদ্বিতীয় মনে এই ধারণা স্থির রেখে) সর্বথা (সর্বতোভাবে) স্বম্-এব পশ্যন্ (আত্মাকেই অবলোকন করে) স্ব-আনন্দম্ অনুভুঞ্জানঃ (আত্মানন্দ উপভোগ করে) কালং নয় (কাল কাটাও)।

সরলার্থ : হে বুদ্ধিমান শিষ্য, 'আমি অদ্বিতীয় আত্মা' মনে এই ধারণা স্থির রেখে শুধু-মাত্র আত্মাকেই সর্বত্র দেখতে দেখতে আত্মানন্দ উপভোগ করে কালাতিপাত কর।

ব্যাখ্যা : গুরু শিষ্যকে বলছেন, 'স্বম্-এব সর্বথা পশ্যন্ মন্যমানঃ স্বম্-অদ্বয়ম্'। তুমি অদ্বিতীয় আত্মা, এটা মনে রেখে সর্বত্র নিজেকেই দেখতে থাকো। তোমার আত্মাকে সর্বভূতে দেখ। সর্বত্র নিজেকেই দেখতে দেখতে 'স্বানন্দম্-অনুভুঞ্জানঃ', নিজের মধ্যেই আনন্দে নিমজ্জমান হয়ে যাও। 'কালং নয় মহামতে'; এইভাবে দিন কাটিয়ে দাও। শিষ্যকে বলছেন ঃ তুমি মহামতি, তুমি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান। সর্বভূতে আত্মদর্শন করতে করতে তুমি আনন্দে কাল কাটিয়ে দাও।

অখণ্ডবোধাত্মনি নির্বিকল্পে বিকল্পনং ব্যোম্নি পুরপ্রকল্পনম্।
তদদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা শান্তিং পরামেত্য ভজস্ব মৌনম্।। ৫২৫

অন্বয় : অখণ্ডবোধ আত্মনি নির্বিকল্পে (নির্বিকল্প অখণ্ডবোধস্বরূপ আত্মায়) বিকল্পনং (ভেদ দেখা) ব্যোম্নি (আকাশে) পুরপ্রকল্পনম্ (নগর কল্পনার মতো) তদ্ (অতএব) সদা (সর্বদা) অদ্বয়-আনন্দময় আত্মনা (অদ্বয় আনন্দময় স্বরূপে) পরাম্ শান্তিং এত্য (পরম শান্তি লাভ করে) মৌনং ভজস্ব (মৌন হয়ে অবস্থান কর)।

সরলার্থ : নির্বিকল্প অখণ্ডবোধস্বরূপ আত্মায় ভেদ কল্পনা আকাশে নগর কল্পনার মতো মিথ্যা। অতএব সর্বদা অদ্বয় আনন্দময় স্বরূপে পরম শান্তি লাভ করে মৌন হয়ে অবস্থান কর।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অখণ্ড-বোধ-আত্মনি নির্বিকল্পে'—অখণ্ডবোধস্বরূপ নির্বিকল্প আত্মায় 'বিকল্পনং ব্যোম্নি পুরপ্রকল্পনম্'; নির্বিকল্প আত্মাতে যদি আত্মা ছাড়া আর কিছু দেখি, বিকল্প দেখি তাহলে সেটা আকাশে নগর দেখার মতো ভুল দেখা হবে। আকাশে বিরাট সব মেঘ দেখলে অনেক সময় মনে হতে পারে যেন মস্ত বাড়ি-ঘর দিয়ে একটা বড় শহর তৈরী হয়েছে। এটা যেমন মিথ্যা-কল্পনা, তেমনি নির্বিকল্প আত্মাতে বিকল্প যদি কিছু দেখি তো সেও সব মিথ্যা। 'তদ্-অদ্বয়-আনন্দময়-আত্মনা সদা শান্তিং

পরামেত্য ভজস্ব মৌনম্।' আত্মা অদ্বয়। তাতে কোন দুই নেই, বিকল্প নেই। আত্মা আনন্দময়। অসীম আনন্দের আকর। এই অদ্বিতীয় আনন্দময় আত্মাকে নিজের স্বরূপ হিসেবে জেনে, তুমি 'পরাং শান্তি' লাভ কর। আর পরম শান্তি লাভ করে 'ভজস্ব মৌনম্'—চুপ হয়ে যাও। নিজের মধ্যে যা পাবার তা পেয়ে গেছ, আর তোমার বাইরে পাবার কিছু নেই, তাই 'ভজস্ব মৌনম্'। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলছেন, মৌমাছি গুন্‌গুন্ করছে, যেন অভিযোগ করছে, মধু পেলাম না কেন ? তারপর যেই ফুলে বসে মধু খাচ্ছে অমনি চুপ। তোমার নিজের মধ্যে যে আনন্দের খনি আছে তার সন্ধান পেয়ে গেছ এখন নিজের মধ্যে নিজে থাক। আনন্দে ভরপুর হয়ে চুপ করে থাক।

তূষ্ণীমবস্থা পরমোপশান্তির্বুদ্ধেরসৎকল্পবিকল্পহেতোঃ।
ব্রহ্মাত্মনা ব্রহ্মবিদো মহাত্মনো যত্রাদ্বয়ানন্দসুখং নিরন্তরম্।। ৫২৬

অন্বয় : ব্রহ্মবিদঃ মহাত্মনঃ (ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মার) অসৎকল্প-বিকল্প-হেতোঃ বুদ্ধেঃ (মিথ্যা-কল্পনা ও দুই দেখার হেতু যে বুদ্ধি তার) ব্রহ্মাত্মনা তূষ্ণীম্ অবস্থা (চিদাত্মারূপ ব্রহ্মে স্থির হয়ে যাওয়া অবস্থা) পরমা-উপশান্তিঃ (পরমা শান্তির অবস্থা) যত্র (যে অবস্থায়) নিরন্তরম্ (অবিরত) অদ্বয়-আনন্দ-সুখম্ (অদ্বয় আনন্দের সুখানুভূতি)।

সরলার্থ : যিনি ব্রহ্মবিদ্ সেই মহাত্মার বুদ্ধি চিদাত্মারূপ ব্রহ্মে স্থির হয়ে গেছে, তাই মিথ্যা-কল্পনা ও দুই দেখার ভাব সেই বুদ্ধি থেকে চলে গিয়ে একটা পরমা শান্তির অবস্থা লাভ হয়েছে, যে অবস্থায় নিরন্তর অদ্বয়-আনন্দের সুখানুভূতিই শুধু থাকে।

ব্যাখ্যা : বলছেন : ব্রহ্মকে জেনেছেন যে মহাত্মা তাঁর বুদ্ধিটা অন্যরকম। বুদ্ধিতেই আমরা মিথ্যা-কল্পনা করি, বিকল্প দেখি, দুই বা বহু দেখি, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মার 'ব্রহ্মাত্মনা তূষ্ণীম্-অবস্থা', 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান হয়েছে, সেইখানে তিনি শান্ত হয়ে বসে আছেন। তার ফলে তাঁর বুদ্ধি থেকে বিকল্প দেখার ভাবটা চলে গেছে। 'বুদ্ধেঃ অসৎকল্প-বিকল্প-হেতোঃ'—অসৎ কামনা, মিথ্যা বস্তুকে সৎ মনে করা বা বিকল্প দেখা—এগুলি তাঁর বুদ্ধির মধ্যে আর নেই। 'তূষ্ণীম্ অবস্থা পরমা-উপশান্তিঃ'—শান্ত মৌন হয়ে পরমা শান্তির মধ্যে তিনি অবস্থান করছেন। 'পরমা শান্তি' মানে শ্রেষ্ঠ শান্তি, যার কোন তুলনা নেই। 'যত্র-অদ্বয়-আনন্দ সুখম্ নিরন্তরম্'—সেটা এমন একটা অবস্থা যে-অবস্থায় তিনি নিরন্তর আনন্দের সুখ অনুভব করছেন। এই আনন্দটা আসছে অদ্বয় অনুভূতি থেকে। 'আমি এক, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই', এই জ্ঞান-প্রসূত যে আনন্দ, সেই আনন্দে তিনি ভরপুর হয়ে আছেন। সেই আনন্দ নিরন্তর, তার কোন ছেদ নেই। উপনিষদ্ বলেন, এই এক জ্ঞান হলে মানুষ অভয় হয়ে যায়। যখন দেখছি আমি ছাড়া আর কেউ নেই, তখন কাকে ভয় ? কিসে ভয় ? তাই একই কথা বারবার

করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন : এক ছাড়া দুই নেই, আর তুমিই সেই এক। এই এক জ্ঞান হলে কিরকম আনন্দ সেটা পরের শ্লোকেও আবার বলছেন।

নাস্তি নির্বাসনান্মৌনাৎ পরং সুখকৃদুত্তমম্।
বিজ্ঞাতাত্মস্বরূপস্য স্বানন্দরসপায়িনঃ।। ৫২৭

অন্বয় : বিজ্ঞাত-আত্মস্বরূপস্য স্ব-আনন্দরস-পায়িনঃ (যিনি আত্মস্বরূপ জেনেছেন, যিনি আত্মানন্দরস পানে রত, তাঁর কাছে) নির্বাসনাৎ-মৌনাৎ (নির্বাসনা ও মৌন-তার থেকে) পরং (অন্য কিছু) উত্তমম্ সুখকৃৎ ন অস্তি (উত্তম সুখকর আর নেই)।

সরলার্থ : যিনি আত্মস্বরূপ জেনে আত্মানন্দরস পানে রত, তাঁর কাছে নির্বাসনা ও মৌনতার থেকে উত্তম সুখকর আর কিছু নেই।

ব্যাখ্যা : এখানে বলছেন : মৌনতা আর নির্বাসনার চেয়ে সুখকর আর কিছু নেই। বাসনা এমন যে, এ যেন আগুনে ঘি ঢালার মতো। একটা বাসনার পূর্তি হলো তো আর একটা বাসনা এসে গেলো। তাই নির্বাসনা হলে শান্তি—'নাস্তি নির্বাসনাৎ মৌনাৎ পরং সুখকৃৎ-উত্তমম্'। মৌন কথাটার অর্থ হচ্ছে নির্বাক, নিশ্চুপ। এখানে মানে হচ্ছে, মন যেন নিশ্চুপ, স্থির, শান্ত। কোনও কিছুতে আকর্ষণও নেই বিকর্ষণও নেই। মনে কোনও চাঞ্চল্য নেই, তাই মৌন, স্থির। মনটাই স্থির, কারণ কোনও বাসনা নেই। বাসনা থাকলেই মন চঞ্চল হবে। বাসনা চলে গেছে তাই মন স্থির, শান্ত। কোন উদ্যোগ-উদ্দীপনা নেই, উত্তেজনা নেই, হাহুতাশ নেই। স্বামীজী একটা কথা বলতেন, intense rest in the midst of intense activity। এর মধ্যে নেতিবাচক কিছু নেই। আমি জড় হয়ে যাচ্ছি না, কিন্তু অনেক কাজের মধ্যেও আমার মনটা স্থির, শান্ত। কারণ আমার নির্বাসনা হয়ে গেছে। কোনও বাসনা নেই। শ্রীমা সারদাদেবী বলতেন : ভগবানের কাছে কিছু যদি চাইতে হয় তবে নির্বাসনা চাও। ঐ একটা বাসনা থাকুক যে, আমি যেন নির্বাসনা হই। এখানে বলছেন, এর থেকে 'পরং সুখকৃৎ-উত্তমম্ ন অস্তি'। এর চেয়ে সুখকর আর কিছু হতে পারে না। এটাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। কার হয় এরকম ? 'বিজ্ঞাত-আত্মস্বরূপস্য স্ব-আনন্দরস-পায়িনঃ'—নিজের স্বরূপ, নিজের পরিচয় যিনি জেনেছেন, আর জেনে যিনি আত্মানন্দের রস পান করছেন। আমি আপ্তকাম, পূর্ণকাম, আমার প্রাপ্তব্য বলে আর কিছু নেই। 'স্ব-আনন্দরসপায়িনঃ'—যে আনন্দরস আমার নিজের মধ্যেই আছে তাই পান করছি আমি। আমি আমার মধ্যেই মধু পেয়ে গেছি। সেইজন্যে আমি মৌন হয়ে গেছি, শান্ত হয়ে গেছি, নির্বাসনা হয়ে গেছি। আমরা তো সবাই আনন্দ খুঁজি, কিন্তু বাইরে। বাইরের আনন্দ তো ক্ষণিক, কোনও একটা কিছুর ওপর নির্ভর করে আছে। কিন্তু ভেতরের যে আনন্দ তার কোনও ছেদ নেই, শেষ নেই,

নিত্যানন্দ। সেই আনন্দ পেলে বিষয়ানন্দের আকর্ষণ তুচ্ছ হয়ে যায়। নির্বাসনা এসে যায়। তখন চুপ করে সেই আনন্দেই বুঁদ হয়ে থাকি।

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্নুপবিশঞ্ছয়ানো বান্যথাপি বা।
যথেচ্ছয়া বসেদ্বিদ্বানাত্মারামঃ সদা মুনিঃ॥ ৫২৮

অন্বয় : আত্মারামঃ বিদ্বান্ মুনিঃ (আত্মতৃপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ মুনি) গচ্ছন্ তিষ্ঠন্-উপবিশন্ শয়ানঃ বা (যাচ্ছেন, আছেন, বসছেন, অথবা শুয়ে পড়ছেন) অন্যথা-অপি বা (বা অন্য কিছু করছেন) সদা যথা-ইচ্ছয়া বসেৎ (সর্বদা যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করছেন)।

সরলার্থ : আত্মতৃপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যখন চলেন, অবস্থান করেন, বসে থাকেন, শুয়ে পড়েন বা অন্য কিছু করেন, তখন সব সময় তাঁর যেমন ইচ্ছে হয় সেরকমই ব্যবহার করেন।

ব্যাখ্যা : ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর হয়ে গেছে, জগৎকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। তাঁর কিরকম একটা অবস্থা হয় ! শ্রীরামকৃষ্ণের যেমন হতো। যাচ্ছেন সব কোথায় কোথায় ! কোথায় যেন কার বাড়িতে চলে গেছেন, সেখানে বসে আছেন, চেনেন না, তারা তাঁকে চিনেছে কিনা তাও জানেন না। খেতে দিয়েছে, খাচ্ছেন। দেহটা যেন একটা গতিবেগে চলছে, উপবেশন, শয়ন, গমন, এসব চলছে, কিন্তু কোনও আমিত্ব বোধ নেই। কোনও উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। 'যথেচ্ছয়া'—যেমন ইচ্ছা উঠছে তার দ্বারাই পরিচালিত। 'যথেচ্ছয়া' বলছেন কেন ? কারণ, ভেবেচিন্তে একটা কোনও পরিকল্পনা করে যে তিনি কিছু করেন তা নয়। বলছেন : 'আত্মারামঃ বিদ্বান্ মুনি'। 'আত্মারাম' অর্থাৎ আত্মাতেই যাঁর আনন্দ। 'বিদ্বান্'—যিনি নিজের স্বরূপ জেনেছেন। 'মুনি'—যিনি মননশীল অর্থাৎ জ্ঞানী। প্রতিটি শব্দই আত্মজ্ঞানীর অবস্থাকে বোঝাচ্ছে। আত্মারাম বিদ্বান মুনি কিভাবে জগতে চলেন বা ব্যবহার করেন ? যথেচ্ছভাবে। নিজের ইচ্ছামতো। বলছেন : 'গচ্ছন্'—যখন কোথাও যাচ্ছেন, 'তিষ্ঠন্'—যখন কোথাও থাকছেন, অবস্থান করছেন, 'উপবিশন্'—যখন বসে আছেন, 'শয়ানঃ'—যখন শুয়ে আছেন, 'অন্যথা অপি'—কিংবা অন্য কিছু যখন করছেন, 'সদা যথা-ইচ্ছয়া বসেৎ'—সব সময় তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করেন। যেমন তাঁর মনে উঠল, সেরকম আচরণ করেন। অন্য কেউ তাঁর,কোন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বা অন্যের মুখ চেয়ে, অন্যে কি ভাববে, এসব ভেবে তিনি কিছু করেন না। তিনিই প্রকৃত স্বাধীন। আমরা স্বাধীন নই। আমরা যা ইচ্ছা তা করতে পারি না। সব সময় ভাবি কে কি বলবে বা ভাববে। পারিবারিক মর্যাদা, সামাজিক মর্যাদা, দেশের বা সমাজের বিধি-নিষেধ, ধর্মের বিধি-নিষেধ এসব আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সমস্ত লৌকিক

বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে খেতে বসেছেন। নিয়ম হচ্ছে, সাধুরা সব একসঙ্গে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় পড়বে, তারপর খাওয়া শুরু হবে। খাবার পাতে দেওয়ামাত্র তিনি খেতে শুরু করেছেন। সাধুরা বলছে : 'এ কে ? কোত্থেকে এসেছে ? কিচ্ছু জানে না'—জাগতিক নিয়ম এঁদের জন্যে নয়।

ন দেশকালাসনদিগ্‌যমাদি-লক্ষ্যাদ্যপেক্ষা প্রতিবদ্ধবৃত্তেঃ।
সংসিদ্ধতত্ত্বস্য মহাত্মনোঽস্তি স্ববেদনে কা নিয়মাদ্যপেক্ষা॥ ৫২৯

অন্বয় : প্রতিবদ্ধবৃত্তেঃ (যাঁর চিত্তবৃত্তি বদ্ধ হয়ে আছে) সংসিদ্ধতত্ত্বস্য (যাঁর তত্ত্ব কি তা জানা হয়ে গেছে) মহাত্মনঃ (সেই মহাত্মার) দেশ-কাল-আসন-দিক্-যমাদি-লক্ষ্য-আদি-অপেক্ষা ন অস্তি (স্থান-কাল-আসন-দিক্-ইন্দ্রিয়-সংযমাদি ও স্থূল-সূক্ষ্ম ধ্যান-ধারণাদির বস্তু নিয়ে বিচারের প্রয়োজন আর থাকে না) স্ব-বেদনে কা নিয়ম-আদি-অপেক্ষা (স্বরূপজ্ঞান হলে নিয়মাদির অপেক্ষা আবার কি) ?

সরলার্থ : যাঁর চিত্তবৃত্তি প্রতিবদ্ধ হয়ে আছে, তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গেছে, সেই মহাত্মার স্থান-কাল-আসন-দিক-ইন্দ্রিয়সংযমাদি ও স্থূল- সূক্ষ্ম ধ্যান-ধারণাদির বস্তু নিয়ে বিচারের প্রয়োজন আর থাকে না। স্বরূপজ্ঞান হলে নিয়ম পালনের অপেক্ষা কি আর থাকতে পারে ?

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'ন দেশ-কাল-আসন-দিগ্-যমাদি-লক্ষ্য-আদি-অপেক্ষা প্রতিবদ্ধবৃত্তেঃ'। 'বৃত্তেঃ'—মনের বৃত্তির। মনের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, চাঞ্চল্য, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি সব মনের বৃত্তি। এগুলো 'প্রতিবদ্ধ'—বদ্ধ হয়ে আছে। কার বৃত্তি প্রতিবদ্ধ হয়েছে ? যিনি 'সংসিদ্ধতত্ত্বস্য'—তত্ত্ব কি তা যিনি জেনেছেন, আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে যাঁর। তাঁর মনের সব বৃত্তি প্রতিবদ্ধ হয়ে গেছে, বদ্ধ হয়ে গেছে। তাঁর দেশ-কাল-আসন-দিক্ আবার ইন্দ্রিয়-সংযমাদি, এসবের আর দরকার হয় না, তিনি এগুলোর ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। আমরা যেন একটা গণ্ডীর মধ্যে আছি তাই সেই গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে আমাদের অনেক কিছু নিয়ম মানার দরকার হয়। কিন্তু যিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁর আর দেশ-কাল-দিক্ এসব বিচারের দরকার হয় না। সংযম অভ্যাস দরকার হয় না। সংযম তাঁর কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তিনি 'মহাত্মা', তাঁর জন্যে কোনও নিয়ম নেই। 'স্ববেদনে কা নিয়মাদি-অপেক্ষা' ? 'বেদনে' মানে জানা হলে, কথাটা বিদ্ ধাতু থেকে এসেছে। 'স্ববেদনে' মানে স্বরূপজ্ঞান হলে। 'স্ববেদনে কা নিয়মাদি-অপেক্ষা' ? যাঁর স্বরূপজ্ঞান হয়েছে তাঁর আবার নিয়ম কি ? তিনি নিয়মের ধার ধারেন না। রাজা মহারাজ আর মহাপুরুষ মহারাজ মঠে আছেন। স্বামীজীর তিথি-পুজো উৎসব চলছে। হঠাৎ রাজা মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন ঃ আপনাকে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে ঘুরে আসতে হবে। মহাপুরুষ মহারাজও গেরুয়া ছেড়ে সিল্কের

ধুতি-পাঞ্জাবী পরে, হাতে ছড়ি নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে এলেন, কেউ চিনতে পারল না। পরে দুজনেই বালকের মতো মজা করলেন এই নিয়ে। এঁরা তো মুক্ত পুরুষ, এঁদের কোনও নিয়ম মানার দরকার নেই। ঠাকুর বলতেন, চারাগাছকে বেড়া দিয়ে ঘিরতে হয় তা নাহলে গরুতে খেয়ে নেবে। কিন্তু ধীরে ধীরে গাছটা বড় হলে তাতে একটা হাতীও বাঁধা যেতে পারে। যিনি জীবন্মুক্ত, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁর জন্যে কোনও নিয়ম নেই। 'কা নিয়মাদি অপেক্ষা' ? তাঁদের আবার নিয়ম কি ?

ঘটোঽয়মিতি বিজ্ঞাতুং নিয়মঃ কোন্ববেক্ষ্যতে।
বিনা প্রমাণসুষ্ঠুত্বং যস্মিন্ সতি পদার্থধীঃ।। ৫৩০

অন্বয় : যস্মিন্ সতি পদার্থধীঃ (যা থাকলে পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হয়) [সেই] প্রমাণ-সুষ্ঠুত্বং বিনা (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রমাণের দোষরাহিত্য ছাড়া) অয়ম্ ঘটঃ ইতি বিজ্ঞাতুং ('এইটি ঘট' এটা জানার জন্যে) কঃ নু নিয়মঃ অবেক্ষ্যতে (অন্য কোন্ নিয়মের অপেক্ষা থাকে) ?

সরলার্থ : যা থাকলে পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হয় সেই দোষহীন চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-প্রমাণ ছাড়া একটা ঘটকে 'এইটা ঘট' বলে জানার জন্যে আর কোন্ নিয়মের অপেক্ষায় থাকতে হয় ?

ব্যাখ্যা : এখানে একটা সুন্দর কথা বলছেন। একটা ঘটকে 'এটা ঘট' বলে চেনবার জন্যে তোমায় আবার সাধ্যসাধনা করতে হবে? বই পড়তে হবে? গুরুর সন্ধান করতে হবে ? মানে আত্মজ্ঞান লাভ হয়ে গেছে যাঁর, তাঁর আর এসবের কোনও দরকার নেই। এই সব আচার-অনুষ্ঠান যদি আমি রেখে দিই তাহলে সেগুলি আবার বন্ধন হয়ে যায়। আমরা যখন ধর্মজীবন আরম্ভ করি তখন অনেক বিধি-নিষেধ মানতে হয় তারপর আস্তে আস্তে সেসব চলে যায়। বিচার করে 'এটা করব না' বলে আর ঠিক করতে হয় না। যেটা করা উচিত নয়, সেটা না করাই স্বভাব হয়ে যায়। তাই বলছেন, এটা ঘট, এ আর বিচার করে ঠিক করতে হবে না। যদি আমার চোখ ঠিক থাকে, তাহলে ঘটকে চিনতে আমার কোনও অসুবিধে হয় না। চোখ দিয়ে দেখেই ঘটকে ঘট বলে চিনতে পারব। তেমনি আমার আত্মাকেও চিনতে কোনও অসুবিধে নেই। যদি আমার জ্ঞানচক্ষু খোলা থাকে। আমি জেনে গেছি আমি আত্মা। 'ঘটোঽয়ম্-ইতি বিজ্ঞাতুং'—একটা ঘটকে 'এইটা ঘট' বলে জানার জন্যে 'নিয়মঃ কঃ নু অবেক্ষ্যতে', কোনও নিয়মের অপেক্ষা করতে হয় না। 'কঃ নিয়মঃ' ? এর আবার কোনও নিয়মকানুন আছে নাকি ? 'বিনা প্রমাণ-সুষ্ঠুত্বং', একটা ঘটকে চেনবার জন্যে দরকার আমার চোখ। আমার চোখ যদি ভালো থাকে, আমার ইন্দ্রিয়গুলো যদি ঠিক মতো কাজ করে তাহলেই হলো, এর

জন্যে আমাকে আর অন্য কোনও প্রমাণের ধার ধারতে হবে না। নির্দোষ চোখই ঘটকে চেনার প্রমাণ। তেমনি আত্মাকে জানার জন্যে একমাত্র প্রয়োজন অপরোক্ষানুভূতি। অপরোক্ষানুভূতিই আত্মজ্ঞানের একমাত্র প্রমাণ।

অয়মাত্মা নিত্যসিদ্ধঃ প্রমাণে সতি ভাসতে।
ন দেশং নাপি বা কালং ন শুদ্ধিং বাপ্যপেক্ষতে।। ৫৩১

অন্বয় : অয়ম্ নিত্যসিদ্ধঃ আত্মা (এই নিত্যসিদ্ধ আত্মা) প্রমাণে সতি ভাসতে (অনুভূতিরূপ প্রমাণে প্রকাশ হন) ন দেশং ন-অপি বা কালং ন শুদ্ধিং অপি বা অপেক্ষতে (দেশ-কাল বা শুদ্ধির অপেক্ষা করেন না)।

সরলার্থ : এই নিত্যসিদ্ধ আত্মা নিজের অনুভূতিরূপ প্রমাণে প্রকাশিত হন। তাঁর প্রকাশের জন্যে বিশেষ স্থান-কাল বা দেহশুদ্ধির কোন প্রয়োজন হয় না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অয়ম্-আত্মা নিত্যসিদ্ধঃ'—এই আত্মা নিত্যসিদ্ধ। তিনি সব সময় আছেন, সে আমি জানি বা না জানি। 'প্রমাণে সতি ভাসতে'—প্রমাণ উপস্থিত হলে তিনি প্রকাশিত হন। সেই প্রমাণটা কি ? অপরোক্ষানুভূতি। নিত্যসিদ্ধ আত্মা যে আছেন আত্মজ্ঞানই তার প্রমাণ। তার আর কোনও প্রমাণ হয় না, আর কোনও প্রমাণ দিয়ে তাঁকে নিশ্চয় করতে হয় না। তিনি সূর্যের মতো স্বয়ংপ্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ। সূর্যকে চিনিয়ে দিতে হয় না, সূর্যের আলোতেই সূর্য প্রকাশ পায়। আত্মজ্ঞান যখন হয় তখন সেটা নিজেই বুঝতে পারা যায়, কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। 'ন দেশং ন-অপি বা কালং ন শুদ্ধিং বা-অপি-অপেক্ষতে'; তাঁর প্রকাশ দেশ-কালের অপেক্ষা করে না, শুদ্ধি-অশুদ্ধির অপেক্ষা করে না।

দেবদত্তোঽহমিত্যেতদ্বিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্।
তদ্বদব্রহ্মবিদোঽপ্যস্য ব্রহ্মাহমিতি বেদনম্।। ৫৩২

অন্বয় : অহম্ দেবদত্তঃ ইতি (আমি দেবদত্ত) এতৎ বিজ্ঞানং (এই জ্ঞান) নিরপেক্ষকম্ (কিছুর অপেক্ষা করে না) তৎ বৎ (সেই রকম) অস্য ব্রহ্মবিদঃ অপি (এই ব্রহ্মজ্ঞেরও) অহং ব্রহ্ম ইতি বেদনম্ ('আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞান)।

সরলার্থ : আমি দেবদত্ত, এই বোধ যেমন কোনও কিছুর ওপর নির্ভর করে না তেমনি যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তাঁর 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞান কিছুর সাপেক্ষ নয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'দেবদত্তঃ-অহম্-ইতি এতৎ বিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্'; 'আমি দেবদত্ত', এটা জানার জন্যে আমার কারোর অপেক্ষা রাখতে হয় না, আমি জানি আমি দেবদত্ত।

ঠিক তেমনি 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানও কোন কিছুর ওপর নির্ভর করে না। 'নিরপেক্ষকম্'। ব্রহ্মজ্ঞান হলে অন্যে কে কি বলছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমার ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ আমি। একটা নিশ্চিত প্রত্যয় হবে, হস্তামলকবৎ। হাতের মুঠোয় আমলকী আছে, কেউ যদি বলে আমলকী তোমার হাতে নেই, আমি কি তা শুনব ? ব্রহ্মজ্ঞান সেইরকম। 'তৎ-বৎ ব্রহ্মবিদঃ-অপি অস্য ব্রহ্ম-অহম্-ইতি বেদনম্'। যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তাঁর ধারণা হবে 'ব্রহ্ম-অহম্ ইতি', অহং ব্রহ্মাস্মি। 'বেদনম্' মানে জ্ঞান। নিজের মধ্যে জ্ঞানের স্ফুরণ হয়েছে, এ আমার নিজের ব্যাপার। অন্য কারোর ওপর নির্ভর করে নেই। যিনি ব্রহ্মবিদ্ তিনি জানেন তিনি কি, অপরে জানুক বা না জানুক।

ভানুনেব জগৎ সর্বং ভাসতে যস্য তেজসা।
অনাত্মকমসৎ তুচ্ছং কিং নু তস্যাবভাসকম্॥ ৫৩৩

অন্বয় : ভানুনা-ইব (সূর্যের মতো) যস্য তেজসা (যাঁর তেজের দ্বারা) অনাত্মকম্-অসৎ তুচ্ছং সর্বং জগৎ ভাসতে (অনাত্মক, অসৎ ও তুচ্ছ সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়) তস্য-অবভাসকং কিং নু (তাঁর প্রকাশক কি আর থাকতে পারে) ?

সরলার্থ : সূর্যের আলোয় যেমন সবকিছু প্রকাশিত হয় তেমনি জ্যোতিস্বরূপ যাঁর তেজের দ্বারা অনাত্মক, অসৎ ও তুচ্ছ সমস্ত জগতের প্রকাশ তাঁর প্রকাশক আর কি থাকতে পারে ?

ব্যাখ্যা : আকাশে সূর্য উঠেছে, রাত্রির অন্ধকার সব চলে গেছে, ভোর হয়েছে। এই অন্ধকার আর অজ্ঞতা যেন এক। হৃদয়াকাশে জ্ঞানসূর্য উঠলে আমার হৃদয় থেকে সমস্ত অজ্ঞতা মুছে যাবে। বলছেন, 'ভানুনা-ইব সর্বং জগৎ ভাসতে যস্য তেজসা'; সূর্যের আলোতেই সবকিছু আলোকিত হয়, এই আলোতেই আমরা জগৎকে দেখছি। সূর্য আছেন বলেই যেন জগৎ আছে। তেমনি ব্রহ্ম আছেন বলেই জগৎ আমার কাছে প্রকাশিত। উপনিষদে আছে, 'তস্য ভাসা সর্বম্-ইদম্ বিভাতি', তাঁর আলোতেই সবকিছু আলোকিত, তিনি আছেন বলেই সবকিছু আছে। এক থাকলেই তার পেছনে শূন্য বসালে সংখ্যা বাড়ে কিন্তু একেকে মুছে দিলেই সব শূন্য। আমার ভেতরে এই জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানের দ্বারাই আমি সবকিছুকে জানছি। বলছেন, 'সর্বং ভাসতে যস্য তেজসা'; 'ভাসতে' মানে প্রকাশ হয়। যাঁর আলোতে সবকিছু প্রকাশিত হয়, 'অনাত্মকম্-অসৎ তুচ্ছং সর্বং জগৎ', 'অনাত্মকম্' অর্থাৎ অনিত্য, যা থাকে না, 'অসৎ' মানে মিথ্যা, যার সত্তা নেই। সমস্ত তুচ্ছ অনাত্মবস্তু ও মিথ্যা জগৎ যাঁর প্রভায় প্রকাশিত, 'কিং নু তস্য অবভাসকম্'—তাঁর প্রকাশক কি আর থাকতে পারে ? সূর্য নিজেই সবাইকে প্রকাশ করে আলো দিয়ে, সূর্যের ওপরে আবার কি কোন আলো ফেলতে হয়

সূর্যকে দেখার জন্যে ? সূর্য স্বয়ংপ্রকাশ। তেমনি আত্মাও স্বয়ংপ্রকাশ, তিনি সবকিছু প্রকাশ করছেন। তাঁর প্রকাশক আবার কে থাকবে ?

বেদশাস্ত্রপুরাণানি ভূতানি সকলান্যপি।
যেনার্থবন্তি তং কিং নু বিজ্ঞাতারং প্রকাশয়েৎ॥ ৫৩৪

অন্বয় : বেদ-শাস্ত্র-পুরাণানি (বেদ-শাস্ত্র ও পুরাণ সমূহ) অপি সকলানি ভূতানি (আর যা কিছু আছে সব) যেন-অর্থবন্তি (যাঁর দ্বারা অর্থবান হয়) তং বিজ্ঞাতারং (সেই বিজ্ঞাতাকে) কিং নু প্রকাশয়েৎ (কি আর প্রকাশ করবে) ?

সরলার্থ : বেদ-শাস্ত্র ও পুরাণ ইত্যাদি ও আর যা কিছু আছে সব যাঁর দ্বারা সত্তাবান ও অর্থযুক্ত, সেই বিজ্ঞাতাকে কি আর প্রকাশ করতে পারে ?

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'বেদশাস্ত্রপুরাণানি ভূতানি সকলানি-অপি যেন-অর্থবন্তি'। বেদ বা অন্যান্য শাস্ত্র-পুরাণাদি এবং আর যা কিছু আছে সেসব 'অর্থবন্তি' অর্থাৎ অর্থবহ হচ্ছে যার দ্বারা। কার দ্বারা হচ্ছে ? আত্মার দ্বারা। বেদ, শাস্ত্র এসব তিনি আছেন বলেই অর্থযুক্ত। তিনি আছেন বলেই এসবের সার্থকতা। তা না হলে কে বেদ পড়ে ? কে এসব বিশ্বাস করে ? তিনি আছেন বলেই বেদ-পুরাণ ইত্যাদি অর্থবান হয়েছে। যাঁর সত্তাতে বেদ-পুরাণ ও আর সবকিছু সত্তাবান হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আবার কে প্রকাশ করবে ? 'তং কিং নু বিজ্ঞাতারং প্রকাশয়েৎ' ? যাঁর সত্তায় সবকিছু সত্তাবান, যাঁর আলোয় সবকিছু প্রকাশিত, অসীম, অনন্ত যিনি, তাঁকে কে প্রকাশ করবে ? যে আলোর জন্যে সবকিছু দেখছি সেই আলোকে প্রকাশ করতে কি অন্য আর একটা আলো লাগে? তা লাগে না। তিনি আছেন বলেই আমরা আছি, তিনিই সবকিছুর বিজ্ঞাতা, তাঁকে কে জানবে ? 'বিজ্ঞাতারং কেন সর্বং বিজানীয়াৎ' (বৃ, ২।৪।১৪)? বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই কথা আছে। আমাদের যে আত্মা তিনি তো আমাদের থেকে আলাদা কোন বস্তু নন যে জানব ? আমাকে আমি জানব কি করে ? তাই বলছেন, 'তং কিং নু বিজ্ঞাতারং প্রকাশয়েৎ'।

এষ স্বয়ংজ্যোতিরনন্তশক্তিরাত্মাঽপ্রমেয়ঃ সকলানুভূতিঃ।
যমেব বিজ্ঞায় বিমুক্তবন্ধো জয়ত্যয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমোত্তমঃ॥ ৫৩৫

অন্বয় : এষ স্বয়ংজ্যোতিঃ-অনন্তশক্তিঃ-অপ্রমেয়ঃ-আত্মা (এই স্বয়ংপ্রকাশ, অনন্তশক্তি, অপ্রমেয় ও সকল অনুভূতিস্বরূপ আত্মা) যম্-এব বিজ্ঞায় (শুধু যাঁকে জেনে) অয়ং ব্রহ্মবিদ্-উত্তম-উত্তমঃ (এই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ) বিমুক্তবন্ধঃ জয়তি (সম্পূর্ণভাবে বন্ধনমুক্ত হয়ে সব জয় করেন)।

সরলার্থ : এই স্বয়ংপ্রকাশ-অনন্তশক্তি-অপ্রমেয় ও সকল অনুভূতির ভিত্তিস্বরূপ যে আত্মা তাঁকে জেনে এই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সম্পূর্ণভাবে বন্ধনমুক্ত হয়ে সবকিছু জয় করেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন : 'এষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ'—তিনি জ্যোতিস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ, 'অনন্তশক্তিঃ-আত্মা-অপ্রমেয়'; তিনি অনন্তশক্তি, 'অপ্রমেয়', কোনও ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে ধরা যায় না। 'সকল-অনুভূতিঃ', সমস্ত অনুভূতির পেছনে তিনি। 'যম্-এব বিজ্ঞায় বিমুক্তবন্ধঃ'—যাঁকে জানলে সমস্ত বন্ধন চলে যায়। জ্ঞান-সূর্যের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বন্ধন চলে যাবে। 'জয়তি অয়ং ব্রহ্মবিদ্-উত্তম-উত্তমঃ'। যখন আত্মজ্ঞান হয় তখন সমস্ত বন্ধন খসে পড়ে। যিনি উত্তমেরও উত্তম ব্রহ্মবিদ্ তিনি তখন সমস্ত বন্ধনমুক্ত হয়ে সবকিছু জয় করেন। বিজয়গর্বে চলাফেরা করেন তিনি।

ন খিদ্যতে ন বিষয়ৈঃ প্রমোদতে ন সজ্জতে নাপি বিরজ্যতে চ।
স্বস্মিন্ সদা ক্রীড়তি নন্দতি স্বয়ং নিরন্তরানন্দরসেন তৃপ্তঃ॥ ৫৩৬

অন্বয় : ন খিদ্যতে (খেদ করেন না) বিষয়ৈঃ ন প্রমোদতে (বিষয়সমূহ নিয়ে আনন্দ করেন না) ন সজ্জতে (আসক্ত হন না) ন চ অপি বিরজ্যতে (বিরক্তও হন না) নিরন্তর আনন্দরসেন তৃপ্তঃ (নিরন্তর আত্মানন্দ রসের দ্বারা তৃপ্ত) সদা স্বস্মিন্ ক্রীড়তি (সর্বদা আত্মাতে ক্রীড়া করেন) স্বয়ং নন্দতি (নিজেই আনন্দ করেন)।

সরলার্থ : সেই ব্রহ্মবিদ্ কোনও খেদ করেন না, বিষয়সমূহ নিয়ে আনন্দ করেন না, আসক্ত হন না, বিরক্তও হন না। নিরন্তর অন্তরের আনন্দরসে তৃপ্ত থেকে তিনি সর্বদা নিজের আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, এবং নিজেই আনন্দ করেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন এই ব্রহ্মবিদ্ 'ন খিদ্যতে নো বিষয়ৈঃ প্রমোদতে'। তাঁর কোনও কিছুতে খেদ নেই, কোনও বিষয় নিয়ে আনন্দ করাও নেই। নিজের মধ্যে তাঁর আনন্দ। তাঁর আনন্দ বিষয়কেন্দ্রিক নয়। 'ন সজ্জতে'—কোন কিছুর ওপর তাঁর আসক্তি নেই। 'সজ্' ধাতু থেকে 'সজ্জতে', যার থেকে 'সঙ্গ' এসেছে। 'ন বিরজ্যতে'—কোনও কিছুর প্রতি বিরক্তিও নেই। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, তাঁর কাছে সমান হয়ে গেছে। 'স্বস্মিন্ সদা ক্রীড়তি'; আত্মক্রীড়। উপনিষদে আছে, আত্মারাম, নিজের মধ্যে নিজে আনন্দ করছি, খেলা করছি। 'নন্দতি স্বয়ং', নিজেই আনন্দ করছেন, 'আনন্দরসেন তৃপ্তঃ'। আনন্দের হিল্লোল তাঁর ভেতরে বয়ে যাচ্ছে, আনন্দের স্রোত বইছে। ভেতরে আনন্দের নির্ঝর রয়েছে, সেই আনন্দে তৃপ্ত হয়ে আছেন। তিনি একা, কিন্তু পূর্ণ। নিজের মধ্যে নিজে খেলা করছেন। পূর্ণকাম, আপ্তকাম হয়ে আছেন। 'যং লব্ধবা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'। আর কিছু পাবার নেই। নিজের আনন্দে নিজে আছেন, পূর্ণ

হয়ে আছেন, কোনও কিছুর ওপর তাঁর আনন্দ নির্ভর করে নেই। তিনি নিরন্তর আনন্দরসে সিক্ত হয়ে আছেন, তৃপ্ত হয়ে আছেন। এই জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থা। এটা ধ্যানের বিষয়।

ক্ষুধাং দেহব্যথাং ত্যক্ত্বা বালঃ ক্রীড়তি বস্তুনি।
তথৈব বিদ্বান্ রমতে নির্মমো নিরহং সুখী॥ ৫৩৭

অন্বয় : বালঃ (বালক) ক্ষুধাং দেহব্যথাং ত্যক্ত্বা (ক্ষুধা ও দেহের ব্যথা ভুলে) বস্তুনি ক্রীড়তি (খেলার জিনিস নিয়ে খেলা করে) বিদ্বান্ তথা-এব (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও সেইরকম) নির্মমঃ নিরহং সুখী রমতে (মমতা ও অহংকার শূন্য হয়ে সুখে আত্মাতে ক্রীড়া করেন)।

সরলার্থ : বালক যেমন ক্ষুধা ও দেহের ব্যথা ভুলে কতগুলো জিনিস নিয়ে খেলা করে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও তেমনি অহংকার ও মমতা শূন্য হয়ে সুখে আত্মায় ক্রীড়া করেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'ক্ষুধাং দেহব্যথাং ত্যক্ত্বা বালঃ ক্রীড়তি বস্তুনি'; খিদে, শরীরের কষ্ট এসব ছেড়ে দিয়ে বালক যা হোক কতগুলো জিনিস নিয়ে খেলে। শিশুরা তো এইরকমই খেলা করে। সাধারণ জিনিস নিয়ে খেলা করছে। যা পেয়েছে তাই নিয়ে এসেছে, হয়তো সব ফেলে দেওয়া জিনিস, সেইসব খুব মূল্যবান জিনিসের মতো ধরে রেখেছে, সেইসব নিয়ে খেলায় মেতে আছে। খিদে, শরীরের কষ্ট, সেসব গ্রাহ্যের মধ্যে নেই। 'তথা-এব বিদ্বান্'; যাঁর জ্ঞান লাভ হয়েছে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, তাঁরও ওই শিশুদের মতো ভাব। সংসার যেন খেলাঘর। বলছেন, 'রমতে'—শিশুদের মতো আনন্দ করেন তিনি। 'নির্মমঃ'—মমত্ববুদ্ধি নেই তাঁর। 'আমি-আমার' বোধ নেই। তারপর বলছেন, 'নিরহং'—আমিত্ব নেই। অহংতা আর মমতা এই তো বন্ধনের কারণ। যিনি মুক্ত পুরুষ তাঁর আমি-আমার বোধ নেই, তিনি সুখী। 'রমতে নির্মমঃ নিরহং সুখী'; তিনি 'আমি আমার' বোধশূন্য, তিনি আত্মক্রীড়, তিনি সুখে নিজের মধ্যে নিজে আনন্দে থাকেন।

চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষমশনং পানং সরিদ্বারিষু
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরংকুশা স্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালন-শোষণাদিরহিতং দিগ্‌বাস্তু শয্যা মহী
সংচারো নিগমান্তবীথিষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি॥ ৫৩৮

অন্বয় : বিদাং (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের) অশনং (ভোজন) চিন্তাশূন্যম্-অদৈন্য-ভৈক্ষম্ (চিন্তাশূন্য দীনতাবর্জিত ভিক্ষান্ন) পানং সরিদ্বারিষু (নদীর জল পান) স্বাতন্ত্র্যেণ

নিরংকুশা স্থিতিঃ-অভীঃ (স্বাধীন বাধাশূন্য নির্ভয় স্থিতি) নিদ্রা শ্মশানে বনে (শ্মশানে বা বনে নিদ্রা) বস্ত্রং ক্ষালন-শোষণাদি রহিতং (বস্ত্র ধোয়া-শুকোনো ছাড়াই) দিগ্ বা-অস্তু (নেই বা থাকলে থাকুক) শয্যা মহী (পৃথিবী শয্যা) নিগম-অন্ত-বীথিষু সঞ্চারঃ (বেদান্তের পথে বিচরণ) পরে ব্রহ্মণি ক্রীড়া (পরব্রহ্মে ক্রীড়া)।

সরলার্থ : যিনি ব্রহ্মবিদ্ তাঁর ভিক্ষান্নে ভোজন, ভিক্ষায় কি পেলেন বা না পেলেন তা নিয়ে তাঁর কোনও চিন্তা নেই বা দীনতা নেই। নদীর জলে তৃষ্ণা নিবারণ করেন। স্বাধীন নির্ভয় বাধাহীন তাঁর স্থিতি, নিদ্রা শ্মশানে বা বনে। বস্ত্রের ধোয়া বা শুকোনো নেই, বস্ত্র নাও থাকতে পারে আবার থাকতেও পারে। শয্যা পৃথিবী। বেদান্তের পথে তাঁর বিচরণ এবং পরব্রহ্মে ক্রীড়া।

ব্যাখ্যা : সাধু, যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন, তিনি কিভাবে আছেন সেইটাই এক-এক করে বলছেন। 'চিন্তাশূন্যম্-অদৈন্য ভৈক্ষম্-অশনং'; তাঁর কোনও চিন্তা নেই। তাঁর কোনও দৈন্য-ভাব নেই। 'ভৈক্ষম্-অশনং'; ভিক্ষা করে নিয়ে আসছেন, যা পাচ্ছেন খাচ্ছেন। সাধুদের এই ভিক্ষা করাকে বলে মাধুকরী। মৌমাছি যেমন নানা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে তেমনি। সাধুরা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করেন, এখানে একমুঠো, ওখানে একমুঠো, যাতে খিদে মেটানোর মতো খাবার জোটে। কতটুকু পেলেন, কি পেলেন, সেসব নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই, কোনও দৈন্য নেই, আরও পেলে ভালো হতো, এ ভাবই নেই। কিংবা আমি বঞ্চিত হয়েছি এরকম কোনও অনুভূতি নেই। 'পানং সরিদ্-বারিষু'; 'সরিদ্' মানে নদী, নদীর জল পান করছেন। 'চিন্তাশূন্যম্'—কোনও চিন্তা নেই, আমার আর একবারের খাবারটা কিভাবে আসবে সে চিন্তাও নেই। ঈশ্বর নির্ভরতা যাঁদের আছে তাঁরা চিন্তা করেন না। 'স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিঃ-অভীঃ'; তিনি একা, তিনি স্বাধীন, তিনি পরনির্ভর নন। 'নিরঙ্কুশা'—কারোর শাসনে তিনি নেই, কারোর বাধ্য তিনি নন। 'স্থিতিঃ অভীঃ'—নির্ভয় তাঁর স্থিতি। তিনি ভয়শূন্য। কোনও বাধা নেই, বিঘ্ন নেই, তিনি স্বতন্ত্র, স্বাধীন, মুক্ত। 'নিদ্রা শ্মশানে বনে'; সাধুদের ঘুমোবার সবচেয়ে ভালো জায়গা শ্মশান, বন, কোনও নির্জন জায়গা। শ্মশানে কেন? কারণ শ্মশান মনে করিয়ে দেয় আমিও একদিন মরে যাব। 'বস্ত্রং ক্ষালন-শোষণাদি রহিতং'; তিনি কাপড় ধোন না বা শুকোন না। 'দিগ্ বা-অস্তু', বস্ত্র না-ও থাকতে পারে, আবার থাকতেও পারে। 'শয্যা মহী' অর্থাৎ শয্যা এই পৃথিবী। তারপর বলছেন, 'সঞ্চারঃ নিগমান্তবীথিষু'। 'সঞ্চারঃ' মানে চলাফেরা। 'নিগম' মানে বেদ, 'নিগমান্ত' মানে বেদান্ত, 'বীথি' মানে রাস্তা। বেদান্ত যে পথ বলে দিয়েছেন তিনি সেই পথে চলেন। 'পরে ব্রহ্মণি ক্রীড়া'—পরমাত্মার সঙ্গে খেলা করছেন তিনি। জীবন্মুক্ত পুরুষ এইভাবে জগতে থাকেন।

বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্ ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্।
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুষক্তবাহ্যঃ ॥৫৩৯

অন্বয় : যঃ আত্মবেত্তা (যে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি) অব্যক্তলিঙ্গঃ-অননুষক্তবাহ্যঃ (বর্ণাশ্রম বা অন্য যে কোনও চিহ্নবর্জিত, বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত) বিমানম্ এতৎ শরীরম্-আলম্ব্য (শরীরে সম্পূর্ণ অভিমানশূন্য হয়ে এই শরীরকেই অবলম্বন করে) অশেষান্ উপস্থিতান্ বিষয়ান্ (উপস্থিত অপর্যাপ্ত ভোগ্যবস্তু) বালবৎ (বালকের মতো) পর-ইচ্ছয়া ভুনক্তি (পরের ইচ্ছায় ভোগ করছেন)।

সরলার্থ : যিনি আত্মবিদ্ তিনি বর্ণাশ্রম বা অন্য কোনও চিহ্নবর্জিত, বাহ্যবিষয়ে নিরাসক্ত, দেহ-অভিমানশূন্য অথচ সেই শরীর অবলম্বন করে আপনি এসে যাওয়া অপর্যাপ্ত ভোগ্য-সামগ্রী বালকের মতো পরের ইচ্ছায় ভোগ করেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'বিমানম্ আলম্ব্য শরীরম্-এতদ্'; বিমান মানে বি-মান, কোনও অভিমান নেই। 'এই শরীর আমার' এই বোধ তাঁর নেই। আমরা তো এই শরীরটাকে সত্য বলে মনে করি কিন্তু যিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ তিনি এই শরীরকে 'আমার শরীর' বলে মনে করেন না। হাত, পা, মাথা, এসব আছে কিন্তু যেন আর একজনের। 'ভুনক্তি'—ভোগ করেন, 'অশেষান্'—অনেক, 'বিষয়ান্-উপস্থিতান্'—তাঁর নিজের চেষ্টা ছাড়াই যেসব বিষয় উপস্থিত হচ্ছে, তিনি সেসব ভোগ করছেন। আসলে তিনি ভোগ করছেন না, দেহটা ভোগ করছে। কারণ, তিনি সম্পূর্ণ দেহাভিমান শূন্য। দেহের কাজ দেহ করছে, তিনি কিছু করছেন না। জনকরাজা যেমন বলেছিলেন, আমি মিথিলার রাজা, আমার অনেক ধনসম্পদ, সব আমি ভোগ করছি কিন্তু এসব যদি চলে যায় তো আমার কিছু এসে যায় না। শরীরবোধ নেই তো ! ওই যে গীতার কথা, আসক্তি নেই। আমি খাচ্ছি, সব করছি, কিন্তু এসব আমি ভোগ করছি না। আমিত্ব নেই, মমত্ব নেই, 'আমি আমার' বোধ নেই। সেইজন্যে বলছেন 'বিমানম্-আলম্ব্য শরীরম্-এতৎ ভুনক্তি অশেষান্ বিষয়ান্-উপস্থিতান্', ভোগ করছেন, 'অশেষান্ বিষয়ান্-উপস্থিতান্'। অনেক প্রাচুর্যের মধ্যে হয়তো আছেন। ভোগের সামগ্রী যেরকম আসছে সেরকম ভোগ করছেন, কিন্তু চেষ্টা করে কিছু সংগ্রহ করছেন না। এ নয় যে এসব না হলে চলে না। সেইজন্যে বলছেন 'পরেচ্ছয়া'—পরের ইচ্ছার দ্বারা চালিত। এসব পরের ইচ্ছায় যেন হচ্ছে। 'বালবৎ'—শিশুর মতো। আপনা-আপনি পরের ইচ্ছায় যেসব ভোগ্যবস্তু আসছে, সেগুলি তিনি শিশুর মতো ভোগ করছেন। কিন্তু সেসবে তাঁর কোন আসক্তি নেই। ভগবানকে শিশু বলা হয়, সরল শিশু, কোনও কিছুতে টান নেই। ঠাকুর বলছেন, একজন শিশুকে মা একটা কাপড় দিয়েছে, পরে আছে। কেউ একজন হয়তো বলল, আমায় কাপড়টা দেবে ? সে বলছে ঃ না, মা দিয়েছে। তারপরই হয়তো অন্য একজনকে

না চাইতেই সেটা দিয়ে দিল। এই বালকের স্বভাব হয় 'আত্মবেত্তা' পুরুষের। 'আত্মবেত্তা' মানে নিজেকে যিনি জানেন, নিজের স্বরূপ জানেন। আমি কে ? আমি শুদ্ধচৈতন্য। এই জ্ঞানে তিনি প্রতিষ্ঠিত। বলছেন, 'আত্মবেত্তা যঃ অব্যক্তলিঙ্গঃ'; কোনও রকম বাহ্য চিহ্ন তাঁর নেই। যেমন বর্ণশ্রমের চিহ্ন, ব্রাহ্মণের যেমন শিখা-উপবীত থাকে, সন্ন্যাসীর চিহ্ন থাকে, তাঁর সেসব নেই। 'অন্-অনুষক্তবাহ্যঃ'—অন্-অনুষক্ত অর্থাৎ অন্-অনুরক্ত, কোনও অনুরাগ নেই। বাহ্য বিষয়ে তাঁর কোনও আসক্তি নেই। জীবন্মুক্ত জগতের সবকিছু থেকে মুক্ত।

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্ বা পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্।। ৫৪০

অন্বয় : দিগম্বরঃ বাপি চ (দিগম্বর অথবা) স-অম্বরঃ বা (বস্ত্রাবৃত বা) ত্বগ্-অম্বরঃ বা অপি (গাছের ছাল পরিহিত) চিদ্-অম্বরস্থঃ (চৈতন্যের আচ্ছাদনে তিনি স্থিত) উন্মত্তবৎ বা অপি চ বালবৎ বা পিশাচবৎ বা-অপি (উন্মাদের মতো বা বালকের মতো অথবা পিশাচের মতো) অবন্যাম্ চরতি (পৃথিবীতে বিচরণ করেন)।

সরলার্থ : ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি কখনও নির্বস্ত্র বা সবস্ত্র অথবা কখনও বৃক্ষবল্কল পরিধান করে থাকেন। কিন্তু সর্বদা চৈতন্যের আচ্ছাদনে স্থিত তিনি উন্মাদের মতো বা বালকের মতো বা পিশাচের মতো এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটি খুব বিখ্যাত। ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন তিনি জগতে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করতে পারেন। কখনও তিনি 'দিগম্বরঃ', 'দিগ্' মানে শূন্য। অর্থাৎ অম্বরহীন, উলঙ্গ, কখনও বা 'সাম্বরঃ'—কাপড় পরা। আবার কখনও ত্বগ্-অম্বরঃ—গাছের ছাল পরেছেন। কিন্তু সব সময় 'চিৎ-অম্বরস্থঃ'—চৈতন্য, জ্ঞানই পোশাক। আর কোনও পোশাক থাক না থাক, এই পোশাক সব সময় পরে আছেন। বস্ত্রহীনই থাকুন বা বস্ত্রযুক্তই থাকুন, সব সময় তিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। 'উন্মত্তবৎ বাপি'—কখনও তিনি পাগলের মতো থাকেন। আসলে পাগল নন, আমাদের মাপকাঠিতে পাগল। আবার কখনও 'পিশাচবৎ'—পিশাচের মতো, পবিত্র-অপবিত্র কোন বোধ নেই। শ্মশানে থাকেন, হয়তো পচা মাংস খান। যিনি জীবন্মুক্ত তাঁকে কোনও প্রচলিত ধারণার মধ্যে বাঁধা যায় না। আমাদের পক্ষে পোশাক-আশাক, ভদ্রোচিত ব্যবহার এগুলো অত্যন্ত মূল্যবান, তিনি এসবের ধার ধারেন না। কোনও কিছু বাঁধাধরা নিয়ম তাঁর নেই। তিনি উন্মত্তের মতো বা শিশুর মতো বা পিশাচের মতো 'চরতি অবন্যাম্'—পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করেন। তিনি বিবস্ত্র বা সবস্ত্র থাকতে পারেন, কিন্তু স্বরূপজ্ঞানে সর্বদা স্থিত থাকেন। আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকে পাগলের মতো, শিশুর মতো বা

পিশাচের মতো তিনি এই ধরাধামে চলাফেরা করেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কি সুন্দর একটা ছবি এঁকেছেন!

কামান্নিষ্কামরূপী সংশ্চরত্যেকচরো মুনিঃ।
স্বাত্মনৈব সদা তুষ্টঃ স্বয়ং সর্বাত্মনা স্থিতঃ।। ৫৪১

অন্বয় : একচরঃ (একাকী বিচরণশীল) নিষ্কামরূপী সন্ (কামনাশূন্য হয়ে) আত্মনা-এব সদা তুষ্টঃ (সর্বদা নিজের আত্মায় নিজে তুষ্ট) স্বয়ং সর্বাত্মনা স্থিতঃ (স্বয়ং সকলের আত্মারূপে বিরাজমান) মুনিঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) কামান্ চরতি (ভোগ্যবস্তুসকল গ্রহণ করেন)।

সরলার্থ : ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজের আত্মায় নিজে তুষ্ট হয়ে থাকেন ও সকলের আত্মারূপে স্বয়ং তিনি অবস্থান করছেন জেনে একাকী বিচরণ করেন ও নিষ্কামভাবে দেহধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় যথাপ্রাপ্ত ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করেন।

ব্যাখ্যা : আবার বলছেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অবস্থা। 'কামান্নিষ্কামরূপী সংশ্চরতি-একচরঃ মুনিঃ'; তিনি যে কিছু ভোগ করেন না, খান না, তা নয়, কিন্তু সব নিষ্কামভাবে, কামনাশূন্যভাবে করেন। হাত খাচ্ছে, মুখ খাচ্ছে, কিন্তু 'আমি' খাচ্ছি না, সব ভোগ্যবস্তু ভোগ করছেন কিন্তু কোনও কামনা নেই। দেহবোধ নেই তো তাই সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে আছেন। 'সংশ্চরতি'—এইভাবে চলাফেরা করছেন, এইভাবে জীবন- যাপন করছেন। গৌরী-মা দেখেছিলেন একবার, ঠাকুর খাচ্ছেন, তাঁর মুখের ভিতর থেকে একটা সাপ যেন খাবারগুলো টেনে নিচ্ছে। ঠাকুর হেসে ফেলেছেন, বলছেন ঃ তুই দেখে ফেলেছিস ! তিনি খাচ্ছেন না, কুণ্ডলিনী সর্পের মুখে আহুতি দিচ্ছেন। 'একচরঃ মুনিঃ'— একাকী বিচরণশীল মুনি। একা একা থাকতে ভালোবাসেন। কার সঙ্গে থাকবেন ? কে তাঁকে বুঝবে ? কাজেই তিনি একা থাকেন। সকলের সঙ্গে থাকলেও তিনি একা। কারণ, নিজের আত্মা ছাড়া আর কিছু তিনি দেখেন না। মুনি মানে তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, সব সময় আত্মস্থ হয়ে বসে আছেন, কিছু বলছেন না, কিছু দেখছেন না, কিছু শুনছেন না। 'স্বাত্মনা-এব সদা তুষ্টঃ'—সব সময় নিজের মধ্যেই নিজে তুষ্ট। তাঁর আনন্দের উৎস তাঁর নিজের মধ্যে, বাইরে কিছু নেই। আর কি ? 'স্বয়ং সর্বাত্মনা স্থিতঃ'—আমি সকলের মধ্যে বিরাজ করছি। সর্বভূতে বিরাজমান এক আত্মা আমি স্বয়ং। এটা তিনি সব সময় অনুভব করছেন। তাই 'কামান্নিষ্কামরূপী সংশ্চরতি একচরঃ মুনিঃ'—যা কিছু ভোগ করছেন, নিস্পৃহ নিষ্কাম ভাবে, যেন তিনি ভোগ করছেন না, আর কেউ ভোগ করছে। একাকী বিচরণ করেন তিনি। তিনি 'স্বাত্মনা-এব সদা তুষ্টঃ স্বয়ং সর্বাত্মনা স্থিতঃ'; নিজের মধ্যেই সব পেয়ে গেছেন, তাঁর আর বাইরের কিছুর প্রয়োজন নেই। এবং সকলের আত্মারূপে তিনিই আছেন এই বোধে তিনি স্থিত।

ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ
ক্বচিদ্‌ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্ব চিদজগরাচারকলিতঃ।
ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ ॥ ৫৪২

অন্বয় : ক্বচিৎ মূঢ়ঃ (কখনও অজ্ঞ) ক্বচিৎ-অপি বিদ্বান্ (কখনও বা বিদ্বান) মহারাজ-বিভবঃ ([কখনও] মহারাজার ঐশ্বর্যসম্পন্ন) ক্বচিৎ ভ্রান্তঃ (কখনও যেন ভ্রান্ত ব্যক্তি) সৌম্যঃ ([কখনও] প্রিয়দর্শন) ক্বচিৎ-অজগর-আচারকলিত (কখনও অজগরবৃত্তি অবলম্বন করে আছেন) ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ (কখনও মানী ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্মানিত) ক্বচিৎ-অবমতঃ (কখনও অপমানিত) ক্ব-অপি-অবিদিতঃ (কখনও অন্যের কাছে অবিদিত) এবং প্রাজ্ঞঃ (এইভাবে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ) সততপরমানন্দসুখিতঃ (সতত পরমানন্দে মগ্ন থেকে সুখী হয়ে) চরতি (কালাতিপাত করেন)।

সরলার্থ : ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কখনও অজ্ঞ, কখনও বিদ্বান, কখনও মহারাজার ঐশ্বর্যসম্পন্ন, কখনও ভ্রান্ত ব্যক্তির মতো, কখনও প্রিয়দর্শন, কখনও অজগরবৃত্তিসম্পন্ন, কখনও মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সংসর্গে সম্মানিত, কখনও অপমানিত, কখনও বা অন্যের কাছে অবিদিতরূপে বর্তমান থেকে সর্বদা পরমানন্দে সুখে কালাতিপাত করেন।

ব্যাখ্যা : ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অবস্থা বর্ণনা করে যাচ্ছেন। বলছেন, 'ক্বচিৎ-মূঢ়ঃ বিদ্বান্ ক্বচিৎ-অপি'—কখনও যেন 'মূঢ়ঃ', কিছু বোঝেন না, 'ক্বচিৎ বিদ্বান্'—কখনও বা জ্ঞানী। তিনি তো আত্মস্থ, অমনস্ক হয়ে আছেন, মনে হচ্ছে যেন কিছু বোঝেন না। আবার হঠাৎ এক একটা এমন কথা বলেন যে শুনে চমকে যেতে হয়। বিদ্বান ছাড়া এরকম কথা কে বলতে পারে ? তারপর বলছেন, কখনও 'মহারাজবিভবঃ', মহারাজার ঐশ্বর্য নিয়ে, রাজকীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে আছেন। 'ক্বচিৎ ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিৎ-অজগর-আচার কলিতঃ'। কখনও যেন 'ভ্রান্তঃ', ভুল করছেন, ছোটখাট জাগতিক ব্যাপারে ভুল হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও স্থির, শান্ত, সৌম্যদর্শন। 'ক্বচিৎ-অজগর-আচার কলিতঃ'—কখনও অজগরবৃত্তি অবলম্বন করে আছেন। অজগর সাপ যেমন গাছের গুঁড়ির মতো পড়ে থাকে, নড়াচড়া করতে পারে না, হরিণ-টরিণ কিছু সামনে এসে পড়লে গপ্ করে খেয়ে নেয়—তেমনি আচরণ করেন কখনও কখনও। 'যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ', যা আসছে তাই শুধু গ্রহণ করছেন। 'ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ'—কখনও খুব সম্মানিত, অনেক বিশিষ্ট লোকজনের মধ্যে মধ্যমণি হয়ে আছেন। আবার 'ক্বচিৎ-অবমতঃ'— কখনও বা অপমানিত হচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এসবের উদাহরণ কত পাওয়া যায়। তাঁর কিছুতেই কিছু এসে যেতো না। 'ক্ব-অপি অবিদিতঃ'—কোথাও বা কেউ তাঁকে জানছে না। 'এবং প্রাজ্ঞঃ চরতি'—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এইভাবে জগতে

চলেন। 'সততপরমানন্দসুখিতঃ'—সর্বদা পরমানন্দে ভরপুর হয়ে আছেন, সুখে আছেন, মান অপমান কিছুই গ্রাহ্য করছেন না।

নির্ধনোঽপি সদা তুষ্টোঽপ্যসহায়ো মহাবলঃ।
নিত্যতৃপ্তোঽপ্যভুঞ্জানোঽপ্যসমঃ সমদর্শনঃ ॥ ৫৪৩

অন্বয় : নির্ধনঃ-অপি সদা তুষ্টঃ (নির্ধন হয়েও সর্বদা তুষ্ট) অসহায়ঃ-অপি মহাবলঃ (সহায়হীন হয়েও মহাবলসম্পন্ন) অভুঞ্জানঃ-অপি নিত্যতৃপ্তঃ (অভুক্ত থেকেও সব সময় পরিতৃপ্ত) অসমঃ-অপি সমদর্শনঃ (তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, আর সকলের মতো নন তবু তাঁর সর্বত্র সমদৃষ্টি)।

সরলার্থ : যিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তিনি নির্ধন হয়েও সর্বদা সন্তুষ্ট, সহায়হীন হলেও তাঁর মহাশক্তি, অভুক্ত থেকেও তিনি সর্বদা পরিতৃপ্ত। তিনি আর সকলের সঙ্গে সম অবস্থায় না থাকলেও তাঁর সকলের জন্যে সমদৃষ্টি।

ব্যাখ্যা : আবার ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অবস্থা বর্ণনা করছেন। বলছেন, 'নির্ধনঃ-অপি সদা তুষ্টঃ'—গরীব, টাকাপয়সা নেই কিন্তু সর্বদা খুশি, সন্তুষ্ট। 'অসহায়ঃ অপি মহাবলঃ'— একা, কেউ সহায় নেই কিন্তু তাঁর মহাবল। 'নিত্যতৃপ্তঃ-অপি-অভুঞ্জানঃ'—কিছু খান-নি কিন্তু সব সময় তৃপ্ত। 'অসমঃ অপি সমদর্শনঃ'—তাঁর স্বরূপজ্ঞান হয়ে গেছে, অন্যদের থেকে তিনি আলাদা, তবু সকলের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি। তিনি সকলের সমান নন, সবার চেয়ে উর্ধ্বে। তবুও তিনি সবাইকে এক দেখেন। পরপর শ্লোকগুলিতে এইটাই বলে যাচ্ছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ কি, কি কি বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাঁকে চেনা যায়। পরের শ্লোকেও তাই বলছেন।

অপি কুর্বন্নকুর্বাণশ্চাভোক্তা ফলভোগ্যপি।
শরীর্যপ্যশরীর্যেষ পরিচ্ছিন্নোঽপি সর্বগঃ ॥ ৫৪৪

অন্বয় : এষঃ (ইনি) কুর্বন্ অপি অকুর্বাণঃ (কাজ করেও ক্রিয়াহীন) ফলভোগী-অপি অভোক্তা (কর্মফল ভোগ করেও অভোক্তা) শরীরী-অপি-অশরীরী (শরীর থেকেও শরীরে অভিমানবর্জিত) পরিচ্ছিন্নঃ-অপি সর্বগঃ (দেহের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়েও তিনি সর্বত্র বিদ্যমান)।

সরলার্থ : ইনি কাজ করেও ক্রিয়াহীন, কর্মফল ভোগ করেও অভোক্তা, শরীরী হয়েও যেন অশরীরী, অর্থাৎ দেহাভিমানহীন, দেহের গণ্ডীতে থেকেও সর্বত্র বিস্তৃত।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'অপি কুর্বন্-অকুর্বাণঃ'—কাজ করছেন, কিন্তু যেন কিছু করছেন

না। কারণ, তাঁর 'আমি কর্তা' এ ভাবই নেই। 'অভোক্তা ফলভোগী-অপি'; কর্মফল ভোগ করছেন কিন্তু সেসব তাঁকে স্পর্শ করছে না, যেন আর কেউ ভোগ করছে, তিনি অভোক্তা। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও প্রারব্ধ ভোগ থাকে, কিন্তু সেই প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কারণ, তিনি সর্বদা আত্মস্বরূপে স্থির থাকেন। 'শরীরী-অপি-অশরীরী-এষঃ'—শরীর আছে অথচ যেন শরীর নেই। কারণ তাঁর দেহাভিমান নেই, 'আমার দেহ' এ বোধ নেই। 'পরিচ্ছিন্নঃ অপি সর্বগঃ'; 'পরিচ্ছিন্নঃ' মানে সীমাবদ্ধ, তবু 'সর্বগঃ'—সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন। দেহটা একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ জায়গায় আছে। আপাতদৃষ্টিতে তিনি সীমাবদ্ধ। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তো স্বয়ং ব্রহ্ম। ব্রহ্মরূপে তিনি সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন।

অশরীরং সদা সন্তমিমং ব্রহ্মবিদং ক্বচিৎ।
প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতস্তথৈব চ শুভাশুভে॥ ৫৪৫

অন্বয় : সদা অশরীরং সন্তম্ (সর্বদা অশরীরিরূপে আছেন) ইমং ব্রহ্মবিদং (এই ব্রহ্মবিদ্-কে) প্রিয়-অপ্রিয়ে (প্রিয়-অপ্রিয়) তথা-এব চ (সেই রকম) শুভ-অশুভে (শুভ-অশুভ) ন স্পৃশতঃ ক্বচিৎ (কখনও স্পর্শ করে না)।

সরলার্থ : সর্বদা অশরীরিরূপে অবস্থান করছেন এই যে ব্রহ্মবিদ্, তাঁকে প্রিয়-অপ্রিয় বস্তু, বা সেইরকমই, শুভ বা অশুভ কিছুই কখনও স্পর্শ করে না।

ব্যাখ্যা : 'অশরীরং সদা সন্তম্-ইমম্ ব্রহ্মবিদং'; ব্রহ্মবিদ্ সব সময় জানেন যে শরীরটা তিনি নন। শরীর-বোধশূন্য এই যে ব্রহ্মবিদ্, তাঁকে 'ক্বচিৎ প্রিয়-অপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ তথা-এব চ শুভ-অশুভে'। প্রিয়-অপ্রিয় বস্তু বা শুভ-অশুভ কোনও কিছু তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারে না। যিনি ব্রহ্মবিদ্ তিনি জানেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। তিনি জানেন তিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, তিনি অসীম, অনন্ত। তাঁর সর্বত্র সমদর্শন, তাঁর কাছে প্রিয়-অপ্রিয়, শুভ-অশুভ এসব কিছু নেই। এসব তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি সর্বব্যাপী, সবকিছুই তিনি। তিনি সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করেছেন, তাঁর আর ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য নেই। রামপ্রসাদ বলছেন, মা তুমিই পাপ তুমিই পুণ্য। তিনিই তো সব হয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। একটা স্তরে পাপ-পুণ্য সব আছে, কিন্তু আর একটা স্তর আছে যেখানে আর দুই নেই, সব এক। সেখানে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, পবিত্র-অপবিত্র সব তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই।

স্থূলাদিসম্বন্ধবতোঽভিমানিনঃ সুখং চ দুঃখং চ শুভাশুভে চ।
বিধ্বস্তবন্ধস্য সদাত্মনো মুনেঃ কুতঃ শুভং বাঽপ্যশুভং ফলং বা॥ ৫৪৬

অন্বয় : স্থূলাদি-সম্বন্ধবতঃ (স্থূল দেহাদির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত) অভিমানিনঃ (অভিমানী

ব্যক্তির) শুভাশুভে (শুভ ও অশুভ [বোধ থাকে]) চ সুখং চ দুঃখং চ (সুখ ও দুঃখ থাকে) বিধ্বস্তবন্ধস্য (বন্ধন ছিন্ন হয়েছে যাঁর) সৎ-আত্মনঃ মুনেঃ ([সেই] নিত্য আত্মস্বরূপে স্থিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের) শুভং বা-অপি-অশুভং ফলং বা কুতঃ (শুভ বা অশুভ কর্মের ফলই বা কোথা থেকে আসবে) ?

সরলার্থ : স্থূল দেহাদির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত দেহাভিমানী ব্যক্তির শুভ-অশুভ বোধ ও সুখ-দুঃখ থাকে। কিন্তু যাঁর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়েছে, যিনি সৎস্বরূপ আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞ মুনির শুভ বা অশুভ কর্মের ফল কোথা থেকেই বা আসবে ?

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'স্থূলাদিসম্বন্ধবতঃ অভিমানিনঃ সুখং চ দুঃখং চ শুভাশুভে চ'। 'স্থূলাদি' অর্থাৎ দেহ ও দেহসংক্রান্ত যা কিছু। 'সম্বন্ধবতঃ' মানে সম্বন্ধযুক্ত। 'স্থূলাদিসম্বন্ধবতঃ' মানে যে ব্যক্তি দেহ ও দেহসংক্রান্ত সবকিছুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, দেহের প্রতি মমত্ববুদ্ধিযুক্ত। 'অভিমানিনঃ'—'আমার দেহ' বলে অভিমান আছে যার। বলছেন : যার দেহাভিমান আছে, দেহের কাজকর্মের সঙ্গে যে নিজেকে যুক্ত মনে করে, তার 'সুখং চ দুঃখং চ শুভাশুভে চ'—তার সুখ-দুঃখ বোধ আছে, ভালো-মন্দ বোধ আছে। এই যে আমরা মায়ার জগতে বাঁধা পড়ে আছি, সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ মেশানো জগতে ঘুরপাক খাচ্ছি, কলুর বলদের মতো, তা এই দেহ-অভিমানের জন্যে। এই দেহের প্রতি আকর্ষণের জন্যে আমরা শুধু ঘুরছি আর ঘুরছি। কিন্তু যাঁর এই দেহাভিমান চলে গেছে ? তাঁর বন্ধনও চলে গেছে, এই ঘুরপাক খাওয়াও আর নেই। 'বিধ্বস্তবন্ধস্য'—বন্ধন বিধ্বস্ত হয়েছে তাঁর, দেহের প্রতি তাঁর মমত্ব নেই, দেহের বন্ধন তাঁর ছিন্ন হয়ে গেছে। সেই 'সৎ-আত্মনঃ মুনেঃ'—সৎ স্বরূপ আত্মাতে নিমজ্জমান মুনির অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের, 'কুতঃ শুভং বা অপি-অশুভং ফলং বা'—শুভ-অশুভ কর্ম কি ? বা তার ফল কোথা থেকে আসবে ? যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তাঁর কর্ম বা কর্মফল কিছুই নেই। 'শুভং বা-অপি-অশুভং ফলং বা কুতঃ'—শুভ-অশুভ কর্ম আবার সেইসব কর্মের ফল কোথা থেকে আসবে ?

তমসা গ্রস্তবদ্ভানাদগ্রস্তোঽপি রবির্জনৈঃ
গ্রস্ত ইত্যুচ্যতে ভ্রান্ত্যা হ্যজ্ঞাত্বা বস্তুলক্ষণম্॥ ৫৪৭

অন্বয় : বস্তুলক্ষণম্ অজ্ঞাত্বা (বস্তুজ্ঞান না থাকায়) জনৈঃ (সাধারণ মানুষের দ্বারা) অগ্রস্তঃ-অপি রবিঃ ([গ্রহণের সময়] সূর্য অগ্রস্ত থাকলেও) তমসা (অন্ধকারের জন্যে) গ্রস্তবৎ ভানাৎ (গ্রস্ত হওয়ার মতো) গ্রস্ত ([রাহুর দ্বারা] গ্রস্ত) ইতি (এই ভাবে) হি ভ্রান্ত্যা উচ্যতে (ভ্রান্তিবশতই বলা হয়ে থাকে)।

সরলার্থ : বস্তুজ্ঞান না থাকায় সাধারণ মানুষ গ্রহণের সময় অন্ধকার দেখে অগ্রস্ত সূর্যকে গ্রস্ত হয়েছে মনে করে এবং এই ভ্রান্তিবশতই 'রাহুর দ্বারা সূর্য গ্রস্ত হয়েছে', এই রকম বলে থাকে।

ব্যাখ্যা : সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদের ছায়া এমনভাবে পৃথিবীতে পড়ে যে, কোন কোন জায়গা থেকে সূর্যকে মোটেই দেখা যায় না, দিনের বেলাতেও সব অন্ধকার হয়ে যায়। যারা সূর্যগ্রহণ কেন হয় জানে না, তারা মনে করতে পারে সত্যিই বুঝি আকাশে সূর্য নেই, কিন্তু সেটা ভুল। বলছেন : 'অজ্ঞাত্বা বস্তুলক্ষণম্'—বস্তুলক্ষণ না জানার জন্যে। 'তমসা গ্রস্তবদ্‌ভানাৎ-অগ্রস্তঃ-অপি-রবিঃ'—অন্ধকারের জন্যে অগ্রস্ত সূর্যকেও গ্রস্ত মনে হয় বলে। সূর্যকে কেউ-ই গ্রাস করে না, তবুও মনে হয়, কেউ তাকে গ্রাস করে ফেলেছে, কেননা, দিনের বেলায়ও চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। 'জনৈঃ গ্রস্ত-ইতি উচ্যতে ভ্রান্ত্যা'—অজ্ঞ লোকেরা তখন ভুল করে বলে, সূর্যকে রাহু গ্রাস করে ফেলেছে। জীবন্মুক্ত পুরুষদের ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষ এরকম ভুল করে। নিজেদের মতো তাঁদেরও তারা দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মনে করে। কিন্তু শরীরে থাকলেও জীবন্মুক্ত পুরুষের নিজের শরীর বলে কোনও বোধ থাকে না। নিজেকে তিনি আত্মা বলেই জানেন। দেহের মধ্যে থাকলেও দেহ তাঁর আত্মজ্ঞানকে ঢেকে দিতে পারে না, ঠিক যেমন সূর্যকে কেউ গ্রাস করতে পারে না।

তদ্‌বদ্‌দেহাদিবন্ধেভ্যো বিমুক্তং ব্রহ্মবিৎতমম্।
পশ্যন্তি দেহবন্মূঢ়াঃ শরীরাভাসদর্শনাৎ॥ ৫৪৮

অন্বয় : তদ্‌বদ্ (সেইরকম) মূঢ়াঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) শরীরাভাসদর্শনাৎ ([ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির] শরীরের আভাসমাত্র দর্শনের থেকে) দেহাদিবন্ধেভ্যঃ বিমুক্তম্ব্রহ্মবিৎতমম্ (দেহ ও দেহসংক্রান্ত যা কিছুর বন্ধন থেকে মুক্ত শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্‌কে) দেহবৎ পশ্যন্তি (দেহবান বলে দেখে)।

সরলার্থ : সেইরকম দেহ ও দেহ সংক্রান্ত সবকিছু বন্ধন থেকে মুক্ত ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠের শরীরের আভাসমাত্র দেখে অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁকে দেহবান বলে মনে করে।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'তদ্‌বদ্' অর্থাৎ আগে যে সূর্যগ্রহণের উদাহরণ দেওয়া হলো, সেইরকম। 'দেহাদিবন্ধেভ্যঃ বিমুক্তং ব্রহ্মবিৎতমম্', যিনি ব্রহ্মবিদ্ হয়েছেন, ব্রহ্মজ্ঞদের মধ্যেও যিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁর দেহবোধ নেই। তিনি 'দেহাদিবন্ধেভ্যঃ', দেহসংক্রান্ত সমস্ত বন্ধন থেকে 'বিমুক্ত', মুক্ত। দেহ তাঁর আছে, দেহাভিমান নেই। দেহের ওপর মমত্বটা নেই। এটা আমার দেহ, এই বোধটা নেই। আমাদের ওই মমত্বটাই তো বন্ধন, আমরা তাই দেহসর্বস্ব হয়ে আছি। তাঁদের সেরকম নয়। 'পশ্যন্তি দেহবৎ-মূঢ়াঃ'—যারা নির্বোধ তারা ব্রহ্মবিদ্‌কেও দেহবান বলে দেখে। 'শরীর-আভাস দর্শনাৎ'—ওই ভান, ওই যে আগের শ্লোকে বলেছেন 'ভানাৎ', যেন মনে হচ্ছে রাহু সূর্যকে গ্রাস করে ফেলল, সেইরকম ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও শরীরটা যেন আভাস। কোনও মমত্ববোধ নেই। শরীর বোধ না থাকলে শরীর থাকা না থাকা তো সমান। যারা সাধারণ লোক তারা সেটা বোঝে না। 'পশ্যন্তি দেহবৎ'। তারা দেখে এর তো শরীর আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে কথা বলছে চলছে, শরীরের সব কাজই তো করছে আমাদের মতো। তারা 'মূঢ়ঃ', তাই বুঝতে পারে না এঁদের পক্ষে শরীরটা একটা আভাস, ছায়ার মতো। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, একটা গাছ করাত দিয়ে কেটে ফেলেছে কিন্তু গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, একটা ধাক্কা দিলে বা জোরে বাতাস এলে পড়ে যাবে। তেমনি এঁদের দেহটা আছে, কিন্তু দেহটা যেন একটা ভান। এই দেহটা 'আমার' বলে কোনও বোধ নেই তাঁদের, তাই এটা যেন না থাকার মতো আছে।

অহিনির্ল্বয়নীং বায়ং মুক্ত্বা দেহং তু তিষ্ঠতি।
ইতস্ততশ্চাল্যমানো যৎকিঞ্চিৎ প্রাণবায়ুনা॥ ৫৪৯

অন্বয় : অয়ং (এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ) অহিঃ নির্ল্বয়নীং বা (সাপ যেমন খোলস ত্যাগ করে তেমনি) দেহং মুক্ত্বা তু (দেহে 'আমি বোধ' থেকে মুক্ত হয়ে) কিঞ্চিৎ প্রাণবায়ুনা ইতস্ততঃ চাল্যমানঃ তিষ্ঠতি (শুধুমাত্র প্রাণবায়ুর দ্বারা এখানে-সেখানে চালিত হয়ে বিদ্যমান থাকেন)।

সরলার্থ : সাপ যেমন খোলস ত্যাগ করে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তেমনি দেহে 'আমি' বোধ থেকে মুক্ত হয়ে শুধুমাত্র প্রাণবায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে এখানে-সেখানে বিচরণ করে বিদ্যমান থাকেন।

ব্যাখ্যা : সাপ যেমন খোলস ছেড়ে দেয়, জীবন্মুক্ত পুরুষ তেমনি দেহে মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ করেন। 'অহিঃ-নির্ল্বয়নীং বা'—সাপ যেমন খোলস ত্যাগ করে। 'অয়ং মুক্ত্বা দেহং তু তিষ্ঠতি'—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও তেমনি দেহবোধ থেকে মুক্ত হয়ে অবস্থান করেন। 'দেহং তু মুক্ত্বা' মানে 'দেহটা আমি' এই ভাবটা তিনি ত্যাগ করে দেন। দেহাভিমান রাখেন না। এর পরে তিনি কিভাবে জগতে থাকেন ? 'ইতস্ততঃ চাল্যমানঃ যৎকিঞ্চিৎ প্রাণবায়ুনা'—শুধু প্রাণবায়ুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ান। সাধারণ মানুষ বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে জগতে থাকে। জীবন্মুক্ত পুরুষের কোন বাসনা নেই। তিনি প্রাণবায়ুর দ্বারা চালিত হয়ে জগতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঝড়ের মুখে এঁটো পাতা। কলাপাতায় খেয়েছি, সেটা ফেলে দিয়েছি, ঝড়ের জন্যে সে এখানে-সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার কি কোনও বাসনা আছে ? নেই। তেমনি

জীবন্মুক্ত পুরুষকেও প্রাণবায়ু যেখানে নিয়ে যাচ্ছে তিনি সেখানেই যাচ্ছেন, তাঁর নিজের কোনও ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই। সাপ যেমন খোলসটা ফেলে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার ঐ খোলসটার প্রতি কোন টানই থাকে না, তেমনি জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহের প্রতি বিন্দুমাত্রও মমত্ববুদ্ধি নেই। দেহটাকে তিনি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন শুধু।

স্রোতসা নীয়তে দারু যথা নিম্নোন্নতস্থলম্।
দৈবেন নীয়তে দেহো যথাকালোপভুক্তিষু॥ ৫৫০

অন্বয় : যথা (যেমন) স্রোতসা (স্রোতের দ্বারা) দারু (কাঠ) নিম্ন-উন্নত স্থলম্ নীয়তে (নীচু ও উঁচু জায়গায় নীত হয়) [তেমনি] দেহঃ ([ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের] শরীর) দৈবেন (প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা) যথা কাল-উপভুক্তিষু (যতক্ষণ প্রারব্ধের ক্ষয় না হচ্ছে ততকাল ওই ফলভোগে) নীয়তে (নিয়োজিত থেকে চালিত হয়)।

সরলার্থ : স্রোতের দ্বারা কাঠ যেমন নীচু বা উঁচু জায়গায় ভেসে আসে তেমনি জীবন্মুক্ত পুরুষের শরীর প্রারব্ধের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে যতকাল না প্রারব্ধের ক্ষয় হচ্ছে তত্কাল ওই কর্মের ফল ভোগ করে।

ব্যাখ্যা : জলের ঢেউয়ে একটা কাঠ ভেসে যাচ্ছে। ঢেউ যখন উঠছে কাঠটা উঠছে আবার ঢেউ যখন পড়ে যাচ্ছে কাঠটা পড়ছে। 'স্রোতসা নীয়তে দারু যথা নিম্ন-উন্নত স্থলম্'—নদীতে স্রোতে ভেসে যাওয়া কাঠ যেমন স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে কখনও নীচে পড়ে কখনও ওপরে ওঠে। জীবন্মুক্ত পুরুষ ঐরকম, প্রাণবায়ু তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। 'দৈবেন নীয়তে দেহঃ'; 'দৈব' মানে এখানে প্রারব্ধ। প্রারব্ধ হচ্ছে যেসব কর্ম ফল দিতে আরম্ভ করেছে। সঞ্চিতকর্ম যা ছিল তা জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিন্তু প্রারব্ধ ভোগ করতে হবে। এর জন্যে এঁদের রোগব্যাধি ইত্যাদি নিতে হয়। কিন্তু অবতার ছাড়া অন্য যে-কোন সিদ্ধ পুরুষের ক্ষেত্রে প্রারব্ধ প্রযোজ্য। বলছেন, 'দৈবেন নীয়তে দেহঃ যথাকাল-উপভুক্তিষু'। 'দৈবেন নীয়তে দেহঃ'। প্রারব্ধ দেহটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 'যথাকাল-উপভুক্তিষু'। 'যথাকাল', যতক্ষণ পর্যন্ত প্রারব্ধ ক্ষয় না হচ্ছে সেই পর্যন্ত ভোগ করতেই হবে। তারপর দেহটা পড়ে যাবে।

প্রারব্ধকর্ম-পরিকল্পিতবাসনাভিঃ
সংসারিবচ্চরতি ভুক্তিষু মুক্তদেহঃ।
সিদ্ধঃ স্বয়ং বসতি সাক্ষিবদত্র তূষ্ণীং
চক্রস্য মূলমিব কল্পবিকল্পশূন্যঃ॥ ৫৫১

অন্বয় : মুক্তদেহঃ (দেহাভিমানশূন্য জীবন্মুক্ত পুরুষ) প্রারব্ধকর্ম-পরিকল্পিত বাসনাভিঃ

(প্রারব্ধকর্ম-পরিকল্পিত বাসনাগুলির কারণে) ভুক্তিষু (খাওয়া-পরা ইত্যাদি বিষয়ে) সংসারিবৎ-চরতি (সংসারী মানুষদের মত আচরণ করেন) সিদ্ধঃ স্বয়ং (নিজে সিদ্ধ-পুরুষ) চক্রস্য মূলম্ ইব (কুম্ভকারের চক্রের মূলের কাঠের টুকরোর মতো) কল্পবিকল্পশূন্যঃ (কিছু করা বা না করার সংকল্প শূন্য হয়ে) অত্র (দেহে) সাক্ষিবৎ তূষ্ণীং বসতি (সাক্ষীর মতো নিশ্চুপ হয়ে অবস্থান করেন)।

সরলার্থ : দেহাভিমানশূন্য জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রারব্ধ কর্মজনিত বাসনা-চালিত হয়ে খাওয়া- পরা ইত্যাদি বিষয়ে সংসারী মানুষের মতো আচরণ করেন। কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধপুরুষ, কুমোরের চাকার মূলের কাষ্ঠখণ্ডের মতো সঙ্কল্প-বিকল্প শূন্য হয়ে এই দেহে সাক্ষীর মতো নীরবে অবস্থান করেন।

ব্যাখ্যা : জীবন্মুক্ত পুরুষ যখন সংসারে থাকেন তখন সব কাজই করেন, সব দিক দিয়ে তিনি যেন সাধারণ মানুষ, কিন্তু তফাতটা হচ্ছে, 'আমি করছি, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা', এই ভাবটা তিনি রাখেন না। বলছেন, 'প্রারব্ধকর্ম-পরিকল্পিত বাসনাভিঃ সংসারিবৎ চরতি ভুক্তিষু মুক্তদেহঃ'; জীবন্মুক্ত পুরুষ 'মুক্তদেহঃ' অর্থাৎ দেহ-অভিমান থেকে মুক্ত। তিনি সাধারণ সংসারী মানুষের মতোই চলেন ফেরেন ও সবকিছু করেন, কিন্তু সবকিছু তিনি করেন প্রারব্ধ কর্মজনিত বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে। নতুন কোন বাসনা তাঁর নেই, নতুন কোন বাসনা তাঁর হয়ও না। তিনি এই দেহ দিয়ে সবই করছেন কিন্তু তিনি যে করছেন এই বোধটা নেই। তিনি তাঁর হাতটা দিয়ে খাচ্ছেন, কিন্তু যেন অপর কেউ খাচ্ছে, তিনি যে খাচ্ছেন এইটা তাঁর উপলব্ধি হচ্ছে না। তাঁর এই সাধারণ মানুষের মতো চলাফেরা এগুলো প্রারব্ধ কর্মের জন্যে, কিন্তু লোকে মনে করে এসব যেন বাসনার দ্বারা পরিকল্পিত কর্ম। 'সিদ্ধঃ স্বয়ং বসতি সাক্ষিবৎ-অত্র তূষ্ণীং'। তিনি সিদ্ধপুরুষ—'সিদ্ধঃ স্বয়ং'। 'বসতি সাক্ষিবৎ অত্র'—দেহের মধ্যে তিনি নির্লিপ্ত সাক্ষির মতো অবস্থান করেন। 'তূষ্ণীং'—নীরবে, শান্তভাবে অবস্থান করেন। প্রারব্ধজনিত কোন কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেন না। শরীর তার নিজের মতো সেগুলি করে যায়। তিনি 'চক্রস্য মূলম্-ইব' স্থির হয়ে থাকেন। কুমোরের যে চাকা, তার একটা মূল থাকে, কাঠের একটা দণ্ডের মতো। চাকাটা তার চারপাশে ঘোরে, কিন্তু ঐ মূলটা স্থির থাকে। তিনি সেই কুমোরের চাকার মূল কাঠটার মতো স্থির, নিশ্চল, শান্ত। তাঁর কোনও 'আমি-আমার' নেই। কোনও 'কল্পবিকল্প' নেই। কিছু করার কল্পনাও নেই, আবার এটা করব না এ ভাবও নেই। কিছুতে লিপ্ত নন, কোনও বন্ধন নেই।

নৈবেন্দ্রিয়াণি বিষয়েষু নিযুঙক্ত এব
নৈবাপযুঙক্ত উপদর্শনলক্ষণস্থঃ।

নৈব ক্রিয়াফলমপীষদবেক্ষতে স
স্বানন্দসান্দ্ররসপান-সুমত্তচিত্তঃ ॥ ৫৫২

অন্বয় : এষঃ (ইনি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গুলি) বিষয়েষু (বাহ্যবিষয়সমূহে) ন নিযুঙ্ক্তে এব (নিযুক্ত করেন না) ন এব অপযুঙ্ক্তে (বিযুক্তও করেন না) উপদর্শন-লক্ষণস্থঃ (সাক্ষীর লক্ষণযুক্ত রূপে) ক্রিয়াফলম্ অপি (কর্মের ফলও) ঈষৎ ন অবেক্ষতে (একটুও দেখতে পান না) স্ব-আনন্দ-সান্দ্ররসপান-সুমত্তচিত্তঃ (আত্মার ঘন গাঢ় আনন্দরস পানে সর্বদা সুখমত্ত হয়ে থাকেন)।

সরলার্থ : ইনি ইন্দ্রিয়গুলিকে কোন কিছু বাহ্যবিষয়ে নিযুক্তও করেন না বিযুক্তও করেন না। ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়ার ফল সম্বন্ধে একটুও দৃক্‌পাত না করে ঘন গাঢ় আত্মানন্দরস পানে সুমত্ত চিত্তে অবস্থন করেন।

ব্যাখ্যা : যিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁর কিছুতেই লিপ্ততা নেই, আকর্ষণ নেই। তিনি সাক্ষী, দ্রষ্টা হয়ে সংসারে রয়েছেন। বলছেন, 'নৈবেন্দ্রিয়াণি বিষয়েষু নিযুঙ্ক্তে এব'—যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে সেগুলোকে তিনি কখনই বিষয়ে নিযুক্ত করেন না। এ নয় যে ইন্দ্রিয়গুলো, চোখ, কান ইত্যাদি কোনও বিষয়ের সংস্পর্শে আসছে না, কিন্তু কোনও যোগাযোগ হচ্ছে না। আমাদের যে একটা অনুভূতি, একটা বস্তু সম্বন্ধে ধারণা হয় সেটা কি করে হয় ? আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে মনে বুদ্ধিতে একটা ছাপ পড়ে। এখানে সেরকম কিছু হচ্ছে না। তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ে নিযুক্ত করছেন না। আবার তেমনি 'নৈব-অপযুঙ্ক্তে '—বিষয় থেকে বিযুক্তও করছেন না। তিনি চেষ্টা করে কিছুই করছেন না। তিনি যে এই ইন্দ্রিয়গুলো কিছুর ওপর নিযুক্ত করছেন, তা নয়, আবার বিযুক্তও করছেন না। ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। 'উপদর্শন-লক্ষণস্থঃ'—তিনি সাক্ষিস্বরূপ আছেন। 'উপদর্শন' মানে সাক্ষী। 'নৈব ক্রিয়াফলম্-অপি-ঈষদ্-অবেক্ষতে স।' ইন্দ্রিয়গুলি কি করছে দেখছেন না, তাদের কাজের কি ফল হচ্ছে সেদিকে একটুও দৃক্‌পাত করছেন না। তারা তাদের মতো কাজ করে যাচ্ছে। আর তিনি কি করছেন ? 'স্ব-আনন্দ সান্দ্ররসপান-সুমত্তচিত্তঃ।' নিজের মধ্যে থেকে যে আনন্দ আসছে তার 'সান্দ্ররস' পান করছেন। 'সান্দ্র' কথাটার অর্থ হচ্ছে ঘন, নিবিড়। আত্মানন্দের ঘন রস তিনি পান করছেন, রস পান করে তিনি 'সুমত্তচিত্তঃ' হয়ে গেছেন, আনন্দে মত্ত হয়ে গেছেন, পাগলের মতো হয়ে রয়েছেন। যিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ তিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও আনন্দ আহরণ করেন না। 'নৈব ক্রিয়াফলম্-ঈষদ্-অবেক্ষতে'—ইন্দ্রিয়দের ক্রিয়ার যে ফল তার একটুও তিনি অনুভব করেন না। কিন্তু 'স্বানন্দসান্দ্ররসপান-সুমত্তচিত্তঃ'। তাঁর ভেতরে যে আনন্দের খনি আছে তার ঘন গাঢ় নিবিড় রস পান করে তিনি মত্ত হয়ে আছেন।

লক্ষ্যালক্ষ্যগতিং ত্যক্ত্বা যস্তিষ্ঠেৎ কেবলাত্মনা।
শিব এব স্বয়ং সাক্ষাদয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমঃ ॥ ৫৫৩

অন্বয় : লক্ষ্য-অলক্ষ্য-গতিং (লক্ষ্য অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ও অলক্ষ্য অর্থাৎ বিষয়চিন্তা, চিত্তের এই দুই বৃত্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করে) যঃ কেবল-আত্মনা তিষ্ঠেৎ (যিনি শুদ্ধ আত্মারূপে অবস্থান করেন) অয়ং ব্রহ্মবিদ্-উত্তমঃ (এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্) স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবঃ এব (যেন স্বয়ং সাক্ষাৎ শিব)।

সরলার্থ : লক্ষ্য ও অলক্ষ্য অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ও বিষয়চিন্তা এই দুটি মনোবৃত্তিই বিসর্জন দিয়ে যিনি শুদ্ধ আত্মায় অবস্থান করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্, স্বয়ং যেন সাক্ষাৎ শিব।

ব্যাখ্যা : এখানে আত্মজ্ঞানীর আর একটা লক্ষণ বলছেন। তিনি কিভাবে থাকেন ? 'লক্ষ্য-অলক্ষ্য গতিং ত্যক্ত্বা'। লক্ষ্য হচ্ছে যেটা আমি ভালো মনে করছি আর অলক্ষ্য হচ্ছে যেটা আমি ভালো মনে করছি না। এই বিচার তার নেই। যখন আত্মজ্ঞান লাভ করেননি তখন ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। যদি আত্মজ্ঞান আমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে ধ্যান-ধারণা-নিদিধ্যাসন আমার লক্ষ্য হবে আর বিষয়চিন্তা হবে অলক্ষ্য। আত্মজ্ঞান লাভ করার আগে পর্যন্ত লক্ষ্য-অলক্ষ্যের বিচারটা খুব প্রয়োজনীয়। কিন্তু যিনি 'আত্মনা তিষ্ঠেৎ' তিনি সে অবস্থা পেরিয়ে গেছেন। সবই তো ব্রহ্ম, সাধুও ব্রহ্ম চোরও ব্রহ্ম, ভালোও ব্রহ্ম, মন্দও ব্রহ্ম। এই আত্মস্থ হয়ে থাকা, নিজের মধ্যে নিজে ডুবে থাকা, এ যদি হয় তাহলে আর এটা দেখব ওটা দেখব না, এই পথে চলব ঐ পথ বর্জন করব, এসব সঙ্কল্প-বিকল্প চলে যায়। 'কেবল-আত্মনা তিষ্ঠেৎ'—শুধু আত্মার সঙ্গে আছেন তিনি। 'শিবঃ এব স্বয়ং সাক্ষাৎ-অয়ং ব্রহ্মবিদ্-উত্তমঃ'—সেই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ যেন সাক্ষাৎ শিব। শিব মানে মঙ্গলময়। আবার শিব হচ্ছেন আমাদের ভোলানাথ, দেবাদিদেব, সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ। যিনি শুদ্ধ আত্মায় সর্বদা অবস্থান করছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ, তিনি সাক্ষাৎ শঙ্কর। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজেকে নিয়ে মত্ত আছেন। আগে যেমন বলেছেন, আত্মানন্দের গাঢ় ঘন রস পান করে তিনি মেতে আছেন।

জীবন্নেব সদা মুক্তঃ কৃতার্থো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
উপাধিনাশাদ্‌ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি নির্দ্বয়ম্ ॥ ৫৫৪

অন্বয় : জীবন্-এব (জীবন থাকতেই) ব্রহ্মবিৎ-তমঃ (ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ) সদা মুক্তঃ কৃতার্থঃ (সর্বদা মুক্ত ও কৃতার্থ) ব্রহ্ম এব সন্ (স্বরূপত ব্রহ্মই ইনি) উপাধিনাশাৎ (দেহ-ইন্দ্রিয় ইত্যাদি উপাধি আত্মার ওপর অধ্যস্তও মিথ্যা, এই অনুভবের ফলে) নির্দ্বয়ং ব্রহ্ম-অপি-এতি (অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন)।

সরলার্থ : যিনি ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ জীবন থাকতেই তিনি সর্বদা মুক্ত ও কৃতার্থ। তিনি তো স্বরূপত ব্রহ্মই ছিলেন। দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি উপাধিগুলি আত্মার ওপর অধ্যস্ত বলে যখনই স্পষ্ট বোধ হয়েছে তখনই তিনি সেই অদ্বয় ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'জীবন্-এব সদা মুক্তঃ'—এই জীবদ্দশাতেই সদামুক্ত। জীবন্মুক্ত পুরুষ যিনি তিনি সদামুক্ত। সংসারে আছেন আর পাঁচজনের মতো, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত, অনাসক্ত। 'পদ্মপত্রম্-ইব-অম্ভসা', জল যেমন পদ্মপাতাকে ভিজোতে পারে না। সাধারণ লোকে ভাবতে পারে, এ তো আমাদেরই মতো—খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, হাসছে, কথা বলছে—তফাত কোথায় ? তফাত ঐখানেই যে, তিনি নির্লিপ্ত। তিনি 'জীবন্-এব সদা মুক্তঃ কৃতার্থঃ ব্রহ্মবিত্তমঃ'; তিনি সদামুক্ত ও কৃতার্থ। কৃতার্থ মানে কৃত-অর্থ অর্থাৎ যা কিছু করার তা করা হয়ে গেছে, যা পাবার ছিল সব পাওয়া হয়ে গেছে। তিনি পূর্ণকাম, কৃতার্থ। তাঁর কোনও অভাববোধ নেই, তিনি পরিপূর্ণ, তিনি ব্রহ্মবিত্তম। কি করে তিনি এরকম হয়েছেন ? 'উপাধিনাশাৎ'। উপাধি কি ? আমার দেহ-মন-বুদ্ধি। আর এগুলিকে কেন্দ্র করে আমার যেসব ধারণা—যা আমাকে সবার থেকে আলাদা করে ভাবায়। আমি ভাবছি, আমার দেহ, আমি বোকা, আমি ধনী-দরিদ্র-ভারতীয়। এসব উপাধি। ব্রহ্ম তো এক, ব্রহ্ম নিরুপাধিক। তিনি বহু হলেন কি করে ? উপাধির জন্যে। উপাধি চলে গেলে ভালো-মন্দ, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ—সব এক। সব ব্রহ্ম। আমরা সবাই স্বরূপত ব্রহ্ম। চিরকালই ব্রহ্ম। যিনি জীবন্মুক্ত হয়েছেন, তিনি 'ব্রহ্ম-এব সন্'—চিরকালই তিনি ব্রহ্মই ছিলেন। যেই তিনি উপাধি নাশ করলেন, তখনই তিনি নিজের ব্রহ্মস্বরূপ জেনে গেলেন। 'ব্রহ্ম-অপি-এতি নির্দ্বয়ম্'; অদ্বয় ব্রহ্মকে পেয়ে গেছেন, ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেছেন। ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছেন। উপাধি চলে গেছে তাই ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছেন।

শৈলূষো বেষসদ্ভাবাভাবয়োশ্চ যথা পুমান্।
তথৈব ব্রহ্মবিচ্ছ্রেষ্ঠঃ সদা ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥ ৫৫৫

অন্বয় : যথা (যেমন) বেষ-সদ্ভাব-অভাবয়োঃ চ (অন্য বেশ ধারণ করলে বা সে বেশ ত্যাগ করলে) শৈলূষঃ (অভিনেতা) পুমান্ (যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তিই থাকে) তথা এব (সেইরকম) ব্রহ্মবিদ্-শ্রেষ্ঠঃ (যিনি ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ তিনি) ব্রহ্ম-এব (ব্রহ্মই) ন-অপরঃ (অন্য কিছু নন)।

সরলার্থ : একজন অভিনেতা যেমন তাঁর ভূমিকা অনুযায়ী নানা বেশ ধারণ করেন আবার সেসব বেশ ত্যাগ করেন কিন্তু সব সময়েই তিনি নিজে যে-মানুষ সেই মানুষই থাকেন, তেমনি যিনি ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ তিনি যে-অবস্থাতেই থাকুন না কেন সর্বদা ব্রহ্মই হয়ে আছেন, অন্য কিছু নয়।

ব্যাখ্যা : একজন অভিনেতাকে কত ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। এক একটা ভূমিকার জন্যে তাকে সেই সেই ভূমিকা অনুযায়ী পোশাক গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তার জন্যে মানুষটা পালটে যায় না। বলছেন, 'শৈলূষঃ বেষসদ্ভাব-অভাবয়োঃ চ'—অভিনেতা যিনি তিনি যে-ভাবের অভিনয়ের জন্যে যে-পোশাকের প্রয়োজন সেইমতো পোশাক গ্রহণ করছেন আবার প্রয়োজনে সে পোশাক ত্যাগ করে অন্য নিচ্ছেন। তিনি রাজা হচ্ছেন, ভৃত্য হচ্ছেন, স্ত্রী, পুরুষ, যুবক বা বৃদ্ধ হচ্ছেন। কিন্তু তার জন্যে তিনি পালটে যাচ্ছেন না। 'যথা পুমান্'—তিনি যেমন মানুষ ছিলেন তেমনিই থাকছেন। 'তথা-এব ব্রহ্মবিদ্-শ্রেষ্ঠঃ'—যিনি ব্রহ্মবিদ্ শ্রেষ্ঠ তিনি সেইরকম, 'সদা ব্রহ্মৈব ন-অপরঃ'—সব সময় তিনি ব্রহ্মই আছেন, অন্য আর কিছু হননি। উপাধির জন্যে ভিন্ন মনে হলেও তিনি অন্য কিছু হননি। জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞানের পর যে-রকম আচরণ করুন না কেন, ব্রহ্মই থাকেন। তাঁর ব্রহ্মস্বরূপ কখনই ক্ষুণ্ণ হয় না।

যত্র ক্বাপি বিশীর্ণং সৎ পর্ণমিব তরোর্বপুঃ পততাৎ।
ব্রহ্মীভূতস্য যতেঃ প্রাগেব তচ্চিদগ্নিনা দগ্ধম্॥ ৫৫৬

অন্বয় : তরোঃ (গাছের) বিশীর্ণং সৎ পর্ণম্-ইব (শুকনো পাতার মতো) ব্রহ্মীভূতস্য যতেঃ (ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর) বপুঃ (শরীর) যত্র ক্ব-অপি (যে কোনও স্থানে) পততাৎ (পতিত হোক) তৎ (তাঁর দেহ) প্রাক্-এব (আগেই) চিৎ-অগ্নিনা দগ্ধম্ (জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়ে গেছে)।

সরলার্থ : গাছের শুকনো পাতা যেমন যেখানে-সেখানে ঝরে পড়ে তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর শরীর যেখানে হোক পড়ে যাক ! তাঁর দেহ তো আগেই জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে গেছে !

ব্যাখ্যা : বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহটা শুকনো পাতার মতো। মৃত্যুর পরে দেহ দাহ করা হয়, কিন্তু তার আগেই তাঁর শরীর জ্ঞানের আগুনে দগ্ধ হয়ে গেছে। 'বিশীর্ণং সৎ পর্ণম্-ইব তরোঃ'; গাছের শুকনো পাতার মতো, 'ব্রহ্মীভূতস্য যতেঃ বপুঃ পততাৎ যত্র ক্বাপি'; ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর দেহটা যেখানে হোক পড়ে যাক। শুকনো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝরে প'ড়ে, বাতাসে ভেসে এখানে-সেখানে পড়ে, ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর শরীর যেখানে খুশি পড়ুক গে না, তাতে কি এলো গেলো ? তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ 'ব্রহ্মীভূত' যোগীর দেহ তো 'প্রাগেব চিৎ-অগ্নিনা দগ্ধম্'—আগেই জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়ে গেছে। বলছেন, 'ব্রহ্মীভূত'—যিনি ব্রহ্ম হয়ে গেছেন। অবশ্য এ নয় যে আমি ব্রহ্ম ছিলাম না। আমি তো ব্রহ্মই ছিলাম, আছিও, কিন্তু অজ্ঞানের জন্যে সেটা জানতে পারছিলাম না। তারপর হঠাৎ দরজা খুলে গেলো, আমি যা তা দেখলাম,

জানলাম যে আমি ব্রহ্ম। যে মুহূর্তে বুঝেছি আমি ব্রহ্ম সেই বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহ, সমস্ত উপাধি, যা কিছু মলিনতা সব দগ্ধ হয়ে গেছে। স্বরূপজ্ঞান আগুনের মতো, সব মলিনতা পুড়িয়ে দেয়। অবিদ্যা নেই, মলিনতা নেই, পাপ নেই, কোনও দোষ নেই, সবকিছুর দাহ হয়ে গেছে। বলছেন, 'চিৎ-অগ্নিনা', জ্ঞানাগ্নির দ্বারা সব উপাধি-টুপাধি আগেই পুড়ে গেছে। এখন 'শুকনো পাতা', কোথাও একটা ঝরে পড়ুক গে না। আমার যদি স্বরূপজ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে তাহলে কবে মৃত্যু হলো, কোথায় মৃত্যু হলো তাতে কি এসে যায় ?

সদাত্মনি ব্রহ্মণি তিষ্ঠতো মুনেঃ পূর্ণাদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা।
ন দেশকালাদ্যুচিত-প্রতীক্ষা ত্বঙ্‌মাংসবিট্‌পিণ্ডবিসর্জনায়॥ ৫৫৭

অন্বয় : সৎ-আত্মনি ব্রহ্মণি (সৎস্বরূপ ব্রহ্মে) পূর্ণ-অদ্বয়-আনন্দময়-আত্মনা (পূর্ণ, অদ্বয় ও আনন্দময় আত্মা সহ) সদা তিষ্ঠতঃ (সর্বদা অবস্থিত) মুনেঃ (মুনির) ত্বক্-মাংস-বিট্-পিণ্ড বিসর্জনায় (ত্বক্-মাংস ও বিষ্ঠার পিণ্ড যে দেহ সেটা বিসর্জনের জন্যে) দেশ-কাল-আদি-উচিত-প্রতীক্ষা ন (উপযুক্ত স্থান, কাল ইত্যাদির প্রতীক্ষার কোনও প্রয়োজন নেই)।

সরলার্থ : সৎস্বরূপ ব্রহ্মে পূর্ণ-অদ্বয়-আনন্দময় আত্মাসহ সর্বদা অবস্থান করছেন যে মুনি, তাঁর ত্বক্-মাংস-বিষ্ঠার পিণ্ড এই দেহটা বিসর্জনের জন্যে কোনও উপযুক্ত স্থান-কাল ইত্যাদি প্রতীক্ষার প্রয়োজন নেই।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'সদাত্মনি ব্রহ্মণি তিষ্ঠতঃ'। এই কথা কতবার বলছেন! যিনি জীবন্মুক্ত তিনি সব সময় আত্মায় অর্থাৎ ব্রহ্মে 'তিষ্ঠতঃ'—অবস্থান করেন। তিনি আত্মারাম, আত্মক্রীড় রূপে আছেন, আত্মার সঙ্গে খেলছেন। 'পূর্ণ-অদ্বয়-আনন্দময়-আত্মনা সদা তিষ্ঠতঃ'; স্বস্থানে, স্বভূমিতে সব সময় বসে আছেন। 'পূর্ণ', তিনি পূর্ণ, তাঁর কোনও অভাববোধ নেই। 'অদ্বয়-আত্মনা পূর্ণ'—তিনি নিজেকে দিয়ে নিজে পূর্ণ। 'অদ্বয়'—দুই নেই, এক। দুই থাকলে একটা দিয়ে আর একটাকে পূর্ণ করা যায়। কিন্তু দুই নেই তো, 'আত্মনা পূর্ণ'—নিজেকে দিয়েই নিজে পূর্ণ। 'সদাত্মনি ব্রহ্মণি তিষ্ঠতঃ পূর্ণ-অদ্বয়-আনন্দময়-আত্মনা সদা'; তিনি 'পূর্ণ', অখণ্ড, তাঁর কোনও বিকল্প নেই। সর্বদা আনন্দে আছেন। আত্মস্থ হয়ে আছেন, তাই আনন্দে আছেন। আগেও বলেছেন, জীবন্মুক্ত পুরুষ আত্মার সান্দ্র আনন্দরসে সুমত্তচিত্ত হয়ে থাকেন। এখানেও তাই বলছেন। জীবন্মুক্ত পুরুষ সর্বদা আত্মসমাহিত হয়ে আত্মানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে অবস্থান করেন। সেই 'মুনেঃ'—মুনির, 'ত্বক্-মাংস-বিট্‌পিণ্ড বিসর্জনায়'—ত্বক্-মাংস-বিষ্ঠার পিণ্ড এই দেহটার বিসর্জনের জন্যে 'ন দেশ-কালাদি-উচিত প্রতীক্ষা'—উপযুক্ত

কোনও বিশেষ স্থানের, বিশেষ কালের প্রতীক্ষা করার কোনও প্রয়োজন নেই। বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্যে এই দেহটাকে ত্বক্-মাংস-বিষ্ঠাপিণ্ড বলে বর্ণনা করছেন। বলছেন, একে বিসর্জন দেওয়ার জন্য স্থান-কাল ইত্যাদির বিচারের দরকার নেই। বিশেষত জীবন্মুক্ত পুরুষের কাছে দেহটার কোন অস্তিত্বই নেই। ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেহটাকে 'ত্যাগ' করে দিয়েছেন, দেহের থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। তারপর এটাকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন শুধু। এটাকে ফেলে দেবার জন্যে তাঁর আবার স্থান কাল এসব ঠিক করার কি আছে ?

দেহস্য মোক্ষো নো মোক্ষো ন দণ্ডস্য কমণ্ডলোঃ।
অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থিমোক্ষো মোক্ষো যতস্তত॥ ৫৫৮

অন্বয় : যতঃ (যেহেতু) অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থি-মোক্ষঃ (অবিদ্যাজনিত হৃদয়ের বৃত্তি, সংস্কার ইত্যাদি বন্ধন থেকে মুক্তিই) মোক্ষঃ (যথার্থ মুক্তি) ততঃ (সেইজন্যে) দেহস্য মোক্ষঃ নো (দেহের থেকে মুক্তি অর্থাৎ দেহত্যাগ যথার্থ মুক্তি নয়) দণ্ডস্য কমণ্ডলোঃ মোক্ষঃ ন ([সাধুর পক্ষে] দণ্ড কমণ্ডলু পরিত্যাগেও মুক্তি হয় না)।

সরলার্থ : দেহের মৃত্যু হলে মুক্তি হয় না। সাধুর দণ্ড কমণ্ডলু ত্যাগ হয়ে গেলেও মুক্তি হয় না। অবিদ্যাপ্রসূত হৃদয়ের যেসব গ্রন্থি অর্থাৎ সংস্কার, মনের বৃত্তি, সেগুলো চলে গেলেই যথার্থ মুক্তি হয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'দেহস্য মোক্ষঃ নো মোক্ষঃ'—দেহের মৃত্যু হলেই মুক্তি হয় না। আবার সাধু দণ্ড-কমণ্ডলু ত্যাগ করলেই তাঁর মুক্তি হয় না। বলা হয় কাশীতে দেহত্যাগ হলে মুক্তি হয়, আবার সাধু যদি মুক্তি কামনা করে উত্তরাখণ্ডে দণ্ড-কমণ্ডলু ত্যাগ করেন তাহলে তাঁর মুক্তি হয়। বলছেন, এগুলো ভুল ধারণা। এসবে মুক্তি হয় না। তাহলে মুক্তিটা কিসে হয় ? 'অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থিমোক্ষঃ মোক্ষঃ'; অবিদ্যাজনিত হৃদয়গ্রন্থি, মনের অক্কট-বক্কট, অবিদ্যা থেকে মনের যেসব সংস্কার সেগুলিই বন্ধন, সেইগুলি ত্যাগই সত্যিকারের মুক্তি। এছাড়া আর কোনও উপায়ে মুক্তি হয় না। আসল হচ্ছে অবিদ্যা। অবিদ্যাপ্রসূত হৃদয়ের যেসব গ্রন্থি, সেগুলোই বন্ধন, জ্ঞান লাভ করলে সেগুলো চলে যায়। 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'; এইসব মনের গ্রন্থি, সংশয় এগুলো চলে গেলে তবেই মুক্তি। অর্থাৎ বলছেন, জ্ঞানলাভ হলেই মুক্তি, তা না হলে মুক্তি নেই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলছেন, 'তম্ এব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্-এতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। এখানেও সেই একই কথা বলছেন।

কুল্যায়ামথ নদ্যাং বা শিবক্ষেত্রেঽপি চত্বরে।
পর্ণং পততি চেৎ তেন তরোঃ কিং নু শুভাশুভম্॥ ৫৫৯

অন্বয় : পর্ণং (পাতা) কুল্যায়াম্ (নালায়) অথ (অথবা) নদ্যাং (নদীতে) বা (বা) শিবক্ষেত্রে (কাশীধামে) অপি (বা) চত্বরে (চারদিক খোলা জায়গায়) চেৎ (যদি) পততি (পড়ে) তেন (তা দিয়ে) তরোঃ (গাছের) শুভাশুভম্ (ভালো-মন্দ) কিং নু (কি আর হতে পারে) ?

সরলার্থ : কোনও গাছের শুকনো পাতা নালায় পড়ুক বা নদীতে পড়ুক অথবা কাশীধামে বা চত্বরে পড়ুক তাতে গাছের আর কি ভালো-মন্দ হতে পারে ?

ব্যাখ্যা : বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহের মৃত্যুটা কিরকম ? শুকনো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে, সেইরকম। সেটা কোথায় পড়বে তার কোন ঠিক নেই। নর্দমায় পড়তে পারে নদীতেও পড়তে পারে বা যেখানে-সেখানে পড়তে পারে, কিন্তু তাতে গাছের আর কি এলো গেলো ? বলছেন, 'কুল্যায়াম্-অথ নদ্যাং বা শিবক্ষেত্রে-অপি চত্বরে পর্ণং পততি চেৎ'—পাতা যদি নালায় পড়ে বা নদীতে পড়ে অথবা শিবক্ষেত্র কাশীতে বা কোনও চত্বরে পড়ে তাতে 'কিং নু তরোঃ শুভাশুভম্'—গাছের ভালো-মন্দ কি হতে পারে ? তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহত্যাগ যেখানেই হোক না কেন, তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। ব্রহ্মকে জেনেছেন মানে তিনি ব্রহ্মই হয়ে গেছেন। তাঁর দেহত্যাগ কাশীতেই হোক বা একটা খোলা জায়গাতেই হোক অথবা পবিত্র গঙ্গায় বা নর্দমাতেই হোক, তাঁর ব্রহ্মস্বরূপের তাতে কিছুমাত্র হেরফের হয় না।

পত্রস্য পুষ্পস্য ফলস্য নাশবদ্ দেহেন্দ্রিয়প্রাণধিয়াং বিনাশঃ।
নৈবাত্মনঃ স্বস্য সদাত্মকস্যানন্দাকৃতের্বৃক্ষবদস্তি চৈষঃ॥ ৫৬০

অন্বয় : পত্রস্য পুষ্পস্য ফলস্য নাশবৎ (পাতা, ফল ও ফুলের যেমন বৃক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে নাশ হয়) [তেমনি] দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-ধিয়াং বিনাশঃ (দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন ও বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত উপাধির বিনাশ হয়) স্বস্য সৎ-আত্মকস্য আনন্দকৃতেঃ আত্মনঃ (স্বৎ-স্বরূপ আনন্দরূপ স্বীয় আত্মার) ন এব ([বিনাশ] হয় না) চ-এষঃ (আর এই আত্মা) বৃক্ষবৎ-অস্তি (বৃক্ষের মতো সদা বিদ্যমান থাকেন)।

সরলার্থ : পাতা, ফুল ও ফল যেমন বৃক্ষচ্যুত হয়ে বিনষ্ট হয় তেমনি দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত উপাধির বিনাশ হয়, কিন্তু সৎস্বরূপ আনন্দাকৃতি স্বীয় আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মা বৃক্ষের মতো সদা বিদ্যমান থাকেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, একটা গাছের পাতা, ফুল, ফল কতভাবে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি আমাদের দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত উপাধির বিনাশ হয় কিন্তু অবিনশ্বর আত্মা ওই গাছের মতো বিদ্যমান থাকেন। 'পত্রস্য পুষ্পস্য ফলস্য নাশবদ্'—পত্র, পুষ্প ও ফলের যেমন নাশ হয় তেমনি 'দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-ধিয়াং বিনাশঃ'—দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ ও বুদ্ধি, এইসবের বিনাশ হয়। একটা গাছের ফল, ফুল, পাতা কতভাবে নষ্ট হয়। ঝড়ে আবার পাখীদের দৌরাত্ম্যে, আবার ফল কখনও পেকে গিয়ে গাছ থেকে খসে পড়ে। তেমনি আমাদের দেহ। বার্ধক্যে জীর্ণ হয়ে পড়ে যেতে পারে, আবার রোগে শরীরের কলকবজা বিকল হয়ে দেহ চলে যেতে পারে। স্থূল দেহটা তো চলে গেলো, কিন্তু ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি নিয়ে আমাদের যে সূক্ষ্মদেহ, সেটা তখনও থাকে বায়ুভূত অবস্থায়। অপূর্ণ সব বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে সে তখন একটা দেহ খোঁজে। কিন্তু যিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ, যাঁর আমি-আমার বোধ নেই, কোনও বাসনা নেই, তাঁর তো আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়-প্রাণ-বুদ্ধি এসব উপাধি পুড়ে গেছে। কাজেই তাঁর প্রারব্ধ ক্ষয় হয়ে গেলেই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ-রূপ সব উপাধি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু 'নৈব-আত্মনঃ স্বস্য সদাত্মকস্যানন্দাকৃতেঃ বৃক্ষবদ্-অস্তি চ এষঃ'; আত্মার কোনও বিনাশ হয় না। তাঁর সৎস্বরূপ আনন্দের আকার যে আত্মা তা 'বৃক্ষবদ্' সদা বিদ্যমান থাকে।

প্রজ্ঞানঘন ইত্যাত্মলক্ষণং সত্যসূচকম্।
অনূদ্যৌপাধিকস্যৈব কথয়ন্তি বিনাশনম্॥ ৫৬১

অন্বয় : প্রজ্ঞানঘনঃ ইতি (প্রজ্ঞানঘন এই ভাবে) সত্যসূচকম্ (সত্যের নির্দেশক শ্রুতি) আত্মলক্ষণম্ (আত্মার লক্ষণ) অনূদ্য (বর্ণনা করে) ঔপাধিকস্য এব (উপাধিবিশিষ্ট জীবেরই) বিনাশনম্ কথয়ন্তি (বিনাশের কথা বলেছেন)।

সরলার্থ : সত্যনির্দেশক শ্রুতি 'প্রজ্ঞানঘনঃ' বলে আত্মার লক্ষণ বর্ণনা করেছেন আর উপাধিবিশিষ্ট জীবেরই বিনাশের কথা বলেছেন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'প্রজ্ঞানঘনঃ ইতি আত্মলক্ষণং সত্যসূচকম্ অনূদ্য'। শ্রুতি 'সত্যসূচকম্'—যা সত্য শ্রুতি তাই প্রকাশ করেন। সেই শ্রুতি 'প্রজ্ঞানঘনঃ' বলে আত্মার লক্ষণ বর্ণনা করে 'ঔপাধিকস্য-এব কথয়ন্তি বিনাশনম্'—উপাধিযুক্ত যা কিছু সেসবের বিনাশের কথা বলছেন। বলছেন, শ্রুতি 'সত্যসূচকম্'; শ্রুতি যে সত্যের কথা বলেন সেটা সর্বকালের, সর্বদেশের সত্য, নৈর্ব্যক্তিক সত্য, এর কোনও পরিবর্তন নেই। সেই শ্রুতি আমাদের বলে দিচ্ছেন, 'প্রজ্ঞানঘনঃ ইতি-আত্মলক্ষণং'। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই কথা বলা হয়েছে ঃ 'অয়ম আত্মা ... প্রজ্ঞানঘন এব'। আত্মার কি লক্ষণ ? কি পরিচয় ? বলছেন, সেই আত্মা 'প্রজ্ঞানঘনঃ'; জ্ঞানস্বরূপ, 'ঘন', জ্ঞান যেন মূর্ত হয়েছে 'প্রজ্ঞানঘন'—মূর্ত প্রজ্ঞা। এই জ্ঞান আমার 'আত্মলক্ষণং'। এই জ্ঞান অন্তর্নিহিত হয়ে আছে বলেই গুরু যখন

বলেন 'তৎ-ত্বম্-অসি', তখন আমার অনুভব হয় 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। শাস্ত্র বারবার করে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, কি আমাদের সত্যিকারের পরিচয়। আর কি বলছেন ? উপাধির বিনাশের কথা বলছেন। উপাধি একটা লেজুড়, আত্মার ওপর জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভালো-মন্দ, সাদা-কালো, পণ্ডিত-মূর্খ—এইসব হচ্ছে উপাধি। আবার দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি এসবও উপাধি। এগুলোকে সব আত্মার ওপর চাপানো হয়েছে, এগুলো অধ্যাস। কিন্তু আত্মা নিরুপাধিক, তাঁকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি না। উপাধি না থাকলে কোনও কিছুকে চিহ্নিত করা যায় না, বিশেষিত করা যায় না। যাঁর গুণ নেই, রূপ নেই তাঁকে কি করে চিহ্নিত করব ? বলছেন, উপাধিগুলির পরিবর্তন হয়। জড় শরীর এতটুকু ছিল, এত বড় হয়েছে, একদিন নাশ হয়ে যাবে। 'ঔপাধিকস্য-এব কথয়ন্তি বিনাশনম্'। উপাধি দিয়ে যা কিছু চিনছি, শ্রুতি সেসবের বিনাশের কথা বলছেন, সেগুলোকে মিথ্যা বলে বুঝতে বলছেন। নেতি, নেতি, নেতি করে যা অনিত্য, মিথ্যা, সেগুলো বর্জন করতে হবে। শাস্ত্র আমাদের বলে দিচ্ছেন যে তোমার আত্মা 'প্রজ্ঞানঘনঃ', সেইটাই তোমার সত্য পরিচয়, দেহ-প্রাণ-বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধিগুলি জড় বস্তু, মিথ্যা। এগুলোর নাশ কর। নাশ করা মানে এগুলোকে মিথ্যা বলে জানা। যা অনিত্য, মিথ্যা, তাকে সত্য বলে মনে করছ অবিদ্যার জন্যে, সেই অবিদ্যাকে বিনাশ কর। অবিদ্যা কি করে দূর হবে ? অন্ধকার দূর হয় আলো জ্বাললে, অবিদ্যা দূর হবে জ্ঞান হলে। জ্ঞান তো আমাদের ভেতরেই আছে, অজ্ঞানের জন্যে জানতে পারছি না। শাস্ত্র আমাদের বারবার সেইটাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মেতি শ্রুতিরাত্মনঃ।
প্রব্রবীত্যবিনাশিত্বং বিনশ্যৎসু বিকারিষু॥ ৫৬২

অন্বয় : 'অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা' (ওহে, এই আত্মা অবশ্যই অবিনাশী) ইতি শ্রুতিঃ (এই শ্রুতিবাক্য) বিকারিষু বিনশ্যৎসু (বিকারী ও বিনাশশীল দেহাদির মধ্যে) আত্মনঃ অবিনাশিত্বং প্রব্রবীতি (আত্মার অবিনাশিত্বের কথা বলছেন)।

সরলার্থ : 'অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা', এই শ্রুতিবাক্য বিকারশীল ও বিনাশশীল দেহ-ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে আত্মার অবিনাশিত্বের কথা বলছেন।

ব্যাখ্যা : 'অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা-ইতি শ্রুতিঃ' (বৃ, ৪।৫।১৪)। শ্রুতি বলছেন, এই আত্মা অবিনাশী। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই কথা বলা হয়েছে। শ্রুতি মানে শাস্ত্র। শ্রুতি বলা হয় কেন ? কারণ আগে শাস্ত্রের কথা শুনে মনে রেখে দেওয়া হতো গুরু-শিষ্য পরম্পরায়। লেখা হয়েছে অনেক পরে। শাস্ত্র হচ্ছে যা শাসন করে। 'প্রব্রবীতি অবিনাশিত্বং আত্মনঃ'। শাস্ত্র জোর দিয়ে আত্মার অবিনাশিত্বের কথা ঘোষণা করছেন। বলছেন, এই জগতে 'বিনশ্যৎসু বিকারিষু'—সবকিছু বিনাশশীল ও বিকারশীল, তার মধ্যে শুধু আত্মা অবিনাশী। তাঁর কোনও বিকার নেই, তিনি অবিনাশী, নির্বিকার। এই বিনাশশীল বিকারগ্রস্ত জগতে তিনি একা নির্বিকার, অবিনাশী। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। এই 'জগৎ' কথাটার মানেই গতিশীল। এটা মিথ্যা কারণ সব সময় পরিবর্তনশীল। কিন্তু আত্মা কখনও বদলান না, বদলাবেনও না। আত্মা শাশ্বত, সনাতন, পুরাণ, সব সময় একরকম। শ্রুতি এই কথাই বলছেন।

পাষাণ-বৃক্ষ-তৃণ-ধান্য-কড়ঙ্করাদ্যা
দগ্ধা ভবন্তি হি মৃদেব যথা তথৈব।
দেহেন্দ্রিয়াসুমন আদি সমস্তদৃশ্যং
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধমুপযাতি পরাত্মভাবম্॥ ৫৬৩

অন্বয় : যথা (যেমন) পাষাণ-বৃক্ষ-তৃণ-ধান্য-কড়ঙ্করাদ্যাঃ (পাথর-বৃক্ষ-তৃণ-ধান্য-তুষ ইত্যাদির) দগ্ধাঃ (দগ্ধ হওয়ার পর) মৃৎ-এব হি ভবন্তি (মাটিই হয়ে যায়) তথা (তেমনি) দেহ-ইন্দ্রিয়-অসু-মনঃ-আদি (দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন ইত্যাদি) সমস্তদৃশ্যং (সমস্ত দৃশ্য-পদার্থ) জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধং (জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়ে) পরাত্মভাবম্-উপযাতি (শুদ্ধ আত্মস্বরূপে পর্যবসিত হয়)।

সরলার্থ : যেমন পাথর-গাছ-ঘাস-তুষ ইত্যাদি দগ্ধ হয়ে যাবার পর মাটি হয়ে যায় তেমনি দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন ইত্যাদি সমস্ত দৃশ্য-পদার্থ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে শুদ্ধ আত্মস্বরূপে পর্যবসিত হয়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'পাষাণ-বৃক্ষ-তৃণ-ধান্য-কড়ঙ্করাদ্যাঃ দগ্ধাঃ ভবন্তি হি মৃদেব যথা তথৈব'—পাষাণ-বৃক্ষ-তৃণ-ধান্য-তুষ এগুলো সব পুড়িয়ে ফেললে কি হয় ? এগুলো মাটিতে পরিণত হয়। তেমনি আমাদের শরীরটা। 'দেহ-ইন্দ্রিয়-অসু-মনঃ-আদি সমস্তদৃশ্যং জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধং-উপযাতি পরাত্মভাবম্'; দেহ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদি সবকিছু যদি জ্ঞানাগ্নি দিয়ে পোড়াতে পারি তাহলে কি হবে ? পরমাত্মায় পর্যবসিত হবে। পরমাত্মা ছাড়া এদের পৃথক অস্তিত্ব তখন আর আমার কাছে প্রতিভাত হবে না। এক পরমাত্মাই আছেন শুধু। মজা হচ্ছে, এমনি সাধারণ আগুন দিয়ে পোড়ালে সবকিছু মাটি হয়ে যায়। কিন্তু জ্ঞানাগ্নি দিয়ে দগ্ধ করলে, জ্ঞান-চক্ষু দিয়ে দেখলে অর্থাৎ জ্ঞান হলে, সবকিছু পরমাত্মা হয়ে যায়। 'নেতি নেতি' করে সবকিছু ত্যাগ করার সময় দেখছি, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা', কিন্তু জ্ঞান যেই হয়ে গেলো অমনি দেখছি 'ব্রহ্মময়ং জগৎ'। তখন জগৎও সত্য, কারণ জগৎ ব্রহ্মই। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই, সবই

ব্রহ্ম। আমাকেই সর্বত্র দেখছি, আমি ছাড়া আর কিছু নেই। তাই বলছেন, সব যখন জ্ঞানাগ্নিতে পুড়ে গেলো তখন 'উপযাতি পরাত্মভাবম্'।

বিলক্ষণং যথা ধবান্তং লীয়তে ভানুতেজসি।
তথৈব সকলং দৃশ্যং ব্রহ্মণি প্রবিলীয়তে॥ ৫৬৪

অন্বয় : যথা (যেমন) ধবান্তং (অন্ধকার) বিলক্ষণং (বিপরীতধর্মী হলেও) ভানুতেজসি (সূর্যের তেজে) লীয়তে (বিলীন হয়ে যায়) তথা-এব (তেমনি) সকলং দৃশ্যং (সকল দৃশ্য-পদার্থ) ব্রহ্মণি প্রবিলীয়তে (ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়)।

সরলার্থ : আলো আর অন্ধকার বিপরীতধর্মী বস্তু হলেও সূর্যের তেজের মধ্যে অন্ধকার যেমন বিলীন হয়ে যায় তেমনি জ্ঞান হলে সমস্ত দৃশ্যবস্তু ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : বলছেন, আলো আর অন্ধকার যেমন পরস্পর বিপরীত, একসঙ্গে থাকতে পারে না, তেমনি জ্ঞান আর অজ্ঞান। অজ্ঞানের জন্যে আমরা বহু দেখি, কিন্তু জ্ঞান হলে দেখি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। তাই বলছেন, 'বিলক্ষণং ধবান্তং লীয়তে ভানুতেজসি'। 'ধবান্তং' মানে অন্ধকার, 'বিলক্ষণ' মানে আলাদা। অন্ধকার সূর্যের আলোর থেকে আলাদা, একেবারে বিপরীত। যখন সূর্য ওঠে, অন্ধকার যেন 'লীয়তে ভানুতেজসি'—সূর্যের তেজের মধ্যেই লয় পেয়ে যায়। অন্ধকার চলে যায়। 'তথৈব সকলং দৃশ্যং ব্রহ্মণি প্রবিলীয়তে'; যা কিছু দেখছি সে সমস্ত ব্রহ্মে 'প্রবিলীয়তে'। এখন মানুষ দেখছি, গাছপালা দেখছি, কত কি দেখছি। এই যে বহু দেখছি, বৈচিত্র দেখছি, এ অজ্ঞানের জন্যে। জ্ঞান হলে অজ্ঞান থাকে না, কারণ তারা পরস্পর বিরোধী। তাই জ্ঞান-সূর্য যখন আমার মধ্যে উঠবে, অজ্ঞানের সৃষ্টি এই যে দৃশ্যমান জগৎ, তার যত কিছু বৈচিত্র, সব 'ব্রহ্মণি প্রবিলীয়তে'—ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে। তখন দেখব সব ব্রহ্ম, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। দৃষ্টিটা পালটে যাবে। এখন জগৎ দেখছি, তখন ব্রহ্ম দেখব।

ঘটে নষ্টে যথা ব্যোম ব্যোমৈব ভবতি স্ফুটম্।
তথৈবোপাধিবিলয়ে ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্॥ ৫৬৫

অন্বয় : যথা (যেমন) ঘটে নষ্টে (ঘট নষ্ট হলে) ব্যোম (ঘটাকাশ) ব্যোম এব ভবতি স্ফুটম্ (স্পষ্টই মহাকাশই হয়ে যায়) তথা এব (তেমনি) উপাধিবিলয়ে (উপাধি নাশ হলে) ব্রহ্মবিদ্ স্বয়ং ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ং ব্রহ্মই হয়ে যান)।

সরলার্থ : ঘট ভেঙে গেলে ঘটের মধ্যেকার আকাশ যেমন স্পষ্টই মহাকাশের সঙ্গে মিশে যায় তেমনি উপাধি নাশের ফলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হয়ে যান।

ব্যাখ্যা : বেদান্তে ব্রহ্মকে অনেক সময়ই আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারণ অনেক সাদৃশ্য আছে। ব্রহ্মসূত্রে বলা হচ্ছে 'তৎ-লিঙ্গাৎ'। আকাশ সর্বব্যাপী, ব্রহ্মও সর্বব্যাপী, আকাশ কিছুতে লিপ্ত নয়, ব্রহ্মও নির্লিপ্ত, নিরাকার, তাই বলা হয় ব্রহ্ম 'আকাশবৎ'—আকাশের মতো। বলছেন, 'ঘটে নষ্টে যথা ব্যোম ব্যোমৈব ভবতি স্ফুটম্'। একটা ঘট আছে, তার মানেই সেই ঘটের মধ্যে আকাশ আছে। আকাশের কিছুটা যেন ঘটের মধ্যে ধরা আছে। বেদান্তে তাকে আমরা বলি ঘটাকাশ, ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশ। আর সর্বব্যাপী যে আকাশ, তা হলো মহাকাশ। 'ঘটে নষ্টে', ঘটটা যদি ভেঙে ফেলি তাহলে বাইরের আকাশ আর ঘটের আকাশ এক হয়ে যায়। 'ব্যোম ব্যোমৈব ভবতি স্ফুটম্'—ঘটাকাশ স্পষ্টই মহাকাশে মিলে যায়। 'তথৈব উপাধি-বিলয়ে'—তেমনি উপাধি চলে গেলে 'ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিৎ স্বয়ং', ব্রহ্মবিৎ স্বয়ং ব্রহ্মই হয়ে যান। 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'। এই ঘটটা একটা উপাধি। আমরা উপাধি বলি কাকে ? যা আলাদা করে। আকাশকে 'ঘটাকাশ' করেছিল ঘট-রূপ উপাধি। ঘটটা ভেঙে গেলো, উপাধি চলে গেলো, সব এক আকাশ হয়ে গেলো। তেমনি ব্রহ্মবিৎ যিনি তাঁর সব উপাধি লয় হয়ে গেছে, তাই তিনি 'ব্রহ্মৈব স্বয়ং', নিজেই ব্রহ্ম হয়ে গেছেন। ব্রহ্ম আমরা সব সময় হয়েই আছি শুধু উপাধিতে বিভ্রান্ত হয়ে সেটা জানতে পারছি না। যেই অজ্ঞান চলে যাবে, অজ্ঞান-জনিত উপাধিও চলে যাবে, অমনি চকিতে আমার মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে যাবে, আমি জেনে যাব আমি ব্রহ্ম।

ক্ষীরং ক্ষীরে যথা ক্ষিপ্তং তৈলং তৈলে জলং জলে।
সংযুক্তমেকতাং যাতি তথাত্মন্যাত্মবিন্মুনিঃ॥ ৫৬৬

অন্বয় : যথা (যেমন) ক্ষীরং ক্ষীরে (দুধ দুধে) তৈলং তৈলে (তেল তেলে) জলং জলে (জল জলে) ক্ষিপ্তং (ফেলা হলে) সংযুক্তং (মিশে গিয়ে) একতাং যাতি (এক হয়ে যায়) আত্মবিৎ মুনিঃ (আত্মজ্ঞ মুনি) তথা (তেমনি) আত্মনি (আত্মাতে)।

সরলার্থ : দুধে দুধ ফেললে, তেলে তেল ফেললে বা জলে জল ফেললে যেমন তারা একসঙ্গে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যায় তেমনি আত্মবিৎ মুনি নিজের আত্মাতে মিশে গিয়ে আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যান।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'ক্ষীরং ক্ষীরে যথা ক্ষিপ্তং তৈলং তৈলে জলং জলে'; দুধে যদি দুধ ফেলি তাহলে দুধই তো থাকবে, তেলে তেল ফেললে সে তেলই থাকবে, তেমনি জলে জল ফেললে জলই থাকবে। স্বামীজী বলছেন, আমরা স্বরূপতই ব্রহ্ম, তাই আমরা ব্রহ্ম 'হতে' পারি, নাহলে কখনই পারতাম না। অজ্ঞানের জন্যে আমি যা সেটা জানতে পারছি না। সেটা জানার জন্যেই শাস্ত্র পড়ি, গুরুর কাছে যাই। বলছেন, দুধে দুধ ফেললে,

তেলে তেল ফেললে, জলে জল ফেললে যেমন 'সংযুক্তম্-একতাং যাতি'—এক হয়ে মিশে যায় 'তথা-আত্মনি-আত্মবিৎ-মুনিঃ'—তেমনি আত্মবিৎ মুনি নিজেকেই নিজে জেনে নিজের মধ্যেই মিশে যান। সমাধি হলে ব্রহ্মস্বরূপ আমি ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যাই। ব্রহ্মই তো ছিলাম কিন্তু মনে করেছিলাম আলাদা, এখন অজ্ঞান চলে গিয়ে জেনে গেছি যে এক ব্রহ্মস্বরূপ 'আমি'ই শুধু আছি। দেহ-মন-বুদ্ধি, এসব উপাধি কোথায় চলে গেছে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বোধে স্থিত হয়ে আছি। অন্য লোকের কাছে হয়তো আমার দেহ আছে কিন্তু আমার কাছে আমার দেহ আর নেই, আমি ব্রহ্ম হয়ে গেছি। মুণ্ডক উপনিষদে আছে, 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়, তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষম্-উপৈতি দিব্যম্' (মু, ৩।২।৮)। এই যে কত নদী সব সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে তখন কি তারা নিজেদের পৃথকত্ব বজায় রাখছে ? রাখছে না। 'নামরূপ বিহায়', নাম-রূপ বর্জন করে সব সমুদ্রে মিশে যাচ্ছে, সমুদ্রই হয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রত্যেকেই যে নিজের নিজের পৃথক সত্তা নিয়ে গর্ব করি, সেই সত্তা মানেই হচ্ছে নাম-রূপ। এই নাম-রূপকে আঁকড়ে ধরে আছি বলেই আমাদের প্রকৃত রূপ আমাদের কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু যিনি বিদ্বান, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে তিনি 'নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্', নাম-রূপের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে শ্রেষ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ পুরুষকে লাভ করেন। হৃদয়পুরে শয়ন করে আছেন যে দীপ্তিমান পুরুষ সেই পুরুষের কাছে তিনি পৌঁছে যান। 'উপৈতি' মানে প্রাপ্ত হন, 'দিব্যম্' মানে দীপ্তিমান, 'পরাৎপরং' মানে ভালোর থেকেও ভালো। ব্রহ্মই যে সত্তা এটা জানতে পারেন। মনের মলিনতা, অজ্ঞতা মুছে ফেলেছি তাই দুধ যেমন দুধে মিশে যায়, তেল যেমন তেলে মিশে যায়, জল যেমন জলে মেশে তেমনি আমি আমার ব্রহ্মস্বরূপ আত্মায় মিশে গেছি।

এবং বিদেহকৈবল্যং সন্মাত্রত্বমখণ্ডিতম্।
ব্রহ্মভাবং প্রপদ্যৈষ যতির্নাবর্ততে পুনঃ॥ ৫৬৭

অন্বয় : এবং (এই ভাবে) অখণ্ডিতং (এক অখণ্ড) সৎ-মাত্রত্বম্ (সত্তামাত্র) ব্রহ্মভাবং (ব্রহ্মভাবে) বিদেহকৈবল্যং (বিদেহমুক্তি) প্রপদ্য (লাভ করে) এষঃ যতিঃ (এই যোগি- পুরুষ) পুনঃ (পুনরায়) ন আবর্ততে (সংসারে ফিরে আসেন না)।

সরলার্থ : এইভাবে এক অখণ্ড সত্তামাত্র ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত এই যোগিপুরুষ (স্থূলদেহ নাশের পর) বিদেহমুক্তি লাভ করেন এবং আর সংসারে ফিরে আসেন না।

ব্যাখ্যা : যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে গেছেন। 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'। জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্ম হয়েই সংসারে থাকেন। 'সৎ-মাত্রত্বম্ অখণ্ডিতং'—তিনি দেখেন, এক অখণ্ড সত্তাই শুধু আছে। দুই নেই, শুধু এক। সেই সত্তাই তিনি, সেই

সত্তাই ব্রহ্ম। 'ব্রহ্মভাবং'—সব সময় ব্রহ্মভাবে আছেন তিনি, ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত আছেন। তিনি যে ব্রহ্ম স্বয়ং এ বোধ থেকে কখনও তাঁর বিচ্যুতি হচ্ছে না। এইভাবে জগতে থাকতে থাকতে প্রারব্ধ যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন তাঁর স্থূলদেহটা পড়ে যাবে। এই দেহটার সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ ছিল না, জ্ঞানলাভের পর এটাকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন শুধু প্রারব্ধের জন্যে। শরীরটা যেই খসে পড়বে, তিনি 'বিদেহকৈবল্যং', বিদেহমুক্তি লাভ করবেন। 'বিদেহকৈবল্যং প্রপদ্য এষঃ যতিঃ ন আবর্ততে পুনঃ'—বিদেহমুক্তি লাভ করে এই যোগী আর সংসারে ফিরে আসবেন না। সাধারণ মানুষ সংসারে আবার জন্মায় অতৃপ্ত বাসনার জন্যে, কারণ বাসনা পূরণের জন্যে একটা দেহের দরকার হয়। কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষদের কথা আলাদা। তাঁরা শরীর থাকতেই ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। তাঁদের কোন বাসনা থাকে না। তাই বিদেহমুক্তির পর তাঁরা আর সংসারে ফিরে আসেন না। তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না।

সদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানদগ্ধাবিদ্যাদিবর্ষ্মণঃ।
অমুষ্য ব্রহ্মভূতত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ কুত উদ্ভবঃ॥ ৫৬৮

অন্বয় : সৎ-আত্মা-একত্ববিজ্ঞানদগ্ধ-অবিদ্যাদি-বর্ষ্মণঃ (সৎস্বরূপ আত্মার সঙ্গে একত্ব- জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হয়েছে যাঁর অবিদ্যাপ্রসূত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর) অমুষ্য (সেই ব্যক্তির) ব্রহ্মভূতত্বাৎ (ব্রহ্মীভূত হয়ে যাওয়ার ফলে) [আর জন্ম হয় না] ব্রহ্মণঃ কুতঃ উদ্ভবঃ (ব্রহ্মের জন্ম কোথা থেকে হবে) ?

সরলার্থ : সৎস্বরূপ আত্মার সঙ্গে একত্ব-জ্ঞানের ফলে যাঁর অবিদ্যাপ্রসূত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর দগ্ধ হয়ে গেছে সেই ব্যক্তির ব্রহ্মভূত অবস্থার ফলে আর জন্ম হয় না। ব্রহ্মের আবার জন্ম কি করে হয় ?

ব্যাখ্যা : সাধারণ মানুষের দেহত্যাগ আর জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহত্যাগের মধ্যে তফাত আছে। সাধারণ মানুষ যখন দেহত্যাগ করে সে সূক্ষ্মদেহ আর কারণ-শরীরটা নিয়ে স্থূলদেহ থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু ঐ সূক্ষ্মদেহ ও কারণ-শরীরের মধ্যে বাসনা, সংস্কার, অহংবোধ এসব থেকে যায়। সেগুলোর জন্যে তাকে আবার একটা স্থূলদেহ নিতে হয় অর্থাৎ আবার জন্মাতে হয়। কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষ জীবিত অবস্থাতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে মুক্ত হয়ে গেছেন। জ্ঞানাগ্নিতে তাঁর স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর দগ্ধ হয়ে গেছে। স্থূলদেহটা থাকলেও তাঁর মধ্যে দেহাভিমান নেই। তিনি ব্রহ্মস্বরূপেই সর্বদা অবস্থান করেন, আর স্থূলদেহটাকে বয়ে নিয়ে বেড়ান সাপের খোলসের মতো। এর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মমত্ব নেই। কাজেই, তাঁর দেহত্যাগ আর সাধারণ মানুষের দেহত্যাগ আলাদা। দেহত্যাগের পর জীবন্মুক্ত পুরুষ আর দেহধারণ করেন না। কারণ, ব্রহ্মের

আবার কখন জন্ম হয় ? তিনি তো চিরকালই ব্রহ্ম। এখানে বলছেন, 'সৎ-আত্মা-একত্ববিজ্ঞানদগ্ধ-অবিদ্যাদি-বর্ষ্মণঃ'; সৎস্বরূপ 'আমি' একা, এই বিজ্ঞান যাঁর হয়েছে তাঁর অজ্ঞান অবিদ্যা, যার জন্যে আমি-তুমি ভেদ করি সেসব দগ্ধ হয়ে গেছে। দেহান্ত হলেও আমাদের বাসনা, কর্মফল সব বীজাকারে থাকে। কিন্তু জ্ঞানের আগুনে যদি বাসনার বীজ পর্যন্ত দগ্ধ হয়ে যায় তাহলে আর জন্ম হয় না। অবিদ্যার ফলে আমরা বারবার জন্মগ্রহণ করি, আমি-তুমি ভেদ করি কিন্তু যাঁর 'একত্ববিজ্ঞান' হয়েছে তাঁর স্থূলশরীরও নেই, সূক্ষ্মশরীরও নেই, কারণ-শরীরও নেই। সূক্ষ্মশরীরের সতেরোটি অংশ থাকে। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি। আমি যখন মরে গেলাম তখন আমার সূক্ষ্মশরীর আর কারণ-শরীরটা রইল। শাস্ত্র বলছেন, যখন বাতাস বয়ে যাচ্ছে তখন সে যেমন ফুলের রেণুগুলোকে নিয়ে যায় আত্মা সেইরকম এই সূক্ষ্মশরীরকে নিয়ে যান। আর কারণ-শরীর কি ? কারণ-শরীর হচ্ছে অবিদ্যা, অজ্ঞান। অজ্ঞানই তো এই জন্ম-মৃত্যুর আসল কারণ, কারণ নষ্ট করলে তবে তো কার্য নষ্ট হবে। তাই বলছেন, জ্ঞান হলে শুধু সূক্ষ্মশরীর নয় কারণ-শরীরও পুড়ে যায়। তখন আর জন্ম হয় না তাঁর। কেন হয় না ? বলছেন : 'ব্রহ্মভূতত্বাৎ'—ব্রহ্মই হয়ে গেছেন বলে জ্ঞানীর আর জন্ম হয় না। 'ব্রহ্মণঃ কুতঃ উদ্ভবঃ'—ব্রহ্মের আবার জন্ম কি করে হবে ? যাঁর ব্রহ্মত্ব লাভ হয়েছে তাঁর আবার জন্ম হয় নাকি ? যোগী জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সমস্ত অবিদ্যা পুড়িয়ে ব্রহ্মই হয়ে গেছেন, তাঁর আর এ সংসারে ফিরে আসা নেই।

মায়াক্লৃপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ ন স্তঃ স্বাত্মনি বস্তুতঃ।
যথা রজ্জৌ নিষ্ক্রিয়ায়াং সর্পাভাসবিনির্গমৌ।। ৫৬৯

অন্বয় : বন্ধ-মোক্ষৌ (বন্ধন ও মুক্তি) মায়াক্লৃপ্তৌ (মায়ার দ্বারা কল্পিত) বস্তুতঃ (পরমার্থত) স্বাত্মনি (নিজের শুদ্ধ আত্মায়) ন স্তঃ (এ দুটি নেই) যথা (যেমন) নিষ্ক্রিয়ায়াং রজ্জৌ (নিষ্ক্রিয় রজ্জুতে) সর্প-আভাস-বিনির্গমৌ (সর্পের ধারণা হয় ও সেই ধারণা চলে যায়)।

সরলার্থ : বন্ধন ও মুক্তি এ দুটিই মায়ার কল্পনা। বস্তুত শুদ্ধ আত্মায় এর কোনটিই নেই। নিষ্ক্রিয় রজ্জুতে যেমন মিথ্যা সর্পজ্ঞান হয় আবার তা চলে যায়, সেইরকম।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'মায়াক্লৃপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ'—বন্ধন আর মুক্তি এ দুটোই মায়ার দ্বারা কল্পিত, মায়ার কাজ। আমি তো সব সময় মুক্ত, আবার মুক্ত হব কি করে ? নিজেকে বদ্ধ ভাবি বলেই নিজেকে মুক্ত করতে হয়। বদ্ধ, মুক্ত এসব মায়ার দ্বারা কল্পিত অবস্থা। 'ন স্তঃ স্বাত্মনি বস্তুতঃ'—বস্তুত, শুদ্ধ আত্মায় এ দুটোর কোনটিই নেই। আত্মার বন্ধনও নেই, বন্ধন থেকে মুক্তিও নেই, দুই-ই মায়ার কল্পনা। কিরকম ? বলছেন, 'যথা রজ্জৌ নিষ্ক্রিয়ায়াং সর্পাভাস'—'নিষ্ক্রিয়' দড়িতে আমি সর্পাভাস দেখছি। দড়িটা তো পড়ে আছে নিষ্ক্রিয়, সে নড়ছে না চড়ছে না, সেই দড়িতে আমি কিন্তু 'সর্পাভাস' দেখছি, আপাতভাবে একটা সাপ দেখছি, দড়িতে সাপের ধারণাটা আরোপ করছি। বলছি, একটা সাপ না ? আবার আলো আনলে দেখছি, 'বিনির্গমৌ'—না না, চলে গেছে সাপটা। আলো এলে দেখতে পেলাম সাপ নয়, এটা দড়ি। মায়াও এইভাবে আমাদের ভুল দেখায়। যেটা যা নয় তাই ভাবি। কিন্তু এই ভুলটা হয় কেন ? মায়া কেন এরকম ভুল দেখায় ? দড়ি দেখে কেন সাপ ভাবি ? আমার দড়ির জ্ঞানও আছে, সর্পজ্ঞানও আছে, তবু ভুলটা হয় কেন ? এটা একটা বড় প্রশ্ন। তার উত্তরে বেদান্ত বলছেন, কেন হয় এ প্রশ্ন করা অনর্থক। এরকম হয়। এখানে কেন বলে কোন কথা নেই, এরকম হয়, এটা ঘটনা। কেন আমার এ ভুল হচ্ছে ? এ অজ্ঞতা কোথা থেকে এলো ? দেখছি সকলের মৃত্যু হচ্ছে, তবু আমি ভাবছি আমি চিরকাল থাকব, চিরকাল সর্দারি করব। কেন এরকম ভাবছি ? কিছু বলা যায় না। কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই বলছেন, এগুলি মায়ার কাজ, 'মায়াক্লৃপ্তৌ'। মায়া অনির্বচনীয়, অঘটনঘটনপটীয়সী—তিনিই এসব করছেন। স্বামীজী মায়াকে বলছেন, 'a statement of facts'। ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু মেনে নিতে হয়। মায়ার সম্বন্ধে বলা যায় না, কেন, কি। কিন্তু এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তাই মায়াকে আমাদের স্বীকার করতে হয়। এই যে বন্ধন বলছি মুক্তি বলছি, এগুলো সব মায়ার কল্পনা। যেন চোখে হাত দিয়ে বলছি, আমি দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক যেমন দড়িটার নড়াচড়া নেই, পড়ে আছে, কিন্তু সেই দড়িতে আমি 'সর্পাভাস' দেখছি, সাপের কল্পনাটা দড়িতে আরোপ করছি, এও তাই। আলো আনলেই সাপটা চলে গেলো, চলে গেলো মানে—বুঝতে পারলাম যে ওটা সাপ নয়, দড়ি। দড়িকে সাপ দেখা মিথ্যা, আবার সাপ চলে গেলো সেটাও মিথ্যা, কারণ সাপ তো ছিলই না কখনও। তেমনি আমি বদ্ধ এ মিথ্যা, কারণ আমি নিত্যমুক্ত আত্মা। আবার আমি মুক্ত হয়েছি, তা-ও মিথ্যা, কারণ আমার কখনও বন্ধন হয়ই নি। আমি চিরমুক্তই, শুধু আমি জানি না। যদি জানি, যেদিন জানব, এক মুহূর্তেই জানব, একটু একটু করে নয়। অজ্ঞান এক মুহূর্তেই যায়। জ্ঞান যদি কোন শুভ মুহূর্তে কারও জীবনে আসে তাহলে মনে হয় কবে জন্ম হলো ? আমি তো অজর, অমর। আমার জন্মই বা কোথায়, মৃত্যুই বা কোথায় ?

আবৃতেঃ সদসত্ত্বাভ্যাং বক্তব্যে বন্ধমোক্ষণে।
নাবৃতির্ব্রহ্মণঃ কাচিদন্যাভাবাদনাবৃতম্।
যদ্যস্ত্যদ্বৈতহানিঃ স্যাদ্দ্বৈতং নো সহতে শ্রুতিঃ।। ৫৭০

অন্বয় : আবৃতেঃ (আবরণের) সৎ-অসত্ত্বাভ্যাং (থাকা বা না থাকার কারণে) বন্ধ-

মোক্ষণে বক্তব্যে (বন্ধন ও মুক্তির কথা বলা হয়) ব্রহ্মণঃ (শুদ্ধ ব্রহ্মের) কাচিৎ (কোনও) আবৃতিঃ ন (আবরণ নেই) অন্য-অভাবাৎ (দ্বিতীয় বস্তুর অভাববশত) [ব্রহ্ম] অনাবৃতম্ (আবরণহীন) যদি অস্তি (যদি [অন্য বস্তু] থাকে) [তাহলে] অদ্বৈতহানিঃ (অদ্বৈততত্ত্ব অপ্রমাণিত হয়ে যায়) শ্রুতিঃ দ্বৈতং নো সহতে (শ্রুতি দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না)।

সরলার্থ : আবরণের থাকা বা না থাকার কারণে বন্ধন ও মুক্তির বিষয়ে কথা বলা হয়। দ্বিতীয় কোনও বস্তুর অস্তিত্বের অভাবের জন্যে শুদ্ধ ব্রহ্মের কোনও আবরণ থাকতে পারে না। ব্রহ্ম আবরণহীন। যদি অন্য বস্তু থাকে তাহলে অদ্বৈততত্ত্ব অপ্রমাণিত হয়ে যায়। শ্রুতি কখনও দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'আবৃতেঃ সদ্-অসত্ত্বাভ্যাং বক্তব্যে বন্ধ মোক্ষণে'। 'আবৃতিঃ' মানে আবরণ। 'আবৃতেঃ'—আবরণের। এখানে আবরণ বলতে বোঝাচ্ছেন মায়ার আবরণ, অজ্ঞানের আবরণ। মায়ার দুটো শক্তি, আবরণী আর বিক্ষেপী। আকাশে সূর্য রয়েছে, মেঘে ঢাকা পড়ে আছে। আয়নাটাতে ধুলো পড়ে আছে, অবিদ্যার ময়লা, তাই নিজেকে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি না। ওখানে দড়ি পড়ে আছে, আমি সাপ দেখছি। দড়ির সত্যি চেহারাটা আবৃত হয়েছে, সাপ দেখছি বিক্ষেপের জন্যে। তেমনি আমার মধ্যে ব্রহ্ম জ্বলজ্বল করছেন, অজ্ঞানে ঢাকা রয়েছেন। তাই বলছেন, 'আবৃতেঃ সদ্ অসত্ত্বাভ্যাং'—অজ্ঞানের আবরণ থাকলে বা না থাকলে, 'বক্তব্যে ব্রহ্মমোক্ষণে'—বন্ধন বা মোক্ষের কথা বলা হয়ে থাকে। অজ্ঞানের আবরণ থাকলে বলি, আমি বদ্ধ। অজ্ঞানের আবরণ না থাকলে বলি, আমি মুক্ত। কাজেই, বন্ধন বা মুক্তির সঙ্গে অজ্ঞান বা মায়ার সম্পর্ক, আত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। বন্ধন মোক্ষ দুই-ই মায়ার সৃষ্টি। বলছেন, 'ন আবৃতিঃ ব্রহ্মণঃ কাচিৎ'—ব্রহ্মের কোনও আবরণ নেই, ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। 'অন্য-অভাবাৎ অনাবৃতম্'। অন্য তো নেই, দুই নেই, তাহলে আবরণটা হয় কোথা থেকে ? দুই যদি থাকে তাহলে একটা আর একটাকে আবরণ করে রাখতে পারে, কিন্তু দুই নেই, তাহলে কে কাকে আবরণ করবে ? 'যদি-অস্তি-অদ্বৈতহানিঃ স্যাৎ'। যদি ধরি যে ব্রহ্মের একটা আবরণ আছে, তাহলে 'অদ্বৈতহানিঃ স্যাৎ'—অদ্বৈতবাদকে অস্বীকার করা হয়। 'দ্বৈতং নো সহতে শ্রুতিঃ'—শ্রুতি দ্বৈতবাদকে কখনও সহ্য করেন না। দুই নেই, শুধু এক। এক তিনি ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত। সকলের মধ্যে এক সত্তা। 'একঃ দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ', তিনি সবাইকার মধ্যে আছেন। গুহাহিতং, হৃদয়গুহায় লুকিয়ে আছেন। আমার অবিদ্যা, অজ্ঞানের জন্যে ব্রহ্মকে আবৃত মনে করছি। কিন্তু ব্রহ্ম কখনও আবৃত হন না। ব্রহ্মের আবরণ স্বীকার করা মানে ব্রহ্ম ছাড়াও দ্বিতীয় বস্তুকে স্বীকার করা। কিন্তু শ্রুতি ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব সমর্থন করেন না। আমরা শ্রুতির বিরুদ্ধে যেতে পারি না। কাজেই, ব্রহ্মের কোন আবরণ থাকতে পারে না।

বন্ধং চ মোক্ষং চ মৃষৈব মূঢ়া বুদ্ধের্গুণং বস্তুনি কল্পয়ন্তি।
দৃগাবৃতিং মেঘকৃতাং যথা রবৌ যতোঽদ্বয়োঽসঙ্গচিদেতদক্ষরম্॥ ৫৭১

অন্বয় : বন্ধং চ মোক্ষং চ (বন্ধন ও মুক্তি) মৃষা এব (মিথ্যাই) মূঢ়াঃ (নির্বোধ ব্যক্তিরা) বুদ্ধেঃ গুণম্ বস্তুনি কল্পয়ন্তি (বুদ্ধির ধর্ম আত্মায় কল্পনা করে নেয়) যথা (যেমন) মেঘকৃতাং (মেঘকৃত) দৃক্-আবৃতিং (দৃষ্টির আবরণ) রবৌ (সূর্যে [আরোপ করা হয়]) যতঃ (যেহেতু) এতৎ অক্ষরম্ (এই আত্মা ক্ষয়হীন) অদ্বয়ঃ অসঙ্গ-চিৎ (দ্বিতীয় রহিত, সঙ্গহীন, চৈতন্যস্বরূপ [সেইজন্যে আত্মার ওপর বন্ধন মুক্তির কল্পনা হয় না])।

সরলার্থ : বন্ধন ও মুক্তি এ দুটোই মিথ্যা-কল্পনা। নির্বোধ ব্যক্তিরা বুদ্ধির ধর্ম আত্মাতে কল্পনা করে আত্মাকে বদ্ধ বা মুক্ত ভাবে। যেমন মেঘের দ্বারা দৃষ্টি আবৃত হলে সূর্য আবৃত হয়েছেন বলে মনে করা ঠিক নয়। তেমনি এই অবিনাশী, অদ্বিতীয়, নিঃসঙ্গ চিৎস্বরূপ আত্মায় বন্ধন মুক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা ভুল।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'বন্ধং চ মোক্ষং চ মৃষা এব'; বন্ধন ও মুক্তি দুই-ই মিথ্যা, কল্পিত। আমি মনে করছি আমি বদ্ধ, তাই আমি বদ্ধ। আমি মনে করছি আমি মুক্ত, তাহলে আমি মুক্ত। দুটোই মিথ্যা। আমারই কল্পনা। 'মূঢ়াঃ বুদ্ধেঃ-গুণং বস্তুনি কল্পয়ন্তি'। যারা মূঢ় তারা 'বুদ্ধেঃ-গুণং'—বুদ্ধির ধর্ম 'বস্তুনি'—ব্রহ্মে অর্থাৎ আত্মাতে কল্পনা করে নেয় ও ভাবে যে আত্মার বন্ধন বা মুক্তি হচ্ছে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে। এটা মায়ার জন্যে হচ্ছে। মায়া আবরণ করছে আর বিক্ষেপ ঘটাচ্ছে। আমরা যেমন সবকিছুর মধ্যে ব্রহ্মকে দেখছি না, ভালো-মন্দ কত কি দেখছি ! আমরা আপন-পর, কত কি দেখছি। এসব বুদ্ধির দোষে কল্পনা করছি। মায়া আমাদের এই বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটাচ্ছে আর বুদ্ধির সেই ভুল আমরা ব্রহ্মে আরোপ করছি। এক ব্রহ্মকে বহু ভাবছি, নিত্যমুক্ত আত্মাকে বদ্ধ ভাবছি। একটা উদাহরণ দিয়ে এটা বোঝাচ্ছেন। 'দৃগ্-আবৃতিং মেঘকৃতাং যথা রবৌ'। মেঘ আমার দৃষ্টিকে আবরণ করেছে, সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি না, ভাবছি সূর্য আবৃত হয়েছেন। কিন্তু সূর্যকে মেঘ কখনো আবৃত করতে পারে না, মেঘ সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট। মেঘ আমার দৃষ্টিপথকে আবৃত করেছে শুধু, তাই মনে হচ্ছে সূর্য মেঘে ঢাকা পড়েছে। ঠিক তেমনি বুদ্ধির দোষে বন্ধন, মুক্তি এসব গুণ আমরা আত্মায় আরোপ করি। কিন্তু 'যতঃ-অদ্বয়ঃ-অসঙ্গঃ চিদ্-এতৎ-অক্ষরম্'—যেহেতু এই আত্মা অদ্বিতীয়, একা, চৈতন্যস্বরূপ, অবিনাশী, বুদ্ধির কল্পনায় তিনি কেন আবৃত হবেন ? বন্ধন, মুক্তি এসব আত্মাতে থাকতে পারে না। তিনি তো সব সময় মুক্ত হয়েই আছেন আবার মুক্তি কি করে হবে ? তাঁর কোনও বন্ধন নেই তাই মুক্তিরও প্রশ্ন নেই।

অস্তীতি প্রত্যয়ো যশ্চ যশ্চ নাস্তীতি বস্তুনি।
বুদ্ধেরেব গুণাবেতৌ ন তু নিত্যস্য বস্তুনঃ ॥ ৫৭২

অন্বয় : বস্তুনি (আত্মায়) অস্তি-ইতি যঃ চ প্রত্যয়ঃ ([বন্ধন] আছে এই ধারণা) যঃ চ ন-অস্তি-ইতি (আবার [বন্ধন] নেই এইরকম ধারণা) এতৌ (এ দুটিই) বুদ্ধেঃ এব গুণৌ (বুদ্ধির গুণের ফল) তু নিত্যস্য বস্তুনঃ ন (নিত্যবস্তু আত্মার নয়)।

সরলার্থ : আত্মায় বন্ধন আছে বা নেই এ দুটো ধারণাই বুদ্ধির গুণসঞ্জাত। নিত্যবস্তু আত্মার এসব থাকা না থাকার কোনওটাই নেই।

ব্যাখ্যা : আত্মায় বস্তুত কোন বন্ধন বা মুক্তি নেই, এই কথাই আবার বোঝাচ্ছেন। বলছেন, 'অস্তি-ইতি প্রত্যয়ঃ যশ্চ', আত্মায় বন্ধন আছে এই ধারণা, 'যশ্চ নাস্তি-ইতি বস্তুনি', কিংবা আত্মায় বন্ধন নেই এই ধারণা, এই দুটোই 'বুদ্ধেঃ-এব গুণৌ-এতৌ'—বুদ্ধির গুণে হচ্ছে। মায়ার প্রভাবে বুদ্ধিতে এই বিভ্রান্তি ঘটছে। 'ন তু নিত্যস্য বস্তুনঃ'—নিত্যবস্তু আত্মাতে বন্ধনও নেই বন্ধনের অভাবও নেই। বুদ্ধির গুণে আমরা ভাবছি, আত্মাতে বন্ধন আছে বা বন্ধন নেই।

অতস্তৌ মায়য়া ক্লৃপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ ন চাত্মনি।
নিষ্কলে নিষ্ক্রিয়ে শান্তে নিরবদ্যে নিরঞ্জনে।
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে ব্যোমবৎ কল্পনা কুতঃ ॥ ৫৭৩

অন্বয় : অতঃ-তৌ বন্ধমোক্ষৌ (অতএব সেই দুটি, বন্ধন ও মুক্তি) মায়য়া ক্লৃপ্তৌ (মায়ার দ্বারা কল্পিত) আত্মনি চ ন (আত্মায় তারা থাকে না) নিষ্কলে নিষ্ক্রিয়ে শান্তে নিরবদ্যে নিরঞ্জনে অদ্বিতীয়ে ব্যোমবৎ পরে তত্ত্বে (নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত অনবদ্য অঞ্জনহীন আকাশের মতো অসঙ্গ পরম তত্ত্বে) কল্পনা কুতঃ (বন্ধমোক্ষের কল্পনা কি করে হয়) ?

সরলার্থ : অতএব বন্ধন ও মুক্তি, এ দুটি মায়ার দ্বারা কল্পিত, আত্মায় এসব নেই। কলাহীন, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অনবদ্য, নিরঞ্জন, অদ্বিতীয়, আকাশের মতো নিরাকার ও অসঙ্গ আত্মায় বন্ধন-মোক্ষের কল্পনা কি করে হয় ?

ব্যাখ্যা : ঐ একই কথা আবার বলছেন যে, আত্মায় বন্ধন বা মুক্তি নেই। বলছেন, 'অতঃ', অর্থাৎ বন্ধন-মুক্তি নিয়ে অনেক কথাই তো হয়ে গেছে, তার থেকেই আমরা বুঝতে পারছি 'মায়য়া ক্লৃপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ ন চ আত্মনি'—বন্ধন-মুক্তি এ দুটিই মায়ার দ্বারা কল্পিত। আত্মায় এ দুটোর কোনটাই নেই। মায়াটা কি ? মায়ার কোন সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। মায়ার সম্বন্ধে বলা হয়, 'সৎ-অসৎ-ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ম্'—'সৎ'-ও নয়, 'অসৎ'-ও নয়, এই দুটোর থেকেই আলাদা, অনির্বচনীয়। মায়া চিরকাল থাকে না, জ্ঞান হলে মায়া থাকে না—তাই 'সৎ' নয়। আবার 'অসৎ' বা অলীক নয়, কারণ মায়ার কার্য, এই জগৎ আমরা দেখতে পাই। কাজেই মায়ার আপেক্ষিক অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এই কারণে মায়াকে 'অনির্বচনীয়' বলা হয়। বলা হয়, 'ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ'—একটা কিছু যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এই মায়ার জন্যেই আমরা ব্রহ্মস্বরূপ থেকে নিজেদের পৃথক ভাবি। নিজেদের জীব ভাবি, নারী-পুরুষ, সুখী-দুঃখী ভাবি, বদ্ধ ভাবি, আবার মায়ার নাশে নিজেদের মুক্ত ভাবি। সবই মায়ার কল্পনা। মায়ার সৃষ্টি এইসব কল্পনা আমাদের শুদ্ধস্বরূপ আত্মাকে কখনও স্পর্শ করতে পারে না। বলছেন : 'নিষ্কলে নিষ্ক্রিয়ে শান্তে নিরবদ্যে নিরঞ্জনে অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে ব্যোমবৎ কল্পনা কুতঃ'—কলাহীন, ক্রিয়াহীন, শান্ত, অনবদ্য, অনঞ্জন, আকাশের মতো, নিত্যমুক্ত পরব্রহ্মস্বরূপ আমার যে আত্মা, তাতে মায়া আর কি কল্পনা আরোপ করবে ? আত্মার কোনদিন বন্ধন হয়নি, তাই মুক্তির প্রশ্নও ওঠে না। যতক্ষণ আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ সুখ-দুঃখ আছে, সংসারযন্ত্রণা আছে, এসবের থেকে মুক্তির চেষ্টাও আছে। কিন্তু যখন আমার স্বরূপজ্ঞান হয়েছে, তখন আমি দেখি যে ওই দেহকেন্দ্রিক সত্তাটা কোনদিনই আমি ছিলাম না। আমি স্বরূপত ব্রহ্ম। চিরকালই আমি তাই। কাজেই, আমি যে কোনদিন বদ্ধ ছিলাম, সেটা মিথ্যা। আবার আমি যে বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে ব্রহ্ম হয়েছি, সেটাও মিথ্যা। আমি চিরকালই ব্রহ্মস্বরূপ।

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৫৭৪

অন্বয় : উৎপত্তিঃ ন (উৎপত্তি হয় না) চ নিরোধঃ ন (নাশও হয় না) বদ্ধঃ ন (বদ্ধ কেউ নেই) চ সাধকঃ ন (আর সাধকও কেউ নয়) মুমুক্ষুঃ ন (মুমুক্ষু কেউ নেই) বৈ মুক্তঃ ন (আবার মুক্তও কেউ হয় না) ইতি-এষা পরমার্থতা (এটাই পরম সত্য)।

সরলার্থ : কারোরই উৎপত্তি নেই তাই নাশও নেই। কেউ বদ্ধ নয় আর বন্ধন মুক্তির সাধকও নেই, মুমুক্ষুও কেউ নেই আবার মুক্তও কেউ হয় না। এটাই পরম সত্য।

ব্যাখ্যা : এবার একেবারে ব্রহ্মস্বরূপে থেকে সবকিছু বর্ণনা করছেন। বলছেন, 'ন নিরোধঃ ন চ উৎপত্তিঃ'—মৃত্যুও নেই, জন্মও নেই। কারোরই কখনও জন্মও হয়নি মৃত্যুও হয়নি। সব ব্রহ্ম। সবাই ব্রহ্ম। 'বদ্ধঃ ন চ সাধকঃ ন মুমুক্ষুঃ ন বৈ মুক্তঃ'—বদ্ধ কেউ নেই, কারণ সবাই ব্রহ্ম। বদ্ধ কেউ নেই বলেই সাধকও কেউ নেই, মুমুক্ষু বা মুক্তিকামীও কেউ নেই, বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে, এরকমও কেউ নেই। 'ইতি এষা পরমার্থতা'—এটাই পরম সত্য। এক ব্রহ্ম, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। কোন কালে ছিল না।

সকলনিগমচূড়াস্বান্তসিদ্ধান্তরূপং
পরমিদমতিগুহ্যং দর্শিতং তে ময়াদ্য।
অপগতকলিদোষং কামনির্মুক্তবুদ্ধিং
স্বসুতবদসকৃৎ ত্বাং ভাবয়িত্বা মুমুক্ষুম্॥ ৫৭৫

অন্বয় : অপগত কলিদোষং (দম্ভ, লোভ ইত্যাদি কলিযুগের দোষ [তোমার] চলে গেছে) কামনির্মুক্তবুদ্ধিং (নিষ্কামচিত্ত) ত্বাং (তোমাকে) ভাবয়িত্বা মুমুক্ষুং (মোক্ষ-অভিলাষী জেনে) স্বসুতবৎ (নিজের পুত্রের মতো) ইদম্ পরম্-অতিগুহ্যং (এই শ্রেষ্ঠ অতি গোপনীয়) সকল-নিগম-চূড়া-স্বান্ত-সিদ্ধান্তরূপং (সকল বেদের শীর্ষস্থানীয় উপনিষদ্গুলির অভ্যন্তরস্থ সিদ্ধান্তস্বরূপ পরব্রহ্মের তত্ত্ব) অসকৃৎ (বারবার) অদ্য (আজ) ময়া তে দর্শিতং (আমার দ্বারা তোমার কাছে প্রকাশিত হলো)।

সরলার্থ : তোমার লোভ দম্ভ ইত্যাদি কলিদোষ অপগত হয়েছে, তুমি নিষ্কাম আর তোমাকে মুমুক্ষু জেনে আমি পুত্রজ্ঞানে তোমাকে এই শ্রেষ্ঠ, অতি গোপনীয়, সমস্ত বেদের শীর্ষস্থানীয় উপনিষদ্সমূহের সারসিদ্ধান্তরূপ পরব্রহ্মতত্ত্ব আজ বারবার করে বলেছি।

ব্যাখ্যা : শিষ্যকে বলছেন, দেখো, এইসব কথাগুলো যে তোমাকে বললাম, এসব বেদান্তের কথা, উপনিষদের কথা। বলছেন, 'সকলনিগমচূড়া'। নিগম হচ্ছে বেদ আর আগম হচ্ছে তন্ত্র। আমাদের হিন্দুধর্ম এই দুটোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। 'সকলনিগমচূড়া' মানে সমস্ত বেদের চূড়া বা শীর্ষ অর্থাৎ উপনিষদ্। 'সকল নিগমচূড়াস্বান্তসিদ্ধান্তরূপং'— উপনিষদের যে সারসিদ্ধান্ত, 'পরমিদম্-অতিগুহ্যম্', যেটা শ্রেষ্ঠ ও অতি গোপনীয়। অতি গোপনীয় কারণ সবাই বুঝবে না, কদর্থ করবে। যেসব কথা সকলে বুঝবে না সেসব তাদের বলে কি লাভ ? শিষ্যকে বলছেন এই কথাগুলো। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নরেন, রাখাল এঁদের কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতেন, বলতেন, দেখ্ তো, কেউ আসছে কি না। বাস্তবিক, আধ্যাত্মিক জীবনের সব কথা সবাইকে বলা যায় না। পাত্র-অপাত্র বিচার করতে হয়। গুরু শিষ্যকে বলছেন : তোমাকে যেসব কথা আজ বললাম, এগুলো অতি গোপনীয় কথা। শ্রেষ্ঠ উপদেশ। বেদের শীর্ষস্থানীয় যে বেদান্ত, তার একেবারে সারসিদ্ধান্ত এই কথাগুলো। সবাইকে এসব বলা যায় না। তোমাকে বললাম, কারণ, তুমি উপযুক্ত আধার। বলছেন, 'অপগত-কলি-দোষং'— তোমার মনের সব মলিনতা কেটে গেছে। চিত্তশুদ্ধি হয়েছে। মনের মলিনতা মানে রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার, হিংসা, ক্রোধ এইসব তোমার মধ্যে থেকে চলে গেছে। 'কামনির্মুক্তবুদ্ধি', তোমার মনে, বুদ্ধিতে কামনার লেশমাত্র নেই, 'বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে গেছে। 'স্বসুতবৎ'—তোমায় নিজের ছেলের মতো ভেবে আর 'ভাবয়িত্বা মুমুক্ষুম্'—

তুমি মুক্তির ইচ্ছা কর এটা বুঝে, তোমায় ভালোবেসে এইসব গুহ্যকথা বারবার করে বলেছি। তুমি যোগ্য আধার বলে এসব তত্ত্ব তোমার কাছে প্রকাশ করেছি। শিষ্যের আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে দেখে গুরু খুশি হয়েছেন, তাই এইসব কথা বলছেন।

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং প্রশ্রয়েণ কৃতানতিঃ।
স তেন সমনুজ্ঞাতো যযৌ নির্মুক্তবন্ধনঃ॥ ৫৭৬

অন্বয় : ইতি (এই ভাবের) গুরোঃ-বাক্যং শ্রুত্বা (গুরুর কথা শুনে) নির্মুক্তবন্ধনঃ (সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত) সঃ (সেই শিষ্য) প্রশ্রয়েণ (পরম ভক্তিভরে) কৃতানতিঃ (শ্রীগুরুর চরণে প্রণত হলেন) তেন সমনুজ্ঞাতঃ (তাঁর দ্বারা সুপ্রসন্ন আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে) যযৌ (চলে গেলেন)।

সরলার্থ : শ্রীগুরুর এইসব স্নেহবাক্য শুনে সেই সংসারপাশ থেকে মুক্ত শিষ্য পরম শ্রদ্ধায় তাঁর চরণে প্রণত হলেন ও তাঁর সম্পূর্ণ আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে চলে গেলেন।

ব্যাখ্যা : গুরু শিষ্যকে আদর করে বললেন যে, তুমি উচ্চ আধার, তোমাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসি আর তুমি মুক্তি চাও, এটা বুঝে বেদান্তের সব মহাবাক্য, বেদান্তের শেষ কথা তোমায় বারবার করে শুনিয়েছি। সত্যিই তো তিনি বারবার করে এইসব কথা বলেছেন। 'ইতি শ্রুত্বা গুরোঃ-বাক্যং'—শিষ্য গুরুর মুখ থেকে এই কথা শুনে 'প্রশ্রয়েণ কৃতানতিঃ', খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। আমরা গুরুকে বলি 'গুরুরেব মহেশ্বরঃ'। গুরুই সব আমাদের কাছে। স্বামীজী বলতেন, অনেকে অনেক কিছু দান করতে পারেন কিন্তু সবচেয়ে বড় দান, জ্ঞান দান, আত্মজ্ঞান দান। গুরু আমাদের সেই জ্ঞান দেন, সেইজন্যে গুরু আমাদের কাছে এত বড়। 'সঃ তেন সমনুজ্ঞাতঃ যযৌ নির্মুক্তবন্ধনঃ'। শিষ্য এবার চলে যাবেন। বন্ধনমুক্ত শিষ্যকে গুরু প্রসন্ন-মনে অনুমতি দিলেন। গুরুর আজ্ঞা পেয়ে শিষ্য প্রস্থান করলেন। পিঞ্জর থেকে মুক্ত সিংহ যেন চললেন।

গুরুরেব সদানন্দসিন্ধৌ নির্মগ্নমানসঃ।
পাবয়ন্ বসুধাং সর্বাং বিচচার নিরন্তরঃ॥ ৫৭৭

অন্বয় : সৎ-আনন্দ-সিন্ধৌ (ব্রহ্মানন্দসাগরে) নির্মগ্নমানসঃ (মগ্নচিত্ত) নিরন্তরঃ এব গুরুঃ (ভেদজ্ঞানশূন্য সেই গুরু) সর্বাং বসুধাং (সমস্ত পৃথিবীকে) পাবয়ন্ (পবিত্র করে) বিচচার (বিচরণ করেছিলেন)।

সরলার্থ : সেই ব্রহ্মানন্দসাগরে নিমজ্জিতচিত্ত ভেদবুদ্ধিরহিত গুরু সমস্ত পৃথিবীকে পবিত্র করে বিচরণ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা : শিষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করে গুরুর আজ্ঞা নিয়ে চলে গেলেন। আর গুরু কি করলেন ? গুরুও তেমনি। 'গুরুরেব সৎ-আনন্দসিন্ধৌ নির্মগ্নমানসঃ'; গুরুরও তো সৎস্বরূপ-ব্রহ্মানন্দসাগরে মন ডুবে আছে, ব্রহ্মকে জেনে তিনি তো ব্রহ্মই হয়ে গেছেন। তিনি 'নিরন্তরঃ'—তাঁর মধ্যে কোনও ভেদদৃষ্টি নেই, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু তিনি দেখছেন না। 'পাবয়ন্ সর্বাং বসুধাং বিচচার'—সমস্ত পৃথিবীকে পবিত্র করে তিনি বিচরণ করেছিলেন। তাঁর পায়ের স্পর্শ যেখানে পড়েছে, সেই স্থান পবিত্র হয়ে গেছে।

ইত্যাচার্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেনাত্মলক্ষণম্।
নিরূপিতং মুমুক্ষুণাং সুখবোধোপপত্তয়ে॥ ৫৭৮

অন্বয় : মুমুক্ষূণাং (মুক্তিকামী ব্যক্তিদের) সুখবোধ-উপপত্তয়ে (সহজে আত্মবোধের নিশ্চিত ধারণার জন্যে) আচার্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেন (গুরু ও শিষ্যের সংলাপের মধ্যে দিয়ে) ইতি আত্মলক্ষণম্ নিরূপিতং (এই আত্মলক্ষণ নিরূপিত হলো)।

সরলার্থ : মুমুক্ষু ব্যক্তিদের সহজে আত্মোপলব্ধির উপায় হিসেবে আচার্য ও শিষ্যের সংলাপের মধ্যে দিয়ে এই আত্মলক্ষণ নিরূপিত হলো।

ব্যাখ্যা : 'ইতি আচার্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেনাত্মলক্ষণম্'; এই যে গুরু-শিষ্যের সংলাপ, আলাপ-আলোচনা, এর থেকে আমরা আত্মলক্ষণ পেয়েছি। 'নিরূপিতং মুমুক্ষুণাং সুখ-বোধ-উপপত্তয়ে'; এই আত্মলক্ষণ নিরূপিত হলো যারা মুমুক্ষু, মুক্তির ইচ্ছা করে, তাদের সহজে আত্মোপলব্ধির জন্যে। যে মুক্তির ইচ্ছা করছে তার এসব কথা শুনলে আনন্দ, বুঝলে আরও আনন্দ। সত্যিই, গুরু-শিষ্যের এসব কথা শুনলে শিহরণ জাগে।

হিতমিদমুপদেশমাদ্রিয়ন্তাং
বিহিতনিরস্তসমস্তচিত্তদোষাঃ।
ভবসুখবিরতাঃ প্রশান্তচিত্তাঃ
শ্রুতিরসিকা যতয়ো মুমুক্ষবো যে॥ ৫৭৯

অন্বয় : যে (যাঁরা) বিহিত-নিরস্ত-সমস্ত-চিত্তদোষাঃ (শ্রুতি-নির্দেশিত সাধনার দ্বারা সমস্ত চিত্তদোষ থেকে মুক্ত হয়েছেন) ভবসুখবিরতাঃ (সংসারসুখে বিরক্ত) প্রশান্ত-চিত্তাঃ (প্রশান্ত চিত্ত) শ্রুতিরসিকাঃ (শ্রুতির রসগ্রহণে সমর্থ) মুমুক্ষবঃ যতয়ঃ (মুক্তিকামী সাধক) [তাঁরা] ইদম্-হিতম্-উপদেশম্ আদ্রিয়ন্তাং (এই কল্যাণকর উপদেশের আদর করুন)।

সরলার্থ : শ্রুতিবিহিত সাধনার দ্বারা চিত্তের সমস্ত মলিনতা যাঁদের চলে গেছে, সংসার-সুখে যাঁদের বিরাগ এসেছে, যাঁরা প্রশান্তচিত্ত, শ্রুতিবাক্যে প্রীতিসম্পন্ন ও মুক্তি-অভিলাষী সাধক, তাঁরা এই কল্যাণকর উপদেশের আদর করুন।

ব্যাখ্যা : বলছেন, 'হিতম্-ইদম্-উপদেশম্-আদ্রিয়ন্তাং'—এই হিতোপদেশের আদর হোক। অতি আদরণীয় এইসব কথা। কাদের কাছে এর আদর হবে ? 'বিহিত-নিরস্ত-সমস্ত-চিত্তদোষাঃ'। 'বিহিত' মানে শাস্ত্রসম্মত কর্ম। 'নিরস্ত'—চলে গেছে। শাস্ত্রসম্মত কর্মের অনুষ্ঠানে 'সমস্তচিত্তদোষাঃ', মনের সব মলিনতা যাঁদের নিরস্ত হয়ে গেছে। মলিনতা আমাদের কোন্‌টা ? মূল মলিনতা হচ্ছে অজ্ঞতা। অজ্ঞতার বশে যেসব কামনা- বাসনা মনে জন্ম নেয় সেসব যাঁদের দূর হয়ে গেছে। 'বিহিত-নিরস্ত'—শাস্ত্র যা করতে বলেন, সেসব করে তাঁরা চিত্তের মলিনতা দূর করেছেন। যাগযজ্ঞের কথা শাস্ত্র যা বলেন তাকে বহিরঙ্গ সাধন বলে আর নিত্যানিত্য-বস্তুবিচার, শমদমাদিষট্-সম্পদের যে সাধনা তাকে অন্তরঙ্গ সাধন বলে। এই দুরকম সাধনে তাঁদের চিত্তশুদ্ধি হয়েছে। 'ভবসুখবিরতাঃ প্রশান্তচিত্তাঃ'—সংসারের সুখে বিরাগযুক্ত, প্রশান্তচিত্ত। সংসারের যে সুখ, সেসব তাঁরা চান না, তাঁদের চিত্ত প্রশান্ত হয়ে গেছে। 'শ্রুতিরসিকাঃ মুমুক্ষবঃ যতয়ঃ'—শাস্ত্র-অনুরাগী, মুক্তি-ইচ্ছু সেইসব সাধকরা এই হিতোপদেশের 'আদ্রিয়ন্তাং'—আদর করুন। এইসব উপদেশ তাঁদের জন্যে।

সংসারাধ্বনি তাপভানুকিরণপ্রোদ্ভূতদাহব্যথা-
খিন্নানাং জলাকাঙ্ক্ষয়া মরুভূবি ভ্রান্ত্যা পরিভ্রাম্যতাম্।
অত্যাসন্নসুধাম্বুধিং সুখকরং ব্রহ্মাদ্বয়ং দর্শয়-
ত্যেষা শংকরভারতী বিজয়তে নির্বাণসংদায়িনী॥ ৫৮০

অন্বয় : সংসার-অধ্বনি (সংসারপথে) তাপভানুকিরণপ্রোদ্ভূতদাহব্যথা-খিন্নানাং (ত্রিতাপরূপ সূর্যের কিরণ থেকে উদ্ভূত দহনজ্বালায় কাতর) জলাকাঙ্ক্ষয়া (শান্তিবারির আকাঙ্ক্ষায়) মরুভূবি (মরুভূমির তুল্য সংসারে) ভ্রান্ত্যা (ভ্রমবশত) পরিভ্রাম্যতাম্ (বিচরণকারী মানুষকে) অতি-আসন্ন-সুধা-অম্বুধিং (অতি নিকটস্থ সুধাসমুদ্ররূপ) সুখকরং অদ্বয়ং ব্রহ্ম দর্শয়তী (সুখকর অদ্বয় ব্রহ্ম দর্শনকারিণী) এষা (এই) নির্বাণ-সংদায়িনী (মোক্ষসুখ প্রদায়িনী) শংকর-ভারতী (শঙ্করের বাণী) বিজয়তে (জয়যুক্ত হচ্ছে)।

সরলার্থ : সংসার-পথে ত্রিতাপজনিত দুঃখজ্বালা, প্রখর সূর্যকিরণের উত্তাপ থেকে উদ্ভূত দাহ-ব্যথার মতো মানুষকে কাতর ও দুর্বল করে। শান্তিবারির আশায় ভুল করে সে সংসার-মরুভূমিতেই ঘুরে বেড়ায়। তাদের জন্যে শঙ্করের এই বাণী অতি নিকটবর্তী সুধাসাগররূপ সুখকর অদ্বয় ব্রহ্ম-দর্শনকারিণী ও মুক্তিপ্রদায়িনী। শঙ্করের এই বাণী সর্বদা জয়যুক্ত হয়।

ব্যাখ্যা : মরুভূমিতে সূর্যের প্রখর কিরণে দগ্ধ মানুষ যেমন জলের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ঘোরে, সংসারেও ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ মানুষ ঠিক ঐভাবেই শান্তির আশায় ঘুরে মরে।

তাদের কাছে শঙ্করের এই বাণী যেন হাতের কাছে সুখসাগর। বলছেন, 'সংসার-অধ্বনি তাপ-ভানু-কিরণ-প্রোদ্ভূত-দাহ-ব্যথা-খিন্নানাং'। 'অধ্বন্' মানে পথ। 'সংসার-অধ্বনি' মানে সংসারের পথে। 'তাপভানুকিরণপ্রোদ্ভূতদাহব্যথা-খিন্নানাং', সূর্যের উত্তপ্ত কিরণে যেমন তপ্ত, তৃষ্ণার্ত ও কাতর হয়ে যেতে হয়, তেমনি মানুষ সংসারের পথে চলতে-চলতে নানা দুঃখের তাপে 'খিন্ন' বা দুর্বল হয়ে যায়। 'জলাকাঙ্ক্ষয়া মরুভূবি ভ্রান্ত্যা পরিভ্রাম্যতাম্'—জলের আকাঙ্ক্ষায় তারা সংসাররূপ মরুভূমিতেই বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে। জানে না কোথায় শান্তি পাবে। সংসারে শান্তি নেই, তবুও ভুল করে সংসারেই শান্তি খোঁজে, মরুভূমিতে মানুষ যেমন জলের আশায় ভুল করে মরীচিকার পেছনে ছোটে। এদের কাছে শঙ্করের এই বাণী কিরকম ? 'অতি-আসন্ন সুধা-অম্বুধি'—একেবারে হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারা যায়, এরকম একটা সুধাসাগর। অমৃতের সাগর। যে সাগর 'সুখকরং ব্রহ্ম-অদ্বয়ং দর্শয়তী-এষা নির্বাণসংদায়িনী'—পরম শান্তিদায়ী অদ্বয় ব্রহ্ম দর্শন করিয়ে দেয় এই সাগর আর মোক্ষ দান করে। শঙ্করের এই অদ্বৈত তত্ত্বের বাণী মানুষকে অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ লাভের পথ দেখায়, মুক্তির পথে নিয়ে যায়, মানুষের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটায়। এই বাণী সংসারতাপদগ্ধ মানুষকে অমৃতের সন্ধান দেয়। প্রতিটি মানুষের কাছে এ শান্তির আকর। 'এষা শংঙ্কর-ভারতী বিজয়তে'—শঙ্করের এই বাণী সর্বত্র জয়যুক্ত হয়। বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বাণী।